১ম বর্ষ
১ম সংখ্যা]

দর্শন

[কার্ত্তিক, ১৩৪৮ সাল

দর্শনের স্বরূপ

অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম এ, পি-এচ. ডি।

দর্শনশাস্ত্রকে আমরা সংক্ষেপে দর্শন বলি। দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ হইতেছে চাক্ষুষজ্ঞান বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। এই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ গ্রহণ করিলে চাক্ষুষ জ্ঞানের সাধন শাস্ত্রকেই দর্শনশাস্ত্র বলিতে হইবে। কিন্তু সাধারণ লোকের নিকট দর্শনের এরূপ অর্থ একান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হইবে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ই চাক্ষুষজ্ঞানের সাধন হইতে পারে, শাস্ত্র কিরূপে চাক্ষুষজ্ঞানের সাধন হইবে? এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে চক্ষুরিন্দ্রিয় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সাধন হইলেও যে শাস্ত্র আত্মসাক্ষাৎকারের সাধন অর্থাৎ যাহার দ্বারা আত্মার বা অধ্যাত্মতত্ত্বের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের ন্যায় সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় তাহাকেও দর্শন বলা হয়। প্রত্যক্ষের স্বরূপগত লক্ষণ হইতেছে সাক্ষাৎ প্রতীতি। যে কোনরূপ সাক্ষাৎ জ্ঞানকেই আমরা প্রত্যক্ষ বলিয়া থাকি, তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়জন্য বা শ্রবণেন্দ্রিয়জন্য হউক অথবা কোন ইন্দ্রিয়জন্যই না হউক তাহাতে প্রত্যক্ষের স্বরূপের বৈলক্ষণ্য হয় না। যোগজ ধর্মদ্বারা অতীন্দ্রিয়, ভূত, ভবিষ্যৎ ও অতিসূক্ষ্ম বস্তুর যে সাক্ষাৎজ্ঞান হয় তাহাকেও প্রত্যক্ষ বলা হয়, অবশ্য এরূপ প্রত্যক্ষ লৌকিক নহে, ইহা অলৌকিক। এমন কি রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে জ্ঞানটি যদি সাক্ষাৎ প্রতীতি হয়, তবে আমরা তাহাকে প্রত্যক্ষ বলিয়া থাকি, যদিচ ইহাকে আমরা ভ্রম প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করি। অতএব দর্শনশব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ ধরিয়া আমরা দর্শন বলিতে আত্মসাক্ষাৎকারের সাধন শাস্ত্র বুঝিতে পারি।

প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ দর্শনশাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে তাঁহাদের মতে দর্শন একটি আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, এবং ইহার দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থকে। জীব বলিতে তাঁহারা দেহবশিষ্ট আত্মাকে বুঝিতেন। জীব পঞ্চভূতের পরিণাম দেহ বা ইন্দ্রিয় সকলের সমষ্টিমাত্র নহে। জীব বলিতে দেহাতিরিক্ত অথচ দেহমনবিশিষ্ট দেহী বা আত্মাকেই বুঝায়। এই আত্মা জ্ঞানময় বা জ্ঞানগুণসম্পন্ন এবং অজর ও অমর। জীবের জন্ম বলিতে কোন আত্মার দেহবিশেষের সহিত সংযোগ বুঝায় এবং মৃত্যু বলিতে তাহার অধিকৃত দেহের বিনাশ বুঝায়। জীব তাহার কর্মানুসারে দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে এবং নিজ কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে। আমরা এখন যে সুখদুঃখ ভোগ করিতেছি তাহা আমাদের পূর্বকৃত নিজ কর্মের ফল। জীব সংসারে নানাবিধ দুঃখভোগ করিয়া নিজ দুঃখ নিবৃত্তির বা মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের মতে আমাদের যাবতীয় দুঃখের মূল কারণ হইতেছে অজ্ঞান বা অত্বজ্ঞানের অভাব। অতএব দুঃখের চরম নিবৃত্তির জন্য তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যে জ্ঞান দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব তাহা প্রত্যক্ষ অথবা অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়া চাই। আত্মা বা তত্ত্ববিষয়ে সাধারণ বা পরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা দুঃখনিবৃত্তি হয় না। অতএব আত্মসাক্ষাৎকার বা অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মুক্তির উপায়। দর্শন এইরূপ আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃষ্ট সাধন এবং জীবের মুক্তিপ্রয়োজন সিদ্ধির উপায়। এতএব দেখা যাইতেছে যে দর্শন বলিতে ভারতীয় দর্শনাচার্যগণ আত্মসাক্ষাৎকার বা তত্ত্বজ্ঞানের সাধন শাস্ত্রকেই বুঝিতেন। আত্মা বা অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের সাধন শাস্ত্রই দর্শন, অন্য বিষয়ে জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান।

দর্শনের পূর্বোক্ত লক্ষণের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি উঠিতে পারে। প্রথম আপত্তি হইতে পারে যে দর্শন তত্ত্বজ্ঞানের সাধন হইলেও তত্ত্বসাক্ষাৎকারের বা প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের উপায় হইতে পারে না। দর্শনে বিচার বা যুক্তিদ্বারা আমরা সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা করি। কিন্তু কেবল বিচার দ্বারা কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে পারে না। যে ব্যক্তি জন্মান্ধ তাহার পক্ষে বিচারবুদ্ধির সাহায্যে আলোকের প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। ভারতীয় দার্শনিকগণ এই আপত্তির যৌক্তিকতা অস্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতেও কেবল বিচার বা মনন দ্বারা আত্মা বা তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় না। এই জন্যই তাঁহারা শাস্ত্রার্থ বিচারের পর আত্মা ও অধ্যাত্মবিষয়ে নিদিধ্যাসন বা যোগসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আত্মা ও তত্ত্ববিষয়ে দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি ন্যায়ানুগত বিচারদ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে এবং সেগুলি বিচারসহ ও ন্যায়ানুমোদিত হইলে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পর আত্মা ও তত্ত্ববিষয়ে নিরন্তর ধ্যানযোগে তন্ময় হইতে পারিলে সেগুলির সম্যক্ উপলব্ধি ও সাক্ষাৎকার হইবে। অবশ্য এই উপলব্ধি কোন লৌকিক প্রত্যক্ষ নহে, কারণ তাহা ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান নহে। কিন্তু ইন্দ্রিয়জন্য না হইলেও ইহা সাক্ষাৎ প্রতীতি বলিয়া ইহাকে প্রত্যক্ষ বলা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষের স্বরূপলক্ষণ সাক্ষাৎ প্রতীতি, ইন্দ্রিয়জন্যত্ব নহে, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এতএব ভারতীয় দার্শনিকগণ যোগসাধন দ্বারা নিষ্পন্ন আত্মা বা অধ্যাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ-জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিলে তাহাতে আপত্তি করিবার কোন হেতু নাই।

দ্বিতীয় আপত্তি হইতে পারে যে যদি দর্শন বলিতে আত্মা বা অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের সাধন শাস্ত্র বুঝি এবং মুক্তিই যদি দর্শনের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে দর্শনে অধ্যাত্মবিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ের অবতারণা ও বিচারের অবসর থাকে না। কিন্তু প্রায় সকল দর্শনেই আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েরও অবতারণা করা হইয়াছে। ন্যায় দর্শনে প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতির বিশদ আলোচনা আছে, বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ প্রভৃতির সূক্ষ্ম বিচার করা হইয়াছে। সাংখ্য দর্শনে কার্যকারণ সম্বন্ধ ও প্রকৃতির পরিণামের বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায় এবং মীমাংসা দর্শনে বৈদিককর্মের অতিসূক্ষ্ম ও অতি বিস্তৃত পর্যালোচনা আছে। অন্যান্য ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য, সেখানেও অধ্যাত্মতত্ত্ব ছাড়া অন্য বহু বিষয় আলোচিত ও নির্ণীত হইয়াছে। অতএব বলিতে হয় যে দর্শনশাস্ত্র কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা নহে এবং মুক্তিই তাহার একমাত্র প্রয়োজন নহে। যদি তাহাই হয় তবে দর্শনের পূর্বোক্ত লক্ষণ দোষযুক্ত হইয়া পড়ে। এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে আত্মসাক্ষাৎকার বা তত্ত্বজ্ঞান দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং মুক্তিই তাহার মুখ্য প্রয়োজন হইলেও এই মুখ্য উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাও আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির উপায়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য জ্ঞানের স্বরূপ, প্রমাণ ও প্রমেয় প্রভৃতির বিচার একান্ত আবশ্যক। সেইরূপ অধ্যাত্মবিদ্যার অঙ্গ-রূপে পরমাণুবাদ, প্রকৃতিপরিণামবাদ প্রভৃতি বিষয়ও দর্শনশাস্ত্রের গৌণ বা অপ্রধান বিষয়। পরমাণুবাদ প্রভৃতির বিচার করিয়া দেখা যায় যে আত্মা বা আধ্যাত্মিক সত্তা স্বীকার না করিলে শুধু পরমাণু বা প্রাকৃতিক

শক্তির সাহায্যে আমরা সৃষ্টিরহস্য বুঝিতে পারি না। অতএব আধ্যাত্মিক বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয় গৌণ প্রয়োজনরূপে দর্শনে স্থান পাইয়াছে। এইরূপে আমরা দ্বিতীয় আপত্তিটীর সমাধান করিতে পারি।

দর্শনের পূর্বোক্ত লক্ষণের বিরুদ্ধে আর একটি গুরুতর আপত্তি হইতে পারে। কোন কোন দর্শনে আত্মা বা আধ্যাত্মতত্ত্ব একেবারে স্বীকৃত হয় নাই। এ সব দর্শনের আলোচ্য বিষয় পরিদৃশ্যমান ভৌতিক জগৎ বা মানবসমাজের কল্যাণের উপায়। নাস্তিক-চূড়ামণি চার্বাক, পাশ্চাত্য জড়বাদী দার্শনিক এবং অগস্ত্ কোম্তের মত দৃষ্টবাদীরা (Positivists) তাঁহাদের দর্শনে আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। ইহলোক, ভৌতিক জগৎ এবং মানবের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সুখসমৃদ্ধির আলোচনাতেই তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। পক্ষান্তরে অনেক ধর্মমতের মধ্যে বহু আধ্যাত্মিক বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদেও (Mysticism) আধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞানের উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে অনেক দার্শনিক মত দর্শনশাস্ত্রের বহির্ভূত হইয়া পড়ে এবং ধর্মতত্ত্ব ও অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদকে দর্শনের শ্রেণীভুক্ত করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে দর্শনের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অব্যাপ্তি ও অতিব্যপ্তি দোষ হইয়া পড়ে, কারণ ঐ লক্ষণ কোন কোন দর্শনে প্রযোজ্য হয় না, আবার যাহা দর্শন হইতে ভিন্ন বিষয় তাহাতেও প্রযুক্ত হইতে পারে। এই আপত্তির সমাধান করিবার পূর্বে আমরা দর্শনের লক্ষণান্তরগুলির অল্পবিস্তর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, কারণ তাহাতে আপত্তিটীর সমাধানের সুবিধা হইবে।

দর্শনের ইংরেজী নাম 'ফিলজফি'। এই সংজ্ঞাটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেছে জ্ঞানানুরাগ। কিন্তু এই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে দর্শন বা ফিলজফির বৈশিষ্ট্য বুঝা যায় না। যদি দর্শন বলিতে জ্ঞানানুরাগমাত্র বুঝিতে হয়, তবে বিজ্ঞানকেও দর্শন বলিতে হয়। কারণ বিজ্ঞানেও বিষয়বিশেষে জ্ঞানানুরাগের যথেষ্ট লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। কোন বৈজ্ঞানিক যে কোন দার্শনিকের মতই জ্ঞানের অনুরাগী ও জ্ঞানলাভের প্রয়াসী। তবে বিজ্ঞান হইতে দর্শনের প্রভেদ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিয়াছেন যে বিজ্ঞান খণ্ডজ্ঞান, কিন্তু দর্শন পূর্ণজ্ঞান। বিভিন্ন বিজ্ঞান বিশ্বের বিভিন্ন বিভাগের জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত। অতএব একটী বিজ্ঞান হইতে আমরা একটী বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারি। পদার্থবিদ্যা (Physics) জড়প্রকৃতির মূলতত্ত্বগুলির জ্ঞান

প্রদান করিতে পারে, রসায়ন (Chemistry) বিভিন্ন দ্রব্যের সংযুক্তি (Composition) ও রাসায়নিক ক্রিয়ার পরিচয় দেয়, অপরাপর জড়-বিজ্ঞানও প্রাকৃতিক বিষয়বিশেষের জ্ঞানানুসন্ধান করে। কিন্তু কোন বিজ্ঞানেই জাগতিক সমস্ত পদার্থের জ্ঞানলাভ করা যায় না। এজন্য বিজ্ঞানকে খণ্ডজ্ঞান বা অসম্পূর্ণ সত্য বলা হয়। দর্শনে সমস্ত বিজ্ঞানের সত্য বা মূলতত্ত্বগুলির সমন্বয় করিয়া আমরা নিখিল বিশ্বের জ্ঞানলাভ করিতে পারি। অতএব দর্শনকে বিজ্ঞানের সমষ্টি বা সমন্বয়শাস্ত্র (synthesis) বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব বা সত্য-গুলি বিভিন্ন এবং কখন কখন তাহারা পরস্পরবিরোধী হইতে পারে। যেমন কোন বিজ্ঞানে একমাত্র জড়পরমাণুকেই মূলতত্ত্ব বলা হইয়াছে, আবার কোন বিজ্ঞানে মূলতত্ত্ব হিসাবে বিভিন্নগুণযুক্ত বহু পদার্থকে স্বীকার করা হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির সমাবেশ করিয়া এবং তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আমরা জীব ও জগৎ সম্বন্ধে একটী সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীত হইতে পারি। দর্শন বলিতে এইরূপ বিজ্ঞানসমন্বয় (Synthesis of the Sciences) বা পরাবিজ্ঞান (Super Science) বুঝিতে হইবে।

দর্শনের পূর্বোক্ত লক্ষনটী সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। দর্শন যদি বিজ্ঞানের সমষ্টিমাত্র হয় তবে দর্শনকে বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বলা যায় না। বিভিন্ন বিজ্ঞানে যে সব সত্য নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের সমাবেশ করিলে আমরা এক অখণ্ড পূর্ণ সত্যে উপনীত হইতে পারি না, পরন্তু কতকগুলি খণ্ডসত্যের যোগফল পাইতে পারি। আবার এই সত্যগুলি যদি পরস্পরবিরুদ্ধ হয় তবে কেবল তাহাদের সমষ্টিদ্বারা সে বিরোধের অবসান হয় না। অপর পক্ষে যদি দর্শনকে বিজ্ঞানের সমন্বয়শাস্ত্র বলা যায় তাহা হইলেও দর্শনের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা যায় না। প্রথমতঃ সর্ববিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করা কোন মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। কারণ, যে সব বিজ্ঞান অতীতকালে প্রচলিত ছিল বা বর্তমানে প্রচলিত আছে সেগুলির জ্ঞানলাভ করা কোন মনীষীর পক্ষে সম্ভব হইলেও ভবিষ্যতে যে সব বিজ্ঞানের উদ্ভব হইবে তাহাদের সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। তর্কের অনুরোধে যদি ধরিয়া লওয়াও যায় যে কোন অদ্ভুতকর্মা পণ্ডিত সর্ববিজ্ঞানের সারসংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন, তথাপি তাহাদের সমন্বয়ে তিনি যথার্থ দার্শনিক তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না। দর্শনের তত্ত্বগুলি নিত্য ও সর্বত্র সত্য (necessary and universal), সেগুলি সব সময়ে, সব দেশে ও সর্বলোকের পক্ষে সত্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি স্থায়ী নহে, তাহাদের পরিবর্তন হইতেছে ও

পরেও হইতে পারে। এরূপ স্থলে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যে দর্শনের সৃষ্টি হইবে তাহাও পরিবর্তনশীল হইবে এবং তাহাকে আমরা দর্শনই বলিতে পারিব না। শেষ কথা, বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা পরিদৃশ্যমান জগতের বাহ্য রূপের (phenomena) জ্ঞানলাভ করিতে পারি, কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত স্বরূপ সত্তা (noumenal reality) জানিতে পারি না। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ (observation) দ্বারা যে সব বিষয় জানা যায় তাহাদের সম্বন্ধে যান্ত্রিক পরীক্ষা (experiment) করিয়া যে সুসম্বদ্ধ (systematic) জ্ঞানলাভ করা যায় তাহাকেই বিান বলে। কিন্তু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষদ্বারা আমরা যে জ্ঞানলাভ করি তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও প্রকৃতি সাপেক্ষ। আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি অনুসারে আমরা বাহ্য বিষয়ে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ অনুভব করি। যদি আমাদের ইন্দ্রিয়ের অবস্থান্তর ঘটে, বা কোন ইন্দ্রিয় নষ্ট হইয়া যায় তবে আমরা বস্তুর ভিন্ন গুণ উপলব্ধি করি বা কোন গুণ একেবারে উপলব্ধি করিতে পারি না। এমন কি, প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ আলোক প্রভৃতির অভাবে দ্রব্যের গুণেরও অবস্থান্তর ঘটিতে দেখা যায়। কোন অন্ধকার ঘরের মধ্যস্থ দ্রব্যের কোন রূপ বা বর্ণ থাকে না, অন্ততঃ তাহা আমরা দেখিতে পাই না এবং বুঝিতেও পারি না। আবার পাণ্ডুরোগে শঙ্খেরও পীতবর্ণ দেখা যায়। এই সব কথা ভাবিলে বুঝা যায় যে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে বস্তুর স্বরূপের উপলব্ধি না হইয়া তাহার ইন্দ্রিয়সম্বন্ধজন্য গুণের প্রত্যক্ষ হয়। আর একটি কথা, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষদ্বারা ভৌতিক পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু কোন আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ, যাহা অভৌতিক তাহার রূপ ও মহত্ব (magnitude) প্রভৃতি গুণ থাকিতে পারে না, কিন্তু এ সব গুণ ব্যতিরেকে কোন বস্তুর ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হয় না। এখন দর্শন যদি বৈজ্ঞানিক সত্যের সমষ্টি বা সমন্বয়শাস্ত্র হয় তবে তাহাও ভৌতিক বিষয়ের ানের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না এবং বস্তুর বাহ্যরূপের অন্তর্নিহিত সত্তার কোন পরিচয় দিতে পারে না। কিন্তু এরূপ দর্শন বিজ্ঞানেরই নামান্তর, তাহা দর্শনপদবাচ্য নহে।

দর্শনের পূর্বোক্ত লক্ষণ দোষদুষ্ট দেখিয়া নব্য-বস্তুতন্ত্রবাদী (Neo-realist) কোন কোন দার্শনিক তাহার অন্যরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, দর্শন বিজ্ঞানসমুদয়ের সমষ্টি নহে, কিন্তু বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলির (fundamental categories) বিচারমূলক (critical) জ্ঞান। বিভিন্ন বিজ্ঞানের আলোচনায় দেখা যায় যে তাহাদের সকলেরই মূলে কতকগুলি তত্ত্ব নিহিত আছে এবং সেগুলিকে স্বীকার করিয়া লইয়াই বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই তত্ত্বগুলি সর্বগত

(universal) এবং জাগতিক সকল বস্তুরই সাধারণ ও সর্বব্যাপী ধর্ম (pervasive character)—দেশ, কাল, কার্য্যকারণসম্বন্ধ, দ্রব্যত্ব. একত্ব প্রভৃতি এইরূপ সর্বব্যাপী বস্তুধর্ম। যে কোন বস্তুর কথা বলা যাক্ না কেন তাহা দেশে ও কালে অবস্থিত এবং তাহা একটী দ্রব্য বা দ্রব্যনিষ্ঠ বস্তু এবং তাহার সহিত অন্য বস্তুর কার্যকারণসম্বন্ধ আছে। বিজ্ঞান এই তত্ত্বগুলির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এগুলিকে স্বীকার না করিলে বিজ্ঞান সম্ভবপর হয় না। বিজ্ঞানে যে সব বস্তুর আলোচনা করা হয় সেগুলিকে দেশকালে সীমাবদ্ধ ও কার্যকারণসম্বন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যবিশেষ বলিয়াই বিবেচনা করিতে হয়। দেশ, কাল ও কার্যকারণসম্বন্ধের অতীত কোন অবিশেষ বস্তুর বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলে না, কারণ এরূপ বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নহে এবং যান্ত্রিক পরীক্ষাধীনও নহে। অতএব বিজ্ঞানমাত্রেই দেশ, কাল প্রভৃতিকে তাহার মূলতত্ত্ব বা ভিত্তিরূপে স্বীকার করিতে বাধ্য। বিজ্ঞানে এই তত্ত্বগুলি স্বীকৃত হইলেও তাহাদের যথাযথ বিশ্লেষণ ও বিচার করা হয় না। দর্শনশাস্ত্রই এ সব তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত। দর্শন হইতে যে জ্ঞানলাভ করা যায় তাহা বিজ্ঞানলব্ধজ্ঞান হইতে কোনরূপে ভিন্ন নহে। দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ে আমাদিগকে একই জগতের বিষয়ে জ্ঞানপ্রদান করে। বিজ্ঞান হইতে দর্শনের প্রভেদ এই যে বিজ্ঞানের মূলে যে তত্ত্বগুলি নিহিত আছে দর্শনশাস্ত্রে সেগুলির ন্যায়সঙ্গত বিচার (criticism) করা হয়। দেশ, কাল প্রভৃতি তত্ত্বগুলি স্বরূপতঃ কি—তাহা সাধারণ লোকে বিচার করিয়া দেখে না। বৈজ্ঞানিকগণ সেগুলির বাহ্যরূপ ও বৃত্তিবিশেষের (specific function) আলোচনা করিলেও তাহাদের স্বরূপ (ultimate nature) সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হন না। দর্শনশাস্ত্রেই আমরা বিচার করিয়া দেখি যে দেশ, কাল প্রভৃতির কোন বিষয়গত সত্তা (objective reality) আছে, না তাহারা কেবল জ্ঞানগত (subjective) ভাব (idea) মাত্র। যুক্তি, তর্ক ও বিচার দ্বারা এসব তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করাই দর্শনের বৈশিষ্ট্য।

দর্শনের পূর্বোক্ত লক্ষণটিও দোষমুক্ত বলিয়া মনে হয় না। দর্শন বলিতে যদি বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলির বিচারমাত্র বুঝায় তবে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে প্রভেদ থাকে না, এবং দর্শনকে একটী পৃথক্ শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করার আবশ্যকতাও থাকে না। বিজ্ঞান মাত্রেই তাহার প্রতি-পাদ্য বিষয়গুলি যুক্তিদ্বারা সমর্থন করে। ন্যায়সঙ্গত বিচারপ্রণালীর সাহায্যেই বৈজ্ঞানিক সত্য বা তত্ত্বগুলি সমর্থিত হয়। বিজ্ঞানের দুইটী দিক আছে। একদিকে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক দ্রব্যনিচয়ের জ্ঞানলাভ করিতে এবং প্রাকৃতিক নিয়মগুলি আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। একটিকে

বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক বলা যাইতে পারে। অপরদিকে বিজ্ঞান তাহার তত্ত্বগুলি সমর্থনযোগ্য কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখে। অবশ্য এই বিচার ন্যায়সঙ্গত প্রণালীতেই করিতে হয়। এইটিকে বিজ্ঞানের প্রামাণ্যের (logical) দিক বলা যাইতে পারে। এখন বিজ্ঞান যদি প্রামাণ্যের দিক দিয়া তাহার অপর তত্ত্বগুলির ন্যায় মূলতত্ত্বগুলিও বিচারদ্বারা সমর্থন করে তবে আর দর্শনের প্রয়োজন কি? এই জন্যই বোধ হয় কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক অধুনা দর্শন নাম পরিত্যাগ করিয়া ন্যায়সাপেক্ষ দৃষ্টবাদের (Logical Positivism) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পরবর্তীকালে দর্শন বলিয়া কোন শাস্ত্র থাকিবে না এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়াছেন। অপর পক্ষে বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্য যদি দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন হয়, তবে বিজ্ঞানের অপর তত্ত্বগুলিও দর্শনশাস্ত্রদ্বারা নির্ণীত হইতে পারে এবং বিজ্ঞানের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করার পক্ষে কোন হেতু থাকে না। ফলকথা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করা বা যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা বিজ্ঞানেরই কাজ, সে জন্য দর্শন নামে পৃথক্ শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষদ্বারা আমরা ভৌতিক পদার্থ সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করি তাহার তত্ত্বগুলি নিরূপণ করাই বিজ্ঞানের কাজ। বিজ্ঞান যে প্রণালীতে তাহার অপ্রধান বা সাধারণ তত্ত্বগুলি নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় সেই প্রণালীদ্বারা তাহার প্রধান বা মূল তত্ত্বগুলি কেন নির্ণয় করিতে পারিবে না তাহা বুঝা যায় না। আর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি বিজ্ঞানের দ্বারা নিরূপিত না হইলে দর্শনশাস্ত্র তাহা কি প্রকারে নির্ণয় করিবে তাহাও সহজবোধ্য নহে। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসম্বন্ধে দার্শনিক মতামত বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের উপরই নির্ভরশীল। অন্যক্ষেত্রে দার্শনিক মত গ্রহণযোগ্য হইলেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক মত গ্রহণ করা দার্শনিকের পক্ষেও সমীচীন ও অপরিহার্য বলিয়া মনে হয়। অতএব দর্শনকে বিজ্ঞানের বিচারশাস্ত্র (Logic of Science) বলিলে দর্শন ও বিজ্ঞানের পার্থক্য বুঝা সুকঠিন হইয়া পড়ে।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে কয়েকজন খ্যাতনামা দার্শনিক দর্শনের আর একটী লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। এই লক্ষণ পূর্বোক্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকদের পরিগৃহীত লক্ষণ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এবং কতকাংশে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের সম্মত লক্ষণের অনুরূপ। প্লেটো, আরিষ্টটল্, হেগেল্, ব্র্যাড্‌লে প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ দর্শন বলিতে বিজ্ঞানের সমষ্টি বা সমন্বয়, অথবা বিজ্ঞানের বিচারশাস্ত্র বুঝেন না তাঁহাদের মতে দর্শন বলিতে জড়জগতের বিজ্ঞান না বুঝিয়া তত্ত্বজ্ঞান

(Metaphysics) বা পারমার্থিক তত্ত্ব (Ultimate Reality) বিষয়ে জ্ঞান বুঝিতে হইবে। বিশ্ববিশ্রুত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো দর্শনশাস্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তাঁহার মতে দর্শন পারমার্থিক তত্ত্বের (Reality) বা শুদ্ধসত্তার (Being as such) জ্ঞান এবং দর্শন অধ্যয়ন করিলে যাহা নিত্য, নির্বিকার ও সর্বব্যাপী তাহার সম্বন্ধে জ্ঞানের উদয় হয়। মহামতি আরিষ্টট্‌ল্‌ দর্শনের দুইটী লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। একটী লক্ষণ অনুসারে দর্শন বলিতে পারমার্থিক বা শুদ্ধসত্তার (Pure Being) জ্ঞান বুঝায়, অপর লক্ষণ অনুসারে দর্শন বলিতে মৌলিক তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান (Science of First Principles) বুঝায়। সুপ্রসিদ্ধ জার্মাণ দার্শনিক হেগেল স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে দর্শন ইহজগতের বা জড়প্রকৃতির জ্ঞান নহে, ইহা লোকাতীত ও নিত্য পরমতত্ত্বের (Absolute Idea) অর্থাৎ পরমাত্মার (God) জ্ঞান। আধুনিক ইংরাজ দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ব্র্যাড্‌লেও দর্শনের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে জগতের বাহ্যরূপের (appearance) অতিরিক্ত পারমার্থিক তত্ত্বের (Reality) জ্ঞানই দর্শন, অথবা দর্শন বলিতে মৌলিক তত্ত্বগুলির বা পরম সত্যনিচয়ের (ultimate truths) জ্ঞান বুঝায়, অথবা নিখিল বিশ্বকে খণ্ডরূপে না জানিয়া এক অখণ্ড সত্তারূপে জানিবার চেষ্টাকেও দর্শন বলা যায়। এস্থলে উল্লিখিত দর্শনের লক্ষণগুলি অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে তাহাদের ভাষা ভিন্ন হইলেও তাৎপর্য একই। দর্শন যে প্রাকৃত বিজ্ঞান নহে, এবং দর্শন যে স্বরূপতঃ ও কার্যতঃ বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন তাহা উল্লিখিত যে কোন লক্ষণ হইতে বুঝা যায়। দর্শন বলিতে এখানে ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক সত্তার জ্ঞান না বুঝাইয়া পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞানই বুঝাইতেছে। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে দর্শনশাস্ত্রে আমরা পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞান কি প্রকারে লাভ করিতে পারি? উপরোক্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষদ্বারা পারমার্থিক তত্ত্ব Reality) জানা যায় না। কারণ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে আমরা বস্তুর বাহ্যরূপ জানিতে পারি, তাহার স্বরূপ জানিতে পারি না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন দ্রব্যের সন্নিকর্ষ হইলে ইন্দ্রিয়গত গুণ ও শক্তি অনুসারে আমরা দ্রব্যের গুণ প্রত্যক্ষ করি। অতএব পারমার্থিক তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়া প্রজ্ঞার (reason) সাহায্য লইতে হইবে। গ্রীক্‌ দার্শনিক প্লেটো ও আরিষ্টট্‌ল্‌ উভয়েই প্রজ্ঞাকেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্রজ্ঞার আলোকে বস্তুর বাহ্যরূপের অন্তরালে অবস্থিত সর্বব্যাপী সত্তাগুলি (Universal ideas or forms) সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং আমরা তাহাদের সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ করিতে

পারি। দার্শনিকপ্রবর হেগেলের মতেও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বা বিচারবুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানলাভ করা যায় না। বিচারবুদ্ধি তদধীন পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে কতকগুলি অসংলগ্ন অবয়বে বিভক্ত করে। উহা তাহাদের মধ্যে যে অনুগত ঐক্যসূত্র (unity) আছে তাহা হারাইয়া ফেলে। যেমন কোন দেহ সম্বন্ধে বিচার করিলে তাহা বিভিন্ন অবয়বের সমষ্টিমাত্র বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অবয়বী ব্যতীত অবয়বসমষ্টি বুঝা যায় না। অতএব অবয়ব অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করিতে হয়। এই অবয়বী বিভিন্ন অবয়বের ঐক্যসূত্র। ভেদের মধ্যে ঐক্যই (unity-in-difference) জীব ও জগতের পরম তত্ত্ব। এই তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আমাদিগকে বিচারবুদ্ধি ছাড়িয়া ভাবনাত্মক প্রজ্ঞার (speculative reason) আশ্রয় লইতে হইবে। এই প্রজ্ঞার সাহায্যে আমরা পরিদৃশ্যমান জগতের (phenomenal world) অন্তর্নিহিত পরম তত্ত্বের (Absolute Idea) বা পরমাত্মার জ্ঞানলাভ করিতে পারিব। ইংরাজ দার্শনিক ব্র্যাড্‌লে এবিষয়ে হেগেল প্রভৃতির সহিত একমত নহেন। তাঁহার মতে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞানের দ্বারা পারমার্থিক তত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান হয় না। কারণ, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা চিন্তার (thought) সীমা অতিক্রম করিতে পারে না এবং চিন্তার রাজ্যে চিন্তা ও সত্তার (Reality) মধ্যে একটী অভেদ্য আবরণ থাকিবেই। চিন্তা ও চিন্তার বিষয় দুইটী পৃথক্ পদার্থ এবং যতক্ষণ চিন্তা চলে ততক্ষণ তাহার বিষয়টি তদতিরিক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুতরাং চিন্তা তাহার বিষয়ের স্বারূপ্য লাভ করিতে পারে না। কিন্তু পরমতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান পাইতে হইলে আমাদিগকে তদ্গতচিত্ত হইতে হইবে। চিন্তা ও সত্তার অভেদ অনুভূতিদ্বারাই তাহা সম্ভবপর হয়। কিন্তু চিন্তা সত্তার সহিত অভিন্ন হইলে চিন্তারই অবসান হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে চিন্তাত্মক বুদ্ধি বা প্রজ্ঞানের দ্বারা পারমার্থিক তত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান হয় না। ব্র্যাড্‌লের মতে শুদ্ধ বা সাক্ষাৎ প্রতীতি (mere feeling or immediate presentation) হইতে আমরা পরম তত্ত্বের কিছু আভাস পাইতে পারি, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে স্থির ও নিশ্চিত জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। এরূপ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু হেগেল বা ব্র্যাড্‌লে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের কোন সম্যক্ পন্থা নির্দ্ধারণ করেন নাই। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের মতে যোগসাধনই তত্ত্বসাক্ষাৎকারের প্রকৃষ্ট উপায়। জগতের পরিদৃশ্যমান বাহ্যরূপ যাহাই হউক না কেন আত্মা বা অধ্যাত্মসত্তাই তাহার পরম তত্ত্ব। প্রাকৃতিক জগতের অন্তরালে যে আধ্যাত্মিক সত্য লুক্কায়িত আছে তাহার সাক্ষাৎজ্ঞান ধ্যানযোগে হইতে পারে। দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য

উদ্দেশ্য আত্মা বা অধ্যাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎজ্ঞান। অতএব দর্শন ও দার্শনিক-দের পক্ষে ধ্যানযোগের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। যোগসাধন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় ও চিত্তের বিক্ষেপকারী বৃত্তিগুলি নষ্ট হইয়া যায় এবং অন্যান্য বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। যখন সকল চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় তখন আত্মা শুদ্ধ ও চিন্ময় সত্তারূপে প্রকাশিত হন। এই শুদ্ধ চিৎসত্তাই দর্শনপ্রতিপাদ্য পারমার্থিক তত্ত্ব। অতএব দর্শন বলিতে প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্তাতিরিক্ত পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞান বুঝিলে এই জ্ঞানলাভের উপায়রূপে যোগসাধনাকে দর্শনশাস্ত্রের একটী অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যোগসাধন দর্শনের অঙ্গভূত হইলেও যোগ বা তদনুরূপ সাধনলব্ধ পার-পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞানমাত্রকেই দর্শন বলা যায় না। যদি তাহাই হয় তবে দর্শন ও ধর্ম বা অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। মানুষ তাহার ধর্মজীবনের মধ্য দিয়াও আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে পারে এবং এরূপ জ্ঞান সাক্ষাৎজ্ঞান বলিয়াই অভিহিত হয়। সেইরূপ অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষেও (mystic experience) অধ্যাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। অতএব দর্শন যদি কেবলমাত্র পারমার্থিক তত্ত্বের সাক্ষাৎজ্ঞান হয় তবে ধর্ম ও অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদকেও একপ্রকার দর্শন বলিতে হয়। আমরা পূর্বে এই আপত্তিটীর উল্লেখ করিয়াছি। এই আপত্তি খণ্ডন করিতে হইলে দর্শনের স্বরূপ সম্বন্ধে আর একটু পুনরালোচনা করিতে হইবে। দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞান একথা সত্য, কিন্তু দর্শন পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞানমাত্র নহে। যুক্তিতর্ক দ্বারা পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই দর্শনের প্রধান কার্য। যে শাস্ত্রে যুক্তির দ্বারা পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান সমর্থিত হয় তাহাকেই দর্শনশাস্ত্র বলে। ধর্ম বা অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদে পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হইলেও সে স্থলে কোন বিচারপ্রণালী বা যুক্তিদ্বারা ঐ জ্ঞানকে সমর্থন করার চেষ্টা দেখা যায় না। ধর্মে অধ্যাত্মতত্ত্বের বর্ণন বা ব্যাখ্যা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে বিচারবুদ্ধিদ্বারা ঐ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার কোন প্রয়াস করা হয় না। সাধারণতঃ ধার্মিকব্যক্তি এসব বিষয়ে পূর্ণবিশ্বাস করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন এবং কোন যুক্তিতর্কের সাহায্য লন না, বরং পাছে তাঁহার ধর্মবিশ্বাস নষ্ট হয় এই ভয়ে যুক্তিতর্ক পরিহার করেন। অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদীরাও কোন অলৌকিক সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা আধ্যাত্মিকতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিয়া তৎসম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হন না। পরন্তু তাঁহারা বলেন যে যুক্তিদ্বারা অধ্যাত্মতত্ত্ব বুঝাও যায় না, বুঝানও যায় না। সে যাহা হউক প্রকৃতস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের

বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং ন্যায়সঙ্গত যুক্তিদ্বারা তাহার সমর্থনের চেষ্টা করেন, কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি বা অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদী এরূপ কোন চেষ্টা করেন না। এই জন্যই দর্শন ধর্ম ও অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদ হইতে স্বতন্ত্র শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

দর্শনের পূর্বোক্ত লক্ষণ সম্বন্ধে অরও একটী আপত্তি হইতে পারে। আমরা পূর্বে তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। দর্শনকে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের সাধনশাস্ত্র বলিলে জড়বাদ বা দৃষ্টবাদ প্রভৃতি দার্শনিক মতবাদকে দর্শন-পদবাচ্য বলা যায় না, কিন্তু এগুলিকে একপ্রকার দর্শন বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। এই আপত্তিটীর সমাধানকল্পে আমাদিগকে জড়বাদ ও দৃষ্টবাদ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে হইবে। জড়বাদীরা বলেন যে জড়পদার্থই জগতের মূল কারণ, এবং তাহা হইতেই জীবজগতের সমুদয় পদার্থের উৎপত্তি হয় এবং তাহাতেই তাহারা বিলীন হয়। আত্মা বা ঈশ্বর—এরূপ কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা নাই, কারণ তাহা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। যাহা প্রত্যক্ষের অবিষয় তাহা অসৎ ও অসত্য। অতএব ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ-গোচর জড়পদার্থই জীবজগতের পরম সত্তা ও মূল কারণ। প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক কোম্‌তের দর্শন দৃষ্টবাদ নামেই পরিচিত। দৃষ্টবাদের মূল সিদ্ধান্ত হইতেছে যে যাহা প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় তাহাই নিঃসন্দিগ্ধ সত্য এবং দর্শন এরূপ সত্যনিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি তত্ত্ব দর্শনের বিষয় নহে, কারণ তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। দর্শন বলিতে কোন অধ্যাত্মতত্ত্বের জ্ঞানবিশেষ বুঝায় না। দর্শন বিজ্ঞান সকলের শ্রেণীবিভাগ (classification) করে মাত্র। বিভিন্ন বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়মগুলির একত্র সমাবেশ করিয়া বিজ্ঞান সকলের পরস্পর সম্বন্ধ এবং সাধারণ পদ্ধতি নিরূপণ করাই দর্শনের কার্য। এখন বিচার করিয়া দেখা যাক্ জড়বাদ ও দৃষ্টবাদ কি হিসাবে দর্শন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। জড়বাদীর মতে জড়পদার্থই (matter) পারমার্থিক তত্ত্ব। কিন্তু জড়পদার্থ বলিতে যদি পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ ভূতকে বুঝায়, তবে জড়বিজ্ঞান হইতেই আমরা তৎসম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারি, সে জন্য কোন দর্শনের অপেক্ষা করিতে হয় না। ভৌতিক জগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানই গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে জড়বাদীর জড়পদার্থ যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক পদার্থ না হইয়া কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা হয়, তাহা আধ্যাত্মতত্ত্বেরই সামিল হইয়া পড়ে এবং তাহার সম্বন্ধে বিজ্ঞান হইতে কোন জ্ঞানলাভ করা যায় না। যাহা অতীন্দ্রিয় তাহাকে জড়পদার্থ বলার সার্থকতা নাই, কারণ জড়মাত্রেই ভৌতিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য।

এরূপস্থলে বিজ্ঞানের সাহায্যেও আমরা তথাকথিত জড়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারি না এবং সেজন্য দর্শনের আবশ্যকতা আছে। এই হিসাবে জড়বাদেকে একপ্রকার দর্শন বলা যাইতে পারে। কোম্‌তে দৃষ্টবাদের যে ব্যখ্যা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার দর্শনকে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমাবেশ বা সমন্বয়মাত্র বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে দর্শনকে বিজ্ঞানের সমষ্টি বা সমন্বয় শাস্ত্র বলা যায় না। অবশ্য এক হিসাবে জড়বাদ, দৃষ্টবাদ প্রভৃতিকে দর্শন বলা যাইতে পারে। যে শাস্ত্রে যুক্তি-দ্বারা বক্তব্য বিষয় সমর্থিত হয়, সচরাচর তাহাকেই দর্শনশাস্ত্র বলা হয়। জড়বাদ ও দৃষ্টবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে সাধারণ হিসাবে দর্শন বলা যায়। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে কেবল যুক্তিতর্কই দর্শনের লক্ষণ নহে। ন্যায়শাস্ত্রে যুক্তিতর্কের অন্ত নাই, তাই বলিয়া ন্যায়শাস্ত্রকে দর্শনশাস্ত্র বলা যায় না। বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিও যুক্তিদ্বারা সমর্থিত, কিন্তু সে জন্য বিজ্ঞানকে কেহ দর্শন বলেন না। অতএব দেখা যাইতেছে, জড়বাদ, দৃষ্টবাদ প্রভৃতিকে সাধারণভাবে দর্শন বলিলেও দর্শনের স্বরূপের বৈলক্ষণ্য হয় না। দর্শন ন্যায়সঙ্গত যুক্তিদ্বারা সমর্থিত জ্ঞান বটে, কিন্তু যে কোন যুক্তিযুক্ত জ্ঞানকে দর্শন বলা যায় না। যুক্তিদ্বারা সমর্থিত পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানই প্রকৃত দর্শন। ভৌতিক বাহ্য সত্তার (physical phenomena) অতিরিক্ত কোন অভৌতিক বা আধ্যাত্মিক সত্তা স্বীকার করিলে বিজ্ঞানের অতিরিক্ত দর্শনশাস্ত্রের উপ-যেগিতা বুঝিতে পারা যায়। ভৌতিক জড়জগতের সত্তাতিরিক্ত কোন সত্তা না থাকিলে বিজ্ঞানের সাহায্যেই আমরা সর্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারিতাম এবং দর্শন নামে বোধহয় একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের প্রয়োজন হইত না। অধিককল্পে বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব বা সূত্রগুলি পরীক্ষা করিবার জন্য একটা ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন হইত। আমরা জীবনে পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে কোন অদৃশ্য অধ্যাত্মতত্ত্বের কোনরূপ সন্ধান পাই বলিয়াই বোধহয় আমাদের বিচারবুদ্ধিদ্বারা তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি এবং এই প্রচেষ্টা হইতে দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। পারমার্থিক তত্ত্ববিষয়ে বিচার সাপেক্ষ জ্ঞান দর্শন শব্দের মুখ্য অর্থ এবং তাহাই দর্শনের স্বরূপ।

নির্গুণ ব্রহ্ম ও ঈশ্বর

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, এম, এ, বিদ্যারত্ন।

যিনি নির্ব্বিশেষ জ্ঞান-স্বরূপ, তিনি বিশ্ব-বিকাশে আপনাকে সবিশেষ জ্ঞাতা রূপে—আদি পুরুষরূপে—প্রকাশিত করেন। তিনি সমগ্র জগতের নাম-রূপের (সমষ্টি-ভাবে) 'জ্ঞাতা' হইয়া পড়েন, এবং নামরূপাত্মক জগৎ তাঁহার 'জ্ঞেয়' হইয়া উঠে। নির্গুণ ব্রহ্মই জগতের সম্পর্কে সগুণ পরমেশ্বর রূপে পরিচিত হইয়া উঠেন। ব্রহ্ম হইতে ঈশ্বর কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। যে শক্তিবলে আপনারই মধ্যে জগৎ অভিব্যক্তি লাভ করে, সেই শক্তি বা আত্ম-সামর্থ্যের সহিত সম্বন্ধ-বশতঃই ব্রহ্মের 'ঈশ্বর'-সংজ্ঞা। ছান্দোগ্য উপনিষদে জগদ্বিকাশের এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়—

"তদসৎশব্দবাচ্যং—প্রাগুৎপত্তেঃ স্তিমিত মনিস্পন্দমসদিব—সৎ-কার্য্যাভিমুখং ঈষদুপজাতপ্রবৃত্তি ("এতেন বীজস্য উচ্ছূনতাবৎ কারণস্য সিসৃক্ষাবস্থাং দর্শয়তি"—আঃ গিঃ) সদাসীৎ। ততোঽপি লব্ধপরিস্পন্দং তৎ সমভবৎ......অঙ্কুরীভূতমিব বীজম্। ততোঽপি ক্রমেণ স্থূলীভবৎ" (ছাঃ ভাঃ, ৩।১৯।১)।

অর্থাৎ, জগৎ-উৎপত্তির প্রাক্কালে, যাহাকে স্পন্দ-রহিত ও স্তিমিত-ভাবাপন্ন থাকায় 'অসতের' ন্যায় প্রতীয়মান হওয়ায় 'অসৎ' শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তাহাই সৎ-কার্য্যের উন্মুখ হইয়া, উহাতে ঈষৎ ক্রিয়া-প্রবৃত্তি ফুটিয়া উঠিল ("বীজ যেমন অঙ্কুরোদ্গমের পূর্ব্বে, কিঞ্চিৎ স্ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠে—উহার যেমন উচ্ছূন-ভাব হয়"—আনন্দগিরি এস্থলের এই অর্থ করিয়াছেন)। এ অবস্থায় ইহাকে 'সৎ' শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়, অর্থাৎ উহা তখন ঈষৎ স্পন্দনোন্মুখ হইল। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ন্যায়, উহার নাম-রূপাকারে স্পন্দন অভিব্যক্ত হইল। পরে উহাই ক্রমে স্থূলাকারে দেখা দিতে লাগিল"। কঠ-ভাষ্যে ইহাকেই জগতের 'বীজাবস্থা' বলা হইয়াছে। বট-কণিকার মধ্যে যেমন বটবৃক্ষের সমস্ত শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে, তদ্রূপ সৃষ্টির প্রাগবস্থায়—পরে জগতে যত কিছু কার্য্য ও কারণ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তৎ-সমস্তেরই সমষ্টি, শক্তিরূপে সে অবস্থায় অন্তর্লীন থাকে। ইহাকেই জগতের 'অব্যক্ত বীজ' নামে বলা যায়; ইহাই নাম-রূপের অব্যক্ত বীজ; ইহাতে এখনও কোন ভেদ, কোন বিশিষ্টরূপ দেখা দেয় নাই। এই সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব-বর্জ্জিত—'অব্যক্ত' বীজই ক্রমে নাম-রূপের আকারে অভিব্যক্ত

হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকেই কঠ-ভাষ্যে 'মায়া' নামে অভিহিত করা হইয়াছে—কঠ-ভাঃ, ৩।১১। কঠ-ভাষ্যে আরো বলা হইয়াছে যে, এই অব্যক্ত বীজ পরমাত্মার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে আশ্রিত ছিল। ব্রহ্মই এই অব্যক্ত বীজের অধিষ্ঠান (substratum)। এই জন্যই ভগবদ্‌গীতায় বলা হইয়াছে—

"বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং······সনাতনম্" (৭।১০)।

পরমাত্মার মধ্যে এই মায়াবীজ একাকারে লীন ছিল—"চিদেকাত্মনা বিলীনত্বাৎ"—উপঃ সাহস্রী। এই অবস্থায়, এই জগদ্বীজ বা মায়াকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া অসম্ভব বলিয়া, গীতায় "আমাকেই সেই সনাতন বীজ বলিয়া জানিবে"—বলা হইয়াছে।

যদ্যপি ব্রহ্ম প্রপঞ্চাসংস্পৃষ্টং স্বতন্ত্রঞ্চ, তথাপি প্রপঞ্চো ন স্বতন্ত্রঃ······ বিকারাশ্রয়ত্বেপি অবিনাশি এব কূটস্থং ব্রহ্ম অবতিষ্ঠতে" (শ্বেঃ ভাঃ, ১।৭)।

এই মায়া বা শক্তি যোগে ব্রহ্ম কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠেন না। কেন না, ইহা ব্রহ্মেরই বিকাশোন্মুখ অবস্থা*, ইহা তাঁহারই ব্যক্ত হইবার ইচ্ছা†, ইহা তাঁহারই প্রকাশ হইবার প্রবৃত্তি বা চেষ্টা‡; ইহা দ্বারা ব্রহ্ম যাহা তাহাই থাকিতেছেন।

মায়া, শক্তি, প্রকৃতি—এ সকলই একার্থবাচক শব্দ। পরমাত্মা, এই মায়া বা মায়ার অভিব্যক্তি যে জগৎ, তাহার অধিষ্ঠান। জগৎ সেই অধিষ্ঠানের সঙ্গে এক হইয়া যাইতে পারে না; কেন না, তাহা হইলেই এই মায়া বা জগৎই ব্রহ্ম হইয়া পড়ে। যাহা বিকার তাহাই নির্ব্বিকার হইয়া পড়ে। আবার, এই জগৎকে বা জগদ্বীজ মায়াকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া ইহাকে (সাংখ্যদিগের ন্যায়) একটা স্বাধীন, স্বতঃসিদ্ধ বস্তু বলিয়া ধরিতে পার না। কেন না, একটা বস্তুর অভিব্যক্তিকে সেই বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া ভাবিতে পারা যায় না। সকলের আশ্রয় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া, স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবে উহা থাকিতে পারে না। নির্ব্বিশেষ পরমাত্মার এই যে জগৎ আকারে বিকাশ ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেদান্তে শুক্তির উপরে রজতখণ্ডের বিকাশ, রজ্জুর উপরে সর্পের প্রতীতি প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল স্থলে আমরা অন্তরালে যে শুক্তি বা রজ্জুর সত্তা আছে, সে কথাটা একেবারে

* বেঃ ভাঃ, রত্নপ্রভা ১।৫
† মুং ভাঃ ১।১।৮
‡ ছাঃ ভাঃ, ৩।১৯।১

যাই এবং উহাকে আমরা একান্তভাবে রজত বা সর্পের আকারে পরিণত করিয়া তুলি। ইহা আমাদের বুদ্ধির দোষেই হইয়া থাকে। বুদ্ধির দোষে আমরা সকলের অধিষ্ঠান ব্রহ্মবস্তুকে নামরূপাত্মক জগতের আকারে পরিণত করিয়া কেবল জগৎকেই দেখিতে পাই, জগৎ লইয়াই সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার নিষ্পন্ন করি। ইহার অন্তরালে যে পরমাত্মা আছেন, নামরূপাদি যে সেই পরমাত্মারই অবস্থা বিশেষ—ইহারা যে তাঁহারই বিকাশ বা বিভূতিমাত্র, সে তত্ত্বটী আমাদের বুদ্ধি ভুলিয়া যায়। সাধে কি ইহাকে মায়া বলা হইয়াছে ?

জগদ্বীজ মায়াই বল ; বা নামারূপাত্মক জগৎই বল ; অথবা মায়াযুক্ত সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরই বল ;—অন্তরালবর্ত্তী ব্রহ্মেরই ইহারা বিকাশ বা অবস্থান্তর মাত্র, একথা ভুলিয়া যদি ঐগুলিকেই একান্ত স্বতন্ত্র, স্বাধীন, স্বতঃসিদ্ধ বস্তু বলিয়া মনে কর ;—বেদান্তে ইহাকেই ভ্রমজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। এই ভাবেই বেদান্তে ইহাদিগকে মিথ্যা, অসত্য বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। বিশেষ একটা আকার ধারণ করিলেই বস্তুটা কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে না—"ন হি বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্তন্যত্বং ভবতি, স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ" (ব্রঃ সূঃ ভাঃ) ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। ইহা ভুলিলে চলিবে না।

বেদান্তে তিন প্রকার সত্তা স্বীকৃত।

বেদান্ত-গ্রন্থে তিন প্রকার সত্তার উল্লেখ ও বিবরণ পাওয়া যায়।

(১) মুখ্য বা সর্ব্বপ্রধান সত্তা। ইহাকে পারমার্থিক (Absolute) সত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। ইহা স্বতঃসিদ্ধ, স্বাধীন।

(২) পরতন্ত্র বা ব্যবহারিক সত্তা। পরিদৃশ্যমান্ জগতের সত্তা এইরূপ। এই সত্তা অন্য হইতে গৃহীত, সুতরাং পরতন্ত্র বা অন্যের অধীন।

(৩) আর এক প্রকার সত্তাকে প্রাতিভাসিক সত্তা বলা হয়। ইহা ভ্রান্তি-জনিত ; ভ্রম চলিয়া গেলে ইহা থাকে না।

ইহাদের মধ্যে যেটী মুখ্য পারমার্থিক সত্তা, সেটী পরমাত্মার। বস্তুর যে সত্তা থাকার দরুণ আমরা সাংসারিক প্রায় সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার নিষ্পাদন করিয়া থাকি, তাহারই নাম ব্যবহারিক সত্তা। জগতে অভিব্যক্ত আকাশ, বায়ু, জলাদি নাম-রূপাত্মক বস্তুমাত্রেরই পরতন্ত্র (Relative or derivative) সত্তা আছে। আর এক প্রকার বস্তু আছে, যাহাদের ভ্রান্ত-প্রতীতি হইয়া থাকে,—যেমন কখন কখন একখণ্ড রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হয় ; ভগ্ন শুক্তি-খণ্ডকে রৌপ্যখণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়। এরূপ স্থলে প্রাতীতিক সত্তা (Illusive appearance) স্বীকৃত হয়।

প্রথমটি কাহার অধীন নহে ; উহা স্বয়ংসিদ্ধ, স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা।

দ্বিতীয়টি পরতন্ত্র, অন্যাধীন সত্তা। তৃতীয় সত্তা মায়াময়, ভ্রমাত্মক, ইহা দ্রষ্টাকে বঞ্চিত করে। আমরা জগতে সে সকল নাম-রূপাত্মক বস্তু দেখিতে পাই, তাহাদের কাহারই পারমার্থিক সত্তা নাই, ইহাই বেদান্তের মত। আমাদের স্বপ্নদর্শন কালে আমরা যে সকল বস্তু অনুভব করিয়া থাকি; বেদান্তমতে তৃতীয় প্রকারের সত্তা সেই সকল বস্তুর। কাল্পনিক বস্তুমাত্রেরই এইরূপ সত্তা আছে। আমাদের মন বা ইন্দ্রিয় কর্তৃকই এরূপ প্রতীতি বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার বস্তুর সত্তা, যতদিন না আমরা ব্রহ্ম-লাভে মুক্ত হইয়া না যাইতেছি, ততদিন এগুলির সত্তা থাকিবেই।

বেদান্তে প্রাতিভাসিক সত্তার বস্তুগুলিকে কখন কখন 'অসত্য', 'মিথ্যা' বলা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু শঙ্কর-ভাষ্যে অপর কতকগুলি বস্তুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তিনি সেইগুলিকেই প্রকৃতপক্ষে একান্ত অসত্য, মিথ্যা, অলীক বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেগুলি যেমন—বন্ধ্যা-পুত্র, আকাশ-কুসুম, আকাশে গন্ধর্ব্ব-নগরের দর্শন—প্রভৃতি। কিন্তু এ তত্ত্ব আর একদিন বলিব।

অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ

শ্রীকল্যাণ চন্দ্র গুপ্ত, এম, এ।

একটি তালের উপর কাক বসিল এবং তৎক্ষণাৎ তালটি পড়িয়া গেল, মাত্র এইটুকু দেখিয়াই যদি কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া বসে যে কাকের উপবেশনই তালের পতনের কারণ, অর্থাৎ প্রথমটি ঘটিলেই দ্বিতীয়টি অবশ্যই ঘটিবে তাহা হইলে তাহার বিজ্ঞতা সম্বন্ধে সচরাচর আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়া থাকে। আমরা সাধারণতঃ বিশ্বাস করিয়া থাকি যে একটি বস্তু বা ঘটনা কোনও কোনও বস্তু বা ঘটনার সহিত কার্য্যকারণ-সূত্রে গ্রথিত হইলেও অধিকাংশ বস্তু বা ঘটনার ভিতর এরূপ কোনও সম্বন্ধ নাই। সুতরাং যে কোনও দুইটি বস্তু বা ঘটনাকে কার্য্যকারণসূত্রে গ্রথিত অথবা অবিচ্ছেদ্যসম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। একস্থানে এক্ষণে দুইটি পুস্তক পাশাপাশি রহিয়াছে অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে একত্রে থাকার জন্য একটা বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু কিছুকাল পরেও যে তাহাদের মধ্যে ঠিক এইরূপ সম্বন্ধই থাকিবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। রাজপথের কোনও একস্থানে দাঁড়াইয়া পথিকশ্রেণী ও যানবাহনাদির গতির যে ধারা আজ লক্ষ্য করিলাম আগামী কালও যে ঠিক সেই ধারাই বর্ত্তমান থাকিবে এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু বিষপান করিবার পর যদি কাহারও মৃত্যু হয় তাহা হইলে বিষপান ও মৃত্যু এই দুইয়ের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যে কোনও মনুষ্যদেহে অনুরূপ বিষপ্রয়োগ করিলে একই ফল পাওয়া যাইবে তাহার কোনও অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই মৃত্যু ও বিষপ্রয়োগ এই দুইয়ের সম্বন্ধ অর্থাৎ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ যে মাত্র দৈশিক অথবা কালিক সম্বন্ধ হইতে মূলতঃ বিভিন্ন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ এবং বস্তু বা ঘটনামাত্রেরই যে অন্য কোনও একটি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা অথবা বস্তু বা ঘটনাসমষ্টির সহিত এইরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ অবশ্যই থাকিবে ইহাই আমাদের স্থিরবিশ্বাস। একটি কার্য্য থাকিবে অথচ তাহার কারণ থাকিবে না ইহা আমাদের ধারণায় আসে না। আবার কেবল মাত্র কার্য্যও কারণের সম্বন্ধই যে অবিচ্ছেদ্য তাহা নয়, আরও কোনও কোনও স্থলে এইরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি। একটি

বস্তুর দৈর্ঘ্য থাকিলে অবশ্যই তাহার প্রস্থ থাকিবে অথবা যদি কোনও ত্রিভুজ সমবাহুবিশিষ্ট হয় তাহার কোণগুলিও অবশ্যই সমান হইবে। সুতরাং সাধারণভাবে বলিতে পারা যায় যে বস্তু বা ঘটনাসমূহের মধ্যে যে সকল সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য অর্থাৎ যাহাদের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ থাকে তাহাদের একটী থাকিলে অপরটি অবশ্যই থাকিবে কখনও ইহার অন্যথা হইবে না। আবার নানাবিধ সম্বন্ধ আছে যাহারা এরূপ নহে। কোনও একটি পুষ্প যে অবশ্যই রক্তবর্ণ হইবে অথবা কোনও একটী বিশেষ দিনে যে অবশ্যই বারিপাত হইবে এরূপ মনে করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই।

কিন্তু আমাদের সাধারণ বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন তাহা নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষায় যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। এবিষয়ে যাঁহারা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এস্থলে ইংরাজ দার্শনিক ডেভিড্ হিউমের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। হিউম্ কার্য্যকারণ সম্বন্ধের বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার মতে দুই বা ততোধিক বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনাকে এক সূত্রে গ্রথিত করিতে পারে এরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বাস্তব জগতে নাই। কার্য্যকারণ সম্বন্ধের বিষয়ে আমাদেব যে ধারণা আছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, আমরা বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক ঘটনা বা কার্য্যের কারণ আছে, এই কারণ কার্য্যের পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকে, কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ কারণের অন্তর্নিহিত এক শক্তি বলে উহা কার্য্যে পরিণত হয়, কারণ ও কার্য্যের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, এবং এইরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই কোনও কারণবিশেষের পুনরাবির্ভাব হইলে কার্য্যবিশেষেরও পুনরাবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। এই সাধারণ প্রচলিত বিশ্বাসের ভ্রম দেখাইতে গিয়া হিউম্ বলিতেছেন যে কার্য্য ও কারণের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের অস্তিত্বের ধারণা কেবলমাত্র আমাদের অতীত সংস্কার প্রসূত বিশ্বাসমাত্র। বাস্তব জগতে এরূপ কোনও সম্বন্ধের অস্তিত্ব নাই অথবা থাকিবার কোনও প্রমাণ নাই। বহুবার 'ক'র আবির্ভাবের পর 'খ'র আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের মনে এই দুইয়ের ধারণার মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হইয়া যায় এবং কেবল ইহারই ফলে 'ক'কে প্রত্যক্ষ করিবামাত্র আমরা 'খ'র আবির্ভাবের প্রত্যাশা করিয়া থাকি। কিন্তু সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালে যে একটী বিশেষ

কারণ হইতে বিশেষ কার্য্য অবশ্যই উৎপন্ন হইবে এরূপ নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে কোনও যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ নাই।

হিউম্‌ ও তাঁহার অনুবর্ত্তীরা যে বিচার প্রণালী দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা একটু বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। যে জগতের সহিত আমাদের পরিচয় আছে তাহাকে সাধারণ-ভাবে মনোজগৎ ও বহির্জ্জগৎ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বহির্জ্জগতের বস্তুগুলির মধ্যে যেমন নানাবিধ সম্বন্ধ আছে আমাদের মনের অন্তর্গত ভাবধারার মধ্যেও সেইরূপ নানাবিধ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই দুই জগতের প্রকৃতির মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য সহজেই আমাদের কাছে ধরা পড়ে। যখন আমরা কোন সুসংবদ্ধ প্রণালী অনুসারে চিন্তা করি না, যখন নানাবিধ চিন্তা, বিশ্বাস বা ধারণা মনের মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায় তখন তাহাদের মধ্যে কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। একটি গৃহ দেখিয়া আজ আমার মনে যে সব চিন্তার উদয় হইল কালও যে তাহা দেখিয়া ঠিক সেই সব চিন্তার উদয় হইবে এমন নহে। কিন্তু আমরা যখন কোনও সুসংবদ্ধ প্রণালী অনুসারে বুদ্ধিমূলক বিচার করিয়া থাকি তখন আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধের সাক্ষাৎ পাই। "মনুষ্যমাত্রেই মরণশীল" "রাম মনুষ্য" অতএব "রামের মরণ অবশ্যম্ভাবী" যখন এইভাবে বিচার করি তখন দেখিতে পাই যে প্রথক দুইটি চিন্তার সহিত তৃতীয় চিন্তাটির একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। প্রথম বাক্য দুইটি সত্য অথচ তৃতীয়টী সত্য নয় এরূপ আমরা কেহ কখনও কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু হিউম্‌ বলেন যে বহির্জ্জগতের বস্তুগুলির মধ্যে এরূপ কোনও সম্বন্ধের অস্তিত্বের সন্ধান আমরা পাই না। অগ্নিসংস্পর্শে জল বাষ্পে পরিণত হয়, এস্থলে অগ্নিসংস্পর্শ এবং জলের বাষ্পীভূত হওয়া এই দুই ঘটনার মধ্যে কোনও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকার প্রমাণ নাই। এইরূপ সম্বন্ধের অস্তিত্ব দুইভাবে জানা যাইতে পারে, প্রথমতঃ বিশুদ্ধ যুক্তিদ্বারা, দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে। কিন্তু ইন্দ্রিয়জ্ঞাননিরপেক্ষ বিশুদ্ধ যুক্তিদ্বারা বহির্জ্জগতে এরূপ কোনও সম্বন্ধের অস্তিত্বের বিষয় জানা যায় না। যেখানে কেবলমাত্র আমাদের মনোজগতের চিন্তাধারা লইয়াই কারবার সেখানে কেবলমাত্র বিচারমূলক যুক্তি দ্বারাই কোনও একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা গণিতশাস্ত্রে পাইয়া থাকি। যে কোনও ত্রিভুজের যে কোনও দুইটি বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহুটি অপেক্ষা দীর্ঘতর ইহা অবিসংবাদিত সত্য। সরলরেখা, ত্রিভুজ প্রভৃতির সংজ্ঞা যদি প্রথমেই আমরা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লই তাহা

হইলে আমাদের প্রতিপাদ্য প্রতিজ্ঞার সত্যতার ব্যতিক্রম কোনও কালে হওয়া সম্ভব নয়। এই সত্যটি প্রতিপাদন করিতে হইলে আমাদের সরলরেখা, ত্রিভুজ প্রভৃতি না দেখিলেও চলে, বস্তুতঃ এক বা ততোধিক ত্রিভুজ দেখিয়া যে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি এমন নয়, আমাদের এই মীমাংসায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানের কোনও স্থান নাই। কিন্তু এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের সিদ্ধান্ত যেমন ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না সেইরূপ কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্যও নহে। জ্যামিতির সংজ্ঞানুযায়ী কোনও সরলরেখা বা ত্রিভুজ কোনও কালেই আমাদের দেখিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যেসকল ত্রিভুজাকৃতি বস্তু আমরা বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি তাহাদের কোনও কোনওটির সম্বন্ধে উপরে প্রদত্ত সিদ্ধান্তটি সত্য নাও হইতে পারে। অর্থাৎ "ত্রিভুজের যে কোনও দুইটি বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা দীর্ঘতর" এই সিদ্ধান্তটি আমাদের চিন্তাধারার মধ্যেই এক বিশেষ সম্বন্ধের সূচনা করিতেছে বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে ইহা কোনও কথাই বলে না। আমাদের মনের গঠনই এইরূপ যে সরলরেখা ও ত্রিভুজ সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ধারণা করিলে এই সিদ্ধান্ত আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য। আরও একটু গভীর ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে যদি এক বা ততোধিক চিন্তা মূলতঃ একার্থক হয় কেবল তাহা হইলেই তাহাদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিতে পারে। "রাম বনে গিয়াছিলেন" এবং "দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র বনে গিয়াছিলেন" এই দুইটির মধ্যে একটী সত্য হইলে অপরটীও সত্য হইতে বাধ্য, কারণ এই বাক্য দুইটি একার্থক। "এই পুষ্পটি রক্তবর্ণ" ইহা সত্য হইলে "এই পুষ্পটি রক্তবর্ণ নহে" ইহা অবশ্যই মিথ্যা হইবে, কারণ প্রথম বাক্যটির সত্যতা এবং দ্বিতীয় বাক্যটির মিথ্যাত্ব একই ব্যাপার। সেইরূপ "৭+৫=১২" "একটি সমকোণ ত্রিভুজের বাহু তিনটিও সমান হইবে" এই প্রকার সিদ্ধান্তগুলিও অবিসংবাদিতভাবে সত্য কারণ মূলতঃ তাহারা একই চিন্তার পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাহারা আমাদের চিন্তাধারার প্রকৃতিই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, বহির্জ্জগতের তথ্য সম্বন্ধে কিছুই বলে না। এখন দেখিতে হইবে যে ইন্দ্রিয়জ্ঞাননিরপেক্ষ বিশুদ্ধ যুক্তিদ্বারা কার্য্য ও কারণের মধ্যে আমরা কিরূপ সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে পারি। অগ্নি ও বাষ্প সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু, অগ্নিসংস্পর্শ ও জলের বাষ্পে পরিণত হওয়া এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনা। অর্থাৎ অগ্নি বলিতে আমরা বাষ্প বুঝি না, অগ্নিসংস্পর্শ বলিতে আমরা জলের বাষ্পীভূত হওয়া বুঝি না। যে ব্যক্তি কখনও জলের সহিত অগ্নিসংস্পর্শ দেখে নাই সে শত বৎসর ধরিয়া চিন্তা করিলেও অগ্নির মধ্যে বাষ্প অথবা বাষ্পের মধ্যে অগ্নির

সন্ধান পাইবে না। সুতরাং অগ্নি সম্বন্ধে খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়াও আমরা বলিতে পারি না যে "অগ্নিসংস্পর্শে জল বাষ্পে পরিণত হয়" ইহা একটী অবিসংবাদিত সত্য অথবা অগ্নিসংস্পর্শ ও বাষ্পের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। অগ্নিসংস্পর্শে জল প্রস্তরীভূত হয় এইরূপ চিন্তা করিতেও কোনও বাধা নাই বা ইহা একেবারেই অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য এরূপ মনে করিবারও কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। সুতরাং বিশুদ্ধ যুক্তিদ্বারা যদি কার্য্য ও কারণের মধ্যে কোনও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের সন্ধান না পাওয়া যায় তাহা হইলে হয়ত পর্য্যবেক্ষণ বা ভূয়োদর্শন দ্বারা তাহা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু হিউমের মতে তাহা পাইবারও কোনও সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি আজীবন দেখিয়াছে যে জল অগ্নিসংস্পর্শে বাষ্পে পরিণত হয় সেও অগ্নি জল বাষ্প ইত্যাদির অতিরিক্ত কোনও সংযোগসূত্র দেখে নাই এবং সেও কখনও বলিতে পারিবে না যে সকল দেশে ও সকল কালে জল অগ্নিসংস্পর্শে অবশ্যই বম্পে পরিণত হইবে। কারণ হইতে কার্য্যে যে কোনও শক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে ইহাও আমরা কখনই বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, এমন কি আমাদের মনের বাহিরে যে বল বা শক্তি আছে তাহাও আমরা নিঃশংসয়ে বলিতে পারি না। আমরা যখন আমাদের হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া থাকি তখন আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাই। আমরা যখন বাহির হইতে কোনও বাধা পাই তখন বহির্জ্জগতেও আমাদের শক্তির অনুরূপ শক্তি আছে ইহা মনে করা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে এরূপ বিশ্বাসের কোনও ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোনও ভারী বস্তু স্থানচ্যুত করিতে হইলে তাহার উপর আমরা শক্তিপ্রয়োগ করিয়া থাকি এবং সেই বস্তুটি যখন আমাদের হস্তের সংস্পর্শে আসে এবং স্বচ্ছন্দভাবে হস্তসঞ্চালনে বাধা দেয় তখন হস্তের সেই অংশে একটা চাপের অনুভূতি হইয়া থাকে। কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা ইহাও দেখা গিয়াছে যে বাহিরের কোনও বস্তুর সহিত হস্তের সংস্পর্শ না হইলেও শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত স্নায়ুমণ্ডলীতে ভিতর হইতে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া অনুরূপ অনুভূতির উদ্রেক করান যাইতে পারে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বল বা শক্তি সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। বহির্জ্জগতের যখন কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার মূলে যে কোনও শক্তির ক্রিয়া আছে এরূপ বিশ্বাস করা স্বাভাবিক হইলেও তাহার কোনও প্রমাণ নাই। অতএব আমাদের মনোজগতের বাহিরে যখন শক্তি বা বলের কোনও সন্ধান পাই না তখন একটী বস্তু নিজের শক্তিদ্বারা একটী কার্য্য উৎপাদন করে একথার কোনও অর্থই হয় না এবং তাহা হইলে কারণ ও কার্য্য

নামে অভিহিত বস্তু বা ঘটনাদ্বয় অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত ইহাও বলা যায় না।

বহির্জ্জগতে কোনও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এই যে যুক্তিগুলি প্রদত্ত হইয়া থাকে ইহারা কতদূর বিচারসহ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। এই সকল যুক্তির মূল কথা হইতেছে যে, যে দুইটী বস্তু বা ঘটনাকে আমরা কার্য্যকারণসূত্রে গ্রথিত করিয়া থাকি তাহারা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌, তাহাদের একটী অপর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অগ্নি এবং বাষ্প দুইটী পৃথক বস্তু, জলে অগ্নিসংস্পর্শ এবং জলের বাষ্পাকারে পরিণত হওয়া দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনা। সুতরাং প্রথমটীর মধ্যে দ্বিতীয়টীর সন্ধান পাওয়া যাইবে না। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে দুইটী বস্তু বা ঘটনাকে কখন পৃথক অথবা ভিন্ন বলিব? প্রশ্নটী যে একেবারে নিরর্থক নহে তাহা একটী সামান্য উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইবে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং মিঃ চার্চ্চিহিল দুই ব্যক্তি না একই ব্যক্তি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা সকলেই বলিব যে এখানে নাম বা পদের বিভিন্নতা থাকিলেও দুইটীই একই ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। সুতরাং দুইটী নাম বা শব্দ বিভিন্ন হইলেই যে তাহাদের উদ্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তি দুই হইবে এক হইতেই পারে না এরূপ বলা যায় না। সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে যদি দুইটি পদের উদ্দিষ্ট বস্তু ঠিক একই সময়ে একই স্থানে বর্ত্তমান থাকে এবং তাহাদেব গুণসমষ্টিও একই হয় তাহা হইলে তাহাদের উদ্দিষ্ট বস্তু এক, দুই নহে। দুইটী সর্ব্বতোভাবে অনুরূপ রৌপ্যমুদ্রা দুই স্থানে একই সময়ে বর্ত্তমান থাকিলে আমরা বলিব যে দুইটী মুদ্রা আছে একটী নহে। আজ যেস্থলে একটী রৌপ্যমুদ্রা দেখিলাম কাল ঠিক সেই স্থলে একটি তদনুরূপ মুদ্রা দেখিলেও তাহারা দুইটী বিভিন্ন মুদ্রা হইতে পারে। সুতরাং দুই বা ততোধিক পদের (অথবা পদসমষ্টির) উদ্দিষ্ট বস্তু এক অথবা পৃথক তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও বিচারদ্বারা স্থির করিতে হইবে। কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এই সমস্যার সমাধান যতটা সহজ বলিয়া মনে হইতেছে ইহা ততটা সহজ নহে। কেন সহজ নহে তাহা একটি সাধারণ উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে। মনে করা যাক্‌ আমি একটী রৌপ্যমুদ্রাকে পাঁচমিনিট ধরিয়া দেখিতেছি অর্থাৎ আমার দৃষ্টি কিছুক্ষণ ধরিয়া একটী উজ্জ্বল শুভ্র গোলাকার পদার্থের উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে। (এখানে সাধারণ প্রচলিত ভাষাই ব্যবহার করা হইল যদিও আমার দৃষ্ট বিষয়টী এক দুই অথবা বহু ইহাই বিচার্য্য বিষয়) তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তে যে মুদ্রাটী দেখিতেছি ও পাঁচমিনিট আগে সেই একই স্থানে যে মুদ্রাটী দেখিয়াছিলাম তাহারা দুইটী বস্তু

অথবা একই বস্তু? পাঁচমিনিট আগে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাকে যদি ম' বলা যায় ও এই মুহূর্ত্তে সেই একই স্থানে যাহা দেখিতেছি তাহাকে যদি ম^{২} বলা যায় যাহা হইলে ম^{১} এবং ম^{২} ইহারা এক অথবা পৃথক? যদি বলা যায় যে তাহারা দুইটী বস্তু তাহা হইলে ম^{২} যখন বর্ত্তমান ম^{১} সেই একই স্থান ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না। অর্থাৎ ম^{১} হয় ইহার মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে নহেত অন্যত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু আমার দৃষ্টি যতক্ষণ ঐ স্থানে নিবদ্ধ আছে তাহার মধ্যে ম^{১}কে ধ্বংস হইতে অথবা স্থানান্তরিত হইতে দেখি নাই বা অপর কেহও দেখে নাই, সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে ম^{১} ম^{২}য়ের সহিত একই সময়ে একই স্থানে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু দুইটী পৃথক বস্তু একই সময়ে একই স্থান অধিকার করিতে পারে না। অতএব ম^{১} ও ম^{২} দুইটী পৃথক বস্তু নহে একই বস্তু। 'ম' অর্থাৎ মুদ্রা নামে একটি বস্তু কিছুকাল ব্যাপিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। কালের প্রবাহ তাহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু তাহার একত্ব তাহাতে ব্যাহত হয় নাই। কিন্তু এস্থলে আপত্তি হইবে যে ম^{১} আমাদের সকলের অলক্ষ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা স্থানান্তরিত হইতে পারে এবং তাহার স্থলে ম^{২}য়ের আবির্ভাব হইতে পারে, অর্থাৎ ম^{১} এবং ম^{২} সদৃশ কিন্তু অভিন্ন নহে। ছায়াচিত্রের পর্দ্দায় একটী চিত্র অপসারিত হইলে আর একটী চিত্রের আবির্ভাব হয় হবং সেটীর পর আর একটীর আবির্ভাব হইয়া থাকে। চিত্রগুলি যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের না হইয়া ঠিক একপ্রকারের হয় তাহা হইলে আমরা পর্দ্দার উপরে কিছুকাল ধরিয়া একটী অচল অপরিবর্ত্তিত চিত্র দেখিতে পাই এবং উহা একটী বস্তু এইরূপ ভ্রম উৎপন্ন হইলেও উহা বাস্তবিকপক্ষে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সদৃশ চিত্রের সমষ্টিমাত্র। সেইরূপ যে মুদ্রাটিকে আমরা একই বস্তু বলিয়া মনে করিতেছি তাহা ম^{১}, ম^{২}, ম^{৩} প্রভৃতির সমষ্টি হইতে পারে ম^{১}, ম^{২} প্রভৃতি আমাদের অলক্ষ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায় এবং ম^{২}, ম^{৩} প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের স্থান অধিকার করে এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে। আমাদের অবস্থা যদি প্লেটোর কল্পিত গুহার অধিবাসিদের অবস্থার ন্যায় হয় তাহা হইলে আমরা হয়ত কেবল কতকগুলি ছায়ার আগমন ও নিঃসরণ প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু একটী ছায়া অপর ছায়াগুলির সদৃশ হইলেও তাহাদের মধ্যে একত্ব বা অভিন্নত্ব নাই। এইরূপ আপত্তির উত্তরে দুইটী কথা বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যাহা সম্ভব বলিয়া মনে করা হয় তাহা সত্য কি না বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ বাস্তবিক যে একটী বস্তু ধ্বংস হইয়া গিয়া তাহার স্থলে সম্পূর্ণ পৃথক আর একটী বস্তুর আবির্ভাব হয় তাহা প্রমাণসাপেক্ষ। ছায়াচিত্রের পর্দ্দায় প্রতিফলিত

চিত্রগুলি যে একের পর আরেকটী অপসারিত হইয়া যায় তাহা আমরা ছায়াচিত্রযন্ত্রের সাহায্য লইয়া সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি, কিন্তু একটী মুদ্রার বেলায় সেরূপ কিছু প্রমাণ করা সম্ভবপর নয়। আর পর্দ্দায় প্রতিফলিত চিত্রটী যে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন চিত্রের সমষ্টি তাহা বুঝাইতে গিয়া আমাদের এমন কতকগুলি বস্তুর সাহায্য লইতে হয় যাহারা পলে পলে ধ্বংস না হইয়া কিছুকাল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতে পারে, অর্থাৎ যাহারা মাত্র কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিত্র বা ছায়ার সমষ্টিমাত্র নয়। সেইরূপ যদি ইহা প্রমাণ করিতে হয় যে মুদ্রাটি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বিচ্ছিন্ন কতকগুলি গোলাকার বিষয়ের সমষ্টিমাত্র তাহা হইলে আমাদের এমন কতকগুলি বস্তুর জ্ঞানের প্রয়োজন যাহারা কেবলমাত্র কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বিষয়ের সমষ্টিমাত্র নহে। দ্বিতীয়তঃ ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে পর্দ্দায় প্রতিফলিত চিত্রগুলির প্রত্যেকটিই পর্দ্দার উপর অন্ততঃ কিছুকাল (তাহা যতই অল্প হউক না কেন) ব্যাপিয়া অবস্থান করে। কোন চিত্রটিই যদি ক্ষণকালের জন্যও পর্দ্দার উপর স্থায়ী না হয় তাহা হইলে সেইরূপ সহস্রাধিক চিত্রের সমষ্টিও কাল ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না। সহস্র শূন্যের সমষ্টি শূন্যই হইবে। সেইরূপ যদিও স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে মুদ্রাটি প্রকৃতপক্ষে ম১, ম২, ম৩, প্রভৃতি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বিষয়ের সমষ্টিমাত্র তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে এইগুলির প্রত্যেকটি অন্ততঃ ক্ষণকাল ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু ম১ অথবা ম২ যদি ক্ষণকালব্যাপী স্থায়ী দ্রব্য বা পদার্থ হয় তাহা হইলেও ক্ষণের একটা প্রসার থাকিবে এবং সেই অল্প সময়ের মধ্যেও পূর্ব্ববর্ত্তী ম১ এবং পরবর্ত্তী ম১ এই দুইয়ের মধ্যে একটা ভেদ বা বিভিন্নতা থাকিবেই থাকিবে। তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্বেকার প্রশ্নই আবার উঠিবে যে ক্ষণের একটি ভগ্নাংশ ব্যাপিয়া যে ম১ বর্ত্তমান এবং অপর একটি ভগ্নাংশ ব্যাপিয়া যে ম১ বর্ত্তমান ইহারা দুই না এক? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হইতেছে যে ইহারা পৃথক বা ভিন্ন হইয়াও এক। একত্ব এবং ভিন্নত্ব একান্তভাবে পরস্পরবিরোধী নহে। বিভিন্নতাবর্জ্জিত ঐক্য অথবা ঐক্যবর্জ্জিত বিভিন্নতা এই দুইই অসম্ভব। এখন যদি ক্ষণকালের জন্যও একটি বস্তু একই থাকিয়া বিভিন্ন হইতে পারে তাহা হইলে দীর্ঘকালের জন্যও যে কেন পারিবে না তাহার কোন সঙ্গত কারণ নাই। অর্থাৎ আমি পাঁচমিনিট কাল বা অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া একই স্থানে যে মুদ্রাটি দেখিতেছি তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন হইয়াও এক ইহা একেবারে অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ বিপরীত প্রমাণ যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ ইহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। এইবার স্থায়ী অচল বস্তু হইতে পরিবর্ত্তনশীল বস্তুতে আসা যাক্। যখন মৃদু উত্তাপে

কটাহস্থিত ঘৃত গলিতে থাকে তখন আমরা একটি ক্রমিক নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া থাকি। এই পরিবর্ত্তন কিছুকাল ধরিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকে, ইহার মাঝে কোনও ব্যবধান বা বিরাম থাকে না। কোনও এক সময়ে ছেদ টানিয়া আমরা এমন কথা বলিতে পারি না যে এইখানে একটি দ্রব্যের সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি হইল এবং পরে আর একটি সম্পূর্ণ নূতন দ্রব্যের উদ্ভব হইল। যে কোনও মুহূর্ত্তের মধ্যে অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে তাহাদের পৃথক করিয়া দেখান যায় না। কালের পরিমাণ যতই স্বল্প হউক না কেন তাহারই মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে একই পদার্থ অভিন্ন থাকিয়াও পরিবর্ত্তিত হইতেছে অথবা নব নব রূপ ধারণ করিতেছে। পরিবর্ত্তন যেখানে নিরবচ্ছিন্ন এবং মন্থর সেখানে ভিন্নতার মধ্যে অভিন্নত্ব বা ঐক্য সহজেই ধরা পড়ে, কিন্তু একটি বস্তুর ঐক্য পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াও অব্যাহত থাকিতে পারে ইহা একবার স্বীকার করিয়া লইলে পরিবর্ত্তন যেখানে দ্রুত অথবা যেখানে পরিবর্ত্তনজনিত ভেদের পরিমাণ বেশী সেখানেও বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। সুতরাং দুই বা ততোধিক পদ ব্যবহার করিলেই যে তাহাদের উদ্দিষ্ট বস্তুগুলি নিশ্চয় পৃথক বা ভিন্ন হইবে এরূপ নহে।

দেশকালনিয়ন্ত্রিত জগৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। আকাশে দৃশ্যমান গোধূলির বর্ণচ্ছটা ও হিমালয় এই দুইই ক্ষণে ক্ষণে পরিববর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের গতি কোথাও দ্রুত কোথাও বা মন্থর। কিন্তু একটী মূলগত ঐক্য না থাকিলে কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। আমরা আমাদের সুবিধা ও প্রয়োজনানুসারে এক নিরবচ্ছিন্ন বস্তু বা ঘটনা-প্রবাহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিয়া থাকি বা বর্ণনা করিয়া থাকি, কিন্তু তত্ত্বদর্শীর দৃষ্টিতে এইরূপ বিভাগ নিতান্তই কৃত্রিম ও অযথার্থ। যাহাদিগকে আমরা কারণ ও কার্য্য বলিয়া থাকি তাহারা যদি একই নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের দুইটি অংশ হয় তাহা হইলে আপাতদৃষ্টিতে তাহারা ভিন্ন বা পৃথক বলিয়া প্রতীত হইলেও তাহারা মূলতঃ এক এবং অভিন্ন। 'ক'র পরে 'খ'র আবির্ভাব কয়েকবার দেখিয়া তাহারা যে কার্য্যকারণসূত্রে আবদ্ধ এই সম্ভাবনার কথা আমাদের মনে উদয় হয় বটে কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত 'খ' 'ক'য়ের পরিণতি এইরূপ দেখাইতে না পারা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই সম্ভাবনা নিশ্চয়তার আকার ধারণ করে না। একটী ভ্রাম্যমাণ গোলক যখন আর একটী অনুরূপ গোলকের সংস্পর্শে আসিয়া থামিয়া যায় ও দ্বিতীয় গোলকটী চলিতে থাকে তখন ঐ দ্বিতীয়গোলকটীর গতি যে প্রথম গোলকটীর গতিরই অংশ এইরূপ উপলব্ধি করিয়াই আমরা

সিদ্ধান্ত করি যে উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে। প্রথম গোলকটী একস্থান হইতে অপরস্থানে যাইবার সময় তাহার গতিতে যেরূপ একটি অখণ্ডতা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ যখন দ্বিতীয় গোলকটী চলিতে আরম্ভ করে তখন তাহার ও প্রথম গোলকটির গতির মধ্যে একটী অখণ্ডতা দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ অগ্নিসংযোগে যখন কোনও পাত্র উত্তপ্ত হইয়া উঠে তখন ঐ পাত্রের উত্তাপ এবং অগ্নির উত্তাপ যে অভিন্ন ইহাই উপলব্ধি হইয়া থাকে। একটী বস্তু বা ঘটনার পর নিয়মিতভাবে আর একটী বস্তু বা ঘটনার আবির্ভাব ইহা কার্য্য-কারণসম্বন্ধের মূলতত্ত্ব নহে। কালপ্রবাহের মধ্যে থাকিয়া কার্য্য যে কারণ হইতে ভিন্ন হইয়াও এক ইহাই কার্য্যকারণসম্বন্ধের স্বরূপ।

কার্য্য ও কারণ যদি মূলতঃ অভিন্ন হয় তাহা হইলে তাহাদের সম্বন্ধ নিশ্চয়ই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হইবে কেবলমাত্র কালিক সম্বন্ধ নয়। কোন্ কারণের পর কোন্ কার্য্যের আবির্ভাব হয় তাহা বারবার প্রত্যক্ষ না করিলে কেবলমাত্র কোনও কারণবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার কার্য্যসম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না এই উক্তিও সত্য নহে। কোনও বস্তুর মধ্যে একটী ছুরিকা প্রবেশ করাইলে সেই বস্তুটী সেইস্থানে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে, এখানে একটী কারণের কার্য্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা মাত্র কারণটী দেখিয়া বলা যাইতে পারে। কোনও বস্তুতে ছুরিকা প্রবেশ করান এই ব্যাপারের অর্থ যদি আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় তাহা হইলে সেই বস্তুটী যে অবশ্যই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি জীবনে কখনও কোনও বস্তুতে ছুরিকা প্রবেশ করিতে দেখে নাই সেও বলিতে পারিবে যে কোনও বস্তুর কোনও স্থানে ছুরিকা প্রবিষ্ট হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল সেই বস্তুটীর সেই স্থানে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যাওয়া। একটী ত্রিভুজ সমবাহুবিশিষ্ট হইলে তাহার তিনটী কোণ সমান হইবে ইহা যেমন ইন্দ্রিয়জ্ঞাননিরপেক্ষ অবিসংবাদিত সত্য, উপরে কথিত সত্যটীও সেইরূপ। এখানে এই আপত্তি হইতে পারে যে কোনও বস্তুতে ছুরিকা প্রবিষ্ট হওয়া ও সেই বস্তুটীর দুইভাগে বিভক্ত হওয়া ত একই ব্যাপার, সুতরাং এখানে একই ব্যাপারকে দুইভাবে বলা হইয়াছে অর্থাৎ উপরে কথিত বাক্যটী একটি সমার্থক বাক্য। আমাদেরও বক্তব্য এই যে এই দুইটী ব্যাপার বস্তুতঃ অভিন্ন কিন্তু এই অভিন্নত্ব ভিন্নতারহিত অভিন্নত্ব নহে। ছুরিকার দিক হইতে বিবেচনা করিলে ইহার গতি একটী ঘটনা, এবং সেই বস্তুটীর দিক হইতে বিবেচনা করিলে ইহার দুইভাগে বিভক্ত হওয়া আর একটী ঘটনা, অথচ দ্বিতীয়টী প্রথমটীরই পরিণতি। এই দুইটী মূলতঃ অভিন্ন

বলিয়াই প্রথমটী ঘটিলে দ্বিতীয়টী অবশ্যই ঘটিবে, কখনও ইহার অন্যথা হইবে না এইরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। কিন্তু আপত্তি হইতে পারে যে সকল স্থলে এইরূপ অনুমান করিতে পারা যায় না। জলে শর্করা নিক্ষেপ করিলে তাহার অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইবে অথবা আদৌ কোন পরিবর্ত্তন হইবে কিনা তাহা প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা ভিন্ন জানা যাইবে না। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে শর্করা ও জলের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকার জন্যই জলের সংস্পর্শে শর্করার পরিণতি কি হইবে তাহা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা যায় না। কিন্তু যদি জগতের প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃতি, তাহাদের সূক্ষ্মতম অংশের সংস্থান ও তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ বিষয়ে আমাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে কোন্ সময়ে কোন্ কারণ হইতে কোন্ কার্য্য হইবে তাহা গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যেই বলিয়া দিতে পারিতাম, তজ্জন্য ভূয়োদর্শনের প্রয়োজন হইত না।

কারণ ও কার্য্য দুইটী ভিন্ন পদার্থ, অতএব তাহাদের মধ্যে কোনও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিতে পারে না এতক্ষণ পর্য্যন্ত এই যুক্তিটীর সারবত্তা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। অতঃপর দ্বিতীয় যুক্তিটি আলোচনা করা যাউক। হিউম্ ও তাঁহার অনুবর্ত্তীরা বলিয়া থাকেন যে কারণ ও কার্য্যের মধ্যে কোনও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আমাদের প্রতক্ষগোচর হয় না। আমরা কেবলমাত্র ইহাই দেখিতে পাই যে কারণের পর কার্য্যের আবির্ভাব হইতেছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোনও সংযোগসূত্রের সন্ধান পাই না। এইরূপ সংযোসূত্রের ধারণা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত এবং যাহা কেবলমাত্র কল্পনাপ্রসূত তাহার কোনও বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এ কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে দুইটী বস্তু বা ঘটনার মধ্যে যদি কোনও সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে এই সম্বন্ধটী এই দুই বস্তু বা ঘটনার অতিরিক্ত কোনও তৃতীয় বস্তু বা ঘটনা নহে। সুতরাং বস্তু বা ঘটনাকে যেভাবে দেখা যাইতে পারে কোনও সম্বন্ধকে সেভাবে দেখা যাইবে না। কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষ হয় না তাহাই যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বা অবাস্তব হইবে এমন নহে। কোনও বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ হইলেই জ্ঞানলাভ হয় না। ইন্দ্রিয়ের সহিত যদি বুদ্ধির সাহচর্য্য না থাকে তাহা হইলে মাত্র ইন্দ্রিয়োপলব্ধি হইতে কোনও জ্ঞান হয় না। দূর হইতে কিয়ৎ পরিমাণ রং দেখিয়া যখন আমি বুঝিতে পারি যে একটী পুষ্প দেখিতেছি তখন এই জ্ঞানলাভ করিতে মাত্র চক্ষুর ব্যবহার যথেষ্ট নহে বুদ্ধির সাহচর্য্যেরও প্রয়োজন। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও

নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত কোনও একটী বিষয়ের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয়, যাহা ঠিক সেই সময়ে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখীন হয় নাই তাহার কোনও সন্ধান দিতে পারে না। অথচ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান কোনও বিশেষ স্থান বা সময়ে সীমাবদ্ধ নহে। "এই রক্তবর্ণের বিষয়টি আমার সম্মুখে অবস্থিত একটী পুষ্প" এইরূপ জ্ঞান হইতে হইলে এই বিষয়টির সহিত পূর্ব্ব দৃষ্ট কোনও কোনও বিষয়ের সাদৃশ্যের এবং কোনও কোনও বিষয়ের বৈষম্যের জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। অধিকন্তু এই পুষ্প বস্তুটি এক্ষণে আমার সম্মুখে অবস্থিত এইরূপ প্রতীতি হইতে হইলে ঐ বিষয়টির সহিত আমার ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য বিষয়গুলির সম্বন্ধ জানিতে হইবে। এইরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান না থাকিলে কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে পুষ্প বলিয়া জানা দূরে থাক তাহা যে একটী বস্তু অথবা একটী বিশেষ বর্ণ এরূপ জ্ঞানও হইতে পারে না। অর্থাৎ কোনও ইন্দ্রিয় আমাদিগকে একটী বিশেষ বিষয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দেয় বটে কিন্তু তাহাকে জানিতে হইলে তাহাকে নানাবিধ সুদূরপ্রসারী সম্বন্ধসূত্রের কেন্দ্রীভূত করিয়া জানিতে হইবে। সমগ্র জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোনও বিষয়কে একেবারে একান্ত করিয়া জানিবার কোনও উপায় নাই। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সহিত বুদ্ধির সাহচর্য্য আছে বলিয়াই এইরূপ নানা সম্বন্ধ-সূত্রে জড়িত, বিষয়ের জ্ঞান আমাদের হইয়া থাকে। সুতরাং যখন কতকগুলি সম্বন্ধের জ্ঞান ব্যতীত কোনও বস্তু বা ঘটনাবিশেষের জ্ঞান হইবারই সম্ভাবনা নাই তখন এই সম্বন্ধগুলিকে কাল্পনিক বা অবাস্তব বলা চলে না। রূপ রস শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি যে অর্থে বাস্তব যে সকল সম্বন্ধসূত্রে জড়িত হইয়া ইহারা বিবিধ পদার্থরূপে আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে সেগুলিও সেই অর্থেই বাস্তব। যখন কোনও বস্তুর সহিত আমাদের পরিচয় হয় তখন তাহাকে এক অবিচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহের অংশ বলিয়া জানি। কোনও বস্তুই দেশে বা কালে স্ব-সম্পূর্ণ নহে। তাহার সত্তাকে কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। অর্থাৎ যে কোনও বস্তুকে পূর্ব্বগামী কারণের কার্য্য (অর্থাৎ পরিণতি) এবং অনাগত কার্য্যের কারণরূপেই জানা যায়। ভূয়োদর্শন, পর্য্যবেক্ষণ, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রভৃতি উপায় দ্বারা কোন্ কোন্ বস্তুর মধ্যে কি সম্বন্ধ বর্ত্তমান সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে কিন্তু কার্য্যকারণসম্বন্ধ অথবা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের জ্ঞান যে কোনও ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে। বরং এ কথা বলা যাইতে পারে যে এরূপ জ্ঞান ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়জ্ঞান হওয়াই অসম্ভব। ইন্দ্রিয়সংযোগে

যেভাবে বস্তু বা ঘটনার জ্ঞান হইয়া থাকে কার্য্যকারণসম্বন্ধের জ্ঞান ঠিক সেভাবে হয় না সত্য কিন্তু এই সম্বন্ধকে কাল্পনিক বা অবাস্তব মনে করিলে ভুল করা হইবে।

এখানে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধের কথাই প্রধানতঃ আলোচিত হইল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। তাহাদের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের ন্যায় তাহারাও যথার্থই বহির্জ্জগতের অঙ্গীভূত। জগতের প্রকৃতিই এইরূপ যে ইহা অবিচ্ছেদ্য সংযোগসূত্রে গ্রথিত অসংখ্য কার্য্যকারণধারার সমষ্টি। এই সংযোগ-সূত্রগুলি কোথাও সুস্পষ্ট কোথাও বা প্রায় অদৃশ্য। জগতের প্রকৃতি এরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইল না কেন, জগৎ দেশ ও কালের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল কেন অথবা ইহা আদৌ হইয়াছে কেন মানববুদ্ধি এসকল প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ। আমরা মাত্র ইহাই বলিতে পারি সে সমগ্র জগতের প্রকৃতি যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে তাহার অন্তর্গত কোনও বিশেষ বস্তু বা ঘটনার সহিত অন্য কতকগুলি বস্তু বা ঘটনা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবেই হইবে। জগতের একটী অংশকে বুঝিতে হইলে অন্যান্য অংশের সহিত তাহাকে সংযুক্ত করিয়া দেখিতে হইবে, কিন্তু সমগ্র জগৎকে এরূপভাবে বুঝিবার কোনও উপায় নাই।

ভ্রমপ্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদ

শ্রীচন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য্য
(ফেলো, অমলনের ইন্‌ষ্টিটিউট)

রাসেল্, ব্রড্, প্রাইস্ প্রভৃতি এক শ্রেণীর আধুনিক দার্শনিক ভ্রম-প্রত্যক্ষসম্বন্ধে যাহা বলেন, এখানে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এঁদের মতে, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিষয়মাত্রই সমানভাবে সত্য, ভ্রান্ত প্রত্যক্ষেরও সাক্ষাৎ-বিষয় মিথ্যা নহে, কিন্তু ঐ বিসয়সম্পর্কে জ্ঞাতার মনে যে বিশ্বাস বা ধারণা উৎপন্ন হয়, তাহাই মিথ্যা, আমি যখন মনে করি, দূরে একটি পাকা আম দেখিতেছি তখন সন্দেহ হইতে পারে সেটী কি গাছের ফল, না রঙ্-দেওয়া কাঠের খেলনা; কিন্তু গোল লালরঙের একটা কিছু যে আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহা একেবারেই অবিসংবাদিত, খুব বেশী হয়ত, এই লাল আকৃতির সত্তাটি যে কি রকম, তৎসম্বন্ধেই কথা উঠিতে পারে; অর্থাৎ আমি প্রশ্ন তুলিতে পারি, উক্ত আকারটি কি স্বপ্নের ন্যায় শুধু মানসিক অথবা প্রাতীতিক, না উহার মনোবাহ্য বস্তু-সত্তাও রহিয়াছে। মাতাল যখন খোলা চোখে রাঙা ইঁদুর দেখে বলিয়া মনে করে, তখন যে একটা কিছু রঞ্জিত আকার তাহার জ্ঞানে ভাসমান হয়, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ। ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানের এই যে অনপলাপ্য সাক্ষাৎ বিষয়, যাহা বিচারবুদ্ধি বা বিশ্বাসের দ্বারা গঠিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত নয়, তাহাকে সেন্‌স্‌ডেটাম্ কহে। অর্থাৎ বিচার-নিরপেক্ষ, শুদ্ধ ইন্দ্রিয়জ্ঞানে যে- বিষয় নিশ্চিতরূপে দেওয়া রহিয়াছে, তাহারই নাম সেন্‌স্‌ডেটাম্। আমরা বাঙ্‌লায় তাহাকে ইন্দ্রিয়োপাত্ত বলিব।

রাসেল্ প্রমুখ দার্শনিকগণ বলেন, আম্রনামক পদার্থ কখনও ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিষয় হইতে পারে না। উহার দিকে বিভিন্ন দৃষ্টি কোণও দূরত্ব হইতে দৃক্‌পাত করিলে, আমরা লালরঙ্-এর নানাবিধ, ছোটবড়, বর্ত্তুল ও আবর্ত্তুল আকার মাত্র দেখিতে পাই; কিংবা উহার গায়ে হাত বুলাইলে কোমল ও মসৃণ স্পর্শযুক্ত আকার মাত্র অনুভব করি। এই সব রঞ্জিত বা স্পর্শান্বিত আকৃতি প্রভৃতি ছাড়া ইন্দ্রিয়জ্ঞানে সাক্ষাৎভাবে আর কিছু পাওয়া যায় না। ইহারাই প্রকৃত ইন্দ্রিয়োপাত্ত। আম্র-নামক বস্তুটি এইসব ইন্দ্রি য়োপাত্তের ন্যায় সাক্ষাৎভাবে জানার যোগ্য

নহে : কিন্তু ইহাদের সাহায্যে পরম্পরায় জ্ঞাতব্য, কারণ, উহা আসলে পরস্পর সম্বন্ধ অসংখ্য ইন্দ্রিয়োপাত্তের একটি বর্গ বা শ্রেণী (group of sense data) (রাসেল্) কিংবা এইরূপ কোন শ্রেণীর ইন্দ্রিয়বাহ্য ও নিয়ত কারণ-বিশেষ (ব্রড্), অথবা কারণধর্মান্বিত কোন কেন্দ্রের চারিধারে সমাবেশযোগ্য ইন্দ্রিয়োপাত্তসমূহের একটি পরিবার বা গোষ্ঠীমাত্র (family of sense data) (প্রাইস্)।

যে-অন্তঃকরণবৃত্তিকে সচরাচর বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ বলিয়া নির্দেশ করা হয়, উহা বাস্তবিক দৃষ্টিতে দুই বিভিন্ন অনুভবের সংমিশ্রণ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। প্রথমটি, কোন ইন্দ্রিয়োপাত্তের সাক্ষাৎজ্ঞান (acquaintance) বা 'পরিচয়'; এবং দ্বিতীয়টি, এই ইন্দ্রিয়োপাত্ত-সংস্পৃষ্ট একটি সম্বন্ধের অস্তিত্বে 'বিশ্বাস' (belief)। আমি যখন মনে করি যে, একটি বিলাতি বেগুন দেখিতেছি, তখন প্রথমে আমার সহিত লাল ও গোল আকারের কোন ইন্দ্রিয়োপাত্তের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে; তারপর আমার মনে এই বিশ্বাস বা ধারণা জন্মে যে, সাক্ষাৎজ্ঞাত এই ইন্দ্রিায়োপাত্তটি অন্যান্য কতকগুলি প্রাপ্তব্য ইন্দ্রেয়োপাত্তের সহিত এক পারিবারিক যোগসূত্রে সম্বদ্ধ।

তথাকথিত প্রত্যক্ষের দুই উপাদান: (১) সাক্ষাৎ পরিচয় ও (২) বিশ্বাস। তন্মধ্যে প্রথমটি সত্যমিথ্যাঘটিত দ্বন্দ্বের অতীত; কিন্তু দ্বিতীয়টি উহার এলাকায়, বিলাতি বেগুনের তথাকথিত প্রত্যক্ষে, চোখে দেখা যায় শুধু লাল রঙের একখণ্ড বর্তুল আকার; কিন্তু মনে বিশ্বাস বা ধারণা হয় যে, ঐ আকারের গায়ে হাত লাগিলে, মোলায়েম স্পর্শ উপলব্ধি হইবে, কিংবা উহার অভ্যন্তর জিহ্বার সহিত সংযুক্ত হইলে, অম্লমধুর রস অনুভূত হইবে। অবশ্য, আলোচ্য স্থলের এই বিশ্বাসটি যথার্থ। কিন্তু রক্তবর্ণ মূষিক দেখিবার সময়, মাতাল তাহার রক্তবর্ণ ইন্দ্রিয়োপাত্ত সম্বন্ধে যে বিশ্বাস পোষণ করে, তাহা অযথার্থ। সে যদি বুঝিতে পারিত যে তদ্দৃষ্ট লোহিত আকৃতিখানা মূষিকনামধারী কোন ইন্দ্রিয়োপাত্ত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহা হইলে তাহার ভুল হইত না, কিন্তু মাতালের যখন দৃঢ় ধারণা থাকে যে, তাহার জ্ঞানে ভাসমান এই আকারটি তাহাকে দংশন করিতে, কিংবা কখন কখন বিড়ালের ক্ষুধা নিবারণ করিতে সমর্থ।

বিলাতি বেগুন সম্পর্কে দৃশ্যমান লোহিতবর্ণ ও ভবিষ্যতে অনুভাব্য সুখস্পর্শ, এতদুভয়ের ভিতর দেশকালঘটিত একটি বাস্তব সম্বন্ধ রহিয়াছে, সুতরাং এই সম্বন্ধের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিলে অন্যায় হইবে না। কিন্তু মাতালের দৃষ্ট রক্তাকৃতি এবং মূষিকদংশনজাত-বেদনা এতদুভয়ের মধ্যে সেরূপ কোন সত্য সম্বন্ধ নাই। তাই এতাদৃশ অবাস্তব সম্বন্ধের অস্তিত্বে

বিশ্বাস করিলে ভুল হইবে। খালিজায়গায় অন্ধকারে যে-ভূত দেখা যায়, তাহার সমস্তটাই যে মিথ্যা তাহা নহে, সেখানেও কোন ইন্দ্রিয়োপাত্ত জ্ঞানপটে নিশ্চয়ই দেখা দেয়। অবশ্য, জ্ঞাতা যে ভাবে, উহার ভিতর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া অসম্ভব, কিংবা সেরূপ চেষ্টা করিলে, গতি রুদ্ধ হইবে, তাহা ঠিক নয়। দ্রষ্টার ধারণা এই যে, ভূতরূপে ব্যাখ্যাত ইন্দ্রিয়োপাত্তটি কোন রামশ্যাম সদৃশ ইন্দ্রিয়োপাত্ত পরিবারের এলাকাভুক্ত; কিন্তু উহা নিছক ভ্রান্তি; কারণ, এতদনুরূপ পারিবারিক যোগসূত্র সম্পূর্ণ অবাস্তব, ভূতসংক্রান্ত ইন্দ্রিয়োপাত্তট নিতান্তই ছন্নছাড়া ও গৃহহীন; কোন ইন্দ্রিয়োপাত্তীয় পরিবারেই তাহাকে স্থান দেওয়া চলে না। মাতালের দৃষ্ট রক্তাকারগুলি-সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এই সব ইন্দ্রিয়োপাত্ত একেবারেই খাপছাড়া এবং পরিবারে থাকার অনুপযুক্ত। সুতরাং ইহারা যে কোন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এইরূপ ধারণামাত্রই ভ্রমমূলক। ইহাদের বেলায় যদি ভ্রমপ্রমাদ ঘটে, তবে তাহা বিশ্বাসগত, কিন্তু জ্ঞান-গত নহে।

অবশ্য, এমন অনেক ভ্রান্তি আছে, যাহা পূর্ণভাবে নিরালম্বন নয়। অধিকাংশ ভ্রমপ্রমাদেরই কোন পারিবারিক অবলম্বন থাকে; অর্থাৎ তৎসংসৃষ্ট ইন্দ্রিয়োপাত্তটি কোন-না-কোন বাস্তবপরিবারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উহা কোন পরিবারের অন্তর্গত, এইরূপ মনে করিলেই যে ভুল হইবে তাহা বলিতে পারা যায় না। এখানে যে-ভ্রান্তি ঘটে তাহা, হয় পরিবারটির স্বরূপসম্পর্কে, নয়, তাহাতে ইন্দ্রিয়োপাত্তটীর যে নির্দ্দিষ্ট স্থান ও পদমর্য্যাদা আছে, তৎসম্বন্ধে। নিম্নলিখিত উদাহরণ দুইটীতে, বোধ হয়, কথাটা কিছু স্পষ্টতর হইবে।

সমুদ্রের পারে দাঁড়াইয়া, পশ্চিমদিক্‌প্রান্তে এক ক্ষুদ্রাকার জ্যোতির্মণ্ডল দেখিয়া মনে হইল, একটা নক্ষত্র অস্ত যাইতেছে। ধরা যাউক, আসলে সেটী দূরস্থ কোন দীপস্তম্ভের আলোক। এখানে ভ্রমটী সাবলম্বন; কারণ আলোকরূপ ইন্দ্রিয়োপাত্তটী দ্রষ্টার ধারণানুযায়ী নক্ষত্র পরিবারের অন্তর্গত না হইলেও, প্রদীপ-পরিবারে তাহার ন্যায়-সঙ্গত স্থান রহিয়াছে। এখানে, উপলব্ধ ইন্দ্রিয়োপাত্তের সহিত সম্বন্ধ একটি বাস্তব পরিবার আছে; কিন্তু ঐ পরিবারের স্বরূপ সম্বন্ধে, জ্ঞাতা যে-বিশ্বাস পোষণ করে, তাহা মিথ্যা।

অন্য একরকম সাবলম্বন ভ্রান্তি আছে, যাহা ইহা অপেক্ষা জটিলতর। একটি সরল যষ্টি জলপূর্ণ চৌবাচ্চায় অংশতঃ ডুবাইয়া রাখিলে, উহা বক্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়; একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বস্তুতঃ তখন যষ্টির আকারে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। এই বক্র ইন্দ্রিয়োপাত্তটি যে লাঠি-

পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। লাঠিটার দিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন রঙের চশমার ভিতর দিয়া তাকাইলে, বিবিধ বর্ণ ও আকারের যে-সব ইন্দ্রিয়োপাত্ত আমাদের গোচরীভূত হয়, তাহাদের সহিত জলস্থ বক্রাকৃতিগুলিও ঐ লাঠিপরিবারের পোষ্য, দ্রষ্টা-ও সাধারণতঃ ইহারা যে কোন্ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, তৎ-সম্বন্ধে প্রমাদগ্রস্ত হয় না। অর্থাৎ এইরূপ কোন ইন্দ্রিয়োপাত্ত দেখিয়া সাধারণতঃ কেহ মনে করে না যে, উহা যষ্টি নয়, কিন্তু সর্প বা রজ্জু। তবে, এই সব ভ্রমের ভ্রান্তিটা ঠিক কোথায়?

অধ্যাপক প্রাইস উপরি উক্ত প্রশ্নের যে-উত্তর দিয়াছেন, তাহা নিম্ন-লিখিতরূপ। একই ইন্দ্রিয়োপাত্তীয় পরিবারের মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন উপবর্গ থাকে; এবং উক্ত পরিবারের প্রত্যেকটী উপাত্ত উহাদের ভিতর কোন এক নির্দ্দিষ্ট উপবর্গে এক নির্দ্দিষ্ট স্থলে অবস্থিত। উদাহরণস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব ও দৃষ্টি-কোণ হইতে যষ্টিবিশেষের যে নানা আকৃতি দেখা যায়, সেগুলি এক বিশিষ্ট উপশ্রেণীর (sub-class) সৃষ্টি করে। উহাকে 'পরিপ্রেক্ষিতীয় শ্রেঢ়ী' (perspectival series) বলা যাউক। আবার এক এক রকম স্ফীতিযুক্ত এক এক রকম কাচখণ্ডের ভিতর দিয়া ঐ যষ্টির যে-সব বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ে, উহাদিগকে অপর এক উপবর্গে সাজান যায়; উহাকে 'বক্রভাবীয় শ্রেঢ়ী' (perspectival distortion and refraction series) নামে অভিহিত করিলে মন্দ শুনাইবে না। লাঠী পরিবারের অসংখ্য ইন্দ্রিয়োপাত্ত এতদনুরূপ কয়েকটি শ্রেঢ়ীতে বিন্যস্ত করা সম্ভবপর। আরপ্রত্যেক শ্রেঢ়ীতে এমন এক ইন্দ্রিয়োপাত্ত পাওয়া যাইবে, যাহা বা যাহার কিয়দংশ অন্যান্য সকল শ্রেঢ়ীতেই বিদ্যমান। এই অংশগুলি একত্র করিয়া যে গোটা আকৃতিটি পাওয়া যাইবে, তাহা এই যষ্টিপরিবারের কেন্দ্রস্থানীয় চক্ষুরূপাত্ত। কেন্দ্রস্থলে পরিবারের স্পর্শোপাত্তগুলিকে-ও জায়গা দিতে হইবে। একটা আধুলীর দিকে নানা-ভাবে তাকাইলে, যেসব আবর্ত্তুল আকৃতি দৃষ্ট হয়, সেগুলি আবর্ত্তুলতার ন্যূনতানুসারে পর পর সজ্জিত হইলে সর্ব্বশেষে একটী পূর্ণাবয়ব বৃত্ত পরিলক্ষিত হইবে। আবার নানারকম স্ফীতিযুক্ত বিভিন্ন কাচখণ্ডে আধুলীর যে সব অদ্ভুত আকার দৃষ্টিগোচর হয়, সেগুলিকে স্ফীতির ন্যূনতানুসারে পর পর সাজাইলে, ঐ পূর্ণাবয়ব বৃত্তটাতেই উপনীত হওয়া যায়, সুতরাং এই বৃত্তাকারটা আধুলী পরিবারের কেন্দ্রীয় চক্ষুরূপাত্ত। স্থূলতঃ, সাদাচোখে দৃষ্ট ও খালিহাতে স্পৃষ্ট যে সব উপাত্ত এক স্থলে সমাবিষ্ট বলিয়া অবধারিত হয়, সেগুলিই পরিবারের কেন্দ্রস্থানীয়।

সত্যত্বের মাপকাঠিতে দেখিতে গেলে, যে-কোন পরিবারের প্রত্যেক উপবর্গ এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়োপাত্তের মূল্য সমান। কিন্তু জীবনধারণের জন্য পরিপ্রেক্ষিতীয় শ্রেঢ়ীর মূল্য বেশী; তন্মধ্যে আবার কেন্দ্রীয় উপাত্ত সমূহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। তাই, দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে ও বিজ্ঞানে উহারা বস্তুর আসল-স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হয়। জীবনধারণের জন্য আমাদের ভিতর যে স্বাভাবিক অন্তঃপ্রেরণা আছে, তাহার প্রভাবে আমরা উপলব্ধ যে-কোন ইন্দ্রিয়োপাত্তকেই তাহার পরিবারের কেন্দ্রস্থানীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে সাধারণতঃ উন্মুখ থাকি। জলে-ডুবান যষ্টির প্রত্যক্ষে, আমরা ঠিক কি ব্যাপারে ভুল করি, এখন তাহা সহজে বুঝা যাইবে। যষ্টির বঙ্কিম আকৃতিটি যে বক্রীভাবীয় শ্রেঢ়ীর কোন অকেন্দ্রীয় স্থলে বিদ্যমান, তাহা আশা করি স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি রশ্মির বক্রীভবনের নিয়ম সম্বন্ধে কিছু জানে না, সে পূর্ব্বোক্ত উন্মুখতার বশে স্বভাবতঃ ভাবিবে যে, চৌবাচ্চার লাঠিটা মাঝখানে বাঁকা, কিংবা দৃষ্ট বক্রাকারের গায়ে হাত চালাইলে স্পর্শদ্বারা গতির দিক্ পরিবর্ত্তন অনুভূত হইবে, অথবা লাঠিখানা জল হইতে তুলিয়া লইলে-ও তাহার কটিদেশের বক্রতা পূর্ব্ববৎ দৃক্-গোচর হইতে থাকিবে। পারিভাষিক শব্দে বলা যায়, বক্রাকারটী ঐ ব্যক্তির নিকট যষ্টির স্ব-স্বরূপ কিংবা যষ্টিপরিবারান্তর্গত পরিপ্রেক্ষিতীয় শ্রেঢ়ীর কেন্দ্রীয় উপাত্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়োপাত্তটী স্বীয় পরিবারের কোন্ শ্রেঢ়ীতে ঠিক কোন্ জায়গায় অবস্থিত, তৎসম্পর্কে জ্ঞাতার যে ধারণা বা বিশ্বাস, তাহাই এখানে ভ্রান্তিমূলক।

মোটের উপর, আমি যখন মনে করি যে, কোন বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন প্রথমতঃ রূপস্পর্শাদিযুক্ত কোন ইন্দ্রিয়োপাত্তের সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে; তারপর আমার মনে বিশ্বাস জন্মে যে, উহা এবং অন্যান্য কতিপয় ইন্দ্রিয়োপাত্ত একটি পারিবারিক যোগসূত্রে গ্রথিত এবং সেই পরিবারের কোন বিশিষ্ট উপবর্গে তাহার এক নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। এই বিশ্বাস যদি সত্য হয়, অর্থাৎ আমার ধারণানুযায়ী পরিবার এবং তাহাতে ঐ ইন্দ্রিয়োপাত্তের তদনুরূপ স্থান যদি বাস্তবিকই থাকিয়া থাকে, তবে আমার প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রমা, নহিলে উহা অপ্রমা। আর এই বিশ্বাস সত্য না অসত্য, তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়োপাত্তের সাক্ষাৎ পরিচয়েই সম্ভবপর। কোন দৃশ্য ইন্দ্রিয়োপাত্তের সহিত যে স্পৃশ্য উপাত্তের সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস, সেই প্রত্যাশিত স্পৃশ্য উপাত্তটী বাস্তবিকই অনুভবের বিষয় হয় কিনা, তাহাত সাক্ষাৎভাবে স্পর্শ দ্বারাই

অবধারিত হইতে পারে। অবশ্য ব্যবহারিক জীবনে, এই সব বস্তু-বিষয়ক বিশ্বাস পরীক্ষা করিয়া দেখিবার মত সময় ও অবসর আমাদের থাকে না; তা ছাড়া, কতক জায়গায় তাহা কার্য্যতঃ অসম্ভবও বটে। তবু সাধারণভাবে বলা যায়, কার্য্যতঃ বহু (এবং তত্ত্বতঃ সর্ব্ব-) স্থলেই ইন্দ্রিয়োপাত্তবিষয়ক বিশ্বাসের সত্যতা কিংবা অসত্যতা সাক্ষাৎ-পরিচয় দ্বারা জানা সম্ভবপর।

অন্তর্নিরীক্ষণে (Introspection) জ্ঞানের প্রামাণ্য জানা দুষ্কর। কারণ, যতক্ষণ ভ্রান্তির নিরসন হয় না, ততক্ষণ-পর্য্যন্ত জ্ঞাতা উহাকে প্রমা বলিয়াই গ্রহণ করে। যদিও কল্পনা এবং প্রত্যক্ষের পার্থক্য অন্তর্নিরীক্ষণে ধরা যায়, তবু কল্পনা যখন জ্ঞানের বেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন এই অন্তর্গম্য পার্থক্যদ্বারা ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বলিয়া চিনিবার উপায় থাকে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদী সত্যকে মিথ্যা হইতে পৃথক্ করিবার যে-উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার জন্য কল্পনা ও প্রত্যক্ষের উক্ত অন্তর্জ্ঞেয় প্রভেদের কোন প্রয়োজন হয় না। অন্ধকারে যাহাকে ভূত মনে করিয়া ভয় পাই, তাহা বাস্তব কি অবাস্তব, সেকথা দৃষ্ট পদার্থটিকে স্পর্শ করিতে গেলেই, সাক্ষাৎভাবে বুঝিতে পারা যায়। বৈয়ক্তিক মনোবীক্ষণ হইতে সর্ব্বজনবেদ্য কোন ইন্দ্রিয়োপাত্তের সাক্ষাৎ পরিচয় যে সত্যমিথ্যা-নির্ণয়ের অনেক ভাল পন্থা, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তবু ইহাতে বেশ কয়েকটি খুঁত রহিয়াছে, সন্দেহ নাই।

বিশ্বাসের যাথার্থ্য যাচাই করার মানে কি? এক ইন্দ্রিয়োপাত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হইবামাত্র আমরা আশা করি, ভিন্ন স্থান হইতে তৎসদৃশ অপর ইন্দ্রিয়োপাত্তের সহিত পরিচিত হইব; এই প্রত্যাশিত উপাত্তের সাক্ষাৎ পরিচয়ই ত বিশ্বাসের পরীক্ষা, কিন্তু এই যে সাক্ষাৎ-পরিচয়, তাহার সম্বন্ধেও কি সত্যমিথ্যার কথা উঠে না? উত্তরে বলা যাইতে পারে, প্রত্যাশিত ইন্দ্রিয়োপাত্তের সাক্ষাৎ জ্ঞান সংশয়ের ঊর্দ্ধে; তবে সেখানে যে-সন্দেহ উঠে, তাহার বিষয় উক্ত সাক্ষাৎজ্ঞান নহে, কিন্তু অপর এক বিশ্বাস। কিন্তু এক বিশ্বাস অন্য বিশ্বাস দ্বারা, আবার এই দ্বিতীয় বিশ্বাস তৃতীয় এক বিশ্বাস দ্বারা, সমর্থন করিতে গেলে, অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য। বিশ্বাস জিনিষটা নিতান্তই মানসিক ব্যাপার। সত্য হোক মিথ্যা হোক, বিশ্বাসমাত্রেরই যে মানসিক সমর্থন সম্ভবপর, তাহাত আমাদের দৈনন্দিন অনুভবের বিষয়। তা ছাড়া, সত্যাসত্যপ্রতিপাদনের সবটাই যে একটা সুসংবদ্ধ ভ্রান্তিমাত্র নয়, তাহা কি কেহ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করিতে পারে? স্বপ্নে, মস্তিষ্কবিকারে, মদের নেশায় এবং তৎসদৃশ

অন্যান্য বিকৃত ও অসুস্থ মানসিক অবস্থায় সুসংবদ্ধ ভ্রান্তির বহু উদাহরণ অহরহ দেখা যায়। অবশ্য সুস্থাবস্থায়, জ্ঞাতা বুঝিতে পারে যে, এই সব ভ্রান্তি পূর্ণভাবে সুসংবদ্ধ নয়। কিন্তু ভ্রমের সময়, একথা তাহার নিকট একেবারেই অজ্ঞাত থাকে। সুতরাং বিশ্বাসের সমর্থন যে বাস্তবিকই যুক্তিসঙ্গত, তাহা অন্তর্নিরীক্ষণের সাহায্যেই আমাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত মানিয়া লইতে হয়। অর্থাৎ সত্যমিথ্যানিরূপণের এই আলোচ্য প্রণালীটী অন্তর্নিরীক্ষণের উপর নির্ভর না করিয়া কাজ করিতে অসমর্থ। জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানব্যতীত নির্ণয় করা অসম্ভব; অথচ যে-কোন বাহ্য-বস্তুবিষয়ক জ্ঞানই সংশয়হ অবশ্য, সত্যমিথ্যা-সম্পর্কিত সর্ব্ব মতবাদের বিরুদ্ধেই এই সমালোচনা সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু এক হিসাবে, ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদীর উপরই এই সমালোচনা বিশেষ-ভাবে প্রযোজ্য। কারণ, তিনি দাবী করেন যে, ইন্দ্রিয়োপাত্তের সাক্ষাৎ 'পরিচয়ে' তিনি পাষাণ হইতে সুদৃঢ় এক সন্দেহাতীত সত্তার আবিষ্কার করিয়াছেন।

তাঁহার মতে, বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষরূপ মানসিক ব্যাপারটী 'সাক্ষাৎপরিচয়' এবং 'বিশ্বাস', এই দুইটী পৃথক্ ও প্রায় সমসাময়িক মনোবৃত্তির সমষ্টি। কিন্তু অন্তর্নিরীক্ষণে, এই বিশ্লেষণ যথার্থ বলিয়া মনে হয় কি? জ্ঞাতার নিকট প্রত্যক্ষ নামক মনোব্যাপার একটা গোটা অনুভবের আকারেই প্রতীত হয়। আর যদি ধরিয়া লও, উহাতে উক্ত উপাদানদ্বয় রহিয়াছে, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, উহারা এমনি ওতপ্রোতভাবে পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে যে, ফলে একটী অখণ্ডরূপে প্রতীয়মান এবং উক্ত উপাদানদ্বয় হইতে পৃথক্ নূতন অনুভবের সৃষ্টি হইয়াছে।

তর্কের খাতিরে মানা যাউক যে, এই বিশ্লেষণ যুক্তিসঙ্গত অর্থাৎ ভ্রমপ্রত্যক্ষে, কোন ইন্দ্রিয়োপাত্তের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিবার পর, তৎসম্বন্ধে একটী ভ্রান্তবিশ্বাস গৃহীত হয়। তবু স্বীকার করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়োপাত্তটি অন্ততঃ আংশিকভাবে সেই ভ্রান্তবিশ্বাসের জন্মদাতা ও পরিপোষক। প্রত্যক্ষে, জ্ঞাতা তাহার ইচ্ছামত যে-কোন বিশ্বাসই যে গ্রহণ করিতে পারে, তাহা নহে। স্বানুভবের কাছে, ইন্দ্রিয়োপাত্তটি সম্পূর্ণ মূক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না; বরং উহা যেন জোরে বলিতে থাকে, আমার সম্বন্ধে অমুক বিশ্বাসটিই গ্রহণ করা সমীচীন হইবে। সুতরাং ভ্রমপ্রত্যক্ষের ইন্দ্রিয়োপাত্ত নিজেই প্রতারক ও মিথ্যা-উহাকে সত্যমিথ্যার ঊর্দ্ধে স্থান দেওয়া ঠিক নয়। অস্পষ্টতা-নিবন্ধন, কোন ইন্দ্রিয়োপাত্ত সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী একাধিক বিশ্বাস মাথা তুলিতে

চাহিলে, অনেক সময়, জ্ঞাতা উহাদের ভিতর একটীকে স্বেচ্ছায় বাছিয়া লয় বটে ; কিন্তু এরূপস্থলে, বিশ্বাসটি যদি পরে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে জ্ঞাতা আশ্চর্য্যে একেবারে হতভম্ব হইয়া যায় না, কারণ সে ভুলিতে পারে না যে, এই ভ্রমের জন্য সে নিজেই দায়ী। কিন্তু প্রত্যক্ষের বেলায় জ্ঞাতা এরকম কোন স্বাধীন ইচ্ছা খাটাইতে পারে না, তাই বিভ্রান্ত প্রত্যক্ষের ভ্রান্তি ধরা পড়িলে, আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাই ; মনে হয়, যেন হঠাৎ স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় এক মায়াময় জগৎ হইতে মাটীর পৃথিবীতে স্থানান্তরিত হইলাম। ভ্রান্তি দূর হইবার পরেও মনে হইতে থাকে, ভ্রান্তিকালীন উপাত্তটিই মিথ্যা পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আমাদিগকে ঠকাইয়াছিল।

প্রত্যক্ষে, বিশ্বাস-জাতীয় জ্ঞানাতিরিক্ত কোন মনোব্যাপার থাকিলে, তাহা জ্ঞাতার নিরঙ্কুশ স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না ; বরং প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত, তাহা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আর যদি মানিয়াও লই যে, বিশ্বাসের উৎপাদনে ইন্দ্রিয়োপাত্তের কোন হাত নাই, তাহা হইলে বোধ হয় স্বীকৃত হইবে যে, জ্ঞাতার অজ্ঞাতসারে তাহার কোন দুর্দম্য আকাঙ্ক্ষা, আশা, ভীতি, চিরাভ্যস্ত কোন চিন্তাপ্রণালী, অথবা তৎসম মানসিকব্যাপার তাহাকে সেরকম বিশ্বাসগ্রহণ করিবার জন্য প্রণোদিত করে। এখন আমরা বলিতে চাই, এইসব বিশ্বাসোৎপাদক মনোবৃত্তি শুধু একটা বিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, উপরন্তু সেই বিশ্বাসানুযায়ী একটি ইন্দ্রিয়োপাত্তও নির্ম্মাণ করে। ইন্দ্রিয়োপাত্তের এবং-বিধ নির্ম্মিতি ও পরিবর্ত্তন যে সম্ভবপর, তাহা নিম্নোক্ত উদাহরণগুলিতে স্পষ্ট হইবে। অধ্যাপক ব্রড লিখিয়াছেন, "আমি যদি কিয়ৎক্ষণ একটা সিঁড়ির ছবির দিকে চাহিয়া থাকি তাহা হইলে হঠাৎ সিঁড়ির দৃশ্যখানা, যেন কলের টিপে, দালানের কার্ণিসে রূপান্তরিত হইয়া যায়। কার্ণিস্ কিংবা সিঁড়ি, ইহাদের ভিতর যাহার কল্পনায় মনোযোগ নিবদ্ধ করা যায়, বিশেষতঃ ঐ দিকেই পরিবর্ত্তন ঘটিতে চাহে।" [সায়ন্টিফিক্ থট্। পৃঃ ২৬০]। অর্থাৎ খেয়ালমত এক বিশ্বাসের জায়গায় অপর বিশ্বাস প্রবর্ত্তন করিলে, ইন্দ্রিয়োপাত্তের স্বরূপটাও বদলাইয়া যায়। আর বিশ্বাস যেখানে জ্ঞাতার স্বাধীন ইচ্ছার উপর আদৌ নির্ভর করে না, সেখানে ভ্রমপ্রত্যক্ষের ইন্দ্রিয়োপাত্ত যে তন্নিরাসক প্রমাজ্ঞানের ইন্দ্রিয়োপাত্ত-হইতে পৃথক, তাহা ত একেবারে পরিস্ফুট। কাগজের ফুলকে যখন বাগানের বলিয়া ভুল করি, তখন উহাতে কাগজের লেশমাত্রও মালুম হয় না ; বরং উহার প্রত্যেকটি পাঁপড়ির সুন্দর রং ও

মনোহর বিন্যাস, এমন কি, উহাদের কোমলতাটি পর্য্যন্ত একান্তভাবে স্বাভাবিক বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু সেই ইন্দ্রজালের মোহ কাটিয়া যায়, তখন কোথায় সেই অকৃত্রিম কমনীয়তা ও অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটা! তখন সমগ্র ইন্দ্রিয়োপাত্তটীই যেন একটা কাগজীয় পরিণামের প্রভাব অনুভব করে। মনোবৈজ্ঞানিক জেমস তাঁহার এক ভ্রান্তির বর্ণনায় লিখিয়াছেন, "একদিন, অনেক রাত পর্য্যন্ত বসিয়া বই পড়িতেছি; হঠাৎ একটা জোরাল আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল, উহা উপরতলা হইতে আসিতেছে; ঐ শব্দে যেন আকাশ বাতাস ভরিয়া গিয়াছে। উহা মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া আবার সুরু হইল। স্পষ্ট শুনিবার জন্য উপরে বৈঠকখানায় গেলাম, কিন্তু ততক্ষণে উহা থামিয়া গিয়াছে। নীচে আসিয়া যেই চেয়ারে বসিয়াছি, অমনি আবার শুনিতে পাই, কি একটা শব্দ আকাশের সকল দিক হইতে তীব্রবেগে ধাইয়া আসিতেছে,—কি তার শক্তি, সে কি গভীর ও ভীতিজনক—যেন বন্যার জল ফুলিয়া উঠিতেছে, অথবা ভীষণ ঝটীকার অগ্রদূত তাহার আগমনবার্ত্তা বহিয়া আনিতেছে। বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া আবার উপরে গেলাম, কিন্তু কি অদ্ভুত! আওয়াজটী আবার বন্ধ হইয়া গেল! দ্বিতীয়বার নীচে আসিয়া দেখি, মেজের উপরে স্কট্ল্যাণ্ডীয় টেরিয়ার কুকুরটা পড়িয়া ঘুমাইতেছে আর আমার আকর্ণিত সেই বিভীষণ শব্দ তাহারই শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে নিঃসৃত! বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আওয়াজটী কয়েক মুহূর্ত্ত আগে ঠিক যেরকম বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, চিনিবার পর সেরকমটী আর শুনা গেল না; মানিতে বাধ্য হইলাম, বর্ত্তমান শব্দটী পূর্ব্বানুভূত শব্দ হইতে সম্পূর্ণ বিসদৃশ।" [সাইকলজি; ব্রীফার কোর্স পৃঃ ৩২৪]

উপরিবর্ণিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে বুঝা যায়, সর্প কিংবা রজ্জুসদৃশ বাহ্যবস্তুর ইন্দ্রিয়োপলব্ধিতে আমরা যে প্রথমে বস্তু-গন্ধ-শূন্য কোন ইন্দ্রিয়োপাত্তের সংস্পর্শে আসিয়া, তারপর উহাকে সর্প বা রজ্জু বলিয়া ব্যাখ্যা করি, একথা সত্য নয়। বরং ইন্দ্রিয়োপলব্ধির গোড়া হইতেই রজ্জ্বাকার কিংবা সর্পাকার প্রতীতি বিদ্যমান। অবশ্য, ইন্দ্রিয়োপাত্তটী অত্যন্ত অস্পষ্ট ও নিষ্প্রকারক হইলে, উহা ঠিক কোন্ বাহ্যবস্তুর অংশ, তাহা বিচারান্তেই নির্দ্ধারিত হয়। তথাপি এই সব স্থলে, ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রথমোপলব্ধ আকারটী বিচারের ফলে আমাদের চোখের সম্মুখেই কিয়ৎ পরিমাণে স্পষ্টতর ও রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদীর মতে, বাহ্য প্রত্যক্ষের তিন উপাদান, যথা (১) বিষয় বা ইন্দ্রিয়োপাত্ত, (২) তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় এবং (৩)

তৎসম্পর্কিত একটা বিশ্বাস; তন্মধ্যে সত্যমিথ্যার কারবার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, ইন্দ্রিয়োপাত্ত এবং তাহার-পরিচয় ক্ষেত্রে নহে। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, এই বিশ্লেষণ অযথার্থ; তা ছাড়া, ইহাকে যথার্থ বলিয়া ধরিয়া লইলেও, ভ্রমপ্রত্যক্ষের ইন্দ্রিয়োপাত্তটিকেও মিথ্যাত্ব-দোষে দুষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

দেশবিচার

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য, এম্‌, এ।

(উপক্রমণিকা)

বস্তুনিরপেক্ষ অসীমপ্রসার দেশ স্বীকার করিলে বস্তুর স্থান ও পরিমাণ এবং একাধিক বস্তুর পারস্পরিক বহিঃসত্তাকে আর বিভিন্ন পদার্থ বলিতে হয় না। একাধিক বস্তুর অসীম দেশে অবস্থানের নামই হইল তাহাদের অন্যোন্যবহিঃসত্ত্ব। বস্তুর পরিমাণ বলিতে ঐ দেশের এক অংশমাত্র[১] বুঝিলেই চলে। এবং স্থান পরিমাণেরই নামান্তর।

বস্তুর গতি বলিতে যদি আমরা বুঝি যে বস্তু তাহার পরিমাণসমেত এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে তাহা হইলেই স্থান ও পরিমাণে প্রভেদ করিতে হয়। কিন্তু পরিমাণসমেত বস্তুর গতি নাই। বস্তুর গতি আছে সত্য, কিন্তু অসীমপ্রসার দেশ স্বীকার করিলে পরিমাণের গতিস্বীকার অসম্ভব। বস্তু দেশ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু যে পরিমাণ দেশাংশবিশেষমাত্র তাহার পক্ষে উহা সম্ভব নহে। ফলতঃ অসীমপ্রসার দেশ স্বীকার করিলে পরিমাণকে কোনও রূপে বস্তুর নিজস্ব ধর্ম বলা যায় না। উহা দেশের অংশবিশেষ, এবং যেহেতু বস্তুর গতিতে পরিমাণের গতি হয় না অতএব উহা বস্তুনিষ্ঠ ধর্ম নহে।

অনেকের ধারণা বস্তু যদি স্বরূপে পরিমাণবিহীন হয় তাহা হইলে তাহার দেশে অবস্থান অসম্ভব। কারণ পরিমাণসমেত পদার্থই দেশে থাকিতে পারে. পরিমাণবিনির্মুক্ত বুদ্ধি বা প্রযত্নের দেশে অবস্থান নাই। কিন্তু দেশে অবর্ত্তমান বস্তু পূর্ব্বে ছিল, পরে তাহা দেশে আসিল এমন কোনও পূর্বাপর ক্রমের কথা এখানে নাই যাহার জন্য এই প্রকার সমস্যা উঠিতে পারে। কতকগুলি পদার্থ প্রথম হইতেই দেশে বর্ত্তমান, কতক-গুলি তাহা নহে—ইহাই আমরা দেখিতে পাই। কেন এইরূপ হইয়াছে তাহার উত্তর নাই। কেন চক্ষুদ্বারা দর্শন ও কর্ণের দ্বারা শ্রবণ হয়, ইহার উত্তর প্রদান ব্রহ্মারও অসাধ্য।

১। পরে দেখান হইবে যে দেশের প্রকৃত অংশ নাই, উহা উপাধির বিভাগ প্রসূত।

পরিমাণহীন বাহ্যবস্তুর কল্পনা অসম্ভব, সত্য। কিন্তু ঐ কল্পনার প্রয়োজন নাই। পরে দেখান হইবে যে স্বরূপতঃ বস্তু অকল্পেয়ই বটে।

মোট কথা এই যে বস্তুনিরপেক্ষ অসীমপ্রসার দেশ কল্পনা করিলে কেবল ইহার বিচারেই স্থান, পরিমাণ ও পারস্পরিক বহিঃসত্তারূপ ত্রিবিধ দেশাকারেরও বিচার হইয়া যাইবে। এখন মূল প্রশ্ন এই—এইপ্রকার অসীমপ্রসার দেশ স্বীকার করিতে হইবে কি না?

দেশের কেবলনিশ্চয়

বস্তুশূন্য দেশ কল্পনা করা যায়। দেশে বর্তমান একটী বস্তু ধীরে ধীরে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল, এবং শুদ্ধ দেশটী পড়িয়া রহিল—এ কল্পনাঅসম্ভব নহে। কোন্ বস্তু স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিলে পরিত্যক্ত দেশাংশটী অটুট থাকে ইহাও আমাদের অতি স্বাভাবিক কল্পনা। তাহা ছাড়া, বস্তুশূন্য দেশের কল্পনা সম্ভব না হইলে জ্যামিতিশাস্ত্রের উদ্ভব কি করিয়া হয়?

কল্পনা করিতে পারিলেই কল্পিত বিষয়টি পদার্থ বা সত্যবিষয় হইবে এমন নহে। খ-পুষ্পের কল্পনা হয়, কিন্তু খ-পুষ্প কোনও পদার্থ নহে। তথাপি একথা মানিতেই হইবে যে খ-পুষ্পের কল্পনায় কোনও নিশ্চয়বোধ নাই, অথচ বস্তুশূন্য দেশের কল্পনায় একপ্রকার নিশ্চয়বোধ রহিয়াছে। উহার যে কোনও অংশের অনন্তবিভাগ হইতে পারে, উহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে, উহাকে ত্রিভুজাকারে কল্পনা করিলে তাহার কোণত্রয় দুই সমকোণের সমান হইবে, দুই সরলরেখা দ্বারা উহাকে বা উহার যে কোনও অংশকে সীমাবদ্ধ করা যায় না—উহার স্বরূপ বিষয়ে এই প্রকারের নানা নিশ্চয়বোধ রহিয়াছে। ফলতঃ সমগ্র জ্যামিতি শাস্ত্রটাই বস্তুবিহীন দেশের স্বরূপবিষয়ে নিশ্চয়বোধ।

দেশবিনির্ম্মুক্ত বস্তুর অস্তিত্ববিষয়ে নিশ্চয়বোধ থাকিলেও তাহার স্বরূপ বিষয়ে কোনও নিশ্চয়বোধ নাই। অর্থাৎ কোন বস্তুর কোন গুণ বা অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেও তাহার ঐ গুণ বা অবস্থা থাকিবেই এমন নিশ্চয়বোধ হয় না। এমন কি ঐ গুণ বা অবস্থা ঐ বস্তুটীতে বাস্তবিক আছে এমন কথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না, কারণ সর্ব্বদাই ভ্রান্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে। অথচ দেশের স্বরূপ বিষয়ে নিশ্চয়বোধ প্রথম হইতেই থাকে। দুই সরলরেখা দ্বারা কোনও দেশাংশ সীমাবদ্ধ করা যায় না—এই বোধের ভ্রান্তির সম্ভাবনাও নাই। কোন কোন স্থলে ভ্রান্তির

সম্ভাবনা ক্রীড়াচ্ছলে কল্পনা করা যায় সত্য ; কিন্তু যে তথ্যে ঐরূপ সম্ভাবনা কল্পনা করি তাহার অর্থ বুঝিলে ঐ কল্পনা নিরর্থক কল্পনামাত্র থাকিয়া যায়, উহাতে আস্থা স্থাপনের প্রসঙ্গও উঠেনা।

আপত্তি হইতে পারে, দেশের স্বরূপ বিষয়ে এই নিশ্চয়বোধে কিছু আসে যায় না, কারণ মিথ্যাভূত স্বপ্নবস্তুর অতিমিথ্যা দেশাংশেও এই প্রকার জ্যামিতিক নিশ্চয় থাকে। কিন্তু এই আপত্তির অবকাশ এখানে নাই। বস্তুশূন্য দেশ সত্যপদার্থ হইবার দাবী করেনা। সত্য না হইলে যে তদ্বিষয়ে নিশ্চয় থাকিবে না, এমন নিয়ম নাই। অসত্য বিষয়ে নিশ্চয় থাকিতে পারে। শশশৃঙ্গ বা মিথ্যাসর্পে কাহারও নিশ্চয় নাই, অথচ বস্তুশূন্য সমগ্র দেশ পদার্থটা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইলেও জ্যামিতি শাস্ত্রে আমাদের নিশ্চয়বোধ অটুট থাকে। এইজন্য মিথ্যা ও সত্যের মধ্যবর্ত্তী নিশ্চয়পদার্থও মানিতে হইবে।

বক্তব্য এই যে বোধ দুই প্রকার—নিশ্চয় ও ভ্রান্তি ; নিশ্চয় আবার দুই প্রকার—সত্যনিশ্চয় ও কেবলনিশ্চয়। সত্যনিশ্চয়ই জ্ঞানপদবাচ্য, কেবলনিশ্চয় জ্ঞান নহে। যে যে স্থলে ধূম থাকে সেই সেই স্থলে বহ্নি থাকে, অদূর পর্বতে ধূম রহিয়াছে, অতএব উহাতে বহ্নি আছে—এই অনুমিতিজ্ঞান সত্যনিশ্চয়বোধ। কিন্তু 'অদূর পর্বতে ধূম আছে' না বলিয়া যদি কেহ বলে 'উহাতে ধূম থাকিলে বহ্নি থাকিত' তাহা হইলে যে অনুমিতিবোধ হয় তাহা কেবলনিশ্চয়বোধ। ইহা সত্যনিশ্চয় বা জ্ঞান নহে, কারণ ঐ পর্বতে ধূম (ও বহ্নি) আছে বা ছিল বা থাকিবে—এইরূপ কোনও বোধ হয় নাই।

অমুক থাকিলে অমুক থাকিত—এই সম্ভাবনার বোধ যে কখনই জ্ঞান হইতে পারেনা তাহা নহে। প্রমাণযোগ্য সম্ভাবনাবোধ জ্ঞান, প্রমাণের অযোগ্য বা মিথ্যাপ্রতিপন্ন সম্ভাবনার বোধ জ্ঞান নহে। পর্বতে ধূমের সম্ভাবনা ও তৎসাধ্য বহ্নির সম্ভাবনাকে হয়ত জ্ঞানই বলিতে হইবে*। কিন্তু যদি কেহ বলে যে পর্বতে সমুদ্র থাকিলে জলকল্লোলধ্বনি শুনা যাইত, অথবা একটী বৃত্ত যদি চতুর্ভুজ হইত তাহা হইলে তাহার কোণগুলি চারি সমকোণের সমান হইত, তাহা হইলে এই সম্ভাবনাত্মক অনুমিতিবোধ নিশ্চয়ই জ্ঞান বলিয়া গৃহীত হইবে না। অথচ ইহা ভ্রান্তিও নহে, কারণ

*তথাপি কেন উহাতে কেবল নিশ্চয়ের দৃষ্টান্তরূপ দেওয়া হইল অল্পক্ষণ পরেই তাহা বুঝা যাইবে।

ইহাতে নিশ্চয়বোধ রহিয়াছে। নিশ্চয়াত্মক হইয়াও ইহা ভ্রান্তি এই কথা বলিলে কেবল ভাষাগত বিরোধ হইবে।

এই কেবলনিশ্চয়াত্মক অনুমিতি ব্যাপ্তির নামান্তর নহে। যদি একটী বৃত্ত চতুর্ভুজ হইত তাহা হইলে তাহার কোণগুলি চারি সমকোণের সমান হইত—এই বোধের অর্থ যদি কেহ এইমাত্র বুঝেন যে যে কোনও চতুর্ভুজের চারিকোণ চারি সমকোণের সমান তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন। কেননা অনুমিতি যেখানে জ্ঞান সে স্থলেও এই কথা বলা যায়; অথচ সেখানে এই কথা বলিতে কেহই প্রস্তুত নহেন। কেহই বলিবেন না যে অনুমিতি ব্যাপ্তিরই নামান্তর।

কেবলনিশ্চয়াত্মক অনুমিতিবোধ অনুমানাকারমাত্রের সত্যনিশ্চয় বা জ্ঞান নহে। উহা হয়ত প্রকৃতপক্ষে অনুমানাকারেরই বোধ, কিন্তু অনুমানাকারের বোধ নিজেই জ্ঞান নহে। কারণ উহা আন্তর প্রত্যক্ষ বা কোনও ব্যাপ্তিবোধ নহে। আন্তরপ্রত্যক্ষ বা ব্যাপ্তিবোধে স্বতঃ নিশ্চয়বোধ নাই—অমুক পদার্থ অমুক প্রকার হইবেই, এমন প্রতীতি হয় না। অথচ অনুমানাকারে তদ্রূপই প্রতীতি থাকে—অনুমানের আকার এই ধরণের হইবেই, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

তর্কশাস্ত্রে অনুমানাকার লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু উহা ইউক্লিডের জ্যামিতি অভ্রান্ত কি না—এই প্রকারের মতভেদ। শুদ্ধবুদ্ধি লইয়া নানাপ্রকার কলাকৌশল দেখান যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে শুদ্ধবুদ্ধির কোনও প্রকার বিশেষই একাধিপত্য লাভ করিতে পারেনা, প্রতি প্রকারই অভ্রান্ত থাকিয়া যায়। শুদ্ধবুদ্ধির একটী প্রকার অন্য একটী প্রকারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারে না, কেননা শুদ্ধবুদ্ধির রাজ্যে সত্যমিথ্যার কথাই নাই। বুদ্ধিদ্বারা কেবল প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থেরই মিথ্যাত্ব নিরূপণ করা যায়। যেখানে অরাতিই নাই সেখানে অরাতি নিধনের প্রসঙ্গ নাই।

ব্যাপ্তিজ্ঞানে বা প্রত্যক্ষে স্বতঃনিশ্চয় নাই—একথা অনেকেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু তাঁহাদের মূলকথা এই যে কোনও জ্ঞানেই চরমনিশ্চয় নাই। অথচ ইহা ভুল কথা। বহু প্রতীতিতেই চরম নিশ্চয় আছে; গণিত ও তর্কশাস্ত্র তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। তাহা ছাড়া, সমান সমান বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টিদ্বয় পরস্পর সমান হইবে, ইত্যাদি সর্বজনস্বীকৃত স্বতঃসিদ্ধগুলিতেও চরম নিশ্চয় রহিয়াছে।

কেবলনিশ্চয়ের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকার বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ফলতঃ নিশ্চয়াত্মক যে কোন সম্ভাবনাবোধ

স্বরূপতঃ কেবলনিশ্চয়বোধ। প্রত্যক্ষযোগ্যত্বের অতিরিক্ত প্রমাণ থাকিলেই তাহা সত্যনিশ্চয় বা জ্ঞানপদবী লাভ করে।*

কেবলনিশ্চয়ে মিথ্যাত্বের অবকাশই নাই, সত্যনিশ্চয়ে তাহা আছে। কেবলনিশ্চয়ের ইংরাজী নাম apriori certitude. বস্তুশূন্য দেশের বোধ একপ্রকার কেবলনিশ্চয়। দেশের জ্ঞান বা সত্যনিশ্চয় তখনই হয় যখন তাহাকে বস্তুর সহিত সম্বলিত করিয়া বুঝি, অর্থাৎ যখন তাহাকে বস্তুর স্থান, পরিমাণ বা দুই বস্তুর পারস্পরিক বহিঃসত্তারূপে দেখি। বস্তুনিষ্ঠ দেশই সত্য, বস্তুনিরপেক্ষ দেশ কেবলনিশ্চয়রূপে অবশ্যস্বীকার্য।

যাবতীয় কেবলনিশ্চয় একজাতীয় নহে। পরোক্ষ ও অপরোক্ষরূপে কেবলনিশ্চয় দুই প্রকার। উপরে যে কেবলনিশ্চয়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহা পরোক্ষ, উহার ইংরাজী নাম apriori thought. অপরোক্ষ কেবলনিশ্চয়ের নাম apriori intuition. দেশ অপরোক্ষ কেবলনিশ্চয়ের বিষয়। পরোক্ষ কেবলনিশ্চয়ের অন্য একটা উদাহরণ 'কার্য্য থাকিলেই কারণ থাকিবে' এই বোধ।

দেশ অপরোক্ষ, কারণ উহা জাতি নহে, দেশীয় বস্তু হইতে বিশ্লিষ্ট (abstracted) কল্পেয়ও নহে। জাতি বা বিশ্লিষ্ট কল্পেয়ই পরোক্ষ। দেশ যে তাহা নহে ইহা পরে দেখান হইবে। জাতি যে পরোক্ষ তদ্বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু জাতিবোধে আমাদের পুরোবর্তী ও অপুরোবর্তী একাধিক পদার্থের একপ্রকার সমকালীন বোধমাত্র হয়, এবং যেহেতু ঐ বোধের বিষয় অপুরোবর্তী পদার্থও হইতে পারে সেইজন্য জাতিবোধকে পরোক্ষ বলিয়া ধরা হইয়াছে।

বস্তুনিরপেক্ষ দেশ যে কেবলনিশ্চয়ের বিষয় তাহা বুঝাইবার জন্য একটা সহজ যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। "আমার সম্মুখে বস্তুশূন্য দেশ বর্তমান'—এখানে এই বর্তমানতা যে জাতীয় পদার্থ, "বস্তুশূন্য দেশে বৃত্তচতুর্ভুজাদি বর্তমান," এই বর্তমানতাও অবিকল সেইজাতীয় পদার্থ। এই দ্বিতীয় বর্তমানতাটী কিন্তু অস্তিত্ববাচক নহে, মসীলিখিত বৃত্ত-চতুর্ভুজাদির বর্তমানতাই অস্তিত্ববাচক, কেন না অঙ্কিত হইবার পূর্বে তাহারা ছিল না, অর্থাৎ তাহারা অস্তিত্বলাভ করে নাই—এই বোধ সর্বজনস্বীকৃত। অতএব বস্তুশূন্য দেশের বৃত্তচতুর্ভুজাদি অস্তিত্ববান না হইয়াও বর্তমান; উহারা যে বস্তুশূন্য দেশে নাই, এমন কথা বলা যায়

---

*জ্ঞান বা সত্য নিশ্চয়ও একপ্রকার নিশ্চয়বোধ। নিরর্থক সম্ভাবনাশঙ্কার (empty possibility) অপেক্ষায় উহাতে নিশ্চয় আছে। কেবলনিশ্চয়বোধের নিশ্চয় কিন্তু একান্ত (absolute), আপেক্ষিক (relative) নহে।

নাই। সেইজন্যই বলিতে হইবে যে ঐ বৃত্তচতুর্ভুজাদি অবশ্যস্বীকার্যমাত্র, যদিও সত্যবস্তু নহে। ইহারই অর্থ এই যে উহাদের বোধ জ্ঞান নহে, কেবলনিশ্চয় মাত্র। অতএব দেশও কেবলনিশ্চয়ের বিষয়। পদার্থতঃ, বস্তুশূন্য দেশ ও ঐ বৃত্তচতুর্ভুজাদি এক জাতীয়, দেশ ঐ বৃত্তচতুর্ভুজাদির একপ্রকার সমষ্টিমাত্র।

দেশ ধর্ম্মনিরূপণ

জ্যামিতিক বাক্যের বোধই বস্তুবিহীন দেশের বোধ—এই কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু অনেকের মতে জ্যামিতিশাস্ত্রের উপপত্তির জন্য বস্তুশূন্য দেশের নূতন রকমের বোধ স্বীকার নিস্প্রয়োজন, কেন না তাঁহাদের মতে জ্যামিতিশাস্ত্র কতকগুলি ব্যাপ্তি ও ব্যাপ্তিসাপেক্ষ কতকগুলি অনুমানের সমষ্টিমাত্র।

এই মত কিন্তু ভ্রান্ত। জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রতিবাক্যেই মিথ্যাত্বের অবকাশলেশবিহীন যে অবশ্যস্বীকৃত্বের বোধ রহিয়াছে তাহা কোনও ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্তিসাপেক্ষ অনুমানে নাই। তাহা ছাড়া, বস্তুশূন্য দেশের বোধ হইতে অবশ্যস্বীকার্য হউক বা না হউক একপ্রকার শাস্ত্রের উদ্ভব সম্ভব, কিন্তু দেশবিহীন বস্তুর বোধ হইতে কোনও শাস্ত্রেরই উদ্ভব সম্ভব নহে।

যে দেশের বোধ হইতে জ্যামিতিশাস্ত্রের উদ্ভব তাহা দেশজাতি নহে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে জ্যামিতিকে কয়েকটী ব্যাপ্তিবাক্যমাত্র বলা যাইত। ব্যাপ্তিপ্রত্যক্ষে জাতির প্রত্যক্ষ হইলে সেই জাতি যে তজ্জাতীয় যাবদ্ব্যক্তিসমবেত, এই বোধটী অবশ্যস্বীকার্য বলিয়াই জ্যামিতিবাক্যগুলি অবশ্যস্বীকার্য হইত। কিন্তু জ্যামিতিবাক্যাবলীর যে অবশ্যস্বীকৃত্বের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহা দ্বারা এই বাক্যাবলীর যাবদ্দেশব্যক্তিতে প্রয়োগ বুঝা হয় নাই। জ্যামিতিবাক্যে কেবলনিশ্চয় বোধ ছাড়াও সত্যনিশ্চয়বোধের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে। সেই প্রসঙ্গেই এই সমস্ত প্রয়োগের কথা আসিতে পারে, অন্যথা নহে।

দ্বিতীয়তঃ দেশ যে জাতি নহে তাহা অন্যভাবেও উপপন্ন হয়। যে কোন গো-ব্যক্তির প্রত্যক্ষে গো-জাতির প্রত্যক্ষ যেভাবে হয় যাবতীয় দেশীয় পদার্থের প্রত্যক্ষে তদনুগত দেশজাতির প্রত্যক্ষ সে ভাবে হয় না কেন না অন্য কোন স্থলেই জাতিকে একান্তরূপে ব্যক্তিবিচ্যুত বলিয়া বুঝা যায় না, অথচ দেশ স্বরূপতঃ ব্যক্তিবিচ্যুত, এই প্রকার বোধ রহিয়াছে।

দেশকে জাতি বলিলে উহা যদনুগত জাতি সেই সমস্ত ব্যক্তি যে দেশীয় বস্তু হইবে এমন কথা সকলে না মানিতেও পারেন; সুতরাং দেশের

সহিত দেশীয় বস্তুর সম্পর্কবিচার এস্থলে হয়ত নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু দেশব্যক্তি বলিতে দেশীয় বস্তু না বুঝিয়া খণ্ড খণ্ড দেশ বুঝিলেও দেশকে জাতি বলা যায় না। সর্বস্থলেই জাতির প্রত্যক্ষে তৎসমবায়ী যাবদ্ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অলৌকিকই হইয়া থাকে; অন্ততঃ জাতির প্রত্যক্ষে যে ভাবে হয় যাবদ্ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সেইভাবে হয় না। কিন্তু যাহাকে দেশজাতি বলা হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ যে ভাবে হয় যাবদ্দেশখণ্ডের প্রত্যক্ষও অবিকল সেই ভাবে হয়। অতএব দেশ জাতি নহে।

সত্য বটে দেশখণ্ডকে পরিচ্ছিন্ন কিন্তু দেশজাতিরূপে কথিত পদার্থকে অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া সকলেই বুঝে। কিন্তু দেশখণ্ডের প্রতীয়মান পরিচ্ছিন্নত্ব প্রকৃতপক্ষে তদাশ্রিত বস্তুরই পরিচ্ছিন্নত্ব। অন্ততঃ লাঘবের খাতিরে দেশখণ্ডের পরিচ্ছিন্নত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা ছাড়া, যেখানে পরিচ্ছিন্নকে অপরিচ্ছিন্নের অংশরূপে পাওয়া যায় সেখানে আর অপরিচ্ছন্নকে জাতি ও পরিচ্ছিন্নকে ব্যক্তি বলা যায় না। সেখানে অপরিচ্ছিন্নটী অবয়বী ও পরিচ্ছিন্নটী অবয়ব; অর্থাৎ দুইই ব্যক্তি, কোনটীই জাতি নহে।

তাহা ছাড়া, প্রকৃতপক্ষে পরিচ্ছিন্ন দেশ বলিয়া পদার্থই নাই। সত্য বটে পরিচ্ছিন্ন দেশকে আমরা অপরিচ্ছিন্ন দেশের অংশরূপে পাই। কিন্তু এই অংশবোধ একেবারে নূতন ধরণের। সচরাচর অংশবোধে অসীমপ্রসার অবয়বীর বোধ থাকে না, হয়ত অবয়বীরই বোধ থাকে না। এখানে কিন্তু তাহা রহিয়াছে। যে কোন পরিচ্ছিন্ন দেশের অনুভবে তাহাকে এক বৃহত্তর দেশের অংশ বলিয়া অনুভব করি, সুতরাং ঐ বৃহত্তর দেশটীকেও আরও বৃহত্তর দেশের অংশ বলিয়া বুঝি, ঐ আরও বৃহত্তর দেশটীর বেলায়ও সেই একই কথা। অর্থাৎ, সহজ কথায়, যে কোন দেশের অনুভবে অসীমপ্রসার দেশের অনুভব হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে অন্যান্যস্থলে অবয়বের পরিমাণবোধে অবয়বীর পরিমাণ-বোধের অপেক্ষা না থাকিলেও এখানে অসীমপ্রসার দেশের বোধ হইতেই খণ্ডদেশের বোধ হয়—বৃহত্তর দেশের অংশ বলিয়া না বুঝিলে খণ্ডদেশের অনুভবই হয় না। অন্যান্য স্থলে অবয়বকে অবয়ব বলিয়া বুঝিলে তবেই অবয়বীর কথা আসে; কিন্তু অবয়বীর কথা না তুলিয়াও স্বরূপে অবয়বের বোধ হইতে পারে। অথচ যে কোন দেশের বেলায় প্রথম হইতেই তাহাকে বৃহত্তর দেশের অংশ বলিয়া বুঝিতে হয়। সুতরাং অন্ততঃ সাধারণ অর্থে দেশের অংশ বা অবয়ব নাই। অংশের যে বোধ হয় লাঘবের খাতিরে তাহাকে অপরিচ্ছেন্ত দেশে বস্তুরূপ উপাধিকৃত উপাধিক পরি-চ্ছেদ বলিলেই চলে।

অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে যখন দেশকে সর্বদাই বস্তুনিষ্ঠ বলিয়া পাই, বস্তুনিরপেক্ষ দেশ যখন কোনও স্থলে পাইনা তখন ঐ প্রকার দেশের কল্পনা বিশ্লিষ্ট পদার্থের কল্পনামাত্র; অতএব উহা লইয়া নূতন নূতন কথা বলিবার প্রয়াস ব্যর্থ: অন্ততঃ উহাতে অজ্ঞানীভূত কেবলনিশ্চয় রহিয়াছে এজাতীয় অদ্ভুত কথা না বলিয়া জ্ঞানাঙ্গ কল্পনামাত্র রহিয়াছে বলা উচিত। যদি কেহ বলেন যে দুই বস্তুর মধ্যবর্ত্তী শূন্যদেশ ত অনুভূত হয় তাহা হইলে তাঁহারা বলিবেন যে উহা আলোকনিষ্ঠ দেশ, অথবা অতি সূক্ষ্ম বস্তুসমূহের দেশ। যদি কেহ বলেন যে ঘনান্ধকারে কোনও বস্তুর অনুভব না হওয়া সত্ত্বেও প্রসারিত দেশের অনুভব হয় তাহা হইলে তাঁহারা হয়ত উত্তর দিবেন যে উহা অন্ধকাররূপ পদার্থের বিস্তারমাত্র।

অন্ধকার দ্রব্য অথবা অভাবমাত্র এ আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়াও দেখান যাইতে পারে যে বস্তুশূন্য দেশের বোধ বিশ্লিষ্ট পদার্থের কল্পনামাত্র নহে। গুণ কর্ম বা জাতির বোধ এতাদৃশ কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু দেশের বোধ এরূপ নহে। দ্রব্যনিষ্ঠ নহে এ প্রকার গুণ কর্ম্ম বা জাতির বোধ হয় না। দ্রব্যনিষ্ঠ বলিয়াই তাহাদের পাইয়াছি, ইহাই একমাত্র কারণ নহে; প্রকৃত কারণ এই যে দ্রব্যনিরপেক্ষ রূপে তাহাদের ভাবাই যায় না দেশকে কিন্তু দ্রব্যনিরপেক্ষরূপে ভাবা যায়। একদেশ হইতে সরিয়া একটি বস্তু অন্যদেশে চলিয়া গেল, এবং পরিত্যক্ত দেশটা পড়িয়া রহিল ইহা আমরা প্রতিক্ষণেই ভাবি। অতএব দেশ গুণকর্ম্মসামান্যের ন্যায় বিশ্লিষ্ট পদার্থ নহে এবং ইহার বোধ বিশ্লিষ্টের কল্পনামাত্র নহে।

গুণকর্ম্মসামান্যকে দ্রব্যভিন্ন বা দ্রব্যেতর বলিয়া ভাবি, দেশকেও দ্রব্যেতর বলিয়া ভাবি। কিন্তু গুণকর্ম্মসামান্য দ্রব্য হইতে অভিন্ন বলিয়াও প্রতীতি থাকে—দ্রব্যের সহিত তাহারা অযুতসিদ্ধি সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। অথচ দেশের বেলায় এপ্রকার অযুতসিদ্ধির প্রতীতি নাই। বরং প্রতীতি হয় দ্রব্য দেশের সহিত অযুতসিদ্ধ। অতএব দেশকে সমবায়সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ বলিবার হেতু নাই। দেশ বস্তুসমবেত নহে, এবং বস্তুযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বস্তুনিরপেক্ষ ভাবে তাহার অপরোক্ষ প্রতীতি হয়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে দেশ বস্তুনিরপেক্ষ পদার্থ। অথচ এতাদৃশ দেশের জ্ঞান বা সত্যনিশ্চয় আমাদের নাই।

বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত হয় যে গুণকর্মসামান্য দ্রব্যের সহিত অযুত-সিদ্ধ, দ্রব্য কিন্তু উহাদের সহিত অযুতসিদ্ধ নহে, অথচ দ্রব্যের জ্ঞান হয়। সুতরাং বস্তু যাহার সহিত অযুতসিদ্ধ তাদৃশ দেশের জ্ঞান হইবেনা কেন? উত্তর এই যে এতাদৃশ দ্রব্যের স্বরূপতঃ জ্ঞান হয় ইহা স্বীকার করিয়া

বৈশেষিক অন্যায় করিয়াছেন। দুই বস্তুর একটী অন্যটীর সহিত অযুত-সিদ্ধ হইলে কোনটাকেই স্বরূপতঃ জানা যায় না—দুইটাকেই এক পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হয়। 'দুই' বলাতে তাহারা যে পৃথক্ একথাও নিশ্চিত। এই যুগপৎ পৃথক্ত্ব ও অপৃথক্ত্বের একমাত্র সমন্বয় এই যে জ্ঞানরাজ্যে তাহারা অপৃথক্ এবং তাহাদের পৃথক্ত্বের বোধ জ্ঞান নহে, কেবলনিশ্চয়। অতএব বস্তুনিরপেক্ষ দেশের বোধ জ্ঞান নহে, কেবলনিশ্চয়।

দেশ আমাসাপেক্ষ

ইংরাজীতে যাহাকে space বলে তদ্দ্বারা বস্তুর স্থান, পরিমাণ; দুই বস্তুর পারস্পরিক বহিঃসত্তা ও অসীমপ্রসার দেশ—ইহা ত অভিপ্রেত হয়ই, তদুপরি আরও অভিপ্রেত হয় যে অসীমপ্রসার দেশ ও তদ্বর্ত্তী যাবদ্বস্তু আমার বাহিরে অবস্থিত। এখন এই আমাবহিঃসত্ত্বের প্রকৃত অর্থ কি?

জগতের একটী পদার্থ অপর একটী পদার্থের বাহিরে ও সমগ্র জগৎটাই আমার বাহিরে—এই দুই 'বাহিরে' শব্দ একার্থবাচক নহে। জগতের অন্তর্গত দুই পদার্থের বহিঃসত্তা পারস্পরিক বা উভয়মুখী—ক খএর বাহিরে বলিলে স্বতঃই মনে হয় খ ও কএর বাহিরে। জগতের বহিঃসত্তা কিন্তু একমুখী। জগৎ আমার বাহিরে বলিলে আমিও যে জগতের বাহিরে, এমন কথার সূচনা নাই।

জগতের অন্তর্গত দুই বস্তুর বহিঃসত্তা উভয়মুখী এইজন্য যে যে দেশে তাহারা অবস্থিত তাহা বিস্তৃত। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে দেশের বিস্তৃতত্ব ও জাগতিক দুই বস্তুর পারস্পরিক বহিঃসত্তা একই পদার্থ। আমি কিন্তু অসীমপ্রসার দেশের বাহিরে বা ভিতরে অবস্থিত নহি; সেই জন্য দেশ ও আমার মধ্যে পারস্পরিক বহিঃসত্তার কথা নাই। 'আমি' শব্দের দ্বারা এখানে আমার দেহ অভিপ্রেত নহে, কারণ আমার দেহও আমার বাহিরে অবস্থিত।

জগৎ আমার বাহিরে, কিন্তু আমি জগতের বাহিরে নাই ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে যাবতীয় জাগতিক পদার্থ যে অসীমপ্রসার দেশে বিদ্যমান আমার সত্তাকে উপেক্ষা করিলে তাহার পদার্থত্বই থাকে না। দেশ যদি আমানিরপেক্ষ হইত তাহা হইলে সাধারণ বহিঃসত্তার ন্যায় জগতের বহিঃসত্তাও উভয়মুখী হইত; অর্থাৎ জগৎ আমার বাহিরে বলিতে আমাকেও জগতের বাহিরে বুঝা যাইত।

জগৎ আমার বাহিরে, কিন্তু আমি জগতের বাহিরে নাই - এই অদ্ভুত বোধের একমাত্র উপপত্তি এই যে এই বহিঃসত্তা আমানির্মাণ, অর্থাৎ আমারই বিষয়গ্রহণের এক ভঙ্গীবিশেষ। এই ভঙ্গী আমার খেয়ালপ্রসূত নহে, কেননা তাদৃশ বোধ আমার নাই অতএব জগতের বহিস্ত্ব খেয়াল-প্রসূত নহে অথচ এক আধ্যাত্মিক ভঙ্গীবিশেষ। জগজতের বহিস্ত্ব শব্দের অর্থ দেশে বিদ্যমানতা, এবং দেশের বহিস্ত্ব তাহার স্বরূপ। অতএব দেশ স্বরূপে এক আধ্যাত্মিক ভঙ্গীবিশেষ।

দেশ যে আমানির্মাণ তাহা বুঝাইবার জন্য আরও অনেক যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। আমার বহিঃস্থ কোন বস্তুকে আমরা 'ঐ বস্তু' বলিয়া বুঝি। 'ঐ' শব্দটীর অর্থ হইল কোন এক পূর্বনির্দিষ্ট বস্তু হইতে বর্তমানে জ্ঞাত বস্তুটীর স্থাননির্দেশ। কিন্তু কোন্ পূর্বনির্দিষ্ট বস্তু হইতে ? যাহাই উল্লেখ করা যাইবে তাহাও একটী 'ঐ বস্তু,' অর্থাৎ তাহারও স্থাননির্দেশ পূর্বতরনির্দিষ্ট বস্ত্বন্তর হইতে করা হইয়াছে। আবার সেই পূর্ব্বতরনির্দিষ্ট বস্তুটীর বেলায় সেই একই কথা বলিতে হইবে। অতএব প্রথমতমনির্দিষ্ট বস্তুর অন্বেষণ প্রয়োজন। উহা আমার দেহের বহিরাবরণস্থ অথবা দেহাভ্যন্তরস্থ কোনও বিন্দু নহে, কেন না তাহারও বিশেষণরূপে 'ঐ' শব্দটী ব্যবহার করিতে হইবে। অথচ দেহের যত অভ্যন্তরে যাই ততই যেন বোধ হয় সেই প্রথমতমনির্দিষ্ট পদার্থটীর দিকে অগ্রসর হইতেছি। ইহা হইতেই সূচনা পাই যে আত্মাই সেই প্রথমতম পদার্থ, আত্মা হইতে নির্দেশই বহিঃসত্ত্বের বা দেশের বোধ। অতএব দেশ আত্মনির্মাণ।

তৃতীয় প্রমাণ। যে কোন বাহ্যপদার্থের প্রত্যক্ষকালে আমার প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ঐ পদার্থের আকারগ্রহণ করে। জ্ঞানের যে ঐ প্রকার আকার গ্রহণ হয় তাহার প্রমাণ রক্তবর্ণের প্রত্যক্ষ শ্যামবর্ণের প্রত্যক্ষ হইতে ভিন্ন; এবং যে অবচ্ছেদে এই দুই প্রত্যক্ষ ভিন্ন তাহারই নাম আকার। এখন কোন্ জ্ঞানের কি আকার হইয়াছে তাহা জানা যায় অনুব্যবসায় দ্বারা। অথচ কোন অনুব্যবসায়েই বিষয়ের রক্তাকার ব্যতীত জ্ঞানের রক্তাকার জানা যায় না। বাহ্য প্রত্যক্ষের অনুব্যবসায় হয় না, অথবা বাহ্যপ্রত্যক্ষে জ্ঞানের আকার হয়না, এমন কথা বলা যায় না। প্রত্যক্ষের যে অনুব্যবসায় হয় তাহার প্রমাণ "আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি" এই সর্ব্ববাদিসম্মত বোধ; জ্ঞানের যে আকার হয় তাহার প্রমাণ রক্তবর্ণের জ্ঞান শ্যামবর্ণের জ্ঞান হইতে ভিন্ন; এবং বিষয়বস্তু ছাড়া প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়া একটী পদার্থ আছে তাহার প্রমাণ এই যে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ব্যাবৃত্ত করিলে প্রত্যক্ষ-

জ্ঞান বলিয়া কিছু একটার অভাব অনুভূত হয়, সে জ্ঞান বিষয় পদার্থের মত জড়ই হউক অথবা স্বয়ংপ্রকাশ হউক না কেন।

এখন অনুব্যবসায় দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞানের রক্তকার জানা যায় না—ইহার অর্থ এই যে অনুব্যবসায়রূপ জ্ঞানের দ্বারা যে রক্তবর্ণ গৃহীত হয় তাহা বহিঃস্থ পুষ্পেরই রক্তবর্ণ। অথচ জ্ঞানের যে রক্তাকার হইয়াছে ইহাও স্থির। অতএব বলিতে হইবে, যে রবক্তবর্ণকে সচরাচর বহিঃস্থ পুষ্পেরই আকার বলা হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষজ্ঞানেরই আকার। ইহার অর্থ এমন নহে যে ঐ রক্তবর্ণ আমার কৃতিসাধ্য। একটা কিছু আমার নিকট দেওয়া আছে ইহা সুনিশ্চিত, কেননা বোধই তাহার প্রমাণ। অথচ ঐ একটা কিছু নিজেই যে রক্তবর্ণ এমন কথা বলিবার অধিকার নাই, কেননা প্রমাণিত হইয়াছে, যে রক্তবর্ণ আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা প্রত্যক্ষজ্ঞানেরই আকার, উহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন রক্তবর্ণ প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়া বোধ থাকে না।

রক্তবর্ণটী আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই আকার, অথচ উহা বহিঃস্থ, ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়? হয় বলিতে হইবে যে 'বহিঃস্থ' শব্দের অর্থ আমা-নিরপেক্ষ দেশে বর্তমানতা, না হয় বলিতে হইবে কোনও একটা জ্ঞান-নিরপেক্ষ পদার্থ আমাসাপেক্ষ দেশে প্রকাশমান হওয়ার জন্য রক্তাকার গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু প্রথম কল্পটী অসঙ্গত; কেননা ঐ মতে বলিতে হইবে যে আমাসাপেক্ষ রক্তবর্ণ 'আমি'রূপ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, অথচ তাহা হইলে ঐ রক্তবর্ণের পশ্চাতে আমানিরপেক্ষ কিছু একটা পদার্থ দেওয়া আছে—এই বোধের সম্যক্ উপপত্তি হয় না। অতএব দ্বিতীয় পক্ষটী অবলম্বন করিয়া বলিতে হইবে যে আমাসাপেক্ষ দেশে আমানিরপেক্ষ কিছু একটা পদার্থ আত্মপ্রকাশ করায় আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান 'বহিঃস্থ রক্তবর্ণ' এই আকার গ্রহণ করিয়াছে। মোট কথা, 'আমাসাপেক্ষ রক্তবর্ণ বহিঃস্থ' ইহার অর্থ ঐ বহিঃস্থত্বও আমাসাপেক্ষ (অর্থাৎ দেশ আমাসাপেক্ষ); দেশ আমানিরপেক্ষ হইলে আমাসাপেক্ষ রক্তবর্ণ কিরূপে বহিঃস্থ হইল বুঝা যায় না।

জ্ঞানাকার ও বিষয়াকারের সাদৃশ্যই জ্ঞানের প্রামাণ্যনিশ্চায়ক, এ কথা আর বলা যায় না, কারণ বহিঃপ্রত্যক্ষকালে জ্ঞানাকার ও বিষয়াকারে কোনও বিভেদ, এমন কি সংখ্যাগত বিভেদও নাই, যেহেতু অনুব্যবসায়ে দুইটী আকার পাওয়া যায় না।

চতুর্থ প্রমাণ। দেশবিহীন কোন দ্রব্য বা গুণ কল্পনাই করা যায় না, অথচ দ্রব্যগুণাদিব্যতিরিক্ত দেশ কল্পনা করা যায়। সুতরাং বলা যাইতে

পারে, যে যে দ্রব্যগুণাদি প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাদের স্বরূপ আমি জানিনা, যাহা জানি তাহা দেশমণ্ডিত। এমন কথা বলা যায় না যে কূটস্থ দ্রব্যগুণাদি স্বরূপেই জ্ঞাত হইতেছে এবং দেশের সহিত তাহাদের সম্পর্ক অবান্তর। বলা যায় না এইজন্য যে দেশবিহীন দ্রব্যগুণাদি অকল্পনীয়। অতএব দাঁড়ায় এই যে যাহাকে প্রথমে আমানিরপেক্ষ বিষয়বস্তু মনে করিয়াছিলাম স্বরূপতঃ তাহার কিছুই জানিনা, জানি কেবল কতকগুলি গুণের দৈশিক সম্পর্ক ; আমানিরপেক্ষ বস্তুই ঐ সম্পর্কাবলীর আধারস্বরূপ দেশে আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রত্যক্ষগুণরূপ আকার পাইয়াছে। অতএব আমানিরপেক্ষ বিষয়বস্তু কিছু না থাকায় যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাকে আমাসাপেক্ষই বলিতে হইবে। এখন প্রত্যক্ষগুণাবলী আমাসাপেক্ষ, ইহার অর্থ এই যে উহাদের দেশ আমাসাপেক্ষ একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

পঞ্চম প্রমাণ। আমার দক্ষিণ হস্তখানি একখানি দর্পণের সম্মুখে ধরিলে উহাকেই বামহস্তরূপে দেখি। যেহেতু উহাকেই বামহস্তরূপে দেখি—এইরূপ প্রতীতি হয়, অতএব বলিতে হইবে যে দক্ষিণ ও বামের প্রভেদ, অর্থাৎ দেশগত প্রভেদ, বস্তুর স্বরূপ নহে। যদি হইত তাহা হইলে উহাকেই বামহস্তরূপে দেখিতেছি, এই ঐক্যবোধ হইত না।

ষষ্ঠ প্রমাণ। দেশের অপরোক্ষ প্রতীতি ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে, এবং যাহার অপরোক্ষ প্রতীতি ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে তাহাকে আমানিরপেক্ষ বিষয় বলা যায় না, কারণ আমানিরপেক্ষ যাবৎ পদার্থের অপরোক্ষ প্রতীতি ইন্দ্রিয়-লভ্যই হইতে পারে। দেশের যে ঐন্দ্রিয়বোধ হয় না তাহার প্রমাণ এই যে ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হইতে হইলেই তদেগাচর বস্তুটী দেশীয় (বহিঃস্থ ও মধ্যমপরিমাণযুক্ত) হইতে হইবেই ; অতএব দেশীয়ত্ব বস্তুপ্রত্যক্ষের কারণ ; প্রত্যক্ষের কারণ নিজে কিরূপে প্রত্যক্ষ হইবে ? যদি কেহ তুল্য যুক্তিতে রূপকে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ না বলেন, যেহেতু বস্তুর রূপ তাহার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের কারণ, তাহা হইলে আমরা বলিব যে দেশের বেলায় বিশেষ কথা আছে—রূপকে দ্রব্যবিহীন বলিয়া ভাবাই যায় না, কিন্তু বস্তুর দেশকে বস্তুবিহীন বলিয়া ভাবা যায়, এবং দেশীয় বস্তুর প্রত্যক্ষে তৎসহচারী দেশকে আমরা ঐরূপ নিরপেক্ষভাবেই অনুভব করি। দেশের অনুভূতি যদি বস্তুর অনুভূতি ব্যতীত কিছুতেই সম্ভবপর না হইত তাহা হইলে দেশ ও রূপ এক পর্য্যায়ভুক্ত হইত। কিন্তু দেশের এই বিশেষত্বের জন্যই তাহাকে রূপাদি হইতে পৃথক্ করিয়া ইন্দ্রিয়গোচর নহে বলিতে আমরা বাধ্য। একথার আলোচনা পূর্বেই হইয়াছে।

দেশের অপরোক্ষানুভূতি ইন্দ্রিয়লভ্য নহে বলিয়াই দেশ আমাসাপেক্ষ, কারণ যাহার অপরোক্ষানুভূতি ইন্দ্রিয়লভ্য নহে অথচ যাহা আমানিরপেক্ষ, এমন দৃষ্টান্ত নাই। দেশকেই বা তৎসদৃশ কোন পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে ধরা যায় না, কেন না উহারাই সন্দিগ্ধক্ষেত্র। তাহা ছাড়া, এই প্রকার পদার্থ মানিলে ইন্দ্রিয়সম্পর্কাতিরিক্ত অন্য এক প্রকার অপরোক্ষানুভূতি মানিতে হয়, অথচ এই প্রকার নূতন অনুভূতি স্বীকার না করিয়া দেশকে আমাসাপেক্ষ বলিলে নূতন কোনও পদার্থ মানা হয় না; অতএব অন্ততঃ লাঘবের খাতিরে দেশকে আমাসাপেক্ষ বলা উচিত।

সপ্তম প্রমাণ। দেশ কেবলনিশ্চয়ের বিষয়, ইহা দেখাইবার সময় বলা হইয়াছে যে মসীদ্বারা অলিখিত বৃত্তচতুর্ভুজাদি শূন্যদেশে রহিয়াছে—এই 'রহিয়াছে' শব্দটী অস্তিত্ববাচক নহে। অস্তিত্ববান নহে অথচ রহিয়াছে —ইহার অর্থ কি ইহাই নহে যে মানসিক একপ্রকার কল্পনায় সৃষ্ট (অঙ্কিত) হইলেই উহারা বিদ্যমান হয়? অতএব উহারা, এবং সেইজন্য সমগ্র দেশ পদার্থটী, আমাসাপেক্ষ।

বস্তুতঃ কেবলনিশ্চয়ের বিষয়মাত্রই আমাসাপেক্ষ। যাহা সত্যবস্তু হইতে পৃথকরূপে কখনও জ্ঞাত হয় না, অথচ যাহার নিরপেক্ষস্বরূপ বিষয়ে একপ্রকার বোধ রহিয়াছে তাহাই কেবলনিশ্চয়ের বিষয়। এইপ্রকার ভেদাভেদ উপপাদন করিতে কেহ বলিয়াছেন ভেদাভেদেই চরম সত্য, কেহবা ভেদাভেদের ক্ষেত্রমাত্রেই অনির্বাচ্যত্ব দেখেন, কেহবা সমবায় স্বীকার করিয়া ঐ সমবায়ের সহিত সমবেতের সম্বন্ধকে সমবেতের স্বরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু ভেদাভেদ স্ববিরুদ্ধ বলিয়া উহা কিছুতেই চরম সত্য হইতে পারে না, অথচ উহার উপপাদন হয় না বলিয়া ভেদাভেদ সম্পর্কযুক্ত পদার্থ আনির্বাচ্য, অতএব মিথ্যা -এই কথা এখনই বলা যায় না, কেননা ঐ বিরোধের সমাধান অসম্ভব নহে। আর সমবায় স্বীকার করিয়া ঐ সমবায়ের সহিত সমবেতের সম্বন্ধনিরূপণকালে ঐ সম্বন্ধান্তরটিকে প্রকৃতপক্ষে সমবেতের স্বরূপ বলিলেও উপপত্তির হৃদয়ঙ্গমতা কিছু বাড়ে না। এমন কথা বলিলে ক্ষতি কি যে জ্ঞানরাজ্যে উহারা অভিন্ন, কিন্তু উহাদের ভেদ জ্ঞানাতীত কেবলনিশ্চয়ের বিষয়? এখন, কেবলনিশ্চয়ের বিষয়কে জ্ঞানবিষয়ের মত আমানিরপেক্ষ বলিলে এই দুই বিষয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। অথচ তাহা অসম্ভব। অতএব, বিশেষতঃ জ্ঞানের বিষয় যে আমানিরপেক্ষ এই বিষয়ে সর্ব্বজনস্বীকৃত অনুভূতি রহিয়াছে বলিয়া, কেবলনিশ্চয়ের বিষয়কে আমাসাপেক্ষ বা

আমানির্মাণ বলিতে হইবে। তাহাছাড়া, কেবলনিশ্চয়ের বিষয় যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া আমাসাপেক্ষ, ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

উপসংহার

দেশ আমাসাপেক্ষ, ইহার অর্থ এমন নহে যে সত্তাহিসাবে আমি ও দেশ উভয়েই উভয়ের অপেক্ষা রাখি। অসীমপ্রসার দেশ আমাসাপেক্ষ হইলেও আমি ঐ দেশসাপেক্ষ নহি। আমিত্বের বোধে দেশবোধের অপেক্ষা নাই। দেশ আমাসাপেক্ষ, ইহার অর্থ এই যে একভাবে আমি দেশের স্রষ্টা। কিন্তু এই সৃষ্টি কালিক নহে, কেননা প্রথমে আমি ছিলাম, পরে দেশ সৃষ্টি করিলাম, এই পূর্ব্বাপর ক্রমের বোধ আমার নাই। ইহা গাণিতিক সৃষ্টিও নহে, কেননা গাণিতিক সৃষ্টিতে স্রষ্টা তত্ত্বটীকে সৃষ্টি করিতে বাধ্য, কিন্তু এখানে বাধ্যতার বোধ নাই। দেশ তাহা হইলে কি প্রকারের সৃষ্টি? উত্তর এই যে কালিক সৃষ্টিকে গাণিতিকভাবে কল্পনা করিলে যাহা দাঁড়ায় ইহা সেই প্রকারের সৃষ্টি। সহজ কথায় আমার সহিত দেশের সম্পর্ক বাধ্যতাবিহীন অকালিক সৃষ্টিসম্পর্ক, যাহারই অপর নাম বিশেষ্যবিশেষণতা বা তাদাত্ম্য, যে সম্পর্ক নিরবস্থ ও বিশিষ্টাবস্থ বস্তুর মধ্যে বর্তমান। নিরবস্থ বস্তু বিশিষ্টাবস্থ বস্তুর স্রষ্টা, অথচ এই সৃষ্টি কালে হয় নাই, এবং ইহার মধ্যে কোনও বাধ্যতা নাই। দেশ আমার তদাত্ম; আমি বিশেষ্য, দেশ আমার বিশেষণ। যাবদবস্থানুগত নিরবস্থ ফল যেমন নানা অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে, অথচ ঐ সকল অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য নহে, তদ্রূপ আমিও কখন, যথা বাহ্যপ্রত্যক্ষে, আত্মপ্রকাশ করি, কিন্তু ঐ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য নহি।

কতকগুলি আপত্তির সমাধান আবশ্যক। যথা—

(ক) দেশ আমাসাপেক্ষ বা আধ্যাত্মিক ভঙ্গীবিশেষ হইলে উহাকে বাহ্যরূপে দেখি কেন?

(খ) যে সকল বস্তু অতীত, ভবিষ্যৎ বা দূরবর্ত্তী, অর্থাৎ যাহাদের বাহ্যপ্রত্যক্ষ হইতেছে না তাহারা কি দেশীয় নহে?

(গ) যে কোনও বাহ্য প্রত্যক্ষে যদি সমগ্র দেশের অপরোক্ষ অনুভব হইয়া থাকে তাহা হইলে তদ্বর্ত্তী যাবতীয় পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না কেন?

(ঘ) আমানিরপেক্ষ অন্য একজন লোক তাহার বহিঃপ্রত্যক্ষে যে দেশে আত্মপ্রকাশ করে সেই দেশ ও আমার দেশ এক না ভিন্ন ?

(ঙ) যে মুকুরকলিত বা স্বপ্নদেশ অতিমিথ্যা তাহা আমার দেশের বাহিরে কি না ?

উত্তর :—

(ক) বাহ্যত্বের সহিত আধ্যাত্মিকত্বের কোনও বিরোধ নাই। যাহা আমাসাপেক্ষ তাহাই আধ্যাত্মিক, ইহার বিরোধী পদার্থ হইল তাহাই যাহা আমানিরপেক্ষ। বাহ্যপদার্থ আন্তর পদার্থের বিরোধী, কিন্তু আন্তর ও আধ্যাত্মিক এক কথা নহে। এমন কথা বলা যায় না যে আত্মা বা মন আমার ভিতরে ও অনাত্মা বা আমানিরপেক্ষ বস্তু আমার বাহিরে। 'ভিতরে' শব্দটীও দেশেরই এক আকার সূচনা করে, দেশের কথা বাদ দিলে 'ভিতরে' বা 'বাহিরে' কোন কথাই উঠে না। আত্মা বা মন আমার ভিতরে বলিয়া যদি কোন অনুভব থাকে তাহা হইলে সেই 'ভিতরে' সম্পর্কটী কোনও দেশীয় সম্পর্ক নহে, অতএব 'বাহিরে' সম্পর্কটী তাহার বিরোধী হইতে পারে না। অতএব দেশ আমাসাপেক্ষ বলিলে বুঝিতে হইবে যে এই দেশ তাহার পূর্ণ বহিঃসত্তা অটুট রাখিয়াই আমা-সাপেক্ষ বা আধ্যাত্মিক। এমন কথা এখানেই নাই যে দেশরূপ আমার আধ্যাত্মিক ভঙ্গীটী আমার শক্তিবিশেষ এবং ঐ শক্তি আমানিরপেক্ষ বস্তুর সংঘাতে দেশাকারে পরিণত হয়। শক্তির কোন কথাই এখানে নাই। পূর্ণ-প্রকাশ-দেশেই আমার দৃষ্টিভঙ্গী, আমিই বাহ্যপ্রত্যক্ষে দেশাকারে আত্মপ্রকাশ করি। এবং স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই আত্মপ্রকাশ কালিক নহে। আমার বস্তুগ্রহণের পূর্বে দেশ ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। বস্তু চিরকালই দেশে আছে, কিন্তু ঐ দেশের স্বরূপ বিচারে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে উহা আমারই অকালিক গ্রহণভঙ্গীবিশেষ। দেশবিহীন বস্তু স্বরূপতঃ অজ্ঞেয়, কারণ প্রত্যক্ষ না হইলে, অথবা প্রত্যক্ষযোগ্যতা না থাকিলে বস্তুর স্বরূপ জানা যায় না, অথচ প্রত্যক্ষ করিতে হইলেই বস্তুকে দেশাকারে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

(খ) অতীত, ভবিষ্যৎ ও দূরবর্তী পদার্থ প্রত্যক্ষ পদার্থের মতই দেশীয়। দেশের অনুভব প্রথম হইতেই অসীমপ্রসার দেশের অনুভব, এবং অতীত, ভবিষ্যৎ ও দূরবর্তী যাবদ্বস্তু ঐ একই দেশে প্রকাশ বলিয়া উহারা প্রত্যক্ষ-যোগ্য। অভিপ্রায় এই যে ভবিষ্যৎ বা দূরবর্তী বস্তুর প্রত্যক্ষ হইলে তাহার দেশকে পূর্বের প্রত্যক্ষবস্তুর দেশ হইতে একান্ত ভিন্ন বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় একই দেশের প্রতীয়মান অংশ,

পুরাতন দেশাংশটাই বিস্তৃত হইলে এই নূতন দেশাংশটাকে গ্রহণ করিত। অতএব অতীত, ভবিষ্যৎ ও দূরবর্ত্তী সমস্ত পদার্থই দেশীয়।

(গ) যে কোনও প্রত্যক্ষে সমগ্র দেশের অনুভব হইলেও তদ্বর্ত্তী যাবতীয় পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না। এইজন্য যে সমগ্র দেশের অনুভবটা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। যে কোনও দেশাংশের অনুভবে তাহা যে অতীত ও ভবিষ্যৎ যাবৎ প্রত্যক্ষের দেশাংশের সহিত এক, অর্থাৎ এই সমস্ত দেশাংশ-গুলিই এক অসীমপ্রসার দেশের (প্রতীয়মান) অংশ, যে কোনও প্রত্যক্ষে আমার এই অনুভব থাকে। দেশের এই সীমাহীন বিস্তারের অপরোক্ষ অনুভব আমার রহিয়াছে, অথচ ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে আমরা খণ্ডদেশই পাই। অতএব এই অসীমপ্রসার দেশের অপরোক্ষানুভূতিকে অতীন্দ্রিয় বলিতে হইবে, এবং সেইজন্যই এই বোধে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবৎ পদার্থের অনুভব হইবার হেতু নাই।

(ঘ) আমানিরপেক্ষ অন্য একজন লোক যে দেশে আত্মপ্রকাশ করে তাহা আমার দেশের সহিত একই পদার্থ। সমস্ত দেশই এক। কোনও দেশকেই অসীমপ্রসার দেশের বাহিরে বলা যায় না। প্রথমতঃ সেরূপ অনুভব আমার নাই। দ্বিতীয়তঃ এই দুই দেশের পারস্পরিক বহিঃসত্তা ত এক দেশীয় সম্পর্কই।

(ঙ) দেশ স্বরূপতঃ সত্যনিশ্চয়ের বিষয় নহে বলিয়া শুদ্ধদেশবিষয়ক ভ্রান্তি হইতে পারে না। রজ্জুসর্পভ্রমনিরাসের পর সর্পের পরিমাণ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। মুকুরান্তর্বর্তী দেশপ্রতিবিম্ব বা স্বাপ্নদেশও মিথ্যা নহে।

পরিমাণকে দেশাংশমাত্র বলিলে সর্পের স্থান যেমন মিথ্যা হয় না, তাহার পরিমাণও তদ্রূপ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় না। মুকুরবর্তী দেশপ্রতিবিম্ব বা স্বাপ্নদেশ মিথ্যা নহে, মিথ্যা সেই দেশবর্ত্তী বস্তু, অথবা সেই বস্তুর সহিত দেশের সম্পর্ক। এই সমস্ত দেশ যদি মিথ্যা হইত তাহা হইলে তাহাদিগের সহিত সত্য বলিয়া অভিহিত দেশের নিরবচ্ছিন্নত্বরূপ সম্বন্ধ কি প্রকারে হয়? মুকুরান্তর্বর্তী দেশ কি আমাদের দেশেরই প্রসার নহে? যদি না হয় তাহা হইলে তাহার সহিত এই দেশের সম্বন্ধ কি? অভিপ্রায় এই যে কোন দেশখণ্ডের বোধে যাবদ্দেশ তাহার সহিত নিরবচ্ছিন্নত্ব সম্বন্ধে সম্বন্ধ বলিয়া প্রতীত হয়। এই প্রতীতিকে ভ্রম না বলিয়া ইহাকে স্বীকার করিয়া অন্যভাবে যাহাতে সমস্ত ব্যাপারটা উপপন্ন হয় তাহাই বাঞ্ছনীয়। কোন ভ্রমই দেশবিষয়ক নহে, দেশবর্ত্তী বস্তু-বিষয়ক বা ঐ বস্তুর সহিত দেশের সম্পর্কবিষয়ক বলিলেই চলে।

দেশবিষয়ক ভ্রম হয় না, ইহার অর্থ এমন নহে যে দেশপ্রতীতিমাত্রই সত্যবোধ। আমাদের বক্তব্য এই যে বস্তুনিরপেক্ষ দেশের বোধ কেবল-নিশ্চয় মাত্র।

উপনিষদের আলোচ্য বিষয়

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. সি. এস্।

উপনিষদের যুগের একটি প্রধান লক্ষ্য করবার বিষয় হল সে যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তির বিদ্যা আহরণের প্রতি সুনিবিড় আকর্ষণ। অবিদ্যার সংস্পর্শ এবং অজ্ঞানের অন্ধকার তাঁদের কাছে অতি ঘৃণার বস্তু ছিল এবং তাকে পরিবর্জ্জন করবার জন্য তাঁদের মানসিক সংকল্পও সেই পরিমাণ গভীর ছিল। উপনিষদের যুগের ঋষির প্রার্থনায়, কথায়, উপদেশে অবিদ্যার প্রতি এই সুগভীর বিরাগের অভিব্যক্তি আমরা যথেষ্ট পরিমাণে খুঁজে পেয়ে থাকি। উপনিষদের ঋষির প্রার্থনায় তাই আমরা পাই যে তিনি কামনা করছেন অজ্ঞান অন্ধকার হ'তে তাঁকে যেন বিশ্ব-শক্তি পরিত্রাণ করেন।১ এমন কি উপনয়ান্তে ব্রাহ্মণ যে সাবিত্রী-মন্ত্র জপ করে থাকেন তারও মূল প্রার্থনা এই যে সূর্য্য যেন আমাদের ধীশক্তি যুক্ত করেন।২ সেইরূপ যারা অবিদ্যায় রত, সত্য এবং বিদ্যার পথভ্রষ্ট তাদের উপনিষদকার ঘৃণা করেন এবং তাদের জন্য পরলোকে ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা রাখেন। ঈশ উপনিষদ বলেন যে "যারা অবিদ্যার

---

(১) বৃহদারণ্যক—১।৩।২৮ তমসো মা জ্যোতির্গময়

(২) সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥
বৃহদারণ্যক

(৩) ঈশ—৯।

দার্শনিককে তাঁর ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যার জন্য এক সহস্র মুদ্রা দান করবেন।[৭]

এই পরাবিদ্যা আহরণের কৌতূহল সেকালে আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেরই যে কত তীব্র ছিল তা সুন্দর হৃদয়ঙ্গম হয় উপনিষদের বর্ণিত দুখানি গল্প দ্বারা। কাজেই গল্প দুটিকে এখানে সংক্ষেপে বলার লোভ সংবরণ করা গেল না।

কঠ উপনিষদে গল্প আছে যে উশন্‌এর নচিকেতা নামে এক ছেলে ছিলেন। এই উশন ছিলেন ভারি দাতা। তাঁর সর্ব্বস্ব তিনি দান করতে সুরু করলেন এমন কি গরুগুলি পর্য্যন্ত বাদ পড়্‌ল না। ছেলে নচিকেতা বালকসুলভ কৌতূহল পরবশ হয়ে বাপকে প্রশ্ন করলেন "তুমি আমায় কাকে দেবে?" পিতার উত্তর না পেয়ে, তিনি বারবার সেই প্রশ্ন করে তাঁকে বিরক্ত করলেন। ফলে এ ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, বাপ রেগে বল্‌লেন 'তোমায় যমকে দেব।' যেমন বলা ঘট্‌লও তাই। ব্রাহ্মণের মুখের কথা কি ব্যর্থ হয? ফলে নচিকেতা গিয়ে উপস্থিত হলেন যমের বাড়ী কিন্তু পিতার উপর অভিমান করেই বোধ হয় অন্নজল কিছুই স্পর্শ করলেন না, তিনটি দিন উপবাসী রইলেন। বাড়ীতে ব্রাহ্মণের সন্তান তিন দিন অভুক্ত অবস্থায় যাপন করছেন অতিথিবৎসল যম কি করে আর তা সহ্য করেন? অগত্যা তিনি স্বয়ং অনুনয় কর্‌বার উদ্দেশ্যে নচিকেতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এমনি কাজ হল না বলে যম শেষকালে তাঁকে বর দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এইখানেই আমাদের আসল বিষয়টি অবতারণা করবার সময় এসেছে।

এই প্রতিশ্রুতির সুযোগ নিয়ে নচিকেতা বর চাইলেন এই: "এই যে মৃতব্যক্তির সম্বন্ধে মানুষের এই বিতর্ক—কেউ বলে সে থাকে কেউ বলে থাকে না—এ বিষয় সত্য কি তুমি আমায় কয়ে দেবে।"[৮] যম কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বড় রাজী হন। বল্‌লেন বিষয়টা বড় শক্ত, বোঝা শক্ত হবে, এতএব অন্য প্রশ্ন ধর। নচিকেতা কিন্তু ছাড়্‌বার পাত্র নন, যুক্তি দেখাতেও বড় মজবুত। তাই তিনি উত্তর করলেন—প্রশ্ন যে শক্ত সে কথা ত সত্য; কিন্তু সেইটাই ত হল বড় যুক্তি; এ প্রশ্নের উত্তর তোমার কাছেই আদায় করতে হবে। কারণ প্রথমতঃ প্রশ্ন শক্ত এবং দ্বিতীয়তঃ

(৭) বৃহদারণ্যক - ২।১।১

(৮)।কঠ—১॥ ১॥ ২০॥ যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে এতদ্বিদ্যামনুশিষ্ট স্বয়াহং বরানামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥ ২॥

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে উপযুক্ততম ব্যক্তি হলে তুমি, তোমার ত এই নিয়েই কারবার। কাজেই প্রশ্ন আমার বদ্‌লাবে না এই প্রশ্নেরই উত্তর আমি তোমার কাছে চাই।

যম দেখ্‌লেন মহা মুস্কিল। ছেলেটি যেমন বাচাল তেমনি বুদ্ধিতে অকাল পরিপক্ব; কাজেই তাকে বিরত কর্‌তে হলে অন্য পথ অবলম্বন করা প্রয়োজন। কর্‌লেনও তাই। তাকে নানা বস্তুর এবং নানা উপভোগের লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। এখানে যমের লোভ দেখাবার বিস্তারিত নমুনা একটু দেওয়া প্রয়োজন হবে। তিনি বল্‌লেন—"শত বৎসর আয়ুযুক্ত পুত্র পৌত্র নাও, বহু পশু, হস্তী, অশ্ব, সুবর্ণ যত চাও নাও, বড় জমিদারী নাও, যত বছর খুসী বেঁচে থাকবার বর নাও। তাতেও যদি মন না খুসী হয়, পৃথিবীতে যা কিছু কামনা দুর্লভ তা একে একে নাম কর, আমি পূরণ করে দেব। এই যে স্বর্গের অপ্সরারা রয়েছে এদের মত বস্তু মানুষের লাভ করা অসম্ভব। এদেরই তুমি নিয়ে যাও আমি সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি। শুধু দয়া করে এই প্রশ্নের উত্তর হতে আমাকে অব্যাহতি দাও।"

নচিকেতা কিন্তু এই লোভনীয় বস্তুর তালিকা দেখে ভুল্‌লেন না, তাঁর সঙ্কল্প এবং তাঁর ইচ্ছা তেমনি অটল হয়ে রইল। তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন সেইটাই আমাদের এখানে বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। তিনি বল্‌লেন—"জীবন যত বড়ই হক তা সীমাবদ্ধ, নৃত্য গীত অশ্ব সবই তোমার থাক। বাস্তব ভোগসুখের দ্বারা মানুষ কখনও তৃপ্তিলাভ করে না।"[১]

মানুষের অন্তরের তৃপ্তি যে বাস্তব সুখভোগে নয়, বিদ্যা আহরণে, এর থেকে বড় সত্য কিছু নাই। মানুষের তৃপ্তি বিদ্যা আহরণে, সত্য আহরণে, কেবল নিছক ঐহিক ভোগসুখে নয়। সত্যসন্ধানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ মানুষের সহজ ধর্ম্ম স্বরূপ। ঠিক বল্‌তে গেলে এই নিয়েই ত মানুষের অন্য জীবদের সঙ্গে প্রভেদ। অন্য জীবের সকল শক্তি ও সামর্থ্য কেবল মাত্র নিজের আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা কার্য্যেই পর্য্যবসিত হয়। সে কাজ করতেও তাদের বুদ্ধির সাহায্য নিতে হয় না এতটুকু, তারা সাক্ষাৎ প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই বেশ সুশৃঙ্খলার সঙ্গে জীবজীবনের এই দুটি মৌলিক কাজ সম্পাদন করে। অর্থাৎ তাদের জীবনধারণের জন্য যেটুকু বুদ্ধির ব্যবহারের বা চিন্তাশক্তির প্রয়োজন, সেটা জীববিশেষ সম্পাদন

(১) অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥ নহি বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্য॥ কঠ॥ ১॥ ১॥ ২৬—২৭॥

করে না, প্রকৃতিদেবীই তাদের হয়ে সে চিন্তার ভার গ্রহণ করেন এবং তাই হল জীবদের অন্তরে নিহিত প্রবৃত্তি সমুদয়।

মানুষের বিষয়ে কিন্তু ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। যে শক্তি বিশ্বের নাট্যমঞ্চে মানুষকে স্থাপন করেছেন তিনি মানুষের ভাবনার বোঝা নিজ স্কন্ধে বহন করতে চান নি, তাঁর ব্যবস্থা হল এই যে নিজের চিন্তা মানুষ নিজেই সেরে নেবে। ফলে অন্য জীবের জন্য প্রকৃতি করে দিলেন লোমশ বা তৎস্থানীয় অন্য জিনিষের পোষাক কিন্তু মানুষের রইল রোমহীন দেহ। আত্মরক্ষার জন্য অন্য প্রাণীর কোন কিছু একটা ব্যবস্থা হলই, কেউ পেলে নখ, কেউ দাঁত, কেউ বা শিঙ আর যা তার কোনটাই পেল না, সে পেল অন্ততঃ ক্ষিপ্রগতি কিম্বা নিজেকে গোপন রাখ্‌বার একটা কিছু উপায়। কিন্তু মানুষের ভাগ্যে জুটল না একেবারে কিছুই। এর ইঙ্গিতই হল এই যে মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে নিজেই নিজের আত্মরক্ষার বা আক্রমণের উপায় উদ্ভব করে নেবে। এইরূপে সামান্য জীবনধারণের মৌলিক অভাবগুলি দূর করার জন্যই তার বুদ্ধিশক্তির যখন প্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ল তখনই সত্য বল্‌তে কি তার ভাগ্যোদয়ের সূচনা হল। মানুষের বুদ্ধি নিজের প্রয়োগের এই বিস্তারিত ক্ষেত্র পাওয়ার ফলে তার দিন দিন তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পেল। ফলে সে শক্তি একদিন এমন বিকাশ লাভ করল যে কেবল মাত্র নিছক জীবনধারণের প্রয়োজনেই নিজেকে ব্যবহার করে তা তৃপ্তিবোধ করত না। জীবনের যুদ্ধে অন্য জীবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেমনি মানুষ নিজেকে একটু নিরাপদ এবং শান্তির আবেষ্টনীর মধ্যে স্থাপন করবার সুযোগ পেল অমনি সেই ধীশক্তি তার নব নব পথে নিজের পূর্ণতর বিকাশ খুঁজে বেড়াতে লাগল। এই ভাবেই দার্শনিক জ্ঞানপিপাসা মানুষের মনে প্রথম জাগ্‌তে সুরু করেছিল।

এই যে পারিপার্শ্বিক বস্তু সন্দর্শনে বিস্ময় এবং কৌতুহল এবং তাদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তির লীলা চলেছে তার স্বরূপ জানবার প্রয়াস মানুষের অতি স্বাভাবিক বৃত্তি। এ বৃত্তির মূল চলে গেছে তার সত্তার অন্তরতম দেশ পর্য্যন্ত। তা যে মানুষের মধ্যে কত গভীর এবং কত শক্তিসম্পন্ন তা যে কোন শিশুর আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করলেই আমরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হব। যে কোন শিশুই একটু বুঝ্‌বার বা দেখবার ক্ষমতা হলেই তার পিতামাতা বা অন্য সমস্থানীয় আত্মীয়দের পারিপার্শ্বিক নানা বিষয় সম্বন্ধে নানা প্রশ্নে একান্ত ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। এটা কি জন্য হয় এটা কেন হয় ইত্যাকি সহস্র প্রশ্ন তার কৌতুহলী মনে সদা সর্ব্বদা জাগে। কৌতুহল এবং জিজ্ঞাসা শিশুরও স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

অন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্য দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত নয়। কেবল জানা নিয়ে তার কথা, জ্ঞান সঞ্চয় হলেই তার পরিসমাপ্তি, কোন পরোক্ষ উদ্দেশ্য তার পিছনে নিহিত নাই।

শিশুর সম্বন্ধে যে কথা খাটে বয়স্ক মানুষ সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক যখন তত্ত্ব জ্ঞানের উদ্দেশ্য সাধনা করেন তখন তাঁরা নিছক জ্ঞান আহরণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না। জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে। আধুনিক কালে বাস্তব জগতে অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমাদের বাস্তব জীবনে বহু সুখ সুবিধার খোরাক জুগিয়েছে। যেমন রেল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতারবার্ত্তা ইত্যাদি। এই সব দেখলে আপাতদৃষ্টিতে একটা ধারণা জন্মাতে পারে এই যে ব্যবহারিক জগতের সুখ সুবিধার প্রয়োজনের খাতিরেই বৈজ্ঞানিক এই সকল আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেছেন। কিন্তু আদৌ তা সত্য নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন তাঁর জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করবার জন্যই। পরে গৌণভাবে সেই আবিষ্কার বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে ভিত্তি করেই নানা বাস্তব যন্ত্রাদির উদ্ভব হয়েছে মানুষের সুবিধা বিধানের জন্য। যন্ত্রাদি উদ্ভব ও বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ দুটি বিভিন্ন জিনিষ। প্রথমটির নিয়ন্ত্রক শক্তি নিশ্চিতই মানুষের ব্যবহারিক সুবিধা, কিন্তু দ্বিতীয়টির নিয়ন্ত্রক শক্তি সম্পূর্ণরূপে মানুষের অন্তর্নিহিত জ্ঞান পিপাসা মাত্র। ষ্টিফেন যখন আবিষ্কার করলেন যে জল বাষ্পের আকারে পরিণত হলে তা নিজের সম্প্রসারণ সাধনের চেষ্টায় বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে তখন তিনি কেবল মাত্র তাঁর জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করেছিলেন। বাষ্পের এই শক্তিকে ভিত্তি করে যখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করে কাজে লাগাবার চেষ্টায় যন্ত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা হল তখনই আমরা পেলাম বাষ্পের ইঞ্জিন এবং তারই ফলে পেলাম নানা সরবরাহ ও কলকারখানার শক্তিশঞ্চারী যন্ত্রাদি।

সুতরাং নচিকেতা যখন যমকে বললেন যে নিছক পার্থিব ভোগ সুখে মানুষ পরিতৃপ্তি আহরণ করতে পারে না বা জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ না হলে তার তৃপ্তি নাই তখন তিনি মানুষের এই স্বভাবজ ধর্ম্মের কথাই বলেছিলেন। বুদ্ধিশক্তির বিকাশসাধন এবং তার সাহায্যে সত্য আহরণ এই হল মানুষের ধর্ম্ম। একেই উপনিষদ সব থেকে বড় ধর্ম্ম বলে সর্ব্বত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। ঠিক সেই কারণেই আবার উপনিষদের ঋষির কাছে অপরাবিদ্যা অপেক্ষা পরা বিদ্যা আহরণের আকর্ষণ সমধিক বেশী। ব্যবহারিক জগতে যে সকল বিদ্যা কাজে লাগে

মোটামুটি তাই অপরা বিদ্যা। সেখানে সত্য বলতে গেলে বলা উচিত নিছক বিদ্যা আহরণের উদ্দেশ্যেই বিদ্যা আহরণ হয় না। সেখানে ঘটনাচক্রে বিদ্যা আহরণ হয়ে পড়ে গৌণ জিনিষ। এবং দৈনন্দিন জীবনে তার ব্যবহারই হয়ে পড়ে মুখ্য জিনিষ। পরাবিদ্যা সম্বন্ধে কিন্তু একথা একেবারেই খাটে না। সে বিদ্যা আহরণে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কোন সুখসুবিধাই নাই। সেখানে বিদ্যান্বেষীর তৃপ্তি পরাবিদ্যা আহরণেই পর্য্যবসিত হয়। নিছক জ্ঞান লাভের জন্যই যে জ্ঞান পিপাসার আদর্শ সে আদর্শ এই পরাবিদ্যাতেই সম্পূর্ণতম তৃপ্তি পায়।

দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ

বৈচিত্র্যের বিশ্ব-আত্মায় এক অদ্বিতীয় দর্শন, খণ্ডের অন্তর্লোকে অখণ্ড সত্তার নিত্য অনুভাব—ধ্যানী দার্শনিকদেরি ভাব-বৈশিষ্ট্য। 'অখণ্ড'-দ্রোহী ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্য-প্রদেশেও এমন বহু তাত্ত্বিকের সন্ধান মেলে, যাঁরা বহুত্বের মধ্যে একেকে, বিশ্ব-খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডকে দর্শন, মনন, নিদিধ্যাসন করে' আনন্দ পেয়েছেন, 'সত্য'-প্রকাশে জীবন পণ করেছেন, 'অখণ্ডের' জয় কীর্তনে উন্মাদ হয়ে বিশ্ব-উপহাস পদ-পীড়িত করেছেন নিরন্তর।

প্রাচ্য-প্রদেশসমূহের, বিশেষ করে' ভারতবর্ষের, স্বাভাবিক প্রবণতাই হচ্ছে অদ্বিতীয় এই অখণ্ড সত্তার দিকে। "ঐক্যনির্ণয়, মিলনসাধন, এবং শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তিলাভের অবকাশ, ইহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল" বলে' সর্বব্যাপী এক অখণ্ড সমগ্রতার ধ্যানে, তার কর্মে, তার যজ্ঞ-আয়োজনে, তার ধর্মে, তার সমাজবিধিব্যবস্থায় নিত্য মূর্তি ও স্ফূর্তি লাভ করেছিল। ভারতবর্ষ, তাই, অতি প্রাচীন-কালেই, স্বাভাবিকভাবেই জানতে পেরেছিল, যে, সৃষ্টি যখন ছিল না, তখন এই 'ইনি' এই অখণ্ড সত্তা, বিদ্যমান ছিলেন -(ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল ১২৯ সূক্ত) এঁ থেকে যখন সৃষ্টি জন্মলাভ করলো, তখনও ইনি বিশ্বসৃষ্টির তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে প্রাণপুরুষরূপে নিত্য জাগরূক রইলেন (শ্বেতাশ্বতরোপ-নিষৎ, ২য় অঃ ১৬।১৭)। "বৈচিত্রের মধ্যে ইনি, এঁর মধ্যে বিশ্ববৈচিত্র্য," —উপনিষদের কবি-ঋষিদের ধ্যানাকাশে এই সত্য সূর্যের মত প্রতিভাত হয়েছিল। এ-কথা সত্য, যে কবিঋষিরা ভাবমৌন আনন্দের অমিত উচ্ছ্বাসে অখণ্ড তত্ত্বকে স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বরূপে গ্রহণ করে' কবিত্বের রস-আধারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ন্যায়শাস্ত্রীয় কোন যুক্তির অপেক্ষা রাখেন নি; কিন্তু পাশ্চাত্যে তাত্ত্বিক হেগেলের লোকোত্তর মনীষাদীপ্ত দার্শনিক যুক্তি-প্রতিভায় এই তত্ত্ব জ্ঞানজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, পুনরায় একে যুক্তির দ্বারা নূতন করে' বোঝাবার প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে না।

অন্ততঃ অখণ্ডোপাসক, মিলনধর্মী ভারতবর্ষে তা' নেই। জাগতিক

বহুত্বের নানা স্রোতস্বিনী এই মহান অখণ্ডের অনন্ত সাগরে সম্মেলিত হয়ে'—ভক্তের ভাষায়, আত্মসমর্পণ করে'—আপন ক্ষুদ্রত্বের সীমা অতিক্রম করছে, এই হচ্ছে ভারতীয় দার্শনিকদের সর্বজনস্বীকৃত ব্রহ্ম বিশ্বাস। "সকলের নিয়ে সেই এক পরম প্রেম চিরজাগ্রত আছেন," রবীন্দ্র দর্শনে তাই এই কথা নানাভাবে নানাছন্দে, নানাভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন: "যারা এক আত্মাকে আপনাদের সকলের মধ্যে দেখতে 'চায়' তারাই মহাজাতিরূপে প্রকাশ 'পায়'।" রবীন্দ্র-দর্শনের বিভিন্ন দিক পর্য্যালোচনা করতে হলে,' প্রথমেই আমাদেরই বলে' রাখতে হবে, যে, তিনি অমৃতের সন্তান; অমৃতোপাসক ভারতবর্ষের আর্য-উপলব্ধিজাত অমৃততত্ত্ব ই অমৃত ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন; তাঁর দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিমূলে ফল্গুধারার মত নিত্যজাগ্রত অখণ্ড-স্বরূপ সেই মৃত-সঞ্জীবনীই প্রবহমান।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—বৈচিত্র্যময় অসংখ্য সীমার মধ্যে অদ্বিতীয় এই মহান অসীম, এই অমৃত নিত্য বিদ্যমান আছেন---সুর দিচ্ছেন, সংশয় দূর করছেন, সীমাকে আপন অসীমত্বের অপূর্ব্ব ইঙ্গিতে মধুর, কিনা অমৃত, করছেন (গীতাঞ্জলি)। এই যে ইনি, এই এক, এই অমৃত-অসীম, এঁর স্পর্শ বিশ্বের প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, মহান থেকে মহত্তর প্রত্যেক সৃষ্টপদার্থের মধ্যেই, বিরাজিত। সৃষ্টি বৈচিত্র্য তাই মিথ্যা নয়, বহুত্বের বিশ্ববিকাশ মায়া-প্রপঞ্চের বিবিধ বস্তুস্তূপমাত্র নয়। কেন নয়? না, এক থেকেই বহুত্বের বিকাশ, আবার বহুত্বের বিচিত্র রূপবৈশিষ্ট্য ভেদ করে' অমৃত এই একেরই সূর্য প্রকাশ (চিত্রা)।

পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি, যে উপনিষদ্ ঠিক এই কথাই বলেন। বলেন: 'এক আমি, বহু হবো, এই বহু হলাম।' সূর্য প্রকাশিত হলেন বিচিত্র সপ্তরঙে, সপ্তরঙ তাই সূর্যের স্বীকৃতি পেল—সত্যের প্রকাশ সত্যই হবে, মায়া হবে না, মিথ্যা হবে না। এক যখন বহু হলেন, তখন বহু অর্থাৎ সেই একের বিশ্ব-বিভূতি, দার্শনিক স্বীকৃতি আদায় না করে' ছাড়লো না। আবার অদ্বৈতদর্শন যখন বললেন, সবই ব্রহ্ম, সবই ইনি, তখনও বহুত্বের প্রতি ন্যায়শাস্ত্রীয় আস্থা ক্ষুণ্ণ হলো না। সবই যখন ইনি, এই সত্যস্বরূপ, তখন এঁর মধ্যে যা' কিছু আছে, সবই সত্য, সবই এঁর অমৃততত্ত্বের প্রতীক, প্রতিনিধি। এখন কথা হচ্ছে, এঁর মধ্যে যা' কিছু আছে সে সব কি?—না, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এই সূর্য্য-চন্দ্র-তারা, এই পুষ্প-গুল্মলতা-পত্র, এই সাগর-পর্বত-আকাশ-বাতাস এই কীট-পতঙ্গ-জীব-বিহঙ্গ, খেচর-ভূচর-উভচর, অধোগামী ও ঊর্ধ্ব-বিহারী।

সৃষ্টি-বৈচিত্র্য তা হলে সত্য। সত্য কি? না, সত্য হলো 'ভাব', মানে, যার অস্তিত্ব আছে। 'ম্যাটার'-ও আমার কাছে সত্য, কারণ তা' আমার ভাবসত্তাকে 'বিশেষ এক ভাবে' প্রমুদিত করে। (বার্কলে) যা সত্য, যার অস্তিত্ব আছে, তা নিশ্চয়ই আমার ভাবসত্তাকে পুলকিত করবে, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, হয় বহির্দৃষ্টি, নয় অন্তর্দৃষ্টি। আমার 'বন-বাগানে' যে-কুসুমটি আজ সকালে প্রমুদিত হয়ে হাস্য করছে, তা' সত্য এই জন্যে, যে-তা' আমার বহির্দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে; আবার ক্ষুদ্র কুসুমটির প্রফুল্ল-আননের অন্তরালে যদি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের শিল্পসৌন্দর্যের বিভূতি দেখতে পাই, যদি চিত্ত উড়ে যায় পুষ্প দেখতে দেখতে পুষ্পাতীতে, তা হলে পুষ্পটির আরো একটি গভীরতর গোপন সত্য আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে; বুঝতে পারি ওটি আমার অন্তর্দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, অমার সৌন্দর্য-ভাবকে উদ্বেজিত করেছে, অরূপের রূপসন্ধানী আমার পিপাসু আত্মাকে অরূপে প্রমুদিত করবার অভিপ্রায়ে বিশেষ রূপাধারে বিকশিত হয়ে এসেছে।

এইভাবে বিশ্বনিখিল রূপবৈচিত্র্যে পর্যবেক্ষণ করতে করতে ধ্যানসাধনায় অরূপের অমৃত-সাগরে স্নান করা, আবার, অরূপে সমাধি-আচ্ছন্ন থেকে বিশ্বরূপমহিমার অমৃত পান করা—রবীন্দ্র-দর্শন-সাধনার চরম উপলব্ধি—(জ্যোৎস্নারাত্রে : চিত্রা)। এই উপলব্ধির আনন্দ সত্যভাবে অনুভব করতে পারলেই রবীন্দ্রদর্শন বা কাব্য আর দুর্বোধ ঠেকবে না। সহজেই বুঝতে পারা যাবে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা তিনি "অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় মুক্তির" মহারূপ (নৈবেদ্য) নিরীক্ষণ করেছেন, আবার কোন পিপাসায় কাতর হয়ে তিনি "রূপসাগরে ডুব 'দিয়েছেন' অরূপ-রতন আশা করি'।"—(গীতাঞ্জলী)।

এই অরূপ অখণ্ডেরই শব্দান্তর একথা বলাই বাহুল্য। 'খণ্ডের' এক একটা 'বিশেষ রূপ-ই' আমাদের ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, সমস্ত খণ্ড-কে,—আবিষ্কৃত, অনাবিষ্কৃত, দৃশ্য, অদৃশ্য সমস্ত বিশেষ বিশেষ খণ্ডকে, একত্র করে' অনুপম অখণ্ডকে একস্থানে, একই কালে, সংকীর্ণ ইন্দ্রিয়-দৃষ্টির দ্বারা দ্যাখা সম্ভব না। ইন্দ্রিয়-দৃষ্টি (perception) যেখানে পরাভূত, ধ্যানদৃষ্টি (intuition) সেখানে মানুষকে সত্য-সন্ধানে সাহায্য করে। ধ্যানদৃষ্টির সহায়তায় যাঁকে দেখি, তিনি "রূপে রূপে প্রতিরূপে বহিশ্চ" বিরাজিত। ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিতে তাঁর পূর্ণরূপ দ্যাখা যায় না, অখণ্ড আমাদের ইন্দ্রিয়দৃষ্টির আয়ত্তে আসে না, তাই বলি: তাঁর

রূপ নেই, তিনি অরূপ ;- অখণ্ডতাই অরূপ,—অরূপ অখণ্ডের একটা নূতন নাম।

ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় সীমার আলো-সম্ভার ;—দিগন্তপ্রসারী সর্বব্যাপী অসীমের আলোচ্ছটা প্রভাসিত হয় ধ্যানদৃষ্টিতে। এই ধ্যানদৃষ্টি যাঁর সদাজাগ্রত তিনিই অখণ্ডকে জানতে পারেন। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে অখণ্ড সম্পূর্ণরূপে ধরা দিয়েছেন বলে' বিশ্বসৃষ্টির কুত্রাপি তিনি 'খণ্ডতা' লক্ষ্য করেন নি। দিক, দেশ, কাল, জীব, জীব-সমাজ, জীব-জীবন কোথাও, কোনো ভাবের বিচ্ছিন্নতা বা বিশ্লিষ্টতা তিনি সহ্য করেন না, স্বীকার করেন না। সর্বত্র একটা সমগ্রতার চিত্র তিনি প্রকটিত হতে ছাখেন, বিশ্ব-প্রকৃতির সর্বত্র তিনি সমগ্রতার সুর ধ্বনিত হতে শোনেন। এই জন্য জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে' ছাখা তাঁর মতে, যুক্তিসম্মত নয়। মুহূর্তবাদীরা জীবনের সামান্যতম একটি মুহূর্তের সঙ্গে অপর মুহূর্তের সাদৃশ্য খুঁজতে চান না. কিন্তু রবীন্দ্র দর্শনে শুধু এক জীবন নয়, অগ্রবর্তী বা পরবর্তী জীবন নয়, বিশ্বজীবনকেই এক করে' অখণ্ডরূপে ছাখবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই জন্যে রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে মৃত্যু ভয়াবহ একটা চরম নিবৃত্তি নয়, জীববনের গতিহীন পরিসমাপ্তি নয়—প্রবহবান জীবনেরি তা একটা নবতম তরঙ্গ তুল্য। শ্যামসুন্দর যেমন শ্রীমতীর জীবনে সমায়াত হয়ে তাঁকে প্রমুদিত করেছিলেন নবজীবনে, নবরূপে,—মৃত্যু ও তেমনি প্রেমিক শ্যামেরি মত জীবনকে নবরূপে গতিদান করে, জাগরিত করে। রবীন্দ্রদৃষ্টির আলোকে স্নাত হয়ে মৃত্যু আর ভীষণদর্শন বিকটাকার কোন 'ইগুয়ানোডন্-কল্প' রাক্ষস রূপে ছাখা দেয় নি. ছাখা দিয়েছে মনোমোহন রূপে, ছাখা দিয়েছে "শ্যাম সমান" - (ভানুসিংহের পদাবলী)।

আপাতঃদৃষ্টিতে এই কথাগুলিতে কবিত্বসুলভ উচ্ছ্বাস আছে বলে' মনে হলেও, এর অন্তরস্থিত দার্শনিক সত্যতাকে স্বীকার না করে' উপায় নেই। অখণ্ডতত্ত্বে উপলব্ধি এলেই, মানুষ বুঝবে: মৃত্যু জীবনের আর এক রূপ: জীবন ও মৃত্যু এক, অখণ্ড মহাজীবনেরি দুই রূপ। চক্রাকারে এই রূপদ্বয় নিত্য আবর্তিত হয়ে জীবজগৎকে জন্ম থেকে জন্মান্তরে নিয়ে চলেছে। বিশ্বজগতে জন্ম অর্থাৎ জাগরণ-ই একমাত্র সত্য, মৃত্যু বলে' এখানে কিছু নেই—দার্শনিক এই বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক বস্তুজগতেও যুক্তি ও যন্ত্রসাহায্যে স্বীকৃত হয়েছে।

জীবন তাহলে' 'চির নবীন সে নিত্য-নূতনকে জানছে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে যাচ্ছে,—দার্শনিক ভাষায়: জন্মামৃতসমুদ্রে নিত্য অভিস্নাত হচ্ছে; তার মৃত্যু নেই, তার মৃত্যু হয় না; কেননা

জীব-জীবন এবং মৃত্যু-জীবন—এই দুই জীবনকে এক করে' অখণ্ড-জীবনই বিরাজ করছেন। মৃত্যুহীন এই অখণ্ড-জীবনের ব্যাপ্তি দূরগত অতীতে, সমায়াত বর্ত্তমানে, অনাগত ভবিষ্যতে। মৃত্যু কোথাও নেই; তাই অতীত মরে নি, জন্মলাভ করেছে বর্ত্তমানরূপে; বর্ত্তমান মরবে না, জন্মলাভ করবে ভবিষ্য-মূর্তিতে। কালের এই জন্ম থেকে জন্মান্তরে, এক থেকে আরে, গতাগতির ছন্দ হৃৎস্পন্দনে অনুভব করলে স্পষ্টই বোঝা যায়, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আর কিছু না, এক অখণ্ড কাল প্রবাহ মাত্র। মানুষ আপন সংকীর্ণ বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করবার অভিলাষে অখণ্ড কালকে অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ,—বৎসর, মাস, দিন, ঘণ্টা, পল, অনুপলের বিশ্বখণ্ডে বিখণ্ডিত করে' নিয়েছে, অঙ্কশাস্ত্র আবিষ্কার করেছে, আবিষ্কার করেছে জ্যোতিষশাস্ত্র, জন্ম দিয়েছে পঞ্জিকা, ক্যালেণ্ডার। বস্তুতঃ গতিষ্মান, অথচ স্থিরধীর মহাকালের অখণ্ড-প্রবাহ অনাদ্যন্তকাল ধরে' ঠিক একভাবেই অব্যাহত রয়েছে। খণ্ডদৃষ্টিতে কালের যেটা গতি, অখণ্ড দৃষ্টিতে সেটাই আবার চিরস্থিতি। একই জিনিস, তাই দুয়ের মধ্যে 'মিল' না থেকে পারে নি; থাকার কথাই বলাই যেন বাহুল্য। (বলাকা)

কাল-দর্শন ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কালের অখণ্ডত্ব নির্ণয় প্রয়োজনবোধে দু-একটা কথা বলা হলো। বলা হলো: অতীত মৃত্যু পায় না, সে বর্তমান প্রবাহে সঞ্চারিত আছে। বর্তমান মৃত্যু পাবে না, সে ভবিষ্যতের তরঙ্গ-ভঙ্গে নিত্য নৃত্য করবে।

মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত অতিক্রম করে' অনেকগুলো 'আমির' ভেতর দিয়ে—বহু অবস্থায় সে পরিচিত হয় বহু 'আমির' সঙ্গে—অভিজ্ঞতাও নানা, আমিও নানা। শৈশবে এক আমি, কৈশোরে আর এক আমি, প্রৌঢ়ে দ্যাখে, আর এক আমি, বার্দ্ধক্যে হয়ে পড়ে আর এক সম্পূর্ণ আমি। কিন্তু এ সব কটা 'আমির' মধ্যেই যে সে এক অখণ্ড আমি রয়েছে তার সুস্পষ্ট চেতনার স্তরে সুপ্রকাশিত হয়ে না উঠলেও ঊনচেতনের (subconscious) স্তরে যে ভাসছে সে বলাই বাহুল্য। নানাত্বের মধ্যে একত্বের বা তাদাত্ম্যের বোধ তার আছে। এই যে বহু-আমির একত্ববোধ, এই যে অখণ্ডতার উপলব্ধি, এই যে sense of personal identity, এইটাই রবীন্দ্রনাথকে মহাকালের অখণ্ডত্ব বা একত্ব উপলব্ধির পথে সহায়তা করেছে। অনাদি, অনন্ত মহাকালের অখণ্ড আমি-সত্তাকে নিজের মধ্যে ধ্যান-দার্শনিকতায় পূর্ণ-স্বরূপে প্রতিভাত করে' নিয়ে অতীতকে তিনি দর্শন করেছেন, ভবিষ্যৎকে

দৃষ্টি দিয়েছেন। মহাকালের জীবনে, বলাই বাহুল্য, দূরগত অতীতটা হচ্ছে শৈশবকল্প. বর্ত্তমানটা কৈশোরকল্প, অনাগত ভবিষ্যৎটা স্বপ্নময় যৌবনকল্প। আর যদি জ্ঞান-সমাধিতে আচ্ছন্ন হয়ে মহাকালকে জিজ্ঞাসা করা যায়, যে, বিরাট যে-শৈশব-অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নানা গল্পে, কল্পে ও কথায় অঙ্কিত হয়ে রয়েছে, সেটা কার জীবনের? তা হলে সে নিশ্চয়ই উত্তরে এই বলবে: আমি একত্ব-কে জানি; আমার personal identityর জ্ঞান আছে। তাই বলতে পারছি, সেটা আমারি। বলতে পারছি: অতীত আমি-র, বর্ত্তমানটা আমি-র, এবং ভবিষ্যৎটা আমি-র জীবনেরই ভগ্নাংশ।

ব্যক্তিগত খণ্ড-জীবনের একত্ববোধের আলোকে সমষ্টিগত অখণ্ড-মহাকালের বিশ্বরূপ দর্শন রবীন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হওয়ায়, তিনি বিরাট অতীতকে সংগ্রামশীল বর্ত্তমানের, সংগ্রামী বর্ত্তমানকে স্বপ্নোজ্জ্বল ভবিষ্যতের সঙ্গে মিলিয়ে একটানা কালপ্রবাহ নিরীক্ষণ করবার যুক্তি পেয়েছেন। ফলে, আধুনিক নিছক বর্ত্তমানবাদিদের মত বর্ত্তমানটাই সব, এ-কথা বলতে পারেন নি; জীবনতত্ত্ব এবং সভ্যতার ইতিবৃত্তে 'ল্যাজামুড়োহীন উদরসর্ব্বস্বতা' তাঁর মতে অশাস্ত্রীয় দার্শনিকতা। (স্বদেশ: 'নূতন ও পুরাতন' 'নববর্ষ')।

বস্তুতঃ, মাত্র বর্ত্তমানকেই যদি স্বীকার করা যায়, Presentকেই যদি living বলে' স্বীকার করা হয়, তা'হলে মৃত অতীত আর অন্ধকার ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান থেকে বিযুক্ত হয়ে 'খণ্ড-কাল-কারাগারে' জীব-জীবনকে বন্দী করে' ফ্যালে। বর্ত্তমানবাদীদের মতে, জীবন-নাটক কেবল বিয়োগাঙ্কই অভিনয় করে। জীবন থেকে, তাদের মতানুযায়ী, বিয়োগ করতে হয় অতীত-কে, বিয়োগ করতে হয় ভবিষ্যৎকে, বিয়োগফল থাকে শুধু বর্ত্তমান, যা' নিয়ে তাদের কারবার। কিন্তু একটু সুক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে যদি তারা ছাখে, তাহ'লেই বুঝতে পারবে, একটি সামান্য মুহূর্ত্তের মধ্যে ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমান ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়ে রয়েছে - বর্ত্তমান প্রতি মুহূর্ত্তে অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে' ভবিষ্যতের মুখে এগুচ্ছে চুম্বকের টানে লোহার মত। এক মুহূর্ত্তের পক্ষে যেটা সত্য, অনন্তকালের পক্ষেও সেটা সত্য।

অখণ্ড জীবনের তত্ত্ব-কথায় যোগ-সাধনই হলো প্রয়োজনীয় কথা, বিয়োগ-সাধন নয়। রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও দেখতে পাই, আমরা তাই। তাঁর তত্ত্বানুযায়ী—যোগ-ই অমরত্ব, বিয়োগ মৃত্যু। তাঁর মতে সেই মানুষ অমৃত-কে জানে, যে অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের কেন্দ্রস্থলে ধ্যান-

বলে দণ্ডায়মান হয়ে সনাতন সমন্বয়-সত্যকে, অখণ্ড-যোগতত্ত্বকে উপলব্ধি করে। ব্যক্তিগত এক মানুষের পক্ষে শৈশব-কৈশোর-যৌবন প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে এক অখণ্ড আমি-কে নিরীক্ষণ করা যেমন সহজ, অখণ্ডোপাসক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে মহাকালের বিভিন্ন যুগাবস্থার কেন্দ্রস্থলে উপনীত হয়ে তার অখণ্ড প্রবাহের নিত্যগতি এবং চিরস্থিতির রহস্য উপলব্ধি করা তেমনিতর সহজ হয়েছে।

বস্তুতঃ অখণ্ডের আলোক দর্শনে যে প্রয়াসী নয়, এবং খণ্ডের প্রতিই যখন তার চিত্ত আসক্ত হয়, তখন অন্যান্য খণ্ডের প্রতি অন্যায়াচরটাকে সে পাপ মনে না। সে স্পর্ধিত হয়, নিঠুর হয়; সে পরের প্রতি অন্ধ হয়; সে ধর্ম্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না, এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করতে চায়। সে কেবলি অন্যকে আঘাত করে, এইজন্য অন্যের আঘাতের ভয়ে রাত্রিদিন বর্মে চর্মে, অস্ত্রে-শস্ত্রে কণ্টকিত হয়ে বসে থাকে, সে আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ করে রাখে—তার অসংখ্য সৈন্য মনুষ্যত্বভ্রষ্ট ভীষণ যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয় (স্বদেশ : নববর্ষ) সে স্বার্থের কূপমকণ্ডু তায় লুপ্ত হয়, সে প্রচ্ছন্ন থাকে।'

কিন্তু অখণ্ডকে যিনি জানেন, "যিনি সর্বভূতকে আপনারই মত দেখেন, এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে, সে থাকে লুপ্ত; আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে, সে হয় প্রকাশিত।' (শিক্ষার মিলন)

বলা নিষ্প্রয়োজন, যে, অখণ্ড তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি না এলে' মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ-তত্ত্বটির সার সংগ্রহ করা অসম্ভব। সকলের মধ্যে আপনাকে তিনিই উপলব্ধি করতে পারেন, যাঁর আত্ম-শিক্ষার সাধনায় দেশগত বা কালগত কোনো গোঁড়ামি নেই; দেশগত বিভিন্ন শিক্ষার সর্ববিধ খণ্ড-তত্ত্বের একত্র সম্মেলনে যিনি সমগ্র অখণ্ড সত্য তত্ত্বকে আবিষ্কার করে' নিতে জানেন। রবীন্দ্রনাথ তা' স্বাভাবিকভাবেই জানেন বলে' তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধনিচয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব-বিকাশের অভ্রান্ত উপায়-তত্ত্বই নির্দেশিত হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—এই উভয় দেশের বিভিন্ন শিক্ষাদর্শন একত্র করে' এক অভিনব মিলিত দর্শনের সম্ভাবনায় তিনি সাধন-তৎপর ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষাদীক্ষা, ধ্যানধারণার ভিন্নত্ব দর্শন করে' যারা বলে—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কখনও মিলিত হতে পারে না, তাদের মতবাদের যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ রবীন্দ্রদর্শনে তাই মেলে।

রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন : প্রাচ্যকে আজ বহির্মুখী শিক্ষায়, 'বিজ্ঞান'-শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে, ইহলৌকিক বস্তুজীবনকে জয় করতে হবে বাহুবলে ; নইলে সে পরাধীনতা-পাশে আবদ্ধ থাকবে চিরকাল। অপর পক্ষে পাশ্চাত্যকে শিক্ষিত হতে হবে অন্তর্মুখী শিক্ষায়, 'তত্ত্বশিক্ষায়' ; নইলে জাগতিক চরম উন্নতি থাকা সত্ত্বেও সে বর্বরোচিত জিগীষার উত্তেজনাতেই থাকবে প্রমত্ত। বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের মিলন হলো শিক্ষার মিলন। "এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্য-পীড়িত ও নির্জীব ; আর এই মিলনের অভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।"

কিন্তু এই মিলন সম্ভব হবে কখন ?—নিজেকে জানলে এবং মানলে, এবং পরকে পরম আন্তরিকতা সহকারে জানবার ও মানবার সততাপূর্ণ সদিচ্ছার সাধনা করলে, এই মিলন, পূর্ব-পশ্চিমের এই মিলন, জাতির সঙ্গে জাতির, একের সঙ্গে অপরের, এই মিলন, সম্ভব হবে। রবীন্দ্রের নীতিদর্শন (Ethical philosophy) ও ধর্ম্মনীতির (theology) মূল কথা হচ্ছে এই নিজেকে জানার ও মানার আগ্রহ, এবং পরকে জানবার ও মানবার সদিচ্ছা।

রবীন্দ্রের নীতিদর্শন ও সমাজতন্ত্র আলোচনা করলে দ্যাখা যায় যে তাঁর মতে ব্যষ্টিগত মানুষ সাধনবলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিকাশ করবে, বিকাশ করবে মঙ্গলের মধ্যে, প্রেমের মধ্যে ;—তারপর বৃহত্তর কল্যাণ-কামনায় স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে সমষ্টি-মঙ্গলে, সমষ্টি জানবে, সকলকে আত্মজ্ঞানে জীব-জীবন ধারণ করে' যাবে, কিন্তু আত্ম-স্বাতন্ত্র্য হারাবে না, পর-জাতির স্বাতন্ত্র্য হরণ করবার অভিলাষ স্বপ্নে কখনও পোষণ করবে না। তাকে মনে রাখতে হবে :—"একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পর-জাতির স্বাতন্ত্র্য হরণ করে, তারাই সর্ব্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পীরিয়ালিজম্ হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি ; গিলে খাওয়াকেই সে এক-করা বলে' প্রচার করে।"

বোঝা যাচ্ছে : Imperialist বা Fascistদের মতো সমগ্র বিশ্ব-জগৎকে আপন বন্দীত্বের বন্ধনে এনে' অখণ্ড এক 'কর্ত্তাভজার' বংশ সৃষ্টির অপরূপ সন্নীতি তিনি সমর্থন করেন না ; State Socialistদের মতো সমষ্টির যৌথ যূপকাষ্ঠে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে তিনি বলি দিতেও চান না, অথবা উগ্রপন্থি individual anarchistদের মতো সমষ্টি-কল্যাণে উদাসীন, সম্পূর্ণ বেপরোয়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে প্রশ্রয় দিতেও পারেন না। ব্যক্তি, তাঁর মতে, একটি ফুলের মত প্রমুদিত হবে প্রকৃতির উদ্যানে,

আপন রূপে, রসে, গন্ধে প্রমুদিত করবে পৃথিবী, আপন 'বিশেষ শোভা' বিকাশ করে' যাবে অবিশ্রাম, স্বপ্নেও ক্ষতি করবে না অন্যান্য কুসুমকলিকার, —পরন্তু অন্যান্য কুসুমের সঙ্গে মিলিত থেকে উদ্যানের মধ্যে এক অভিনব সমগ্রতার রূপ বিকশিত করবে। একদিকে নিজেকে, অপরদিকে নিজেকে সকলের মধ্যে মিলিত রেখে'—সকলকে, সম্পূর্ণরূপে সুন্দর ও শোভন করার সদিচ্ছাই ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টিকে, সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টিকে মিলিত করবার নীতিদর্শন।

মিল-এর Utilitarianism-এর মধ্যে লোকমঙ্গলের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তার সঙ্গে রবীন্দ্রের এই নীতিদর্শনের বিশেষ পার্থক্য আছে। বলা বাহুল্য, মিলের মঙ্গলবাদ সামাজিক কর্ত্তব্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত; রাষ্ট্রনৈতিক বিধিবিধানের প্রভাব তার মধ্যে আছে। ব্যক্তিকে অন্তরে বাহিরে বিকশিত করবার, নিজেকে জানবার এবং পরকে মানবার, স্বাত্মার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার, এবং পরাত্মার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করবার, কোনো ইঙ্গিত তাতে মেলে না। রবীন্দ্রের নীতিদর্শন ধর্ম্মবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে ধর্ম্ম করবে, সে নিজেকে যেমন জাগরিত করবে, অপরকে জাগরিত হবার তেমনি সুযোগ দেবে। স্বেচ্ছায় "হবে" অন্যে যাতে "হয়' স্বেচ্ছায় তার চেষ্টা করবে। এর মধ্যে রাজনৈতিক আইনবিধানের কোন চাপ নেই, ধর্ম্মনৈতিক চিত্ত-প্রসারের জ্যোতিঃ সম্পদই আছে।

নীতিদর্শনকে সার্থক করতে হলে, তাই ধর্ম্মের প্রয়োজন আছে। ধর্ম্ম-সাধনা, রবীন্দ্রনাথের কাছে, প্রেম-সাধনা। প্রেম না হলে ধর্ম্ম নিরর্থক, কল্যাণ বা শান্তি অমূলক-স্বপ্নকল্পনা। (শান্তি-নিকেতন, ১ম খণ্ড)

প্রেমের সূর্য্য-সাধনায় অন্ধকার দূরীভূত হয়,, অহংকার চোখের জলে যায় ধুয়ে, মাথা নুইয়ে আসে আনন্দের ভক্তি-প্রেরণায়। মানুষের প্রতি অবিচার বা অনাচার করতে তখন স্বাভাবিকভাবেই আর ইচ্ছা জাগে না। সকলের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সকলকে অখণ্ডরূপে, আত্মারূপে দ্যাখবার তখন দৃষ্টি খোলে। ঐক্য-তত্ত্ব তখন আর পুঁথির পাতায় থাকে না, উপলব্ধির মণি-মঞ্জুষায় সঞ্চিত হয় মহাবিত্তের মত। রবীন্দ্রকাব্যে ও দর্শনে প্রেমের তপস্যা তাই সবার আগে। রবীন্দ্র বলেন: প্রেমের ঈশ্বর দয়া না করলে, সব সাধনাই শূন্য, সব তত্ত্বই ব্যর্থতায় বিপর্যস্ত।

এই প্রেমের ঈশ্বর আমার মধ্যেই আছেন; শুধু জানতে পারি নি, জানতে চাইনি, তাই ইনি আমা থেকে দূরে রয়েছেন বলে' মনে হয়। যখন দূরে আছেন বলে' মনে হয়, তখ এঁকে বলি "তুহু"। "তুহু"

বলার অর্থ আর কিছু নয়, স্বাত্মাকে স্বীকার করে' নিয়ে পরমাত্মাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকা। রবীন্দ্রদর্শনের এই হলো দ্বৈতবাদ। আবার যখন প্রেমকে অনুভব করি অন্তরে, যখন এঁকে পেয়ে যাই; যখন ইনি অন্তরে সূর্য্যের দীপ্তিতে জাগ্রত হয়ে আমার অন্ধকার দূর করেন, অসত্য নাশ করেন, অমৃতের পথে টান দেন পরম স্নেহাবেগে, তখন ইনি আর 'তুহু' নন, "অহম্"—আমি প্রেম আমি সুন্দর, আমি সত্য ও কল্যাণ, আমি বিস্তৃত করবো নিজেকে, আমি গান গাইবো, আমি ফুল ছড়াবো, আত্ম-'নির্ঝরের' যখন 'স্বপ্নভঙ্গ' হয়েছে, এইবার করুণাধারা ঢালবো। রবীন্দ্র-দর্শনে এই হলো একপ্রকারের অদ্বৈততত্ত্বোপলব্ধি।

বস্তু-জীবন ও ভাব-জীবন গভীরভাবে মনন করে' দেখলে বোঝা যায়, দ্বৈত ও অদ্বৈত—এই দুই তত্ত্বের মধ্যেই সত্য নিহিত আছে। বস্তু-জীবনে সত্য সত্যই আমরা ঈশ্বর থেকে নিজেকে সব সময় অভেদ ভাবতে পারি নে, আবার ভাবজীবনে মাঝে মাঝে নিজের মধ্যে তাঁর সঙ্গে নিজকে অখণ্ডস্বরূপে দেখেও ফেলি। রবীন্দ্র-দর্শনে তাই উভয় তত্ত্বের প্রতিই সত্যস্বীকৃতির সৌন্দর্য আছে। মোটামুটীভাবে ধরলে তাঁর ধর্মতত্ত্বকে বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামীর অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের কাছাকাছি বলে' মনে হয়।

বস্তুতঃ, ভগবান প্রেম-কৃষ্ণ আমা'থেকে ভেদ আবার বিভেদ-ও বটেন। তিনি আমাতে আছেন, তত্ত্ব-সাধনায় ও শুদ্ধি প্রেরণায় তিনি আমার মধ্যে জাগরিত হন, চিত্ত-ধারার সঙ্গে একত্র আলিঙ্গিত হয়ে লীলাবিলাসে রাসোৎসবে প্রমুদিত হন; বলেন: হৃদয়ের এই ব্রজধাম ত্যাগ করে' "পাদমেকং ন গচ্ছামি"। আবার আমাকেই নবতম এক বিরহসত্যে জাগরিত করবার জন্যে অন্তর্বৃন্দাবন ত্যাগ করে' কখন যেন লুকিয়ে যান, "নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন' তখন "অন্ধকার" বলে' মনে হয়,—আমা থেকে দূরে, দূরে-দ্বারকায় থেকে' আমাকে বলান: "তুহুঁ কই' "তুঁহু কই"! - তাই কাঁদতে থাকি ব্যাকুল বেদনায়। চিত্ত রাধা যত ব্যাকুল হয়, ততই 'তুহুঁ' প্রভাসিত হতে থাকে। দেখি: আমার চারিপাশে আমারি আনন্দ বর্ধনে ভগবান প্রেমকৃষ্ণ বিশ্ববৈচিত্র্যে লীলা করছেন, অদৃশ্যে থেকেও দৃশ্যমান হয়েছেন ওই লীলাকাশে, ওই শ্যামসমাচ্ছন্ন বৃক্ষাকীর্ণ ঘন-অরণ্যে, ওই সাগরে, ওই কৃষ্ণ-পর্বতে, ওই বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রূপ সৌন্দর্য্যে।

রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন: তিনি কাছের'ও বটেন, 'দূরের' ও বটেন;

দৃশ্য ও বটেন, 'অদৃশ্য-ও' বটেন; 'অহম্-ও' বটেন আবার" তুহুঁ-ও বটেন তিনি রূপে রূপে, প্রতিরূপে-ও বটেন, 'বহিশ্চ-ও' বটেন।

সহজেই তাই বোঝা যাচ্ছে; ঈশ্বর-তত্ত্ব নির্ণয়ে রবীন্দ্র 'স্পিনোজা' নন; তিনিই একমাত্র নির্বিশেষ substance এই বলেই তিনি ক্ষান্ত হন না। তিনি 'ডেকার্ড-ও' নন; 'প্রকৃতি সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই তিনি সৃষ্টির সান্নিধ্য ছেড়ে অন্যত্র অদৃশ্যে বাস করেছেন 'পেনসনার'দের মত'—প্রকৃতি থেকে তাঁর এই নিত্য-ভেদতত্ত্বে তিনি শ্রদ্ধাবান নন। পরন্তু স্পিনোজার 'ইমানেন্স' এবং ডেকার্ডের 'ট্রান্সেনডেন্স'—এই দুই তত্ত্বকে সমন্বিত করে' এক অখণ্ড-তত্ত্বে ঈশ্বরীয় সর্বব্যাপিত্বে প্রেমের নিত্য-ব্যাপ্তির সর্বসত্যে, তিনি আস্থাস্থাপন করেছেন। "সমস্ত মানুষের সুখদুঃখকে এক করে যে-একটী পরম বেদনা, পরম প্রেম আছেন, তিনি যদি শূন্য কথার কথা মাত্র হতেন, তবে বেদনার এই গতি কখনই এমন বেগবান হোতে পারত না। ধনীদরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলকে নিয়ে সেই এক পরম প্রেম চিরজাগ্রত আছেন বলেই এক জায়গার বেদনা সকল জায়গায় কেঁপে উঠ্ছে। (পাপের মার্জ্জনা : শান্তি-নিকেতন ১৭শ খণ্ড)

মানুষের জন্য মানুষের সর্ব্বজনীন বেদনাবোধের অস্তিত্ব থেকে প্রেমের বিশ্বব্যাপিত্ব তিনি এইভাবে উপলব্ধি করেছেন।

প্রেমের নিত্য ব্যাপ্তির এই সত্য যখন সর্বমানুষের উপলব্ধির বিষয় হবে, মানুষে-মানুষে, দেশে দেশে, পূর্ব্ব-পশ্চিমে তখন আর ভেদ থাকবে না। কবি কিপ্লিঙ্-এর অশ্রদ্ধেয় মতবাদ (পূর্ব্ব-পশ্চিম কখনও এক হবে না) ধুলিসাৎ হয়ে যাবে চকিতে। বিজ্ঞান ও তত্ত্বকথা তখন একত্র মিলিত হবে, পূর্ব্ব হাত পাতবে পশ্চিমের কাছে, পশ্চিম হাত পাতবে পূর্ব্বের কাছে। উভয়ে উভয়ের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে হাত ধরাধরি করে চলবে অসৎ থেকে সতের পথে, অন্ধকার থেকে আলোকের পথে, মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে। বলবে : ভয় নেই, আর ভয় নেই। প্রেমের কৃপায় মিলনকে যখন জানা গেছে, হৃদয় দিয়ে মানা গেছে, অন্তরের গভীরে আনা গেছে,—ভয় নেই, আর ভয় নেই।

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই—
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

বাংলায় দর্শন

ডাঃ শ্রীরাসবিহারী দাস, এম. এ, পি. এইচ্. ডি।

শিল্পকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, যে কোন জাতির, যে কোন দেশের সভ্যতার বিশেষ অঙ্গ। এই সব সংস্কৃতিমূলক বিষয়সমূহের অনুশীলন ব্যতিরেকে কোন জাতিই প্রকৃত অর্থে সভ্যপদবাচ্য হইতে পারে না। এই সব বিষয়ের মধ্যে আবার দর্শনের একটি প্রকৃষ্টস্থান রহিয়াছে বলিয়া অদার্শনিকেরও স্বীকার করিতে হয়। কাণ্ট হেগেলকে ছাড়িয়া দিলে বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সভ্যতার এবং প্লেটো এরিষ্টোটলকে ছাড়িয়া দিলে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার মূল্য কি থাকে, কি না থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

সভ্যতা বলিতে শুধু বাহিরের সাজসরঞ্জাম, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী বা কলকারখানা বুঝায় না। যে মানুষ এই সব ব্যবহার করে, এগুলির দ্বারা তাহার সভ্যতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারা যায় মাত্র। বাস্তবিক অর্থে সভ্যতা বলিতে মানুষের এক বিশিষ্ট মনোভাব বা আধ্যাত্মিক অবস্থাই বুঝায়। সভ্যতার এই রকম আধ্যাত্মিক অর্থ আছে বলিয়াই মানুষের সভ্যতা বা সংস্কৃতিকে এতটা মূল্য দেওয়া হয়।

সভ্যতা বলিতে যে বিশিষ্ট মনোভাব বা আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝায়, সে মনোভাব বা আধ্যাত্মিক অবস্থা কিরূপ, তাহা এক কথায় বুঝাইয়া বলিতে পারা যাইবে না। তবে একথা সত্য যে, উচ্চাঙ্গের সৌন্দর্য্যবোধ, গভীর জ্ঞানপিপাসা ও সাধু প্রবৃত্তি তাহার বিশেষ অঙ্গ। সব সভ্য মানবের মধ্যেই যে সৌন্দর্য্যবোধ, জ্ঞানপিপাসা এবং সুপ্রবৃত্তি সমানভাবে বর্ত্তমান থাকে তাহা নহে। কাহারও মধ্যে একটী প্রবল, অন্যটী অপেক্ষাকৃত ক্ষীণভাবে থাকে। কিন্তু সভ্যতাকে পূর্ণাঙ্গ হইতে হইলে এই সব গুণই তাহাতে যথাযথভাবে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।

এই সভ্য মনোভাব হইতেই শিল্পকলা সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। মুখ্য অর্থে সভ্যতা বলিতে এক বিশিষ্ট মনোভাব বুঝাইলেও সেই মনোভাব হইতে যাহা প্রসূত হয়, তাহাকেও সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। এই জন্যই দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতিকে সভ্যতার অঙ্গ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ যে জ্ঞানপিপাসা হইতে দর্শন বিজ্ঞানের উৎপত্তি, দর্শন বিজ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারাই সেই পিপাসার তৃপ্তি ও পুষ্টি সাধিত হয়।

সুতরাং সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতিকে সভ্যতার অঙ্গ বলিলে অযৌক্তিক কিছু বলা হয় না।

কেহ কেহ মনে করেন, শিল্পকলা ও সাহিত্য, এমন কি বিজ্ঞানও মানবমনের বা সভ্যতার, যে স্তরে উদ্ভূত হয়, দর্শন তদপেক্ষা উচ্চস্তরের অভিব্যক্তি ; দার্শনিক জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, দার্শনিক মনোভাবই মানবমনের প্রকৃষ্টতম অবস্থা। একথা অনেকে স্বীকার নাও করিতে পারেন। তবে দার্শনিক মনোভাব মানব-সভ্যতার কিংবা আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি না হইলেও, দর্শন যে সভ্যতার এক বিশেষ অঙ্গ, সে বিষয়ে মতদ্বৈধের আশঙ্কা খুবই কম। দর্শন ব্যতিরেকে কোন সভ্যতাই পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। অন্যান্য বিষয়ে প্রকর্ষ লাভ করিলেও, যদি কোন সভ্যতায় দর্শনের সংস্পর্শ না থাকে, তাহা হইলে সে সভ্যতায় আত্মচৈতন্যের অভাব রহিয়াছে বলিয়াই মনে হইবে। স্ব-সম্বিতের (self-consciousuess) অভাবে মানুষ যেমন মানব নামের সম্পূর্ণ যোগ্য হয় না, তেমনই দার্শনিকতার অভাবেও সভ্যতার আলোক নিস্প্রভ হইয়া পড়ে।

ভারতীয় সভ্যতায় দার্শনিকতার অভাব ছিল না। এদেশের দর্শনই বিশেষ গৌরবের বিষয়। এ দেশের উপর দিয়া অনেক ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বহু শতাব্দী ধরিয়া এদেশের দার্শনিক চিন্তাধারা অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া যেন সে চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কিংবা লুপ্ত হইয়া যাইতে বসিয়াছে। এ দেশের শিল্পকলা ও সাহিত্য প্রথম সংঘাতের বিমূঢ়াবস্থা কাটাইয়া সচেতন হইয়া উঠিয়াছে এবং বিশ্বসভ্যতাকে নিজেদের দানে পরিপুষ্ট করিতেছে। বিজ্ঞানেও ভারতীয়েরা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু দর্শনে ? সমসাময়িক দর্শনে ভারতীয়েরা কি দান করিয়াছেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

কেন এই রকম হইয়াছে তাহার সম্যক্ কারণ নিরূপণ করা হয় ত সুকঠিন। কিন্তু খুব সম্ভবতঃ ইহার একটি কারণ এই যে, আমাদের দার্শনিক শিক্ষাদীক্ষা ও দার্শনিক চর্চ্চা বিদেশী ভাষায় করিতে হয়। ভাষার সঙ্গে ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বিদেশী ভাষায় আমরা গভীরভাবে বা মৌলিকভাবে কিছু ভাবিতে পারি না। যে রকম কথায় যে ভাব পাইয়া থাকি, সেই রকম ভাষাতেই সেই জাতীয় ভাবের সাধারণতঃ পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকি। বিদেশী ভাষার সাহায্যে এর চেয়ে অধিক আর অগ্রসর হওয়া যায় না।

এখানে বলা যাইতে পারে, বিজ্ঞানীরাও ত বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞানের চর্চা করিয়া থাকেন, এবং তাহা সত্ত্বেও বিজ্ঞানে মৌলিকতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু বুঝিয়া দেখা উচিত, বিজ্ঞান ভাষার উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা দর্শন নির্ভর করে। শুধু ভাষাবদ্ধ ভাব নিয়াই বিজ্ঞানের কারবার নয়; প্রয়োগশালায় নানা যন্ত্রপাতি নিয়া বহু চাক্ষুষ পদার্থের সহিত বিজ্ঞানীকে সাক্ষাৎভাবে সংস্পৃষ্ট হইতে হয়। আর বিজ্ঞানে প্রধানতঃ যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহা বহুলাংশে কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র। এই রকম বৈজ্ঞানিক ভাষার প্রকৃতি এবং আমাদের সাধারণ চলিত ভাষার প্রকৃতি ঠিক এক রকমের নয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় কোন প্রকারের জাতিগত বা দেশগত বৈশিষ্ট্য নাই। এ রকম ভাষাকে দেশী বা বিদেশী বলার কোন অর্থ নাই। কিন্তু দার্শনিক ভাষা সেই রকম নয়। চলিত সাধারণ ভাষাই দর্শনের ভাষা। এই ভাষার সাহায্যেই দার্শনিক চিন্তা চলিতে পারে। সুতরাং বোঝা যাইতেছে, চাক্ষুষ পদার্থের সহিত সাক্ষাৎ সংসর্গে আসিয়া, গাণিতিক সার্ব্বভৌম ভাষা নিয়া বিজ্ঞানীর কাজ করিতে হয় বলিয়া বিজ্ঞানের উপর দেশীয় ভাষার কোন প্রভাবই পড়ে না।

তাহা ছাড়া বিজ্ঞানের চেয়ে দর্শনের জীবনের সঙ্গে নিকটতর সম্বন্ধ। জীবনের—বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক জীবনের—নানাবিধ সমস্যার সমাধানের জন্যই দর্শনের উৎপত্তি ও বিকাশ। যাঁর জীবনের অনুভূতি যত গভীর, তাঁর কাছে জীবনের সমস্যাও তত তীব্রভাবে আসে। সেই সমস্যার সমাধানের জন্যও তিনি অনুরূপ আন্তরিকতা ও ব্যগ্রতার সহিত দার্শনিক প্রয়াসে ব্রতী হন। ইহা হইতেই বড় বড় দর্শনের সৃষ্টি হয়। আরও দেখা যায় যে, মনের গভীর ভাবের বা তীব্র অনুভবের কথা সাধারণতঃ নিজের মাতৃভাষায় যত সহজে ব্যক্ত করা যায়, বিদেশীভাষায় তত সহজে পারা যায় না। মনের উপরকার হালকা কথাগুলিই যেন বিদেশীভাষায় ব্যক্ত করিয়া থাকি; এবং বিদেশীভাষায় যাহা বলা হয় তাহাও যেন কতকটা অস্পষ্ট ও ক্ষীণভাবে আমরা ধারণ করিতে পারি। এরকম অবস্থায়, বিদেশী ভাষার সাহায্যে যেন আমাদের মনের কোন গভীর কথাই ব্যক্ত হইয়া আসে না, ও দার্শনিক কোন তত্ত্বকথাই তেমন গভীর ও স্পষ্টভাবে আমাদের মনে প্রবিষ্ট হয় না। এরকম পরিস্থিতিতে দর্শনের কোন নূতন বা গভীর কথা আমাদের নিকট হইতে কিরূপে আশা করা যাইতে পারে?

এই অস্বাভাবিক অবস্থা দূরীকরণের জন্যই কতিপয় দর্শনানুরাগী অধ্যাপকের উৎসাহ ও চেষ্টায় সম্প্রতি 'বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই 'দর্শন' পত্রিকার প্রচার হইতে চলিয়াছে। আশা করা যায়, বাংলা ভাষায় দর্শনালোচনার ফলে বাংলা দেশে দার্শনিক চিন্তার প্রসার হইলে এদেশেও দর্শনের নূতন ধারা বহিতে থাকিবে। আমরা আত্মপ্রত্যয়ের সহিত দর্শনে নূতন কথা বলিতে সাহসী হইব। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের কথার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র করিব না।

উপরে ভাষা ও দার্শনিক চিন্তার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সত্য না হইলেও বাংলা ভাষায় দর্শনালোচনার যথেষ্ট আবশ্যকতা রহিয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন ভাষার জন্য দার্শনিক চিন্তার কিছু আসিয়া যায় না; যে কোন ভাষায়ই, অথবা কোন চলিত ভাষার আশ্রয় না লইয়াও, আমরা দার্শনিক ভাব পোষণ করিতে পারি। তাহা হইলেও, আমরা যদি বাংলা ভাষাকে সভ্যভাষা বলিয়া দাবী করিতে পারি, তবে সে ভাষায় দর্শনের কথা বলা যাইবে না, বা বলা হইবে না, তাহা কি হইতে পারে? যদি না বলা যায়, বা বলা না হয়, তাহা হইলে তাহাতে সে ভাষার, বা সে ভাষাভাষীদের দীনতাই প্রকাশ পাইবে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে বাংলা ভাষায় অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যেমন পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লিখিত ও প্রকাশিত হইতেছে, দর্শন সম্বন্ধে তেমন কিছু হইতেছে না। সুতরাং অন্ততঃ আমাদের ভাষার ও সাহিত্যের এই অভাব দূর করিবার জন্যও আমাদের বাংলা ভাষাতেই দর্শনের আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলেও মনে হয়, 'দর্শন-পরিষদ' ও 'দর্শন' পত্রিকা প্রত্যেক চিন্তাশীল বাঙ্গালীর নিকট হইতে সহানুভূতি ও সাহায্যলাভ করিবে। যাঁহারা জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে আমাদের অগ্রণী, তাঁহারা বাংলা ভাষাতেই দর্শন সম্বন্ধে পুস্তক ও প্রবন্ধাদি রচনা ও প্রকাশ করিয়া ভাষার ও সাহিত্যের সম্পদ ও গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

সম্পাদকীয়

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র 'দর্শনের' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। বাঙ্‌লা ভাষায় দার্শনিক চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরিষদ্‌-সম্পাদক ডাঃ শ্রীরাসবিহারী দাস মহাশয়ের যে প্রবন্ধটী এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইল তাহা হইতেই পাঠকবর্গ দর্শন পত্রিকার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশেষ অবগত হইবেন। সুতরাং এই বিষয়ের পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আজ এই শিশু প্রতিষ্ঠানটী যে নবীন প্রাণ ও নবীন আশা লইয়া সগৌরবে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইবার প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছে আশা করি তাহা বাঙ্‌লা মায়ের চিন্তাশীল সন্তান মাত্রেরই সহানুভূতি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। আমরা বাঙ্গালী দর্শনানুরাগীগণকে পরিষদের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া এই পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া এই মহদনুষ্ঠানটাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি।—সর্ব্ব-সাধারণের বিজ্ঞপ্তির জন্য এই পত্রিকার পরিশিষ্ট অংশে পরিষদের বিস্তৃত নিয়মাবলী দেওয়া হইল।

কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে আজ সমগ্র বাঙ্‌লা দেশ শোকে মুহ্যমান। কবির দেহত্যাগে শুধু বাঙ্‌লার নয় সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার প্রকাশে যে ব্যাঘাত ঘটীয়াছে তাহা সুদূর ভবিষ্যতেও দূরীভূত হইবে কিনা তাহা কে জানে? রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য যে দার্শনিকজগতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। কবির অনেক সঙ্গীত ও কাব্যই যে আমাদের প্রাণে বৈদিক যুগের উপনিষদের ন্যায় এক অলৌকিক আনন্দ সৃষ্টি করে তাহা বোধ হয় কাহাকেও স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। আমরা প্রকৃতই অনুভব করিতেছি যে এখন রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তা সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন; কারণ আমাদের ইহাই যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস যে তাঁহার এই দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত সম্যক্‌ পরিচিত না হইয়া কেহ যদি তাঁহার কাব্য ও সাহিত্যের সমালোচনা করিতে বসেন তবে সে সমালোচনা নিতান্তই অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক হইবে। আজ আমরা স্মরণ করিয়া বিশেষ

আনন্দিত হইতেছি যে ভারতীয় দার্শনিক সম্মেলনের (Indian Philosophical Congress) প্রথম অধিবেশনে শ্রীরবীন্দ্রনাথই প্রথম সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া সম্মেলনকে ধন্য করিয়াছেন।

কবির মৃত্যুতে বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সহ-সভাপতি ডাঃ শ্রীসুশীল কুমার মৈত্র মহাশয়। এই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী সর্ব্বসমবেত ভদ্রমণ্ডলীকর্ত্তৃক গৃহীত হয়ঃ—

"বঙ্গীয় দর্শনপরিষদের এই সভা বঙ্গমাতার সুসন্তান, নির্ভীক স্বদেশ-প্রেমিক, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সেবক এবং জগদ্বরেণ্য দার্শনিক-কবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার প্রদীপ্ত প্রতিভার অশেষ অমূল্য অবদানে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়াছে; তাঁহার অনুপম ভাবধারা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নবযুগের অবতারণা করিয়াছে। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার আলোকে সাহিত্য ও দর্শন, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান, কবিতা ও ললিত-কলা, রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্র সমুদ্ভাসিত হইয়াছে।

এই সভা মহামনীষী রবীন্দ্রনাথের পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধানিবেদন করিতেছে; এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।"

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম্. এ, পি. এইচ্.-ডি, (ক্যান্টাব্) মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের জর্জ দি ফিফ্থ্ অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিয়াছেন—ইহাতে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ডাঃ দাশ-গুপ্ত মহাশয়কে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। দার্শনিক জগতে ডাঃ দাস-গুপ্তের পরিচয় নূতন করিয়া দিবার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি ভারত ও ভারতেতর দেশ-সমূহে অতি সুপরিচিত দার্শনিক। স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তিই যে মনোনীত হইয়াছেন তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। সংস্কৃত কলেজ হইতে তিনি শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিবেন।

* * * *

বাঙলা ভাষায় পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে চাই আমাদের বৈদেশিক শব্দের পরিভাষা। সুতরাং এই পরিভাষা সৃষ্টি

করাও আমাদের পরিষদের একটী প্রধান পরিকল্পনা। এতদুদ্দেশ্যে পরিষদ হইতে একটী পরিভাষা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি প্রকাশিত প্রবন্ধ ও পুস্তকাদির সাহায্যে পরিভাষার সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইবেন; এবং দর্শনের প্রতি সংখ্যায় এই পরিভাষা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে। আমরা পরিষদের সদস্য ও পত্রিকার পাঠকবর্গকে এই মহতী প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া বিভিন্ন শব্দের পরিভাষার যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব করিয়া দর্শনের কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দেন। আমরা ইতিমধ্যেই এইরূপ প্রস্তাব পাইয়াছি—দর্শনের আগামী সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইবে।
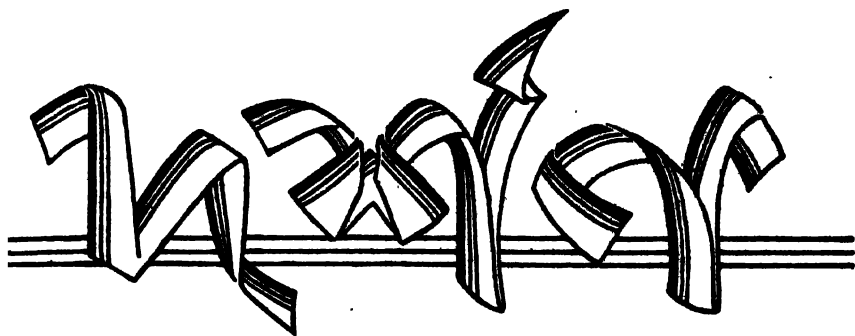
(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

দ্বিতীয় সংখ্যা] মাঘ [সন ১৩৪৮ সাল

সম্পাদক—

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ, পি-এচ্. ডি

সূচীপত্র

কার্ত্তিক সংখ্যা

মাঘ সংখ্যা

২য় সংখ্যা . দর্শন মাঘ, ১৩৪৮ সাল

ব্র্যাড্‌লের অদ্বৈতবাদ

অধ্যাপক শ্রীহরিদাস চৌধুরী, এম, এ

[মিষ্টার এফ্. এচ্. ব্র্যাড্‌লে একজন খ্যাতনামা ইংরাজ দার্শনিক। তিনি দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত 'অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাণ্ড রিয়ালিটি,' প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অব্ লজিক,' 'এথিক্যাল্ ষ্টাডিস' এবং 'এসেজ্ অন্ ট্রুথ অ্যাণ্ড রিয়ালিটি' নামক পুস্তকগুলি দার্শনিক মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। সাধারণভাবে তিনি হেগেলপন্থী বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার দার্শনিক মতবাদ সুপ্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক হেগেলের মতবাদ হইতে অনেকাংশে ভিন্ন এবং কতকাংশে অদ্বৈতবেদান্তের অনুরূপ। এই প্রবন্ধে তাহার স্থূল পরিচয় পাওয়া যাইবে।—সম্পাদক]

ইন্দ্রিয়-অনুভূতির গণ্ডি অতিক্রম করিয়া মানুষ যখন তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয় তখন তাহার জ্ঞানদৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠে এক অদ্বৈত, অখণ্ড অবিভাজ্য সত্য। সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তা যেমন বিশ্বের অনন্ত বৈচিত্র্যের পশ্চাতে এক অদ্বিতীয় অনন্ত তত্ত্বের সন্ধান দেয়, সুগভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারাও লাভ হয় সেই অদ্বৈত সত্যেরই অভ্রান্ত সাক্ষাৎ পরিচয়। দার্শনিক চিন্তাধারার স্বাভাবিক গতিই হইল 'বহু'কে 'একে'র মধ্যে, বৈচিত্র্যকে অনন্ত সত্তার মধ্যে তুলিয়া ধরা, এবং আবার সেই অনন্ত এক হইতে অনন্ত বৈচিত্র্যময় এই বিশ্বের উৎপত্তি ও ক্রমাভিব্যক্তির একটা সুসম্বদ্ধ বিবরণ দেওয়া। যে পর্যন্ত দর্শন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'কে সৃষ্টির আদি

এবং অনন্তরূপে প্রদর্শন করিতে না পারে সে পর্য্যন্ত তাহা স্থির ও নিশ্চিন্ত-ভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মতবাদ হইতে এই কথাই নিঃশংসয়ে প্রমাণিত হয়। প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো ও আরিষ্টটল্এর নিকট চরম সত্যের এই অনন্ত রূপই প্রতিভাত হইয়াছিল, প্লেটো তাহার নাম দিলেন শিব-সত্তা (Idea of the Good), আর আরিষ্টটল্ উহাকে বলিলেন অচল বিশ্বপরিচালক (Unmoved Mover of the world)। স্পিনোজার অদ্বিতীয় অসীম দ্রব্য (One Infinite Substance) এবং হেগেলের স্বীকৃত পরমাত্মা (Absolute Spirit) "একম্ সৎ" এরই মহিমা প্রচার করে। আমাদের দেশের শঙ্কর ও রামানুজের চিন্তাধারাও "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"কেই পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার বিপুল প্রয়াস। আধুনিক যুগে গ্রীন্, ব্র্যাড্লে, রয়িস্, ক্রোচে, জেনটিলে, বার্গ্সোঁ, এমন কি বস্তুতন্ত্রবাদী আলেকজাণ্ডার পর্যন্ত পরমতত্ত্বকে এক ও অদ্বিতীয় রূপেই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অতীন্দ্রিয় অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা যে অনন্ত সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, দার্শনিক চিন্তা তাহাকেই বুদ্ধির নিকট স্বচ্ছ ও পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করে। ব্র্যাড্লের দর্শন সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে অস্পষ্ট অপরোক্ষানুভূতির ভিত্তিতেও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে সত্যকে প্রতিভাত করিবার ইহা একটা বিরাট চেষ্টা। ব্র্যাড্লের দর্শনে অদ্বৈতবাদ তর্কবুদ্ধির সহায়ে ঠিক কিভাবে বিকাশলাভ করিয়া কি রূপ ও পরিণতি লাভ করিয়াছে, আমরা এই প্রবন্ধে তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

দর্শনের উদ্দেশ্য সৃষ্টির চরম রহস্য ভেদ করা। এবং পরম সত্যের শাশ্বত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। কিন্তু সত্য নির্ণয় করিবার উপায় কি? সত্য যখন আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবে তখন তাহাকে কোন চিহ্ন দ্বারা চিনিয়া লইব, কোন দিশারীর অভ্রান্ত নির্দেশে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া সত্যকে পরমশ্রদ্ধাভরে বরণ করিতে সমর্থ হইব? ব্র্যাড্লে বলেন যে দর্শনের দিক হইতে বুদ্ধিই আমাদের সত্যানুসন্ধানের দিশারী: কোন বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া আমাদের বিচারমূলক চিন্তাধারা যখন একটা স্বচ্ছন্দ পরিতৃপ্তি লাভ করে তখনই বুঝিব যে আমরা সত্যের সন্ধান পাইতেছি। এখন প্রশ্ন হইল কিসের দ্বারা আমাদের বিচারমূলক

চিন্তা স্থির পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে? ব্র্যাড্‌লের মতে আমাদের চিন্তারাশি তখনই পূর্ণশান্তি লাভ করে যখন আমরা আবিষ্কার করি অন্তর্বিরোধশূন্য সামঞ্জস্য বা আত্মসঙ্গতি। সুতরাং এই আত্মসঙ্গতিই সত্যের প্রকৃত স্বরূপ। যেখানেই আমরা লক্ষ্য করি আভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্য বা আত্ম-অসঙ্গতি সেখানেই আমাদের বুদ্ধি অসত্যের স্পর্শে যেন চঞ্চল হইয়া উঠে, মিথ্যার কৃষ্ণচ্ছায়া আমাদের চিন্তাকে সুসমঞ্জস সত্যের আলোকের জন্য অধীর করিয়া তোলে। কিন্তু এই আত্মসঙ্গতি (Self-coherence) কথাটা তর্কশাস্ত্রের সঙ্কীর্ণ অর্থে নিলে চলিবে না। কোন কোন তর্কশাস্ত্রের মতে আমাদের কোন ধারনা অসত্য হইয়াও আত্মসঙ্গতিসম্পন্ন হইতে পারে, যেমন, আকাশকুসুমের বা সুবর্ণময় পর্বতের কল্পনা মিথ্যা কিন্তু তবু অন্তর্বিরোধশূন্য। ব্রাড্‌লে আত্মসঙ্গতি কথাটা গভীরতর অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সর্বব্যাপকতা (all-comprehensiveness or extension) আত্ম-সঙ্গতিরই অপর এক অবিচ্ছেদ্য দিক। পূর্ণ আত্মসঙ্গতি যাহার আছে তাহাকে সর্বব্যাপক, অখণ্ড ও অদ্বিতীয় হইতে হইবে, কারণ খণ্ডের ও ক্ষুদ্রের পক্ষে অন্তর্বিরোধশূন্য হওয়া অসম্ভব। সঙ্কীর্ণ, ও সীমাবদ্ধ যাহা তাহাই অভ্যন্তরীণ বিরোধদুষ্ট। নিম্নলিখিত যুক্তিদ্বারা ইহা বোধগম্য করা যাইতে পারে। ধরুন ক একটি খণ্ড বস্তু; ইহা ছাড়া আর অন্ততঃ একটা পদার্থ নিশ্চয়ই থাকিবে, যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে খ। এখন ক-র স্বতন্ত্র রূপটা বুঝিতে হইলে খ-র সহিত উহার তুলনা করা ও সম্বন্ধ স্থাপন করা দরকার; খ-র সহিত ক-র সাদৃশ্য কোথায়, পার্থক্যই বা কি তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়াই শুধু ক-র স্বতন্ত্র-রূপ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ক-র প্রকৃতি বা বিশেষ রূপ (nature or distinctive character) ক-র নিজস্ব সত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, উহা ক-র সসীম সত্তার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া খ-র সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেছে। কিন্তু যদিও ক-র প্রকৃতি তাহার অস্তিত্বের সীমানা অতিক্রম করিয়া একটা ব্যাপকতা লাভ করিতেছে এবং খ-কেও আলিঙ্গন করিতেছে, অস্তিত্বের দিক হইতে কিন্তু 'ক' 'খ'-কে বাদ দিয়া একটা সঙ্কীর্ণতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। 'ক'-র মধ্যে সত্তার (existence) ও স্বরূপের (nature) এই যে বিরোধ,

অস্তিত্বের ও ধর্মের এই যে বিরোধ তা' 'ক'-র সসীমতারই অপরিহার্য ফল; সুতরাং 'ক'-র সসীমতাই "ক'-কে অন্তর্বিরোধদুষ্ট করিয়া অসত্য" প্রমাণিত করিতেছে। অনুরূপ যুক্তি প্রয়োগ করিয়া দেখানো যাইতে পারে যে সসীম 'খ' ও পারমার্থিক সত্তার অধিকারী হইতে পারে না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে পরম সত্য যাহা তাহা হইবে পূর্ণ আত্ম-সঙ্গতিসম্পন্ন, সর্বব্যাপক, এক ও অদ্বিতীয় (One unitary all-comprehensive, perfectly self-coherent whole)। কিন্তু এবার প্রশ্ন উঠিবে, এই সর্বব্যাপক অদ্বিতীয় পারমার্থিক সত্তা কোন্ উপাদানে গঠিত, এবং জীব ও জগতের সঙ্গে উহার প্রকৃত সম্বন্ধটিই বা কি? অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাণ্ড রিয়ালিটি (Appearance and Reality) নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগে (যাহা অ্যাপিয়ারেন্স নামে অভিহিত) ব্র্যাড্‌লে আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান-লব্ধ বিভিন্ন বিষয়-বস্তু (objects of experience) বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারের দ্বারা উহাদের প্রত্যেকের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। যে সকল ব্যাপক ও অপরিহার্য বুদ্ধিপ্রত্যয়ের সাহায্যে আমরা জগতকে বুঝিবার চেষ্টা করি এবং আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি গড়িয়া তুলি উহাদের প্রত্যেকটিকে ব্র্যাড্‌লের ক্ষুরধার বিশ্লেষনের নিকট উহার তাত্ত্বিক মূল্যের পরীক্ষা দিতে হইয়াছে। মুখ্য ও গৌণ গুণাবলী, দ্রব্য ও গুণ, দেশ ও কাল, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, অহং, আত্মা প্রভৃতির প্রত্যয়নিচয়কে ব্র্যাড্‌লে খুব সুনিপুনভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং সর্বত্রই তিনি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ইহাদের কোনটিই আমাদিগকে সত্যের সন্ধান দিতে পারে না,—মিথ্যার ও অনৃতের দ্যোতক ইহারা সকলে। নানাভাবে নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া ব্র্যাড্‌লে সমস্ত পদার্থের ও সমস্ত বুদ্ধি প্রত্যয়ের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এখানে শুধু দুই একটা মূল যুক্তির আলোচনা দ্বারা ব্র্যাড্‌লের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীটি বুঝাইতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে।

আমরা যখন কোন জিনিষকে গুণবিশিষ্ট দ্রব্য বলিয়া অথবা দেশকালে অবস্থিত পদার্থ বলিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি তখন আমরা জিনিষটাকে বুঝিতে চাই নানারূপ সম্বন্ধ ও পার্থক্যের মধ্য দিয়া, বহুকে একের মধ্যে, সংগ্রথিত করিয়া। যে কোন বস্তু সম্বন্ধে আমরা দেখি

যে উহাতে একাধিক গুণের সমাবেশ হইয়াছে। ঐ গুণাবলীর সংহতিকেই আমরা বস্তুর প্রকৃতি বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকি। এখন প্রশ্ন হইল, কি ভাবে কোন্ তত্ত্বের দ্বারা ঐ গুণসমূহ সংহত বা একত্রীভূত হইতেছে? এ বিষয়ে সাধারণ ধারণা হইল যে, গুণাশ্রয় কোন দ্রব্যবিশেষের মধ্যে গুণসমুদায় সংহত বা সংগ্রথিত হইতেছে। কিন্তু প্রথমতঃ গুণের অতিরিক্ত কোন কিছুই আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয় না। দ্বিতীয়তঃ, যদিও গুণাতিরিক্ত দ্রব্য বলিয়া কোন তত্ত্ব আমরা স্বীকার করিয়া লই, তখন উহার একত্রীকরণ ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিবে, অর্থাৎ ঐ দ্রব্য কতদূর পর্য্যন্ত তাহার প্রয়োজন সাধন করিতে পারে তাহা ভাবিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। যেহেতু দ্রব্য গুণাবলী হইতে স্বতন্ত্র, সুতরাং দ্রব্যও বহুর পাশে একটি বৃহত্তর বহুর অংশবিশেষ হইয়া পড়িল না কি? অখণ্ডত্ব পাইতে হইলে দ্রব্য ও গুণাবলীকে একত্রে সংগ্রথিত বা একত্রীভূত করিতে পারে এমন আর একটি তত্ত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না কি? কিন্তু এ পথে অগ্রসর হইলে অনবস্থা (infinite regress) দোষের উদ্ভব হয়; তত্ত্বের পর তত্ত্ব স্বীকার করিয়া একীকরণ আর হইয়া উঠে না। যদি বলা হয় যে দ্রব্য বলিয়া কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন, গুণসমূহ নিজেরাই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বস্তুসংহতি গড়িয়া তোলে, তখনও সমস্যার সমাধান হয় না। প্রথমতঃ একাধিক গুণের সমষ্টিও একটি গুণ, এবং গুণমাত্রেরই একটি আধার বা আশ্রয় প্রয়োজন। গুণ কখনো আধার ব্যতীত আত্মনির্ভরশীল হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। যদি বলা হয় এককভাবে না হইলেও সমষ্টিরূপে গুণাবলী আত্মনির্ভরশীল তখন সেই সংহত গুণসমষ্টির অন্তরে একটি সংযোগ বা মিলনসূত্র স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয়; অথচ এই মিলনসূত্রটির স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলেই আবার জটিলতার উদ্ভব হইতে বাধ্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যদিও একের মধ্যে বহু সর্বত্রই সংগ্রথিত ও সংহত তবু বুদ্ধির নিকট এক ও বহুর এই সমন্বয়কে আমরা কিছুতেই বোধগম্য করিতে পারি না। জগতকে বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে গিয়া প্রথমেই আমরা অনন্ত ভেদসৃষ্টি করিয়া বহুর মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি; পরে নানারূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বহুকে আবার একের সমন্বয়ে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করি বটে, কিন্তু প্রকৃত সমন্বয়সূত্র বা একীকরণক্ষম তত্ত্বের কোন সন্ধান আমরা পাই না।

আমাদের জ্ঞানোন্মেষের প্রথম অবস্থা নির্বিকল্প জ্ঞান বা অনুভূতি (immediate experience), এই নির্বিকল্প জ্ঞানের মধ্যে অনন্ত বহুর একটা সমন্বয় হইয়াছে, অথচ সেখানে বহুর কোন বিশিষ্টরূপ নাই, সম্বন্ধ সম্বন্ধীয় ভেদ তখনো সৃষ্টি হয় নাই। ভেদাত্মক বুদ্ধির ক্রিয়া আরম্ভ হইলেই নির্বিকল্প জ্ঞানের সেই সমন্বয় ভাঙ্গিয়া যায়, এবং বিশিষ্টরূপ নিয়া অনন্ত বৈচিত্র্য স্বতন্ত্রভাবে আমাদের সবিকল্প জ্ঞানের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু এই বিভিন্ন রূপবৈচিত্র্যকে এবং গুণবহুত্বকে বুদ্ধি আর অখণ্ড সমন্বয়ের মধ্যে সম্মিলিত করিতে পারে না। নানারূপ সম্বন্ধের সাহায্যে বুদ্ধি নির্বিকল্প জ্ঞানের লুপ্ত সমন্বয়কে ফিরাইয়া পাইবার চেষ্টা করে বটে কিন্তু বুদ্ধিনির্মিত সমন্বয় ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও পারমার্থিক সত্যের কোন সন্ধান দেয় না। বুদ্ধি সমন্বয় করিতে চেষ্টা করে বহুর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, কিন্তু সম্বন্ধ সম্বন্ধীয় যে ব্যবস্থা তাহা আভ্যন্তরীণ বিরোধে পরিপূর্ণ। ধরুন ক ও খ দুটি সম্বন্ধী যাহারা সম্বন্ধ ম-র দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এখন ক ও খ-কে যুক্ত করিতে হইলে ক ও খ উভয়ের সঙ্গেই পৃথগ্‌ভাবে ম-র সংযোগ বা সম্বন্ধ থাকা চাই। কিন্তু ক-র সঙ্গে ম-র সংযোগ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে ম$_1$ নামক আর একটি সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়; সেইরূপ খ-র সঙ্গে ম-র সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে ম$_2$ নামক আর একটি সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এরূপভাবে ক ও খ-র মিলনসূত্র বুঝিতে গিয়া আমাদিগকে ১টি, ২টি, ৪টি, ৮টি করিয়া অগণিত সম্বন্ধ টানিয়া আনিতে হইবে; ফলে ক ও খ-র ব্যবধান ক্রমশই বাড়িয়া গিয়া উহাদের মিলন রহস্য বুদ্ধির অনধিগম্য হইয়া পড়িবে। ক ও খ ইহাদের প্রত্যেকের অভ্যন্তরেও এই একই অনবস্থা দোষ পরিলক্ষিত হইবে। ক-র সম্বন্ধ ক-কে আশ্রয় করিয়াই সম্ভব, ক-কে বাদ দিয়া অবস্থান করিতে পারে না। এদিকে আবার ক-র সমগ্র প্রকৃতিটি বিভিন্ন সম্বন্ধের সমাবেশ হইতেই উদ্ভূত, সম্বন্ধকে বাদ দিয়া ক-র স্বরূপই নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং সম্বন্ধ সম্বন্ধীর মধ্যে আমরা পাইতেছি একটা চক্রক দোষ (vicious circle) আবরা বিভিন্ন সম্বন্ধের দরুণ ক-র প্রকৃতির মধ্যেও একটা বহুত্ব মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে। নানাবিধ সম্বন্ধ হইতে ক-র মধ্যে বিভিন্ন গুণ উৎপন্ন হয়।

এই সম্বন্ধঘটিত গুণসকলের (relational qualities) সংহতিই ক-র প্রকৃতি, অথচ এই সংহতি বুদ্ধির অনধিগম্য।

হেগেল, গ্রীণ কেয়ার্ড প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলেন যে এক ও বহুর সমন্বয়ের একটি সুন্দর সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই। সেই দৃষ্টান্তস্থল হইতেছে আমাদেরই আত্মচেতনা। বিষয়-বিষয়ী স্বরূপ আত্মচেতন পুরুষের মধ্যে বহু একের দ্বারা অতি চমৎকারভাবে বিবৃত হইতেছে এবং সেই একই বহুর মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। আমরা যখন আমাদের নিজেদের বিভিন্ন ভাবরাশি সম্বন্ধে সচেতন হই তখন সেই ভাবসমূহের বহুত্ব ও বিশিষ্টরূপ নষ্ট হয় না, যদিও উহারা আমাদের অখণ্ড সত্তার সহিত এক ও অভিন্ন। বহু কি করিয়া বহুত্ব বজায় রাখিয়াও এক অখণ্ড মিলনসূত্রে বিধৃত ও সংগ্রথিত হইতে পারে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আত্মচেতন পুরুষের জীবন। ব্র্যাড্‌লে আত্মচেতনার এই গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ প্রকৃতি যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই বলিয়াই একের সহিত বিচিত্ররূপবিশিষ্ট বহুর সম্মিলন মাত্রকেই তিনি আত্মবিরোধদুষ্ট বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু হেগেল-পন্থীদের এই যুক্তি ব্র্যাড্‌লের নিকট শূন্যগর্ভ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ব্র্যাড্‌লে বলেন যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের আলোকে আত্মচেতনার মধ্যেও নানারূপ অন্তর্বিরোধ প্রকট হইয়া উঠে। এখানে ঐরূপ একটি মাত্র স্ববিরোধের উল্লেখ করাই যথেষ্ট হইবে। আত্মচেতনার মধ্যে একটা বিষয়-বিষয়ী, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা ভেদ আছে। বিষয়কে বিষয় হিসাবে বুঝিতে হইলে বিষয়ী হইতে উহার ভেদ এবং বিষয়ীর সহিত উহার সম্বন্ধ জানা দরকার। কিন্তু বিষয়ীকে বিষয়বৎ জানিতে না পারিলে এইরূপ ভেদ ও সম্বন্ধজ্ঞান অসম্ভব; অথচ যে মুহূর্ত্তে বিষয়ীকে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধের একটি অন্তরূপে জানা গেল, সে মুহূর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ী বিষয়ে পরিণত হইল, এবং প্রকৃত 'বিষয়ী' এই বিষয়-বিষয়ী সম্বন্ধের অতীতে সর্ব্ব সম্বন্ধ বর্জিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু আবার সেই বিষয়ীকেও তাহার স্বরূপে বুঝিবার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব পরিস্থিতিরই পুনরাবৃত্তি ঘটিতে বাধ্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিষয়-বিষয়ী সম্বন্ধযুক্ত আত্মচেতনা আত্মবিরোধপূর্ণ। সুতরাং আত্মচেতনাকেও এক ও বহুর সমন্বয়কারক তত্ত্বরূপে গ্রহণ করা চলে না। ব্র্যাড্‌লে বলেন যে

সবিকল্পজ্ঞান ও বিষয়-বিষয়ীর ভেদ নির্বিকল্প অনুভূতি হইতেই বুদ্ধির ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু নির্বিকল্প অনুভূতির যে অখণ্ডত্ব ও একত্ব একবার বিলুপ্ত হইয়াছে বুদ্ধি সহস্র সম্বন্ধের দ্বারা ও নিজের চেষ্টায় আর সেই অখণ্ডত্ব ফিরাইয়া আনিতে পারে না। বিকল্পাত্মক আত্ম-চেতনা ব্যাপক নির্বিকল্পজ্ঞানের অসম্পূর্ণ ও স্ববিরোধদুষ্ট অথচ অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ও অভিব্যক্তি।

বস্তু, ব্যক্তি, দেশকাল প্রভৃতি পরিদৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক অংশ সম্বন্ধেই—দ্রব্য ও গুণ, কার্য্য ও কারণ প্রভৃতি প্রত্যেক মূল প্রত্যয় সম্বন্ধেই—ব্র্যাড্‌লে বহু যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে সম্বন্ধাত্মক বলিয়া তাহারা অন্তর্বিরোধপূর্ণ এবং সেই কারণে মিথ্যা। আমাদের সবিকল্পজ্ঞানের কোন বিষয়বস্তুকেই আমরা পারমার্থিক সত্তার অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিনা, কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে পারমার্থিক সত্তা সুসমঞ্জান ও আত্মসঙ্গতিসম্পন্ন। কিন্তু মিথ্যা হইলেও অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তার অধিকারী না হইলেও পরিদৃশ্যমান জগৎ নিছক অভাবাত্মক বা শূন্যগর্ভ হইতে পারে না, কারণ উহা আমাদের অনুভূতি ও জ্ঞানের বিষয়বস্তু। সুতরাং ভাবাত্মক অথচ মিথ্যা এই জগতের যথার্থ স্থান কোথায়? পারমার্থিক সত্তা এক ব্রহ্মের বাহিরে ইহা পড়িতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত; অথচ ব্রহ্মের অন্তরেই বা মিথ্যার স্থান হয় কিরূপে? ব্রহ্মের অন্তর্গত হইলে জগতের মিথ্যাত্ব ব্রহ্মকেও স্পর্শ করিতে বাধ্য নয় কি? ব্র্যাড্‌লে বলেন যে জগতের বিভিন্ন অন্তর্বিরোধপূর্ণ অংশ ব্রহ্মের মধ্যেই রূপান্তরিত অবস্থায় অবস্থান করে এবং উহাদের উপাদানেই ব্রহ্ম বস্তুতঃ গঠিত। আমাদের অনুভূতির এক অংশকে যখন আমরা বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করি তখনই উহাতে স্ববিরোধ দেখা দেয় এবং মিথ্যারূপে উহা প্রতিভাত হয়। কিন্তু অনন্ত মিথ্যারাজি যখন ব্রহ্মের মধ্যে সম্মিলিত হয় তখন একের আভ্য-ন্তরীণ গলদ অপরের সংস্পর্শে বিদূরিত হয় এবং পারস্পরিক অন্তর্প্রবেশ-জনিত এক অভাবনীয় রূপান্তরের ফলে সবিকল্পজ্ঞানের মিথ্যা বিষয়সমূহ পরম সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিণত হয়। এই রূপান্তর ও পরিণতি কি করিয়া সম্ভব হয় তাহা বুদ্ধির দ্বারা আমরা সম্যক্ ধারণা করিতে পারি না, কিন্তু তবুও ইহাই চরম সত্য; কারণ দার্শনিক বিচার এই সিদ্ধান্তেই

আমাদিগকে নিঃসংশয়ে পৌঁছাইয়া দেয়। সঙ্গতির মধ্যে অসঙ্গতির রূপান্তর যে সম্ভব তাহার প্রমাণ আমরা প্রত্যক্ষ হইতেই লাভ করি। আমাদের দেহের কোন অংশবিশেষের যন্ত্রণা আমাদের সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ বা আনন্দবোধের মধ্যে রূপান্তরিত হয়; অথবা কোন যন্ত্রমধ্যস্থ অংশসমূহের পারস্পরিক সংঘর্ষ সমগ্র যন্ত্রটির সুসমঞ্জস ও সুসম্বদ্ধ কার্য্য-পদ্ধতিরই অপরিহার্য্য অঙ্গ। সুতরাং বিরোধ ও সংঘর্ষ কিরূপে একটা ব্যাপক সমন্বয়ের অংশ হইতে পারে আমাদের অভিজ্ঞতায় তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আবার ব্রহ্মের মধ্যে মিথ্যার রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী, কারণ ভাবাত্মক (positive entity) মিথ্যাও ব্রহ্মের বাহিরে পড়িতে পারে না, এবং ব্রহ্ম আত্মসঙ্গতিসম্পন্ন বলিয়া ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থানকালে মিথ্যার অসঙ্গতি বিলুপ্ত না হইয়া পারে না। সুতরাং যাহা সম্ভবও বটে এবং অবশ্যম্ভাবীও বটে, তাহা বস্তুতঃ সত্য না হইয়া পারে না। (What must be and also may be surely is).

এবার ব্রহ্ম (Absolute) সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে তিনি এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণ আত্মসঙ্গতিসম্পন্ন বিকল্পাতীত পুরুষ। আমাদের জ্ঞানের সমস্ত বিষয়বস্তু, সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া অন্তর্বিরোধমুক্ত এক মহাসমন্বয়ে বিধৃত হইতেছে। ব্রহ্মকে পুরুষ (Experience or spirit) বলিব এইজন্য যে অনুভূতি বা চেতনাই Absoluteএর স্বরূপ যদিও সেই অনুভূতি অপরোক্ষ এবং সেই চেতনা বিকল্পাতীত। অনুভূতি বা চেতনার সম্পূর্ণ বহির্ভূত কোন সত্তা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আমরা প্রত্যক্ষ করি সে সমস্তই অপরোক্ষানুভূতি হইতে বুদ্ধির ক্রিয়াদ্বারা উদ্ভূত হইয়া একটা বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই সকল বুদ্ধি নির্মিত দৃশ্যবান বস্তুদ্বারাই ব্রহ্ম গঠিত, এবং ইহাদের রূপান্তরের ফলে যে অখণ্ড অনির্ব্বচনীয়, বুদ্ধির অনধিগম্য, অনুপম চেতনার উৎপত্তি তাহাই ব্রহ্মের পরম সম্পদ। ব্রহ্মকে শুধু পরম জ্ঞান (Absolute knowledge or Thought) অথবা পরা শক্তি (Absolute Will or Power) অথবা পরম প্রেম বা আনন্দ (Absolute Love or Bliss) বলিয়া নির্দ্দেশ করা ব্র্যাড্লের মতে অযৌক্তিক। আবার এ কথা বলাও যুক্তিবিরুদ্ধ যে জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম এই তিনই ব্রহ্মস্বরূপের তিনটি অবিকৃত দিক। কারণ

ইহারা সকলেই ব্রহ্মস্বরূপের অন্তর্গত হইলেও ব্রহ্মের মধ্যে সম্মিলিত হইয়া ন্যূনাধিক রূপান্তরিত হইয়া যায়। ইহাদের রূপান্তরজনিত যে অনির্ব্বচনীয় অবস্থা তাহাই ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মের মধ্যে জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ এই সমস্তই বিদ্যমান থাকিলেও ইহাদের কোনটির মধ্যে পৃথগ্-ভাবে অথবা ইহাদের সকলের মধ্যে সম্মিলিত ভাবে ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ নহেন।

এবার ব্রহ্মের সহিত আমাদের জীবনের তিনটি সর্ব্বোচ্চ আদর্শ, সত্য, শিব ও সুন্দরের (Truth, Goodness and Beauty) সম্বন্ধ নির্ণয় করা দরকার। ব্র্যাড্‌লে বলেন যে উহারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও না, আবার অভিন্নও না, অথবা বলা যাইতে পারে যে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। সত্য আমাদের জ্ঞানের অনুবন্ধী (Correlative), অর্থাৎ জ্ঞানকে বাদ দিয়া সত্যের বিশিষ্টরূপ কল্পনা করা যায় না: সেইরূপ শিব আমাদের ইচ্ছা-শক্তির অনুবন্ধী, এবং সুন্দর আমাদের আবেগময়ী প্রকৃতির অথবা প্রেমতৃষ্ণার অনুবন্ধী। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে ব্র্যাড্‌লের মতে জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম ইহারা সকলেই ব্রহ্মের মধ্যে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং সত্য, শিব ও সুন্দর নিজেদের বিশিষ্টরূপ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয় স্বরূপে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু পরাৎপর ব্রহ্মই আবার একদিকে জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম এবং অপরদিকে সত্য, শিব ও সুন্দরের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন, যদিও ভেদ ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া এই আত্মপ্রকাশ ব্রহ্মের অখণ্ড পূর্ণতাকে কিছু পরিমাণ বিকৃত করিতে বাধ্য। সত্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন, কারণ সত্য যে পর্য্যন্ত না ব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন হইতেছে সে পর্য্যন্ত তাহাকে আমরা পূর্ণ সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারি না, অথচ সর্ব্বভেদবর্জিত নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাওয়ার ফলে সত্যের বিশিষ্টরূপ লুপ্ত হইয়া যায়। শিব ও সুন্দর সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রয়োজ্য।

জগতের অন্যান্য বস্তুর ন্যায় চেতনাময় জীবও ব্র্যাড্‌লের মতে এক সর্ব্বগত রূপান্তরের ফলে আত্মস্বাতন্ত্র্য উৎসর্গ করিয়া ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ সত্তার অঙ্গীভূত হয়। জীবেরও স্বরূপের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ বিদ্যমান; আত্মচেতনের মধ্যে যে এক ও বহুর অন্তর্বিরোধমুক্ত সমন্বয় সাধিত হয় না, তাহা পূর্ব্বেই দেখানো হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে জীবগণের

কোন স্বতন্ত্র সত্তা না থাকিলেও রূপান্তরিত অবস্থায় নির্বিশিষ্টভাবে তাহারা ব্রহ্মের অপূর্ব্ব সম্পদ। বিভিন্ন জীবকে কেন্দ্র করিয়াই অরূপ ব্রহ্মের অনন্ত রূপবৈচিত্র্যে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব হয়। অনেকে জীবাত্মাকে অনাদি, অনন্ত, নিত্যপূর্ণ ও স্বয়ম্ভু বলিয়া মনে করেন। অনেকে আবার জীবকে ব্রহ্মের অংশরূপে স্বীকার করিলেও জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য মানিয়া লন এবং উহাকে অনাদি ও অনন্ত বলাও অসঙ্গত মনে করেন না। অনেক চরমপন্থী আবার জীবাত্মাকে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক মনে করিয়া জীবাত্মা ও ব্রহ্মের অভিন্নত্বই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। ব্র্যাড্‌লের মতে জীবাত্মা ব্রহ্মের অংশ বটে, কিন্তু ব্রহ্মের অংশরূপে তাহার আত্মস্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। পরিদৃশ্যমান জড়জগতের মত জীবনসমষ্টিকেও এক ব্যাপক রূপান্তরের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে হয়।

সর্ব্বশেষে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে ব্র্যাড্‌লের মত কি তাহা জানা দরকার। ব্র্যাড্‌লে বলেন যে মানুষের ধর্ম্মগত চেতনার নিকট আত্মচেতন, সর্বমঙ্গলময়, প্রেমময় যে ঈশ্বর আবির্ভূত হন, দার্শনিক বিচারে তাঁহাকেও পারমার্থিক সত্তার অধিকারী বলিয়া মনে করা যায় না। ঈশ্বরের প্রকৃতিতেও আত্মবিরোধ আছে; একটু গভীরভাবে ভাবিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে। প্রথমতঃ আত্মচেতনার মধ্যেই যে স্ববিরোধ অন্তর্নিহিত, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরের প্রকৃতির মধ্যে জীব ও জগতের সহিত কতকগুলি সম্বন্ধ অনুস্যূত আছে। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা হিসাবেই তিনি ঈশ্বর। জীবের নিয়ন্তা ও ভাগ্য-বিধাতা হিসাবেই তিনি তাহার শ্রদ্ধা ও ভক্তির চরম লক্ষ্য এবং আরাধনার দেবতা হিসাবেই তিনি ঈশ্বর। এই সকল সম্বন্ধ ঈশ্বরের প্রকৃতির মধ্যে আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতির কারণ হইতেছে। সুতরাং বলিতে হইবে যে ঈশ্বরও অব্যক্ত ব্রহ্মের একটি অসম্পূর্ণ ব্যক্তরূপ,—পূর্ণ আত্মসঙ্গতিসম্পন্ন পরম সত্তার অন্তর্বিরোধদুষ্ট অভিব্যক্তি। অবশ্য ঈশ্বর ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন না হইলেও ব্র্যাড্‌লে খুব জোরের সহিতই বলিয়াছেন যে আমাদের জ্ঞানে ঈশ্বরকেই আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসাবে উপলব্ধি করি। একদিক দিয়া বিচার করিলে আমাদের জ্ঞানের বিষয়মাত্রই আত্মবিরোধদুষ্ট অতএব মিথ্যা অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য নহে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি

যে এই সকল "মিথ্যার" উপাদানেই আবার ব্রহ্ম গঠিত। ব্যাপক রূপান্তরের মধ্য দিয়া মিথ্যা সমূহই পরম সত্যের অঙ্গীভূত হইতেছে। সুতরাং সর্ব্বৈব মিথ্যা ও অলীক কিছুই থাকিতে পারে না। প্রত্যেক মিথ্যার মধ্যেই কিছু পরিমাণ সত্য অন্তর্নিহিত আছে। তা ছাড়া আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে আত্মসঙ্গতি কথাটা ব্র্যাড্‌লে তর্কশাস্ত্রের সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নাই। আত্মসঙ্গতি ও ব্যাপকতা (self-coherence and comprehensiveness) এই দুইটি তিনি একই সত্যস্বরূপের অবিচ্ছেদ্য দুইটি দিক্ বলিয়া মনে করেন। সুতরাং জ্ঞাত পদার্থসমূহের মধ্যে যখন দেখি যে উহাদের কোনটি বেশী কোনটি বা কম ব্যাপক, অর্থাৎ যখন দেখি যে উহাদের কোনটির সাহায্যে জ্ঞানরাজ্যের বৃহত্তর অংশ বুদ্ধির সহজগম্য হইয়া উঠে, কোনটির দ্বারা বা অনুভব ক্ষেত্রের অতি সামান্য অংশের উপরই আলোকসম্পাত হয়, তখন আমরা স্পষ্টভাবে বুঝি যে সত্যের আত্মপ্রকাশের মধ্যে তারতম্য আছে। ব্যাপকতা ও আত্ম-সঙ্গতির দিক্ হইতে যাহা গরীয়ান্ তাহা পারমার্থিক সত্তার নিকটতর; কেননা উহার আভ্যন্তরীণ বিরোধ অপেক্ষাকৃত সামান্য রূপান্তরের ফলেই ব্রহ্মপ্রকৃতির সমন্বয়ের মধ্যে নির্বাণ লাভ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ব্যাপকতা ও আত্মসঙ্গতির দিক্ হইতে যাহা নিকৃষ্ট পরম সত্য হইতে তাহার দূরত্ব সর্ব্বাধিক এবং মিথ্যার নিম্নতম স্তরে তাহার অবস্থিতি, কারণ আমূল রূপান্তরের ফলে ব্রহ্মের বুকে ইহার স্বরূপ একরূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। সুতরাং জড়, প্রাণ, মন, ঈশ্বর প্রভৃতি একদিক্ হইতে মিথ্যা হইলেও ইহাদের কোনটি পরম সত্তার নিকটতর বলিয়া অধিকতর সত্য, আবার কোনটি ব্রহ্ম হইতে অধিকতর দূরে বলিয়া অধিকতর মিথ্যা। জড় হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে মন, মন হইতে ঈশ্বর অধিক আত্মসঙ্গতিপূর্ণ ও ব্যাপক, অতএব ব্রহ্মের নিকটতর ও অধিক সত্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ঈশ্বর ব্রহ্মের অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হইলেও আমাদের অভি-জ্ঞতার মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মের স্বরূপে আমাদের জ্ঞানের সীমানা অতিক্রান্ত হয় এবং আমাদের স্বতন্ত্র সত্তাও সেখানে বিলুপ্ত হয়।

পারমার্থিক সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে ব্র্যাড্‌লের অভিমত সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। এবার দুই একটা বিষয়ের সমালোচনা করিয়াই প্রবন্ধ-শেষ করিব।

আমাদের জ্ঞানের অন্তর্গত সর্ববস্তু সম্বন্ধেই ব্র্যাড্‌লে বলেন যে উহারা মিথ্যা হইলেও ব্রহ্মের বাহিরে পড়িতে পারে না ; ব্রহ্মের অন্তরেই উহাদের ঐসব স্থান, এবং ঐসব উপাদানেই ব্রহ্ম গঠিত। (The appearances are the stuff of which the Absolute is made.) ব্রহ্মের বিরাট পূর্ণতা সাধনে উহারা প্রত্যেকেই ন্যূনাধিক সহায়তা করে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে এখানে একটী জটিল সমস্যার উদ্ভব হইতেছে। অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় মিথ্যা কখনো সত্যের অন্তর্গত ও অঙ্গীভূত হইতে পারে না। ব্র্যাড্‌লে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে শুধু রূপান্তরের মধ্য দিয়া আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের অন্তরে স্থানলাভ করিতেছে। প্রত্যেক দৃশ্যমান পদার্থ আত্মবিরোধদুষ্ট, সুতরাং অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ব্রহ্মের অঙ্গীভূত হইলে ব্রহ্মও সেই আত্মবিরোধজনিত মিথ্যা দ্বারা কলুষিত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক দৃশ্যমান বস্তুর দুইটী দিক্, একটী তার বহিরঙ্গ, স্ববিরোধকলঙ্কিত মায়াময় বাহ্যরূপ, আর একটী তার অন্তরঙ্গ অর্থাৎ রূপান্তরিত অব্যক্ত অবস্থা। দৃশ্যমান বস্তু সমূহের শেষোক্ত এই রূপান্তরিত অবস্থামাত্রই (Transmuted alter ego) ব্রহ্মের অঙ্গীভূত হইবার উপযুক্ত। সুতরাং পরিদৃশ্যমান জগতের অবক্ত্য রূপান্তরিত সত্তা ব্রহ্মের অন্তর্গত হইলেও প্রশ্ন উঠিবে যে, উহার বহিরঙ্গের অর্থাৎ মায়াময় বাহ্যরূপের স্থান কোথায় বা আশ্রয় কি? দৃশ্যমান বস্তুরূপেই দৃশ্যমানের আশ্রয় কি হইতে পারে সেই প্রশ্নের কোন সদুত্তর আমরা ব্র্যাড্‌লের দর্শনে খুঁজিয়া পাই না।

ব্র্যাড্‌লীয় দর্শনে আর একটি বড় প্রশ্ন উঠে সৃষ্টিরহস্যকে কেন্দ্র করিয়া। দৃশ্যমান পদার্থসমূহ অল্পবিস্তর রূপান্তরের মধ্য দিয়া ব্রহ্মের অনির্বচনীয় অজ্ঞাত স্বরূপ গড়িয়া তুলিতেছে। কিন্তু নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ব্রহ্মের পক্ষে বৈচিত্র্যময় এ মিথ্যার রাজ্যে নামিয়া আসিবার প্রয়োজন কি? অখণ্ড অদ্বৈত ব্রহ্ম হইতে দ্বন্দ্বময় এই দ্বৈত জগতের উদ্ভব ও সৃষ্টির হেতু কি? শঙ্করপন্থী মায়াবাদীর পক্ষে এই প্রশ্নের গুরুত্ব হ্রাস করিবার একটি পথ আছে। তাঁহারা বলিবেন ব্রহ্মের দিক্ হইতে জগৎ সম্পূর্ণ তুচ্ছ, ইহার কোনরূপ অস্তিত্বই নাই, সুতরাং জগতের মধ্যে ব্রহ্মের নামিয়া

আসিবার বা আত্মপ্রকাশ করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না। ব্রহ্মের উপর মিথ্যা জগতের অধ্যাস বুঝাইবার জন্য তাঁহারা আবরণ-বিক্ষেপময়ী মায়া-শক্তির আশ্রয় নিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের এই মায়া ধারণাতীত, সদসদ্-বিলক্ষণা, "মহাদ্ভুতানির্বচনীয়স্বরূপা"। ব্র্যাড্‌লে বলেন যে সম্বন্ধপ্রাক্ নির্বিকল্প-অনুভূতির অখণ্ডত্ব ভাঙ্গিয়া সম্বন্ধমূলক বুদ্ধির ক্রিয়ার ফলে বহুত্ব-বিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্ম এই বহুত্ববিশিষ্ট দৃশ্যমান জগতের রূপান্তরিত সম্বন্ধাতীত নির্বিশেষ অবস্থা। কিন্তু সম্বন্ধপ্রাক্ নির্বিকল্প অনুভূতি এবং সম্বন্ধবিশিষ্ট জগৎ এই দুই-ই অসম্পূর্ণ ও অস্থায়ী। বৈচিত্র্য-ময় জগৎ নির্বিকল্প জ্ঞানের স্বাভাবিক পরিণতি, আবার অখণ্ড নির্বিশেষ ব্রহ্ম নামরূপাত্মক জগতের চরম সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হইল, যে অস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ নির্বিকল্প জ্ঞানের মধ্যে নামিয়া আসিয়া নামরূপাত্মক মিথ্যা বিস্তার করিবার তাৎপর্য্য ও নিগূঢ় উদ্দেশ্য কি? বুদ্ধির ক্রিয়ার মধ্য দিয়া রূপবৈচিত্র্যের বিকাশ সম্বন্ধে ব্র্যাড্‌লে বহুস্থানে আত্মস্ফুরণ, আত্ম-অভি-ব্যক্তি প্রভৃতি কথা ব্যবহার করিয়াছেন। অথচ সমগ্র ব্র্যাড্‌লীয় দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হইল যে সম্বন্ধযুক্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া, নামরূপের মধ্য দিয়া সত্য কখনো আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না; সমস্ত সম্বন্ধ ও রূপবৈচিত্র্যকে এক অরূপ অনির্দেশ্য অখণ্ডতার মধ্যে রূপান্তরিত করিয়াই সত্য আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এককে বহুর মধ্যে, অরূপকে রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশ করিবার এই মিথ্যা ও অসম্ভব প্রয়াস কেন? আর এই অসম্ভব প্রয়াসকে পূর্ণজ্ঞান ব্রহ্মতে আরোপই বা করা যায় কিরূপে? ব্র্যাড্‌লে এখানে নিরুত্তর। তিনি শুধু এক যায়গায় বলিয়া-ছেন যে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা দর্শনের দিক্ হইতে অসঙ্গত, কারণ এই প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধির সাধ্যাতীত। কিন্তু ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধটি এই দিক্ হইতে না বুঝিতে পারিলে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান লাভ করিতে পারি না এবং দার্শনিক যুক্তি ঘুরিয়া ফিরিয়া অনন্ত জটিলতার সৃষ্টি করিতে বাধ্য। পাশ্চাত্য দর্শন ছাড়িয়া ভারতীয় দর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই চরম রহস্য উদ্‌ঘাটনের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমাদের চোখে পড়ে। পাশ্চাত্য দর্শন প্রধানতঃ অখণ্ড সত্তা ও অনন্ত জ্ঞানের সাহায্যেই জগদ্রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মানুষের জিজ্ঞাসু মন একটা পরম প্রশান্তির মধ্যে পরিতৃপ্ত

হইতে পারে না। ভারতীয় ঋষির দৃষ্টিতে আনন্দই সৃষ্টির চরম উৎস। এই আনন্দ অনাবিল, অনন্ত, বিশুদ্ধ আনন্দ। জগৎ সৃষ্টির মূলে এই অফুরন্ত আনন্দের অহেতুক অভিব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘন ও আনন্দস্বরূপ। এই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিবার লীলাময়ী ব্রহ্মশক্তি অনন্ত বিশ্ববৈচিত্র্য রচনা করিয়া চলিয়াছেন। সত্তা ও শক্তি অভিন্ন, উহারা একই পরব্রহ্মের দুইটি অবস্থা বা দিক্‌।

ঈডিপাস্ এষণা

অধ্যাপক শ্রীশম্ভুনাথ রায়, এম্, এ

পরলোকগত ডক্টর ফ্রয়েড মনোবিজ্ঞান ক্ষেত্রে এক বিরাট বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন। তিনি মানবের নির্জ্ঞান (unconscious) মন সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়া মনোবিজ্ঞানের চলিত ধারণাগুলির আমূল পরিবর্ত্তনের ধারা সূচিত করিয়াছেন। যাঁহারা ঐ সকল তথ্য অবগত আছেন তাঁহাদিগের নিকট এই পরিবর্ত্তনের বিষদ ব্যাখ্যা করা নিস্প্রয়োজন মনে করি। এখানে শুধু ফ্রয়েড কল্পিত মানবের ঈডিপাস্ এষণা বা Oedipal wish সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

ঈডিপাস্ প্রাচীন গ্রীস দেশের অন্তর্গত থীব্সের রাজকুমার। তাহার পিতা তাহার জন্মগ্রহণের পর তাহাকে বনে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কারণ এক ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়াছিলেন যে ঐ পুত্রই তাহার পিতার হন্তা হইবে। প্রাণভয়ে পিতা পুত্রকে বনে পরিত্যাগ করিলেন বটে কিন্তু নিয়তির পরিহাস এমনই যে এক কাঠুরিয়া তাহাকে বন হইতে লইয়া গিয়া কোরিন্থ্ সহরে লালন পালন করিল এবং যৌবনে ঈডিপাস্ অতি সুন্দর ও সবল হইয়া উঠিল। যুদ্ধনিপুণ ঈডিপাস্ উত্তরকালে তাহার পিতাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হত্যা করিল এবং তাহার মাতার পাণিগ্রহণ করিল। অবশ্য ঈডিপাস্ তাহার মাতা বা পিতাকে জানিত না।

অজ্ঞাতসারে মাতার সহিত পরিণয় বা অযাচার মানবমনের একটি গভীরতম বাসনা। ঈডিপাসের গল্পে নাকি ঐ বাসনার পরিতৃপ্তি দেখান হইয়াছে। বিবিধ জাতির কল্পনাপ্রসূত বিভিন্ন উপাখ্যানে ঐ বাসনার প্রকাশ হইয়াছে ও পরিতৃপ্তি ঘটিয়াছে। মানব ইতিহাসের প্রারম্ভে ঐ বাসনা প্রকট ছিল এবং পরে সভ্যতার চাপে উহার অবদমন (repression) ঘটিয়াছে। প্রমান হিসাবে বলা হইয়াছে যে পশুগণের যৌন সঙ্গমের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, কিন্তু মানুষের তাহা নাই। সেইজন্য আদিম যুগে মানুষ তাহার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবার জন্য

তাহাকে কাছে রাখিত, এবং স্ত্রী তাহার পুত্রকে নিজের কাছে রাখিতে চাহিত এবং তাহার ভরণপোষণের জন্য স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিতে পারিত না। ফলে স্বামী স্ত্রী পুত্র লইয়া একটি প্রাথমিক পরিবার গঠিত হইল। কিন্তু পুত্র যৌবন প্রাপ্ত হইলে তাহার যৌন ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিত এবং সে তাহার সহচরী লাভের আকাঙ্খা চরিতার্থ করিতে উৎসুক হইত। কিন্তু বলবান ও নিষ্ঠুর পিতা পাছে সে তাহার মাতা বা মাতৃ-স্থানীয়া অন্য কোন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় এই ভয়ে তাহাকে পরিবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিত, ফলে বিদ্রোহী পুত্রগণ একত্র হইয়া পিতাকে হত্যা করিত ও তাহাদের যৌন ইচ্ছা চরিতার্থ করিয়া পুনঃ স্ব-স্ব স্ত্রীর সহিত বাস করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিবার গঠন করিত। প্রত্যেক পুত্রের মাতার প্রতি অনুরাগ কেবলমাত্র পিতার দাপটে ক্ষুণ্ণ ও অবরুদ্ধ হইয়া থাকিত। কিন্তু অবরুদ্ধ বাসনার উচ্ছেদ হয় না, তাহার প্রকাশ অন্যভাবে ঘটিয়া থাকে। প্রথমে পিতা হইতে যে ভয় উপজাত হইল পরে তাহা সমাজ-নিন্দা ভয়ে পরিণত হইল এবং ব্যক্তির মানসিক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ নিন্দা বা ভয় তাহার অন্তরে উপ্ত হইল। এইরূপে ব্যক্তির (individual) মধ্যে বিবেকের আবির্ভাব ঘটিল। ফলে দাঁড়াইল এই যে যে সকল ইচ্ছা সমাজরীতির বিরোধী তাহার অবদমন হইল, অর্থাৎ সেগুলি ব্যক্তির চেতনা হইতে বিলুপ্ত হইল

স্বপরিবারের মধ্যে বিবাহ, সগোত্রে বিবাহ প্রভৃতি সমাজ নিষিদ্ধ বিবাহে বাধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য অযাচার বাসনার প্রতিরোধ করা। অনেকে বলিবেন পুরুষ কখনও স্বীয় পরিবারভুক্ত নারীকে বিবাহ করিতে চাহে না, কারণ পুরুষের স্বভাব অন্যত্র সহচরী অন্বেষণ করা, অন্য পরিবার-ভুক্ত নারীর সহিত মিলিত হওয়া। কেহ কেহ বলেন নিকট আত্মীয় বা সগোত্রকে বিবাহ করিলে রক্ত দূষিত হয় এবং ব্যাধির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ সমস্ত তর্ক বা বিচারের উদ্দেশ্য আমাদের নির্জ্ঞান মনের অন্তর্ভুক্ত অযাচার বাসনাকে স্বীকার না করা এবং প্রচ্ছন্ন রাখা। এই অযাচার বাসনা আমাদের মনে অবরুদ্ধ আছে এবং অনেক সময়ে উহার প্রকাশ ঘটে, বিশেষ করিয়া স্বপ্নে এবং মানসিক বিকারে। পুঞ্জীভূত বাসনা ও সংবেদনার সমষ্টিকে complex বলা হয়। ঈডিপাস্ গ্রন্থির মূলে যে বাসনা নিহিত রহিয়াছে তাহা এক কথায় বলা যাইতে পারে পিতার

হত্যা সাধন করিয়া মাতাকে লাভ করা। ইহার মধ্যে বৈরী পিতার প্রতি যে দ্বেষ বা ঘৃণা আছে তাহার সহিত যুগ্ম সম্বন্ধে স্থিত মিত্র পিতার প্রতি ভালবাসা। অতএব ঘৃণা বা প্রীতি দ্বিতয় বা দ্ব্যাত্মক (ambivalent) —যখন ঘৃণা প্রকট হইয়া পড়ে প্রীতি তখন নির্জ্জানে পর্য্যবসিত হয়, আবার যখন প্রীতি স্পষ্ট হইয়া উঠে ঘৃণা তখন প্রচ্ছন্ন রূপে থাকে। এমনও হইতে পারে যে পুত্র পিতার সহিত অভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া মাতার ভালবাসা ভোগ করিবে। অথবা সে নিজে স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া পিতাকে আকর্ষণ করে এবং মাতার প্রতি বৈরিতা সাধন করে, এই অবস্থাকে ঈডিপাস্ এষণার বিপরীত ভাব বা inverted Oedipus Complex বলা হয়।

পশু-শিশুর তুলনায় মানব-শিশুর নিঃসহায়তা অধিক কালব্যাপী, সেইজন্য মানব শিশু তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও আহার সরবরাহের জন্য মাতার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। ফলে মাতার প্রতি তাহার টান এত অধিক থাকে যে সে পিতা অপেক্ষা মাতাকেই বেশী ভালবাসে ও মাতার প্রতি পিতার আদর অপছন্দ করে। এই অবস্থায় তাহার মনে ঈডিপাস্ এষণা যে ভাবে কার্য্য করে তাহার কয়েকটি স্তর ব্যাখ্যা করিব। প্রথমে শিশু মায়ের আদর ও যত্ন লইতে ভালবাসে এবং সম্পূর্ণ নিক্রিয়ভাবে তাহা গ্রহণ করে। দ্বিতীয় অবস্থায় সে যে শুধু আদর গ্রহণ করে তাহা নয়, পরিবর্ত্তে আদর প্রদান করিতেও সচেষ্ট হয়। তৃতীয় অবস্থায় সে পুত্তলিকা লইয়া মায়ের মত আদর করে ও খেলা করে। চতুর্থ অবস্থায় মা যেমন সকলের প্রতি ব্যবহার করেন সেইরূপ ব্যবহার করিতে প্রয়াস পায়, অর্থাৎ সকলকে মায়ের চক্ষে দেখে। পঞ্চম অবস্থায় শিশু পিতার সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আনন্দ ভোগ করে। ষষ্ঠ অবস্থায় শিশুর পৌরুষ প্রকট হয় এবং সে মাতাকে একান্তভাবে পাইতে চাহে এবং পিতার বিরোধী হইয়া উঠে। ইহাই ঈডিপাস্ এষণার পরিপূর্ণ অবস্থা।

হ্যাভ্‌লক্ এলিসের মতে জীবনের প্রথম অবস্থায় শিশু যখন মায়ের স্তন পান করে তখন সে স্ত্রীভাবে মাতার সহিত রমণ করে। এইরূপ সম্বন্ধকে প্রকৃত রতি বলা চলে না, কারণ ইহা জনন ক্রীয়াশীল রতি নহে। কিন্তু ফ্রয়েডের মতে লিঙ্গ ও যোনির সম্বন্ধন একমাত্র যৌন ক্রিয়া নহে।

তৎপূর্ব্বে বালক তাহার মুখ, পায়ু ও উপস্থের ক্রিয়া হইতে যে আনন্দ উপভোগ করে তাহাও যৌনসম্বন্ধীয়। বাল্যাবস্থায় শিশু জননক্রিয়ায় অসমর্থ, সেইজন্য ঈডিপাস্ এষণা সে পরিত্যাগ করে। শুধু তাহাই নহে, বিবেকের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার অপ্রীতিকর বাসনাগুলিকে ভুলিতে থাকে এবং সম্বিদ্ হইতে সরাইয়া দেয়। চেতন মনের গণ্ডী হইতে নিষ্কাশন ব্যাপারে পিতৃজনিত অঙ্গহানির ভয় (castration fear) কার্য্যকরী হয়। পরে সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে ঈডিপাস্ এষণা নির্জ্ঞান মনের কোণে অবরুদ্ধ হয়। কিন্তু এইরূপ অবদমনের ফলে নানারূপ কল্পনা, স্বপ্ন ও মানসিক বিকারে ঈডিপাস্ এষণার অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রয়েডের মতে ঈডিপাস এষণার স্বাভাবিক চরিতার্থতার প্রতিবন্ধ হওয়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহার লীলা দৃষ্ট হয়। এই সব ক্ষেত্র যৌন ব্যাপার সংক্রান্ত না হইয়াও মুলতঃ যাহা যৌন প্রবৃত্তি তাহার বিকাশ সাধন করে, ইহাকে ফ্রয়েড sublimation of sex instinct বা যৌন ইচ্ছার উদগতি বলিয়াছেন।

ফ্রয়েডের মতে সকল প্রকার কৃষ্টির মূলে ঐ ঈডিপাস্ এষণা নিহিত রহিয়াছে। যৌন প্রবৃত্তির অবদমন হেতু উহার বিকাশ নানারূপে ও বিভিন্ন প্রণালীতে ঘটিয়া থাকে। যদি সভ্যতা এবং সমাজের গঠন ও ক্রমবর্দ্ধমান প্রসারের কারণ অন্বেষণ করা যায় তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে উহার আধার স্বরূপ যৌন প্রবৃত্তি প্রকট রহিয়াছে। এবং মানুষ সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি উদ্ভাবন করিয়া তাহার যে উন্নতি সাধন করিয়াছে সেই সকল কার্য্যের মধ্যে যৌন প্রবৃত্তির রূপান্তর ঘটিয়াছে।

ফ্রয়েড্ পশু প্রতীক গোত্র বা টোটেম (Totem) সম্বন্ধে যে তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন টোটেম সমাজ অতি প্রাচীন, এখন মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া প্রভৃতি স্থানে টোটেম সমাজের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা প্রাচীন টোটেম সমাজ হইতে ভিন্ন। টোটেম সমাজের মূল সূত্র হইতেছে কোন একটি পশু বা পাখী যেমন ক্যাঙ্গারু, এমু প্রভৃতি। ঐ পশু বা পক্ষীকে প্রতীক স্বরূপ লইয়া এক একটি পরিবার বা দল গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন একটি দল বা সঙ্ঘের পূর্ব্বপুরুষের প্রতীক হইয়াছে ঐ পশু বা পক্ষী। নিজ নিজ

টোটেম বা প্রাণীর সংহার বা উহার মাংস ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ ছিল। কোন একটি টোটেম দলের যে কোন ব্যক্তি যে স্থানেই অবস্থান করুক না কেন, গোত্র হিসাবে সে ঐ দলের সভ্য এবং তাহার সহিত ঐ গোত্রের সম্বন্ধ নষ্ট হইতে পারে না। বংশপরম্পরায় সমস্ত ব্যক্তিই ঐ দলের সহিত মিলিত থাকিত এবং একই পিতা বা মাতার সন্তান না হইলেও তাহারা পরস্পরকে ভাই ভাগিনী রূপে দেখিত। "ক্যাঙ্গারু" দলের কোন একটি পুরুষ "এমু" দলের কোন একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করায় যে সকল সন্তান জন্মিত তাহারা সকলেই 'এমু' নামে অভিহিত হইত। এইরূপ বিবাহের ফলে যে পুত্র জন্মিত তাহার 'এমু' দলের কোনও নারীর পাণি-গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে টোটেম সমাজের দুইটি রীতি ছিল—টোটেম প্রাণীর সংহার না করা এবং একই টোটেমভুক্ত রমণীর পাণিগ্রহণ না করা। ফ্রেজার, য়্যাণ্ড, ল্যাং প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিদগণ তাঁহাদের স্ব স্ব গবেষণার ফলে ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ফ্রয়েড বলেন যে টোটেম রীতি বিশ্লেষণ করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে আদিম যুগেও মানবের মনে অযাচার বাসনা ছিল এবং তাহার প্রতিরোধ হেতু যে বিধি নিষেধ ছিল তাহা কালক্রমে ভিন্ন ভাবে আমাদের সমাজে ক্রিয়াশীল আছে। ফ্রয়েডের মতে মানুষের আদিম বাসনা শিশুর মনে উপজাত হয় এবং শিশুর মানসিক অবস্থা অনেকটা আদিমযুগের মানব মনের অবস্থার অনুরূপ।

ফ্রয়েডের মত সমীচীন হইলেও ডক্টর ম্যালিনোস্কি ঐ মত সমর্থন করেন না। তিনি বলেন ঈডিপাস্ এষণা মৌলিক প্রেরণা নহে। তিনি যে সমস্ত অসভ্য জাতির সমাজ, রীতি, নীতি প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে মানুষের মনে যে ভালবাসা জন্মে তাহা বালকের মাতার প্রতি অনুরাগকে কেন্দ্র করিয়া উপজাত হয় না বরং পরিবারভুক্ত মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনীকে কেন্দ্র করিয়া উপজাত হয়। এবং এইরূপ ভালবাসার বিভিন্নরূপ প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে মানুষের আদি বাসনা অবরুদ্ধ হয় সত্য, কিন্তু ঐ অবরুদ্ধ বাসনাকে ঈডিপাস্ এষণা নাম দেওয়া অন্যায়।

ডক্টর হির্শফেল্ড্ বলেন যে ঈডিপাস্ এষণার যে রূপ ব্যাখ্যা ফ্রয়েড দিয়াছেন তাহা যুক্তিহীন, কারণ ঈডিপাস্ জ্ঞাতসারে তাহার মাতার পাণিগ্রহণ করিতে চাহে নাই এবং ঈডিপাস্ গল্পের উপর ভিত্তি করিয়া ঈডিপাস্ এষণার সম্বন্ধে যে গবেষণা করা হইয়াছে তাহা ভুল। ডক্টর উলজিমথ ও ঐরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন ঈডিপাস্ গল্পের মত আরও অনেক গল্প গ্রীক্ পুরাণে আছে, অতএব ঈডিপাসের কার্য্য-প্রণালী লক্ষ্য করিয়া তাহার বাসনার যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহার সপক্ষে কোন সদ্যুক্তি নাই। তিনিও বলেন ঈডিপাসের মনে কোনও অযাচার বাসনা ছিল না।

আমাদের মনে হয় ফ্রয়েড মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীর ব্যবহার ও মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা নির্ভুল না হইলেও সম্পূর্ণ যুক্তিহীন নহে। তবে ভালবাসা ও ঘৃণার যে ছবি তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা নিছক সত্যের প্রতিকৃতি নহে। ভালবাসা কোন একটি সরল মনোভাব নহে, উহার মধ্যে বিভিন্ন ভাব ও প্রেরণা নিহিত রহিয়াছে। আলেক্জাণ্ডার শ্যাণ্ড ভালবাসার জটিল প্রক্রিয়ার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হয়। ভালবাসা বা অনুরাগের যে বিভিন্ন অবস্থার কথা বৈষ্ণব সাহিত্যে আছে তাহাও প্রণিধানযোগ্য। সমস্ত দিক চিন্তা করিয়া দেখিলে ঈডিপাস্ এষণাকে সমস্ত সভ্যতার মূল ভিত্তি বলিয়া মনে হয় না।

জৈনদর্শনে পরিণামতত্ত্ব

অধ্যাপক শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ।

জৈন দার্শনিকগণ পরিণামতত্ত্বের যে বিবরণ দিয়াছেন ঐরূপ বিবরণ আমরা ভারতীয় অন্য কোনও দর্শনে দেখিতে পাই না। তাঁহাদের মতে সত্তা ও পরিণাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সত্তা হইতে পরিণাম বা পরিণাম হইতে সত্তা পৃথকভাবে দেখিবার উপায় নাই। পরস্পর বিজড়িত এই সত্তা ও পরিণাম হইতেই অর্থ বা বস্তুর স্বরূপ নির্ণীত হয়। সুতরাং তাঁহাদের মতে এমন কোন বস্তু নাই যাহার পরিণাম হইতেছে না অথবা এমন কোন পরিণাম নাই যাহা বস্তুনিষ্ঠ নহে[১]। কোন বস্তু সত্তাবান্ বলিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে তাহাতে পরিণাম চলিতেছে এবং পরিণামও নিরাধার নহে, পরিণাম সত্তাবান হইতে গেলে বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য। স্বাশ্রয়ভূত বস্তুর অভাবে পরিণাম নিরাশ্রয় হইয়া শূন্যত্বে পরিণত হয়। বস্তু পরিণামের ভিতর দিয়া সত্তা হইতে নিজরূপ লাভ করিয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা গেল যে বস্তুসমুদয়, যাহা লইয়া আমাদের প্রতীতি-সিদ্ধ জগতে আদান প্রদান চলিতেছে, উহারা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সত্তা ও পরিণাম এই দুইটির সংমিশ্রণে আত্মলাভ করে। এক কথায় বলিতে গেলে পরিণাম (Evolution) বস্তুর নিজস্ব ধর্ম্ম এবং উহা প্রতীতিসিদ্ধ। ফলকথা এই দাঁড়াইল যে সত্তাই বস্তুতত্ত্বের ভিত্তি; কিন্তু সে সত্তাটি এরূপ যে উহা পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না এবং এই পরিণামে সত্তার আত্যন্তিক লোপও হয় না অথচ পরিণম্যমান সত্তাই বস্তুকে স্বরূপ দান করে।

এইরূপ সত্তা এবং পরিণামের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ জৈনমতে সর্ব্ব বস্তুর বস্তুত্বের ভিত্তি। পাশ্চাত্য দর্শনে অনেকস্থলে Existence অথবা সত্তা এবং বস্তু অথবা Real এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করা হয় না। ম্যাক-টাগার্ট (McTaggart) তাঁহার সুবিখ্যাত *The Nature of Existence* নামক গ্রন্থে Reality এবং Existenceএর স্বরূপ আলোচনা

১। প্রবচন-সার ১।১০

প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে Reality is Existence অর্থাৎ সত্তা ও বস্তু অভিন্ন। কিন্তু আমরা জৈনের সত্তাবাদ আলোচনায় দেখিলাম যে বস্তু ও সত্তা একেবারে অভিন্ন নহে অথচ সত্তা উহার অবশ্যম্ভাবী এবং নিয়ত পরিণামের মধ্য দিয়া বস্তুর বস্তুত্ব সম্পন্ন করে; সুতরাং বস্তু ও সত্তা এক নহে অথচ সত্তা হইতে বস্তুকে পৃথক করিয়া দেখিবার উপায় নাই। আরও মনে হয় যে জৈনমতে সত্তা বস্তুর অপ্রকট অবস্থা এবং বস্তু সত্তার প্রকট অবস্থা এবং সত্তার এই যে প্রকট অবস্থা যদ্দ্বারা বস্তু স্বরূপ লাভ করে, তাহাই পরিণাম। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে পবিণামের সহিত সত্তার স্বগত ভেদ নাই। সত্তাই পরিণত হয়। সুতরাং বস্তু হইতেছে পরিণম্যমান সত্তা। আমরা বস্তু ও সত্তার পরস্পর সম্বন্ধ বুঝাইতে বলিয়াছি যে বস্তু সত্তার স্পষ্ট অবস্থা এবং সত্তা অস্পষ্ট বস্তু, কিন্তু ইহার দ্বারা যেন কেহ মনে না করেন যে এইরূপ পরিণাম সাংখ্যীয় পরিণামের অনুরূপ। কারণ সাংখ্যে যদিও পরিণাম অর্থে, অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্তি বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলেও সাংখ্যে একমাত্র অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই যাবতীয় ব্যক্ত পদার্থের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়। দ্বিতীয়তঃ সাংখ্য বিবৃত এই পরিণাম সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি-সাপেক্ষ নয় অন্ততঃ উহাতে নির্লিপ্ত পুরুষের সংযোগ বা সান্নিধ্যের অপেক্ষা আছে এবং যেমন সৃষ্টি প্রবাহে প্রকৃতি হইতে ক্রমশঃ বুদ্ধি অহঙ্কার আদি আবির্ভূত হয়, ঠিক তেমন প্রলয় প্রবাহেও বস্তু সমুদায় স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং অবশেষে প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্তি হয়, জৈনেরা ঐরূপ কোন একমাত্র অব্যক্ত শক্তি স্বীকার করিয়া জগতের যাবতীয় বস্তুকে উহার পরিণাম বা বিকাররূপে ভাবেন না। জৈনমতে বস্তু বহু এবং প্রত্যেক বস্তুই স্বতঃসিদ্ধ অথচ তাহার স্বভাব এই যে উহা সত্তা ও পরিণামের মধ্য দিয়া আত্মলাভ করে এবং এই পরিণম্যমান সত্তা বস্তুর কেবল উৎপত্তি কেন তাহার স্থিতি-বৃদ্ধি-ক্ষয়ও নিরূপিত করে। সুতরাং দেখা গেল যে জৈনের পরিণামবাদ সাংখ্যের পরিণামবাদ হইতে সর্ব্বতোভাবে পৃথক। রামানুজ দর্শনেও পরিণামের কথা আছে বটে কিন্তু রামানুজের পরিণামবাদ জৈন পরিণাম হইতে অন্যরূপ। কারণ রামানুজ মতে ব্রহ্ম পরিণামী নিত্য সত্তা, তিনি তাঁহার বিচিত্র মায়াশক্তির সাহায্যে জগৎ সংসার স্বীয় সত্তা হইতে বিকার বা

পরিণামরূপে সৃষ্টি করেন সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব কোন পরিণাম প্রবৃত্তি নাই। পক্ষান্তরে পরিণাম বস্তু মাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহাই জৈনদিগের মত। পাশ্চাত্য বিকাশবাদীদিগের (Evolutionists) মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ বস্তুর অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক পরিণাম-প্রবৃত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই পরিণাম-প্রবৃত্তি স্বাভাবিক না হইলে পরিণাম-প্রবৃত্তির প্রেরণা কি হইতে পারে এ প্রশ্ন কোন কোন আধুনিক পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদী তুলিয়াছেন আবার কেহ কেহ বা উহা অনাবশ্যক বোধে উল্লেখ করেন নাই। আলেকজাণ্ডার (Alexander) এই প্রেরণার নাম দিয়াছেন নাইসাস্ (Nisus); এবং দিক্-কাল হইতে বিকাশের স্রোতে যতদিন অধ্যাত্ম জগৎ আবির্ভূত হয় নাই ততদিন ঐ প্রেরণা বা নাইসাস্ ছিল আধিভৌতিক কিন্তু যখন অধ্যাত্মজগৎ আবির্ভূত হইল তখন ঐ প্রেরণাও আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিল। কিন্তু আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে পরিণাম বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম না হইলেই প্রেরণার আবশ্যক হয়, অন্যথা নহে। আলেকজাণ্ডারের ক্রমবিকাশবাদের মূলে যখন কোন আধ্যাত্মিকতার লেশ মাত্র নাই তখন বিকাশপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক বলিলে তাঁহার কোন ক্ষতি হইত না বরং তিনি একটী প্রেরণার অভ্যুপগমের (Assumption) দোষ এড়াইতে পারিতেন। সুতরাং আমাদের মনে হয় যে জৈনবিবৃত পরিণামবাদ আধুনিক বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদিগের অভিমত বলা যাইতে পারে।

তাহা হইলে দেখা গেল যে জৈনমতে প্রত্যেক বস্তু, উহা জীবই হউক বা অজীবই হউক সতত পরিণামাধীন এবং এই স্বাভাবিক পরিণামই বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিতেছে। জৈনদিগের এই বস্তুতত্ত্ববাদকে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয় উহা Evolutionary Realism। প্রতি বস্তুই অস্তিত্ববান এবং প্রতি বস্তুই পরিণম্যমান। সত্তা ও পরিণামের মধ্য দিয়া বস্তু আমাদের নিকট বস্তু বলিয়া পরিচিত হয়। এই সত্তা ও পরিণাম, যাহাদের পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের দ্বারা বস্তুর স্বরূপ নির্নীত হয়, উহাদিগকে আরও স্পষ্টভাবে উমাস্বাতি তাঁহার 'তত্ত্বার্থ সূত্রে' "উৎপাদব্যয়ধ্রৌব্যযুক্তং সৎ" এই সূত্রের দ্বারা বিবৃত করিয়াছেন। বস্তুর একটা দিক্ সত্তা তাহার অপর দিক্‌টি

পরিণাম। উৎপত্তি স্থিতি ও নাশ এই তিনটি শব্দের দ্বারা উমাস্বামী এই পরিণামের প্রকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং দেখিতে পাই যে জৈনগণ বস্তু সক্রিয় এই মত (Dynamic Conception) গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যেক বস্তুই প্রতি মুহূর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন গুণের সৃষ্টি করিতেছে এবং ঐ সৃষ্ট গুণগুলির নাশও হইতেছে বটে কিন্তু এইরূপ গুণোৎপাদন ও গুণ নাশের সঙ্গে বস্তুর স্থৈর্য্য সংরক্ষিত হইতেছে এবং ইহার দ্বারাই বস্তুর প্রতিনিয়ত স্বার্থস্বরূপ বা ব্যক্তিত্ব (Individuality) রক্ষিত হইতেছে। জৈনগণ এই প্রকার পরিণাম ব্যতীত আর এক প্রকার পরিণাম স্বীকার করেন তাহার নাম অবস্থা পরিণাম। এই অবস্থা পরিণামের অপর নাম 'পর্য্যায়'। কোন বস্তুর নূতনত্ব হইতে পুরাতনত্ব লাভ বা এক বর্ণ ত্যাগ করিয়া অন্য বর্ণ গ্রহণ এইরূপ অবস্থা পরিণাম পর্য্যায়ের উদাহরণ। এই অবস্থা পরিণাম যোগশাস্ত্রেও স্বীকৃত হইয়াছে। যোগ শাস্ত্রে আরও দুই প্রকার পরিণাম উল্লিখিত আছে, তাহাদের নাম ধর্ম্ম-পরিণাম ও লক্ষণ-পরিণাম। তবে যোগের এই ত্রিবিধ পরিণাম বস্তু ও তাহার ধর্ম্মের ভেদ স্বীকার করিয়া লইয়া কল্পনা করা হয় কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীতে ভেদ না থাকায় পরিণাম প্রকৃতপক্ষে এক প্রকারই হইতে পারে। কারণ ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিনটি বিভিন্ন পদার্থকে ধর্ম্ম শব্দের অর্থে অন্তর্ভূত করিলে বাস্তবিক অসঙ্গতি হয় না। ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা দ্বারা ধর্ম্মীরই পরিণাম সূচিত হয়। সাংখ্য যোগ মতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভেদ এবং অভেদ স্বীকার করা হয়। ধর্ম্ম ধর্ম্মী হইতে ভিন্ন যে হেতু ধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মীর অভিব্যক্তি বা স্পষ্টতা প্রতিপন্ন হয়। আবার ধর্ম্ম ধর্ম্মী হইতে অভিন্নও বটে কারণ ধর্ম্ম ধর্ম্মীর পরিণাম মাত্র। এই অংশে অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভেদাভেদ সম্বন্ধে সাংখ্যযোগের সহিত জৈন মতের ঐক্য আছে কিন্তু পরিণামের স্বরূপ, উৎপত্তি ও প্রেরণা সম্বন্ধে সাংখ্যযোগ ও জৈনমতে যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম।

এক্ষণে বস্তুর পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ হইলেও উহার বিরতি বা বিশ্রাম জৈনগণ স্বীকার করেন কিনা তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব। সাংখ্যমতে পরিণাম পুরুষের ঈক্ষণে আরব্ধ হয় বটে কিন্তু যে জীবের সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে তাহার পক্ষে আবার প্রকৃতি লয় হইয়া থাকে।

পরিণামের কেবল যে বিশ্রাম হয় তাহা নহে উপরন্তু যাবতীয় বিকার বা পরিণাম অবশেষে প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয়। বিকৃত অবিকৃতে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং সাংখ্যের পরিণামে আরম্ভ, বিরতি এবং লয় স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু জৈন পরিণামকে এরূপভাবে দেখেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জৈনমতে জীব ও অজীবাত্মক সর্ব্ব বস্তুই পরিণামাধীন এবং পরিণামের বিরতি নাই এবং লয়ও নাই। বস্তু ভৌতিকই হউক বা আত্মিকই হউক, পরিণাম উহার স্বভাব এবং যেহেতু কোন বস্তুরই নাশ স্বীকার করা হয় না সেইহেতু বস্তু এই পরিণামের নাশকেও প্রশ্রয় দিতে পারে না এবং তাহার ফলে বস্তু মাত্রই পরিণামের মধ্য দিয়া নিজ সত্তা রক্ষা করিয়া যাইতে বাধ্য। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে এই সত্তা ও পরিণাম যাহা লইয়া বস্তুর স্বরূপ তাহাকে যদি কেবল অজীব বস্তুতে নিরুদ্ধ না রাখিয়া জীব বস্তুরও নিয়ামক বলিয়া কল্পনা করা হয় তাহা হইলে এই সত্তা ও পরিণাম নিয়ন্ত্রিত আত্মবস্তুর স্বরূপ, স্থিতি, বৃত্তি ও চরম গতি কিরূপ হইবে? আত্মার স্বভাবই হইল এই যে উহা জ্ঞানরূপ পরিণাম গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে জৈনমতে বস্তু ও তাহার পরিণাম অভিন্ন। সুতরাং জ্ঞান হইতে জ্ঞাতা আত্মা অভিন্ন। যদি জ্ঞান আত্মা হইতে ভিন্ন হইত তাহা হইলে জ্ঞান চেতন আত্মা হইতে ভিন্ন হইত অর্থাৎ জ্ঞান অচেতন অথবা অপ্রকাশ হইত। কিন্তু জৈন মতে আত্মা ও জ্ঞান অভিন্ন সুতরাং জ্ঞান ও স্বপ্রকাশ। এইরূপে আত্মার অন্যান্য পরিণাম ও আত্মার সহিত অভিন্ন এবং আত্মার জ্ঞান, দর্শন, চারিত্র প্রভৃতি পরিণামের মধ্য দিয়া আত্মার বস্তুত্ব নিষ্পন্ন হইতেছে। আত্মা স্বয়ম্ভূত এবং উহার বিনাশও নাই সুতরাং মুক্তাবস্থায়ও এই স্বতঃসিদ্ধ নিত্য আত্মবস্তুও পরিণাম হইতে বিচ্যুত হয় না। জৈনগণ বলিয়া থাকেন যে আমরা সংসার দশায় যে সীমার মধ্যে অবস্থান করি এমন কি জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম যাহা কিছু সংসারি জীবনে ঘটিতেছে সে সীমার নাম লোকাকাশ। জীব যখন মুক্ত হয় তখন তাহার জ্ঞানদর্শন ও চারিত্র চরম স্ফূর্ত্তি লাভ করে সত্য কিন্তু তাহারা আত্মার যে পরিণাম সেই পরিণামই থাকে, কেননা বস্তুর সত্তা ও পরিণাম ইহার প্রত্যেকটী বাস্তব এবং বস্তু সত্তা ও পরিণাম ত্যাগ করিয়া বস্তুত্ব রক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং জৈনমতে সত্তা ও পরিণাম যেমন

সংসারি জীবের স্বরূপ নির্ণয় করে সেইরূপ মুক্ত জীবেরও স্বরূপ নির্ণয় করে। জৈনমতে জীব পরিণামী নিত্য। সাংখ্য ও বেদান্ত মতে আত্মা অপরিণামী নিত্য। সুতরাং জৈন সম্মত জীবের লক্ষণ হইতে সাংখ্য ও বেদান্তের আত্মার লক্ষণ ভিন্ন। এইরূপে দেখা গেল যে মুক্তির পরে যখন জীব অলোকাকাশে উন্নীত হয় তখনও পরিণম্যমান থাকে। কিন্তু এই মুক্ত জীব কি ভাবে তখনও পরিণত হয় তৎ সম্বন্ধে জৈনগণের সিদ্ধান্ত তাদৃশ পরিস্ফুট নহে। তবে ইহা সত্য যে তাঁহাদের মতে মুক্ত জীব যদিও কর্ম্মের আবর্ত্তে পুনর্ব্বার পতিত হয় না তথাপি তাহার পরিণাম সুতরাং কর্ম্ম কোন কোন আকারে বর্ত্তমান থাকে, অবশ্য সে কর্ম্ম আর পুদ্গল আকারে তাহাকে আবৃত করিতে পারে না। এই মুক্ত জীবের নাম 'জিন' এবং 'তীর্থঙ্কর' তাঁহার অপর নাম। তীর্থঙ্কর অর্থাৎ যিনি জীব এবং জড়জগতের তীর্থ অর্থাৎ মঙ্গলের সোপান রচনা করেন। তাঁহার সেই রচনা ক্রিয়া তাঁহার পরিণাম ভিন্ন আর কিছু নহে। সত্তা এবং পরিণামে যখন কোন ভেদ স্বীকার করা হয় না তখন মুক্ত জীব যা তীর্থঙ্করের যে সত্তা তাহা শুদ্ধ সত্তা, সুতরাং সেই শুদ্ধ সত্তার যাহা পরিণাম তাহা নিশ্চয়ই শুদ্ধ পরিণাম অর্থাৎ তাহা কর্ম্ম বা পুদ্গলের কলুষ হইতে নির্মুক্ত। জৈনগণ ইহাও বলেন যে তীর্থঙ্কর এমনকি দেবগণ হইতেও শুদ্ধতর অথচ পরিণামশীল। তবেই দেখা যাইতেছে যে মুক্ত জীব তাঁহার বিশুদ্ধ সত্তার পরিণামের মধ্য দিয়া লোকাকাশ এবং অলোকাকাশের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট এবং সেই সম্বন্ধ তাঁহার বিশুদ্ধ সত্তার পরিণাম ছাড়া আর কিছুই নহে।

এইরূপে জৈনগণের সত্তা ও পরিণামবাদের আলোচনায় ইহাই প্রতীয়মান হইল যে জগতে এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা উপরি উক্ত সত্তা ও পরিণামের স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত। কি জীব কি অজীব সকল বস্তুই সত্তা ও পরিণামের মধ্য দিয়া আপনার স্বরূপের প্রতিষ্ঠা করে। সত্তা ও পরিণাম এইরূপে জীবাজীবাত্মক সমগ্র জগতের মূলসূত্র। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে জগৎ সংসার সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য-দর্শনের একটি মুখ্য মতবাদ যাহা Dynamic Conception of Reality বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে জৈনদর্শনগণ তাহাই অতি সুস্পষ্ট ভাবে অতি প্রাচীন কালেও প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পরিণাম অনাদি

ও অনন্ত। সুতরাং এই পরিণাম বর্ত্তমান পরিস্থিতিতেই পর্য্যবসিত নহে, ইহা ভবিষ্যতেও বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিবে। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে প্রচলিত আরম্ভবাদ (Doctrine of Emergent Evolution) জৈনমতের সহিত পরিণামের সাতত্য অংশে সমান হইলেও অনেকাংশে উহা হইতে বিলক্ষণ। Emergent Evolutionএর যে কয়েকটি ব্যাখ্যাকর্ত্তা জাগতিক বস্তুর উৎপত্তি, বিকাশ ও ক্রমপরিণতির পরিচয় দিয়াছেন তাঁহাদের সহিত জৈন-মতাবলম্বীদের মূল পার্থক্য এই যে তাঁহারা হয় দিক্-কাল (Space-Time) না হয় চৈতন্যাচৈতন্যময় (psycho-phyisical) সত্তা স্বীকার করিয়া উহাদের প্রাথমিক অব্যক্ত অবস্থা ধরিয়া নিয়া ও ক্রমবিকাশের স্রোতে ফেলিয়া উহা হইতে জগৎসংসারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু জৈনদিগের মধ্যে ঐরূপ কোন অব্যক্ত একটি সত্তা লইয়া জগৎ সংসারের উৎপত্তি ও ক্রমপরিণাম বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা হয় নাই। তাঁহারা বহুত্ববাদী এবং অনন্ত সত্তাপরিণামময় জীবা-জীবাত্মক বস্তু স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়া তাহাদের প্রত্যেকেই সত্তা ও পরিণামের দ্বারা চালিত বলিয়া ভাবিয়াছেন।

জৈনগণের বস্তু সম্বন্ধে এইরূপ মতবাদ সাধারণ জ্ঞান (Common sense) এবং প্রতীতির (Experience) উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এতদুভয়ের উপর ভিত্তি করিয়া যে সমস্ত অনুমান সম্ভব হইয়াছে তাঁহারা তাহাই গ্রাহ্য করিয়াছেন। পাশ্চাত্য নব্য বস্তুতন্ত্রবাদী (Neo-Realist) যে নির্গুণ বা নিরপেক্ষ সত্তা (Neutral Reality) স্বীকার করিয়া লইয়া তাহা হইতে ক্রমবিকাশফলে জীব ও অজীবাত্মক বস্তুর আবির্ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন জৈনগণ তাহার পক্ষপাতী নহেন. কারণ, তাহা সাধারণ জ্ঞান ও প্রতীতির বহির্ভূত। আবার বহুত্ববাদ স্বীকার করায় জৈনগণ চৈতন্যাচৈতন্যময় কোন এক অবিবিক্ত বস্তু সত্তাও গ্রহণ করেন নাই কারণ তাহাও তাঁহাদের নিকট প্রতীতিবিরুদ্ধ। আবার বস্তুর পরিণাম বস্তুর স্বভাবগত নিয়ম এই মতের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ক্রমবিকাশে কোন এক উদ্দেশ্যবান চৈতন্যশক্তির আশ্রয় লইয়া এই সত্তা ও পরিণামের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করেন নাই। তাঁহারা প্রতীতি ও অনুমানলব্ধ বস্তুর স্বরূপ ধরিয়া লইয়া বস্তুর পরিণামের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে জৈনমতে সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা ঈশ্বরের

স্বীকার নাই, সুতরাং পরিণাম কোন এক উদ্দেশ্যবান চৈতন্যময় ভগবৎ শক্তির বা উদ্দেশ্যের সাফল্যের জন্য সংঘটিত হয় একথা তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ফলকথা এই যে তাঁহাদের মতে বস্তু স্বতঃপরিণম্যমান, কারণ পরিণাম বস্তুর প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। এই কারণেই আমরা পূর্ব্বেই জৈনের বস্তুবাদের Evolutionary Realism এই নাম করণ করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক আরও দেখিতে পাইবেন যে পাশ্চাত্য বস্তুতন্ত্রবাদে, বিশেষতঃ দ্বৈতমূলক বস্তুতন্ত্রবাদে Theory of Interaction অর্থাৎ জীব ও অজীবের মধ্যে ক্রিয়া ব্যতিহারমত যে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়াছে জৈনগণের Evolutionary Realism সেই অসামঞ্জস্যের একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান করিয়াছে। উক্ত Interaction Theoryর সেইখানেই অসামঞ্জস্য যেখানে উহা জ্ঞাতা জীব ও জ্ঞেয় অজীবকে অক্রিয় (Static) অর্থাৎ পরিণামরহিত ভাবিয়া পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়াব্যতিহার দেখাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু জৈনমতে বস্তু মাত্রই, উহা জীবই হউক বা অজীবই হউক, সক্রিয় বা পরিণামস্বভাব (dynamic) এবং অজীব বস্তুর পরিণাম আর কিছুই নহে উহা জীবের বা জ্ঞাতার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হওয়া। আবার জীববস্তুর পরিণামই হইতেছে অজীব বস্তুর জ্ঞান। জীব এবং অজীব ধর্ম্মগত পৃথক্ ইহা সত্য হইলেও তাহাদের পরিণামের স্বরূপ এই যে সেই পরিণাম দ্বারাই অজীববস্তু জ্ঞাতার জ্ঞেয়ত্ব আকার ধারণ করে এবং জীববস্তু তাহার জ্ঞানরূপ পরিণাম দ্বারা অজীব বস্তুকে উহার বিষয়ীভূত করে [১]। জৈনের এই প্রকার বস্তুস্বরূপের বিবৃতিকে আধুনিক ভাষায় বৈজ্ঞানিক (Scientific) বিবৃতি বলিতে কুণ্ঠিত হইব না। চেতন ও জড়ের পরস্পর ক্রিয়া (Interaction) বুঝাইবার জন্য ভগবৎ শক্তির অবতারণা করিয়া যে মতবাদগুলি প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডেকার্টের (Descartes) পরবর্ত্তীকালে প্রচলিত হইয়াছিল আমাদের মনে হয় যে জৈনের এই বিবৃতি অন্ততঃ সেই মতবাদগুলির অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

১। প্রবচনসার ১।২৯-৩১

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব

অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ।

সৌন্দর্য্যবোধ আমাদের সবারই আছে—কম আর বেশী। সুন্দরকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা মানুষের প্রকৃতিগত ভাব—এ ভাবের ধারা মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রথম থেকেই প্রবাহিত হয়েছে। কখনও বা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে সে নিজের ভেতরে টেনে আনে, আবার কখনও বা নিজের সৌন্দর্য্য প্রকৃতিতে আরোপ করে—এ নিয়েই মানুষের কাব্য, সঙ্গীত, কলা এসব গড়ে উঠেছে। সুন্দর বলতে শুধু যে রূপ বোঝায় তা নয়; সুন্দরের মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সবই পড়ে। তাই সুন্দর বলতে আমরা সঙ্গীত, নৃত্য, কলা, শিল্প, কাব্য, সাহিত্য সবই বুঝি। এই সুন্দরকে উপলব্ধি করতে মানুষের মনে ও দেহে এক অদ্ভূত সংবেদনের (sensation) উৎপত্তি হয়। আমাদের সকল অনুভূতিতেই কোনরূপ না কোনরূপ সংবেদনের প্রয়োজন; কিন্তু এ রস সংবেদন যেন একটু বিভিন্ন প্রকারের। অনেক মনস্তত্ত্ববিদের মতে রস-সংবেদন ও অন্য সংবেদনের মধ্যে কোন জাতিগত পার্থক্য নেই, কেবল প্রগাঢ়তার তারতম্য (difference in degree) রয়েছে। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে এই মতবাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানবের সরল ও অবিকৃত মনের কাছে এ রস-সংবেদন যে একটী অসাধারণ ও অলৌকিক অনুভূতিরূপে প্রতীত হয় তাতে কোন সন্দেহই নেই। এই সংবেদন আবার সব মানবের সমান নয়। বিভিন্ন মানবের সহজাত ধাত ও ভাবধারা বিভিন্ন; তাই বিভিন্ন রুচি এবং সেই হেতু এ রস-সংবেদন ও বিভিন্নরূপেই অনুভূত হয়। কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যে আনুমানিক একটা সাদৃশ্য আছে কি না, এই মানবরুচির বৈষম্যের মধ্যে কোন সাম্য পরিলক্ষিত হয় কি না—এ প্রশ্ন মানবের নীতি ও সমাজ-তন্ত্রে এবং দার্শনিকের ভাবনা শাস্ত্রে (Science of Thought) একটা মস্ত বড় সমস্যা। এক কথায় বলতে গেলে বলতেই হবে যে আমাদের

এ রুচির প্রকারের নানাত্বের এবং অসাম্যের মধ্যে একত্বের ও সাম্যের পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। সুন্দরের এই বিশ্বজনীন অনুভূতি (universality of the feeling of the Beautiful) সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানে সৌন্দর্য্য-সংজ্ঞা বা সৌন্দর্য্য-চেতনা (aesthetic sense) নামে অভিহিত।

মানুষ স্বভাবতঃই তত্ত্বজিজ্ঞাসু। যা কিছু তার জ্ঞানের এলাকায় এসে উপস্থিত হয় তারই তত্ত্ব খুঁজে বার করতে সে চায়—এটা মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি। এবং এই প্রকৃতিটিই মানুষের বৈশিষ্ট্য—যে বৈশিষ্ট্য মানবেতর প্রাণী থেকে তাকে স্পষ্টভাবে পৃথক করে রেখেছে। আর এই প্রকৃতি থেকেই তার জীবনের যত সমস্যার উদ্ভব এবং তাদের সমাধানের প্রবল প্রচেষ্টা। তাই মানবজগতে দর্শনের আবির্ভাব, বিজ্ঞানের উৎপত্তি, কলার বিকাশ ও শাস্ত্রের প্রয়োজন। যখন মানবের বাহ্য বা আন্তর ইন্দ্রিয়ে কোন একটা উত্তেজনা (stimulus) সংবেদন (sensation) সৃষ্টি করে তখন তার বিচারশীল মন কিছুতেই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারে না। তখনই তার প্রজ্ঞা এই সূত্রবিহীন বিচ্ছিন্ন (discrete) সংবেদনগুলির বিশ্লেষণে (analysis) ও সংশ্লেষণে (synthesis) নিযুক্ত হয় এবং এই সব অর্থহীন সংবেদনের মধ্যে একটা মহান্ অর্থ খুঁজে বার করে। তার এই প্রজ্ঞাচক্ষুর সম্মুখে সে দেখতে পায় এই সব অরূপের উজ্জ্বল রূপ, প্রজ্ঞা কর্ণে শুনতে পায় তাদের সুমধুর সুভাষিত ছন্দবদ্ধ সঙ্গীত। এই প্রজ্ঞাই মানবের চলচ্চিত্রবৎ গতিশীল ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অন্তরালে উপলব্ধি করে নিশ্চল শাশ্বত সত্তাকে। এই হলো মানব জ্ঞানের মৌলিক তথ্য। সুন্দরের উপলব্ধি ব্যাপারেও তাই। শুধু উপলব্ধিতেই মানুষ সন্তুষ্ট থাকে না, সেই উপ-লব্ধিকে আবার সূক্ষ্ম বিচারের শানে ফেলে সে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করতে তৎপর হয়। কবির ছন্দে, শিল্পীর নৃত্যে ও কলায়, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে সবটাতেই চিন্তাশীল মানব বসে যায় তত্ত্ব গবেষণায়। কোথায় সঙ্গীতের আদি এবং সঙ্গীত কি বস্তু ? নৃত্য, কলা, কাব্য এসবের মানে কি ? এ সব মানবের পরমার্থ বস্তু কি না ? প্রকৃতির একটা বস্তু সুন্দর, আর একটা অসুন্দর কেন ? সুন্দরের বাসস্থান কোথায় ? আমাদের মনে না বাইরের জগতে ?—ইত্যাদি নানা রকমের প্রশ্ন এসে উপস্থিত হয় তার মনের

কাছে। এই সব প্রশ্নের বা সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধানের প্রচেষ্টা যে শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই তাকেই আমরা সৌন্দর্য্যশাস্ত্র (aesthetics) বলি। বিচারের দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যায় যে সুন্দরের সমস্যা কেন, মানবজীবনের কোন সমস্যারই প্রকৃতপক্ষে সমাধান হয় না। দার্শনিক চিন্তা দ্বারা মানুষ তার কোন সমস্যারই সমাধান করে উঠতে পারে না। তা বলে সে চিন্তা বা গবেষণা থেকে ক্ষান্তও থাকতে পারেনা, কেননা চিন্তাশীলতা যে তার ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য ধর্ম্ম—এটাই যে তার স্বভাব। তাই সমস্যাগুলো এড়িয়ে যেতেও সে পারে না। তাই বলছিলাম যে সৌন্দর্য্যতত্ত্বে আমরা দেখতে পাই শুধু কতকগুলি সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধানের প্রচেষ্টা—প্রকৃত সমাধান নয়।

সে যাই হোক্, এই সৌন্দর্য্যশাস্ত্রকে খতিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই—এতে রয়েছে দুটি জ্ঞানের ধারা অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশ্রিত হয়ে। একটী হচ্ছে সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান (the science of the Beautiful) আর একটী হচ্ছে সৌন্দর্য্যতত্ত্বজ্ঞান (the Philosophy of the Beautiful)। বিজ্ঞান শুধু পরিদৃশ্যমান জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরিদৃশ্যমান ঘটনাবলীর (phenomena) মধ্যে যদি কোন নিয়মানুবর্ত্তিতা থাকে তবে তাহা নির্দ্ধারণ করা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়মগুলি (laws of nature) আবিষ্কার করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান শুধু ভূয়োদর্শনদ্বারা ব্যাপ্তি নিরূপণ করে (a mere induction of particulars), বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত (particular instances) থেকে সাধারণ নিয়মগুলির (universal laws) জ্ঞান দেয়। সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানও তাই করে। দৃশ্যমান সুন্দর বস্তুগুলোর বিশ্লেষণই (analysis) শুধু আমরা এতে পাই। সৌন্দর্য্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের (noumenon) সাথে এর কোন সম্বন্ধ নেই। অর্থাৎ অনুভূত সুন্দর বস্তুগুলির অন্তরালে কোন অতীন্দ্রিয় (transcendental or metempirical) স্বয়ংসিদ্ধ সুন্দর-সত্তা আছে কি না এ বিষয়ের আলোচনা এবং বিচার বিজ্ঞানের এলাকায় পড়ে না। এ বিচার হচ্ছে সৌন্দর্য্যতত্ত্বজ্ঞানের (Philosophy of the Beautiful) বিষয়বস্তু। এতে প্রধান প্রশ্নই হচ্ছে সৌন্দর্য্য আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানে (sense) না বুদ্ধিতে (intellect) অবস্থিত? সুন্দরের আদিম বাসস্থান কোথায়? আমাদের মনের অনুভব শক্তিতে, কিম্বা

ধীশক্তিতে ?—ইত্যাদি অনেক রকম জটিল প্রশ্ন এই শাস্ত্রে উত্থাপিত হয়। আমরা এখানে সৌন্দর্য্য তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করবো। কিন্তু এখানে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনা যদিও আমাদের এখানে উদ্দেশ্য নয়, তবুও সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আলোচনা এই বিজ্ঞানকে ছেড়ে দিয়ে করলে মোটেই যুক্তিসঙ্গত ও সম্পূর্ণ হবে না। কোন তত্ত্ববিজ্ঞানই (metaphysics) বিজ্ঞানকে ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে না। বিজ্ঞান আর দর্শনের পার্থক্য আছে বটে—অন্ততঃ পক্ষে এদের নিজ নিজ সমস্যার সমাধানের পন্থা বা পদ্ধতি বাস্তবিকই বিভিন্ন। সমস্ত জাগতিক ব্যাপারেই বিজ্ঞান দেয় খণ্ডজ্ঞান আর দর্শন বা তত্ত্ববিজ্ঞান চেষ্টা করে তাদের বিষয়ে এক অখণ্ড জ্ঞান দিতে। কিন্তু সমস্ত তত্ত্ববিজ্ঞানই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি স্থাপনা করে বিচারান্বেষী হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিজ্ঞান যেখানে এসে শেষ হয়েছে, তত্ত্ববিজ্ঞান সেখান থেকে চলতে আরম্ভ করে। অথবা বিজ্ঞানের কাছে যে সব প্রশ্ন অনাবশ্যক এবং যে মৌলিকতত্ত্বগুলি (first principles) বিজ্ঞানের কাছে প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ (a priori) ও বিচারাতীত বলে প্রতীয়মান হয় তাদেরই সম্বন্ধে বিশেষ বিচারমূলক আলোচনাই হচ্ছে তত্ত্ববিজ্ঞানের এক প্রধান কার্য্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দার্শনিক জ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ। দর্শনের আলোচনায় বিজ্ঞানের আলোচনা অনুপ্রবিষ্ট হবেই, তা না হলে সে আলোচনার অঙ্গহানি হবে। শুধু তাই নয় বিজ্ঞানের আলোচনায়ও যে দর্শনের মস্ত বড় স্থান রয়ে গেছে সে কথা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ অস্বীকার করলেও এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এর সত্যতা তাঁরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। আজ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে এডিংটন, জীন্‌স্ প্রভৃতি যে সব মনীষী অধ্যাত্মবাদ (spiritualism) বা বিজ্ঞানবাদের (idealism) দিকে বিশেষ করে ঝুঁকে পড়েছেন তাঁদের কাছে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলো যে দার্শনিক সিদ্ধান্তের সাথে একাকারে পরিণত হতে চলেছে সেটা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এই সব বিজ্ঞানবাদী বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত সমালোচনা করে দেখলে দেখা যায় যে বিজ্ঞান এসে মিশেছে তত্ত্ববিজ্ঞানে—ফিজিক্স্‌ আর মেটাফিজিক্স্‌ হয়েছে এক। সে যাই হোক্ আমাদের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে এই যে সৌন্দর্য্যতত্ত্বকে আমরা যতই পৃথক্

করে আলোচনা করতে চেষ্টা করি না কেন তাতে সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানের সমস্যাকেও কিছুটা স্থান দিতে হবে। কাজেই আমাদের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব আলোচনায় বিশ্লেষণ (analysis) ও সংশ্লেষণ (synthesis) দুইই এসে পড়ে। বিশেষতঃ একথাটা ভুললে চলবে না যে বিজ্ঞানই বলি আর তত্ত্ববিজ্ঞানই বলি, বিশ্লেষণই বলি আর সংশ্লেষণই বলি—দুইই সেই এক মানবের চিন্তাশক্তি (thought) থেকে উদ্বুদ্ধ—দুটি সেই একই চিন্তাধারার দুটি প্রবাহ মাত্র।

যাক্ সে সব কথা, এখন সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মস্ত বড় একটা প্রশ্নই হচ্ছে যে সুন্দরের কোন আদর্শ বা নিরূপক (standard বা criterion) আছে কিনা এবং থাকলে তার অধিষ্ঠান কোথায়? এ বিষয়ের অবতারণা আমরা পূর্ব্বেই করেছি। মানব রুচির-ও উপলব্ধির বৈষম্যের কথা আমরা মোটেই অস্বীকার করতে পারি না। এই বৈষম্যের কারণ এক নয়, বহু। এর জন্য দায়ী কিছুটা আমাদের ব্যক্তিগত সংস্কার, কিছুটা পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষা, কিছুটা নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং কিছুটা আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা (environments)। এই সব সামগ্রী (causes and conditions) বহুকাল ধরে মানব রুচি ও উপলব্ধির বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। আমরা পূর্ব্বে এও বলেছি যে এই অসমতার মধ্যে সাম্যের পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু এ সামরূপ আদর্শের উপলব্ধি আমাদের কি প্রকৃতপক্ষে হয়? বিশ্বজগতে—কি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, কি মানুষের কৃত সৌন্দর্য্য—কোনটাতেই কি নিখুঁত সুন্দরের উপলব্ধি আমাদের হয়? যে বস্তু যতই সুন্দর বলে আমাদের উপলব্ধি হোক্ না কেন, তবুও যেন কি একটা অভাবের জ্ঞান আমাদের এই উপলব্ধিতে থেকে যায়। অথচ বাস্তবজগতে সুন্দরের আদর্শ যে একেবারে না পাই তাও নয়—হয়ত সম্পূর্ণভাবে না পেতে পারি। গ্রীক্ দার্শনিকচূড়ামণি প্লেটোর মতে আমাদের সুন্দর বোধে পূর্ণতার অভাবের কারণ হচ্ছে এই যে জগৎ প্রপঞ্চের সুন্দর বস্তুগুলির অন্তরালে যে সৌন্দর্য্যের স্বয়ংসিদ্ধ আদর্শ বা আকার (form) রয়েছে তার সম্যক জ্ঞান বা উপলব্ধি আমাদের নেই। বিশেষতঃ এটাই আমাদের মনে হয় যে বাইরের জগতে যদি সৌন্দর্য্যের আদর্শ না থাকে তবে আমরা এই আদর্শের খোঁজ পেলামই বা কোথা থেকে? খোঁজ না পেলেই বা সৌন্দর্য্য কি দিয়ে মাপি? কি করেই

বা মন্তব্য প্রকাশ করে থাকি যে এটি আদর্শস্থানীয় সুন্দর নয়, অথবা এই সৌন্দর্য্যের আদর্শ অত্যন্তই নীচু? এখানে কবি টেনীসনের কথাই মনে পড়ে—তবে বুঝি সেই নিখুঁত নিদর্শনের আশ্রয় আমাদের মনোজগতে! কিন্তু প্রকৃতিতেই যদি এ নিদর্শন না থাকে তবে মানব মনেই বা কি করে থাকা সম্ভব হয়? মানবের কারুকার্য্যে থাকা ত একেবারেই অসম্ভব।

এই আদর্শের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েই আমাদের সমস্যা এসে দাঁড়ায়—সৌন্দর্য্য জ্ঞানগত (subjective) কি বিষয়গত (objective)। অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত বস্তুতন্ত্রবাদ (Realism) এবং বিজ্ঞানবাদ (Idealism) এই চির প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ দুটীর মধ্যে কোন্‌টা ঠিক? এই প্রশ্নের উত্তরের উপর সৌন্দর্য্যতত্ত্বের এই সমস্যার সমাধান নির্ভর করে। এই সংক্রান্তে এখানে কয়েকটী সৌন্দর্য সম্বন্ধীয় মতবাদের (Theories of Beauty) আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

কোন কোন দার্শনিকের মতে আমাদের সৌন্দর্য্য চেতনা সম্পূর্ণভাবে আমাদের সমাজের চিরপ্রচলিত প্রথা ও অভ্যাস থেকে নিরূপিত হয়। এই বোধ আমরা শিক্ষা থেকে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে (inheritance) আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের থেকে প্রাপ্ত হই। প্রত্যক্ষবাদীগণের (empiricists) মধ্যে যাঁরা চরমপন্থী বা সংশয়বাদী (sceptics) তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এরূপ মত পোষণ করেন। এরকম মন্তব্যে কিছুটা যে সত্যতা আছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে বলে মনে হয় না। আমাদের সৌন্দর্য্যচেতনার প্রগাঢ়তা যে অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। শুধু প্রগাঢ়তার বৃদ্ধি কেন অনেক সময় দেখা যায় যে শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা আমাদের রুচির প্রকারগত ভেদ জন্মে থাকে। কিন্তু তা বলে সৌন্দর্য্যবোধ যে আমাদের ঐ শিক্ষা থেকে সৃষ্ট হয় এরূপ সিদ্ধান্ত করাটা মোটেই সমীচীন হবে না। আর এক মতানুসারে সুন্দর হচ্ছে সুখপ্রদ—যে বস্তু সুখদায়ক নয় সে বস্তু সুন্দর নয়। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে সুন্দরমাত্রই সুখদায়ক হলেও সুখদায়কমাত্রই কি সুন্দর হবে? যদি তাই হয় তবে যে বস্তু সুখ দেয় অথবা যখনই কোন সুখের অনুভূতি আমাদের হয় তা থেকেই আমাদের সুন্দরের সঙ্গলাভ করা উচিত। কিন্তু সব সময় তা ঘটে কি? আরও বিশেষ কথা এই সুন্দর শব্দটি ইন্দ্রিয়জন্য সুখ অর্থে

ব্যবহৃত হবে না ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত আধ্যাত্মিক আনন্দ অর্থে আমরা বুঝবো এটা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা দরকার ; নচেৎ সৌন্দর্য্যসেবা ইন্দ্রিয়সেবার (sensualism) নামান্তর হবে।

পূর্ব্বোক্ত মতটা পরিবর্দ্ধিত করে আর একটা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবর্দ্ধিত মতানুসারে সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি হচ্ছে প্রয়োজনীয়তা ও উপকারকতা। অর্থাৎ যে বস্তু যত বেশী প্রয়োজনীয় এবং উপকারী সে বস্তু তত বেশী সুন্দর—সৌন্দর্য্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হবে তার সুফল দেবার যোগ্যতা দ্বারা, তার অর্থক্রিয়াকরিত্বের (practical efficiency) দ্বারা। কিন্তু সৌন্দর্য্যের সঙ্গে উপকারিতা বা কার্য্যকারিতা মিশিয়ে ফেলাতে যে শুধু যুক্তিতর্কের বাধা ঘটে তা নয় পর্য্যবেক্ষণেরও (observation) অবমাননা করা হয়। কোন প্রয়োজনীয় বস্তু সুন্দর হলে আমরা তাতে আকৃষ্ট হই অথবা কোন সুন্দর বস্তু আমাদের জীবনযাত্রায় ফলদায়ক হলে তার মূল্য বেড়ে যায় বটে কিন্তু একথাও সত্য যে যে বস্তুতে যত বেশী পরিমাণে সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখা যায় সে বস্তু তত কম ব্যবহারে লাগে এবং যে বস্তু যত বেশী ব্যবহারোপযোগী সে বস্তু তত কম সুন্দর হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত না দিলেও বোধ হয় এর সত্যতা সম্বন্ধে কারুর সন্দেহ হবে না।

আর একটী প্রচলিত মতবাদ অনুসারে কোন বস্তুর সৌন্দর্য্যের মূলাধার হচ্ছে তার অঙ্গসৌষ্ঠব (symmetry) বা অবয়ব-সামঞ্জস্য (proportion)—সুসমঞ্জসতাই হচ্ছে সৌন্দর্য্যের একমাত্র নিদর্শন। কলা ও কাব্যেই বিশেষ করে এ মতবাদের সমর্থন দেখা যায়। কিন্তু সুন্দরকে সামঞ্জস্য বা মিলন থেকে অভিন্ন বললে সৌন্দর্য্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলা হয় না—সামঞ্জস্য সৌন্দর্য্যের একটী উপাদান বা সহকারী কারণ (condition) হতে পারে কিন্তু তার সমগ্র কারণ নয়।

পাশ্চাত্য দর্শনে সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিচারে আর একটী মতের প্রাবল্য দেখা যায়—সেটী হচ্ছে সংসর্গবাদ (Associationism.) সংসর্গবাদ অনুসারে বস্তু স্বভাবতঃ সুন্দর বা অসুন্দর পদবাচ্য নয়। অর্থাৎ বস্তু স্বরূপতঃ সুন্দরও নয়, অসুন্দরও নয় ; সে তার আনুসঙ্গিক বা সংসর্গী ঘটনাবলীর অনুরূপ গুণযুক্ত হয় মাত্র। এইভাবে প্রকৃতির সমস্ত বস্তুতেই আমাদের অনু-রাগানুযায়ী সৌন্দর্য্য আরোপিত হয়। কিন্তু এই মতাবলম্বীগণ একটা

কথা ভুলে যান যে সংসর্গ বা অনুসঙ্গ (association) কোন দ্রব্য বা গুণ সৃষ্টি করতে পারে না, শুধু পূর্ব্বপরভাবী গুণ বা দ্রব্য সকলকে সম্বন্ধ করতে পারে। একাধিক সুন্দর বা অসুন্দর বস্তুর সমাবেশে সৌন্দর্য্যের তারতম্য ঘটতে পারে কিন্তু সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় না। তা ছাড়া আর একটা কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে সম্বন্ধীকে ছেড়ে দিয়ে কোন সম্বন্ধেরই মানে হয় না। কাজেই কোন অস্থায়ী সম্বন্ধ বা সংসর্গ বুঝতে গেলেই আমাদের আগে বুঝতে হবে কোন এক অসম্বন্ধ সত্তাকে, যার সম্বন্ধে এই সংসর্গের উৎপত্তি। তাহলেই আমাদের বলতে হবে যে সংসর্গজ সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যায় বস্তুতে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়, অপ্রমাণিত হয় না।

পূর্ব্বোক্ত মতবাদগুলির কোনটাই দোষরহিত নয়, গলদ প্রত্যেকেরই যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে প্রত্যেকটা মতবাদেই আংশিক সত্য নিহিত আছে। কোন মতটাকেই আমরা একেবারে মিথ্যা বলে পরিত্যাগ করতে পারবো না। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে বস্তুতন্ত্রবাদ (Realism) এবং বিজ্ঞানবাদ (Idealism) এই দুটী প্রতিদ্বন্দী দার্শনিক মতবাদের সমালোচনা করতে হয়। পূর্ব্বোক্ত মতবাদগুলিকেও এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এখানেও প্রশ্ন হচ্ছে যে সৌন্দর্য্য জ্ঞানাতিরিক্ত কোন একটী সত্তা কি না ?

বিজ্ঞানবাদীর মতে একটী সুন্দর বস্তুর প্রত্যক্ষের মানেই হচ্ছে এই যে জ্ঞাতার জ্ঞানগত ভাবনা হতে কোন একপ্রকার সংবেদনের সৃষ্টি এবং ঐ সংবেদনই জ্ঞাতার মনে এক সংমিশ্রিত ভাবপ্রবাহের সাম্যাবস্থা (emotional equilibrium বা harmony) আনয়ন করে। এই সাম্যাবস্থার উদ্বোধনে জ্ঞাতার মনে এক অদ্ভুত আনন্দের হিল্লোল উৎপন্ন হয় এবং সেই হেতুই সে ঐ সংবেদনের কারণ-বস্তুতে সৌন্দর্য্য আরোপ করে থাকে। সৌন্দর্য্য স্বরূপতঃ বহির্জগতে নেই, অন্তর্জগতের বা মনোজগতেরই বিকার মাত্র। এই হ'লো পরিমার্জ্জিত বিজ্ঞানবাদীর মতের সারসংক্ষেপ। কিন্তু এঁদের মধ্যে যাঁরা আবার চরমপন্থী এবং যাঁরা দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের (subjectivism) পক্ষপাতী তাঁদের মতে সৌন্দর্য্যের একমাত্র নিদর্শন হচ্ছে এই যে ভোক্তার কাছে সেটী কতটা ফলপ্রদ হয়েছে।

এ মতের উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করেছি। টলষ্টয়ের মতে কি চারুকলা কি কাব্য, কি সঙ্গীত সবারই মূল্য ধার্য্য করতে আমাদের দেখতে হবে যে তারা কত সংখ্যক ভোক্তার উপলব্ধিতে বা ভোগে কতটা ফলদায়ক হয়েছে। তিনি মনে করেন হৃদয়ের আবেগের আদানপ্রদান করাই (communication of emotion) হচ্ছে কলার উদ্দেশ্য এবং যখন এই ভাবাবেগ অতি স্বচ্ছ শুভ্র এবং নির্ম্মল হয় তখনই সেটা আদর্শ কলারূপে পরিগণিত হয়। যে কলা সুন্দর সৃষ্টি করবে বলে সঙ্কল্প ক'রে শুধু সুখরস সৃষ্টি করে, টল্‌ষ্টয়ের মতে সে কলা আদর্শ কলা নয়, সে শুধু এক শ্রেণীর লোকেদের আনন্দ দেয়, সর্ব্বসাধারণের কাজে লাগে না,—সে শুধু 'বুরজোঁয়াদের আর্ট'। তাই তিনি মনে করেন যে সেক্সপীয়রের কিং লিয়ার (King Lear) থেকে একটী রুশদেশীয় গ্রাম্যসঙ্গীতও অনেক বড় আর্ট, কেননা কিং লিয়ার যত লোকের হৃদয়ে ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে পারবে তার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোককে আনন্দ দেবে এই গ্রাম্য সঙ্গীত। এই হলো টল্‌ষ্টয়ের "কলাশিল্পের স্বরূপ কি?" (What is Art?) নামক গ্রন্থখানির মোটামুটি তাৎপর্য্য এবং এই তাৎপর্য্য থেকে বিজ্ঞান-বাদের চরম সিদ্ধান্তের আভাসই আমরা পেয়ে থাকি। সৌন্দর্য্যের বাসস্থান বহির্জগতে নয়, সুতরাং সৌন্দর্য্য বিষয়গত (objective) নয়। প্রকৃতপক্ষে সৌন্দর্য্য একটী বিষয়ীগত অনুভূতি মাত্র (subjective experience) অর্থাৎ জ্ঞানের অতিরিক্ত এর কোন স্বাধীন সত্তা নেই। শীতলতা বা উষ্ণতা যেমন হিম বা অগ্নির গুণ নয়, আমাদের ইন্দ্রিয়ের ওপরে কেবল তাদের ক্রিয়াফল মাত্র তেমনি সৌন্দর্য্য ও আমাদের সৌন্দর্য্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (Aesthetic sense) ওপরে বিশেষ একটী ক্রিয়াফল মাত্র।

বিজ্ঞানবাদের এই মতের বিরুদ্ধে বস্তুতান্ত্রিকের (realist) আপত্তি অনেক। প্রথম কথাই হচ্ছে যে প্রমাতা বা প্রমাণচৈতন্য ব্যতীত প্রমেয়ের যে কোন অতিরিক্ত সত্তা নেই একথা বস্তুতান্ত্রিক স্বীকার করেন না—অর্থাৎ সম্মুখস্থ টেবিলটীর অস্তিত্ব আমার টেবিলের জ্ঞান বা কোন মানসিক বিকারের ওপর নির্ভর করে সে কথা স্বীকার করেন না। সৌন্দর্য্যের সত্তা সম্বন্ধেও এই একই কথা। আমরা পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে যদি বহির্জগতে সৌন্দর্য্যের কোন স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার না করে দ্রব্যসংশ্লিষ্ট বিশেষ কোন একটী সম্বন্ধকেই সৌন্দর্য্য বলে বুঝি তবে এটাই আমাদের

সিদ্ধান্ত হলো যে সৌন্দর্য্যবোধই (appreciation of beauty) সৌন্দর্য্য। তাই যদি হয় তবে এটাই প্রতীয়মান হয় যে আমরা যখন কোন সুন্দর বস্তু উপলব্ধি করি বা কোন সুন্দর দৃশ্য দেখে বিমুগ্ধ হই আমরা শুধু আমাদের স্বীয় সৌন্দর্য্যবোধের মধুরতা উপভোগ করে (appreciation of the act of appreciating beauty) বিমোহিত হয়ে থাকি। বাস্তবিক পক্ষে কোন সম্বন্ধের সঙ্গে আমাদের মনের সংযোগ হলে কি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়, না আমাদের মনের সঙ্গে কোন সুন্দর বস্তুর সম্বন্ধ হলে আমরা সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করে থাকি? যুক্তিতর্কের দিক ছেড়ে দিলেও দেখি যে সৌন্দর্য্য উপলব্ধিতে আমাদের সুন্দর বস্তুরই জ্ঞান হয়, স্বকীয় সৌন্দর্য্য বোধের উপভোগ বা জ্ঞান হয় না, বা হলেও সে জ্ঞান গৌণ (secondary বা derivative) মুখ্য (primary বা original) নয়।

দ্বিতীয়তঃ, সৌন্দর্য্য বলতে যদি আমরা ভোক্তার ভাবধারার সাম্যই বুঝি তবে এক যুগের আদৃত কলা শিল্প অন্য যুগে অনাদৃত হয় কেন? অথবা একই দৃশ্য বিষয়ে দ্রষ্টার মনে এক সময় এই ঐক্যতান বেজে ওঠে আর এক সময় মন নীরব হয়ে থাকে কেন? এরকম আরও অনেক আপত্তি এখানে উত্থাপন করা যেতে পারে। এবং এর কোন আপত্তিরই সমাধান এই বিজ্ঞানবাদের দিক থেকে হয় বলে পূর্ব্বপক্ষ মনে করেন না।

সুতরাং বিরুদ্ধমতবাদীগণ বহির্জগতে সৌন্দর্য্যের বাস্তব সত্তার (objective entity) অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এঁদের মতে সৌন্দর্য্য বিষয়গত ভাব। এখানে আমরা প্লেটোর মতবাদেরই উল্লেখ করবো। আমরা পূর্ব্বেই আভাস দিয়েছি যে প্লেটো এই দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চের সুন্দর বস্তুগুলির অন্তরালে এক সৌন্দর্য্যের ছাঁচ বা আদর্শ বা আকারের (Form of Beauty) অস্তিত্ব স্বীকার করেন: এবং এই আদর্শের সঙ্গে বাস্তবজগতের বস্তুগুলির যতটা মিল বা অমিল হবে তারা ততটা সুন্দর বা অসুন্দর হবে—অর্থাৎ ঐ আদর্শকে যে বস্তু যতটা অনুকরণ করতে পারবে সে বস্তু তত বেশী সুন্দর বলে পরিগণিত হবে এবং যে বস্তু মোটেই তার তদনুরূপ হয় না—সে বস্তু অসুন্দর বা কুৎসিত। প্লেটোর সিম্পোসিয়াম্ (Symposium) নামক কথোপকথনমূলক গ্রন্থে (Dialogue) সৌন্দর্য্য তত্ত্বানুসন্ধান সূত্রে এই সৌন্দর্য্যের ছাঁচগুলোর বিশেষ আলোচনা আমরা দেখতে পাই। তিনি আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকগণের ন্যায় মনের তিনটি অবস্থার ক্রম-

বিকাশের কথা আমাদের বলেছেন। তাঁর মতে আমরা প্রথম সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি কোন একটী সুন্দর বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে ; তারপরে ক্রমে আমরা সক্ষম হই নানাবিধ সুন্দর বস্তুর মধ্যে সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করতে। এবং বহুতে সৌন্দর্য্যবোধ আমাদের মনোজগতে যত সুদৃঢ় ও বিস্তৃত ভাবে জাগরিত হয় ততই আমাদের প্রত্যক্ষ বস্তুর অন্তরালে এক শাশ্বত সুন্দর-সত্তার জ্ঞানলাভ হতে থাকে। এই সত্তাই হচ্ছে সৌন্দর্য্যের আকার (Form of Beauty)। তিনি তাঁর রিপাব্লিক্ (Republic) নামক গ্রন্থে এই আকারের সম্যক্ জ্ঞান আমাদের কি করে হতে পারে তারও উপায় নির্দ্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন– যে জ্ঞান আমাদের অজ্ঞানান্ধকার (illusion) দূর করে সেই জ্ঞানের চর্চ্চা ও উপলব্ধিতে এই আকারের উপলব্ধি বা জ্ঞান আমাদের হতে পারে। এই জ্ঞান হচ্ছে সংখ্যা-গণনা বিদ্যা। সংখ্যা-বিজ্ঞান (Theory of Numbers,) জ্যামিতি (Theory of Geometry), ঘনমিতি বিদ্যা (Theory of Solids বা Stereo-metry) এবং জ্যোতির্বিদ্যা (Theory of Astronomy) প্রভৃতির সম্যগ্‌জ্ঞান। সূক্ষ্ম ও সর্ব্বগত (abstract and universal) আকারের জ্ঞান হতে হলে এই সব বিদ্যার সম্যগ্-জ্ঞান দরকার। তিনি আরও বলেন যে এই আকারের জ্ঞান তর্কবিচার বা বুদ্ধি চালনার দ্বারা আমরা পাবো না –পাবো যোগজ প্রত্যক্ষ বা অলৌকিক প্রত্যক্ষ (Intuition) দ্বারা। এই জ্ঞান একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় শিল্পীর মনে হঠাৎ প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে—এ এক অলৌকিক অতীন্দ্রিয় জ্ঞানালোক (a mystical flash)। প্লেটো ফীড্রাস্ (Phaedrus) গ্রন্থে আরও বলেন যে মানব জীবনে জীবের সম্যগ্ জ্ঞান বা পূর্ণপ্রজ্ঞা কোনটাই পূর্ণমাত্রায় অর্জ্জিত না হতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য্য সত্তার বিশুদ্ধ জ্ঞান তার হওয়া সম্ভবপর। অর্থাৎ সমুচিত শিক্ষালাভ হলে আমরা এই সর্ব্বগত (universal) আকারকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারি এবং সেই জ্ঞানানুরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস বা গন্ধের মধ্যে সুন্দরকে পুনঃপ্রকাশও করাতে পারি। সুতরাং প্লেটোর মতে সৌন্দর্য্য উপলব্ধির তারতম্য শুধু বিষয়ীগত তারতম্য বা রুচির বিভিন্নতার ওপরই নির্ভর করে না, জ্ঞানের তারতম্যের ওপরও যথেষ্ট নির্ভর করে।

প্লেটো সৌন্দর্য্য বোধবৃত্তির (aesthetic process) ব্যাখ্যায় মনের যে

তিনটী অবস্থার ক্রমবিকাশের কথা বলেছেন আধুনিক মনোবিজ্ঞান তাহা সমর্থন করেছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের মতে চিন্তা জগতে সৌন্দর্য্যের প্রথম অনুপ্রাণন (first inspiration of Beauty) হতে হলে মনের চার প্রকার অবস্থান্তর ঘটে—প্রথমতঃ মনকে অভিমুখী করে প্রস্তুত করতে হবে (Preparation) তারপর মনে সৌন্দর্য্যানুভূতি অঙ্কুরিত হবে (Incubation) তারপর তাহা জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে (Illumination) এবং পরিশেষে উহা মনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে (Verification)।

শুধু মনোবিজ্ঞানে কেন আধুনিক পাশ্চাত্য আর্ট-সমালোচকদের প্রতিপাদ্য বিষয়েও প্লেটোর মতবাদ যথেষ্ট সহায়তা করেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ক্লাইভ্ বেলের 'আর্ট' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটীর কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বেল্ যদিও প্লেটোর মতাবলম্বী নন তবুও তিনি এই গ্রন্থে যে সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনে তৎপর হয়েছেন সে সিদ্ধান্ত যে প্লেটোর সৌন্দর্য্যতত্ত্বেরই প্রকারান্তর এ কথা বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। বেল্ বলেন যে প্রত্যেক সৌন্দর্য্য অনুভূতির অন্তরালে রয়েছে এক ব্যক্তিগত অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাস (peculiar emotion)। সুন্দর বস্তুগুলোর মধ্যে প্রকারতার এবং প্রগাঢ়তার যতই পার্থক্য থাকুক না কেন তারা সবই এক জাতিভুক্ত, কারণ তারা সকলেই সৌন্দর্য্যস্রষ্টা এবং সৌন্দর্য্যবোদ্ধা সবারই অন্তরে এই অপূর্ব্ব সৌন্দয্য-ভাবোচ্ছ্বাস (aesthetic emotion) আনয়ন করে। প্রত্যেক কলা-শিল্পই এই ভাবের উন্মেষ করাতে সক্ষম কেন না এরা সকলেই কোন এক তাৎপর্য্যপূর্ণ সত্তায় সত্তাবান—এই সত্তাকে বেল্ বলেছেন 'Significant form' বা অর্থপূর্ণ আকার।' এই আকার বা সত্তার উপলব্ধির প্রকাশই হচ্ছে কাব্য, সঙ্গীত-কলা ইত্যাদি।

আমরা সাধারণতঃ জাগতিক পদার্থ নিচয়কে আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় বলে দেখে থাকি। কিন্তু কবি বা শিল্পী তা দেখেন না—তিনি প্রকৃতিকে উপায়রূপে (as means) না দেখে আত্মনিষ্ঠ উদ্দেশ্য (end in itself) রূপে উপলব্ধি করে থাকেন। এখানেই সাধারণ মানব থেকে কবি বা শিল্পীর পার্থক্য। আমরাও যে এ দৃষ্টিতে জগৎকে না দেখি তা

নয়, কিন্তু দেখলেও ক্ষণিকের জন্য দেখে থাকি এবং সেই ক্ষণিকের দেখাতেই সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি আমাদের হয়ে থাকে। কিন্তু শিল্পী বা কবির পক্ষে দৃষ্টি অবিচ্ছিন্ন ও পলকশূন্য—অর্থাৎ তাঁর মনটি দৃষ্টিতে নিয়ত নিবদ্ধ হয়ে থাকে। তিনি প্রতি বস্তুতে সৌন্দর্য্য সত্তার উপলব্ধি করেন। একটী সুন্দর ছবিকে কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়রূপে না দেখে যদি আমরা ছবিটীর সৌন্দর্য্যকেই একমাত্র লক্ষ্য বস্তু বলে গ্রহণ করি তবে যেমন আমরা এক অভিনব অলৌকিক সৌন্দর্য্য-সত্তার উপলব্ধি করে থাকি, শিল্পীও তেমনি প্রকৃতিতে উপলব্ধি করেন। তিনিও প্রকৃতিকে একটী ছবির মতই উপলব্ধি করে থাকেন। তাঁর এই উপলব্ধিতে আছে এক অলৌকিক অনুভূতি। এই অলৌকিক অনুভূতি আছে বলেই প্রকৃতির অতি সাধারণ ও তুচ্ছ দৃশ্য বা ঘটনাও কবির ছন্দে মধুর সঙ্গীতে স্পন্দিত হয়ে ওঠে, শিল্পীর লেখনীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ফুটে ওঠে। সাধারণ মানবের দৃষ্টিকে যে সব ঘটনা (phenomenon) আকৃষ্ট করতে পারে না সে সব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে শিল্পীর জ্ঞানালোকে। জগতের যে কোন মহাকবি বা শিল্পীর রচনায় আমরা এর পরিচয় এত বেশী পাই যে এখানে কোন দৃষ্টান্ত না দিলেও আমাদের বাক্যটী (Judgment) অগ্রাহ্য হবে না। আর এই অনুভূতি কোন ভাব বা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, এ শুধু অনুভবসিদ্ধ। যাঁর জীবনে এ অনুভূতি হয় নাই, তাঁর কাছে এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দেওয়া যায় না। কেউ কেউ মনে করেন যে এই অলৌকিক অনুভূতি আর অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষবাদীর দর্শন (mystic vision) এক। এই অনুভূতি অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সামিল হলেও একেবারে এক কিনা বলা যায় না—কারণ এ দুয়ের মধ্যে প্রকারগত ভেদ না থাকলেও প্রগাঢ়তার তারতম্য রয়েছে। শিল্পীর অনুভূতি এই অলৌকিক অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের (mystic vision) তুলনায় স্বল্পকাল স্থায়ী। তবে এই দর্শনে শিল্পীও বিষয়বস্তুর সঙ্গে একীভূত হয়ে যান— এ অনুভূতিতে আছে পূর্ণানন্দের আভাস, এই জন্য হিন্দু দার্শনিকগণ এ আনন্দকে বলেছেন ব্রহ্মানন্দের সহোদর। একেই বলে রস। সুতরাং শিল্পীর এই ভাবোচ্ছ্বাসের বা রসের অনুভূতি এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যের (Transcendental world) আভাস দেয় বলে কলাকে (art) পরমতত্ত্বের দ্বার-স্বরূপ (window of reality) বলা যায়। কাব্য, সঙ্গীত,

ললিতকলা (fine arts) সমস্তই যুগে যুগে এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত করে আসছে যদিও যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবের সৌন্দর্য্যবোধশক্তি বা অভিব্যক্তিপ্রকারের পরিবর্ত্তন হচ্ছে।

প্লেটো এবং তৎপ্রবর্ত্তিত আধুনিক মতবাদ সৌন্দর্য্যকে বিষয়গত (objective) বলে ধার্য্য করলেও সম্পূর্ণরূপে বস্তুতন্ত্রবাদের মত পোষণ করে না। তত্ত্ববিজ্ঞানের দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় বরং অধ্যাত্মবাদই প্রতিপাদন করে। কিন্তু এখানেও মস্ত একটা সমস্যা যে বস্তুর অন্তরালে অবস্থিত শাশ্বত আদর্শ বা আকার বা ছাঁচ এক না বহু এবং চিন্ময় না জড় ?—অর্থাৎ এই স্বয়ংসিদ্ধ অতীন্দ্রিয় আকার আত্মার অতিরিক্ত এক অচেতন সত্তা কি না ? যদি তাই হয় তবে চেতন আর জড়ের সম্বন্ধে যে চির-জটিল অমিমাংসিত সমস্যা দার্শনিক জগতে রয়েছে তারই পুনরুত্থাপন করা হয়। তবে এর সমাধান কি ? যুক্তির জগতে এর প্রকৃত সমাধান নেই—সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি। নদীশাখা যেমন মরুপথে এসে নিজেকে হারিয়ে ফেলে বুদ্ধি ঠিক তেমনি কিছুদূর অগ্রসর হয়ে এসে এক বুদ্ধির অগোচর তত্ত্বের (alcgical principle) সম্মুখে পরাজয় স্বীকার করে। তবে একটা মোটামুটি সমাধান হয়ত হতে পারে। সুতরাং যে সিদ্ধান্তের উল্লেখ আমরা করবো সে সিদ্ধান্ত একটা সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত বলে পরিগণিত হতে পারে—এবং এই সাম্প্রতিক সমাধান (provisional solution) মানব জীবনে একটা আপোষ-চুক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এখন আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে এই যে আমাদের প্রত্যক্ষ-বিষয় জ্ঞানগত, বিষয়গত নয়। কিন্তু তা বলে আমরা দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করি না। আমাদের সম্মুখস্থ টেবিলটার প্রত্যক্ষজ্ঞান হতে হলে যদি আমার মনের থাকা প্রয়োজন হয় অথবা আমি যদি বলি যে এই টেবিলের জ্ঞান আমার কতকগুলি মনোবৃত্তি সাপেক্ষ তা হলে এটা আমরা বুঝবো না যে টেবিল-বস্তুটার অস্তিত্ব না থাকলেও আমার মনোবৃত্তিই টেবিলের জ্ঞান দেবে। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আমরা এই সিদ্ধান্ত করবো যে সৌন্দর্য্য স্বভাবতঃ (intrinsically) বহির্জগতে থাকে না; এবং এ কথা বললে কেউ যেন মনে না করেন যে তাহলে সূর্য্যাস্ত বা সূর্য্যোদয় অথবা কোন মধুর সঙ্গীত বুদ্ধীন্দ্রিয় দ্বারা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না

করলেও প্রকৃতির ঐ অপরূপ রংএর ছটা বা ছন্দের আদর্শ আমাদের মনোজগতে সুদৃঢ় হয়ে বসে আছে। বিভিন্নতা ও নানাত্ব হচ্ছে এই জগতপ্রপঞ্চের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এই নানাত্বের মধ্যেও আনুমানিক একটা আদর্শের অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করে থাকি। বিচারের দিক থেকে এটাই বরং বলা চলে যে বিভিন্নতাটাই আদর্শের বিশেষ একটী অত্যাবশ্যক উপাদান। ভ্রমের প্রতীতি যেমন সত্যের অস্তিত্বই প্রমাণ করে তেমনি রুচির বিভিন্নতাই এই আদর্শের উপলব্ধিতে সহায়ক হয়। এবং এই আদর্শ বস্তুসাপেক্ষ। প্রত্যক্ষবাদীর মত আমরা এই আদর্শের উৎপত্তি প্রথা বা রীতিতে স্বীকার করবো না। তুষারাবৃত পর্ব্বতশিখরকে আমরা সুন্দর বলি কেননা সবাই সুন্দর বলে আসছে। সঙ্গীত ভাল যেহেতু ভাল বলাটা প্রথা রয়েছে এরকম সিদ্ধান্ত মোটেই যুক্তিসম্মত নয়। সৌন্দর্য্যের এই বিষয়গত বাস্তব আদর্শের বিরুদ্ধে জ্ঞানের আপেক্ষিকতার (relativity of knowledge) দিক থেকে যে আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে তার উত্তর হবে এই যে আমাদের এই জ্ঞানের আপেক্ষিকতার দোষে এই পরম আদর্শ (absolute standard) দোষযুক্ত হয় না। কারণ আমরা সবই আপেক্ষিকভাবে জানি—প্রত্যেক জ্ঞানই জ্ঞাতৃসম্পর্কীয় বা বৃত্তিসাপেক্ষ সুতরাং সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির অসম্পূর্ণ জ্ঞানের দিক থেকে দেখতে গেলে সেটাই তার পূর্ণ জ্ঞান—অর্থাৎ পূর্ণের এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানেতেই ব্যক্তিগত সম্পূর্ণত্ব প্রকাশ পাচ্ছে ;—অসম্পূর্ণতাটাই তার ব্যক্তিগত পূর্ণত্ব। আর এই অসম্পূর্ণতার গণ্ডিও সে অতিক্রম করে যেতে পারে না যেহেতু সসীমত্ব বা অপূর্ণত্বটাই তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ। অথচ এটাও বলা যায় না যে এই ব্যক্তিগত অসম্পূর্ণতাটাই পরম পূর্ণতা—কারণ পারমার্থিক তত্ত্বের পূর্ণতা এক পূর্ণসত্তাই (একমেবাদ্বিতীয়ম্) হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি নানা বা বহু এবং সেই হেতু পরম-পূর্ণতাও (Absolute whole) বহু হবে—এরকম বাক্য স্ববিরুদ্ধ পদবিন্যাস (contradiction in terms) হয়ে পড়ে। আরও বিশেষ কথা এই যে অসীম পূর্ণের অনুভূতিও আমরা অস্বীকার করতে পারি না, কেন না পরম-তত্ত্বের জ্ঞান না থাকলে আমরা আপেক্ষিকতার কথাই বা বলি কি করে—পূর্ণকে না জানলে ব্যক্তিগত অসম্পূর্ণতার সংবাদই বা পাই কি করে? সুতরাং মানব রুচির একরূপতা (uniformity) আছে বললে

তাহা পারমার্থিক (absolute) অর্থে মোটেই বুঝবো না, আপেক্ষিক (relative) অর্থেই বুঝবো। বিশেষতঃ আধুনিক বিজ্ঞান-জগতে জড়-প্রকৃতির একরূপতা বা একবিধত্বই (the law of the uniformity of nature) যখন আপেক্ষিকবাদের (theory of relativity) দ্বারা প্রকারান্তরিত হয়েছে তখন মানবের সচেতন প্রকৃতিতে পারমার্থিক একবিধত্ব কি করে সম্ভব ? সত্য, শিব ও সুন্দর যাই বলি না কেন সবই এই আপেক্ষিক জগতের ব্যাপার। কিন্তু এই ব্যাপারের অন্তরালে সর্ব্বময় হয়ে আছে এক চৈতন্য সত্তা। বিশিষ্ট চৈতন্যের (individual consciousness) সমাবেশ যে সমষ্টি চৈতন্য (Universal Consciousness) সেটিও এই নিরুপাধিক সত্তারই উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্য। অধিষ্ঠান (locus) এক কিন্তু আরোপিত চৈতন্যের পৃথক ধারা অনুসারে পৃথক প্রকারের দৃষ্টি। চিন্তা (thought) থেকে সত্য (Truth) প্রযত্ন (volition) থেকে শিব (Goodneas) এবং বেদনা (emotion) থেকে সুন্দরের (Beauty) উৎপত্তি। তিনই সেই এক জ্ঞানের ধারা। কিন্তু সবই এই অধ্যস্ত জগতে সীমাবদ্ধ বা অবিদ্যাজনিত। সুতরাং সবই এই আপেক্ষিক বা ব্যবহারিক জগতের কথা।

আর একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। সৌন্দর্য্যের আদর্শের বিষয়ীগত বা বিষয়গত গুণের কোনটাকেই আমরা সৌন্দর্য্যের এক মাত্র উপাদান বলে স্বীকার করবো না। সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে দুয়েরই সমান দান এবং প্রয়োজনীয়তা। এখানে হেগেলীয় মতাবলম্বীদের মত মধ্যপন্থী হয়ে দুয়ের সামঞ্জস্য করাটাই যৌক্তিক বলে মনে হয়। এ দুটী অনুবন্ধী বা পরস্পর সাপেক্ষ (correlatives) এবং এই অর্থেই আমরা বলবো যে সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিতে সংজ্ঞা ও প্রজ্ঞা দুয়েরই সংমিশ্রণের প্রয়োজন। প্রকৃতির আকার, গতি, শব্দ প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারে অসংখ্য বস্তুতে ব্যাপ্ত এবং এদের ছন্দোময় মিলনে (harmonic adjustment) হচ্ছে সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব। কিন্তু এই মিলন (adjustment) সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে না—শুধু প্রকাশ করে। আবার প্রকাশও স্বয়ং হয় না, প্রয়োজন হয় একজন প্রকাশকের এবং এই প্রকাশকই হচ্ছে শিল্পীর অনুভূতি। সুতরাং শিল্পী সৃষ্টিক্ষম বটে কিন্তু এই প্রকাশন অর্থেই সৃষ্টির মানে বুঝতে হবে। কিন্তু তা বলে আর্টকে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির প্রতিকৃতি বলে মনে

করার যথেষ্ট হেতু নেই। কবি শুধু অনুকরণই করেন না, তিনি কিছু সৃষ্টিও করেন। শিল্পী শুধু অনুলিপিকর (copyist) বা অনুকারীই (imitator) নন, তিনি স্রষ্টাও বটে।

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ হচ্ছে এই যে সুন্দর বলতে যে প্রকৃতপক্ষে কী বুঝি তা আমরা জানি না, সুন্দরের প্রকৃত উপাদানের সম্যগ্ জ্ঞান আমাদের নেই, অথবা থাকলেও তা ভাব বা ভাষার অতীত—অবাঙ্মনসোগোচরম্। দার্জ্জিলিংএর টাইগার-হিলে দাঁড়িয়ে সেই সুদূর আকাশ গহ্বর থেকে যখন আমরা প্রভাতের রবিকে প্রথম উঠতে দেখি তখন শুধু এটুকুই জানি যে আমাদের এক অভিনব অলৌকিক প্রত্যক্ষ ও আনন্দের অনুভূতি হলো, দেহ মন ও প্রাণ ঐ অপরূপ সৌন্দর্য্যের ছটায় যেন এক অসীম পুলক-স্পন্দনে উদ্বেল হয়ে উঠলো! কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু যদি আমাদের জিজ্ঞাসা করেন, প্রকৃতির এই সুন্দর দৃশ্যের সঙ্গে শাশ্বত চৈতন্য-সত্তার কোন অবিচ্ছেদ্য কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে কি? আমরা উত্তরে বলবো—জানি না, যদিও যুক্তিতর্কে আমাদের মানতেই হবে যে আমাদের সৌন্দর্য্য-উপলব্ধিমূলক বাক্যটীর সত্য নিরূপণ করতে হলে এরূপ কোন সম্বন্ধের অস্তিত্ব একান্ত আবশ্যক। এটা আমরা বেশ বুঝি যে এই দৃশ্যের বাস্তবতা আমাদের এই বিশিষ্ট জ্ঞানের একটী প্রকৃত উপাদান বটে, কিন্তু এই বাস্তবতাটাই এই জ্ঞানের সত্য নিরূপণে যথেষ্ট বা একমাত্র উপাদান (sufficient condition) নয়।

বিদেহমুক্তি ও জীবন্মুক্তি *

অধ্যাপক শ্রীমাধবদাস চক্রবর্ত্তী, এম. এ, সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

বেদান্তে উক্ত হইয়াছে—"অবস্থাত্রয়হীনাত্মা বৈদেহী মুক্ত এব সঃ।" যে ব্যক্তি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় বিরহিত তিনিই বিদেহমুক্ত বলিয়া খ্যাত। বেদান্ত মত ও অধ্যারোপ বাদের ব্যাখ্যার জন্য নিম্নে অবস্থাত্রয়ের একটু বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

রজ্জুর জ্ঞান তিরোহিত হইলে যেমন উহাতে মানুষের ক্ষণকালের জন্য সর্পভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে, তেমনি ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানের অভাব বশতঃ তাহাতে জীবের জগদ্‌ভ্রান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই যে অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান ইহারই নাম অধ্যারোপ। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের উপরই এই অধ্যারোপ সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর করে। যে পর্য্যন্ত এই অবস্থাত্রয় বর্ত্তমান থাকে সেই পর্য্যন্তই অধ্যারোপের অবকাশ থাকে; অবস্থাত্রয়ের অপগমে অধ্যারোপেরও অবসান হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ভেদে অবস্থা ত্রিবিধ। যে অবস্থাতে বাহেন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি হয় তাহার নাম জাগ্রদ-বস্থা। যে অবস্থাতে একমাত্র মনোবৃত্তির দ্বারা এ জন্মের বা জন্মান্তরের জাগ্রদবস্থায় অনুভূত ও মনঃ কল্পিত বিষয়ের অনুভূতি হইয়া থাকে তাহার নাম স্বপ্নাবস্থা এবং যে অবস্থাতে মনের সহিত সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিলীন হইয়া যায়, কেবল বুদ্ধির সূক্ষ্মবৃত্তিদ্বারা অজ্ঞানাবৃত সুখরূপ আত্মোপলব্ধি হইয়া থাকে তাহার নাম সুষুপ্তি অবস্থা। জাগ্রদবস্থাতে স্থূল, স্বপ্নাবস্থাতে সূক্ষ্ম এবং সুষুপ্তি অবস্থাতে কারণ শরীর বর্ত্তমান থাকে।

সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ। অজ্ঞান বা মায়া সৎও নহে অসৎও নহে, ইহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত, অনির্বাচ্য, জ্ঞানের বিরোধী কিন্তু ভাবরূপ। বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান এই অজ্ঞান সমষ্টিরূপে এক পদবাচ্য হইয়া থাকে। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্‌" ইত্যাদি শ্রুতির 'এক' শব্দ

* মহাকাব্যরত্নাবলীর প্রভাটীকা অবলম্বনে লিখিত।

এই অজ্ঞান বা মায়াকেই বিষয় করিয়া থাকে। আবার মলিন সত্ত্বপ্রধান এই অজ্ঞান ব্যষ্টিরূপে 'ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপমীয়তে" এই শ্রুতি কথিত মায়াপদকে অধিকার করে।

মায়োপাধি ঈশ্বরই শ্রুতিতে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, পরোক্ষ, নিয়ামক, সর্বেশ্বর প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে। অবিদ্যোপাধি জীব শ্রুতিতে অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি, অপরোক্ষ, নিয়ম্য, আনন্দভুক্, চেতোমুখ, প্রাজ্ঞ প্রভৃতি রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমষ্টিরূপ অজ্ঞান অখিল প্রপঞ্চের কারণ ও ঈশ্বরের কারণ শরীর আনন্দময় বলিয়া, এবং কোষের ন্যায় ঈশ্বরকে আবৃত করে বলিয়া, আনন্দময় কোষ নামে অভিহিত। স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর এই আনন্দময় কোষে লীন হয় বলিয়া এবং ইহাতেই ঈশ্বরের অনুভব হয় বলিয়া ইহার নাম সুষুপ্তি। আবার ব্যষ্টিরূপ অজ্ঞান জীবের অহঙ্কারাদির কারণ বলিয়া কারণশরীর, আনন্দময় বলিয়া এবং কোষের ন্যায় আবরক বলিয়া আনন্দময় কোষ নামে কথিত। মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ নামে দুইটি শক্তি আছে। ঈশ্বর বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা লিঙ্গ হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সমুদয় প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"বিক্ষোপশক্তির্লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ।" তমপ্রধান, বিক্ষেপ শক্তিযুক্ত ও অজ্ঞানোপহত ঈশ্বরচৈতন্য হইতে সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত আকাশাদি তন্মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে। তাই শ্রুতি বলিতেছেন— "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি। এই ভূতপঞ্চক হইতে সূক্ষ্মশরীর এবং স্থূলভূতসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সূক্ষ্মশরীর পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু এবং বুদ্ধি ও মনের সমবায়ে গঠিত। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সাত্ত্বিকাংশ হইতে ক্রমে আকাশাদি ভূতপঞ্চকের উদ্ভব হইয়াছে। বুদ্ধির ধর্ম্ম অধ্যবসায়, মনের ধর্ম্ম সংকল্প ও বিকল্প, অনুসন্ধান ও অভিমানাত্মক চিত্ত ও অহঙ্কার ইহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। এই মন প্রভৃতি অন্তঃকরণ সমূহ আকাশাদিগত ব্যস্ত রজোংশ হইতে জাত। প্রাণাদি পঞ্চবায়ু আকাশাদিগত মিলিত রজোংশ জাত। সূত্রাত্ম চৈতন্য এই সকল সূক্ষ্মভূতের সমষ্টিরূপ উপাধিদ্বারা উপহিত। এই সমষ্টি স্থূল প্রপঞ্চ হইতে সূক্ষ্ম বলিয়া ইহাকে সূক্ষ্মশরীর বলা হয়। বিজ্ঞানময়াদি কোষত্রয় জাগ্রদ্‌বাসনাময় বলিয়া স্বপ্নাবস্থার অন্তর্গত। এই সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ, প্রাণ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল সূক্ষ্মভূতের ব্যষ্ট্যুপহিত

তৈজস চৈতন্যে ও ব্যষ্টিভূত সূক্ষ্মভূত সমূহ স্থূল শরীরাপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া সূক্ষ্ম শরীর বলিয়া কথিত। এবং বিজ্ঞান মায়াদি কোষত্রয় জাগ্রদ্‌বাসনা-ময় বলিয়া স্বপ্ন।

প্রথমতঃ ভূত সমূহকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের অর্দ্ধকে সমান চারিভাগে বিভক্ত করিবে। এই বিভক্ত অংশগুলি স্ব-ব্যতিরিক্ত অন্য ভূতের অর্দ্ধেকের সহিত মিলাইতে হইবে। ইহারই নাম পঞ্চীকরণ। অপঞ্চীকৃত ভূত পঞ্চক পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ক্রমে আকাশ, মরুৎ, তেজ, অপ ও ক্ষিতির গুণ। ইহাদের মধ্যে যে যে স্থানীয় তাহার তত গুণ অর্থাৎ আকাশের একটী গুণ শব্দ ; বায়ুর দুইটী গুণ শব্দ ও স্পর্শ ; তেজের তিনটী গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; অপের চারিটী গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস ; এবং ক্ষিতির পাঁচটী গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। স্বকীয় গুণের প্রাধান্য হেতু ভূত সমূহকে তত্তদ্‌গুণবিশিষ্ট বলা হয়। এই পঞ্চীকৃত ভুতপঞ্চক হইতে ব্রহ্মাণ্ড, তদন্তর্গত চতুর্বিধ স্থূল শরীর,[১] অন্ন ও পানাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৈশ্বানর চৈতন্য এই চতুর্বিধ স্থূল শরীরের সমষ্টি দ্বারা উপহিত। এই চতুর্বিধ শরীরের সমষ্টিই তাহার স্থূল শরীর। এই সমষ্ট্যাত্মক স্থূল শরীর অন্নের বিকার বলিয়া অন্নময় কোশ এবং স্থূল ভোগের আয়তন বলিয়া জাগ্রদ্রূপে প্রসিদ্ধ। এই চতুর্বিধ স্থূল শরীরের ব্যষ্টি দ্বারা উপহিত বিশ্ব চৈতন্যের এই সমষ্টি স্থূল শরীর এবং অন্নবিকার বলিয়া অন্নময় কোশ নামে অভিহিত। স্থূল ভোগের আয়তন বলিয়া ইহা জাগ্রৎ। এপর্য্যন্ত অবস্থাত্রয়রূপ অধ্যস্ত প্রপঞ্চের কথা বলা হইল। অবস্থাত্রয়াবগাহী পঞ্চ কোশেরও সাধারণ বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইল। এখন এই কোশ সমূহের একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়, এই পাঁচটী কোশ। মাতা ও পিতার ভুক্ত অন্ন হইতে জাত শুক্র ও শোণিতের পরিণামরূপ যে আকার তাহার নাম অন্নময় কোশ। ইহা প্রারব্ধের ভোগায়তন। অপরিচ্ছিন্ন, জন্মাদি ষড়ভাববিকার বিবর্জ্জিত, ও তাপত্রয় বিরহিত আত্মাকে পরিচ্ছিন্নাদি গুণযুক্তের ন্যায় আপাদিত করে বলিয়া ইহার নাম কোশ

১। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ।

অর্থাৎ আচ্ছাদক। পঞ্চ বায়ু ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়যুত প্রাণবিকার প্রাণময় কোশ নামে অভিহিত। ইহা ক্ষুৎপিপাসামনাদি রহিত আত্মাকে তদ্বন্তরূপে প্রকাশিত করে। জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের সহিত বর্তমান মনের বিকারের নাম মনোময় কোশ। ইহা সংশয়শোকমোহাদি বিরহিত আত্মাকে তদ্বন্তরূপেতে উপস্থাপিত করে। জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের সহিত বর্ত্তমান বুদ্ধির বিকারের নাম বিজ্ঞানময় কোশ। ইহা কর্তৃত্বাদি অভিমানরহিত আত্মাকে তদ্বন্তরূপে আচ্ছাদিত করে। এই কোশই ইহলোক ও পরলোকে গমনাগমন করিয়া থাকে এবং জীবরূপে অভিহিত হয়। প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ বৃত্তিযুক্ত, অজ্ঞান প্রধান, আনন্দের বিকার অন্তঃকরণ আনন্দময় কোশ নামে অভিহিত। এই পঞ্চকোশযুক্ত স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরই প্রকৃত প্রস্তাবে জাগ্রদাদি তিনটী অবস্থা। সমষ্ট্যাত্মক কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর বন ও জলাশয়ের সহিত এবং ব্যষ্ট্যাত্মক কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর বৃক্ষ ও জলের সহিত তুলিত হইতে পারে। বৃক্ষ ও বন এবং জল ও জলাশয়ে যেরূপ ভেদ নাই সমষ্ট্যাত্মক ও ব্যষ্ট্যাত্মক শরীরও তেমনি অভিন্ন।

এইরূপে কারণব্যষ্টি ও কারণ সমষ্টি দ্বারা উপস্থিত ঈশ্বর এবং প্রাজ্ঞের; সূক্ষ্ম ব্যষ্টি ও সূক্ষ্ম সমষ্টুপহিত সূত্রাত্মা ও তৈজসের এবং স্থূল ব্যষ্টি ও স্থূল-সমষ্টি দ্বারা উপহিত বিশ্ব এবং বৈশ্বানরের অভিন্নতা বর্ত্তমান। বনের বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত আকাশ যেরূপ জলাশয়গত জলে প্রতিবিম্বিত আকাশ হইতে অভিন্ন, এইরূপ ঈশ্বর প্রাজ্ঞাদিও পরস্পর অভিন্ন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনের সমষ্টি যেমন একটী মহাবন; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের সমষ্টি যেমন এক মহা-জলাশয়, সেইরূপ সূক্ষ্ম ও কারণ প্রপঞ্চের সমষ্টি এক মহাপ্রপঞ্চ। অথবা যেমন অবান্তর বনাবচ্ছিন্ন আকাশ এবং অবান্তর জলাশয়বচ্ছিন্ন প্রতি-বিম্বাকাশ একই মহাকাশ, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত উপাধিযুক্ত ঈশ্বর হইতে বৈশ্বানর পর্য্যন্ত সকলই এক অভিন্ন চৈতন্য। অয়ঃ পিণ্ডোস্থিত অগ্নির ন্যায় মহৎপ্রপঞ্চোপহিত চৈতন্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্বমস্যাদি মহা-বাক্যের দ্বারা প্রতিবোধিত হইয়া থাকে।

তাদাত্ম্যাধ্যাসরহিত ব্রহ্মই নিত্য, নিরঞ্জন পরব্রহ্ম। এই ব্রহ্মপ্রাপ্তিই

জীবের লক্ষ্য। ইহাকেই শ্রুতি "শিবং শান্তং চতুর্থম্" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ অবস্থাত্রয় রাহিত্যের নাম অপবাদ[২]।

কার্য্যসর্গ সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে এবং প্রতিসর্গ (প্রলয়) স্থূল হইতে সূক্ষ্মে পর্য্যবসিত হয়। অজ্ঞানাধ্যস্ত, রজ্জুবিবর্ত্ত সর্প যেরূপ জ্ঞানোদয়ে তিরোহিত হইয়া রজ্জু মাত্রে স্থিত হয়, অজ্ঞানাধ্যস্ত, ব্রহ্মবিবর্ত্ত জগৎও সেইরূপ জ্ঞানোদয়ে ব্রহ্মেতে পর্য্যবসিত হয়। প্রকৃত স্বরূপ হইতে অন্যত্বই বিকার এবং তত্ত্ববিরহিত অন্যত্বই বিবর্ত্ত বলিয়া খ্যাত[৩]। জগতের যে প্রকৃত সত্তা নাই, ব্রহ্ম সত্তাই যে জগৎ সত্ত্বার প্রতিভাসক তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর-বিগ্রহ-ভূত, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যবস্থারহিত-স্বরূপ, অবস্থাত্রয়হীন আত্মা অনধ্যস্ত ও অপবাদরহিত হইয়া নির্বিশেষ কেবল ব্রহ্ম মাত্রে স্থিত হন। এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই বিদেহমুক্ত বলিয়া কথিত। সহজ কথায় বলিতে গেলে দেহ অর্থাৎ সংসার বন্ধন। যাহার দেহ অর্থাৎ সংসার বন্ধন বিমুক্ত হইয়াছে তিনি বিদেহমুক্ত। কণ্ঠগত হারের বিস্মৃতির ন্যায় নিত্যপ্রাপ্ত স্বরূপের বিস্মৃতির নামই সংসার। শুদ্ধচৈতন্য, নিত্যব্রহ্মই নিজের স্বরূপ। সংসারী জীব এবং সর্বজ্ঞত্বাদি গুণযুক্ত ঈশ্বরের তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের দ্বারা বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ ও অবিরুদ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই জীবের স্বরূপ। বস্তু-দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ অনাদি সান্ত অবিদ্যাই স্বরূপবিস্মৃতিরূপ সংসারের কারণ।

এই অবিদ্যা কর্ম্মানুগ এবং ঈশ্বরানুশাস্য। কর্ম্ম কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ব্যাপারবিশেষ। এই কর্ম্ম প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মানভেদে ত্রিবিধ। পূর্ব্বশরীর সম্পাদিত ও বর্ত্তমান শরীরোপভোগ্য কর্ম্মের নাম প্রারব্ধ। পূর্ব্ব শরীরের দ্বারা সম্পাদিত কিন্তু বর্ত্তমান শরীরের দ্বারা অনুপভোগ্য কর্ম্মের নাম সঞ্চিত। বর্ত্তমান শরীর সম্পাদিত, উভয়বিধ

২। তৎসত্ত্বেতৎসত্ত্বাৎ তদসত্ত্বেতদসত্ত্বাচ্চ অপবাদো নাম।

৩। "সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ॥"

কর্ম্মের নাম ক্রিয়মাণ। এই কর্ম্ম আবার নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, নিষিদ্ধ ও প্রায়শ্চিত্তভেদে পঞ্চবিধ। যাহা না করিলে পাপ হয় তাহার নাম নিত্য, যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদি। বুদ্ধি শুদ্ধির নিমিত্ত পুত্রজন্ম, গ্রহণ প্রভৃতি নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া জাতকর্ম্ম ও স্নানদানাদি যাহা করা হয় তাহার নাম নৈমিত্তিক কর্ম্ম। কোন কিছুর কামনা করিয়া যাহা করা হয় তাহার নাম কাম্য, যেমন জ্যোতিষ্টোমাদি। যাহার অনুষ্ঠানের দ্বারা নরক-গমনাদিরূপ অনিষ্ট সংসাধিত হয় তাহার নাম নিষিদ্ধ, যেমন ব্রাহ্মণ-হননাদি। পাপক্ষয়মাত্র সাধন চান্দ্রায়ণাদির নাম প্রায়শ্চিত্ত।

নিত্য, নৈমিত্তিক, ফলানপেক্ষ্য কাম্য এবং পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম ও অনুষ্ঠেয়, অন্য সকল কর্ম্ম বর্জ্জনীয়। বিহিত কর্ম্মদ্বারা আমাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়। সাধক বিশুদ্ধান্তঃকরণে দীর্ঘকাল নিরন্তরভাবে শমদমাদি সাধনের অভ্যাস করিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। চিত্ত শুদ্ধ হইলে আর কর্ম্ম করার আবশ্যকতা থাকে না। অতএব ভাগবতে উক্ত হইয়াছে "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥"

বেদে কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, এই ত্রিবিধ কাণ্ড রহিয়াছে। চিত্ত বিশুদ্ধির জন্য কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন। উপাস্যনিষ্ঠ চিত্তৈকাগ্রতা অর্থাৎ ভক্তি উৎপাদনের জন্য উপাসনা কাণ্ডের প্রয়োজন। প্রারব্ধাদি কর্ম্ম ক্ষয়ের নিমিত্ত জ্ঞানকাণ্ডের আবশ্যকতা। কর্ম্মের প্রকার পূর্ব্বে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে উপাসনার স্বরূপ ও তাহার ফল সংক্ষেপে বলা হইতেছে। সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানস ব্যাপারের নাম উপাসনা, যেমন শাণ্ডিল্যবিদ্যাদি। উপাসনা বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গভেদে দ্বিবিধ। সুবিধার নিমিত্ত উপাসনাকে সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—সম্পৎ, আরোপ, সম্বর্গ এবং অধ্যাস। তাই উক্ত হইয়াছে—"সম্পদারোপ সম্বর্গাধ্যাসা ইতি মনীষিভিঃ। উপাসাবিধয়স্তত্র চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ[৪]।" নিত্যাদি কর্ম্ম এবং উপাসনা এই উভয়েরই ফল

৪। কেহ কেহ উপাসনাকে, অহংগ্রহ, অপ্রতীক, প্রতীক, সম্পৎ, সম্বর্গ, যজ্ঞাঙ্গ ও কর্ম্মাঙ্গ ভেদে সাত প্রকার বলিয়া থাকেন। উপাস্য পরমাত্মার আত্ম-অভেদে উপসনার

পিতৃদেবলোকাদি প্রাপ্তি। শ্রুতি বলিতেছেন—"কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ।" গীতার মতে অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র এই ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল। কর্ম্মভোগপর্য্যবসায়ী বলিয়া সংসার বন্ধনের কারণ। অতএব প্রারব্ধাদি কর্ম্মক্ষয় অবশ্য কর্ত্তব্য। একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই ইহা সম্ভব। ভগবান্ বলিয়াছেন—জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন! অপিচ—ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে। "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" এই শ্রুতির বলে কর্ম্মের দ্বারাও কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে কর্ম্মের আত্যন্তিকক্ষয় একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে। এই মর্ম্মে স্মৃতিতে আছে—"কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো নহ্যাত্যন্তিকঐষ্যতে। অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তম্বিমর্শনম্॥" এখন অবিদ্যার ক্ষয় কি করিয়া করিতে পারা যায় তাহাই কথিত হইতেছে। জ্ঞানের দ্বারাই অবিদ্যা নিবৃত্ত হয়। স্মৃতি বলিতেছেন—"বিদ্যাঽবিদ্যাং নিহন্ত্যেব তেজস্তিমিরসংঘবৎ।" অতএব দেখা যাইতেছে জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম ও অবিদ্যা উভয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে। কর্ম্মানুযায়ী অবিদ্যা হইতে সংসার হয় বলিয়া জ্ঞানের দ্বারা সংসারও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই সংসারনিবৃত্তিই মুক্তি।

নাম অহংগ্রহ উপাসনা অর্থাৎ আমিই পরমাত্মা এই যে পরমাত্মাতে আমিত্বের অধ্যারোপ ইহারই নাম অহংগ্রহ উপাসনা। শ্লোকে উল্লিখিত অধ্যাসই এই অহংগ্রহ। এই অহংগ্রহ উপাসনা আবার সগুণ, নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ। পর্য্যঙ্ক বিদ্যা, দহরবিদ্যা, উপকোসল বিদ্যা, মধু বিদ্যা, শাণ্ডিল্য বিদ্যা প্রভৃতি ব্রহ্মের বিকারোপাসনা অপ্রতীক উপাসনা বলিয়া খ্যাত। শ্লোকের আরোপ উপাসনাই এই অপ্রতিক উপাসনা। নাম রূপ প্রভৃতি উপাসনার আলম্বনের নাম প্রতীক। শীলাতে বিষ্ণু দর্শন, আদিত্যে ব্রহ্ম দর্শন প্রভৃতি প্রতীক উপাসনা। যথা কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য হেতু উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বস্তুর অভেদ জ্ঞান করিয়া যে উপাসনা তাহার নাম সম্পৎ উপাসনা। মনোবৃত্তি অসংখ্য, বিশ্বেদেবও অসংখ্য, সুতরাং মনকে বিশ্বেদেব কল্পনা করিয়া যে উপাসনা তাহা সম্পৎ উপাসনা। ক্রিয়ার সাদৃশ্যে অভেদ জ্ঞান করিয়া উপাসনার নাম সম্বর্গ উপাসনা। সংহার ক্রিয়া সামান্যে বায়ু ও প্রাণের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া উপাসনা করার নাম সম্বর্গ উপাসনা। প্রণব প্রভৃতি আলম্বন রূপে গ্রহণ করিয়া উপাসনা করার নাম যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা। হবিঃসংস্কার যেরূপ যজ্ঞকার্য্যের অঙ্গ, সেইরূপ আত্মার সংস্কারের জন্য তাহাকে ব্রহ্মভাবে অনুধ্যান করার নাম কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা।

ভট্টৈকদেশী ও প্রভাকর মতাবলম্বীগণ নিষ্কাম কর্ম্মই মুক্তির সাধন বলিয়া বলেন। ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ ও ভাস্কর প্রভৃতি কর্ম্মসমুচ্চিত উপাসনাকে মুক্তির সাধন বলেন। নিরুক্তৈকদেশিগণ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়কেই মুক্তির সাধন বলিয়া থাকেন। এই সকল আচার্য্যগণ নিজ নিজ বুদ্ধিদ্বারা গূঢ় বেদার্থ এইরূপ বলিয়া উৎপ্রেক্ষা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ কর্ম্মাদি নিরপেক্ষ জ্ঞানই মোক্ষসাধন। কৈবল্যোপনিষৎ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—"জ্ঞাত্বাতং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে।" স্মৃতিতেও আছে—"জ্ঞানাদেবামৃতত্বং নহি শশকবধূঃ সিংহপোতং প্রসূতে।"

রজ্জুবিবর্ত্ত সর্প যেরূপ রজ্জুজ্ঞান বিনা মন্ত্র ও ওষধি প্রভৃতির প্রয়োগে বিনিবৃত্ত হয় না ব্রহ্মবিবর্ত্ত প্রপঞ্চও সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত কেবল কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। চিত্তশুদ্ধির হেতু কর্ম্ম ও উপাসনা পরম্পরাক্রমে মোক্ষ আনয়ন করে কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে। জ্ঞান হইতেই সাক্ষাৎ মোক্ষ হয়।

এই জন্মে এবং জন্মান্তরে বেদবেদাঙ্গাদির অধ্যায়ণ জ্ঞানের প্রথম সোপান। তৎপর সাধক নিত্যানিত্য বস্তু বিচার করিবে। এক মাত্র ব্রহ্মই নিত্যবস্তু, তদ্ব্যতীত প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত পদার্থ সমূহ অনিত্য। তৎপর ইহকাল ও পরকালে ফলভোগ হইতে বিরত হইতে হইবে। এই পৃথিবীতে স্রক্, চন্দন, বনিতা প্রভৃতির দোষ দর্শন করিয়া এবং পরকালে নন্দনকাননবিহার ও রম্ভা প্রভৃতির সঙ্গের আকাঙ্ক্ষা বর্জন করিয়া বিষয় ভোগে বীততৃষ্ণ হইতে হইবে। অনন্তর বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহের ন্যায় মনের ও নিগ্রহ করিতে হইবে। কর্ম্মের সংন্যাস, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা, লক্ষ্যে চিত্তের ঐকাগ্র্য, এবং গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসরূপ সাধন সম্পত্তি আয়ত্ত করিতে হইবে। ইহারাই শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা নামে অভিহিত। তৎপর কি করিয়া আমার এই নানা দুঃখবহুল শরীর হইতে মোক্ষ হইবে, কখন আমার মোক্ষ হইবে, এইরূপ তীব্র ইচ্ছার উদ্রেক করিতে হইবে। ইহারই নাম মুমুক্ষুত্ব। সর্বশেষ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধিরূপ সাধন অবলম্বন করিবে।

সমুদয় বেদান্ত বাক্যের অদ্বয় ব্রহ্মে তাৎপর্য্যাবধারণের নাম শ্রবণ। শ্রুত অদ্বয় ব্রহ্মের বেদান্তের অবিরোধী যুক্তির দ্বারা নিরন্তর ভাবে চিন্তনের নাম মনন। বিজাতীয় দেহ হইতে অহংত্ব পর্য্যন্ত জড়বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের

নিরোধপূর্ব্বক সজাতীয় অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যয়ের প্রবাহীকরণের নাম নিদিধ্যাসন। ব্যুত্থান ও নিরোধসংস্কারের অভিভব ও প্রাদুর্ভাবের নিমিত্ত চিত্তের একাগ্রতারূপ পরিণামের নাম সমাধি।

সমাধি সবিকল্প ও নির্বিকল্প ভেদে দ্বিবিধ। চিত্তের নিরোধ পরিণামকে বিকল্পরহিত বা নির্বিকল্প সমাধি বলা হয়। এখানে সমাধি শব্দের অর্থ যোগ।

হঠযোগ ও রাজযোগ ভেদে যোগ দ্বিবিধ। রাজযোগরূপ সৌধে আরোহণ করিবার জন্য হঠযোগ সোপানরূপে পরিকল্পিত। হঠযোগ ও রাজযোগকে সাধন ও সিদ্ধিরূপ মনে করিতে হইবে। সিদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলে সাধনের অভ্যাস নিষ্ফল। আবার সাধন বিনা সিদ্ধি প্রাপ্তি অসম্ভব। এই জন্যই স্বাত্মারাম বলিয়াছেন—হঠম্বিনা রাজযোগো রাজযোগম্বিনা হঠঃ। পূর্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, জ্ঞানের দ্বারা নিখিল প্রপঞ্চের লয় হইলে স্বস্বরূপাবস্থানরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মুক্তি হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ শোধনোপযোগি ব্যাপারপূর্বক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তিভেদে মুক্তি দ্বিবিধ। এক্ষণে জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তির ভেদ সংক্ষেপে বলা হইতেছে। প্রারব্ধ শরীর বর্ত্তমান থাকা কালীন দেহ হইতে অহংত্ব পর্য্যন্তের অভিমান রহিত হইয়া নির্বিশেষ কেবল ব্রহ্মরূপে যে স্থিতি, যাহাতে ঘট প্রস্তুত হওয়ার পরেও কুলাল চক্রের ভ্রমণের ন্যায় প্রারব্ধপ্রবৃত্ত শরীর যাত্রার অনুকূল প্রবৃত্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহার নাম জীবন্মুক্তি। প্রারব্ধের অবসানে স্বীয় কল্পিত সমুদয় প্রপঞ্চের বিনাশপূর্বক নির্বিশেষ কেবল ব্রহ্মরূপে স্থিতির নাম বিদেহমুক্তি। অতএব দেখা যাইতেছে যে বিদেহমুক্ত সংসারীদের নিকট মৃত, জীবন্মুক্তেরাই তাহাদের উপদেষ্টা বলিয়া বেশী উপকারক।

উপনিষদের আলোচ্য বিষয়

২

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. সি. এস্।

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিলেন মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী।[১] দার্শনিক হিসারে এই যাজ্ঞবল্ক্যের খ্যাতি ছিল সুদূর-প্রসারী। বাস্তবিক বল্‌তে কি উপনিষদের যুগে তাঁর মত নামকরা দ্বিতীয় দার্শনিক আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি ঠিক কর্‌লেন যে তিনি প্রব্রজিত হবেন। সেই কারণে তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে ডেকে বল্‌লেন যে তিনি প্রব্রজন কর্‌বেন ঠিক করেছেন, অতএব তাঁর যা সম্পত্তি আছে তা তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে বিভাগ করে দিয়ে যেতে চান। এ দিকে মৈত্রেয়ী ছিলেন বাস্তবজীবনে উদাসীন এবং পরাবিদ্যায় আসক্ত। তাই তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন—যদি এই সমগ্র পৃথিবী বিত্তে পরিপূর্ণ হয়ে আমার হত তা হলে কি আমি অমৃতা হতাম? তিনি উত্তর দিলেন যে তা কখনই হয় না, বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা আদৌ নাই তখন মৈত্রেয়ী যে দৃপ্ত বাক্যটি বলে-ছিলেন সেই উক্তিটিই আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়। তিনি বল্‌লেন—"যা পেয়ে আমি অমৃতা হব না, তা নিয়ে আমি কি কর্‌ব? আপনি যা জানেন তাই আমাকে বলে যান।"[২] তা শুনে যাজ্ঞবল্ক্য অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং মোটামুটি তাঁর যা দার্শনিক মত তাই তাঁকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন। সে বিষয় আমরা যথাস্থানে আলোচনা কর্‌ব। মোটামুটি এখনেও আমরা সেই নচিকেতার বাণীর সমর্থন পাই। মৈত্রেয়ীর মত সংসারবাসিনী নারীও মানুষের তৃপ্তি পার্থিব ভোগবিলাসে হয় না কিন্তু পরাবিদ্যা আহরণেই হয় এ তথ্য হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে-ছিলেন এবং সেই কারণেই যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে প্রিয়বাদিনী বলে পরিগণিত হয়েছিলেন।

১। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্—দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ এবং চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য।

২। যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তবেদ মে বিব্রূহীতি॥ বৃহদারণ্যক, ৪।৫।৪

এই সুন্দর গল্প হতে আমরা সহজেই ধারণা করে নিতে পারি যে সেকালে পরাবিদ্যার কত বেশী আদর ছিল। পার্থিব ভোগ বিলাসের মোহ, ব্যবহারিক জগতে যা কাজে লাগে এমন বিদ্যার আকর্ষণ, এমন কি যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি ধর্ম্ম বিষয়ক ব্যাপারের দাবীও সে কালের মানুষ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করতেন, পরাবিদ্যাকে বরণ করে নেবার জন্য। নিছক জ্ঞানলাভের জন্যই জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। যে জ্ঞানের কোন ব্যবহারিক উপযোগিতা নাই কিন্তু যে জ্ঞান সৃষ্টির মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে আমাদের সাহায্য করবে সেই জ্ঞানই তাঁদের কাছে বরণীয়তম ছিল।

এখন তা হলে আমরা মোটামুটি এই ধারণা করতে সমর্থ হয়েছি যে পরাবিদ্যাই উপনিষদের মূল এবং একমাত্র আলোচনার বিষয়। এই পরাবিদ্যা অর্থে আমরা যাকে আজকাল দার্শনিক বিদ্যা বলি সাধারণভাবে তাই বোঝায়। সমগ্র বিশ্বের যা মূলগত বস্তু তার আলোচনা করা, তার স্বরূপ কি, তার সৃষ্টি হয় কিরূপে ইত্যাদি বিষয়ই হল দর্শনের সাধারণ আলোচনার বিষয়। পরাবিদ্যার অর্থও তাই। সৃষ্টির মৌলিক বিষয়গুলিকে নিয়ে আলোচনা এবং তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহই হল পরাবিদ্যা সঞ্চয় করা। এখন যে সমস্ত দার্শনিক সমস্যা বিশেষ করে উপনিষদ্‌গুলিতে আলোচিত হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া কর্ত্তব্য।

দর্শনের আলোচনার বিষয় হল সমগ্র সত্য[৩] অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি। এইখানেই দর্শনের সহিত বিজ্ঞানের পার্থক্য। বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন সৃষ্টির এক একটি বিশিষ্ট অংশ নিয়ে এবং সেই বিশিষ্ট অংশের বস্তুনিচয়ের সম্বন্ধে যে জ্ঞান আহরণ করেন তাকেই সুসংবদ্ধ আকারে প্রকাশ করেন। যেমন জ্যোতিষশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধেই জ্ঞান আহরণ, রসায়নশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল মৌলিক বস্তু ও তাদের মিশ্রণে যে মিশ্র বস্তুগুলি গঠিত হয় তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা। দর্শনের আলোচনার বিষয় বলতে জগতের কিছু বাদ পড়ে না, সমস্ত বিষয়ই এক ভাবে না একভাবে

৩। সত্য শব্দটি দার্শনিক পরিভাষায় যাকে reality বলে তার সমর্থবোধক হিসাবে ব্যবহার করা হল। উপনিষদে ইহা এই অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। ব্রহ্মকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে সত্যের অর্থ মিথ্যার উল্টো নয়, কারণ ব্রহ্মকে সত্য এবং মিথ্যা দুই বলেও নির্দ্দেশ করা হয়েছে।

তার গণ্ডির মধ্যে এসে পড়ে। অবশ্য সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে একত্র করলেই আমরা দর্শন পাই না। সেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ভিত্তি করে বিশ্বের মৌলিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংবদ্ধ আকারে জ্ঞান আহরণ করাই হল দর্শনের বিশেষ কর্ত্তব্য।

উপনিষদে এই মৌলিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা আমরা যথেষ্ট পাই এবং তাই হল তাকে দর্শন বলে গ্রহণ করবার সব থেকে বড় কারণ। উপনিষদের মধ্যে তাদের আলোচনা সুসংবদ্ধ আকারে পাবার আশা আমরা আদৌ করতে পারি না। সেই প্রাচীন যুগে বৈজ্ঞানিক ধরণে আলোচনার পদ্ধতি প্রচার লাভ করে নি। এক কথায় বলতে গেলে তখন ছিল মানব সভ্যতার শৈশবের যুগ, তখন বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় নি। উপনিষদ্কার যে আলোচনার পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা কোন বিশেষ পদ্ধতি বা শৃঙ্খলা সংবদ্ধ নয়। উপনিষদ্গুলি একই মনীষীর রচিত নয় বা অনেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা নিয়েই সীমাবদ্ধ নয়। তার কারণ এই যে তার উৎপত্তি বেদের এবং বিশেষ করে ব্রাহ্মণের অংশ হিসাবেই। সেই কারণেই অনেক উপ-নিষদে যাগ যজ্ঞাদির আলোচনার কথাও আমরা বহুল পরিমাণে পাই। সব থেকে বড় এবং প্রাচীন যে দুখানি উপনিষদ্ আছে—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—তাদের উভয়েরই বহুল পরিমাণ অংশ আমরা এই যজ্ঞ উদ্গীথ ইত্যাদির আলোচনায় পরিপূর্ণ দেখতে পাই। তারই মাঝখানে কোন কোন ঋষি সুগভীর চিন্তা ও সাধনার ফলে কোন মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে যখন কোন জ্ঞান আহরণ করেছেন তখন তাকে উপনিষদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এই ভাবেই উপনিষদের মধ্যে নানা তত্ত্বের আলো-চনা খণ্ড খণ্ড আকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আমরা পেয়ে থাকি। সেইগুলিকে সংগ্রহ করে পরস্পর সুসংবদ্ধ আকারে গ্রথিত করলে তবেই আমরা তাকে একটি বিশেষ দার্শনিক মতের আকার দিতে সমর্থ হব। এই রচনার বিশেষ উদ্দেশ্য হল সেই প্রচেষ্টা করা।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিশেষ বিষয় হল উপনিষদে যে সমস্ত মৌলিক সমস্যাগুলি আলোচিত হয়েছে তাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া। এখন সেই বিবরণ আরম্ভ করবার উপযুক্ত সময় হয়েছে।

উপনিষদে প্রথমতঃই একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে জ্ঞানের

আকাঙ্ক্ষা সব থেকে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে সেই বিষয়টি সম্পর্কে যাকে জানা হয়ে গেলে আর কিছু জানবার থাকে না। মোটামুটি একেবারে নিছক সত্যটি, নামরূপের অতীত সত্যের আসল রূপটি আবিষ্কার কর্‌বার আগ্রহই সব থেকে বেশী। এ আগ্রহের গভীরতা উপনিষদে প্রচলিত প্রার্থনার বাণীতে আমরা বেশ উপলব্ধি কর্‌তে পারি। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।"

সত্যের মুখকে অনাবৃত করে তার আসল রূপটীকে জান্‌বার ব্যাকুলতাই এই প্রার্থনাটির মর্ম্মকথা। সত্যের মূলতম প্রকাশটির নাগাল পাওয়াই এই তীব্র আগ্রহের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। সেই জন্যই আমরা দেখি উপনিষদ্ বলেন ঋগ্‌বেদ যজুর্ব্বেদ ইত্যাদি অপরাবিদ্যা আহরণ কর্‌লেই সব জানা হল না। তা হল বাহিরের জিনিষ, অন্তরের নয়। এমন সত্যকে উপলব্ধি কর্‌তে হবে যাকে জানা হয়ে গেলে আর কিছু জান্‌বার থাকবে না, আর সকল জিনিষ আপনিই জানা হয়ে যাবে। যেমন মাটীতে গড়া সকল জিনিষের উপাদান কারণ মাটীকে যখন চেনা হয়ে যায়, তখন মাটীতে নির্ম্মিত সকল বস্তু সম্বন্ধে আসল তত্ত্বটীর জ্ঞান সঞ্চয় করা হয়ে যায়। তেমনি এই দৃশ্যমান বিশ্বের মধ্যে যা কিছু আছে তাদের সকলের মূলগত কারণ যা, উপাদান যা, তাকে জানা, তাকে উপলব্ধি করা, তাই হল উপনিষদের আকাঙ্ক্ষা। ছান্দোগ্য উপনিষদের দুই স্থলে দুটী ছোট গল্পের ভিতর দিয়ে এই কথাটিকে অতি সুন্দরভাবে বুঝান হয়েছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা পাই যে আরুণির পুত্র ছিলেন শ্বেতকেতু। পিতা ছিলেন বিশেষ পণ্ডিত তাই তাঁর আদেশে পুত্র শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষকাল গুরুগৃহে থেকে সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করে গর্ব্বিত হয়ে পিতার কাছে ফিরে এলেন। তখন তাঁর পিতা তাঁকে প্রশ্ন কর্‌লেন—"গুরুর কাছেত সব শিক্ষা করে পণ্ডিত হয়ে এসেছ, তাঁকে কি সেই আদেশটী জিজ্ঞাসা করেছিলে?" পুত্র ত সে কথা শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন, সেই আদেশের অর্থ পিতার নিকটই জান্‌তে চাইলেন। তখন পিতা তাকে বুঝালেন যে যাকে জান্‌লে অজ্ঞাত কিছু

থাকে না, যাকে শুন্‌লে অশ্রুত কিছু থাকে না তাই হল 'আদেশ'। অর্থাৎ সকল বস্তুর সকল বিষয়ের সম্বন্ধে যা মূলগত তত্ত্ব তাই হল 'আদেশ'। সেই মূলগত তত্ত্বের জ্ঞান ভিন্ন সকল শিক্ষাই অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। আরও তিনি উপমা দিয়ে এই কথাটী বুঝালেন। তিনি বললেন লৌহকে চেনা হয়ে গেলে যেমন যা কিছু লৌহনির্ম্মিত বস্তু আছে তাদের চেনা হয়ে যায়, তাদের যে রূপের বিভিন্নতা তা কেবল নামেতেই এবং মানুষের চিন্তাধারাতেই সে নামের উৎপত্তি, লৌহত্বই তাদের সম্বন্ধে মূল সত্য। তেমনি হল সেই আদেশ। সুতরাং আদেশের এখানে একটী বিশেষ পারিভাষিক অর্থ আছে। তার অর্থ এই যে সমগ্র সৃষ্টির সম্বন্ধে যা মূলগত তত্ত্ব তারই নির্দ্দেশ।

এই মূলগত তত্ত্বের জ্ঞান যে বিদ্যা দিতে পারে তাই হল খাঁটী পরাবিদ্যা, আর সকল বিদ্যাই বাহ্যিক তাদের বাহাদুরী কেবল মাত্র শব্দ যোজনা দিয়েই। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভেই আমরা পাই যে নারদ মুনি একদিন ঋষি সনৎ কুমারের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ কর্‌লেন যে তাঁকে পড়াতে হবে। তখন সনৎ কুমার বললেন যে তা বেশ উত্তম প্রস্তাব, তবে কতদূর অবধি নারদ পড়েছেন সেটা বলে দিলে সুবিধা হবে, তিনি তার পর থেকে পড়াবেন। নারদ তখন যত বিদ্যা অর্জ্জন করেছিলেন তার যা লম্বা তালিকা দিলেন তা হল এই : ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ব, ইতিহাস, পুরাণ, পিতৃ-পুরুষ সম্বন্ধে বিদ্যা, দেবতা সম্বন্ধে বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা (শিক্ষাকল্পাদি), ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন সনৎকুমার বললেন যে তুমি এ পর্য্যন্ত যা পড়েছ সব কিছুই হল নাম। অর্থাৎ এই সকল অপরা বিদ্যা তাঁকে আসল মূল তত্ত্বের সন্ধান দিতে পারে নি, তারা কেবল বাহিরের বিদ্যা। সেই মূলগত তত্ত্ব কি তার অনুসন্ধানে তিনি এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেছেন। সে বক্তৃতায় তিনি সেই মূলগত তত্ত্বের অন্বেষণে বিভিন্ন বস্তু বা বিষয়কে পরীক্ষা করে যে বিষয়টী সবার মূলে আছে বলে নির্দ্দেশ করেছেন তা হল 'ভূমা'। এই ভূমাই হল সবার মূলে এবং তাকে জান্‌লেই বিশ্বের মূল সত্যকে জানা হয়ে যায়।[৪]

৪। ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥
ছান্দোগ্য ।।৭।।২৩

এই ভূমা হল আর কিছুই নয়, ইহা হল যা সব থেকে বড়, সব থেকে বিরাট, যা সকল বস্তু এবং বিষয়ের আধার তাই। ভূমা শব্দের ধাতুগত অর্থই হল তাই। অপর পক্ষে আমরা দেখি 'ভূমা'র যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা হতে অনায়াসে এই ধারণা করা যায় যে উপনিষদ্‌কার ব্রহ্ম অর্থে যা বুঝেন ভূমার অর্থও তাই। এদিকেও এটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ব্রহ্মের ধাতুগত অর্থও হল যা অতি বৃহৎ তাই, অর্থাৎ উভয় শব্দেরই অর্থ এক। পারিভাষিক অর্থও যে উভয়েরই এক তাও একটি উদাহরণ দিলে বেশ সহজেই প্রমাণিত হয়ে যাবে। ব্রহ্ম যে উপনিষদ্-দর্শনে সর্ব্ব বস্তু ও সর্ব্ব বিষয়ের মূল এবং অবলম্বন তাতে কোথাও মতদ্বৈধ নাই। যা কিছু আছে তা সমস্তই ব্রহ্ম, তাতেই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় এই হল উপনিষদের মূল বাণী[৫] অপর পক্ষে ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ভূমার যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা এই একই অর্থে। ভূমা হল তাই যা সকল বিষয়ের আধার স্বরূপ। "তাই হল নীচে, তাই উপরে, তাই পশ্চাতে, তাই সামনে, তাই দক্ষিণে, তাই উত্তরে—তাই হল বিশ্বে যা কিছু আছে সমস্ত।"[৬] সুতরাং যাকে ভূমা বলা হয়েছে এবং যাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে উভয়েই যে এক তাতে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

এই ব্রহ্ম শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে এবং এই একই অর্থে আর একটি শব্দেরও বহুল পরিমাণে ব্যবহার আমরা উপনিষদে পেয়ে থাকি। এই শব্দটি হল 'আত্মন্'। এই আত্মা শব্দের পরবর্ত্তী কালে এবং এখন একটা বিশেষ অর্থ দাঁড়িয়েছে এই যে তা ব্যক্তি বিশেষের আত্মাকে (ইংরেজী পরিভাষায় যাকে Soul বলে তাকেই) নির্দ্দেশ করে। অনেক ক্ষেত্রে আবার আত্মন্ শব্দকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং মানুষের আত্মাকে নির্দ্দেশ করতে তাকে জীবাত্মা বলা হয় এবং ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করতে তাকে পরমাত্মা বলা হয়। উপনিষদে কিন্তু তার একটু ব্যতিক্রম ঘটেছে। এইটা বিশেষ করে মনে রাখবার বিষয় যে

৫। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৩।১৪।১

৬। স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমিতি। ছান্দোগ্য ॥ ৭।২৫।১॥

আত্মন্ শব্দে সাধারণতঃই সেখানে ব্রহ্ম অভিহিত হয়ে থাকেন। ব্রহ্ম ও আত্মা প্রতিশব্দরূপে ব্যবহারের বহু উদাহরণ আমরা উপনিষদে পাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা পাই—উষস্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন —যিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষচৈতন্যাত্মক ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বান্তরস্থ আত্মা, তাই আমাকে বুঝিয়ে দিন।[৭] অন্যত্র এই উপনিষদেই আমরা পাই মৈত্রেয়ীকে যাজ্ঞবল্ক্য বল্‌ছেন "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্।"[৮] ছান্দোগ্য উপনিষদেও আমরা এইরূপ আত্মা ও ব্রহ্মের একই অর্থে ব্যবহার দেখিতে পাই। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে মহাশ্রোত্রিয়গণ এসে মীমাংসা করতে প্রবৃত্ত হলেন "কো নু আত্মা কিং ব্রহ্মেতি।"[৯] মাণ্ডূক্য উপনিষদে বলা হয়েছে যে বিবেকীরা ব্রহ্মকে চতুর্থ অর্থাৎ তুরীয় মনে করিয়া থাকেন; তাঁকেই আবার আত্মা বলে নির্দ্দেশ করা হয়েছে।[১০] সুতরাং উপনিষদের মতে আত্মা বা ব্রহ্ম হলেন বিশ্বের মূলগত তত্ত্ব এবং তাঁর সম্যক্ উপলব্ধি হল উপনিষদের প্রধান উদ্দেশ্য।

মোটামুটী দার্শনিক আলোচনায় যে সকল বিষয় সাধারণতঃ আলোচিত হয় এবার তাদের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার প্রয়োজন হয়েছে। তা হলে পরে সেই দার্শনিক বিষয়গুলির কোন্ কোন্‌টী উপনিষদে আলোচিত হয়েছে সে সম্বন্ধে ধারণা করবার আমাদের যথেষ্ট সুবিধা হবে। দার্শনিক সমস্যাগুলিকে সাধারণতঃ দুটী প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে – প্রথম যা কিছু সত্য, যা কিছু ভাব বা অভাব পদার্থ তার সম্বন্ধে প্রশ্ন: এ সম্বন্ধে জ্ঞানকে আমরা তত্ত্ববিজ্ঞান (Ontology) বল্‌তে পারি। দ্বিতীয়, জ্ঞান সম্পর্কে যে সমস্ত প্রশ্ন জাগতে পারে; এ বিষয়ে জ্ঞানকে আমরা প্রমাবিজ্ঞান (Epistemology) এই আখ্যা দিতে পারি। এই দুই শ্রেণীর সমস্যাগুলির আর একটু বিস্তারিত বিবরণ দিলে বোধ হয় সুবিধা হবে।

৭। অথ হৈনমুষস্তশ্চাক্রায়ণঃ প্রপচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্ব ইতি ॥ বৃহদারণ্যক ৩।৪।১

৮। বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫

৯। ছান্দোগ্য, ৫॥১১॥১

১০। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ মাণ্ডূক্য, ৭

পদার্থ সম্পর্কিত প্রশ্ন সাধারণতঃ দুটী হয়ে থাকে—প্রথম বাস্তব জগতের সৃষ্টি হল কিরূপে? এখানে বাস্তব জগত অর্থে জড় এবং চেতন সকল পদার্থকেই ধরতে হবে। দ্বিতীয় তাদের প্রকৃতি ও গঠন কিরূপ? তারা মূলে এক না বহু, তারা চেতন না অচেতন পদার্থ? এই প্রথম প্রশ্নটীর যা আলোচনা সম্ভব তাকে দার্শনিক পরিভাষায় সৃষ্টিতত্ত্ব (Cosmogony) বলা হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটী সমাধানের যে চেষ্টা তাকে বিশ্ববিজ্ঞান (Cosmology) এই পারিভাষিক নাম দেওয়া যেতে পারে। মোটামুটী দেখা যেতে পারে যে সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশ্ন মূলতঃ এই দুই ধরণেরই হতে পারে। অপর পক্ষে দার্শনিক আলোচনার কতক অংশ জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়েই হয়ে থাকে। এই জ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্ন নানারূপ হতে পারে। জ্ঞানের উৎপত্তি কিরূপে হয়, জ্ঞানের সামগ্রী কি কি, জ্ঞান অর্জ্জনের সব থেকে উপযোগী পদ্ধতি কি কি হতে পারে ইত্যাদি। এই জাতীয় সকল প্রশ্নকেই প্রমাবিজ্ঞানের বিষয় বলে আমরা নির্দ্দেশ করতে পারি। সকল দার্শনিক আলোচনার প্রধান বিষয় হল এই সমস্যাগুলি। এখন উপনিষদে এই সমস্যাগুলির মধ্যে কোন্ কোন্টী আলোচিত হয়েছে তারই পরিচয় আমরা এখানে দেব।

এই বিশ্ব সম্বন্ধে যে প্রশ্ন সর্ব্বপ্রথম মানুষের মনে স্বতঃই এবং স্বভাবতঃই জাগে তা হল এই যে এই সৃষ্টি কি করে হল, সৃষ্টির ধারা কিরূপ? এই প্রশ্ন বোধ হয় যে কোন মানুষ বিশ্ব সংসার সম্বন্ধে একটু ভাবতে চেষ্টা করে তার মনেই সর্ব্বপ্রথম জাগে। সুতরাং মানব দর্শনের ইতিহাসে এই প্রশ্নটীই যে সর্ব্বপ্রথম জেগেছিল তা দেখে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই। ঋগবেদ যদিও প্রধানতঃ নানা দেবদেবীর স্তুতিতে পরিপূর্ণ তার শেষ ভাগে, বিশেষ করে দশম মণ্ডলেই আমরা দেখি যে ঋষি কবিরা কেবলমাত্র নানা দেবদেবীর স্তব রচনা করেই সন্তুষ্ট নন। তাঁরা সময় সময় নানা দার্শনিক প্রশ্নের আলোচনা করছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সে প্রশ্নের সমাধান করবার ইচ্ছায় উত্তরও দিতেছেন। উদাহরন স্বরূপ এই সম্পর্কে দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তের উল্লেখ আমরা করতে পারি। পুরুষ সূক্তেই মানুষের প্রথম দার্শনিক গবেষণার উদাহরণ। এই ঋগ্‌বেদের মধ্যেই আমরা দেখি যে ঋষির মনে এই সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছে।

এই সম্পর্কে আমরা একটী শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। শ্লোকটি এইরূপ—

ইয়ং বিসৃষ্টিঃ যত আবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গং বেদ যদি বা ন বেদ॥[১১]

শ্লোকটীর অর্থ এইরূপ—এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন! অথবা তিনিও না জানিতে পারেন।

পশ্চিম দেশেও আমরা দেখি যে দার্শনিকের মনে সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রথম যে প্রশ্ন জেগেছিল তাও ঠিক একই। গ্রীশ্ দেশেই পাশ্চাত্য দর্শনের জন্ম হয়। এ দেশের আদিম দার্শনিক হলেন থেলেস্, এনেক্সিম্যাণ্ডার, এনেক্সি-মেনেস প্রভৃতি। দেখবার বিষয় এই যে তাঁদের দার্শনিক আলোচনা এই সৃষ্টির কারণ নির্দ্দেশেই সীমাবদ্ধ। কেউ ঠিক করলেন জল হতেই সকল বিশ্বের উৎপত্তি, কেউ বললেন বায়ু হতেই সকল জিনিষ উদ্ভূত হয়েছে, কেউ বা বললেন বিশ্বের সকল বস্তুর আদিমতম রূপ হল অগ্নি।

উপনিষদের দার্শনিক আলোচনাতেও আমরা দেখতে পাই যে বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই প্রশ্ন একটি বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে এবং তা উপনিষদের আলোচনাগুলির একটি প্রধান অঙ্গ স্বরূপ। একাধিক উপনিষদে আমরা এই প্রশ্নের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ পাই এবং সমাধানের চেষ্টাও দেখতে পাই।

১১। ঋগ্বেদ—১০।১২৯।৭

সম্পাদকীয়

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র 'দর্শনের' দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর ইহা দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক-মণ্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের মধ্যে যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহের সঞ্চার করিয়াছে তাহা দেখিয়া আমাদের মনে বিশেষ আনন্দ ও আশার উদ্রেক হইয়াছে। দর্শন ও ধর্ম্মবিষয়ে অনুরাগসম্পন্ন সাধারণ পাঠকবর্গও যে এই পত্রিকার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। অতি অল্পদিনের মধ্যেই বহু গণ্যমান্য ও চিন্তাশীল ব্যক্তি পরিষদের সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত হইয়াছেন এবং তন্মধ্যে সাধারণ পাঠকপাঠিকার সংখ্যা অত্যল্প নহে। প্রথম সংখ্যার সব খণ্ডই বিতরিত বা বিক্রীত হইয়া যাওয়ার পর যে সব বিদ্বজ্জন একখণ্ড পত্রিকার জন্য আমাদের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিতে পারি নাই বলিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি এবং তাঁহাদের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি। এ ত্রুটী আমাদের ইচ্ছাকৃত নহে এবং বর্ত্তমান সংখ্যা সম্বন্ধে যাহাতে তাহা পুনরায় না ঘটে তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথম সংখ্যা সম্বন্ধে কয়েকটি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে মনে হয় 'দর্শন' পত্রিকা শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজের একটি চিরানুভূত ও সুস্পষ্ট অভাব দূরীকরণে সমর্থ হইবে। সমালোচনামুখে এ সব পত্রিকায় 'দর্শনের' উন্নতিসাধনকল্পে যে সকল সদুপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা সাদরে গৃহীত ও অনুসৃত হইবে। আশাকরি দর্শনানুরাগী বাঙ্গালীমাত্রেই এই পত্রিকার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করিয়া আমাদিগকে বাধিত ও কৃতার্থ করিবেন।

*　　　*　　　*

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার মহামহোপাধ্যায় ডক্টর স্যার গঙ্গানাথ ঝা বিগত কার্ত্তিক মাসের ২৩শে তারিখে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তাঁহার মত একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রবিশারদের মৃত্যুতে ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনের যে গুরুতর ক্ষতি

হইল তাহা সুদূর ভবিষ্যতেও পূরণ হইবার আশা কম। ডাঃ গঙ্গানাথ ঝা তাঁহার ছাত্রজীবনের প্রথমভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স ও এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম.এ পাস করিবার পর তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট এবং এল-এল. ডি উপাধি লাভ করেন। প্রথমোক্ত উপাধিলাভের সময়েই তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি কয়েক বৎসর দ্বারভাঙ্গা রাজগ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং তাহার পর বহুবৎসর যাবৎ এলাহাবাদের মুইর কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে কাজ করেন। তারপর তিনি বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন এবং পাঁচ বৎসর ঐ পদে বিশেষ দক্ষতার সহিত কাজ করেন। তৎপরে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে উপর্য্যুপরি তিনবার নির্ব্বাচিত হন এবং উক্ত কার্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি "কমলা লেক্চার" প্রদান করেন এবং তাঁহার ঐ বক্তৃতাবলী "ফিলজফিক্যাল ডিসিপ্লিন্" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্বে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে "সাধোলাল লেক্চার" প্রদান করেন এবং ঐ বক্তৃতাবলী 'গৌতমের ন্যায়দর্শন' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। মীমাংসা দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত "প্রভাকর স্কুল অব্ পূর্ব্ব-মীমাংসা" নামক গ্রন্থখানি মৌলিক তথ্যপূর্ণ এবং সর্ব্বজনসমাদৃত হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া তিনি ভারতীয় দর্শনের পঠনপাঠন ও প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্লোকবার্ত্তিক, জৈমিনির মীমাংসাসূত্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, ন্যায়সূত্র, ভাষ্য ও বার্ত্তিক, পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ ও ন্যায়কন্দলী প্রভৃতির ইংরেজী অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁহার যে সব অমূল্য অবদান আছে তাহাতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা তাঁহার স্বর্গত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

* * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক ও কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রদ্ধেয় কিরণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত অগ্রহায়ণ মাসের ১৯শে

তারিখে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের এক প্রাচীন পণ্ডিতবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরলোকগত রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের পরিবারে বিবাহ করেন। তিনি কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান্ ছাত্র ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ পরীক্ষায় ইংরেজী, দর্শন ও সংস্কৃত এই তিনটি বিষয়ে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের কাম্য অথচ সুদুর্লভ 'জন্ লক্' বৃত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য যে সব ভারতবাসী অদ্যাবধি অক্সফোর্ডে গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র। গ্রীক্, ল্যাটিন্ ও সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনেও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বঙ্গদেশের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ে ব্যবহারজীবীর কাজ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট্ বিভাগে ইংরেজী ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনায় গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। গ্রীক্ সাহিত্য ও দর্শনের জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় তাঁহার নিকট যে আলোক ও সদুপদেশ পাওয়া যাইত তাহা আর অন্যত্র পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। তাঁহার চরিত্রে পাণ্ডিত্যের সহিত সরলতার যে অপূর্ব্ব সমাবেশ আমরা দেখিয়াছি তাহা খুব কম স্থানেই দেখা যায়। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা আত্মীয়বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি এবং তাঁহার শোকাচ্ছন্ন পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের প্রবীণতম সদস্য মান্যবর প্রকাশচন্দ্র সিংহরায় ন্যায়বাগীশ মহাশয় দীর্ঘকাল রোগভোগের পর গত ২০শে কার্ত্তিক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদ্ একজন অশীতি-পর বৃদ্ধ ও বিদ্যোৎসাহী সদস্য হারাইল এবং বঙ্গমাতা তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী ও ভক্ত সন্তান হারাইলেন। দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত বাল্য-জীবনেই প্রকাশচন্দ্রের অসামান্য ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যা-লয়ের সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বরিশাল জিলা-স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং

প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি ও স্বুবর্ণ পদক লাভ করেন। তিনি মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে এফ-এ এবং বি-এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ হারের বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এম-এ উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠকালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরিশালে ঐ পদে নিযুক্ত হন। পঁচিশ বৎসরের উপর তিনি রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন রাজকর্ম্মচারীর পদে গৌরবের সহিত কাজ করিয়াছেন। চাকুরী জীবনে অনেক প্রলোভন ও বিপদের সম্মুখীন হইয়াও তিনি কখনও সত্যভ্রষ্ট হন নাই বা আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করেন নাই। যাহা সত্য বা ন্যায্য বলিয়া তিনি নিজে বুঝিতেন তাহা হইতে কেহ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকার সময়েই তাঁহার মনে ভারতীয় সাহিত্য, ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের প্রবল বাসনা জাগে এবং তিনি এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দেন। "আমার সাহিত্য সাধনা" নামক পুস্তিকাতে তিনি নিজে এ বিষয়ের বিবরণ লিখিয়াছেন। রাজকর্ম্ম হইতে অবসর লইবার পর তিনি যুগপৎ ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চ্চায় ও বিবিধ জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘকাল নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি ধর্ম্ম এবং ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সুগভীর জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তাহার সম্যক্ পরিচয় তাঁহার গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত তর্কবিজ্ঞান, ন্যায়-সোপান, দর্শন-সোপান, বেদান্ত-সোপান, গীতা-সোপান, ধর্ম্মযোগ নামক গ্রন্থগুলি যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেমনি হৃদয়গ্রাহী। বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়নে তিনি পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই অশীতি-পর মনীষী জরাগ্রস্ত দেহে শাস্ত্রানুশীলন ও শাস্ত্রব্যাখ্যায় যে উদ্যম, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন তাহা আমাদের আদর্শস্থল। তিনি বিশেষ আস্তিক্য-বুদ্ধি সম্পন্ন অথচ বিচার-শীল লেখক ছিলেন। এজন্য তাঁহার লিখিত গ্রন্থগুলি সুধীসমাজে সমাদৃত হইয়াছে। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ও আত্মীয়দের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের অন্যতম প্রবীণ সদস্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় গত ১৩ই মাঘ সজ্ঞানে কাশীলাভ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার পরলোকগমনে ভারতীয় দার্শনিক-মণ্ডলের আর একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হইল। তর্কবাগীশ মহাশয় যশোহরের এক সুবিখ্যাত ভট্টাচার্য্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ন্যায়, বেদান্তাদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই বিবিধ দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। প্রাচীন যুগের আচার্য্যদের সুমহান্ আদর্শ অনুসরণ করিয়া তিনি পাবনার সুবিখ্যাত দর্শন টোলে বহুবৎসর ধরিয়া বহু ছাত্রকে স্বগৃহে অন্নদান করতঃ বিদ্যা বিতরণ করিয়াছেন। এই সময় হইতেই তিনি প্রাচীন ন্যায়ের অন্তর্গত বাৎস্যায়ন ভাষ্যের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রবন্ধাকারে লিখিয়া কতিপয় পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে সমগ্র বাৎস্যায়ন ভাষ্যের অনুবাদ লিখিতে অনুরোধ করেন। তিনি সুদীর্ঘ বিংশতি বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবৃতি ও টিপ্পনীর সহিত সম্পূর্ণ বাৎস্যায়ন ভাষ্যের বিস্তৃত অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার "ন্যায়দর্শন" নামক এই অমূল্য ও অতুলনীয় গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক সুবৃহৎ পাঁচখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেছে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের "প্রবোধচন্দ্র বসু-মল্লিক" বৃত্তিপ্রাপ্ত অধ্যাপকরূপে তিনি "ন্যায়-পরিচয়" নামে আর একখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই দুইটি গ্রন্থ তাঁহার অমর কীর্ত্তি এবং দুরূহ ন্যায়দর্শনের সুগম প্রবেশপথ।

তর্কবাগীশ মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বীরভূম অধিবেশনের দর্শন শাখার সভাপতি মনোনীত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা, বৈষ্ণব সম্মেলনী প্রভৃতি বিবিধ সৎ-প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং তদ্‌বিধায় তিনি নানাভাবে দেশের সমাজের ও সাহিত্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন তেমনই সরল প্রকৃতি ও ধর্ম্মানুরাগী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয়ের

সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল তাঁহারা সকলেই তাঁহার সদালাপ ও সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। বাংলার এই বরেণ্য মনীষী ও মহামতি দার্শনিকের পরলোক-গমনে যে আদর্শ জীবনের অবসান ঘটিল তাহার পুণ্যস্মৃতি আমাদিগকে উন্নত ও অনুপ্রাণিত করুক ইহাই কামনা করি।

ভারতীয়-দর্শন-মহাসভা (Indian Philosophical Congress)

১৯২৫ সালে কলিকাতা-দর্শন-সমিতির (Calcutta Philosophical Society) উদ্যোগে এই মহাসভা প্রথম স্থাপিত হয় এবং ঐ সালের ডিসেম্বর মাসে কবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। তদবধি প্রতি বৎসর ঐ সময়ে (বড়দিনের অব্যবহিত পূর্ব্বে) ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে মহাসভার অধিবেশন তিন দিনের জন্য হইয়া থাকে। বিগত ডিসেম্বর মাসের ২০শে, ২১শে ও ২২শে তারিখে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার এক অধিবেশন হইয়া গেল। এবার মূল সভাপতি ছিলেন লাহোর ট্রেণিং কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ জি. সি. চাটার্জি, আই, ই, এস্। তর্ক ও তত্ত্ব বিজ্ঞান (Logic and Metaphysics), ধর্ম্ম ও নীতি-বিজ্ঞান (Religion and Ethics), মনোবিজ্ঞান (Psychology), ভারতীয় দর্শন এবং মুস্লিম্-দর্শন এই পাঁচটি শাখাতে মহাসভায় প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছিল। তাহা ছাড়া যুক্ত অধিবেশনে মূল সভাপতি ও শাখা-সভাপতিদের অভিভাষণ পাঠ হইয়াছিল এবং দুইটি পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় দুইটির একটি ছিল 'যাহা অপ্রমেয় তাহাই কি অর্থহীন?' (Is the Unverifiable meaningless?), এবং অন্যটি ছিল, 'সমষ্টি-মনের অস্তিত্ব আছে কি ?' (Is there a group-mind ?).

কলিকাতার আতঙ্ক ও অশান্তির জন্য এইবার বাংলা দেশ হইতে মাত্র একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন; তিনি ভারতীয় দর্শন শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ব্রহ্ম। ধর্ম্ম ও নীতি-বিজ্ঞানের নির্ব্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর অপরিহার্য্য কারণে যাইতে পারেন নাই। অন্যান্য বারের তুলনায় এইবার সমাগত প্রতিনিধি এবং

পঠিত প্রবন্ধের সংখ্যা খুবই অল্প হইয়াছিল। কিন্তু আলিগড়ের কর্তৃপক্ষের আন্তরিক আদর আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনার প্রাচুর্য্য বিশেষ লক্ষণীয় হইয়াছিল।

উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার গণিতজ্ঞ ডাঃ স্যার্ জিয়াউদ্দিন, সি, আই, ই, মহোদয় মহাসভার উদ্বোধন করেন এবং সেই প্রসঙ্গে গণিত ও বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে দর্শনের অপরিহার্য্যতার বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ-পাঠ করেন।

মূল-সভাপতি মিঃ চাটার্জির অভিভাষণের বিষয় একটু নূতন রকমের ছিল। তিনি কোন জটিল দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা না করিয়া দৈনন্দিন ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে দর্শনের নিবিড় সম্পর্কের কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তাঁহার মতে জীবন-যুদ্ধে দর্শনের উপযোগিতা অসন্দিগ্ধ। কিন্তু মানবজাতির শৈশবকালে যে সকল দর্শন উপযোগী ছিল. আধুনিক বয়ঃপ্রাপ্ত মানবের পক্ষে তাহা উপযোগী নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি গীতার ও অন্যান্যের সর্ব্বাত্মবাদ, যোগদর্শন, মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাবাদ ইত্যাদি প্রাচীন দর্শনের অনুপযোগিতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। উপসংহারে তিনি বস্তুতন্ত্রবাদ (Realism) এবং প্রাকৃতবাদের (Naturalism) অনুসরণ করিয়া মানবজীবন ও মানবের আদৃতবস্তু সকলের (Values) ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন যে এই প্রকার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিই কালোপযোগী ও বাস্তব জীবনের পক্ষে সহায়ক।

ভারতীয় দর্শনের সভাপতি ডাঃ ব্রহ্ম বেদান্তের সর্ব্বাতিশয়িত্ব (Vedantic Transcendence) সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। তর্ক ও তত্ত্ববিজ্ঞান শাখার সভাপতি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত টি. আর্. ভি. মূর্ত্তি এবং মনোবিজ্ঞান শাখার সভাপতি অন্নমালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পি. এস্. নাইডু এই উভয়ের অভিভাষণও বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

ভারতীয় দার্শনিক-পরিভাষা সমিতির অধিবেশনও এই উপলক্ষ্যে হইয়াছিল। তাহার বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হইল।

পুস্তক পরিচয়

হিন্দু প্রমাবিজ্ঞান বা ন্যায়-সোপান—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ন্যায়বাগীশ বি. এ প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক পি, ২০৫ ল্যান্সডাউন রোড এক্স্‌টেন্‌সন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ॥৵০ আনা।

প্রমাবিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি খুব কমই আছে। যাহা আছে তাহা ন্যায় বা অন্য কোন দর্শনের কোন প্রামাণিক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও টীকা-টিপ্পনী সম্বলিত হওয়ায় অতি বৃহৎ হইয়াছে এবং সর্ব্বত্র সহজবোধ্যও হয় নাই। প্রমা ও প্রমাণ বিষয়ে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনেব বিভিন্ন শাখায় যে সব মৌলিক তথ্য-পূর্ণ মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলির সারসংগ্রহ করিয়া বাংলা ভাষায় কোন সহজ ও সাধারণের পাঠোপযোগী গ্রন্থ এযাবৎ রচিত হয় নাই। আবার অনেকে মনে করেন যে ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞানেরই বিচার করিয়াছে, কিন্তু প্রমা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন আলোচনা করে নাই। এ ধারণা যে কতটা ভ্রমাত্মক তাহা যে কোন ভারতীয় দর্শনের সম্যক্ আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ভারতীয় দর্শনগুলির প্রত্যেকটিকেই একাধারে তত্ত্ববিজ্ঞান ও প্রমাবিজ্ঞান বলিলে ভুল হইবে না। কোন ভারতীয় দর্শনে প্রমা ও প্রমাণের বিচার না করিয়া কেবল পারমার্থিক তত্ত্বসম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। ভারতীয় দার্শনিকগণ প্রমাবিজ্ঞানের দৃঢ়ভিত্তিতেই তাঁহাদের নিজ নিজ তত্ত্ববিদ্যার স্থাপনা করিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় প্রকাশ চন্দ্র সিংহরায় ন্যায়বাগিশ মহাশয়ের হিন্দু প্রমাবিজ্ঞান বা ন্যায়-সোপান একদিকে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিবে এবং অপর দিকে একটি প্রচলিত ভ্রান্তধারণা দূর করিবে। এই গ্রন্থে তিনি ভারতীয় দর্শন সকলের প্রমা ও প্রমাণ বিষয়ক তথ্যগুলির সারসংগ্রহ করিয়া অতি সরল ও সহজভাবে তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য দর্শনের বিভিন্ন মত উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সুস্পষ্ট করিয়াছেন। পরিশিষ্ট ভাগে তিনি ভারতীয় দর্শন সকলের পারমার্থিক তত্ত্ববিষয়ে বিভিন্ন মতের উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তক পাঠ করিলে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিও ভারতীয় দর্শনের প্রমাবিজ্ঞান ও তত্ত্ববিজ্ঞান এতদুভয়েরই পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন এবং ভারতীয় দর্শন যে তত্ত্ববিজ্ঞানমাত্র নহে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

প্রমা ও প্রমাণের ব্যাখ্যা করিতে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রায় নির্ভুল ও যথার্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু দুই এক স্থলে তাঁহার প্রদত্ত ও অনুমোদিত ব্যাখ্যায় সন্দেহের অবকাশ হইতে পারে। প্রত্যক্ষ একটি প্রমাণ। ইহার লক্ষণ ব্যাখ্যা

করিতে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন সংবেদন (sensation) প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু সংবেদনকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিলে তাহার প্রমেয় কি হইবে? কেবল সংবেদন হইতে আমাদের কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না। রজ্জু প্রত্যক্ষ ও রজ্জুতে সর্প প্রত্যক্ষস্থলে আমাদের সংবেদন একরূপ। সুতরাং ইহাদের কোনটিকেই প্রত্যক্ষ বলা যায় না। প্রত্যক্ষদ্বারা কোন বস্তুরূপ প্রমেয় সিদ্ধি না হইলে তাহাকে প্রমাণ বলার সার্থকতা থাকে না। সূত্রে প্রদত্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণে অব্যাপ্তিদোষ খণ্ডন করিতে গ্রন্থকার ঈশ্বর প্রত্যক্ষের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতেও আপত্তি হইতে পারে। কারণ, এখানে জীবের ঈশ্বর প্রত্যক্ষ না বুঝিয়া নব্যনৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরের ইন্দ্রিয়াজন্য নিত্য প্রত্যক্ষ বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। গৌতমের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমেয় বলিয়া গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন সূত্রে ঠিক তাহা পাওয়া যায় না। সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ বলিতে গ্রন্থকার যাহা বুঝিয়াছেন তাহাও বিচারণীয়। ইহা সামান্যের অলৌকিক প্রত্যক্ষ নহে, পরন্তু সামান্যজ্ঞানজন্য জাতির প্রত্যক্ষ। উপমান প্রমাণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা মৌলিক হইলেও কিন্তু কোন প্রাচীন বা নব্য নৈয়ায়িকের গ্রন্থে এই ব্যাখ্যা নাই। বিশ্বনাথ তাঁহার ন্যায়সূত্রবৃত্তিতে উপমান সূত্রের ব্যাখ্যায় শেষে যে দৃষ্টান্তটি দিয়াছেন তাহা ঠিক উপমা (analogy) নহে। গ্রন্থকার যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কোথায় আছে আমার জানা নাই। যদি গ্রন্থকারের মতে উপমান অনুমান বা শব্দ প্রমাণের ন্যায় নিশ্চয়াত্মক না হয় তবে তাহাকে প্রমাণ বলিবার সার্থকতা কি? সে যাহা হউক, মোটের উপর গ্রন্থখানি তথ্যপূর্ণ এবং তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি যুক্তিদ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। প্রমাবিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় এরূপ পুস্তক পূর্ব্বে লিখিত হয় নাই। এই পুস্তক দর্শনানুরাগী ও বাংলা-ভাষাভাষী সুধীজনমাত্রেরই আদরণীয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।—সম্পাদক।

Continence and Its Creative Power—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত। সিন্ধুপ্রদেশস্থ করাচীর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ।০ আনা।

গ্রন্থকার "ব্রহ্মচর্য ও ইহার সৃষ্টি-শক্তি" সম্বন্ধে 'বেদান্ত কেশরীতে' প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহা পরে করাচীর 'ডেলি গেজেটে' প্রকাশিত হয়। ইহাই এখন পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে বর্ত্তমান যুগে ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ এবং পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন না করিলে আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনে

সুখ ও শান্তির আশা নাই। গ্রন্থকার তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় মনোবিজ্ঞান, শরীর-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন দিক্ হইতে বিচার করিয়া সমর্থন করিয়াছেন। আয়ুর্বেদ ও হিন্দুশাস্ত্র হইতেও বিশেষ বিশেষ বাক্য ও নীতি উদ্ধৃত করিয়া তিনি স্বমতের পোষকতা করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবন কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত এইপুস্তকে তাহার সম্বন্ধেও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পরিশেষে গ্রন্থকার নব্যভারতকে লক্ষ্য করিয়া একটি আবেগময়ী বাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বাণী ছাত্রসমাজের হৃদয়স্পর্শ করিলে এবং তাহারা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিলে আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীগণ বিশেষ উপকৃত হইবে এবং তাহাদের জীবনযাত্রার পথ সুগম হইবে ইহাই আমাদের স্থির বিশ্বাস। আমরা এই পুস্তিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

এই ইংরেজী পুস্তিকার একটা বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইলে দেশের তরুণ সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। স্বামীজি মহারাজকে এসম্বন্ধে বিবেচনা করিতে আমাদের বিনীত অনুরোধ জানাইছি।—সম্পাদক।

ভারতীয় দার্শনিক-পরিভাষা সমিতি

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্র মোহন দত্ত, এম. এ, পি-এচ্. ডি।

মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রদানের নিয়ম ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই এখন প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের প্রচেষ্টা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পক্ষে বিশেষ উপকারী, এই সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় সমস্যাও দেখা দিয়াছে। এতদিন ইংরেজীর দ্বারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাব-বিনিময় হইত, ইহাদ্বারা পরস্পরের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন চিন্তা ও ভাবের ধারা রক্ষা করার সুবিধা হইত। প্রত্যেক প্রদেশেই নিজ মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হইলে এবং উচ্চাঙ্গ পুস্তক রচিত হইলে ভাষাগত ঐক্যের অভাবে প্রদেশগুলি পরস্পর হইতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। সংস্কৃতি বা ভাবের ঐক্য লুপ্ত হইলে, রাষ্ট্রগত ঐক্যের মূলও বহুলাংশে শিথিল হইয়া যাইবে; ভারতের অখণ্ডতা বোধ স্তিমিত হইয়া আসিবে। এই সমস্যার প্রতিবিধান আবশ্যক।

ইংরেজী ত্যাগ করিয়া মাতৃভাষায়ই যদি সকল বিষয়ে চর্চ্চা করা উচিত হয়, তবে ঐক্য ও সংযোগ রক্ষার এক প্রধান উপায় হইবে বিভিন্ন বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ-গুলিকে যথাসম্ভব এক করা। প্রত্যেক প্রদেশেই এখন মাতৃভাষায় নূতন নূতন পরিভাষা-সঙ্কলনের চেষ্টা হইতেছে। এখন দেশব্যাপি একটা আন্দোলন হওয়া উচিত যাহাতে বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা সঙ্কলকগণ সম্মীলিত চেষ্টা দ্বারা এক সাধারণ পরিভাষার সৃষ্টি করিতে পারেন।

দুঃখের বিষয়, এই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের দিক্ হইতে চেষ্টা খুব সামান্যই হইয়াছে। এক পরিভাষা সৃষ্টি করার পথে অবশ্য অসুবিধা কিছু কিছু আছে; কিন্তু তাহা একেবারে দুরপনেয় নহে। এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইতেছে পরিভাষা সংস্কৃত-মূলক হইবে, না আর্ব্বীমূলক না দ্রাবিড়ভাষা-মূলক হইবে। ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা কবে হইবে জানি না। তবে এই প্রকার মীমাংসার অপেক্ষায় ঐক্যের চেষ্টা স্থগিত রাখিলে, অনৈক্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে। কারণ অসংহত চেষ্টায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ গড়িয়া উঠিতেছে। মহারাষ্ট্র, গুজরাত, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশে অল্পাধিক কাল বাস করার এবং মারাঠী, গুজরাতী, হিন্দী, বাংলা, অসমীয়া, উড়িয়া, প্রভৃতি সংস্কৃত-মূলক ভাষার সহিত পরিচয় ঘটারও আমার সৌভাগ্য হইয়াছে। দেখিয়া বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছি, এই সকল ভাষায় ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের প্রতিশব্দ সংস্কৃত

হইতে গঠিত হইতেছে, অথচ এক ভাষার পরিভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার পরিভাষার অনেক স্থলেই ঐক্য বা সাদৃশ্য নাই। যেমন, একই অর্থে বিভিন্ন ভাষায়, সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ব্যবহার হইতেছে; সেইরূপ সম্পাদক ও মন্ত্রী, বিপ্লব ও ক্রান্তি, সভাপতি ও অধ্যক্ষ্য ইত্যাদি একই অর্থে চলিয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার প্রায় বিশ বৎসর হইতেই মনে প্রশ্ন হইতেছিল, যে সব ভাষা সংস্কৃত হইতেই পরিভাষা সৃষ্টি করিতেছে অন্ততঃ সেইগুলির মধ্যে কি এক পরিভাষার প্রবর্ত্তন করা যায় যায় না? তাহা হইলেও ত' বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে অনেকটা ঐক্য স্থাপন সম্ভবপর হয়? সব বিষয়ে এক পরিভাষা করার আন্দোলনের জন্য বহু শক্তি ও সময়ের আবশ্যক। আপাততঃ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এই ঐক্য স্থাপন করার চেষ্টা করার ইচ্ছা হইল। দর্শনের পরিভাষা সম্বন্ধে এইরূপ চেষ্টা করার বিশেষ কতকগুলি সুবিধার কথা মনে হইল। ভারতীয় দর্শনের চর্চ্চা সংস্কৃত ও তন্মূলক পালি-প্রাকৃত ভাষায় ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই বহু শতাব্দী যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে এবং তাহার ফলে দর্শনের বহু পারিভাষিক শব্দ সর্ব্বত্র একই অর্থে প্রচলিত আছে। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া এক নূতন সাধারণ পরিভাষা সঙ্কলন ও গঠন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। এই চেষ্টা করার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সম্মীলিত আলোচনা ও পরামর্শের অবশ্য প্রয়োজন। ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশন উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর দার্শনিকদের বিভিন্ন প্রদেশে একত্র সমাগম হয়। উক্ত কাজ করার পক্ষে ইহা এক বড় সুযোগ বলিয়া মনে হইল।

বিগত ইং ১৯৪০ সনের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজের উপকণ্ঠে এডিয়ার এ ভারতীয় দর্শন মহাসভার এক অধিবেশন হইয়াছিল। সেখানে কয়েকজন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে এই সম্বন্ধে প্রথম আলাপ হইল। ইঁহাদের কয়েকজন পূর্ব্ব হইতে নিজ নিজ ভাষায় দার্শনিক পরিভাষা সঙ্কলনের কাজ করিতেছিলেন। সংস্কৃত-মূলক পরিভাষাগুলির মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে ইঁহাদের বিশেষ সহানুভূতি পাওয়া গেল। কিছু আলোচনার পর সেখানেই কয়েকটি প্রদেশের উৎসাহী ব্যক্তিদিগকে নিয়া একটা অস্থায়ী সমিতি গঠিত হইল। মহারাষ্ট্রের সাংলী কলেজের অধ্যাপক ডি. ডি. বাড়েকর এই সমিতির সাময়িক আহ্বায়ক নিযুক্ত হইলেন। আলোচনান্তে স্থির হইল যে প্রথমবৎসর বিভিন্ন প্রদেশে দর্শনের পরিভাষা সম্পর্কে কি কি কাজ হইয়াছে তাহার তথ্য-সংগ্রহ করিতে হইবে এবং দর্শন মহাসভার পরবর্ত্তী অধিবেশনের সময় ইহার পর কি কর্ত্তব্য স্থির করা হইবে।

গত ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সময় অস্থায়ী পরিভাষা সমিতিরও অধিবেশন হইল। উহাতে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত তথ্য আলোচিত হয়। দেখা যায় যে কোন

প্রদেশেই এখনও দর্শনের পরিভাষা সঙ্কলনের কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। তবে কোন কোন স্থানে প্রাদেশিক ভাষায় দর্শনের কিছু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে এবং পরিভাষার কাজ আংশিক ভাবে করা হইয়াছে। ইহাও দেখা গেল যে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে বিভিন্ন ভাষায় যে সব পরিভাষা প্রস্তুত হইতেছে তাহা প্রধানতঃ সংস্কৃত হইতেই গৃহীত বা উহার সাহায্যেই গঠিত। আলোচনার পর ভারতীয় দার্শনিক-পরিভাষা সমিতি স্থায়ী-ভাবে গঠিত হইল।

এই সমিতির দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে স্থির হইল প্রথমতঃ তত্ত্ব-বিজ্ঞান (Metaphysics), নীতি-বিজ্ঞান, ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও তর্কবিজ্ঞান প্রভৃতি দর্শনের শাখায় প্রচলিত ইংরেজী শব্দের তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ভিন্ন ভিন্ন শাখার জন্য তিন চারিজন সভ্য নিয়া এক একটি উপসমিতি গঠিত হইল। আগামী ডিসেম্বর মাসে লাহোরে দর্শন মহাসভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপর্য্যুক্ত সভ্যগণ সংগৃহীত তালিকা উপস্থিত করিবেন। ইহার পর সংগৃহীত ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ-গুলির প্রতিশব্দ পূর্ব্ব-প্রচলিত ভারতীয় দর্শনের সংস্কৃত বা পালি-প্রাকৃত গ্রন্থ হইতে কি কি পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান ও সঙ্কলন বিশেজ্ঞগণ করিবেন। তাহার পরে অবশিষ্ট শব্দের প্রতিশব্দ প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন সংস্কৃত-মূলক ভাষায় সংগৃহীত আধুনিক পরিভাষা হইতে গ্রহণ করা হইবে অথবা নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

এই পরিভাষা-সমিতির তিন প্রকার সদস্য থাকিবেন। যাঁহারা সমিতির কার্য্যে আর্থিক সাহায্য করিবেন তাঁহারা পৃষ্ঠপোষক সদস্য হইবেন। মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত অমলনের নগরের তত্ত্ব-জ্ঞান-মন্দির নামক দর্শন-প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা বদান্যবর শ্রীযুক্ত প্রতাপশেঠ মহোদয় ইতিমধ্যেই সমিতির প্রারম্ভিক কার্য্যের সাহায্যার্থ একশত টাকা দিয়াছেন। তাঁহাকে প্রথমই পৃষ্ঠ-পোষক শ্রেণীভুক্ত করা হইল। যাঁহারা সমিতির পরিভাষা সঙ্কলনের কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা হইবেন কর্ম্মী সদস্য। ইহাছাড়া যাঁরা কোনও কারণে নিয়মিত ভাবে সমিতির কার্য্য করিতে অক্ষম, অথচ যাঁরা দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ কৃতবিদ্য তাঁহাদিগকে উপদেষ্টা সদস্য করা হইবে। পরিভাষা সংগ্রহের কাজে জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য এবং সংগৃহীত পরিভাষার দোষ-গুণ বিচারের জন্য তাঁহাদের পরামর্শ লওয়া হইবে।

'দর্শন' এর পাঠকদের মধ্যে যাঁহারা ভারতীয় দার্শনিক-পরিভাষা সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যের প্রতি সহানুভূতিশীল তাঁহারা অর্থ ও উপদেশ দিয়া অথবা কোনও কাজের ভার লইয়া ইহাতে সাহায্য করিবেন এই উদ্দেশ্যেই উক্ত সমিতির সম্বন্ধে জ্ঞতব্য বিবরণ এখানে দেওয়া হইল। এই সম্পর্কে যে যতটুকু সহায়তা করিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। 'দর্শন' এ যে পরিভাষা সংগৃহীত হইবে তাহাও সেই

ভারতীয় দার্শনিক-পরিভাষা সমিতির কাজের সহায়ক হইবে। এই সম্বন্ধে 'দর্শন' এর সম্পাদকের সহিত পত্র ব্যবহার করিলেই চলিবে। পরিভাষা-সংগ্রহের বৃহৎ কার্য্যে সমর্থ সুধীবৃন্দের সমবেত চেষ্টা অত্যন্ত আবশ্যক। কেহ বেশী কাজ না করিতে পারিলেও অন্ততঃ কয়েকটি ভাল পারিভাষিক শব্দ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া বা নিজে নির্ম্মাণ করিয়া পাঠাইলেও অনেক উপকার হইবে। তিনি ধন্যবাদের পাত্র হইবেন।

আরিষ্টটল্ এবং মিলের তর্কবিজ্ঞানের পরিভাষা

[অধ্যাপক শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য তর্ক-বিজ্ঞানের পরিভাষার যে তালিকা দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ পাঠকবর্গের বিবেচনার্থ প্রকাশ করা হইল। তাঁহারা তাঁহাদের অভিমতসহ নূতন প্রতিশব্দ এবং তর্কবিজ্ঞানের অন্যান্য ইংরেজী শব্দ লিখিয়া পাঠাইলে বিশেষ বাধিত ও উপকৃত হইব। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তালিকার অবশিষ্টাংশ ক্রমশঃ উপস্থাপিত করা হইবে। পরে এগুলির চূড়ান্তভাবে গৃহীত ও অনুমোদিত তালিকা প্রকাশিত হইবে—সম্পাদক।]

১। Logic – তর্কশাস্ত্র বা তর্কবিজ্ঞান
২। Definition—লক্ষণ
৩। Province—নির্দ্দিষ্ট বিষয়বস্তু
৪। Thought—মনন
৫। Thing - বস্তু
৬। Science—বিজ্ঞান
৭। Art—প্রয়োগবিজ্ঞান
৮। Truth—প্রমা
৯। Formal—জ্ঞাতৃতন্ত্র বা ভাবতন্ত্র
১০। Material—জ্ঞেয়তন্ত্র বা বস্তুতন্ত্র
১১। Deduction—বিশেষানুমান
১২। Induction—সামান্যানুমান
১৩। Universal—সামান্য
১৪। Particular—বিশেষ
১৫। Deductive Logic—বিশেষানুমান-ন্যায়
১৬। Inductive Logic—সামান্যানুমানন্যায়
১৭। Consistency—সঙ্গতি
১৮। Fact—ঘটিত
১৯। Phenomenon—ঘটনা
২০। Process—ব্যাপার
২১। Term—পদ
২২। Word—শব্দ
২৩। Name—নাম
২৪। Proposition—বচন
২৫। Sentence—বাক্য
২৬। Judgment—সম্বন্ধ
২৭। Subject – উদ্দেশ্য
২৮। Predicate—বিধেয়
২৯। Copula—সংযোজক
৩০। Object—জ্ঞেয়
৩১। Positive—অস্তিত্ববাদী
৩২। Normative—আদর্শবাদী
৩৩। Affirmative—বিধ্যর্থক
৩৪। Negative—নিষেধার্থক
৩৫। Law—নিয়ম
৩৬। Method—প্রণালী
৩৭। Rule—অনুশাসন
৩৮। Principle—মূলসূত্র
৩৯। Postulates—প্রতিজ্ঞা বা সিদ্ধান্ত
৪০। Axioms—স্বতঃসিদ্ধান্ত
৪১। Nature—স্বরূপ
৪২। Law of Identity—স্বারূপ্য- বা তাদাত্ম্য-সাধকনিয়ম
৪৩। Law of Non-Contradiction—বিরোধ-বাধক নিয়ম
৪৪। Law of Excluded Middle—মধ্যকোটি নিরাসক নিয়ম
৪৫। Law of Sufficient Reason—আত্যন্তিক কারণসাধক নিয়ম
৪৬। Conceptualism—প্রকারাস্তিত্ববাদ
৪৭। Nominalism—নামাস্তিত্ববাদ
৪৮। Realism—বস্তু-অস্তিত্ববাদ
৪৯। Concept—প্রকার বা কল্পনা
৫০। Idea—ভাব
৫১। Connotation or Intention—সারার্থ বা সারধর্ম্ম
৫২। Denotation or Extension—বিস্তৃতি বা ক্ষেত্র
৫৩। Inverse Variation—প্রতি-লোমভেদ
৫৪। Psychological or Subjective Connotation—জ্ঞাতৃতন্ত্র ধর্ম্ম

৫৫। Metaphysical or Objective Connotation—জ্ঞেয়তত্ত্ব-সারধর্ম

৫৬। Logical or Conventional Connotation—ব্যবহারিক সারধর্ম

৫৭। Genus—জাতি

৫৮। Species—উপজাতি

৫৯। Summum Genus—পরাজাতি

৬০। Infima Species—ক্ষোদিষ্ঠ উপজাতি

৬১। Proximate Genus—নেদিষ্ঠ জাতি

৬২। Co-ordinate Species—সহোপজাতি

৬৩। Subordinate Species—অনুপজাতি

৬৪। Differentia—উপজাত্যবচ্ছেদক ধর্ম

৬৫। Proprium—উপলক্ষণধর্ম

৬৬। Accident—আগন্তুকধর্ম

৬৭। Generic Property—জাত্যুপলক্ষণধর্ম

৬৮। Specific Property—উপজাত্যুপলক্ষণধর্ম

৬৯। Separable Accident—বিযোজ্যাগন্তুকধর্ম

৭০। Inseparable Accident—অবিযোজ্যাগন্তুকধর্ম

৭১। Categorematic word—স্বয়ং-পদগ্রাহ্যশব্দ বা পদাধিকার শব্দ

৭২। Syncategorematic word—পরাধীন শব্দ

৭৩। Acategorematic word—অপদ শব্দ

৭৪। Simple term—একশাব্দিক পদ

৭৫। Composite term—বহুশাব্দিক পদ

৭৬। Singular term—বিশেষ পদ

৭৭। General term—সামান্য পদ

৭৮। Univocal term—একার্থক পদ

৭৯। Equivocal term—অনেকার্থকপদ

৮০। Concrete term—দ্রব্যবাচক পদ

৮১। Abstract term—গুণবাচক পদ

৮২। Collective term—সমষ্টিবাচক পদ

৮৩। Distributive term—ব্যষ্টিবাচক পদ

৮৪। Definite term—নির্দ্দিষ্ট পদ

৮৫। Indefinite term—অনির্দ্দিষ্ট পদ

৮৬। Relative term - সাপেক্ষ পদ

৮৭। Absolute term—নিরপেক্ষপদ

৮৮। Positive term—ভাববাচক পদ

৮৯। Negative term—অভাববাচক পদ

৯০। Privative term—সাময়িক গুণাভাববাচক পদ

৯১। Connotative term—সারধর্মবাচক পদ

৯২। Non-Connotative term—বিভক্তিমাত্রবাচক পদ

৯৩। Infinite term—অসীমপদ

৯৪। Contrary term—অসঙ্গত পদ

৯৫। Contradictory term—বিরুদ্ধপদ

৯৬। Ambiguous term—সন্দিগ্ধ পদ

৯৭। Too narrow definition—অব্যাপ্ত লক্ষণ

৯৮। Too wide definition অতিব্যাপ্ত লক্ষণ
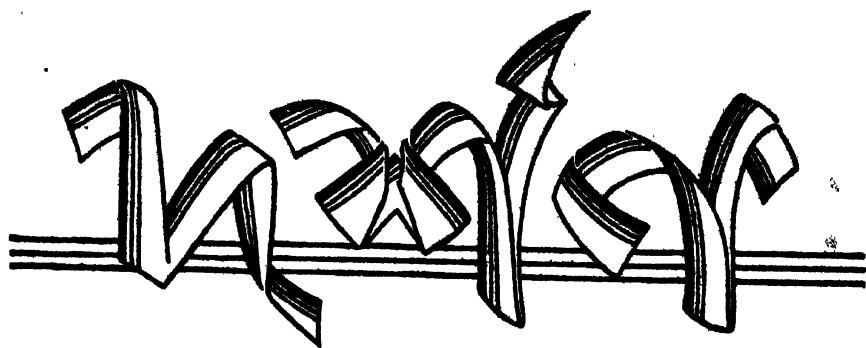
বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা]　　বৈশাখ　　[সন ১৩৪৯ সাল

সম্পাদক—

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ, পি-এচ্. ডি

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

•:•:•

সূচীপত্র

বৈশাখ সংখ্যা

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা] [বৈশাখ, ১৩৪৯ সাল

স্বয়ংসৎ বস্তু ও অবভাস

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীরাসবিহারী দাস, এম্. এ. পি-এচ. ডি.

যাঁহারা ইংরাজি ভাষায় কান্টীয় দর্শনের আলোচনা, অধ্যাপনা বা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা থিঙ্গ্ ইন্ ইটসেল্ফ্ কথাটার সঙ্গে খুবই পরিচিত। কিন্তু এই কথাটার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও, তাহা দ্বারা কি বুঝায়, বা কি বোঝা উচিত, সে বিষয়ে সকলের খুব স্পষ্ট, অন্ততঃ একই, ধারণা আছে বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ থিঙ্গ্ ইন্ ইট্‌সেল্‌ফ্ বলিতে কি বোঝা উচিত, এই বিষয়ে মতানৈক্য থাকাতেই কাণ্টের টীকাকারদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব টীকাকারদের মধ্যে যাঁহারা আমাদের জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, যাঁহাদিগকে এক কথায় বস্তুতন্ত্রবাদী (ইংরাজিতে রিয়্যালিষ্ট্) বলা যাইতে পারে, তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া, থিঙ্গ্ ইন্ ইট্‌সেল্ফ্ এবং তৎসংসৃষ্ট ফেনোমেনন্, য়্যাপিয়ারান্স্ বা অবভাস সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

থিঙ্গ্ ইন্ ইট্‌সেল্ফ্‌কে বাংলাতে স্বগতসত্তাক বস্তু বলিতে পারা যায়। স্বগতসত্তাক বস্তু বলিতে এই রকম পদার্থই বুঝায়, যার সত্তা তার নিজের মাঝেই আছে। আমাদের মনে হইতে পারে, সকল বস্তুর সত্তাই ত তাহাদের নিজেদের মধ্যে থাকে; এবং তাহা হইলে স্বগতসত্তাক বস্তু বলিয়া বিশেষ কি বলা হইল? এই কথার বিশেষ অর্থ বুঝিতে হইলে আমাদের প্রথমতঃ বোঝা উচিত যে, এ রকম বস্তুও থাকিতে পারে,

যার সত্তা তার নিজের মধ্যে নাই। অর্থাৎ যে রূপে সে বস্তু আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয়, সেরূপে তার নিজস্ব কোন সত্তা নাই, অন্যের সত্তায় সে সত্তাবান। সূর্য্য বাস্তবিক অস্ত যাওয়ার অব্যবহিত পরে পশ্চিমাকাশে যে সূর্য্যের প্রতিমা দৃষ্টিগোচর হয়, তার নিজস্ব কোন সত্তা নাই। অস্তগত সূর্য্য এবং বিশিষ্ট প্রকারের দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানব মনের উপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করে। যে কোন আপেক্ষিক বা সম্বন্ধমূলক গুণধর্ম্মযুক্ত বস্তুর অস্তিত্ব এই রকম পরগত দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নিসংযোগে রক্তীভূত লৌহপিণ্ডকে কি রকম উষ্ণ বলিয়াই না মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক লৌহ-পিণ্ড নিজের কাছে বা নিজের মধ্যে মোটেই উষ্ণ হইতে পারে না: আমাদের সংবেদনার কাছেই, আমাদের স্পার্শন প্রত্যয়ের কাছেই শুধু উষ্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে, উষ্ণরূপে লৌহপিণ্ড স্বগতসত্তাক নহে। অন্য কিছুর উপর কোনরূপে নির্ভর না করিয়া আপনার মধ্যে বস্তু যে রূপে থাকে, সেরূপেই তাহাকে স্বগতসত্তাক, অথবা অল্প কথায়, স্বয়ংসৎ বা স্বরূপসৎ বলিতে পারা যায়। বস্তুর যে রূপ অন্যের উপর নির্ভর করে, সেরূপে তাহা স্বয়ংসৎ, স্বরূপসৎ বা স্বগত-সত্তাক নহে।

আমরা সাধারণ জ্ঞানে যে সব বিষয় জানিয়া থাকি, তাহা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। সুতরাং যেরূপে বিষয় আমাদের দ্বারা জ্ঞাত হয়, সেরূপে তাহা স্বগতসত্তাক বা স্বয়ংসৎ নহে। কাণ্টের মতে স্বরূপ সৎ বস্তু বা বস্তুর স্বয়ংসৎ রূপ আমাদের মানবীয় জ্ঞানে কখনই প্রতিভাত হয় না। তবে কাণ্ট্ বস্তুর এ রকম অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় এক রূপ মানিলেন কেন?

যে রকম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া কাণ্ট্ জ্ঞানবিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, যে রকম বিচারধারার দ্বারা তাঁহার দার্শনিক মত প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহাতে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় স্বয়ংসৎবস্তু না মানিয়া কাণ্টের উপায়ান্তর ছিল না। কাণ্ট্ নিজে দৃষ্টিবাদী (এম্পিরিসিষ্ট্) ছিলেন না বটে; অর্থাৎ একথা সত্য যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শুধু দেখিলে শুনিলেই জ্ঞানলাভ হয় বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। তবে এ কথাও সত্য যে, দৃষ্টিবাদের দ্বারা তাঁহার জ্ঞানবিচার বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। শুধু দেখিলে শুনিলেই প্রকৃত জ্ঞানলাভ না হইলেও কাণ্টের মতে দেখা শোনা

ব্যতিরেকে কোন জ্ঞানই হইতে পারে না, ইন্দ্রিয়জন্য অনুভব না থাকিলে আমাদের কোন প্রত্যয়ই জ্ঞানপদবাচ্য হয় না। কাণ্টীয় জ্ঞানশাস্ত্রের এই মূলমন্ত্র কাণ্ট্ দৃষ্টিবাদীদের কাছ হইতে শিখিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর (ইউরোপীয়) দৃষ্টিবাদীদের মতে আমাদের জ্ঞানের যাবতীয় উপকরণ আমরা ইন্দ্রিয়ানুভবের দ্বারা বাহির হইতে পাইলেও বাহ্যবস্তুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় হয় না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর বাহ্যবস্তুর ক্রিয়ার ফলে আমাদের মনে যে ছাপ পড়ে, অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর ক্রিয়ার ফলে আমাদের মনে যে সব প্রতীতির (আইডিয়া) উদয় হয়, সেইরূপ বা সেই সব প্রতীতিই সাক্ষাৎভাবে আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে বলিতে হয়, বাহ্যবস্তু যে স্বরূপতঃ কি, তাহা বাস্তবিক আমরা জানি না। আমরা যাহা জানি, তাহা আমাদের মনের উপর বাহ্যবস্তুর ক্রিয়ার এক প্রকার পরিণাম মাত্র। কাণ্টের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় স্বয়ংসৎবস্তুর কল্পনার বীজ হয়ত এইখানেই ছিল।

আগেই বলা হইয়াছে, কাণ্ট্ দৃষ্টিবাদী ছিলেন না। তিনি মনে করিতেন না যে মন বা বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় থাকিলেও, শুধু ইন্দ্রিয়ানুভব দ্বারাই জ্ঞানলাভ হইতে পারে। তাঁহার মতে বাহ্য পদার্থোৎপাদিত মানস প্রতীতিমাত্রই জ্ঞানের বিষয় নয়। (এখানে 'বাহ্য' শব্দের দ্বারা 'আমাভিন্ন' বুঝিলেই চলিবে।) প্রতীতিনিচয়কে বিশিষ্ট প্রকারে সুসম্বদ্ধ করিয়াই আমাদের বুদ্ধি আমাদের জ্ঞানের বিষয় নির্ম্মাণ করে। কাণ্টের মতে আমাদের জ্ঞানশক্তি প্রধানতঃ দুই প্রকার, অথবা জ্ঞানশক্তির প্রধানতঃ দুই রূপ। একরূপে ইহাকে সংবেদনশক্তি (সেন্সিবিলিটি) এবং অন্যরূপে বুদ্ধিশক্তি (আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং) বলা যায়। সংবেদনরূপে ইহা পরতঃক্রিয় (রিসেপ্টিভ্) এবং বুদ্ধিরূপে স্বতঃক্রিয় (স্পণ্টেনিয়াস্)। সংবেদনরূপে ইহা অন্যের প্রভাবে, অর্থাৎ পরবশ হইয়া, ক্রিয়া করে; বুদ্ধিরূপে নিজেই আপনা হইতে ক্রিয়া করিয়া থাকে। সংবেদনাতে আমরা যাহা পাই, যাহা শুধু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করি, তাহা অন্যের কাছ থেকে পাওয়া; আর বুদ্ধির দ্বারা যে প্রকারে বুঝি, সে প্রকার বুদ্ধিরই নিজের। কাণ্টের মতে উভয় শক্তির ক্রিয়ার ফলেই জ্ঞানলাভ হয়। শুধু সংবেদনের দ্বারা কিংবা শুধু বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না।

জ্ঞান ব্যাপারে আমাদের কিছু পাইতে হয় (সংবেদনার দ্বারা) এবং কিছু দিতেও হয় (বুদ্ধির দ্বারা)।

সংবেদনার উপাদান বাহির হইতে পাইলেও তাহা গ্রহণ করিবার প্রকার আমাদের নিজস্ব। সংবেদনজন্য বোধকে যদি পারিভাষিক অর্থে অনুভব (ইনটুইশন্) বলি, তাহা হইলে দেশ ও কালকে কাণ্টের মতে, অনুভবের আকার (ফর্ম্স্ অব্ ইনটুইশন্) বলিয়া মানিতে হয়। ইহার অর্থ এই যে, আমাদের কিছু অনুভব করিতে হইলে শুধু দেশে ও কালেই অনুভব করিতে হয়। আমাদের অনুভবের দৈশিক ও কালিক আকার আমাদের জ্ঞানেরই আকার মাত্র, বস্তুনিষ্ঠ কোন ধর্ম্ম নহে; কাণ্ট্ দেখাইয়াছেন, দেশ ও কাল বাস্তব কোন পদার্থ নয়, আমাদের অনুভবেরই আকার মাত্র।

আমাদের সংবেদনজন্য প্রতীতিকে বিভিন্নভাবে সুসম্বদ্ধ করিয়া বিষয়রূপে পরিণত করাই আমাদের বুদ্ধির কাজ। এই বিষয়গত সুসম্বদ্ধতা বুদ্ধি কয়টী নির্দ্দিষ্ট প্রকারেই সম্পাদিত করিতে পারে। দ্রব্যগুণ-ভাব, কার্য্যকার ভাব প্রভৃতি যে ১২টি নির্দ্দিষ্ট প্রকারে সংশ্লেষিত বা সুসম্বদ্ধ হইয়া আমাদের সংবেদনজন্য প্রতীতিনিচয় বিষয়াকারে পরিণত হয়, তাহাদিগকে বৌদ্ধিক প্রকার (ক্যাটিগরিস্ অব্ দি আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং) বলা হয়। দেখা যাইতেছে, বিষয়রূপে আমাদের জ্ঞানে যে পদার্থ পাই, তাহা স্বরূপসৎ কোন বস্তুই নহে। তাহা মূলতঃ আমাদের মানস প্রতীতি মাত্র এবং অনেকাংশে আমাদের বুদ্ধি নির্ম্মিত। আমাদের জ্ঞানগম্য বিষয় প্রথমতঃ আমাদের বিশিষ্ট আকারের (দৈশিক ও কালিক) সংবেদনার উপর, এবং মুখ্যতঃ আমাদের বৌদ্ধিক প্রকারের উপর নির্ভর করে; সেই জন্য তাহাকে স্বয়ংসৎ বা স্বরূপসৎ বলা যায় না। কাণ্ট্ তাহাকে অবভাস বলিয়াছেন। আমরা যাহা কিছু জানি, তাহাতেই আনুভবিক আকার (দেশ ও কাল) ও বৌদ্ধিক প্রকার (দ্রব্যত্বাদি) প্রবিষ্ট হওয়াতে তাহাকে স্বয়ংসৎ বলিয়া মানিতে পারা যায় না, অবভাস বলিয়াই মানিতে হয়।

আমাদের জ্ঞানে বিষয়রূপে যাহা ভাসে, তাহাকেই অবভাস বলা হইতেছে। এই অবভাস যে স্বয়ংসৎবস্তু নয়, বা তাদৃশ বস্তু সদৃশও কিছু নয়, তাহা সহজেই বোঝা যায়। অবভাসের মূল উপকরণ ত আমাদের মানস প্রতীতি মাত্র। এই প্রতীতিগুলি অবশ্য আমাদের (জ্ঞানশক্তির)

উপর স্বয়ংসৎবস্তুর ক্রিয়ার ফলেই উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু স্বয়ংসৎবস্তুর ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হইলেই তাহারা যে তৎসদৃশ হইবে, এমন কথা বলা যায় না। অগ্নির সংস্পর্শে আমাদের দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া দুঃখ ও অগ্নি একই পদার্থ বা একই রকমের পদার্থ বলিতে পারা যায় না। তার উপর বর্ত্তমান ক্ষেত্রে স্বয়ংসৎবস্তুজন্য প্রতীতিও শুদ্ধরূপে আমরা জ্ঞানে পাই না। এই সব প্রতীতি আমাদের জ্ঞান-শক্তির নির্দ্দিষ্ট আকারে আকারিত হইয়া বিষয়রূপে আমাদের জ্ঞানে ভাসে। স্বয়ংসৎবস্তুর স্বরূপের সঙ্গে এই সব আকারের কোন সম্পর্কই নাই। এরকম স্থলে আমাদের বুদ্ধি নির্ম্মিত বিষয় ও স্বয়ংসৎবস্তুর মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে একথা কেমন করিয়া বলা যাইবে ?

আমরা বলিলাম, স্বয়ংসৎবস্তু আমাদের প্রতীতি উৎপাদন করিয়া থাকে ; তাহা আমাদের (জ্ঞানশক্তির) উপর স্বয়ংসৎবস্তুর ক্রিয়ার ফলেই সম্ভবপর হইয়া থাকে। স্বয়ংসৎবস্তু সম্পর্কে এ রকম ভাষা প্রয়োগ অনেকের মতে অসমীচীন। কেননা এ রকম ভাষায় কার্য্যকারণভাবের কথা, এক বস্তুর উপর অপর বস্তুর ক্রিয়ার কথা ব্যক্ত হইয়াছে, এবং এই রকম কথা আমরা জ্ঞানীয় বিষয় আবভাসিক বস্তু সম্বন্ধেই বুঝিয়া থাকি ও বুঝিতে পারি, স্বয়ংসৎবস্তু সম্বন্ধে এরকম কথার কি অর্থ হইতে পারে, তাহা আমাদের বোধগম্যই হয় না। কিন্তু এ রকম ভাষা আমাদের পক্ষে অনেকটা অপরিহার্য্য। আমাদের জ্ঞানের এক বিষয়ের উপর অন্য বিষয়ের যেরূপভাবে ক্রিয়া হইয়া থাকে, অথবা এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তর যে রকম ভাবে উৎপন্ন হয়, স্বয়ংসৎবস্তুর রাজ্যে সে রকম কিছু হয় না বা হইতে পারে না সত্য, কিন্তু তথাপি আমাদের জ্ঞান সম্পর্কে স্বয়ংসৎবস্তু কিছুই করে না, অথবা আমাদের উপর তাহার কোন ক্রিয়াই হয় না, এ কথাও ঠিক বলিতে পারা যায় না। স্বয়ংসৎবস্তু একেবারে নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় হইলে, স্বয়ংসৎবস্তু বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা বলিবারও অবসর হইত না। যাহা হউক, অবভাসের বা আমাদের বিষয় জ্ঞানের মূলে যে স্বয়ংসৎবস্তু রহিয়াছে, তাহা না মানিয়া পারা যায় না। এখন এই অবভাস বস্তুটী যে কি সে বিষয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর করিবার চেষ্টা করা যাক্।

অবভাস বলিতে জ্ঞানে যাহা ভাসে, যাহা প্রতীত হয়, তাহাই আপাততঃ বুঝিতে পারা যায়। প্রথমতঃ জ্ঞানের সঙ্গে বা কোন জ্ঞাতার সঙ্গে অবভাসের সম্বন্ধ আছে বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ বুঝিতে হইবে, কোন না কোন বস্তুর অবভাস জ্ঞানে প্রকাশ পায়। মূলে কিছুই নাই, অথচ অবভাস হইতেছে, এরকম কল্পনা আমরা করিতে পারি না। সুতরাং অবভাস বলিতেই বুঝিতে হইবে কোন কিছুর কারো কাছে অবভাস। এখানে জ্ঞাতার কথা ছাড়িয়া দিলেও, আরো দুইটী পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, মূলবস্তু এবং তার অবভাস। এখানে অবভাত বস্তু ও তার অবভাসের মধ্যে আমরা নানা প্রকার সম্বন্ধের কথা কল্পনা করিতে পারি। প্রথমতঃ অবভাস ও অবভাত বস্তুকে আমরা এক বলিয়াই অনেক স্থলে ধরিতে পারি। সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা কোন ভৌতিক পদার্থ (যথা ঘট পটাদি) এবং ঐন্দ্রিয়কজ্ঞানলব্ধ তাহার অবভাসের মধ্যে কোন ভেদের কল্পনা করি না। দ্বিতীয়তঃ বিচারের ফলে ভৌতিক পদার্থ ও তাহার অবভাসের মধ্যে ভেদ কল্পনা করিলেও, ভৌতিক পদার্থকে অবভাস হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন বলিয়া বোঝা যায় না; জ্ঞানের দিক্ দিয়া ভৌতিক পদার্থকে তৎসম্পর্কিত অবভাসরাশির সমষ্টি বলিয়াও বুঝিতে পারা যায়; অর্থাৎ অবভাসকে বস্তুর এক অংশ বা অবয়ব বলিয়াও ধারণা করিতে পারা যায়। তৃতীয়তঃ, যখন সরল যষ্টিখণ্ড জলে অর্দ্ধমগ্ন অবস্থায় আমাদের কাছে বক্র বলিয়া প্রতিভাত হয়, অথবা শ্বেত বস্তু পীত বলিয়া প্রতীত হয়, তখন বস্তু ও তাহার অবভাসকে আমরা ভিন্ন বলিয়াই বুঝিতে বাধ্য হই। সরলের মধ্যে বক্রের কিংবা শ্বেতের মধ্যে পীতের সমাবেশ কখনই করিতে পারা যায় না। কিন্তু এরকম স্থলেও অবভাসের মধ্যে মূল বস্তুর কোন জ্ঞানই হয় না, তাহা বলিতে পারা যায় না। সরল যষ্টিকে যখন বক্র বলিয়া দেখি, তখনও তাহা যে যষ্টি ও নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট, সে সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ থাকি না। শ্বেত শঙ্খকে পীত বলিয়া বুঝিলেও অবভাত বস্তুর শঙ্খত্বের কোন শঙ্কা থাকে না। মূল বস্তু যদি আংশিক ভাবেও অবভাসের মধ্যে প্রকাশিত না হইত, তাহা হইলে সেই অবভাস যে তাহার অবভাস এ কথা বলা যাইত না।

এখানে অবভাসের যে তিন প্রকার কল্পনার কথা বলা হইল, সেগুলি হইতে কাণ্টীয় দর্শনের অবভাসের কল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপরের দৃষ্টান্ত-

গুলিতে যে সব বস্তুকে মূলবস্তু বলিয়া ধরা হইয়াছে, কাণ্টের মতে সে সবই অবভাস বলিয়া গণ্য হইবে। আগেই বলা হইয়াছে, অবভাস বলিতে কোন বস্তুর জ্ঞানীয় রূপ বুঝায়। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানে কোন বস্তু যেরূপে প্রতিভাত হয়, সেই প্রাতীতিক রূপই ঐ বস্তুর অবভাস। অবভাসের এই কল্পনা কাণ্টীয় অবভাসেও প্রয়োজ্য। আমাদের জ্ঞানে বিষয়রূপে যাহা ভাসে, তাহাই অবভাস। কিন্তু কাহার অবভাস? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয়, স্বয়ংসৎবস্তুর অবভাস। কিন্তু কাণ্টীয় অবভাস যদি স্বয়ংসৎবস্তুর অবভাস হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ইহা প্রাতিভাসিক (ভ্রান্ত) অবভাসের চেয়েও নিকৃষ্টতর, কেননা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের বিষয় বাস্তব না হইলেও, তাহা হইতে মূলভূত বস্তুর কিছু না কিছু আভাস পাওয়া যায়। আমরা যখন শুক্তিতে রূপ্য দর্শন করি, তখন রূপ্য-অবভাস শুক্তি-বস্তু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বটে, কিন্তু শুক্তির চাক্‌চিক্যাদি গুণ দৃষ্ট রূপ্যেতেও ভাসিয়া থাকে। অন্ততঃ যে স্থানে বস্তু থাকে, সেই স্থানেই ভ্রমের বিষয় প্রত্যক্ষ হওয়াতে, সেই ভ্রান্ত অবভাসের দ্বারা মূলভূত বস্তুর দৈশিক অবস্থান অবশ্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কাণ্টীয় অবভাস হইতে মূলভূত স্বয়ংসৎবস্তু সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না, মূলভূত বস্তুর সঙ্গে অবভাসের সাদৃশ্য বা অন্য কোন জ্ঞেয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই, অন্ততঃ আছে বলিয়া আমরা জানিতে পারি না। তাহা হইলে অবভাসকে মিথ্যা বলিয়া ধরিয়া নিতে আপত্তি কি? মূলভূত বস্তু যখন স্বরূপতঃ জানা যাইতেছে না, তখন অবভাসকে এক অর্থে মিথ্যা হয়ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু কাণ্ট নিজে অবভাসকে মিথ্যা কিংবা ভ্রান্ত বলিতে সম্মত নন, এবং সে বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট যুক্তিও রহিয়াছে। যেখানে আমাদের ভ্রম হয়, সেখানেই বিচার করিলে দেখা যাইবে, সেই ভ্রমের মূলে আমাদের ব্যক্তিগত বা বৈয়ক্তিক অবস্থাগত কোন দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমাদের পিত্তের কোন বিশেষ বিকার হইলে শ্বেত বস্তুকে আমরা পীত বলিয়া দেখি। শুক্তিকে রূপ্যরূপে দেখিবার বেলায় আমাদের অর্থলোভ প্রভৃতি দোষও বর্ত্তমান থাকে। যে অবস্থায় আমরা মিথ্যাবস্তু দেখিয়া থাকি সে অবস্থাতে উপযুক্ত আলোকের অভাবাদি কারণও বিদ্যমান থাকে। এই সবই দ্রষ্টার নিজের বা বিশেষ অবস্থার দোষ। কিন্তু যে কারণে আমরা মূলভূত স্বয়ংসৎবস্তু না দেখিয়া শুধু

অবভাসই প্রত্যক্ষ করতে পারি, সে কারণ আমাদের ব্যক্তিগত কোন দোষ নয়। সব মানবের সাধারণ বুদ্ধিধর্ম্মই আমাদের অবভাস প্রত্যক্ষের কারণ। ব্যক্তিগত বা বৈয়ক্তিক অবস্থাগত দৈহিক বা ভৌতিক কারণে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সার্ব্বভৌম বৌদ্ধিক কারণে অবভাস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ; সেইজন্য অবভাস মিথ্যা বা ভ্রান্ত নয়। আরও এক কথা কোন ভ্রম প্রত্যক্ষকে ভ্রম বলিয়া আমরা তখনই বাস্তবিক বুঝিতে পারি, যখন মিথ্যাবস্তুর স্থানে সত্য কোন বস্তু দেখিতে পাই। সত্যবস্তু না দেখা পর্য্যন্ত মিথ্যাবস্তুই আমাদের কাছে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। সত্যবস্তু জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়াই অধম মিথ্যাবস্তুকে নিম্নশ্রেণীভূক্ত করিয়া দেয়। উত্তম সত্যবস্তুর দর্শনেই মিথ্যাবস্তুর অধমতা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং অবভাসকে যদি আমাদের মিথ্যা বা ভ্রান্ত বলিতে হয়, তাহা হইলে অবভাস হইতে কোন উচ্চতর বিষয় আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমরা যাহা কিছুই জানি না কেন, তাহাই অবভাস হইবে। মানুষ মানবীয় বুদ্ধির সীমা কখনই অতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং মানুষ যাহা কিছু জানে তৎসমস্তই তাহার বুদ্ধি সাপেক্ষ অবভাস রূপে জানে। অবভাস অপেক্ষা কোন উচ্চতর বিষয় কখনই আমাদের জ্ঞানগম্য না হওয়াতে অবভাসকে মিথ্যা বলিবার কোন কারণই কখনও উপস্থিত হয় না। অতএব অবভাস স্বয়ংসৎবস্তু না হইলেও, এবং সর্ব্বথা আমাদের বুদ্ধি সাপেক্ষ হইলেও, কখনই ভ্রান্ত বা মিথ্যা নয়।

অবভাস জ্ঞাতার স্বরূপ মাত্রই নয়, জ্ঞান মাত্রও নয় ; অথচ স্বয়ংসৎ-বস্তুও নয়। ভ্রান্ত বিষয় মূলভূত সত্য বস্তু হইতে যতটা ভিন্ন নয়, অবভাস স্বয়ংসৎবস্তু হইতে তদপেক্ষা বেশী ভিন্ন, একথা আগেই বলা হইয়াছে। ইহাকে এক ভিন্ন রকমের বস্তু বলিয়াই আমাদের মানিতে হয়। যদি মিথ্যা হইত, তাহা হইলে হয়ত বলিতে পারিতাম, অবভাস কোন বস্তুই নয়। আমি কি তবে বলিতে চাই, স্বয়ংসৎ এক রকমের বস্তু, আর অবভাস অন্য রকমের বস্তু ? আমার অভিপ্রায় যেন এই রকমই। আমি জানি, একথা বলাতে কাণ্টের কোন কোন প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারদের সঙ্গে মতদ্বৈধ হইতেছে। অধ্যাপক প্যাটন বলেন, ঠিক ঠিক বলিতে গেলে, দুই বস্তু নয়, একই বস্তু, দুই ভাবে দেখা যাইতেছে মাত্র, (১) নিজের

মাঝে যেমন আছে, (২) এবং যেমন আমাদের কাছে ভাসিতেছে। অর্থাৎ তাঁহার মতে একই বস্তু, একরূপে স্বয়ংসৎ এবং অন্যরূপে অবভাস।[১] অধ্যাপক প্যাটনের আগে প্রসিদ্ধ কান্টীয় পণ্ডিত আডিকেস্‌ও এই রকম কথা বলিয়াছেন। কেবল একটাই কিছু আছে, যাহা একদিকে যেমন আমাদের জ্ঞানানুরূপে আমাদের কাছে ভাসে, তেমনি অন্যদিকে নিজস্ব সত্তাবান্‌ও বটে।[২]

একথা অবশ্য আমি বুঝি, স্বয়ংসৎবস্তু ও অবভাস একই অর্থে দুই বস্তু নয়, অর্থাৎ যে অর্থে স্বয়ংসৎ পদার্থকে বস্তু বলা যায়, সেই অর্থে অবভাসকে বস্তু বলা যায় না। কিন্তু বস্তু (থিঙ্) কথা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বয়ংসৎ পদার্থ ত এক বস্তু বটেই, এবং অবভাসকেও যদি বস্তু বলা যায় এবং অবভাস যদি স্বয়ংসৎ বস্তু হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে এখানে দুই বস্তু পাইতেছি একথা বলিতে পারিব না কেন? আমি বলিতে চাই, অবভাসও এক রকম বস্তু বটে। ঘটপটাদিকে বস্তু বলিতে আমরা সাধারণতঃ কোন আপত্তি করি না, ঐ গুলিই ত অবভাস। এবং কাণ্টের মতে দ্রব্যত্ব সত্তা প্রভৃতি বৌদ্ধিক প্রকার অবভাসেই প্রয়োজ্য। এই সব প্রকার প্রয়োগ করিতে পারি বলিয়াই অবভাসকে বিষয়রূপে জানিতে পারি। দ্রব্যত্ব সত্তা প্রভৃতি ধর্ম্ম যদি অবভাসের থাকে, তাহা হইলে তাহা বস্তু-পদবাচ্য হইবে না কেন বুঝিতে পারা যায় না।

আমার পুরোবর্ত্তী টেবিল যে একটী বস্তু সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ করে না, এবং এই টেবিল স্বয়ংসৎ বস্তু নয়, ইহাও কাণ্টের মত; সুতরাং

১। Strictly speaking, there are not two things, but only one thing, considered in two different ways: the thing as it is in itself and as it appears to us. *Kant's Metaphysics of Experience.* Vol. I, p. 61.

২। es ist jedesmal nur ein Etwas, das einerseits uns erfahrungsmässig gegeben ist......andererseits aber auch ganz unabhängig davon ein Dasein an und für sich hat.

Kant und Das Ding an sich, p. 20.

স্বয়ংসৎ পদার্থ বস্তন্তর হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? যদি টেবিল ও তৎসম্পর্কিত স্বয়ংসৎ পদার্থ দুই বস্তু না হয়, তাহা হইলে তাহারা একই বস্তু ; এবং আমাদের বলিতে হয়, একই বস্তু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ; কেন না কাণ্টের মতে আমরা স্বয়ংসৎ বস্তুকে জানিতে পারি না এবং টেবিলকে নিশ্চয়ই জানি। একই বস্তুকে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বলাতে যে-বিরোধের সৃষ্টি হয়, তাহা আর পৃথক করিয়া দেখাইয়া দিতে হয় না। বস্তুর একত্ব রক্ষা করিয়া এই বিরোধ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে বলিতে হয়, বস্তু এক হইলেও তাহার দুইটী রূপ, এবং একরূপে তাহা জ্ঞাত এবং অন্যরূপে অজ্ঞাত। কিন্তু এই স্বয়ংসৎ বস্তুই যদি কোন একরূপে আমাদের দ্বারা জ্ঞাত হইল, তাহা হইলে ইহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, একথা কাণ্ট কি করিয়া বলিলেন ? এই কথা বলিলেই ত হইত যে, তাহা আমরা সম্পূর্ণ-রূপে জানি না। তাহাই কি কাণ্টের অভিপ্রায় ? দ্বিতীয়তঃ স্বয়ংসৎ ও অবভাসকে যদি দুই বস্তু বলা না যায়, তাহা হইলে তাহা একই বস্তুর দুই রূপ, ইহাই বা কি করিয়া বলা যায় ? নিশ্চয়ই যেই অর্থে স্বয়ংসত্তা বস্তুর রূপ, সেই অর্থে অবভাসত্ব তাহার রূপ নয়। তার উপর জ্ঞাত ও অজ্ঞাতকে সমপর্য্যায়ে ফেলিয়া উভয়কেই সমানভাবে এক বস্তুর রূপ বলিয়া ভাবা নিশ্চয়ই খুব সহজ নয়। তার চেয়ে স্বয়ংসৎ পদার্থও অবভাসকে দুই পৃথক্ বস্তু বলিয়া ভাবাই ত সহজ।

স্বয়ংসৎ ও অবভাসের মধ্যে যদি ঐক্য রাখিতে হয়, তাহা হইলে ত বলিতে হয়, যত স্বয়ংসৎ, তত অবভাস। যদি কোন অবভাস থাকে এবং তদভিন্ন স্বয়ংসৎ না থাকে, তাহা হইলে ত অবভাস স্বয়ংসৎ হইতে পৃথক বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। তবে কি বলিব, প্রত্যেক অবভাসেরই তদভিন্ন একটী স্বয়ংসৎ আছে ? একটী ঘটের অনুরূপ কয়টী স্বয়ংসৎ আছে ? এক না বহু ? ঘটের বিভিন্ন অবয়ব ও ত এক একটী অবভাস। এই বহু অবয়বের জন্য কি বহু স্বয়ংসৎ মানিব ? ঘটের মধ্যে যতগুলি অণু আছে, ঘটানুরূপ স্বয়ংসৎও কি ততগুলি ? অন্ততঃ অবভাস যে বহু তাহা আমাদের মানিতে হয়. এবং স্বয়ংসৎ যদি অবভাসের সঙ্গে তাদাত্ম্যা-পন্ন হয়, তাহা হইলে স্বয়ংসৎকেও বহু বলিয়া আমাদের ধরিতে হয়। সেই রকম অবস্থায়, কাণ্ট যে এক যায়গায় বলিলেন, এই অবভাসিক দৃশ্য প্রপঞ্চের মূলে, আত্মা ও অনাত্মারূপে দুই বস্তু না থাকিয়া, মূলতঃ

একই বস্তু থাকিতে পারে, সে কথার কি অর্থ হইবে? আমি একথা বলিতেছিনা যে, কাণ্ট্ নিশ্চিতভাবে মনে করিবেন, সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চের মূলে এক অদ্বিতীয় স্বয়ংসৎ বস্তু রহিয়াছে। তবে তিনি নিশ্চয়ই মনে করিতেন, এই রকম হইতে পারে। অর্থাৎ একই স্বয়ংসৎ বস্তু সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চের মূলে থাকিলেও তাঁহার অন্য কোন দার্শনিক সিদ্ধান্তের অনুপপত্তি হইবে না। সুতরাং আমি বলিতে চাই, কাণ্টীয় দর্শন সম্মত পদার্থের এরকম ব্যাখ্যা করিতে হইবে না, যাহাতে কাণ্ট এখানে যে সম্ভাবনার কথা বলিতেছেন, তাহা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমরা অসংখ্য অবভাস অনুভব করিতেছি। তাহাদের এক একটি (প্রত্যেকটাই) যদি (কোন) এক একটি স্বয়ংসৎবস্তুর দৃশ্যরূপ হয়, তাহা হইলে ত অসংখ্য স্বয়ংসৎ বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়। তাহাই কাণ্টের মত হইলে সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চের মূলে একই স্বয়ংসৎ বস্তু থাকিতে পারে, একথা তিনি বলিতে পারিতেন না। সুতরাং আমাদের স্বীকার করিতে হয়, আবভাসিক জগতের মূলে এক স্বয়ংসৎবস্তু আছে, না বহু স্বয়ংসৎ বস্তু আছে সে সম্বন্ধে আমরা বাস্তবিক কিছুই বলিতে পারি না। স্বয়ংসৎ বস্তুর সঙ্গে দৃশ্যমান অবভাসের যে সাদৃশ্যাদি কোন সম্বন্ধের কল্পনা করা যায় না, তাহা আগেই বলা হইয়াছে। এখন বলিতে চাই, অবভাসকে স্বয়ংসৎ-বস্তুর একরূপ বলা ত দূরের কথা, স্বয়ংসৎ ও অবভাসের মধ্যে কোন সাক্ষাৎ তাত্ত্বিক সম্বন্ধই নাই। দৃশ্য সর্পের যেরকম তাহার মূলভূত রজ্জুর সঙ্গে বাস্তব কোন কোন সম্বন্ধ নাই, বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। একথা সত্য যে, মূলে স্বয়ংসৎবস্তুর কোন প্রকার উত্তেজনা না থাকিলে আমাদের জ্ঞানশক্তির কোন ক্রিয়াই হইত না এবং অবভাস রূপ বিষয় ও নির্ম্মিত হইত না। কিন্তু এই বুদ্ধিনির্ম্মিত বিষয়ই যে আমাদের জ্ঞানশক্তির উত্তেজক (স্বয়ংসৎ) পদার্থের একরূপ, তাহা বলিতে যাওয়া সাহস মাত্র বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধিনির্ম্মিত বিষয় হইতে, জ্ঞানশক্তির উত্তেজক স্বয়ংসৎ পদার্থ কিরূপ, এমন কি, এক না বহু, সে বিষয়ে আমরা কিছুই অনুমান করিতে পারি না। সুতরাং এই আবভাসিক বিষয়কে স্বয়ংসৎ বস্তু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া কল্পনা করাই সমীচীন মনে হয়।

এখনই বলিলাম, স্বয়ংসৎবস্তুর সঙ্গে অবভাসের কোন বাস্তব, অন্ততঃ সাক্ষাৎ, সম্বন্ধ নাই। কিন্তু অবভাসের কল্পনার সঙ্গে স্বয়ংসতের কল্পনা

ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত বলিয়া মনে হয়। অবভাসের কল্পনা ব্যতিরেকে স্বয়ংসতের কল্পনা করা কঠিন। অবভাস বলিতে কি বুঝায়, যদি স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে স্বয়ংসৎবস্তু বলিতে কি বোঝা উচিত তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। আমাদের জ্ঞানব্যাপারে কল্পনা শক্তি যে অনেক কিছু কাজ করে, সে কথা কাণ্ট খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়া ছিলেন। আমাদের মন বা বুদ্ধি যে নিজ থেকে অনেক কিছু দিয়া জ্ঞানের বিষয় নির্ম্মিত করে, সে বিষয়ে কাণ্টের কোন সন্দেহ ছিলনা। তাই যদি হয়, তবে ত আমাদের বলিতে হয়, জ্ঞানের বিষয় আমাদের মনগড়া রূপেই আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। জ্ঞানের আদিম উপাদান প্রথমতঃ মানবীয় অনুভবের বিশিষ্ট আকারে (দেশ ও কালে) গৃহীত হইয়া, বৌদ্ধিক প্রকার পরিচ্ছেদ ধারণ করিয়া আমাদের জ্ঞানে বিষয়রূপে ভাসে। প্রকারপরিচ্ছেদরহিত বিষয়ের নগ্নরূপ কখনই আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। সুতরাং বুঝিতে পারা যায়, আমাদের জ্ঞানীয় বিষয় কোন বস্তুর ঠিক ঠিক প্রতিকৃতি নয়। জলে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইলে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়; কিন্তু তরঙ্গ কখনই প্রস্তরের স্বরূপ প্রকাশ করে না। সেই রকম, যে বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আমাদের জ্ঞানশক্তি বিষয় নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়, বুদ্ধিনির্ম্মিত বিষয় কখনই সেই বস্তুর প্রতিকৃতি হইতে পারে না। সুতরাং কাণ্ট্ বিবৃত জ্ঞান প্রক্রিয়া মানিতে হইলে জ্ঞানীয় বিষয়কে অবভাসমাত্রই বলিতে হয়। আর শুধু অবভাসই যদি জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে অবভাসের মূলে যে স্বয়ংসৎ স্বতন্ত্র বস্তুর কল্পনা করিতে আমরা বাধ্য হই, সে বস্তু সর্ব্বদা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ই থাকিবে। স্বয়ংসৎবস্তু যখন অবভাস নয়, অর্থাৎ অবভাস হইতে ভিন্ন বলিয়াই যখন স্বয়ংসতের কল্পনা করিয়া থাকি, তখন তাহাকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিয়াই ভাবিতে হয়। কাণ্ট্ যখন বলিলেন, স্বয়ংসৎবস্তু অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, তখন তিনি আমাদিগকে নূতন কোন তথ্য জ্ঞাপন করিলেন না; স্বয়ংসৎ কথাটারই অর্থ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন মাত্র।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমরা যদি শুধু অবভাসই জানি, তাহা হইলে শুধু অবভাস নিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকি না কেন? তদতিরিক্ত স্বতন্ত্র স্বয়ংসৎবস্তু মানিবার প্রয়োজন কি?

আমাদের জ্ঞাত ও জ্ঞেয় বিষয় মাত্রই অবভাস, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; এবং এই বিষয় যে অনেকাংশে বুদ্ধি নির্ম্মিত তাহাও না মানিয়া পারা যায় না। কিন্তু আমাদের জ্ঞানশক্তি একেবারে নিজের থেকেই বিষয়ের সৃষ্টি করিতে পারে না, বিষয়ের আকার জ্ঞানশক্তি নিজে দিলেও বিষয়ের উপাদান অন্যত্র হইতে আহরণ করিতে হয়। জ্ঞানশক্তি কিয়ৎ-পরিমাণে স্বতঃক্রিয় হইলে ও কিয়ৎপরিমাণে তাহা পরতঃক্রিয়। আমাদের বুদ্ধি নিজ থেকে বিষয়সৃষ্টি করিতে পারে না, তজ্জন্য জ্ঞানশক্তির উত্তেজক স্বয়ংসৎবস্তুর সাহায্য দরকার, একথা স্বীকার করিয়া কাণ্ট্ জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। 'আমি জানিতেছি' বা আমার জ্ঞান হইতেছে' আমাদের এই রকম বোধ হইতে হইলে জ্ঞান-শক্তিকে পরবশ হইয়া প্রবর্ত্তিত হইতে হয়। যাহা হইতে আমাদের জ্ঞানশক্তি জ্ঞানব্যাপারে এই প্রবর্ত্তনা বা উত্তেজনা পাইয়া থাকে, তাহাকেই স্বয়ংসৎবস্তু বলা হইয়াছে।

তার উপর আমাদের আরও ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, শুধু সাপেক্ষ বা পরতন্ত্রবস্তু নিয়া আমাদের কাজ চলে না। অবভাস যে নিতান্ত আমাদের বুদ্ধি সাপেক্ষ, তাহা অনেকবার বলা হইয়াছে। শুধু অবভাসই আছে, স্বয়ংসৎ কিছু নাই, এই কথা বলিলে বলিতে হয় সব কিছুই পরতন্ত্র, স্বতন্ত্র কিছু নাই। কিন্তু একথা আমরা ভাবিতেই পারি না। সাপেক্ষের মূলে নিরপেক্ষ, পরতন্ত্রের মূলে স্বতন্ত্র আছে বলিয়া আমরা ভাবিতে বাধ্য। সেইজন্য অবভাসের মূলে স্বয়ংসৎবস্তু আছে, একথা আমরা না ভাবিয়া পারি না। তবে স্বয়ংসৎবস্তু সম্বন্ধে অন্য কোন ভাবাত্মক বোধ আমাদের নাই। আমরা জানি, আমাদের জ্ঞান ব্যাপারের মূলে স্বতন্ত্র স্বয়ংসৎবস্তু কিছু আছে, এবং তাহা অবভাস নয়; কিন্তু তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই। যে অর্থে অবভাসকে জানি, সেই অর্থে স্বয়ংসৎবস্তুকে মোটেই জানি না। কিন্তু না জানিলেও, স্বয়ংসৎবস্তু যে কিছু আছে, তাহা আমরা ভাবিতে বাধ্য। কাণ্ট্ যে তাঁহার পরবর্ত্তী ভাবপ্রবণ দার্শনিকদের মত স্বয়ংসৎবস্তুকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া শুধু অবভাস নিয়া সন্তুষ্ট থাকেন নাই, তাহাতে তাঁহার দার্শনিক মহত্বই প্রকাশ পাইয়াছে।

অভাব প্রত্যক্ষে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ

অধ্যাপক শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য, এম. এ, বেদান্ততীর্থ।

আজ একটী অপ্রচলিত বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। আশাকরি, পাঠকবর্গ এই প্রবন্ধের শিরোনাম দেখিয়াই ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না। অভাব বিষয়ক বিচারই আমরা সচরাচর পড়ি না। এই প্রবন্ধে এই অভাববিষয়ক বিচারের অতি অপ্রচলিত একাংশের আলোচনা করা হইবে। আমরা যখন যে কোন পদার্থ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করি তখন সেই পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইয়া থাকে। এই সন্নিকর্ষ ইন্দ্রিয়-বিষয়-সম্বন্ধের নামান্তর। এই সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার। এই ছয় প্রকার সন্নিকর্ষের নাম লৌকিক সন্নিকর্ষ। এই ছয় প্রকার বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে। এইরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে সাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের আপত্তি হইতে পারে না। ন্যায় বৈশেষিক দর্শন মতে অভাব অতিরিক্ত পদার্থ। যেমন দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি স্বতন্ত্র পদার্থ সেইরূপ অভাবও স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহা কাল্পনিক পদার্থ নয়। ইহা অধিকরণ হইতে অভিন্ন নয়। 'ভূতলে ঘট নাই' এই বাক্যের অর্থ ভূতলে ঘটাভাব আছে। 'ভূতল একাকী আছে' এইরূপ অর্থ নয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ভূতলের দুইটী রূপ আছে। একটী ইহার সদ্রূপ ও অপরটী ইহার অসদ্রূপ। ইহার অসদ্রূপ ই অভাব পদার্থ। নৈয়ায়িকেরা বলেন যে অভাব অতিরিক্ত পদার্থ। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তানুসারে আমরা যদি নৈয়ায়িক মত বুঝিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে দেখিব যে ভূতল একটী ভাবপদার্থ ও ঘটাভাব অভাব পদার্থ। এই ভূতল ঐ অভাবের অধিকরণ। ঘটাভাব ভূতলে আশ্রিত হইয়া থাকে। 'ঘটাভাব বিশিষ্ট ভূতল' এই স্থলে ঘটাভাব বিশেষণ ও ভূতল বিশেষ্য। ভূতল ও ঘটাভাবের সম্বন্ধ বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধ। আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত ভূতলের সংযোগ সম্বন্ধ হয়। এই ঘটাভাব বিশেষণরূপে ভূতলে থাকে। সুতরাং এই অভাবের সহিত চক্ষুর সংযুক্তবিশেষণতা সম্বন্ধ হয়। নানারূপ বিশেষণতার সাহায্যে

আমাদের অভাবের সাধারণ প্রত্যক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে। কোন প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় নৈয়ায়িকদের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে সাধারণ প্রত্যক্ষের দ্বারা আমরা অভাবকে জানিতে পারি না। তাঁহাদের মতের বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধে করা হইবে।

অভাবের প্রত্যক্ষ বিষয়ক আলোচনা করিতে হইলে অভাব সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আমরা যখনই অভাবের কথা বলি অথবা আমরা যখন অভাব প্রত্যক্ষ করি তখন আমরা এই অভাবকে কোন পদার্থের অভাব বলিয়া বলি অথবা জানি। শুধু অভাবের কোন কালেই আমাদের জ্ঞান হয় না। আমাদের ঘটাভাব পটাভাব প্রভৃতির জ্ঞান হয় কিন্তু অবিশেষিত অভাবের কোন দিনই জ্ঞান হয় না। আমরা কোন দিনই বলি না যে আমরা অভাব দেখিতেছি অথবা ওখানে অভাব আছে। অভাব সব সময়েই বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত হইয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। এখন দেখা যাক্ এই অভাবের বিশেষণ কোন্ পদার্থ হইয়া থাকে। 'অভাব বলিলে' এই অভাবটী কাহার অভাব তাহা বলিতেই হইবে, তাহা না বলা পর্য্যন্ত অভাবের পরিচয়, অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যাহার অভাব তাহাকে অভাবের প্রতিযোগী বলা হয়। 'ঘটের অভাব' এই স্থলে ঘট এই অভাবের প্রতিযোগী : এই প্রতিযোগী অভাবের বিশেষণ। এই প্রতিযোগীর সাহায্যে একটী অভাবকে অন্য অভাব হইতে পৃথক করিয়া আমরা বুঝিতে পারি। এই প্রতিযোগীই অভাবের সব সময়ে (নিয়ত) বিশেষণ হয় এবং অভাব ব্যক্তি সমূহের পার্থক্য জানাইয়া দেয়। প্রতিযোগিতে ধর্ম্মের নাম প্রতিযোগিতা। ঘটাভাবের অভাব ঘট। ঘটাভাবের অভাবত্ব প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার উল্লেখ করিয়া অভাবের পরিচয় দেওয়া হয় বলিয়াই এখানে প্রতিযোগিতার কথা বলিলাম। ঘট যেখানে থাকে ঘটাভাব সেখানে থাকেনা। ঘট ও ঘটাভাব পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। এখন সকলের মনেই এ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ঘট যদি তাহার অভাবের বিরোধি পদার্থ হয় তাহা হইলে ঘট কিরূপে ঘটাভাবের বিশেষণ হয়, কারণ, বিশেষণ বিশেষ্যের সহিত সম্বদ্ধ হয় ইহাই হইল সর্ব্ববাদিসম্মত নিয়ম। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ঘট ও ঘটাভাবের বিরোধ কিরূপ স্থলে হয় তাহা বুঝিতে হইবে। তাহার পরে দেখিতে হইবে তাহাদের বিশেষ্য বিশেষণ সম্বদ্ধ হয় কি না।

ঘটাভাবের সহিত ঘটের বিরোধ বলিলে আমাদের বক্তব্য বিষয়টী অতি স্থূল ভাবে বলা হইল। ঘট ও তাহার অভাবের বিরোধ হয় কোন সম্বন্ধ বিশেষকে আশ্রয় করিয়া। ঘট ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে থাকে এবং তাহার অবয়ব কপাল ও কপালিকাতে এই ঘটই সমবায় সম্বন্ধে থাকে। ঘট সংযোগ সম্বন্ধে কপালে থাকে না। সংযোগ সম্বন্ধে ঘটের অভাব কপালে আছে। নৈয়ায়িক পরিভাষানুসারে বলা হয় সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক—কপালবৃত্তি—ঘটাভাব। এর সরল অর্থ কপালে একটী অভাব ব্যক্তি আছে। এই অভাবের প্রতিযোগী ঘট। এবং এই প্রতিযোগীর সম্বন্ধ সংযোগ। এই সংযোগ সম্বন্ধ এই প্রতিযোগীর বিশেষণ এবং এই সম্বন্ধ এই প্রতিযোগীকে অন্য প্রতিযোগী হইতে পৃথক করিয়া দেয়। সমবায় সম্বন্ধে ঘট কপালে থাকিলেও সেই ঘটাভাব এই কপালে থাকিতে পারে যে ঘটাভাবের প্রতিযোগী সংযোগসম্বন্ধ দ্বারা বিশেষিত। সুতরাং ঘটের সহিত ঘটাভাবমাত্রের বিরোধ নাই। নৈয়ায়িকদের মতে অভাব তাহার প্রতিযোগীতে প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে থাকে এবং প্রতিযোগী তাহার অভাবে প্রতিযোগিতাকত্ব সম্বন্ধে থাকে। অতএব প্রতিযোগী তাহার অভাবের বিশেষণ হইতে পারে।

এখন আমরা প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করি। অভাবের প্রত্যক্ষ কেমন করিয়া হইয়া থাকে তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধে করিব না। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় অভাবের প্রত্যক্ষ সাধারণ সন্নিকর্ষের দ্বারা হয় না, অসাধারণ সন্নিকর্ষের আবশ্যকতা আছে, যদি থাকে তাহা হইলে সেই অসাধারণ সন্নিকর্ষটী কি? কোন একটী ব্যক্তির অভাবকে আমরা বিশেষাভাব বলি। এক জাতীয় সকল ব্যক্তির অভাবকে আমরা সামান্যাভাব বলি। ক এর বাটীতে খ এর বাটীতে যে ঘট আছে সেই ঘট নাই। ক এর বাটীতে অন্য ঘট থাকিলেও খ এর বাটীর ঘট নাই। ক এর বাটীতে উক্ত ঐ ঘটের অভাব আছে। ইহা ঘটের বিশেষাভাব, অর্থাৎ বিশিষ্ট ঘটের অভাব। গ এর বাটীতে যদি কোন ঘটই না থাকে তাহা হইলে এই ঘটাভাব ঘটসামান্যের অভাব। ইহার নাম ঘটসামান্যাভাব। নৈয়ায়িক মতে ঘটের সামান্যাভাব প্রত্যেক ঘট ব্যক্তির যত অভাব আছে তাহার সমষ্টি নয়, ইহা একটী অতিরিক্ত অভাব। ঘটের সামান্যাভাবকে কেন অতিরিক্ত বলা হয় তাহা এ প্রবন্ধে আলোচিত

হইবে না। এখন আমরা ধরিয়া লইব যে ঘটের সামান্যাভাব একটী অতিরিক্ত অভাব। এই ঘটসামান্যাভাবের প্রতিযোগী কে? এবং প্রতিযোগীর অন্য কোন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, শুধু এই কথা বলিলেই চলিবে যে ইহার প্রতিযোগিমাত্রই ঘটত্বের দ্বারা বিশেষিত। সকল ঘট ব্যক্তির সামান্য ধর্ম্ম ঘটত্ব। এই ঘটত্বের দ্বারা বিশেষিত ব্যক্তি মাত্রই এই ঘটাভাবের প্রতিযোগী। প্রতিযোগীকে না জানিলে অভাব জানা হয় না। ঘটত্বের দ্বারা বিশেষিত ব্যক্তি অসংখ্য। তাহাদের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া জানা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আমরা যখন 'এই ঘট' এইরূপে একটী ঘটকে জানি তখন ঘট ব্যক্তি এবং ঘটত্ব জাতি জানি। এই ঘটত্ব জাতি পরম্পরা সম্বন্ধে আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়। এই ঘটত্ব জাতির সহিত সকল ঘটব্যক্তির সম্বন্ধ আছে। কারণ ঘট ব্যক্তিকে ঘট রূপে বুঝিতে হইলেই তাহার সহিত ঘটত্ব জাতির সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে। এই ঘটত্বের সাহায্যে আমরা সকল ঘট ব্যক্তিকে জানিয়া থাকি। এস্থলে ঘটত্বই সন্নিকর্ষের কাজ করিয়া থাকে। এই সন্নিকর্ষের নাম সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ। ইহারই সাহায্যে আমাদের সকল ঘটব্যক্তির জ্ঞান হইয়া থাকে। এইভাবে সকল ঘটব্যক্তি জ্ঞাত হইলে আমাদের ঘটাভাব জ্ঞান সম্ভবপর হয়। অতএব ঘটাভাব প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষের আবশ্যকতা আছে। ইহাই প্রাচীন নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্ত।

এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে একদল নব্যনৈয়ায়িক বলিয়া থাকেন যে সকল প্রতিযোগীর জ্ঞান না হইলে যে সামান্যভাবের জ্ঞান হয় না একথা বলা চলে না। প্রতিযোগীর যে ধর্ম্ম সকল প্রতিযোগিতেই থাকে এবং এবং প্রতিযোগি ভিন্ন অপর কোথাও থাকেনা তাহাকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বলে। যেমন ঘট-সামান্যাভাবের প্রতিযোগী সকল ঘটব্যক্তি। সমস্ত ঘটব্যক্তিতেই ঘটত্ব থাকে। এই ঘটত্ব ঘট ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিতে থাকে না। এই ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব। এই ঘটত্বের দ্বারা বিশেষিত যে কোন ঘটজ্ঞান ঘটাভাব প্রত্যক্ষের কারণ। অতএব ঘটের সামান্যাভাব প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সকল ঘট ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত উপায়ে প্রত্যক্ষের প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সকল ঘটব্যক্তির সামান্যাকারে প্রত্যক্ষের নাম ঘটের অলৌকিক প্রত্যক্ষ। অতএব ঘটের

সামান্যাভাব প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকারের কোন আবশ্যকতা নাই।

রঘুনাথ শিরোমণি বলেন যে অভাব প্রত্যক্ষের হেতুরূপে প্রতিযোগি-জ্ঞানের কোনই আবশ্যকতা নাই। অভাবজ্ঞানটীর আকার কিরূপ তাহা দেখা যাক্। অভাবজ্ঞানে অভাব বিশেষ্য হয়। এই অভাবের প্রতিযোগী এই অভাবের বিশেষণ হয়। এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এই প্রতিযোগীর বিশেষণ হয়। এই অভাবজ্ঞানে বিশেষ্যের বিশেষণ আছে এবং এই বিশেষণেরও বিশেষণ আছে। এখন একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই বিষয়টী আরও স্পষ্ট করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্। ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ ইহা একটী জ্ঞান। এই জ্ঞানে অভাব বিশেষ্য। ঘট এই অভাবের প্রতিযোগী। ইহা এই অভাবের বিশেষণ। এবং ঘটত্ব এই প্রতিযোগীর বিশেষণ। এইস্থলে ঘটত্বই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক। যে জ্ঞানের বিশেষ্য বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত হয় এবং এই বিশেষণের বিশেষণ থাকে তাহাকে বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহি বোধ বলে। বিশেষণের বিশেষণকে বিশেষণতা-বচ্ছেদক বলে। যে জ্ঞানের যেটী বিশেষণ হয় তাহাকে সেই জ্ঞানের প্রকার বলে। যে জ্ঞানের ঘট বিশেষণ হয় তাহাকে ঘটত্বপ্রকারক জ্ঞান বলে। যে জ্ঞানে বিশেষণতাবচ্ছেদক বিশেষণ হয় তাহাকে বিশেষণতা-বচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞান বলে। বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহি বুদ্ধির প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞান কারণ। ঘটাভাব জ্ঞান বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞান। এই জ্ঞানের প্রতি ঘটত্বপ্রকারক জ্ঞান কারণ। এই ঘটত্ব জ্ঞানই বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞান। এই স্থলে ঘটত্ব বিশেষণ ঘটের বিশেষণ। এই ঘটপ্রকারকজ্ঞানই ঘটাভাব জ্ঞানের প্রতি হেতু। ঘটাভাব প্রত্যক্ষের কারণ ঘটজ্ঞান নয় কিন্তু ঘটত্বপ্রকারক জ্ঞান। অতএব সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। এখন আপত্তি উঠিতে পারে অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি প্রতিযোগিজ্ঞান যদি কারণ না হয় তাহা হইলে প্রতিযোগিশূন্য অভাবের প্রত্যক্ষ হয় না কেন? অর্থাৎ আমরা ঘট নাই একথা বলি কেন, আমাদের বলা উচিত শুধুই 'নাই'। এর উত্তরে রঘুনাথ শিরোমণি বলিতে পারেন যে অভাবের প্রতিযোগিদ্বারা অবিশেষিত হইয়া যে প্রত্যক্ষ হয় না তাহার অন্য কারণ আছে। অভাবপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষবিশেষ যে কারণ তাহা সকলকেই

স্বীকার করিতে হইবে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞানেও ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ বিশেষের সাহায্যে এই অভাবের প্রত্যক্ষ উৎপাদিত হইয়া থাকে, এই জন্যই কেবলমাত্র অভাবের জ্ঞান হয় না।

এই মতের সমালোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বকথিত নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের শিষ্যেরা অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন। সেই দোষগুলির এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব না, কারণ, এই দোষগুলি উভয়পক্ষের সাধারণ দোষ এবং এই দোষগুলির উদ্ধারের পথও একই ধরণের। কিন্তু তাঁহারা একটা বিশেষ দোষ দেখাইয়াছেন। সেই দোষটীর আলোচনা এই প্রবন্ধে করিব। রঘুনাথ শিরোমণির মত আমরা গ্রহণ করিতে পারি না, কারণ এই মত গ্রহণ করিলে আমাদের বড় দীর্ঘাকারের কার্য্য ও কারণ মানিতে হয়। তাঁহার অভাব জ্ঞান বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহিবোধ। অর্থাৎ এই জ্ঞানটী এমন একটী কার্য্য যাহার বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতি অনেকগুলি অংশ আছে। এই জ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে আত্মাতে থাকে। এই জ্ঞানের কারণ বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞান। এই জ্ঞানের আকারও বেশ বড়। এই জ্ঞানও সমবায় সম্বন্ধে আত্মাতে থাকে। এই কার্য্যজ্ঞান ও ও কারণজ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে আত্মারূপ একই আধারে থাকে। কার্য্য ও কারণের অন্য কোন দোষ নাই বটে কিন্তু এই পথটী বড়ই দীর্ঘ। যাঁহারা প্রতিযোগিজ্ঞানকে অভাব জ্ঞানের কারণরূপে বলেন তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে তাঁহাদের পথটী আরও স্বল্প।

তাঁহাদের মতে অভাবপ্রত্যক্ষকে বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞান বলিয়া বলিবার কোনই প্রয়োজন নাই। অভাবপ্রত্যক্ষকে শুধু বিশিষ্ট জ্ঞানরূপে বুঝিলেই চলিবে। অভাব বিশেষ্য ও প্রতিযোগী বিশেষণ। প্রতি-যোগীর বিশেষণ অভাবের জ্ঞান কালে জ্ঞাত হয় কি না তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। যে জ্ঞানে বিশেষ্য ও বিশেষণ প্রতীয়মান হয় তাহাকে বিশিষ্ট জ্ঞান বলে। এই অভাব জ্ঞানের বিষয় অভাব। সকল জ্ঞান যেরূপ বিষয়তা সম্বন্ধে স্বীয় বিষয়েতে থাকে এই জ্ঞানও সেইরূপ বিষয়তা সম্বন্ধে অভাবেতে থাকে। এই অভাব জ্ঞানের প্রতি কারণ জ্ঞান। এখন দেখা যাক্ কিরূপ জ্ঞান কারণ। তাঁহারা বলেন যে জ্ঞান পরম্পরা সম্বন্ধে অভাবে থাকে সেই জ্ঞান কারণ। সেই পরম্পরা সম্বন্ধটী হইতেছে স্বপ্রকারীভূত ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্ব সম্বন্ধ। এখন এই সম্বন্ধটীর

বিশেষ বিবরণ প্রয়োজনীয়। প্রত্যক্ষের বিষয় যে অভাব সেই অভাবে প্রতিযোগিতাকত্ব সম্বন্ধে প্রতিযোগী থাকে। এবং এই প্রতিযোগী প্রতিযোগিজ্ঞানের বিষয়। এবং এই প্রতিযোগী প্রতিযোগিজ্ঞানের বিশেষণরূপে প্রতীয়মান হয়। এই জ্ঞানর প্রতিযোগীর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে এবং প্রতিযোগীর সহিত অভাবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। সুতরাং এই জ্ঞানের প্রতিযোগীকে দ্বার করিয়া অভাবের সহিত সম্বন্ধ ভালভাবেই স্থাপিত হইতে পারে। এখানে দুইটী পৃথক্ পৃথক্ সম্বন্ধ মিশিয়া একটী জটিল সম্বন্ধের সৃষ্টি করিয়াছে। এখানে শুধু জ্ঞান ও এই সম্বন্ধের কথা বলিলেই আমরা প্রতিযোগিজ্ঞানকে পাইব। কারণ অন্য কোন জ্ঞান এই সম্বন্ধে অভাবের সহিত সম্বদ্ধ হয় না। কার্য্য ও কারণের অবয়ব ক্ষুদ্র করিয়া আমরা সম্বন্ধের আকার যতই বড় করিনা কেন তাহাতে দোষ হয় না। ইহারই নাম সম্বন্ধ মুদ্রা। এই প্রক্রিয়ানুসারে কার্য্য এবং কারণ উভয়ই স্বল্পাকার। কার্য্য বিশিষ্টজ্ঞান এবং কারণ জ্ঞান। অতএব এই মতে কার্য্যকারণ ভাবের লাঘব দেখান হইয়াছে।

রঘুনাথের পরবর্ত্তী আরও নবীন নৈয়ায়িকের দল বলেন যে প্রতি-যোগিজ্ঞানকে অভাব প্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও প্রতি-যোগিদ্বারা অবিশেষিত অভাবের প্রত্যক্ষের আপত্তি এই নিয়মানুসারে বারণ করা যায় না। তাঁহারা একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টান্তটী ভ্রমজ্ঞানের দৃষ্টান্ত। ঘটজ্ঞানের বিরোধী অভাব ঘটের অভাব নয়। এইরূপ নিশ্চয় হইলে আমাদের ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ঘটরূপ প্রতিযোগীর জ্ঞান থাকিলেও আমাদের এইস্থলে ঘটাভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। এই অভাব ঘটাভাব নয় এইরূপ নিশ্চয় থাকিলে 'ঘটাভাবের জ্ঞান' উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা ঘটাভাব নয় এই নিশ্চয় 'ইহা ঘটাভাব' এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধক। যাহা থাকিলে যাহা উৎপন্ন হয় না তাহাকে তাহার প্রতিবন্ধক বলে। ক থাকিলে যদি খ উৎপন্ন না হয় তাহা হইলে ক খ এর প্রতিবন্ধক। আমার নিশ্চয় ভ্রমাত্মক হইলেও ইহা প্রতিবন্ধক হয়। এইরূপ স্থলে ঘট বিশেষিত অভাব বুদ্ধি হইতে পারে না। শুধুই 'নাই' এইরূপ জ্ঞান হয় ইহা বলিতে হইবে।

এই সমালোচনা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। প্রতিবাদী বলেন যে ইহা ঘটাভাব নয়। এইরূপ জ্ঞানেও ঘট বিশেষণ হইতেছে। এই প্রতিবন্ধক জ্ঞান ঘটদ্বারা বিশেষিত হওয়ায় এইরূপ প্রতিবন্ধক জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। এইরূপ প্রতিবন্ধক জ্ঞান যদি সম্ভবপর না হয় তাহা শুধু অভাবের প্রত্যক্ষ যে উৎপন্ন হয় সেপ.ক্ষ কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকেরা অপর একটী দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন এবং বলেন যে এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাশূন্য অভাবের জ্ঞান হইতে পারে। অভাব প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট হইতে ভিন্ন। এখানে ঘটাভাবের নাম না করিয়া প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ঘট বিশিষ্ট বলা হইয়াছে। প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট ঘটাভাবই হইয়া থাকে। ঘট বিশিষ্ট হইতে ভিন্ন এই রূপ নিশ্চয় থাকিলে ঘটবিশিষ্টের জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব এই স্থলে প্রতিযোগিবিযুক্ত অভাবের জ্ঞান হইয়া থাকে একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। এইরূপ স্থলে প্রতিযোগিজ্ঞানকে যাঁহারা অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি হেতু বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারাও অভাবভেদকে হেতু বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। এবং এইজন্যই প্রতিযোগিজ্ঞানকে অভাবপ্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিবার কোন যুক্তি দেখা যায় না। যদি কোন স্থলে প্রতি-যোগিজ্ঞান ব্যতীত অভাবপ্রত্যক্ষ সম্ভবপর হয় তাহা হইলে প্রতিযোগি-জ্ঞানকে অভাবপ্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিবার কি রাজশাসন থাকিতে পারে?

অপর নৈয়ায়িক দল বলিয়া থাকেন যে অভাবের প্রতিযোগিবিযুক্ত-ভাবে প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে কোনই দোষ হয় না। 'শূন্য' এই প্রকার জ্ঞান আমাদের হইয়া থাকে। এবং এই জ্ঞান প্রামাণিক। প্রতিযোগি-জ্ঞানকে অভাবপ্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া মানিবার পক্ষে কোনই প্রমাণ নাই।

উপসংহারে আমরা এই কথা বলিতে চাই যে প্রাচীন নৈয়ায়িকদিগের মত নব্য নৈয়ায়িকগণ গ্রহণ করেন নাই। প্রতিযোগ্যাবিশেষিত অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়া নব্য নৈয়ায়িকগণ অভাবের বাস্তবতা আরও দৃঢ়-ভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন। এই অভাব-কল্পিত পদার্থ নয়। এই অভাব

অধিকরণ হইতে অভিন্নও নয়। কিন্তু অভাব যখন প্রতিযোগিবিশেষিত হইয়া প্রত্যক্ষ হয় তখন প্রতিযোগীর জ্ঞান কিরূপে হয় তাহা পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ ভাল করিয়া বিচার করেন নাই। অভাব প্রত্যক্ষের পক্ষে প্রতিযোগিজ্ঞানের কারণতা স্বীকার করিলেও সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকারের কোনই আবশ্যকতা যে নাই তাহা সকল নব্য নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্ত।

নাথযোগদর্শন

(শিবশক্তিতত্ত্ব)

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ।

যোগদর্শন বলিলে সাধারণতঃ মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত দর্শন বুঝায়, এবং তদনুগত সাধনমার্গ ই যোগমার্গ নামে অভিহিত হয়। নাথযোগি-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যোগ দর্শন ও যোগ মার্গ একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নাথযোগিসম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট সাধারণতঃ হঠযোগী বলিয়া পরিচিত হইলেও, হঠযোগ এই সম্প্রদায়ের সাধনমার্গের একটি বিশেষ অংশমাত্র। এই অংশ বিশেষ সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের সাধকগণ বিশেষজ্ঞ। মানুষ সুনিয়ত অনুশীলন দ্বারা তাহার দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর কিরূপ প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে, দেহের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি যন্ত্রের ক্রিয়া কি প্রকারে সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাধীন করিতে পারে, স্বীয় প্রাণশক্তি ও মনঃশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া কতদূর অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে, হঠযোগিগণ এবিষয়ে গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে বহুল গবেষণা করিয়াছেন এবং অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। হঠযোগদ্বারা মানুষ দেহেন্দ্রিয়মনের প্রভু হয়। কিন্তু দেহ, প্রাণ ও মনের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাতেই তাঁহাদের সাধনার শেষ নহে। ইহা দ্বারা যে দিব্যশক্তি ও দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, তাহার সাহায্যে বিশ্বের মূলীভূত চরম তত্ত্বের নিরাকরণ সাক্ষাৎকারই তাঁহাদের সাধনার আদর্শ। চরম তত্ত্বকে নিজের ভিতরে—নিজের আত্মার আত্মারূপে—উপলব্ধি করিয়া এবং সেই চরম তত্ত্বের দৃষ্টিতে বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় রহস্য অবগত হইয়া, সর্ব্ব প্রকার বন্ধন ক্ষুদ্রতা মোহ ও দুঃখ হইতে আত্যন্তিক বিমুক্তিলাভ এবং সমস্ত বিশ্বের উপর সম্যক্ নাথত্ব বা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাই তাঁহারা মানব জীবনের লক্ষ্যস্থানীয় বলিয়া গ্রহণ করেন। জ্ঞানে পূর্ণতা, প্রেমে পূর্ণতা, শক্তিতে পূর্ণতা ও শান্তিতে পূর্ণতা লাভ করিয়া মানুষ ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে, নিত্যসিদ্ধ নিত্যপরিপূর্ণ পরমেশ্বরের সহিত স্বরূপতঃ অভিন্নতা উপলব্ধি

করিবে, মানবতার এই সুমহান্ দাবী লইয়া নাথযোগিগণ সাধন সমরে প্রবৃত্ত হন। স্বীয় দেহমন প্রাণকে আয়ত্ত করা ও তদুদ্দেশ্যে হঠযোগের অনুশীলন করা এই সাধনার প্রথম সোপান।

নাথযোগিগণ আপনাদের সম্প্রদায়কে "সিদ্ধ-সম্প্রদায়" বলিয়া ঘোষণা করেন। সাধনাদ্বারা যাঁহারা অভীপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারাই সিদ্ধ। সুতরাং জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে, শান্তিতে যাঁহারা আদিনাথ যোগীশ্বর শিবের সহিত একীভাবসম্পন্ন হইতে পারেন, তাঁহারাই বস্তুতঃ সিদ্ধ ও নাথ নামের যোগ্য। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এরূপ অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের সাক্ষাৎকৃত তত্ত্ব ও অবলম্বিত সাধন পদ্ধতিই এই সম্প্রদায়ের সাধ্যসাধন বিষয়ক মতবাদের ভিত্তি, ঐ সিদ্ধগণের জীবন নিজেদের জীবনের ভিতরে সম্যক্‌সত্য করিয়া তোলাই সাধকগণের জীবনাদর্শ,—এই প্রকার বিশ্বাস সুদৃঢ় রাখিবার উদ্দেশ্যেই সমস্ত সম্প্রদায়কে সিদ্ধ যোগিসম্প্রদায় বলা হইয়া থাকে।

যোগিগুরু গোরক্ষনাথ এই সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক না হইলেও সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য। বেদান্তি-সম্প্রদায়ে আচার্য্য শঙ্করের যে স্থান, নাথ যোগিসম্প্রদায়ে গোরক্ষনাথেরও সেই স্থান। ভগবান্ বুদ্ধের পরে আচার্য্য শঙ্কর ব্যতীত যোগিগুরু গোরক্ষনাথের ন্যায় আর কোন মহাপুরুষই আধ্যাত্মিক জীবনের উপর স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও উপদেশের এমন বিশাল প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে এবং ভারত বহির্ভূত অনেক দেশেও নাথ সাম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক মঠ মন্দির আশ্রম ও শাখা-সম্প্রদায় সংগঠিত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্র গোরক্ষনাথের অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত রহিয়াছে। সম্প্রদায় মধ্যে গোরক্ষনাথ সাক্ষাৎ শিবাবতার বলিয়া পূজিত। তিনি অমর এবং এখনো দিব্য দেহে লোক সমাজের কল্যাণ বিধান করিতেছেন,—সম্প্রদায়িক সাধকগণ ইহা অকপটভাবে বিশ্বাস করেন।

গোরক্ষনাথ ঠিক কোন্ সময়ে ও কোন্ প্রদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন,

তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অদ্ভুত মতভেদ দৃষ্ট হয়। বঙ্গ, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব প্রভৃতি অনেক প্রদেশ তাঁহাকে আত্মজ বলিয়া দাবী করেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল বিভিন্ন কিম্বদন্তী অবলম্বনে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নানা সময়ে কল্পিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক মতে তিনি সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগেই লোক কল্যাণার্থে স্বেচ্ছায় আত্মপ্রকট বলিয়া থাকেন। যাহা হৌক, ঐতিহাসিক তথ্যালোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তাঁহার প্রবর্ত্তিত দার্শনিক মতবাদ সংক্ষেপে বিবৃত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

নাথ সম্প্রাদায়ে সংস্কৃতে ও প্রাদেশিক ভাষায় সাধ্যসাধন বিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গোরক্ষনাথ নিজেও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অধিকাংশ গ্রন্থেই প্রধানতঃ যোগ সাধনার পদ্ধতি নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে দার্শনিক তত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি' একখানা উৎকৃষ্ট সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থ। প্রধানতঃ এই গ্রন্থ অবলম্বনেই গোরক্ষনাথের দার্শনিক মতবাদ এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। গ্রন্থখানি পদ্যপদ্যাত্মক।

সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতির প্রথম শ্লোক এই,—

আদিনাথং নমস্কৃত্য শক্তিযুক্তং জগদ্‌গুরুম্।
বক্ষ্যে গোরক্ষনাথোঽহং সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতিম্॥ ১।১॥

—শক্তিযুক্ত জগদ্‌গুরু আদিনাথকে নমস্কার করিয়া আমি গোরক্ষনাথ সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি বলিব।

গোরক্ষনাথ গ্রন্থকর্ত্তা। আদিনাথ নাথসম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক এবং গোরক্ষনাথের গুরুর গুরু পরমগুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহাকে তিনি শক্তিযুক্ত ও জগদ্‌গুরু বলিয়া খ্যাপন করিতেছেন এবং তাঁহাকে প্রণতি জানাইয়া গ্রন্থারম্ভ করিতেছেন। এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ও নির্দ্দেশিত হইয়াছে। আদিনাথ গ্রন্থকর্ত্তার দৃষ্টিতে তত্ত্বতঃ সকল নাথের আদি, সকল যোগীর চিরন্তন আদর্শ, যোগীশ্বর মহাদেব। তিনিই পরমতত্ত্ব। এই পরম অদ্বয় তত্ত্ব শিব 'শক্তিযুক্ত' ও 'জগদ্‌গুরু'। এই শিবতত্ত্বই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।

শিব নিত্যশক্তিমান্। তিনি এক অদ্বিতীয় সর্ব্ববিধপরিচ্ছেদরহিত। তাঁহার শক্তি স্বরূপতঃ তাঁহার সহিত অভিন্ন। সুতরাং শক্তির সত্তায় তাঁহার মধ্যে কোনরূপ দ্বৈতভাব হয় না। "শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরাভ্যন্তরে শিবঃ। অন্তরং নৈব জানীয়াৎ চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব।" ৪।২৬। শিব সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাঁহার শক্তি সচ্চিদানন্দময়ী। কিন্তু শক্তির সংকোচ-বিকাশ আছে, ব্যক্তাব্যক্ত ভাব আছে, ক্রিয়ার ভিতরে অভিব্যক্তি এবং ক্রিয়াশূন্য অবস্থায় স্বস্বরূপে অবস্থিতি আছে। এই প্রকার পরিণাম আছে বলিয়াই তাহা শক্তি নামে অভিহিত হয়। "সর্ব্বশক্তি প্রসরসংকোচাভ্যাং জগৎসৃষ্টিঃ সংহৃতিশ্চ ভবত্যেব ন সন্দেহঃ"—১।২০। কিন্তু পরিণামের আত্মা অপরিণামী। অপরিণামী সৎস্বরূপ আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্ব ব্যতীত পরিণামিনী সত্তার কোন অর্থই হয় না। পরিণাম ও অপরিণাম এক তত্ত্বেরই দুই অঙ্গ। "ন শিবেন বিনা শক্তিঃ ন শক্তিরহিত শিবঃ।" ব্যবহারিক জ্ঞানে পরিণাম বা পরিবর্ত্তনের প্রত্যয় অপরিণাম বা স্থিতিশীলতার প্রত্যয়সাপেক্ষ এবং অপরিণাম বা অপরিবর্ত্তনের প্রত্যয়ও পরিণাম বা পরিবর্ত্তনের প্রত্যয় সাপেক্ষ। শুধু পরিণাম বা শুধু অপরিণাম, শুধু গতি বা শুধু স্থিতির কোন ধারণা সম্ভব নয়।

স্থূল দৃষ্টিতে স্থিতি ও গতির পরস্পরসাপেক্ষত্ব প্রতীয়মান হয়, পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াই যে পরস্পরের সত্তা, তাহা অনুভূতিগোচর হয়। একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে আরো দেখা যায় যে, যাহা আপাততঃ স্থির, গতিহীন, পরিণামবিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাও একান্তভাবে স্থির নয়, তাহার মধ্যেও গতি চলিতেছে, তাহাও পরিণাম-প্রবাহেরই সমন্বিত অবস্থাবিশেষ; আবার যেখানে কেবল গতি বা পরিণামই দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার মধ্যেও কথঞ্চিৎ স্থিতিশীলতা বিদ্যমান। অতিক্রুত পরিণামশীল পদার্থ প্রায়শঃ স্থির অচঞ্চল অপরিণামী বলিয়াই অনুভূত হয়, আবার নিত্য অচ্যুতস্বভাব পরিণামরহিত বস্তুর মধ্যেও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সূক্ষ্ম পরিণাম আবিষ্কৃত হয়। স্থিতি ও গতির ভেদ, নিত্যত্ব ও পরিণামিত্বের পার্থক্য বস্তুতঃ আপেক্ষিক বলিয়াই বোধ হয়।

সূক্ষ্ম আলোচনায় ইহাই নিরূপিত হয় যে, পরম পরাকাষ্ঠার অবস্থায় গতি ও স্থিতি, পরিণাম ও একত্ব, পরস্পরের সহিত অভিন্ন স্বরূপে প্রতি-

ষ্টিত—শক্তি ও বস্তু তখন এক হইয়া যায়, কাল ও মহাকালের কোন ভেদ থাকে না। (Absolute Motion and Absolute Rest,—Time and Eternity, are found to be identical.) এ বিষয়ে সাধারণ আলোচনার অবকাশ এখানে নাই।

নাথযোগিগণ গতির মূল উপাদানকে বলেন শক্তি, এবং স্থিতির উপাদানকে বলেন শিব, এবং শিব ও শক্তিকে বলেন তত্ত্বতঃ অভিন্ন। শক্তি নিয়ত পরিণামশীলা অবিরাম ক্রিয়াময়ী বহুরূপরূপান্তরপ্রসবিনী বিশ্বজননী; শিব অপ্রচ্যুতস্বরূপ, সকল পরিণাম ও ক্রিয়ার উদাসীন দ্রষ্টা ও সম্ভোক্তা, অসংখ্যরূপরূপান্তরের নিত্য অভেদভূমি, এক অদ্বিতীয় স্বয়ংজ্যোতি পরমাত্মা। তত্ত্বতঃ উভয়ই এক, অভিন্ন। শক্তি ও তাহার ক্রিয়াপ্রবাহকে তাঁহারা মিথ্যা বলেন না, বিশ্বপ্রপঞ্চকে রজ্জু সর্পবৎ অজ্ঞান-প্রসূত বলেন না। শক্তি ও তাহার পরিণাম দ্বারা শিবের অদ্বৈতত্ব হানি হয় বলিয়াও তাঁহারা মনে করেন না। শক্তির ক্রিয়ার ভিতরে তাঁহারা শিবেরই প্রকাশ দর্শন করেন.

শিবময়ী শক্তির আত্মপরিণামেই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি। সৃষ্টি দ্বিবিধ—ব্যষ্টি সৃষ্টি ও সমষ্টিসৃষ্টি। বহু ব্যষ্টির মধ্যে ঐক্যসূত্রের বিকাশেই সমষ্টি সৃষ্টি। নাথযোগিগণ ব্যষ্টিকে বলেন 'পিণ্ড' এবং সমষ্টিকে বলেন 'ব্রহ্মাণ্ড'। পিণ্ডরূপ শক্তিপরিণাম দ্বারা যেমন বহুত্বের বিস্তার সাধিত হইতে থাকে, তাহাদের মধ্যে ঐক্যসূত্রের বিকাশ দ্বারা তেমনি সমষ্টিসৃষ্টি হইতে থাকে, ব্রহ্মাণ্ড গঠিত হইতে থাকে। প্রত্যেক পিণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড প্রতিফলিত, এবং ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পিণ্ডেরই বিরাটরূপের অভিব্যক্তি। অদ্বিতীয়া সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তি সৃষ্টিকালে অনন্তপিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডজননী অনন্তপিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডরূপিনী. এবং শিব তাঁহার এই অনন্ত লীলা-পরিণামের 'উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ'। প্রলয়কালে এই অনন্তপিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড সেই শক্তির মধ্যে পরিণামাভিব্যক্তিবিহীন অব্যক্ত শক্তিরূপেই বিলীন থাকে। তখন শক্তির স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠা এবং শিবের সহিত সম্যক্ অভিন্নভাবে অবস্থিতি। শক্তির তখন পরিণামের পরাকাষ্ঠা বলিয়াই সে অবস্থায় স্থিতি ও গতির কোন ভেদ নাই, স্বরূপ ও ক্রিয়ার কোন ভেদ নাই। শিবেরও তখন কোন উপাধি নাই। শক্তি তাঁহার সহিত অভিন্ন বলিয়াই তখন তাঁহাকে শক্তিমান্ বলারও কোন অর্থ নাই, সকল

জ্ঞান, সকল গুণ, সকল ঐশ্বর্য্য তদভিন্না শক্তির মধ্যে অভেদভাবে বিলীন বলিয়াই তখন জ্ঞান গুণ বা ঐশ্বর্য্য তাঁহাতে আরোপ করা চলে না।

গোরক্ষনাথ বিশ্বাতীত চরম তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

যদা নাস্তি স্বয়ং কর্ত্তা কারণং চ কুলাকুলম্।
অব্যক্তং চ পরং ব্রহ্ম অনামাবিদ্যতে তদা ॥ ১।৪

—যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম কার্য্য জগতের সত্তা নাই, সুতরাং কারণ এবং কর্ত্তারও সত্তা নাই, তখন অব্যক্ত অনাম পরব্রহ্মই স্বরূপতঃ বিদ্যমান।

কার্য্যের সম্পর্কেই কারণত্ব ও কর্ত্তৃত্ব। উৎপত্তিস্থিতিধ্বংসশীল কার্য্য-জগতের যখন অভাব, তখন যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহাকে কারণও বলা যায় না, কর্ত্তাও বলা যায় না। তখন যে কিছুই থাকে না, তাহাও বলা যায় না, যেহেতু কিছু না থাকিলে বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তিই হইতে পারিত না। যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহার কোন গুণ, কোন বিশেষণ, কোন নাম নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়, যেহেতু গুণমাত্রই বস্তুকে বিশেষিত করে, বস্ত্বন্তর হইতে তাহার বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করে এবং তদ্দ্বারা বস্ত্বন্তরের সত্তা সূচনা করে, এবং সার্থক নামমাত্রই গুণবাচক বিশেষণকল্প। অতএব বিশ্বপ্রপঞ্চের অতীত মূল তত্ত্ব নামরূপাদিবিহীন, কর্ত্তৃত্ব-কারণত্বাদিবিহীন, সর্ব্ববিধপরিচ্ছদবিহীন এক সদ্‌বস্তু। তাহা অব্যক্ত, কিন্তু স্বপ্রকাশ। সেই সদ্‌বস্তুই বেদান্তে ও শ্রুতিতে ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা অভিহিত হয়, নাথ-যোগীদের গ্রন্থে শিব শব্দ দ্বারা অভিহিত হয়।

কর্ত্তৃত্ব-কারণত্বাদি ধর্ম্ম তাহার মধ্যে ব্যক্ত না থাকিলেও, এসব ধর্ম্মের সম্ভাবনা তাহার মধ্যে অবশ্যই আছে, এই কার্য্যজগৎই ইহার প্রমাণ। যখন কার্য্য নাই, তখন কারণ বা কর্ত্তাও নাই; কিন্তু কার্য্য যখন তাহা হইতে সৃষ্ট হয়, তখন কারণত্ব ও কর্ত্তৃত্বের বীজ তাহার মধ্যে অবশ্যই স্বীকার্য্য। এই বীজ তাহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন। এই বীজই শক্তি নামে অভিহিত। যোগিগুরু বলিতেছেন—

স্বয়মনাদিসিদ্ধম্ একমেব অনাদিনিধনং সিদ্ধসিদ্ধান্তপ্রসিদ্ধম্। তস্য ইচ্ছামাত্রধর্ম্মা ধর্ম্মিণী নিজা শক্তিঃ প্রসিদ্ধা ॥১।৫॥

—স্বয়ং অনাদিসিদ্ধ অনাদিনিধন একই সিদ্ধগণের (তত্ত্বদর্শিগণের) সিদ্ধান্তে প্রসিদ্ধ। তাহার 'নিজা শক্তি' (স্বাভিন্না স্বস্বরূপভূতা নিত্যা

শক্তি) প্রসিদ্ধা। ইচ্ছামাত্রই সেই শক্তির ধর্ম্ম, সেই শক্তি ইচ্ছামাত্রধর্ম্মের ধর্ম্মিণী। পরমার্থতঃ এই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মিণীর কোন ভেদ নাই, এবং এই নিজা শক্তি ও সেই নিত্য নির্ব্বিকার নামরূপক্রিয়াদিরহিত অদ্বিতীয় তত্ত্বেরও কোন ভেদ নাই। অথচ সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় এই শক্তি পরিণামময়ী ও তাহার আত্মস্বরূপ এক নিত্য কূটস্থ, শক্তি বিশ্বজননী ও এক বিশ্বাত্মা বিশ্বপ্রকাশক বিশ্বাধিষ্ঠান। এই একই বৈদান্তিকদের ব্রহ্ম, নাথযোগী উপাসকগণের শিব।

এই অনাদিসিদ্ধ অনাদিনিধন নামরূপ পরিণামাদিরহিত অদ্বিতীয় শিবের স্বরূপভূতা অনাদিসিদ্ধা অনাদিনিধনা নিত্যপরিণামময়ী ইচ্ছামাত্র ধর্ম্মা 'নিজাশক্তির' ক্রমবিবর্ত্তনে কি পদ্ধতিতে বিশ্বপ্রপঞ্চের ক্রমাভিব্যক্তি হয়, এবং তদ্দ্বারা কি পদ্ধতিতে শিবের বিচিত্রোপাধিবিশিষ্ট স্বরূপের প্রকাশ হয়, 'সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি'তে সিদ্ধগুরু গোরক্ষনাথ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই পদ্ধতিনির্দ্দেশের অবতরণিকায় তিনি বলিয়াছেন,—

নাস্তি সত্যবিচারেঽস্মিন্ উৎপত্তিশ্চাণ্ডপিণ্ডয়োঃ।
তথাপি লোকবৃত্ত্যর্থং বক্ষ্যে সৎসম্প্রদায়তঃ ॥ ১।২

—এই দর্শনে পারমার্থিক বিচারে অণ্ড ও পিণ্ডের (সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডের ও ব্যষ্টিদেহের) উৎপত্তি (অর্থাৎ আদি সৃষ্টি) নাই। (শক্তির পরিণাম ও বিকাশ সঙ্কোচ এবং তদ্ধেতুক পিণ্ডাণ্ডকসৃষ্টিপ্রবাহ বস্তুতঃ অনাদি ও অনন্ত; কোন বিশেষ কালে ইহার আরম্ভও হয় নাই, কোন বিশেষকালে ইহার শেষও হইবে না।) তথাপি লৌকিকভাবে কালিক দৃষ্টিতে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া প্রদর্শনার্থে সৎসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তানুসারে ইহা বর্ণন করিব।

পরমব্রহ্ম শিবের স্বরূপভূতা 'নিজা শক্তি' চারিটী স্তরে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া বিশ্বসৃষ্টির কারণ হইয়া থাকে। এই চারিটী স্তরের নাম যথাক্রমে 'পরাশক্তি', 'অপরাশক্তি', 'সূক্ষ্মাশক্তি'. 'কুণ্ডলিনী শক্তি'। শক্তির এইরূপ ক্রমবিকাশেই শিবের জ্ঞান গুণ বীর্য্য ঐশ্বর্য্যাদি বিশেষণের বিকাশ।

নিজাশক্তিতে শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ নাই, গুণ ও গুণীর ভেদ

নাই, আশ্রিত ও আশ্রয়ের ভেদ নাই, জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়ার ভেদ নাই, প্রকাশ প্রবৃত্তি ও স্থিতির ভেদ নাই। আত্যন্তিক অভেদভূমি এই নিজা-শক্তির স্বভাবে যোগিগুরু পাঁচটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"নিত্যতা নিরঞ্জনতা নিস্পন্দতা নিরাভাসতা নিরুত্থানতা ইতি পঞ্চগুণা নিজাশক্তিঃ' ১।১০ (১) নিত্যতা—নিজাশক্তি নিত্যা, তাহার প্রাগভাবও নাই, ধ্বংসাভাবও নাই। (২) নিরঞ্জনতা—তাহার কোন প্রকার মালিন্য নাই, রাগদ্বেষাদি কোন প্রকার দোষ নাই। (৩) নিস্পন্দতা—তাহার মধ্যে কোন প্রকার স্পন্দন নাই, বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য নাই, স্থিতি ও গতির ভেদ তাহার স্বভাবে উৎপন্ন হয় নাই, অবস্থান্তর প্রাপ্তির উন্মুখতাও প্রকাশিত হয় নাই। (৪) নিরাভাসতা—স্বাশ্রয় শিব হইতে ভিন্নরূপে তাহার কোন প্রতীতি নাই, ভেদের অভাবহেতু শিবের আভাস বা প্রতিবিম্বও তাহাতে বিলসিত হয় না, শক্তি-শক্তিমৎ আশ্রিতাশ্রয় প্রকাশ্যপ্রকাশক গুণগুণী প্রভৃতি কোন প্রকার ভেদের বিকাশ তাহার মধ্যে নাই। (৫) নিরুত্থানতা—উত্থান বা সংসাররূপে পরিণামের কোন লক্ষণ তদবস্থায় প্রকটিত হয় নাই।

কেবলমাত্র নিষেধবাচক পাঁচটী লক্ষণ দ্বারা শিবাভিন্না নিজাশক্তিকে লক্ষিত করা হইয়াছে। এই নিজাশক্তির মধ্যে যখন সৃষ্টির অভিমুখে কিঞ্চিৎ উন্মুখতা অভিব্যক্ত হইল, শিবের সহিত তাহার কথঞ্চিৎ শক্তি-শক্তিমদ্‌ভাব অভ্যুত্থিত হইল, শিব কিঞ্চিৎ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া শক্তির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, তখন এই শক্তি পরাশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল।

"তস্যোন্মুখত্বমাত্রেণ পরাশক্তিরুত্থিতা"। ১।৬

এই পরাশক্তিরও পাঁচটী লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। "অস্তিতা অপ্রমেয়তা অভিন্নতা অনন্ততা অব্যক্ততা ইতি পঞ্চগুণা পরাশক্তিঃ"—১।১১

(১) অস্তিতা—পরাশক্তির স্তরে শিবাশ্রিতা শক্তিরূপে শক্তির কথঞ্চিৎ ভিন্নাভিন্ন অস্তিত্বের আবির্ভাব হইল। নিজাশক্তির স্তরে শিবই শক্তি বা শক্তিই শিব; পরাশক্তির স্তরে শিবের শক্তি, শক্তি শিবের সহিত নিত্যযুক্তা হইয়াও, তৎসত্তায় সত্তাবতী ও তচ্চৈতন্যে প্রকাশময়ী হইয়াও, স্বরূপতঃ শিবের সহিত অভিন্না হইয়াও, সৃষ্ট্যুন্মুখতালক্ষণ দ্বারা কথঞ্চিৎ

ভিন্নরূপে বিরাজমানা। (২) অপ্রমেয়তা—পরাশক্তি অপ্রমেয়া সর্ব্ববিধ পরিচ্ছেদশূন্যা ইয়ত্তারহিতা, সুতরাং ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি লৌকিক প্রমাণের অগম্যা। (৩) অভিন্নতা—জীবজগদাদি সৃষ্ট না হওয়ায় তাহার ভিতরে বা বাহিরে কোন প্রকার ভেদ নাই, তাহার সত্তা হইতে পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট কোন পদার্থের বিদ্যমানতা নাই। (৪) অনন্ততা—তদ্-ব্যতিরিক্ত কোন বস্তু না থাকায় ও দেশকাল না থাকায় পরাশক্তি অনন্তা, আদ্যন্তমধ্যবিহীনা। (৫) অব্যক্ততা – পরাশক্তিও অব্যক্তা, কোন প্রকার দ্বৈত বা বৈচিত্র্য তখনও অভিব্যক্ত হয় নাই।

সৃষ্টির উন্মুখতাহেতু শক্তির ভিতরে যখন কিঞ্চিৎ স্পন্দন আবির্ভূত হইল, শক্তি যখন সামান্যভাবে কথঞ্চিৎ ক্রিয়াশীলা হইল, তখন সেই পরাশক্তির যে অবস্থা, তাহার নাম 'অপরাশক্তি'।

'তস্য স্পন্দনমাত্রেণ অপরাশক্তিরুত্থিতা ।১।৭।

এখানে একটি কথা স্মরণীয় যে, নিজাশক্তি যখন পরাশক্তিরূপে পরিণত হয়, তখন তাহার 'নিজাত্ব' নষ্ট হইয়া 'পরাত্ব' লাভ হয় না, এবং পরাশক্তি যখন অপরাশক্তিরূপে পরিণত হয়, তখনও তাহার 'নিজাত্ব' ও 'পরাত্ব' নষ্ট হইয়া 'অপরাত্ব' প্রাপ্তি হয় না। কারণরূপ সর্ব্বদাই কার্য্যরূপের মধ্যে অনুস্যূত থাকে, এবং সেইহেতু কার্য্যরূপ যতই বৈচিত্র্যান্বিত হয়, তাহাতে একত্ব নষ্ট হয় না, বহুত্বের মধ্যেও একত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং নব নব সৃষ্টির যোগ্যতাও অফুরন্ত থাকে।

এই স্পন্দনাত্মিকা অপরাশক্তিরও পাঁচটী লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।

"স্ফুরতা স্ফুটতা স্ফারতা স্ফোটতা স্ফূর্ত্তিতা—ইতি পঞ্চগুণা অপরা-শক্তিঃ" ১।১২। স্ফুরতা ও স্ফারতা (অর্থাৎ সঞ্চলন ও সঞ্চালন), স্ফুটতা ও স্ফোটতা (অর্থাৎ বিকাশত ও বিকাশকতা), স্ফূর্ত্তিতা (অর্থাৎ উৎসাহ বা আনন্দভাব)। অপরাশক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ ব্যক্তভাবান্বিতা, ব্যক্তীভূত হওয়ার দিকে কতকটা অগ্রসর। তাহার মধ্যে সৃষ্টির আবেগ পূর্ব্বাপেক্ষা স্ফুটতর, কিন্তু তাহাতে বৈচিত্র্য সূক্ষ্মভাবেও প্রকাশ পায় নাই, কেবলমাত্র একটু চাঞ্চল্যের বিকাশ হইয়াছে। অপরাশক্তির উপাধিযোগে শিব যেন নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে সদ্য উত্থিতপ্রায় হইয়াছেন, কিন্তু

ব্যুত্থিত হন নাই, তাঁহার অহংবোধও জাগ্রত হয় নাই, তাঁহার মধ্যে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভেদে, কর্তৃ-কার্য্যভেদ বিকশিত হয় নাই, নিজেকে শক্তিমান্ এবং শক্তিকে তাঁহার আশ্রিতা বলিয়া কোন সজাগ অনুভূতি সমুত্থিত হয় নাই। ব্যুত্থানের উদ্যোগ হইয়াছে মাত্র।

অপরাশক্তির মধ্যে ক্রমশঃ 'অহংভাব' প্রকাশ পাইল, এবং তাহাতে সৃষ্টির অভিমুখে শক্তি আরো অগ্রসর হইল। অপরাশক্তি তখন সূক্ষ্মাশক্তি রূপে পরিণত হইল।

"ততঃ অহন্তার্থমাত্রেণ সূক্ষ্মা শক্তিরুৎপন্না" ।১।৮।

এই সূক্ষ্মাশক্তিরও পাঁচটী লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

"নিরংশতা নিরন্তরতা নিশ্চলতা নিশ্চয়তা নির্ব্বিকল্পতা—ইতি পঞ্চগুণা সূক্ষ্মাশক্তিঃ।" ১ ১৩। (১) নিরংশতা—অখণ্ডিতা অহমাকারা বৃত্তিরূপেই তখন শক্তির প্রকাশ। অহমাকারা বৃত্তির মধ্যে ইদমাকারা বৃত্তি সমুৎপন্ন না হইলে—'অহম্ অহম্' এই প্রকার অনুভব প্রবাহের ফাঁকে ফাঁকে অহং ভিন্ন 'ইদম্ ইদম্' এই প্রকার অনুভূতি জাগ্রত না হইলে,—'অহম্' খণ্ডিত হয় না, অহং-বোধের অবয়ববিভাগ হয় না, অংশাংশী-ভেদ সমুদিত হয় না। (২) নিরন্তরতা—দেশকৃত বা কালকৃত কোন প্রকার 'অন্তর' বা ব্যবধান তাহার মধ্যে প্রকটিত হয় নাই। কখন 'আমি-বোধ', কখন এই বোধের অভাব, আবার এই বোধের উৎপত্তি, এইরূপ ব্যবহিতভাবে অহন্তাবোধ প্রবাহিত হয় না; কোন স্থানবিশেষে আমিত্ববোধ (যথা, দেহাত্মবোধ) এবং স্থানান্তরে এই বোধের অভাব (যথা, দেহাতিরিক্ত স্থানে), এইরূপ কোম ব্যবধানও সূক্ষ্মশক্তিগত অহন্তাবোধের মধ্যে নাই। (৩) নিশ্চলতা—এই অহমাকারাবৃত্তির কোন 'চলন' অর্থাৎ চাঞ্চল্য বা স্বরূপবিচ্যুতি ঘটে না, কখন গাঢ়তা, কখন শিথিলতা, কখন জাগ্রদ্ভাব, কখন তন্দ্রাচ্ছন্নভাব, এই প্রকার অবস্থাভেদ সেই বৃত্তির মধ্যে থাকে না। (৪) নিশ্চয়তা—এই অহন্তা নিশ্চয়াত্মিকা, সংশয়-বিপর্য্যয়শূন্যা। (৫) নির্ব্বিকল্পতা—এই অহংজ্ঞানে কোন বিকল্প নাই, কোন উপাধি বা বিশেষণ নাই,—ইহাতে 'আমি-বোধ' কোন প্রকার বিশেষণবিশিষ্ট নয়, কোন প্রকার উপাধিযুক্ত নয়, সুতরাং পরিচ্ছিন্ন নয়, এক এক সময় এক একরূপ অবস্থায় অবস্থিতও নয়। 'আমি-জ্ঞান' এই স্তরে সর্ব্বদা একরূপ, এবং এই আমি-বোধই সূক্ষ্মশক্তির স্বরূপ।

তদনন্তর এই অহন্তার সঙ্গে বেদনশীলতা উদ্‌গত হইল,—জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান ভেদ, কর্ত্তৃ-কার্য্য-কর্ম্মভেদ, সংকল্পাত্মিকা বৃত্তি, সংকল্পনীয় পদার্থ-রাজির ভাবময় রূপ এই অহন্তান্বিতা মহাশক্তির ভিতরে সমুদিত হইল, তখন ইহার নাম হইল কুণ্ডলিনীশক্তি।

"ততো বেদনশীলা কুণ্ডলিনী শক্তিরুদ্‌গতা"। ১।১৩।

কুণ্ডলিনী শক্তির পঞ্চ লক্ষণ—

"পূর্ণতা প্রতিবিম্বতা প্রবলতা প্রোচ্চলতা প্রত্যঙ্‌মুখতা—ইতি পঞ্চগুণা কুণ্ডলিনী শক্তিঃ।" ১।১৪।

(১) পূর্ণতা, ব্যাপকতা, সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা; বিশ্ব সংসারের উপাদান কারণ বলিয়াই কুণ্ডলিনী শক্তি পূর্ণা, সর্ব্বব্যাপিনী। (২) প্রতিবিম্বতা—ইহার ভিতরে শিব স্বরূপতঃ প্রকাশিত না হইয়া বিচিত্ররূপে প্রতিবিম্বিত হয়। কুণ্ডলিনী শক্তি অবলম্বনেই শিবের বৈচিত্র্যসৃষ্টি ও বিচিত্রোপাধি-পরিগ্রহ। (৩) প্রবলতা—অশেষবৈচিত্র্যরচনাসামর্থ্য। (৪) প্রোচ্চলতা ক্রমবর্দ্ধমানতা, স্থূলাদিরূপে পরিণামশীলত্ব; আপনার অভ্যন্তর হইতে নিত্য নব নব সৃষ্টির বিকাশ সাধন করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তি ক্রমশঃই পুষ্টিলাভ করিতেছে। (৫) প্রত্যঙ্মুখতা—বিচিত্ররূপে আপনাকে সংসার সৃষ্টির মধ্যে পরিণত করিয়াও কুণ্ডলিনী শক্তি নিত্য শিবমুখী শিবপ্রাণা শিবাত্মবোধসম্পন্না; এই প্রত্যঙ্মুখতা হেতুই বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব বিরাজিত, বৈষম্যের মধ্যে সাম্য বিদ্যমান, ভেদের মধ্যে অভেদ সুপ্রতিষ্ঠিত।

শিবাভিন্না শিবময়ী মহাশক্তির এইরূপ পঞ্চবিধ বিকাশ ও প্রতি স্তরে পঞ্চবিধ গুণের প্রকাশে শিবের এই বিশ্বদেহের উৎপত্তি,—অদ্বৈততত্ত্ব বিশুদ্ধ সচ্চিৎস্বরূপ শিবের বিশ্বাত্মা বিশ্বপ্রাণ বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বভাবময়রূপে অভিব্যক্তি। এই বিশ্বদেহই পরপিণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ড। "এবং শক্তিতত্ত্বে পঞ্চ-পঞ্চগুণযোগাৎ পরপিণ্ডোৎপত্তিঃ"। ১।১৫।

বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত*

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ।

বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে প্রাচ্য মত বলিতে আমি প্রাচীন আচার্য্যদের মতকে লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও প্রধান প্রধান অনেক বিষয়ে তাঁহাদের মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদেরই অন্য নাম বেদান্ত। বেদের অন্তে সন্নিবিষ্ট বলিয়া উপনিষদের নাম বেদান্ত। পাণিনির প্রথম সূত্রের মহাভাষ্যে এবং অন্যান্য স্থলে বেদের সহস্রাধিক শাখার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও এক্ষণে অল্প কয়েকটি শাখাই বিদ্যমান আছে। বেদকে বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়া বেদের বিভিন্ন অংশকে শাখা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন বৃক্ষের একটি শাখা অবলম্বন করিলেই ঐ বৃক্ষের ফল লাভ করিতে পারা যায় সেইরূপ বেদের একটি শাখা অবলম্বন করিলেই বেদবৃক্ষের ফলস্বরূপ ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থই লাভ করা যায়। তন্মধ্যে মোক্ষলাভের কথাই উপনিষদে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। বেদের সহস্রাধিক শাখার প্রান্তে সহস্রাধিক উপনিষদ এক সময়ে বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে ১০৮টি সমধিক প্রসিদ্ধ উপনিষদ এক্ষণে বিদ্যমান। এই ১০৮টি উপনিষদের নাম, এবং কোন্ উপনিষদগুলি ঋগ্বেদের অন্তর্গত, কোন্গুলি যজুর্ব্বেদের, কোন্গুলি সামবেদের এবং কোন্গুলি অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত, এই সকল তথ্য মুক্তিকোপনিষদে পাওয়া যায়।

বেদ দুই অংশে বিভক্ত—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মহর্ষি আপস্তম্ব যজ্ঞ-পরিভাষা সূত্রে বেদের সংজ্ঞা দিয়াছেন—মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ং, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সমষ্টির নাম বেদ। প্রাচীন আচার্য্যগণ সকলেই বেদের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকাংশ উপনিষদ ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্গত, কোনও কোনও উপনিষদ মন্ত্রভাগের অন্তর্গত। অতএব সকল

*৩১ শে মার্চ্চ বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম।

উপনিষদই বেদের অন্তর্গত। বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোনও মানবের রচিত নহে। বেদের রচনাকর্ত্তার নাম পাওয়া যায় না, যে সকল ঋষির নিকট বেদের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল সেই সকল ঋষির নাম পাওয়া যায়। বেদ যে কোনও মানব রচিত নহে, বেদের শব্দ সকল যে নিত্য এই মতের সমর্থনে সায়ণাচার্য্য বেদ হইতে নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বাচাবিরূপনিত্যয়া—ঋগ্বেদ সংহিতা (৮।৭৫।৬) অর্থাৎ বেদের বিবিধ শব্দ সকল নিত্য। ঋষিদের নিকট বেদের শব্দ সকল প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেও সেই সকল শব্দ ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। শঙ্করাচার্য্য এই মতের সমর্থনে বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিত মেতদ্
যদ্ ঋগ্বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্ববেদঃ ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদ—২।৪।১০

অর্থাৎ ঋগ্বেদ প্রভৃতি এই মহা প্রাণীর (ঈশ্বরের) নিঃশ্বাসের ন্যায় উৎপন্ন হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলিয়াছেন,

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ॥

অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মার নিকট বেদ প্রকাশ করেন। ব্রহ্মা ঈশ্বরের নিকট বেদ লাভ করেন, পরে যে ঋষি যেরূপ তপস্যা করেন তাঁহার নিকট বেদের সেই অংশ প্রকাশিত হয়।

মনুষ্য রচিত গ্রন্থে ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা আছে। বেদ মনুষ্য রচিত নহে, স্বয়ং ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রচারিত, এজন্য বেদে ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা নাই। সমগ্র বেদ অভ্রান্ত সত্য। বেদের অর্থ অনেক সময় অতিশয় গভীর—ব্যাস বাল্মীকি মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা বেদের গভীর অর্থ উপলব্ধি করেন এবং সাধারণ লোকেও যাহাতে বেদের অর্থ জানিতে পারে এজন্য পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। বেদের যে সকল অংশ এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে, তাহার সার ভাগও এই সকল গ্রন্থে রক্ষিত

হইয়াছে। এই সকল বেদমূলক ঋষি প্রণীত গ্রন্থের সাধারণ নাম স্মৃতি। বেদের নাম শ্রুতি। শ্রুতি ও স্মৃতির মিলিত নাম শাস্ত্র। মহাভারত বলিয়াছেন, ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদার্থ মুপবৃংহয়েৎ অর্থাৎ ইতিহাস (রামায়ণ ও মহাভারতের নাম ইতিহাস) এবং পুরাণের দ্বারা বেদের অর্থ দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। রামায়ণে দেখা যায় যে লব ও কুশের যখন বেদসকল অভ্যাস করা হয় তখন বেদের অর্থ বুঝাইবার জন্য মহর্ষি বাল্মীকি তাহাদিগকে রামায়ণ শিক্ষা দেন। মহাভারতকে পঞ্চমবেদ বলা হয় কারণ চারি বেদে যে সকল উপদেশ আছে মহাভারতে তাহা সঙ্কলন করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় উপনিষদের সারভাগ সংগ্রহ করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন—

বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝনে না যায়।
পুরাণ বাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥

মনুসংহিতা সম্বন্ধে বেদ বলিয়াছেন, যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তৎ ভেষজং (তৈত্তিরীয় আরণ্যক) অর্থাৎ মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকারী। বিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন বিভিন্ন রোগীর জন্য বিভিন্ন ঔষধ ব্যবস্থা করেন, মনুও সেইরূপ বিভিন্ন ভবরোগীর বিভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন ; চিকিৎসক যেমন কাতর রোগীকে তিক্ত ঔষধ দেন, কষ্টকর ব্যবস্থা করেন, সেইরূপ যে ব্যক্তি দুঃখ পাইয়াছে মনু তাহার জন্য আরও দুঃখের ব্যবস্থা করেন : যে পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য আমরা সংসারে দুঃখ পাই সে পাপের যাহাতে শীঘ্র ক্ষয় হয় এজন্যই মনু এরূপ ব্যবস্থা করেন। অনাবশ্যক দুঃখ দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।

এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে ইহা প্রতিপাদিত হইবে যে বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের সমষ্টি একটি অখণ্ড বস্তু যাহা শাস্ত্র নামে পরিচিত - উপনিষদ তাহার একটি অংশ,—অন্য শাস্ত্রে যে সকল তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায় সে সকল তত্ত্ব উপনিষদ কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, কোথাও বা অন্তর্নিহিত আছে ; বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, বাহ্য দৃষ্টিতে বীজ এবং ফুলকে বিভিন্ন বস্তু বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু যিনি গভীর দৃষ্টিতে দেখিবেন তিনি বলিবেন উহারা ভিন্ন বস্তু নহে, বীজের মধ্যেই ফুল বিদ্যমান আছে। সেইরূপ বাহ্য

দৃষ্টিতে কেহ বলিতে পারেন যে পুরাণের ধর্ম্ম এবং উপনিষদের ধর্ম্ম বিভিন্ন, কিন্তু যিনি গভীর দৃষ্টিতে দর্শন করিবেন তিনি বলিবেন যে উহারা এক।

সুতরাং উপনিষদের তত্ত্ব বলিতে সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রেরই তত্ত্ব আসিয়া পড়ে। সংক্ষেপে সে তত্ত্ব এই যে এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সম্পাদন করেন, ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়, প্রলয়ের সময় জগৎ ঈশ্বরের মধ্যেই বিলীন হয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, জীব নিজ পূর্ব্বকৃত পাপ পুণ্য অনুসারে সুখদুঃখ ভোগ করে, জীবকে পাপ বা পুণ্য করিবার প্রবৃত্তি ঈশ্বরই জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম অনুসারে প্রদান করেন, প্রত্যেক সৃষ্টির পূর্ব্বে একটি সৃষ্টি ছিল, পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যে জীব যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিল বর্ত্তমান সৃষ্টির প্রারম্ভে যে তদনুসারে দেহ লাভ করে এবং তাহার তদনুরূপ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি হয়, যে পাপ করে সে নরকে যায়, যে পুণ্য করে সে স্বর্গে যায়, স্বর্গ বা নরক অনন্তকাল স্থায়ী নহে, পাপ পুণ্যের পরিমাণ অনুসারে স্বর্গে বা নরকে অল্পকাল বা দীর্ঘকাল বাস করিতে হয়, তাহার পর আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, যে ব্যক্তি প্রবল পাপও করে নাই পুণ্যও করে নাই তাহাকে স্বর্গেও যাইতে হয় না নরকেও যাইতে হয় না, মৃত্যুর পরই সে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি আজীবন ঈশ্বরের উপাসনায় অতিবাহিত করে সে মৃত্যুর পর দেবযান পথে ব্রহ্মলোক গমন করে এবং সেখান হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহার পুনর্জন্ম হয় না, জীবের স্থূলদেহ ব্যতীত ইন্দ্রিয়—প্রাণ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা গঠিত একটি সূক্ষ্মদেহ আছে, স্থূলদেহের ন্যায় সূক্ষ্মদেহও অচেতন, আত্মাই চৈতন্যময়, মানবের ন্যায় পশুপক্ষী প্রভৃতিরও আত্মা আছে, পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম অনুসারে মানব পশুপক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারে, উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করিয়া মানব ইন্দ্র-বায়ু-বরুণ প্রভৃতি দেবদেহও লাভ করিতে পারে, যতক্ষণ পুনর্জন্ম নিবৃত্তি না হয় ততক্ষণ দুঃখের সম্ভাবনা নিবৃত্ত হয় না, এজন্য পুনর্জন্ম নিবারণ করা বা মোক্ষলাভ করাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষাই আমাদের পুনর্জন্মের কারণ, অজ্ঞান হেতু আমরা দেহ ইন্দ্রিয় বা মনকে আত্মা বলিয়া ভ্রম করি,

আমাদের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম অনুসারে ঈশ্বরের মায়াশক্তির প্রভাবে আমাদের এই ভ্রম উৎপন্ন হয়, ঈশ্বরের কৃপা হইলে তিনি আমাদিগকে মায়ার পরপারে লইয়া যান, আমরা তখন ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করি, বিষয় ভোগের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়, আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, ঈশ্বরকে নিরন্তর উপাসনা করিলে, তাঁহার চিন্তায় তন্ময় হইলে তিনি কৃপা করেন, চিত্ত শুদ্ধ না হইলে ঈশ্বরকে নিরন্তর উপাসনা করা যায় না, আমাদের পূর্ব্বকৃত মন্দ কর্ম্মের ফলে আমাদের চিত্ত মলিন হইয়াছে, এজন্য কোনও বস্তুর প্রতি আসক্তি হয় কাহারও প্রতি বিদ্বেষ হয় ; আমরা ঈশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে এই আসক্তি ও বিদ্বেষ অন্তরায়রূপে উপস্থিত হয় এবং আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদিগকে বিষয় চিন্তায় নিবিষ্ট করে ; এই আসক্তি ও বিদ্বেষরূপ চিত্তের মলিনতা দূর করিবার জন্য কর্ম্ম করা প্রয়োজন, নিষ্কাম ও অনাসক্তভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে চিত্তকে ঈশ্বর চিন্তায় নিবিষ্ট করিয়া রাখা যায়, নিরন্তর ঈশ্বর চিন্তা করিলে আমরা ঈশ্বরের কৃপালাভ করিতে সক্ষম হই, ঈশ্বরের কৃপালাভ করিলে আমরা মায়া অতিক্রম করিতে পারি, এবং ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মোক্ষলাভের অধিকারী হই। এইভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান আমাদের চিত্তশুদ্ধ করিয়া একদিকে যেমন আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সহায়ক অপরদিকে তাহা আমাদের পার্থিব উন্নতিরও সহায়ক। কারণ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ— ইহলোকে উন্নতি এবং পরলোকে মোক্ষলাভ—যতো ঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ—যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয় তাহাই ধর্ম, ইহলোকের উন্নতির নাম অভ্যুদয়, পরলোকে মোক্ষলাভের নাম নিঃশ্রেয়স।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি, তাঁহাকে লাভ করিলে জীবের অবস্থা কিরূপ হয়, এই সকল কথাই উপনিষদে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কর্মের কথা অল্প পরিমাণে আছে এজন্য কেহ কেহ মনে করেন যে উপনিষদে কর্মের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নাই, জ্ঞানের উপরই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। কর্ম না করিলে জ্ঞানলাভ করা যায় না, ইহাও উপনিষদের মত। ঈশোপনিষদ্

বলিয়াছেন, কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে শতবর্ষ জীবিত থাকিবে এইরূপ ইচ্ছা করিবে—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।

কেনোপনিষদ্ বলিয়াছেন, তপস্যা, আত্মসংযম এবং কর্মের উপর উপনিষদ্ প্রতিষ্ঠিত,

তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম ইতি প্রতিষ্ঠা

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন

সত্যংবদ, ধর্মং চর

অর্থাৎ সত্য বলিবে, ধর্ম আচরণ করিবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ আহার শুদ্ধি রক্ষা করিতে বলিয়াছেন,

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ

অর্থাৎ আহার শুদ্ধ হইলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করা যায়। কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন যে মন্দ কর্ম হইতে নিবৃত্ত না হইলে, মন শান্ত না হইলে ঈশ্বর লাভ হয় না

নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো না সমাহিতঃ।

নাশান্ত মানসো বা ঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

কঠ ১।২।২৩

কোন্ কর্ম ভাল কোন কর্ম মন্দ, কোন্ আহার শুদ্ধ কোন্ আহার অশুদ্ধ এ বিষয় বিস্তারিত বিবরণ উপনিষদে পাওয়া যায় না, মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে পাওয়া যায়, মনুর ব্যবস্থাসকল বেদমূলক,

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিৎ ধর্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ

স সর্বোভিহিতো বেদে—

সমস্ত উপনিষদের সারভূত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য কোন্ কর্ম অকর্ত্তব্য এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ

তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ

মনুসংহিতা সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থ এবং মহাভারতের বহু পূর্বে রচিত হইয়াছিল ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

উপনিষদ্ এবং মনুসংহিতার মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি—জীবনের কি লক্ষ্য তাহাই উপনিষদে বিস্তারিতভাবে

আলোচনা করা হইয়াছে, সেই লক্ষ্য লাভ করিবার জন্য কিরূপ আচার পালন করা উচিত, কোন্ কর্ম করা উচিত, কিরূপ সমাজ ব্যবস্থা সেই লক্ষ্যের অনুকূল এই সকল কথা মনুসংহিতাতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

মনু বলিয়াছেন যে কাহার কি কর্ম করা উচিত তাহা তাহার বর্ণ বা জাতির উপর নির্ভর করে, বর্ণ বা জাতি জন্মের উপর নির্ভর করে (মনু ১০।৫)। কারণ জন্ম একটা অহেতুক ঘটনা নহে, পূর্বজন্মের কর্মের উপর বর্ত্তমান জন্ম এবং জাতি নির্ভর করে। এ সকল কথা উপনিষদের অনুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। জাতি যে পূর্বজন্মের কর্মের দ্বারা নির্দিষ্ট হয় ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে।

রমণীয়চরণা রমণীয়াং যোনিমাপদ্যন্তে ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয় যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা কপূরচরণা কপূয়াংযোনিমাপদ্যন্তে শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং।—ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫-১০-৭

অর্থাৎ যাহারা উত্তম আচরণ করে তাহারা উত্তম যোনি প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মণযোনি বা ক্ষত্রিয়যোনি বা বৈশ্যযোনি। যাহারা মন্দ আচরণ করে তাহারা মন্দ যোনি প্রাপ্ত হয়, যথা শ্বযোনি, শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি।

বর্ণাশ্রমধর্ম পালনের সহিত উপনিষদুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানলাভের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা রামানুজ প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের সর্বশেষ সূত্র-ভাষ্য হইতে প্রতীত হইবে। রামানুজ বলিয়াছেন,—এবং অহরহরনুষ্ঠীয়মান বর্ণাশ্রম ধর্মানুগৃহীততদুপাসনরূপতৎসমারাধনপ্রীত উপাসীনান্ অনাদিকাল-প্রবৃত্তানন্তদুস্তরকর্মসঞ্চয়রূপাবিদ্যাং বিনিবর্ত্ত্য স্বযাথাত্ম্যানুভবরূপ অন-বধিকাতিশয়ানন্দং প্রাপয্য পুনর্নাবর্ত্তয়তি।

অর্থাৎ প্রত্যহ বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করিলে তাহাতে ঈশ্বরের উপাসনা করা হয়, তাহাতে তিনি প্রীত হইয়া আমরা অনাদিকাল হইতে যে সকল পাপ করিয়াছি তাহা হইতে মুক্ত করেন, তখন আমরা নিজস্বরূপ অনুভব করি এবং অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হই, আর পুনর্জন্ম হয় না।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল সকল প্রাচীন আচার্য্যই এই সকল তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ এই সকল বিষয় লইয়া—ব্রহ্মের স্বরূপ কি, তিনি সগুণ না নির্গুণ, জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ কি,

ব্রহ্মকে লাভ করিলে জীবের কি অবস্থা হয়। কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে আচার্য্যদের মধ্যে মতভেদ নাই।

কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন আচার্য্যদের এই সকল মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা সর্বত্রই বিরোধ দেখিয়াছেন। বেদের কর্ম-কাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদের, উপনিষদের সহিত পুরাণের, বেদের সহিত মনুসংহিতার, সর্বত্র বিরোধ ও অসামঞ্জস্য দেখিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কর্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের যে বিরোধের কথা তাঁহারা বলিয়াছেন সে বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনাণ্ড বলিয়াছেন—উপনিষদগুলি বেদের ব্রাহ্মণভাগের অংশ হইলেও তাহাদের মধ্যে যে নূতন ধর্ম দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কার্য্যতঃ যজ্ঞ ধর্মের বিপরীত * অর্থাৎ উপনিষদের ধর্ম কর্মকাণ্ডের বিপরীত। কিন্তু তিনি ইহা বুঝিলেন না যে কর্মকাণ্ড উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার সোপান। সোপান এবং ছাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ কর্মকাণ্ড ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে সেই সম্বন্ধ।

ডাঃ ভিন্‌টারনিট্‌স্ বলিয়াছেন, যে সময়ে ব্রাহ্মণরা বৃথা যজ্ঞধর্মের চর্চ্চা করিতেছিলেন সেই সময়ে অন্যেরা সেই সব গভীর প্রশ্নের আলোচনা করিতেন যেগুলি উপনিষদে অতি সুন্দরভাবে মীমাংসিত হইয়াছে † অর্থাৎ যাঁহারা যজ্ঞ করিতেন এবং যাঁহারা উপনিষদের জ্ঞানের চর্চ্চা করিতেন তাঁহারা ভিন্ন দলের লোক। কিন্তু তিনি ইহা ভুলিয়া গেলেন যে জনক রাজার যজ্ঞসভায় বসিয়াই যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষি জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াছিলেন (বৃহদারণ্যক উপনিষদ); চক্রায়ণ উষস্তি ঋষিও রাজার যজ্ঞে গিয়া জ্ঞানের কথা বলেন এবং পুরোহিতরূপে বৃত হন (ছান্দোগ্য); যমরাজা নচিকেতাকে আগে যজ্ঞ করিতে শিক্ষা দেন পরে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন; তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলিয়াছেন যজ্ঞ শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি যত্নপূর্বক অনুষ্ঠান করা উচিত (দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং), বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলিয়াছেন ব্রাহ্মণগণ অনাশক্ত ভাবে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা করিয়া

* History of Sanskrit Literature p. 215
† History of Sanskrit Literature, p. 231

ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করে (তমেব ব্রাহ্মণাবিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভিন্ন দেশের লোক, তাঁহাদের ভাষা ভিন্ন, ধর্ম ভিন্ন, তাঁহাদের এরূপ ভুল হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের এই সকল ভিত্তিহীন উক্তির প্রতিধ্বনি করিতেছেন দেখিয়া আমাদের বিস্ময় ও ক্ষোভের সীমা থাকে না। অধ্যাপক হিরিয়ান্না লিখিয়াছেন—উপনিষদের মূল ভাব যজ্ঞধর্ম হইতে ভিন্ন,—এমন কি তাহার বিরোধী এবং তাহাতে বিশ্ব সম্বন্ধে যে মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্নিহিত মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।* অর্থাৎ উপনিষদের শিক্ষা যজ্ঞের বিরোধী। এই উক্তির সমর্থনে তিনি একটি মাত্র উপনিষদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, "প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ" (মুণ্ডকোপনিষদ)। এই শ্লোকটিতে কেবল ইহাই বলা হইয়াছে যে যজ্ঞের দ্বারা মোক্ষ লাভ করা যায় না। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডেও ত একথা বলা হয় নাই যে যজ্ঞ দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। কর্ম্মকাণ্ডে ইহাই বলা হইয়াছে যে যজ্ঞদ্বারা স্বর্গ লাভ হয় (স্বর্গকামো যজেত)। মুণ্ডকের এই বাক্যের সহিত তাহার বিরোধ কোথায়? মুণ্ডকের যে অধ্যায়ে এই বাক্য পাওয়া যায় তাহার গোড়াতেই বলা হইয়াছে, যে যজ্ঞ সকল সত্য, তাহার পর বলা হইয়াছে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত (তান্যাচরথ নিয়তং) তাহার পর বলা হইয়াছে যে যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হয় (নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বা)। সুতরাং বিরোধ কিছু নাই। পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের অনুসরণকারী ভারতীয় পণ্ডিত যজ্ঞে বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের সেই অবিশ্বাস তাঁহারা উপনিষদের ঋষিদিগের প্রতি আরোপ করিয়াছেন মাত্র। পুনশ্চ স্যার রাধাকৃষ্ণণও উপনিষদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—লোকে ভ্রান্তিবশে যে দেবতাদের পূজা করিয়াছিল তাহাদের সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া বিশ্বরহস্যের চিন্তা আরম্ভ করিল।† ইহার তাৎপর্য্য এই যে উপনিষদের ঋষিগণ ভাবিতেন যে বেদের সংহিতা অংশের ঋষিগণ অজ্ঞতাহেতু অনেক দেবতার কল্পনা করিতেন। উপনিষদে কি স্যর রাধাকৃষ্ণের এই মতের বিন্দুমাত্র

*:Outtines of Indian Philosophy, p, 48.
† Indian Philosophy, V. I, P. 71.

সমর্থন পাওয়া যায়? প্রত্যেক উপনিষদেই দেবতাদের কথা আছে, ঈশ্বর যেরূপ মনুষ্য পশু পক্ষী সৃষ্টি করিয়াছেন সেইরূপ দেবতাও সৃষ্টি করিয়াছেন। পুনশ্চ স্যর রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন আদিম বহু দেবতা পূজা (Polytheism) হইতে বহুদূর অগ্রসর হইলে তবে সুসম্বন্ধ দার্শনিক মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়* অনেক দেবতার কথা আছে বলিয়া যদি কর্ম্মকাণ্ড (Polytheism) হয় তাহা হইলে উপনিষদও Polytheism কারণ উপনিষদেও সর্ব্বত্র বহু দেবতার কথা আছে। এক সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা উপনিষদে আছে, সত্য। কিন্তু ঋগ্বেদ সংহিতাতেও এক সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা অনেক স্থলে আছে। যথা নাসদীয় সূক্ত, হিরণ্যগর্ভসূক্ত, পুরুষসূক্ত)। যজ্ঞ করিয়া স্বর্গে চলিয়া যায় (কর্মকাণ্ডের কথা) এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে মুক্তি হয় (জ্ঞানকাণ্ডের কথা), এই দুই উক্তি যে পরস্পর বিরোধী ইহা কোন্ তর্কশাস্ত্র অনুসারে প্রতিপাদিত হয়?

আমি অধ্যাপকগণের নিকট নিবেদন করিতেছি যে বিখ্যাত য়ুরোপীয় পণ্ডিতের উক্তি বলিয়াই তাঁহারা যেন তাহা অবিচারে গ্রহণ না করেন, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যরা কি বলিয়াছেন তাহাও যেন শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে আলোচনা করেন, এই আচার্য্যরা দীর্ঘকাল (কেহ কেহ আজীবন) ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া, শান্তসংযত হৃদয়ে বৈদিক সত্য উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহাদের পবিত্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ছাত্রদের নিকট আবেদন করিতেছি তাঁহারা যে অমূল্য প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, তাহা যেন যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রচার করিবার ব্রত গ্রহণ করেন, শঙ্কর রামানুজ ব্যাস বাল্মীকির সহিত তাঁহাদের যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে বৈদেশিক সভ্যতার আক্রমণে তাহা যেন ছিন্ন না হয়।

* Op. Cit., P. 72.

দেশ কি আমাসাপেক্ষ?

শ্রীশুকদেব সেন, এম. এ

[দর্শনের প্রথম সংখ্যায় (কার্ত্তিক, ১৩৪৮ সাল) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'দেশবিচার' নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তাহারই সমালোচনা করা হইয়াছে।—সম্পাদক]

গত কার্ত্তিক সংখ্যার 'দর্শনে' শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার সুচিন্তিত 'দেশবিচার' নামক প্রবন্ধে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে দেশ 'আমা সাপেক্ষ' ও 'কেবলনিশ্চয়ের' বিষয়। কালিদাসবাবু অনেক বিচার করিয়া তাহার সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। তাহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। শুধু তাহার প্রদর্শিত কয়েকটী যুক্তি সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করিব।

'দেশ আমাসাপেক্ষ' ইহা সিদ্ধ করিতে কালিদাসবাবু সাতটী প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। প্রথম প্রমাণে কালিদাসবাবু বলিয়াছেন "জগতের অন্তর্গত দুই পদার্থের বহিঃসত্তা পারস্পরিক বা উভয়মুখী. জগতের বহিঃসত্তা কিন্তু একমুখী। জগৎ আমার বাহিরে বলিলে আমিও যে জগতের বাহিরে এমন কথার সূচনা নাই।......জগৎ আমার বাহিরে, কিন্তু আমি জগতের বাহিরে নাই, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে যাবতীয় জাগতিক পদার্থ যে অসীম প্রসার দেশে বিদ্যমান আমার সত্তাকে উপেক্ষা করিলে তাহার পদার্থত্বই থাকে না।" (পৃঃ ৫৪)। সুতরাং দেশ আমা সাপেক্ষ। প্রথম প্রমাণের মূল কথা 'জগৎ আমার বাহিরে কিন্তু আমি জগতের বাহিরে নাই' এই বাক্যটীর অর্থ ভাল করিয়া বুঝা দরকার। এই বাক্যটীতে ব্যবহৃত 'আমি' 'জগৎ' ও 'বাহিরে' এই তিনটী শব্দের কি অর্থ হইতে পারে বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ 'আমি' শব্দ দ্বারা একটী বিশেষ দেহ বা দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা বুঝা যাইতে পারে। আমি শব্দ দ্বারা "দেহ অভিপ্রেত নয়" এ কথা কালিদাসবাবু স্পষ্টই বলিয়াছেন। দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা অভিপ্রেত কিনা তাহা অবশ্য বলেন নাই। ধরিয়া

নিতেছি এখানে 'আমি' শব্দের অর্থের সঙ্গে দেহের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং 'আমি' শব্দের অর্থ এখানে হইতে পারে নিরবচ্ছিন্ন আত্মা বা জ্ঞাতা। কোন কোন মতে (যথা ন্যায় মতে) আত্মা সর্ব্বব্যাপী বা বিভু। আত্মা যদি সর্ব্বব্যাপী হয় তবে জগৎ বা কোন কিছুই আত্মার বাহিরে, অর্থাৎ আত্মা যেখানে নাই সেইখানে আছে, এমন কথা বলা যায় না। সুতরাং এইরূপ সর্ব্বব্যাপী আত্মা ও 'আমি' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ হইতে পারে না। অতএব ধরিয়া নিতেছি 'আমি' শব্দের অর্থ এখানে শুধু 'জ্ঞাতা', অন্য কিছু নয়। এখন দেখা যাক 'বাহিরে' শব্দের কি অর্থ হইতে পারে। 'ক খ এর বাহিরে'—ইহার এক অর্থ হইতে পারে ক ও খ ভিন্ন স্থানে বা দেশে অবস্থান করে। 'একটী টেবিল একটী চেয়ারের বাহিরে' ইহার অর্থ টেবিলটী ও চেয়ারটী বিভিন্ন স্থান বা দেশ জুড়িয়া আছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এইরূপ অর্থ 'বাহিরে' শব্দ শুধু সেই সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা চলে যেখানে পদার্থ দুইটীর উভয়ই দেশে থাকে বা থাকিতে পারে। কিন্তু পদার্থ দুইটীর অন্ততঃ একটীও যদি এমন হয় যে তাহার সম্বন্ধে দেশে থাকা না থাকার প্রশ্নই ওঠে না, তাহা হইলে সেখানে উপরোক্ত অর্থে 'বাহিরে' শব্দটী ব্যবহার করা চলে না। যেমন 'ন্যায়পরায়ণতা' দেশে থাকে কি থাকে না, এই প্রশ্ন ওঠে না, সুতরাং 'টেবিলটী ন্যায়পরায়ণতার বাহিরে' কিম্বা 'ন্যায়-পরায়ণতার বাহিরে টেবিল' এইরূপ কোন কথাই বলা চলে না। আমরা 'আমি' শব্দের অর্থ ধরিয়া নিয়াছি শুধু 'জ্ঞাতা'—যে জ্ঞাতা সম্বন্ধে দেহে থাকা না থাকার, সর্ব্বদেশে বা কোনদেশেই থাকা না থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং এইরূপ জ্ঞাতা সম্পর্কেও উপরোক্ত অর্থে, অর্থাৎ ভিন্ন স্থানে অবস্থান অর্থে 'বাহিরে' শব্দটী ব্যবহার করা চলে না। অতএব 'আমার বাহিরে জগৎ' বা 'জগতের বাহিরে আমি' ইত্যাদি বাক্যগুলিকে অর্থপূর্ণ বলিয়া ধরিতে হইলে 'বাহিরে' শব্দটীকে অন্য কোন অর্থে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

'জগৎ' শব্দটীর কি অর্থ হইতে পারে তাহাও এখন দেখা দরকার। জগৎ শব্দের এক অর্থ হইতে পারে 'যাহা কিছু সদ্‌বস্তু আছে তাহার সমষ্টি বা সমগ্র।' এখন প্রশ্ন এই যে এই সমষ্টি বা সমগ্রের ভিতরে

'আমার' ও অন্তর্ভাব হইয়াছে কিনা? যদি ধরা হয় এই সমগ্রের ভিতরে আমার বা জ্ঞাতার অন্তর্ভাব আছে, তবে বলিতে হইবে: এই সমগ্রও আমাকে বাদ দেয় নাই, আমিও সমগ্রকে বাদ দেই নাই। অর্থাৎ সমগ্র বা জগতের বাহিরেও আমি নই, আমার বাহিরেও জগৎ নাই। এখানে বাহিরে শব্দটী কোন দৈশিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এখানে বাহিরে অর্থ ভিন্ন। আর যদি ধরা হয় সমগ্রের ভিতরে আমার অন্তর্ভাব নাই, তবে বলিতে হইবে সমগ্র ও আমি ভিন্ন। অর্থাৎ 'সমগ্র' ও 'আমি' পরস্পর পরস্পর হইতে ভিন্ন। সুতরাং এই অর্থে সমগ্র বা জগৎ আমার বাহিরে বা আমা হইতে ভিন্ন, এবং আমিও সমগ্র বা জগতের বাহিরে অর্থাৎ জগৎ হইতে ভিন্ন। কিন্তু এই অর্থেও আমার বাহিরে জগৎ কিন্তু জগতের বাহিরে আমি নাই' একথা বলা চলে না। জগৎ শব্দের অন্য এক ব্যাখ্যা হইতে পারে 'জ্ঞেয়' অর্থে। এই অর্থে জগৎ শব্দের ভিতরে সমষ্টি বা সমগ্রের কোন ইঙ্গিত নাই। জগৎ শব্দের অর্থ এখানে 'যাহা জানা যায়', জ্ঞেয় বা দৃশ্য, আর 'আমি' শব্দের অর্থ যে জানে, জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা। কোন কোন জ্ঞেয় পদার্থ স্থানে বা দেশে থাকিলেও জ্ঞাতার সম্বন্ধে কোন দেশে থাকা না থাকার প্রশ্ন ওঠে না, ইহা আমরা ধরিয়া নিয়াছি। সুতরাং 'বিভিন্নস্থানে অবস্থান করা' অর্থে বাহিরে শব্দটী জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধে ব্যবহার করা চলে না। এখানেও আমাদের মনে হয় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধে 'বাহিরে' শব্দটী ব্যবহার করিতে হইলে 'ভিন্ন' অর্থেই ব্যবহার করা চলে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়েব মধ্যে অন্যোন্যাভাব বা ভেদ বর্ত্তমান। অর্থাৎ জ্ঞাতা জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন, এবং জ্ঞেয় জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন। কিন্তু তাহা হইলে বলিতে হয় জ্ঞেয় অর্থাৎ জগৎ যেমন জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ আমার বাহিরে, ঠিক তেমনি জ্ঞাতা। অর্থাৎ আমিও জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন অর্থাৎ জগতের বাহিরে। সুতরাং এইরূপ ব্যাখ্যায়ও 'আমার বাহিরে জগৎ কিন্তু জগতের বাহিরে আমি নাই' কালিদাসবাবুর এই কথার উপপত্তি হয় না। তাহার পরে এই কথার উপপত্তির জন্য যদি বা কোন যুক্তিতে ধরিয়া নেওয়া যায় যে জ্ঞাতা হইতে জ্ঞেয় ভিন্ন হইলেও জ্ঞেয় হইতে জ্ঞাতা ভিন্ন নয় (জগতের বাহিরে আমি নাই), তাহা হইলেও ইহা হইতেই কি করিয়া প্রমাণ হয় যে দেশ নামক জ্ঞেয় পদার্থ আমা সাপেক্ষ তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

কালিদাস বাবু দ্বিতীয় প্রমাণে বলিয়াছেন “আমার বহিঃস্থ কোন বস্তুকে আমরা ঐ বস্তু বলিয়া বুঝি। ‘ঐ’ শব্দটীর অর্থ হইল কোন পূর্বনির্দিষ্ট বস্তু হইতে বর্ত্তমানে জ্ঞাত বস্তুটীর স্থান নির্দ্দেশ। কিন্তু কোন্ পূর্বনির্দিষ্ট বস্তু হইতে? যাহাই উল্লেখ করা যাইবে তাহাও একটী ‘ঐ বস্তু’।” কালিকাস বাবুর মতে দেহ ও পূর্বনির্দিষ্ট বস্তু নয়, কারণ দেহের ও “বিশেষণরূপে ‘ঐ’ শব্দটীর ব্যবহার করিতে হইবে।” “আত্মাই সেই প্রথমতম পদার্থ, আত্মা হইতে নির্দ্দেশেই বহিঃসত্বের বা দেশের বোধ। অতএব দেশ আমা-নির্ম্মাণ।” (পৃঃ ৫৫) প্রথম প্রমাণের আলোচনা প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন তুলিয়াছিলাম এখানেও প্রথমে আমাদের সেই প্রশ্ন। “আমার বহিঃস্থ বস্তু” বলিতে কি বুঝিব? সাধারণ অর্থে বুঝা যায় ‘আমি যে দেশে নাই সেই দেশে বর্ত্তমান বস্তু।’ আমি বা আমার শব্দের অর্থের সঙ্গে দেহের কোন সম্বন্ধ নাই এ কথার ইঙ্গিত কালিদাস বাবুর দ্বিতীয় প্রমাণেও আছে। আমি শব্দের দ্বারা যদি বিশুদ্ধ জ্ঞাতা হিসাবে আত্মা বুদ্ধি, তবে এই আত্মা সম্বন্ধে কোন দেশে থাকা না থাকার প্রশ্ন উঠে না, ইহাও আমরা ধরিয়া নিয়াছি। আমি শব্দের এইরূপ অর্থ ধরিলে “আমার বহিঃস্থ” বলিতে কি অর্থ প্রকাশ হয়, আমরা বুঝি না। আমাদের ধারণা, যে বস্তু স্বয়ং স্থানে বা দেশে থাকে না, তাহাকে অবধি করিয়া অন্য কোন বস্তুর স্থান নির্দ্দেশ করা যায় না। আমরা এইরূপ ব্যাপ্তি নিতে পারি যে কোন একটী প্রথম বস্তুকে অবধি করিয়া কোন একটী দ্বিতীয় বস্তুর স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে প্রথম বস্তুটীকে স্থানে থাকিতেই হইবে। দৃশ্যমান জগতে ইহার উদাহরণের অভাব নাই, কিন্তু ইহার ব্যভিচার আছে বলিয়া আমরা জানি না। জ্ঞাতা বা আত্মা এখানে সন্দিগ্ধস্থল, সুতরাং উহার উল্লেখ অগ্রাহ্য। আমাদের এই ব্যপ্তি ঠিক হইলে আত্মা হইতে নির্দ্দেশে কোন বস্তুর স্থান নির্দ্দেশ হয়, এ কথা বলা চলে না।

সাধারণতঃ ‘ঐ বস্তু’ বলিতে আমরা বুঝি ‘যাহা এই বস্তু নয়।’ যে বস্তুটী দেহের কাছে তাহাকে ‘এই বস্তু’ বলিয়া বুঝি, এবং যেটী দেহ হইতে দূরে তাহাকে ‘ঐ বস্তু’ বলিয়া বুঝি। এইরূপে ‘সম্মুখে’, ‘পিছনে’, ‘দক্ষিণে’, ‘বামে’ প্রভৃতি বলিতে ও আমরা কোন একটী দেহের সম্মুখে,

পিছনে, দক্ষিণে, বামে এইরূপ ভাবেই বুঝি। দেহ সম্পর্কবিহীন দেশ-বিহীন বিশুদ্ধ জ্ঞাতার কাছে বা দূরে, সম্মুখে বা পিছনে বলিতে কি অর্থ বুঝা যায় তাহার স্পষ্ট ধারণা আমাদের হইতেছে না।

দেহ হইতে দূরের বস্তুকেই আমরা 'ঐ বস্তু' বলি, দেহকেও 'ঐ বস্তু' বলিয়া সাধারণতঃ আমাদের বোধ হয় না। দেহ এবং দেহাতারিক্ত সব বস্তুকেই 'ঐ বস্তু' বলিয়া বুঝি—এইরূপ কথার উপপত্তি হয় যদি আমরা 'ঐ'এর ব্যাখ্যা করি আমাভিন্ন' বা 'জ্ঞাতা ভিন্ন' অর্থে। 'ঐ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন' ধরিলে বলা চলে আমি বা জ্ঞাতা যাহা কিছু জানে সবকিছুকেই আমা বা জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন বলিয়া বা 'ঐ' বলিয়া জানে। কিন্তু এখানে 'ঐ' শব্দের অর্থ শুধু 'ভেদ', দৈশিক বহিঃসত্তা নয়। তার-পরে একথাও বলা চলে না যে যাহা কিছু জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন পদার্থ বা জ্ঞেয় হইবে তাহা দৈশিকও হইবে, কারণ সুখদুঃখই বহু পদার্থকে সাধারণতঃ জ্ঞেয় বলিয়া স্বীকার করা হয়, কিন্তু সে গুলিকে সব সময় দৈশিক বলা চলে না। অবশ্য যদি প্রথমেই ধরিয়া নেওয়া হয় যে যাহা দেশে থাকে শুধু তাহাকেই 'জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন' বা জ্ঞেয় বা 'ঐ' বলিব তবে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

তৃতীয় প্রমাণে কালিদাস বাবু যে সব কথা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ-রূপে আমি বুঝিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় তৃতীয় প্রমাণটীর মূলে রহিয়াছে জ্ঞান সম্বন্ধে একটী বিশেষ মতবাদ। মতটী এই যে, কোন একটী বস্তুর জ্ঞানে যে সব গুণ বা ধর্ম্মকে আমরা সাধারণতঃ ঐ বস্তুনিষ্ঠ বলিয়া মনে করি প্রকৃতপক্ষে উহারা ঐ বস্তুনিষ্ঠ নহে, উহারা জ্ঞাননিষ্ঠ। যেমন রক্তপুষ্পের জ্ঞানে "যে রক্তবর্ণকে সচারাচর বহিঃস্থ পুষ্পেরই আকার বলা হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই আকার" (পৃঃ ৪১)। এখন সমস্যা এই যে, রক্তবর্ণ যদি বস্তুতঃ আমার জ্ঞানেরই আকার হয় তবে তাহাকে বহিঃস্থ পুষ্পের আকার বলিয়া বোধ হয় কেন? এই সমস্যার সমাধানে কালিদাস বাবু বলিয়াছেন যে আমা নিরপেক্ষ বস্তু "আমা সাপেক্ষ দেশে প্রকাশমান" হয় বলিয়া বস্তুটী রক্তাকার বলিয়া বোধ হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য দেশকে আমাসাপেক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং দেশ আমাসাপেক্ষ।

তৃতীয় প্রমাণটী বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দুইটী প্রশ্ন মনে হয় ; যে সব ধর্ম্মকে বস্তুনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়, তাহার সমাধানের জন্য দেশকে আমাসাপেক্ষ স্বীকার করা প্রয়োজন কি না ; দ্বিতীয়, যে সমস্যার সমাধানের জন্য দেশকে আমাসাপেক্ষ স্বীকার করা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, ঐ সমস্যাটীই আদৌ কোন বাস্তব সমস্যা কিনা ? এই সমস্যাটীই ঠিক বাস্তব সমস্যা নয় বলিয়া আমরা সন্দেহ করি, কারণ যে সব কথা মানিয়া নিলে এই সমস্যার সৃষ্টি হয় সেই সব কথা মানিয়া নেওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে হয় না।

এ কথা সাধারণতঃ সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যে সকল জ্ঞান আমাদের হয় বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ যে সকল জ্ঞানের অনুব্যবসায় হয়, সে সকল জ্ঞানই সবিকল্পক। অর্থাৎ যখন কিছু জানি, একটা কিছুকে একটা কিছুভাবেই জানি। যেমন একটী ফুলকে লাল বলিয়া জানি। বা একটী বস্তুকে ফুল বলিয়া জানি, অথবা অন্ততঃপক্ষে একটা কিছুকে 'আছে' অর্থাৎ সত্তাবান বা অস্তিত্ববান বলিয়া জানি। এই সব ক্ষেত্রে যাহাকে জানি তাহাকে বিশেষ্য বা উদ্দেশ্য বলা যায়, আর যেভাবে তাহাকে জানি (যেমন 'লাল' ভাবে বা 'ফুল' ভাবে) তাহাকে বিশেষণ বা বিধেয় বলা যায়। আমাদের ধারণা এই যে কোন বিশেষ্যকে যখন কোন বিশেষণ বিশিষ্ট বলিয়া জানি, বিশেষণটী তখন ঐ বিশেষ্যেরই ধর্ম্ম। যে ক্ষেত্রে বিশেষণটী সত্যই বিশেষ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম নহে, সে ক্ষেত্রকে আমরা অপ্রমা বা ভ্রান্তির স্থল বলিয়া থাকি। কালিদাসবাবু বলিতে চান যে কোন স্থলেই বিশেষণটী প্রকৃতপক্ষে বিশেষ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম নহে ; বিশেষণটী প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানেরই আকার। কালিদাসবাবুর মতে রক্তপুষ্পের' জ্ঞানে রক্তবর্ণটি বস্তুনিষ্ঠ নহে, জ্ঞাননিষ্ঠ। একটী পুষ্পকে রক্ত বা নীলভাবে না জানিয়া শুধু পুষ্প হিসাবেও জানিতে পারি। এই ক্ষেত্রে, অর্থাৎ 'পুষ্পত্ববিশিষ্ট পুষ্প' এইরূপ জ্ঞানেও তাহা হইলে বলিতে হয় পুষ্পত্ব নামক জাতি বা ধর্ম্মটীরও প্রকৃত আশ্রয় জ্ঞান, বস্তু নয়। আবার একটী বস্তুকে পুষ্পভাবে না জানিয়া শুধু 'আছে' বা 'সত্তাবান' ভাবেও জানিতে পারি। এ ক্ষেত্রেও তাহা হইলে অনুরূপ যুক্তিতে স্বীকার করিতে হইবে যে 'সত্তা'

বা 'অস্তিত্ব' ও বস্তুর ধর্ম্ম নয়, উহাও প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠ। এখন আমাদের প্রশ্ন এই যে, এইরূপ আমানিরপেক্ষ বস্তুটী তাহা হইলে কি রকম পদার্থ? সকল প্রকার গুণবিহীন, ধর্ম্মবিহীন, সত্তা বা অস্তিত্ববিহীন পদার্থের কল্পনায় ও শূণ্যের কল্পনায় কি পার্থক্য আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এইরূপ আমানিরপেক্ষ বস্তুর কল্পনা যদি শূণ্যের কল্পনাই হয়, তবে একটী শূণ্য আমাসাপেক্ষ দেশে প্রকাশিত হইয়া আমাপ্রদত্ত ধর্ম্মাদি গ্রহণ করে, ইত্যাদি কথার অর্থ কি হয় আমরা ঠিক বুঝিতেছি না।

আমাদের ধারণা জ্ঞানের আকার বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা বস্তুতঃ বিষয়েরই আকার। রক্তাকার বা নীলাকার জ্ঞানের অর্থ রক্তবিষয়ক বা নীলবিষয়ক জ্ঞান; জ্ঞানটী নিজেই রক্তবর্ণ বা নীলবর্ণ নয়। কালিদাসবাবু বলিতে চান জ্ঞানের আকার ভিন্ন বিষয়ের কোন আকার নাই। কিন্তু অনেকে ইহার ঠিক বিপরীত কথা বলিতে পারেন যে বিষয়ের আকার ভিন্ন জ্ঞানের কোন আকার নাই। অন্ততঃ একথা ঠিক যে কালিদাসবাবুর মতটী সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ হইতে পারে; সুতরাং এই মতটা যাহারা মানিতে রাজী নহেন তাহারা এই মতটীর উপর নির্ভরশীল বলিয়া, কালিদাসবাবুর তৃতীয় প্রমাণটাও গ্রহণযোগ্য মনে করিবেন না।

চতুর্থ প্রমাণ। আমি যতদূর বুঝিয়াছি (অবশ্য আমি ভুল বুঝিতে পারি) তাহাতে মনে হয় কালিদাসবাবুর চতুর্থ প্রমাণটী অনেকটা তাহার তৃতীয় প্রমাণের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং এ সম্বন্ধে পৃথকভাবে আর কিছু বক্তব্য নাই।

পঞ্চম প্রমাণ। এই প্রমাণে তিনি বলিয়াছেন "আমার দক্ষিণ হস্তখানি একখানি দর্পণের সম্মুখে ধরিলে উহাকেই বামহস্তরূপে দেখি। যেহেতু উহাকেই বামহস্তরূপে দেখি—এইরূপ প্রতীতি হয়, অতএব বলিতে হইবে যে দক্ষিণ ও বামের প্রভেদ, অর্থাৎ দেশগত প্রভেদ বস্তুর স্বরূপ নহে।" (পৃঃ ৫৭)

এই প্রমাণের মূলে কোন গভীর তত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে, কিন্তু ঐরূপ কিছু থাকিলেও আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। একখানা বড় আয়নার সামনে মুখামুখি না দাঁড়াইয়া যদি আয়নার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়ান যায়, এবং একটু কষ্ট করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দেখা যায়, তাহা হইলে

দেখা যাইবে, বাম হাতখানা বাম হাতই রহিয়াছে, আয়নার ভিতরে উহাকেই ডান হাত বলিয়া মনে হইতেছে না। আয়নার সামনে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে বিম্বের বামহাত ও প্রতিবিম্বের বামহাত যে বিপরীত দিকে থাকে তাহার গোড়ার রহস্য শুধু এই-ই যে বিম্বের ও প্রতিবিম্বের মুখ তখন বিপরীত দিকে ঘুরান থাকে। বিম্বের ও প্রতিবিম্বের মুখ বিপরীতদিকে ঘুরান থাকিলেও বিম্বের বামহাত যে দিকে থাকিবে, প্রতিবিম্বের বামহাতও কেন সেইদিকেই থাকিবে না। অথবা, আমি ও যদি মুখামুখি দাঁড়াই, তবে আমার বামহাতখানা যেদিকে থাকিবে তোমারও সেইদিকস্থ হাতখানিই কেন বামহাত হইবে না। অথবা, আমি পূব দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে উত্তরদিকস্থ হাতখানা যদি আমার বামহাত হয়, তবে আমি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলেও আমার বামহাতখানা কেন উত্তর দিকেই থাকিবে না,—এই সবগুলিই মূলতঃ আমার কাছে একই প্রশ্ন বলিয়া মনে হয়। আমরা যেই যখন যেদিকেই ঘুরিয়া দাঁড়াই না কেন, আমাদের সকলের বাম হাত ও ডানহাত সব সময়ই একদিকে থাকিবে এ কথা বলা চলিত, যদি কম্পাসের কাঁটায় আমাদের বামহাত ও ডানহাতগুলি সব সময়ই একটা দিক বিশেষের দিকে সংলগ্ন থাকিত। কিন্তু আমাদের হাতগুলিও কম্পাসের কাঁটার মত ঘোরে না, বা দিকগুলিও আমাদের গতির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া দাঁড়ায় না। আমরা যে দিকেই ঘুরিয়া দাঁড়াই না কেন, পূব দিক পূব দিকই থাকিবে, উত্তর দিক উত্তর দিকই থাকিবে। শুধু আমার হাত, অর্থাৎ আমার দেহের অঙ্গ বিশেষ কোনদিকে থাকিবে, তাহাই আমার ঘোরার উপর নির্ভর করে। সুতরাং বুঝা যায় দিকের অবস্থিতি আমাদের দেহের ঘুর্ণন সাপেক্ষ নয়, আমাদের দেহের অঙ্গবিশেষের অবস্থিতিই আমাদের দেহের ঘুর্ণন সাপেক্ষ। সুতরাং দিক আমাসাপেক্ষ ইহা প্রমাণ হয় না। তাহা ছাড়া, অনেকে মনে করেন দিকের কল্পনা ও দেশের কল্পনা ঠিক এক নয়। তাহারা বলিবেন কোন যুক্তিতে দিক আমাসাপেক্ষ প্রমাণিত হইলেও ঐ যুক্তিতেই দেশও আমাসাপেক্ষ ইহা প্রমাণিত হয় না। আর বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, এই পঞ্চম প্রমাণে কালিদাস বাবু 'আমি' বা 'আমার' প্রভৃতি শব্দ যে ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে এই শব্দগুলি দ্বারা

'আত্মা' বা 'বিশুদ্ধ জ্ঞাতা'কে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই পঞ্চম প্রমাণের 'আমি' বা 'আমার' শব্দ কোন দেহবিশেষকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং পঞ্চম প্রমাণটীকে মানিয়া নিলেও ইহা দ্বারা দেশ শুধু দেহসাপেক্ষ ইহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু ইহা প্রমাণ করা কালিদাসবাবুর উদ্দেশ্য নয়।

ষষ্ঠ প্রমাণ। ষষ্ঠ প্রমাণে কালিদাস বাবু বলিয়াছেন, দেশ আমা-সাপেক্ষ কারণ "দেশের অপরোক্ষ প্রতীতি ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে"। "যাহার অপরোক্ষ প্রতীতি ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে তাহাকে আমানিরপেক্ষ বলা যায় না।" (পৃঃ ৫৭) "দেশের অপরোক্ষ প্রতীতি ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে" এই কথাটীর অর্থ বোঝা দরকার। প্রথমতঃ ইহার অর্থ হইতে পারে, দেশের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, কিন্তু সে জ্ঞান ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য নহে। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-জন্য এবং ইন্দ্রিয়াজন্য দুই রকম প্রত্যক্ষ জ্ঞান মানিতে হয়। কিন্তু ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কালিদাসবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তিনি ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষজ্ঞান মানিতে প্রস্তুত নহেন। অতএব স্বীকার করিতে হয়, যাহা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান নহে তাহা প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান নহে। সুতরাং 'দেশের অপরোক্ষ প্রতীতি ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে' না বলিয়া বলা উচিত দেশের অপরোক্ষ জ্ঞানই হয় না। তাহা হইলে যুক্তিটী দাঁড়ায় এইরূপ : 'দেশ আমাসাপেক্ষ, কারণ, দেশের অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। পরমাণু প্রভৃতি এমন কতবস্তুইত আছে যাহার প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় প্রত্যক্ষজ্ঞানের অবিষয় যত বস্তু আছে সকলই আমাসাপেক্ষ। একথা সাধারণতঃ কেহ স্বীকার করিবেন না, এবং মনে হয় কালিদাস বাবুরও ইহা বলা উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ বলা যাইতে পারে, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ছাড়াও প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে পারে। দেশ এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়। তাহা হইলে ব্যাপ্তিটী দাঁড়ায় এইরূপ : যাহা যাহা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় তাহাই আমাসাপেক্ষ। কিন্তু এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের উদাহরণ কোথায়? যুক্তির খাতিরে মনকে ইন্দ্রিয় না মানিলে সুখদুঃখাদির মানস প্রত্যক্ষকে এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের স্থল বলা যায়। কিন্তু দেশকে কি সুখদুঃখাদির সঙ্গে এক পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে? চক্ষুকর্ণাদি সকল ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকেও সুখদুঃখাদির যেমন

মানস প্রত্যক্ষ হয়, সকল বহিরিন্দ্রিয় ব্যতিরেকেও দেশের রূপ মানসই প্রত্যক্ষ হয় কি ? সুখদুঃখাদির সঙ্গে সম পর্য্যায়ভুক্ত করিলে দেশের আর দেশত্ব বা বহিঃসত্ত্ব থাকে না। এবং এইরূপ দেশ কিরূপ পদার্থ আমরা বুঝিতে পারি না। আর দেশ যদি এইরূপ মানস প্রত্যক্ষের বিষয় না হন, তাহা হইলে আমরা বলিব, বহিরিন্দ্রিয়ের অবিষয় এবং মানস প্রত্যক্ষের অবিষয় হইয়াও প্রত্যক্ষের বিষয় এইরূপ কোন পদার্থের প্রসিদ্ধি নাই। দেশ: সন্দিগ্ধস্থল, সুতরাং উহার উল্লেখ করা যাইতে পারে না। সুতরাং যাহা যাহা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় (অর্থাৎ মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়) তাহাই আমাসাপেক্ষ এই ব্যাপ্তি মানিয়া নিলেও ইহা দ্বারা দেশ আমাসাপেক্ষ ইহা সিদ্ধ হয় না।

পরিশেষে কেহ প্রশ্ন তুলিতে পারেন 'আমাসাপেক্ষ' বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারে কিনা ? 'আমার অর্থাৎ জ্ঞাতার অস্তিত্বের উপর যাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে, ইহাই যদি 'আমাসাপেক্ষ' কথার অর্থ হয়, তবে অনেকে কোন পদার্থেরই, অন্ততঃ ভ্রমপ্রত্যক্ষের বিষয় ভিন্ন অন্য কোন পদার্থেরই, আমাসাপেক্ষত্ব মানিতে প্রস্তুত নাও হইতে পারেন। যাহারা কোন পদার্থেরই আমাসাপেক্ষত্ব স্বীকার করেন না, তাহারা দেশের আমাসাপেক্ষত্বও স্বীকার করিবেন না। সুতরাং প্রথমে বিচারের দ্বারা আমাসাপেক্ষত্বের সিদ্ধি করা দরকার। কিন্তু এই সব বহু তর্ক সাপেক্ষ বিচারে প্রবেশ করা এখানে সম্ভব নয়।

দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ।

অনেক কাল পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, তাই লেখকের নাম স্মরণ হইতেছে না, তবে কথাটা কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ইহা বেশ মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন—"ভারতীয়দিগের একটা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য দর্শন শাস্ত্রে। অন্য দেশের লোকদিগকে যেরূপ চেষ্টা করিয়া—পড়াশুনা করিয়া দার্শনিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয় ভারতীয়দের ততটা আবশ্যক হয় না। দার্শনিক জ্ঞান ইহাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত। দর্শনশাস্ত্রের সংস্কার লইয়াই ইহারা জন্মগ্রহণ করে" ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের কোন রচনা লইয়া আমরা উল্লিখিত মতবাদের সত্যতা পরীক্ষা করিব। দর্শনশাস্ত্র বলিতে আমরা বেদান্ত সাংখ্য ন্যায় ইত্যাদিই বুঝিয়া থাকি।

যে বয়সে কবি "ছবি ও গান" রচনা করেন তখন বাংলা ভাষায় দর্শন শাস্ত্রের পুস্তক সুলভ ছিল না। সংস্কৃত ভাষায় বেদান্ত পড়িবার মত শক্তি ও সুবিধা তখন তাঁহার ছিল ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব "ছবি ও গানের" কবিতায় যদি কোন বেদান্ততত্ত্ব প্রকাশ পায় তবে কবির এই বেদান্ততত্ত্ব পরিজ্ঞান ভারতীয় জন্মের বৈশিষ্ট্য ইহা অস্বীকার করা যায় না।

কাব্যে দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি অন্যবিধ তত্ত্বের প্রবেশ পথ দুইটি। প্রথম পথ—কবিনিবদ্ধ ব্যক্তির পাণ্ডিত্য। কাব্যে বা নাটকাদিতে কবিরা যে সকল পাত্রের উল্লেখ করেন তাহাদিগের পরস্পর আলাপে কিংবা তাহাদিগের কাহারও স্বগত চিন্তায় দার্শনিক এবং অন্যপ্রকার তত্ত্বের প্রবেশ কাব্যে সম্ভব হয়। দার্শনিকতত্ত্বে ইহার উদাহরণ—চতুরঙ্গের জ্যেঠা মহাশয়।

দ্বিতীয় পথ—ব্যঞ্জনা। ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে; তবে উহার স্বরূপ বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়া রাখিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করিতে সুবিধা হইবে।

সাধারণতঃ কবি তাঁহার প্রবন্ধোপযোগী বিষয় সমূহই বর্ণনা করিয়া

থাকেন কিন্তু রচনার বৈচিত্র্য বশতঃ ক্বচিৎ উহা হইতে এমন বিষয়ও প্রকাশ পাইয়া থাকে যাহার সহিত প্রস্তাবিত বিষয়ের সম্পর্ক অতি দূর, হয়তো বা কিছুই নাই। এই নূতন অর্থই ব্যঙ্গ্যার্থ—ব্যঞ্জনার ফল।

অপর কথা এই যে বর্ণনীয় প্রকৃত বিষয়ের সহিত এই ব্যঙ্গ্যার্থের সম্পর্ক কোন অংশবিশেষে থাকিলেই চলে, সকল দিক হইতে উহার সহিত সম্বন্ধ নিষ্প্রয়োজন।

প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন এই ব্যঞ্জনাই কাব্যের জীবন, ব্যঞ্জনাহীন শব্দ ও অর্থ 'কাব্য' সংজ্ঞার অযোগ্য।

কোন ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশে লেখকের অভিসন্ধি থাকা এবং না থাকা উভয় প্রকারই সম্ভব; তবে কোথায় কিরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশ লেখকের উদ্দেশ্য তাহা ধরা পড়ে উহার রচনাভঙ্গীতে। অবশ্য ইহাও মানিতে হয় যে কবির যাহাতে অভিসন্ধি নাই এরূপ বিষয়ও ক্ষেত্রবিশেষে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। মেঘদূতের

দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্"

হইতে দিঙ্নাগাচার্য্যের প্রতি যে কটাক্ষ প্রকাশ পায় তাহা কালিদাস ইচ্ছাপূর্ব্বক করিয়াছেন কিনা তাহা বলা কঠিন। তথাপি

"নেত্রা নীতাঃ সততগতিনা যদ্বিমানগ্রভূমীঃ"

ইত্যাদি শ্লোকের ব্যঙ্গ্যার্থ যে তাঁহার নিতান্তই বিবক্ষিত ইহা বলা যায়।

বাচ্যার্থ সাধারণতঃ একরূপই হইয়া থাকে। লক্ষ্যার্থও প্রায় সেই রূপ। ব্যঙ্গ্যার্থ কিন্তু ঐ দুই প্রকার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। দেশ কাল প্রয়োজন ইত্যাদি নানা কারণে এবং পাঠকের নিজের অভিজ্ঞতা অনুসারে এক কথা হইতেই নানাবিধ ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকাশ সচরাচর হইয়া থাকে। এই পথে জাগতিক সমস্ত বিষয় এবং জগতের বাহিরে যদি কিছু থাকে তাহাও কবিদিগের অধিকারে আসে। ফলে, কাব্যশাস্ত্র সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার হয়।

তাই মহামনীষী আলঙ্কারিক বলিয়াছেন—

ন তচ্ছাস্ত্রং ন সা বিদ্যা ন তচ্ছিল্পং ন সা কলা।
ন যন্তবতি কাব্যাঙ্গমহো ভারো মহান্ কবেঃ॥

প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গদেশে অনেক বিখ্যাত দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহারা চিন্তার ফল প্রকাশ করিয়াছেন সংস্কৃত-ভাষায়। এজন্য বঙ্গভাষা দার্শনিক শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ হইতে পারে নাই। উল্লিখিত কারণে যথেষ্ট শব্দ সাহায্য না পাওয়ায় বাংলা কবিতায় দার্শনিক ভাব ব্যক্ত করিতে সাদৃশ্যই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

সাদৃশ্যের দ্বারা বস্তু ব্যঞ্জনায় একটি অসুবিধা আছে। সাদৃশ্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং পরিস্ফুট না হইলে উপমান এবং উপমেয় এই দু'য়ের একটির বর্ণনায় অন্যটি বুঝা সম্ভব হয় না।

দার্শনিকতত্ত্ব অলৌকিক। জাগতিক কোন বস্তুর সহিত তাহার ঐ প্রকার স্পষ্ট সাদৃশ্য আশা করা যায় না। অতএব বাংলা কবিতা হইতে দার্শনিক ভাবের ব্যঞ্জনা পাইতে হইলে শব্দের সাহায্যও আবশ্যক। যেখানে তাহা পাওয়া যাইবে না ঐজন্য সাদৃশ্যের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে সেখানে ভাবের প্রকাশও অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। আমরা ক্রমশঃ ইহা দেখাইব।

ব্যঞ্জনা প্রবন্ধগত বাক্যগত এমন কি পদ এবং পদের অংশগতও হইতে পারে। আমরা কবির "রাহুর প্রেম" কবিতায় ঐরূপে নানাবিধ ব্যঙ্গ্যার্থ এবং কিছু দার্শনিকতত্ত্বের ও অভিব্যক্তি দেখিতে পাই।

প্রেম সমানে সমানে হইয়া থাকে। উহার উত্তম পুষ্টি দেখিতে পাই 'মধুমতী'তে*। এইরূপ প্রেমের মাধুর্য্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া অসমান স্ত্রী-পুরুষে প্রেম জন্মিতেই পারে না অথবা তাহার উৎকর্ষ কম ইহাও মানা যায় না। রজনী ও শচীন্দ্রের ভালবাসা এই শ্রেণীর। ইহাতে দেখিতে পাই—মালাকরকন্যা অন্ধ রজনী চিকিৎসা প্রসঙ্গে উচ্চশিক্ষিত অবস্থাপন্ন ডাক্তার শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর এবং কয়েকটি অঙ্গুলির স্পর্শ একবার মাত্র পাইয়া তাহাকে এতই ভালবাসিয়া ফেলিল যে কেবল তাহারই ফলে শচীন্দ্রও রজনীর প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিল না।

একের নীরব প্রেম অপরকে কত গভীর ভাবে আবিষ্ট করিতে পারে রজনী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

* বঙ্গদর্শন ১২৮০ সাল জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রবল অনুরাগের ন্যায় তীব্র বিরাগও আকর্ষণের কারণ হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে আকৃষ্টব্যক্তির প্রেমও গভীর হইতে পারে এবং তাহা উল্লিখিত দুই প্রকার হইতে কোনরূপে অপকৃষ্ট নহে।

এই নূতন তত্ত্বের শিক্ষা পাই আমরা রাহুর প্রেমে। উহাই এই কবিতার প্রবন্ধগত ব্যঙ্গ্যার্থ। কেহ দরিদ্র অথবা কদাকার হইলে তাহার মনে যে প্রেম জন্মিতে পারে না কিম্বা সেই প্রেমের পাত্রও ঐরূপ কদাকার এবং দরিদ্র হইবে এমন নিয়ম নাই। অতএব রাহু বলিতে এখানে বুঝা যায় একজন কদাকার পুরুষ। এই রাহুর প্রণয়পাত্র সম্ভবতঃ সাহিত্যের নায়িকা অতএব সর্বথা অনবদ্যা। ইনি রাহুকে কোন মতেই আমল দিতে চাহেন না, তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করেন, তাড়াইয়া দিতে পারিলে বাঁচেন কিন্তু রাহু যথার্থ প্রেমিক, সে কোন প্রকারেই হাল ছাড়িতে প্রস্তুত নয়।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিবেন ইহা রসাভাস,* রস নহে। হউক রসাভাস, তাই বলিয়া এই প্রেমের মাধুর্য্য মর্য্যাদা কম ইহা মানিব না।

এই রাহুর পরিচয় দিতে কবি বলিয়াছেন—

"অনন্তকালের সঙ্গী আমি তোর
আমি যে রে তোর ছায়া"

রাহুর এই পরিচয়ের মধ্যেই আমরা দার্শনিক তথ্য দেখিতে পাই। রাহু পৃথিবীর ছায়া ইহা আজ সকলেই জানেন। বড় পৃথিবীর ছায়া যদি রাহু তবে ছোট এই পার্থিব দেহের ছায়াই বা রাহু হইবে না কেন? তাহা হইলে অনায়াসেই বলা যায়—তোমার আমার ছায়াও রাহু।

দার্শনিক দৃষ্টিতে ছায়াতত্ত্বের বিচার করিলে দেখিতে পাই উহা প্রতিবিম্বজাতীয় পদার্থ। উহার মূল বস্তু বিম্ব-প্রকৃতস্থলে পৃথিবী বা পার্থিব দেহ। উহা বাদ দিলে রাহুর এই ছায়ার কোন অস্তিত্বই থাকে না। এদিকে রাহু যেভাবে নিজের ভালবাসা ব্যক্ত করিতেছে তাহা প্রেমের পরাকাষ্ঠা। এক্ষণে স্বতন্ত্র অস্তিত্বহীন এই রাহুকে বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকিল বিম্ব ও প্রেম। ফলে দাঁড়াইতেছে—এই রাহুর প্রেম শুদ্ধ আত্মপ্রেম। কারণ, বেদান্ত মতে একমাত্রই আত্মাই সত্য, অন্য সমস্তই

* "রত্যৌ তথাহনুভয়নিষ্ঠায়াং" সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ।

প্রতিবিম্বজাতীয় কল্পিত বস্তু। আত্মপ্রেমই যে প্রেমের চরম তাহা বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত। তাই পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—

তৎপ্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈব মন্যার্থমাত্মনি।
অতস্তৎ পরমং তেন পরমানন্দতাত্মনঃ॥

অর্থাৎ আমি যে অন্যকে ভালবাসি তাহার মূলে রহিয়াছে আমার নিজের প্রতি ভালবাসা। কিন্তু নিজেকে যে ভালবাসি তাহার কোন কারণ নাই উহা স্বাভাবিক—হেতুনিরপেক্ষ এবং হেতুনিরপেক্ষ বলিয়াই উহা অবিনশ্বর, নিত্য। তাই বলিতেছিলাম আত্মপ্রেম প্রেমের পরাকাষ্ঠা। তাই আত্মদৃষ্টিতে উপাসনার এত মাহাত্ম্য। নিঃস্বার্থ প্রেম একটি কথার কথা মাত্র।

উপনিষদও বলিয়াছেন—ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি—আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি,—ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।

রাহু এবং তাহার প্রণয়পাত্র এইভাবে একাত্মা। সংসারে কিন্তু এককের স্থান নাই। ঐভাবে যে কোন ভালবাসা হইতে পারে আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। তাই উহা প্রকাশের জন্য চাই অন্যের - স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের অস্তিত্ব। এখন প্রশ্ন হয়—রাহু এবং তাহার আসল মূর্ত্তি একজাতীয়ই, পুরুষ ও স্ত্রী এই মিথুনভাব তাহাতে সম্ভব নহে, অতএব উল্লিখিত ব্যঙ্গ্যার্থ কল্পনা সম্ভব হয় কিরূপে? ইহার উত্তর আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি—ব্যঙ্গ্যার্থে আসলের সহিত সর্ব্বাংশে সাম্য নিষ্প্রয়োজন।

আমরা দেখিয়াছি এই পরম প্রেমের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় কবিতার "রাহুর প্রেম" এই সংজ্ঞা হইতে। এখন এই প্রেমের পরমত্ব বা চরম উৎকর্ষ কেন এবং ইহা যে ঔপনিষদ প্রেম তাহা বুঝিবার জন্য কবিতাটির বিভিন্ন অংশ আলোচনা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে একটি অপ্রিয় সত্য সভয়ে বলিতে চাই। তাহা এইরূপ—

বঙ্গভাষার নিজস্ব কোন দার্শনিক তত্ত্ব নাই। ইহাতে আমরা যেটুকু দার্শনিকতা পাই তাহা অন্য ভাষার প্রধানতঃ সংস্কৃতভাষার সম্পত্তি। সুতরাং

সেই ভাব প্রকাশ করিবার সামর্থ্য সংস্কৃতভাষায় যত বেশী বঙ্গভাষায় তাহা আশা করা যায় না। কারণ, ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশে বঙ্গভাষার একমাত্র অবলম্বন সাদৃশ্য কিন্তু সংস্কৃতভাষা সাদৃশ্য ব্যতীত স্বীয় শব্দ এবং তাহার লিঙ্গ-বচনাদির সাহায্যেও ঐ পথে অগ্রসর হয়।

দার্শনিকতত্ত্ব প্রকাশে সংস্কৃতভাষার এই অসাধারণ্য থাকায় আমরা প্রথমে এই কবিতাটির সংস্কৃত অনুবাদ উদ্ধার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে মূল অংশ হইতেই আমাদের বক্তব্য সমর্থন করিব।

উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছিলে প্রেম কখনও কথার দ্বারা আত্ম-প্রকাশ করে না কিংবা উহার দ্বারা প্রেমপাত্রের মর্য্যাদাহানি হয় না। উহা নীরবে এক ভাবেই বহিতে থাকে, সর্ব্বদাই উহা প্রণয়ীকে প্রণয়াস্পদের চরণে শরণাপন্ন করে। ইহা দেখাইতে বলা হইয়াছে—

আশ্লিষ্য পাদযুগলং স্থিতিমপ্যভিন্দন্
এবং চিরায় গতবাক্ ত্বয়ি সন্নিধাস্যে॥

কবির ভাষায়—কঠিন বাঁধনে চরণ ঘেরিয়া
চিরকাল তোরে রব আকড়িয়া
কঠিন লৌহ ডোর।
তুই তো আমার বন্দী অভাগিনী
রুধিয়াছি কারাগারে।
প্রাণের শৃঙ্খল পরায়েছি প্রাণে
দেখি কে খুলিতে পারে॥

কবিতাটি অপরিণত বয়সের রচনা। নতুবা তিনি বলিতেন এই বন্ধন: স্বর্ণ শৃঙ্খলের, লোহার শিকলের নহে।

সংস্কৃত ভাষায় 'জাতরূপ' শব্দের অর্থ স্বর্ণ। উহার দ্বারা 'জন্ম স্বরূপ' এই প্রকার অর্থও পাওয়া যায়। জন্ম দেহগ্রহণ। দেহ ব্যতীত ছায়ার অর্থাৎ রাহুর সহিত উহার এই প্রেমপাত্রের সম্বন্ধ কিছুতেই সম্ভবে না। জীবন থাকিতে কেহ এই রাহুকে তাহার প্রেমপাত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না ইহাও ধ্রুব সত্য। ইহাই ত ভালবাসার চরম উৎকর্ষ যে কখনও তাহা নষ্ট বা বিকৃত হয় না। জন্মস্বরূপ এই বন্ধন হইতে এক-মাত্র নির্ব্বাণমোক্ষলাভ ব্যতীত পরিত্রাণ পাওয়া যায় না ইহা সকল

দর্শনশাস্ত্রের অপ্রতিবাদ সিদ্ধান্ত। মুক্তিলাভ কত কঠিন তাহাও দর্শন-শাস্ত্র আলোচকদিগের অবিদিত নহে। প্রীতির-বন্ধনস্থান প্রাণ বা হৃদয়। উহাই শাস্ত্রসম্মত হৃদয়গ্রন্থি। হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করা যায় কেবল সেই পরাবর ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে। উদ্ধৃত কবিতার শেষের দিকে এই কথা-কয়টি রহিয়াছে। তাই ইহার অনুবাদ হইয়াছে—

বন্দীকৃতাঽসি সুচিরায় তথাঽবিদগ্ধে
ত্বত্তঃ কথঞ্চন যথা ন পৃথক্ ক্রিয়েয়।
ন্যস্তং হি তে হৃদয়মর্ম্মণি জাতরূপ-
সূত্রেণ বন্ধনমিদং ক ইব চ্ছিনত্তু ॥

কবি বলিয়াছেন অভাগিনী। তাহা ভালই হইয়াছে। দুর্ভাগ্য ব্যতীত দুঃখবহুল জন্মলাভ ঘটে না। তাই ঘরে ঘরে এখনও গান শুনা যায় –

যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নং।

ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥

'অভাগিনী'র পরিবর্ত্তে অনুবাদে আসিয়াছে—অবিদগ্ধে। অবিদগ্ধা অনিপুণা। আত্মজ্ঞান লাভের কৌশল তোমার জানা নাই। অথচ একমাত্র আত্মজ্ঞানলাভ ব্যতীত এই জন্মবন্ধন ছিন্ন করাও সম্ভব নহে। অতএব চিরকাল তুমি আমার—অর্থাৎ রাহুর বন্দী।

যে প্রেম স্বাভাবিক কাল তাহা নষ্ট করিতে পারে না। যে ভাল-বাসা চরমে পৌছিয়াছে কাহারও কোন ক্রিয়া—যথেচ্ছ ভ্রমণাদি আচরণেও তাহা বিকৃত হয় না। কারণ, তাহা নিরুপাধি অর্থাৎ কোন নিমিত্ত বিশেষ অপেক্ষা করিয়া তাহা সৃষ্ট নহে। ইহা একমাত্র আত্মপ্রেম। তাই কবি বলিয়াছেন—

জগৎ মাঝারে যেথায় বেড়াবি
যেথায় বসিবি যেথায় দাঁড়াবি
কি বসন্তে শীতে দিবসে নিশীথে
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
এ পাষাণ প্রাণ অনন্ত শৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধ'রে।
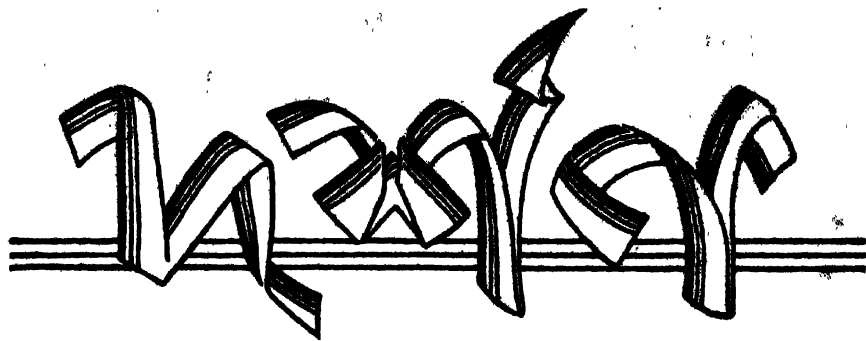
বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা] শ্রাবণ [১৩৪৯ সাল

সম্পাদক—

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ, পি-এচ্. ডি

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচীপত্র

শ্রাবণ সংখ্যা

২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা]

[শ্রাবণ, ১৩৪৯ সাল

নিত্য-পরিণামশীল প্রকৃতি

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্র মোহন দত্ত, এম্. এ, পি-এচ্. ডি।

সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটি শব্দ আমাদের দেশের দর্শনে, সাহিত্যে পুরাণে ও লোকমুখে এত অধিক প্রচলিত যে আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের অর্থসম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন উঠে না। এমন অনেক শব্দ আছে যাহার ব্যবহার আমরা অবলীলাক্রমে করিয়া যাই, কিন্তু ইহাদের ঠিক অর্থ কি, এই প্রশ্ন কেহ জিজ্ঞাসা করিলে ভাবিয়া উত্তর খুঁজিয়া পাই না। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই প্রকারেরই শব্দ। ইহাদের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে যিনিই ভাবিয়াছেন, তিনিই বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। সাংখ্য-যোগের ভাষায় ত্রিগুণের ব্যাখ্যা করাতে কোনই গোল নাই। কিন্তু যদি অন্য ভাষায় ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করা যায় তাহা হইলেই নানা জটিল প্রশ্ন উঠে। আধুনিক কালেও ত্রিগুণের অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা নানাদিক্ হইতে হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতগুলি একদেশদর্শিতা-প্রসূত। কতকগুলি সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক এবং অর্থনির্ণয়ের পক্ষে বহুপরিমাণে সহায়ক।[১] কিন্তু কোন ব্যাখ্যাই সর্ব্বাংশে কৌতূহল নিরাস করে না। এই জন্য এই বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বিষয়টি এত বিভিন্নদিক্ হইতে বিশদভাবে বিচার করা প্রয়োজন যে কোনও ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাহা করা সম্ভব পর নয়। সাংখ্য-কারিকা নামক সাংখ্য দর্শনের সুপ্রাচীন গ্রন্থে গুণ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে তাহাকে ভিত্তি করিয়াই এখানে ত্রিগুণের

১। অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়-কৃত 'Studies in Vedantism' নামক গ্রন্থে ত্রিগুণ সম্বন্ধে যে অতি-সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এরিষ্টটলের দর্শনের actuality ও potentiality র সহিত সত্ত্ব ও তমের তিনি যে তুলনা করিয়াছেন তাহার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করার প্রয়াসেই এই প্রবন্ধের উৎপত্তি।

অর্থকল্পনার চেষ্টা করিব। কল্পিত অর্থ অন্যান্য শাস্ত্রে ব্যবহৃত ত্রিগুণ শব্দের অর্থের অনুযায়ী কিনা তাহার আলোচনা সম্প্রতি করিব না। প্রবন্ধের সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যেই আলোচনা নিবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু যদি সাংখ্য-কারিকার ন্যায় প্রামাণ্য গ্রন্থের বর্ণিত ত্রিগুণের অর্থ সন্তোষজনক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়, তবে অন্যত্র ইহা কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করাও হয়ত সহজ হইবে।

ত্রিগুণের অর্থ বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ সাংখ্যের প্রকৃতি ও তাহার পরিণাম সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে প্রকৃতি ও উহা হইতে উদ্ভূত এই জগৎ নিত্য-পরিণামশীল। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, দুগ্ধ হইতে দধি প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, প্রকৃতি হইতেও তেমনি জগতের উৎপত্তি হয়। দধি দুগ্ধেরই পরিণত অবস্থা বা পরিণাম। অঙ্কুর বীজের পরিণাম; জগৎ মূলপ্রকৃতির পরিণাম। সাংখ্যের এই পরিণামবাদ ও বৈশেষিকের আরম্ভবাদের মধ্যে একটা মৌলিক দৃষ্টিগত পার্থক্য আছে; তাহা লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা প্রধানতঃ বস্তুর গঠনপ্রণালী দুই প্রকারের দেখিতে পাই। বহু অবয়ব বা অংশ একত্র সংযুক্ত করিয়া ঘট, পট, গৃহ প্রভৃতি রচিত হয়। মানুষ নানা দ্রব্য হইতে এইভাবে নূতন নূতন দ্রব্য প্রস্তুত করে। এই পদ্ধতিতে বহুর সংযোগে একের গঠন সম্ভব হয়। কিন্তু সজীব দ্রব্যের উৎপত্তির প্রণালী অন্য প্রকারের। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ ইত্যাদির উৎপত্তি লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে এই সব স্থলে এক হইতে বহুর সৃষ্টি হয়। যে বীজ পূর্ব্বে অবিভক্ত ছিল তাহা স্বতঃ বিভক্ত ও বিকশিত হইয়া শাখা, পত্র, মূল, ফুল, ফল প্রভৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হয়। মানুষ যখন কৃত্রিম বৃক্ষ অঙ্কিত করে বা প্রস্তুত করে— তখন এক একটি অংশ প্রস্তুত করিয়া জুড়িয়া জুড়িয়া বৃক্ষ গঠন করে কিন্তু সজীব বীজ হইতে স্বাভাবিক উপায়ে যখন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তখন এক হইতেই ক্রমে বহু অংশ উদ্গত বা উদ্ভিন্ন হয়। কৃত্রিমের গঠন হয় অংশের সমাবেশে, সম্মেলনে বা সংযোগে। আর নৈসর্গিক সজীব দ্রব্যের উৎপত্তি হয় অবিভক্তের স্বতঃ বিকাশে, বিভাগে; অনভিব্যক্তের স্ফুরণে, উন্মেষে বা অভিব্যক্তিতে। ফরাসীদেশের বিখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক বার্গসোঁ এই দুপ্রকার নির্ম্মাণ-পদ্ধতির যথাক্রমে manufacture ও organization নাম দিয়াছেন। বাংলায় আমরা প্রথমটিকে গড়া বা গঠন বা রচনা বলিতে পারি; দ্বিতীয়টিকে বলিতে পারি উৎপাদন। যদিও গৌণভাবে উৎপাদন শব্দটি আজকাল কৃত্রিম-গঠনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, তথাপি মুখ্য অর্থে ইহা স্বাভাবিক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বৈশেষিক প্রথম উপায়ে অর্থাৎ মানুষ যেরূপে কৃত্রিম দ্রব্য গড়ে সেই-

ভাবে জগতের সৃষ্টি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি জগৎকে ঘটের সঙ্গে এবং ঈশ্বরকে কুম্ভকারের সঙ্গে তুলনা করেন এবং জগতের উপাদানের জন্য বহুপ্রকারের পরমাণু প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যের কল্পনা করেন। কি প্রকারে পরমাণুর সঙ্গে পরমাণুর সংযোগে স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক একটি দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সাংখ্য দ্বিতীয় প্রণালীতে অর্থাৎ সজীবের স্বাভাবিক উৎপত্তি বা পরিণতির দৃষ্টান্তে জগতের সৃষ্টি বুঝিতে চেষ্টা করেন। সেইজন্য এক স্বতঃ-পরিণামশীল মূল প্রকৃতির কল্পনা করিয়া উহা হইতে তিনি নানা প্রকার বস্তুর ক্রমিক উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি বুঝিতে চান। সেইজন্য তাঁহার দৃষ্টিতে সৃষ্টির অর্থ—অব্যক্তের অভিব্যক্তি, অবিভক্তের বিভাগ, নিরবয়বের সাবয়বাকারে পরিণতি বা বিকাশ। এই জন্যই সাংখ্যের সৃষ্টির কাহিনী পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া গিয়াছে; কি প্রকারে মহাভূত সকলের সংযোগে জগতের নানা দ্রব্যের উৎপত্তি হয় তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু সাংখ্য যেখানে থামিয়াছে, বৈশেষিক দর্শনের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছে সেখানে হইতে। ভূত-পরমাণু হইতে কি প্রকারে দ্রব্য গঠিত হয় বৈশেষিকের তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়। দৃশ্যমান জগতের অসংখ্য দ্রব্যের গঠনের অনুসন্ধান করিতে গিয়া বৈশেষিক পঞ্চমহাভূতের কল্পনা করিলেন। বহুকে অল্পের দ্বারা বুঝিবার চেষ্টার মূলে রহিয়াছে চিন্তার লাঘবের চেষ্টা, যাহাকে তাঁহারা লাঘব-ন্যায় বলেন। সাংখ্য এই লাঘব-ন্যায়ই আরও একটু দূরে প্রসারিত করিয়া মহাভূতগুলির এক সাধারণ কারণ আছে বলিয়া স্থির করিলেন। একই অহঙ্কার তত্ত্বের নানামুখী অভিব্যক্তিতে একদিকে জ্ঞান ও ক্রিয়ার সাধন ইন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি, অপরদিকে জ্ঞানের বিষয় বা ক্রিয়ার উপাদানের সৃষ্টি। কল্পনা-লাঘবের দৃষ্টিতে সাংখ্য বৈশেষিক হইতে শ্রেয়ঃ। এই লঘুতর কল্পনা নৈসর্গিক জগতে এক অবিভক্ত কারণ হইতে বহুকার্য্যের অভিব্যক্তির দৃষ্টান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই কল্পনা নিরাধারও নহে।

সাংখ্যের পরিণামবাদ বুঝিতে এত কথার অবতারণা করিতে হইল। কিন্তু এই সম্পর্কে আরও কতকগুলি বিষয় অনুধাবন করা প্রয়োজন। পরিণামের ধারা যেমন এক হইতে বহুর দিকে, তেমনি সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের দিকে। সাংখ্য সৎকার্য্যবাদী ইহা সুবিদিত। তাঁহার মতে কার্য্য কারণে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে। যেখানে যাহার কোনপ্রকারই অস্তিত্ব নাই সেখান হইতে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। বটের বীজ হইতেই বটবৃক্ষের সৃষ্টি হয়, আম্রবীজ হইতে হয় না।

সুতরাং কার্য্য কারণেরই অভিব্যক্ত অবস্থা, আর কারণ কার্য্যেরই অব্যক্ত অবস্থা।

'পরিণাম' এই বিশেষ্য শব্দ ব্যবহার করায়, পরিণাম শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে বাধা জন্মে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে পরিণাম একটা স্থায়ী দ্রব্য নহে, উহা মূলতঃ ক্রিয়াত্মক। পরিণাম এক প্রকারের পরিবর্ত্তন। সাংখ্যের মতে মূল-প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান দৃশ্যমান জগৎ পর্য্যন্ত কোথাও এমন কোন বিষয় নাই যাহাতে অবিরত পরিবর্ত্তন না চলিতেছে। বিষয় সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। ঘট, পট, গৃহ, বৃক্ষ, পর্ব্বত, তারকা প্রভৃতি বাহ্য বিষয় এবং রাগ, দ্বেষ, আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি আভ্যন্তর বিষয়—যাহা কিছু চৈতন্য দ্বারা উদ্ভাসিত বা জ্ঞাত হয় সকলই পরিবর্ত্তনশীল। স্থূল দৃষ্টিতে কোন কোন বিষয়কে আমরা স্থায়ী বলিয়া মনে করি। হিমালয় পর্ব্বত বা চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দ্রব্যকে নিত্য বলিয়া ভাবি। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে এই সব দ্রব্যেরও উৎপত্তি হইয়াছে এবং ইহাদিগকে যখন স্থায়ী বলিয়া মনে হয় তখনও ইহাদের ভিতরে আমাদের অলক্ষিতে অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে। সুতরাং বিষয়মাত্রই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। চৈতন্য-ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু আমাদের নিকট দ্রব্য বলিয়া পরিচিত তাহার প্রত্যেকটি এক একটী পরিণাম বা পরিবর্ত্তন, বা উহাদেরই সমষ্টি মাত্র। যখন কোন মুহূর্ত্তে আমরা হিমালয় পর্ব্বত প্রত্যক্ষ করি. তখন বস্তুতঃ বিশেষ একটা পরিণামই প্রত্যক্ষ হয়। হিমালয় বলিতে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের যে স্থির দ্রব্যের কথা মনে আসে তাহাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ইহা পর পর উৎপন্ন বহু অবস্থার সমষ্টিমাত্র। সাংখ্যের ভাষায় বলিতে গেলে আপাতদৃষ্টিতে স্থির বলিয়া প্রতীয়মান প্রত্যেক বিষয় বহু ক্রমিক ও অবিচ্ছিন্ন পরিণামের দ্বারা উৎপন্ন একটা প্রবাহ মাত্র। যেমন প্রত্যেক মুহূর্ত্তে নদীর জলের পরিবর্ত্তন হইতেছে, একের পর অন্য জলরাশি আসিয়া নদীর বক্ষঃ পূর্ণ করিতেছে, অথচ অবিচ্ছিন্নভাবে নূতন জলরাশি আসাতে নদীর প্রবাহ বা ধারাকে একই বলিয়া মনে হয়, তেমনি জগতের প্রত্যেকটি বিষয় বহু পরিণামের অবিচ্ছিন্ন ধারায় গঠিত এক একটি প্রবাহমাত্র। প্রবাহের ছেদ নাই বলিয়া উহা স্থির মনে হয়। সমগ্রজগৎও এইভাবে একটা অবিচ্ছিন্ন পরিণামের প্রবাহ, তাই উহাও এক এবং নিত্য বলিয়া মনে হয়।

সাংখ্যদর্শনের এই প্রকৃততত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদের প্রচলিত দৈনন্দিন দৃষ্টির আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। নূতন দৃষ্টিতে সমগ্র ব্যক্ত জগৎ সক্রিয়, গতিশীল নিয়তপরিণামশীল একটা প্রবাহ মাত্র। ক্ষুদ্র, বৃহৎ, বহুকালব্যাপী বা অল্পকালব্যাপী যাহা কিছু আমরা প্রত্যক্ষ করি

বা ভাবিতে পারি, সবই ক্ষুদ্র, বৃহৎ, দীর্ঘ বা হ্রস্ব পরিণাম-প্রবাহ। এইরূপ প্রবাহকেই স্থির কল্পনা করিয়া আমরা ইহাকে একটা দ্রব্য বলিয়া ভাবি; প্রবাহের এক অংশকে সমগ্র প্রবাহের গুণ বা ধর্ম্মরূপে কল্পনা করি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি যাহাকে আমরা দ্রব্যের গুণ বলিয়া ভাবিয়া থাকি তাহার প্রত্যেকটি এক একটি পরিণাম বা ক্ষুদ্র প্রবাহ, দ্রব্যটি এই সবের সমষ্টিরূপ একটা অপেক্ষাকৃত বড় প্রবাহ। এই জন্য গুণ ও দ্রব্য, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীতে সাংখ্যের মতে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই।

পরিণাম শুধু ব্যক্ত জগতেই নিবদ্ধ নয়। প্রকৃতির যখন সাম্যাবস্থা তখনও তাহার অভ্যন্তরে নিয়ত পরিণাম চলিতে থাকে; যদিও তাহা সদৃশ পরিণাম এবং তাহা দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের সৃষ্টি হয় না।

এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে সাংখ্যের মতে বিষয়ের জ্ঞান হয় আমাদের চিত্তের বিষয়াকারে পরিণাম দ্বারা। যে পর্য্যন্ত চিত্ত বিষয়াকারে পরিণত না হয় সেই পর্য্যন্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রকার জ্ঞানই হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বাহ্যবিষয় বা পরিণাম আমাদের আভ্যন্তরিক পরিণাম ছাড়া বুঝিবার উপায় নাই। নিজে পরিবর্ত্তিত না হইয়া বাহ্য পরিবর্ত্তনকে বুঝিতে পারা যায় না। বাহ্য বিষয়ের গুণ বা ধর্ম্ম যে পর্য্যন্ত আমাদের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত না হয় সে পর্য্যন্ত বাহ্যকে বুঝিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য সাংখ্যের বাহ্য বস্তুর বর্ণনায় এমন অনেক বিশেষণ দেখিতে পাই যাহা সাধারণতঃ আমরা আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধেই প্রয়োগ করি।

বাস্তবিক পক্ষে সাংখ্যের দৃষ্টিতে বাহ্য ও আভ্যন্তর পরিণামে কোনও মৌলিক পার্থক্য নাই। কারণ উভয়ই চৈতন্যের বিষয়, সুতরাং অচেতন। শুধু তাহাই নহে, সাংখ্যের সৃষ্টির ক্রম লক্ষ্য করিলে দেখা যায় আভ্যন্তর হইতেই বাহ্যের অভিব্যক্তি হয়। বাহ্য বিষয় আন্তর বিষয়েরই স্থূল অভিব্যক্তি। যাহা নিরবয়ব ও অবিভক্ত তাহা হইতেই বিভক্ত ও সাবয়বের উৎপত্তি। এই উৎপত্তির ধারা বৌদ্ধ, বেদান্ত প্রভৃতি অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক-দের মধ্যে ব্র্যাড্‌লে, বার্গসোঁ এবং হোয়াইট্‌হেড্ প্রভৃতির দর্শনেও বিভিন্ন-ভাবে সৃষ্টির এই ধারাই স্বীকৃত হইয়াছে।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে সাংখ্যের মতে বাহ্য বিষয়ের উৎপত্তিও হয় আভ্যন্তর পরিণাম হইতে এবং উহার জ্ঞানও হয় আভ্যন্তর পরিণাম দ্বারা। বিষয়ের অস্তিত্ব বিষয়-বুদ্ধি-সাপেক্ষ। বুদ্ধি ছাড়া বিষয় নাই, বিষয় ছাড়া বুদ্ধি নাই—ইহাই সাংখ্যের দ্বিবিধ-সর্গের (অর্থাৎ যুগপৎ

প্রবর্ত্তমান প্রত্যয় বা বুদ্ধির সৃষ্টি এবং বিষয়ের সৃষ্টির) তাৎপর্য্য। এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানবাদ নয়। কারণ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদ সাংখ্য অস্বীকার করেন। তাহা ছাড়া সাংখ্য ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও সমষ্টিগত বুদ্ধির পার্থক্য স্বীকার করেন। ব্যক্ত বিষয়সমূহের উপাদান বা আলম্বন সমষ্টিবুদ্ধি—সেজন্য ব্যক্তজগৎকে সামান্য (বহু দ্রষ্টার দ্বারা দৃশ্য সাধারণ বিষয়) বলিয়া বর্ণনা করেন। অবশ্য, বুদ্ধি নিজেই প্রকৃতির পরিণাম: সুতরাং তাহার নিজস্ব কোন চেতনাশক্তি নাই। চেতন পুরুষের সঙ্গে সম্বদ্ধ হইয়াই বুদ্ধি চেতনের ন্যায় প্রতিভাত হয়। বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতির সব পরিণামই চেতনপুরুষের বিষয়। পুরুষের চৈতন্যের সম্পর্কেই প্রকৃতির পরিণাম ঘটে এবং চৈতন্যের আলোকে উদ্ভাসিত বুদ্ধির দ্বারাই পরিণামগুলির সম্বন্ধে জ্ঞানও সম্ভব হয়।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে সাংখ্যের মতে বিষয়রূপ প্রকৃতির যত পরিবর্ত্তন বা পরিণাম তাহা জ্ঞাতা পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ। শুধু তাহাই নয়। প্রকৃতির প্রত্যেকটি পরিবর্ত্তন বা পরিণাম বাসনাযুক্ত বদ্ধপুরুষের ভোগের উদ্দেশ্যেই উৎপন্ন। যেমন অপূর্ণবাসনা-ভোগের জন্য স্বপ্নে পুরুষের চিত্ত হইতে নানাপ্রকার ভোগ্য বিষয়ের উৎপত্তি হয় তেমনি জাগ্রদবস্থাতেও বাসনার তাড়নায় প্রকৃতি হইতে (বুদ্ধি প্রভৃতি পরিণাম দ্বারা) বদ্ধপুরুষের ভোগের জন্য নানা ভোগ্য বিষয়ের ও ভোগের সাধন-স্বরূপ ইন্দ্রিয় সকলের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রত্যেকটি বিষয় প্রকৃতির পরিণাম এবং প্রত্যেকটি পরিণাম চেতন পুরুষের সম্পর্কে এবং তাহারই উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয়। কোন পরিণামই উদ্দেশ্যবিহীন নহে। ফলে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রত্যেক বিষয়ই প্রকৃতির এক একটি সার্থক (অর্থাৎ প্রয়োজন-সাধক) পরিবর্ত্তন। সমগ্র বিশ্ব এই সার্থক পরিবর্ত্তনের সমষ্টি। এমন কোন জ্ঞেয় বা বিষয় নাই যাহার সম্পর্কে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। কিন্তু পরিণাম বা পরিবর্ত্তনের অর্থ প্রকৃতির এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি। সুতরাং কোন পরিণাম বিশ্লেষণ করিলে ইহার ভিতরে তিনটি পরস্পরাশ্রয় অবিচ্ছেদ্য অবস্থা লক্ষিত হয়। (ক) বীজাবস্থা বা অনভিব্যক্তাবস্থা, (খ) উদ্দিষ্ট আকারের দিকে অভিব্যক্তির জন্য প্রবৃত্তি বা যত্ন এবং (গ) অভিব্যক্ত অবস্থা। পরিণাম যতই ক্ষুদ্র হউক ইহার এই তিনটি দিক না থাকিলে উহাকে পরিণাম বলিয়াই ভাবিতে পারা যায় না। এই তিনটি অবস্থার হেতুত্রয়কে যথাক্রমে তমঃ, রজঃ এবং সত্ত্ব বলা যায়। প্রকৃতির প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরিণামেই এই তিনটি উপাদান বর্ত্তমান। সুতরাং সৎকার্য্যবাদ অনুসারে প্রকৃতিতে এই তিনটি উপাদানের কল্পনা করা যায়।

গুণত্রয়ের এই ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে অনেকের নিকটই বিস্ময়জনক মনে হইবে। সেইজন্য ত্রিগুণ সম্বন্ধে কারিকায় যে বর্ণনা আছে তাহাতে এই অর্থ খাটে কিনা এবং গুণের সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা হইতে নূতন অর্থ কোন অংশে ভাল কিনা তাহা বিচার করা প্রয়োজন। আমরা সাধারণতঃ মনে করি যেমন তিনটি বিভিন্ন বর্ণের সূতার সংযোগে একটি দড়ি প্রস্তুত করা যায় তেমনি তিনটি গুণের সংযোগে প্রকৃতি গঠিত। গুণগুলি যেন এক একটা পরমাণুর মত, এবং প্রকৃতি যেন ইহাদের সমষ্টি। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যের ব্যাখ্যায় গুণগুলিকে কতকটা এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গুণগুলি প্র তির উপাদানরূপ তিন প্রকারের মূলদ্রব্য; প্রত্যেক প্রকারের গুণদ্রব্যই সংখ্যায় অনন্ত (প্রবচন ভাষ্য, ১।১২৮ সূঃ)। ইহাদের সংযোগ ও বিভাগ রূপ ধর্ম্ম আছে (ঐ, ১।৬১ সূঃ)। প্রকৃতি তিন প্রকারের অসংখ্য গুণ ব্যক্তির সংযোগলব্ধ সমূহ। পরমাণুর ন্যায় গু গুলিরও সংখ্যা কল্পনা করিয়া ভিক্ষু ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা ও বৈষম্যাবস্থা সংখ্যাগত বলিয়াই বুঝিতে চেষ্টা করিয়ছেন। সৃষ্টির প্রাক্কালে তিনটি গুণই অসংখ্যভাবে প্রকৃতিতে থাকায় সাম্য সম্ভব হয় এবং সৃষ্টিকালে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক তিন প্রকারের গুণব্যক্তির সংযোগ হয়। সে দ্রব্যে সত্ত্ব গুণের সংখ্যা বেশী তাহাকে সাত্বিক, যাহাতে রজোগুণের সংখ্যা বেশী তাহাকে রাজসিক এবং যাহাতে তমোগুণের সংখ্যা বেশী তাহাকে তামসিক বলা হয়। সত্ত্বাদির হ্রাসবৃদ্ধি তাহাদের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির জন্যই হয় (প্রবচন ভাষ্য, ১।১২৮)। এই ব্যাখ্যানুসারে সাংখ্য যে বৈশেষিকের মতই প্রায় হইয়া দাঁড়ায় ভিক্ষু তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং এই আশঙ্কার নিরাস করার চেষ্টাও করিয়াছেন। "যদি মূল কারণ সত্ত্বাদিকে পরিচ্ছিন্ন (finite) ও অসংখ্য ব্যক্তিস্বরূপ স্বীকার করা যায়, তবে বৈশেষিকের সঙ্গে সাংখ্যের পার্থক্য কি রহিল? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, সত্ত্ব প্রভৃতির (ভূতাদির মত) শব্দস্পর্শাদি গুণ নাই।" অনেক পরিচ্ছিন্ন গুণব্যক্তি স্বীকার করিলে সুবিধা এই যে তাহাদের সংযোগে পরিচ্ছিন্ন বিষয়ের সৃষ্টি কল্পনা করা যাইতে পারে; এবং তাহাদের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধিতে অনুপাতের তারতম্য স্বীকার করা যায়। কিন্তু যদি প্রত্যেকটি গুণের সংখ্যা বহু না হয় তাহা হইলে হ্রাসবৃদ্ধির অর্থ হয় না; সব দ্রব্যেই তিনগুণের অনুপাত একই হইবে; বেশী কম হইতে পারে না। ইহাই বিজ্ঞানভিক্ষুর বক্তব্য।

পূর্ব্বে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সাংখ্যের পরিণামবাদ ও বৈশেষিকের আরম্ভবাদের মৌলিক একটা পার্থক্য আছে। একটি অবিভক্ত অব্যক্ত কারণের বহুধা বিভক্ত পরিণাম বা অভিব্যক্তির দৃষ্টান্তের উপর স্থাপিত, অপরটি বহু অবয়বের সংযোগে এক দ্রব্য গড়ার দৃষ্টান্তের

উপর প্রতিষ্ঠিত। ভিক্ষু এই পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়া সাংখ্যের সৃষ্টিক্রম বৈশেষিকের ধারাতেই বুঝার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য গুণত্রয়ের সংযোগে সৃষ্টির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় একটা বড় আপত্তি এই যে, যে সকল দ্রব্যের পৃথক্ অস্তিত্ব সিদ্ধ আছে তাহাদের মধ্যেই সংযোগ-সম্বন্ধ স্বীকার করা যায়। সাংখ্যের মতে গুণত্রয় পরস্পরকে আশ্রয় করিয়াই থাকে; কখনও পৃথক থাকে না। সুতরাং ইহাদের সংযোগ বা বিয়োগ কল্পনা করা যায় না। বাচস্পতি-মিশ্র সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে সাংখ্যের এই গূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন —"অপ্রাপ্তি-পূর্ব্বিকা প্রাপ্তিঃ সংযোগঃ।......নাপি সত্ত্ব-রজ-স্তমসাং পরস্পরং সংযোগঃ, অপ্রাপ্তেরভাবাৎ।" (১০ম কারিকা)। সাংখ্য এবং ন্যায়-বৈশেষিকের পার্থক্যও তিনি বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন, সাংখ্যের মতে অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের উৎপত্তি হয়, আর কণাদ ও গৌতমের মতে ব্যক্ত হইতেই ব্যক্তের উৎপত্তি হয়, (ঐ ১৫শ কারিকা)।

সাংখ্যকারিকায় ব্যক্ত ও অব্যক্তের পার্থক্য প্রদর্শন করিতে গিয়া বলা হইয়াছে ব্যক্ত সাবয়ব, অব্যক্ত তাহার বিপরীত। যদি অব্যক্ত প্রকৃতি তিনটি গুণের সংযোগে গঠিত বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে তাহাকেও সাবয়ব বলিতে হইবে; নিরবয়ব বলার কোনই কারণ নাই। ইহা হইতেও বুঝিতে হইবে গুণত্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সংযোগ নয়; অন্য কোন প্রকারের হইবে। ভিক্ষুর ন্যায় যাঁহারা সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব কারণ সংযোগে কার্য্যসৃষ্টির ধারায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা প্রকৃতির নিরবয়বত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গোলে পড়িয়াছেন, এবং নানাপ্রকার কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন।

অবয়ব-সংযোগ ব্যতিরেকে কিরূপে প্রকৃতিতে তিনটি উপাদানের অস্তিত্ব সম্ভব তাহা আমাদের কল্পিত ব্যাখ্যায় স্পষ্ট বুঝা যায়। অনভিব্যক্তি (বা আবরণ), অভিব্যক্তির দিকে প্রবৃত্তি, এবং অভিব্যক্তি এই তিনটি অবস্থার মূলীভূত তিনপ্রকারের কারণ বা শক্তির নাম যদি যথাক্রমে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব হয়, তাহা হইলে এই তিনটি গুণের সম্বন্ধ সংযোগ বলিয়া কল্পনা করার প্রয়োজন হয় না। সাংখ্যকারিকাতে ত্রিগুণের ধর্ম্ম, প্রয়োজন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে আমাদের কল্পিত ব্যাখ্যা দ্বারা তাহা বুঝিবার পক্ষে কেমন সুবিধা হয় তাহা একবার বিচার করিয়া দেখিলেই ইহার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইবে।

উক্ত গ্রন্থে তমঃ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ইহা বিষাদাত্মক, ইহার কাজ নিয়ম, ইহা গুরু এবং বরণক। রজঃ দুঃখাত্মক, ইহার কাজ প্রবৃত্তি, ইহার ধর্ম্ম উপষ্টম্ভকত্ব ও চলত্ব। সত্ত্ব সুখাত্মক, ইহার কাজ প্রকাশ, ধর্ম্ম প্রকাশত্ব

ও লঘুত্ব। গুণত্রয়ের যে ব্যাখ্যা এই প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে তাহাদ্বারা এই বর্ণনার অর্থ যেমন স্পষ্ট হইবে গুণগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক বুঝারও তেমনই সুবিধা হইবে।

প্রত্যেক পরিণামের মূলে আমরা তিনরূপ কারণ দেখিয়াছি; অনভিব্যক্তি, অভিব্যক্তির দিকে প্রবৃত্তি ও অভিব্যক্তি। এই তিন অবস্থার কারণগুলিকে আমরা তিন প্রকারের শক্তি বলিয়াছি। সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যের মতে শক্তি অর্থে কার্য্যের অব্যক্ত অবস্থা বা কারণ ভিন্ন কিছু নহে তত্ত্বকৌমুদী ১৫শ, কা দ্রষ্টব্য)। পরিণামের অন্তর্গত অনভিব্যক্তির মূলীভূত কারণকে বা শক্তিকে আমরা বলিয়াছি তমঃ। ইহার কার্য্য 'নিয়ম' বলার তাৎপর্য্য এই যে তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব উভয়কে নিয়ত রাখে অভিব্যক্তিমুখী প্রবৃত্তি (বা ক্রিয়া) এবং অভিব্যক্তিকে ব্যাহত রাখাই অনভিব্যক্তি। কার্য্যের প্রকাশে বা অভিব্যক্তিতে বাধা জন্মাইবার জন্য তমঃ বরণক বা আবরণকারী, ইহাও বলা সঙ্গত। যে শক্তি বা কারণের প্রভাবে বীজে বৃক্ষ অনভিব্যক্ত বা আবৃত অবস্থায় থাকে তাহারই নাম তমঃ। যেমন অভিব্যক্তির কারণরূপ সত্ত্বকে ঢাকিয়া রাখার জন্য তমঃকে আবরণকারী বলা যায়, তেমনি অভিব্যক্তিমুখী প্রবৃত্তিতে বাধা জন্মাইবার জন্য তমঃকে গুরু বলা যায়। ক্রিয়ার বিঘ্নকারক ধর্ম্মের নামই গৌরব বা গুরুত্ব। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে পরিণাম বাহ্য ও অভ্যন্তর উভয় প্রকারই হইতে পারে এবং সাংখ্যমতে বাহ্য ও অভ্যন্তর বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য বিশেষ নাই। তমঃ ও অন্যান্য গুণের ক্রিয়া বাহ্য এবং অভ্যন্তর পরিণামে একই রূপ। বাহ্য দৃষ্টান্ত দ্বারাই আমরা তমোগুণের আবরণকত্ব ও গুরুত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আভ্যন্তর দৃষ্টান্তেও ইহা খাটিবে। যখন আমরা চিন্তা করিতে চেষ্টা করি তখন যাহা অস্পষ্ট থাকে তাহাকে স্পষ্ট করার চেষ্টাই হয় এবং চিন্তা সফল হইলে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই অস্পষ্ট অবস্থার মূলে তমঃ, ইহাই স্পষ্টতাকে আবৃত করিয়া রাখে এবং স্পষ্টীকরণের জন্য চিন্তার যে চেষ্টা বা প্রবৃত্তি তাহাতেও বাধা জন্মায়, তাই ইহাকে অতিক্রম করার জন্য মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন হয়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে বাহ্য জগতে যেমন অভিব্যক্তি ও প্রবৃত্তির বাধা আমরা দেখি তেমনি অভ্যন্তর জগতেও উহা অনুভব করি। আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক অবস্থাকে তমোগুণের কার্য্য বলিয়া বলা হয়। এই সব অবস্থা যেমন বাহ্য কর্ম্মশক্তির পক্ষে বাধক, তেমনি মানসিক চিন্তার পক্ষে বিঘ্নজনক। সেজন্য তমঃকে অজ্ঞানের কারণও বলা যাইতে পারে।

তমোগুণকে বিষাদাত্মক বলার কারণ কি এবং এই গুণের অন্যান্য ধর্ম্মের সঙ্গে বিষাদের কি সম্পর্ক তাহা এইবার বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। বাংলায় বিষাদের অর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে দুঃখ। কিন্তু ইহার মৌলিক

অর্থ অবসাদ, অবসন্নতা, মোহ ইত্যাদি ; এবং এইখানে এই অর্থই খাটে। কারণ দুঃখ সাংখ্যের মতে রজোগুণেরই কার্য্য। যে তমোগুণের জন্য ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তি ব্যাহত হয় মোহের অবস্থা উহারই কার্য্য বলিয়া ভাবা খুবই সঙ্গত। কারণ মোহের বা অবসাদের অবস্থায় ক্রিয়া ও জ্ঞান দুইই বাধাপ্রাপ্ত হয়।

রজোগুণের সম্বন্ধে কারিকাতে বলা হইয়াছে, ইহা অপ্রীতি বা দুঃখাত্মক, ইহার ধর্ম্ম উপষ্টম্ভকত্ব ও চলত্ব, ইহা প্রবৃত্তির কারণ। রজঃ প্রবৃত্তি জন্মাইয়া পরিণাম ঘটায় আমরা এই অর্থই পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছি। স্থূল জগতে আমরা দুই প্রকার কর্ম্ম হইতে দেখি, কোনও কোনও বস্তু নিজ হইতেই কাজ করে, কোনও বস্তু অপর দ্বারা চালিত হইয়া কাজ করে। নিজে কাজ করা বা অন্য দ্বারা কাজ করান এই দুইই প্রবৃত্তিসাপেক্ষ ; সুতরাং রজোগুণেরই কার্য্য। উপষ্টম্ভ অর্থ কার্য্যে উৎসাহিত বা উদ্যত করা, অর্থাৎ অন্যকে কাজে প্রবৃত্ত করা ; চলত্ব অর্থে নিজে চলা। সুতরাং রজোগুণের এই উভয় ধর্ম্ম কেন উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু প্রবৃত্তি, চলত্ব, উপষ্টম্ভকত্ব ইত্যাদির সঙ্গে দুঃখের সম্পর্ক কি তাহা তত স্পষ্ট নয়। প্রত্যেক পরিণামের একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে, পূর্ব্বে আমরা তাহা দেখিয়াছি। কখনও জ্ঞাতসারে কখনও বা অজ্ঞাতসারে সেই উদ্দেশ্যের দিকে প্রবৃত্তি হয় এবং যতক্ষণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয় চেষ্টা ততক্ষণ পর্য্যন্তই চলে। এই অসিদ্ধ প্রযত্নের অবস্থাই দুঃখ। জ্ঞানপূর্ব্বক আমরা যে চেষ্টা করি তাহা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি দুঃখময় অবস্থা ভোগ করি ইহা অনুভবসিদ্ধ। যতক্ষণ মানুষ তমোগুণে অভিভূত হইয়া সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, অবসন্ন বা মোহগ্রস্ত হইয়া উদাসীনভাবে অবস্থান করে এবং শারীরিক বা মানসিক কোন চেষ্টাই করে না ততক্ষণ দুঃখও থাকে না। কিন্তু নিষ্ক্রিয় অবস্থা বা তমঃকে জয় করিবার চেষ্টা যখন আরম্ভ হয় তখনই দুঃখেরও আরম্ভ হয় এবং উহাকে সম্পূর্ণ জয় করিয়া অভিভূত না করা পর্য্যন্ত এই দুঃখ থাকে। অজ্ঞানকৃত প্রবৃত্তিতেও তমের বাধা জয় না করা পর্য্যন্ত দুঃখানুভব হয়। যেমন শ্বাসক্রিয়াতে যদি কোন বাধা উপস্থিত হয় তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহা অভিভূত বা দূরীভূত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কষ্ট হয়। তেমনি পরিপাকক্রিয়া যতক্ষণ সফলভাবে চলে স্বস্তি-ভাব থাকে, কিন্তু কোন বাধা উপস্থিত হইলে উহা দূর করার জন্য আন্ত্রিক ক্রিয়া যে পর্য্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত না হয়, ততক্ষণ কষ্টই বোধ হয়।

কিন্তু এই সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কোন কোন কাজ আছে যাহা করাতেই আনন্দ, কার্য্যসমাপ্তিতে বা ফলপ্রাপ্তিতে নয়। ইংরাজীতে এই প্রকার আনন্দকে pleasure of pursuit অর্থাৎ প্রযত্নজ

আনন্দ বলা হয় এবং pleasure of attainment অর্থাৎ সিদ্ধিজ আনন্দ হইতে ইহার পার্থক্য দেখান হয়।[১] ঘোড়া দৌড়াইয়া যে আনন্দ তাহা শুধু গন্তব্যস্থলে পঁহুছানর জন্য নয়, দৌড়াইবার কালেই এই আনন্দ অনুভূত হয়। এই প্রকার দৃষ্টান্ত আমাদের কল্পিত সাংখ্যমতের বিরুদ্ধে প্রমাণ দেয় বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু সাংখ্যের পক্ষ হইতে (বিশেষতঃ আমরা এই মতের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহার দিক্ হইতে) বলা যায়, ঘোড়া দৌড়াইবার আনন্দ অনভ্যস্ত লোকে লাভ করিতে পারে না, তাহার পক্ষে উহা উদ্বেগেরই কারণ। পরিপক্ক অশ্বারোহীর পক্ষেই এই আনন্দ সম্ভব। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে প্রতি মুহূর্ত্তে অশ্বারোহী অশ্ব-চালনার জন্য অনবরত যে চেষ্টা করিয়া থাকে তাহার প্রত্যেকটি চেষ্টার সফলতার জন্যই আনন্দ হয়। যেমন এক ঘণ্টাব্যাপী অশ্বচালনার একটা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে কোন গন্তব্যস্থলে পৌঁছান তেমনি প্রতি মুহূর্ত্তের খণ্ড খণ্ড চেষ্টারও এক একটা উদ্দেশ্য জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে থাকে—যেমন আসন স্থির রাখা, অশ্বকে ঠিক পথে রাখা, শরীরকে যথাযথভাবে সঞ্চালিত করা ইত্যাদি। এই বৃহৎ বা খণ্ড চেষ্টার কোন অংশে উদ্দেশ্য সফল না হইলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত সকল হইতে প্রবৃত্তির মূলীভূত রজোগুণকে কেন দুঃখের কারণ বলা হয় তাহা বুঝা যায়। জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক প্রবৃত্তির অবস্থা মাত্রই যে চরিতার্থ না হওয়া পর্য্যন্ত দুঃখজনক তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।[২] কিন্তু সব দুঃখই অচরিতার্থপ্রবৃত্তি নিমিত্ত কি না এই সম্বন্ধে সন্দেহ একেবারে নিরাস করা সম্ভব নয়। কোন বিশেষ স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি কেন দুঃখ উৎপাদন করে বলা কঠিন। এই সম্বন্ধে আধুনিক মনোবিজ্ঞানবিদ্গণও পরস্পরবিরোধী নানা কারণ কল্পনা করিয়াছেন। কোন মতই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। অনেকের মতে যাহা জীবের জীবন রক্ষা বা বংশ রক্ষার চেষ্টার প্রতিকূল তাহা দুঃখজনক এবং যাহা অনুকূল তাহা সুখজনক। এই মতের সহিত উক্ত সাংখ্যমতের কতকটা সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু এই মতের প্রতিকূল কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে, যেমন, কোন কোন বিষ বেশ সুস্বাদ, আবার কোন কোন স্বাস্থ্যপ্রদ দ্রব্যও বিস্বাদ লাগে। সকল প্রকার সুখদুঃখের ব্যাখ্যা আধুনিক মতে

১। চলতি বাংলায় এই দুইটিকে চলার (বা করার) আনন্দ ও পাওয়ার আনন্দ বলা যাইতে পারে।

২। বার্গসোঁ বলেন "Every pain, then, must consist in an effort,—an effort which is doomed to be unavailing".—Matter and Memory, ৫৬ পৃঃ।

বা সাংখ্যের অন্য কোন প্রকার ব্যাখ্যাকার মতে করা দুঃসাধ্য। কিন্তু তথাপি প্রবৃত্তি ও দুঃখের মধ্যে বহুস্থলে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। এই সব দৃষ্টান্ত হইতেই হয়ত সাংখ্য অন্যান্য স্থলেও অনুরূপ কারণের কল্পনা করিয়া প্রবৃত্তির কারণ রজোগুণকে দুঃখাত্মক বলিয়াছেন।

তবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সকল প্রকার দুঃখস্থলেই জীবের শান্তি বা বিশ্রামের অভাব এবং ক্রিয়াশীলতার আধিক্য দেখা যায়। বেদনায় লোক ছট্‌ফট্ করে, এবং তাহা পরিহারের চেষ্টা করে। দুঃখের অবস্থা উদ্বেজক ও চাঞ্চল্যকারক। সুতরাং দুঃখকে প্রবৃত্তিমূলক না বলিয়া প্রবৃত্তিকেই দুঃখমূলক বলিলে বোধ হয় অনেকের সম্মত হইবে। কিন্তু এই মতের বিষয়েও প্রশ্ন হইবে, বৃক্ষ প্রভৃতিতে দুঃখ অনুভূতি আছে কিনা এবং ইহা হইতেই উহাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মে কি? সবদিক বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, দুঃখ প্রবত্তির কারণ বা প্রবৃত্তি দুঃখের কারণ না বলিয়া উভয়ই এক সাধারণ কারণের কার্য্য বলিলে সর্ব্ববাদিসম্মত হইতে পারে। এই কারণকেই আমরা রজঃ বলিতে পারি। ফলে আমাদের বলিতে হইবে যাহার দ্বারা প্রবৃত্তি জন্মে তাহা হইতে দুঃখও জন্মে; সেজন্য দুঃখ ও প্রবৃত্তিতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যেমন বিদ্যুতের প্রভা ও মেঘের গর্জ্জন-শব্দ উভয়ই একই কারণে ঘটে, তথাপি কোন কোন স্থলে একটি স্পষ্ট অনুভূত হইলেও অপরটি লক্ষিত হয় না, তেমনি প্রবৃত্তি ও দুঃখ একই রজোগুণ হইতে উদ্ভূত, তথাপি সব স্থানে উভয়কেই সমান ভাবে লক্ষ্য করা যায় না।

এখন সত্ত্বগুণের কথা বিবেচনা করা যাউক। কারিকার মতে সত্ত্ব সুখাত্মক, ইহা প্রকাশক ও লঘু, ইহার কাজ প্রকাশ করা। আমরা পরিণামের অভিব্যক্ত অবস্থার অন্তর্নিহিত কারণশক্তিকে সত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। প্রকাশ ও অভিব্যক্তির একই অর্থ। কিন্তু বাহ্য ও আভ্যন্তর পরিণামভেদে প্রকাশ বা অভিব্যক্তির কিছু প্রকারভেদ হয়, তাহা আলোচনা করা উচিত। আমরা বলি বীজ হইতে অঙ্কুর প্রকাশিত বা অভিব্যক্ত হয়, আবার বলি জ্ঞানে জ্ঞেয় বিষয় প্রকাশ পায়। সাংখ্যের মতে উভয় প্রকারের প্রকাশই মূলতঃ এক। উভয় স্থলেই সত্ত্বমূলক অভিব্যক্তি বিদ্যমান। কোনও বিষয়ের অজ্ঞান দূর করিবার প্রযত্ন সফল হইলেই তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। সুতরাং এখানেও বলা যাইতে পারে অনভিব্যক্তি হইতে অভিব্যক্তির অভিমুখে যে প্রযত্ন তাহাদ্বারাই বিষয়ের জ্ঞান হয়। সুতরাং বীজ হইতে অঙ্কুরের পরিণতি ও অজ্ঞান অবস্থা হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি উভয়ই অনভিব্যক্তের অভিব্যক্তি।

প্রবৃত্তির পথে যাহা বাধা জন্মায় তমোগুণের সেই ধর্ম্মকে সাংখ্য গুরুত্ব বলেন। ইহার বিপরীত লঘুত্ব; ইহা সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম। লঘুত্ব সকল প্রবৃত্তির অনুকূল। যখন আমরা কোন বস্তুকে উপরে উঠাইতে চাই তখন যদি উঠাইবার কাজ সহজ হয় তবে ঐ বস্তুতে লঘুত্ব ধর্ম্ম আরোপ করি, যদি ঐ কাজ কঠিন হয়, তবে উহাতে গুরুত্ব ধর্ম্ম আরোপ করি। ইহা হইতে বুঝা যায় লঘুত্ব ও গুরুত্ব প্রবৃত্তি হইতে অনুমিত ধর্ম্ম। আমরা বাহ্য বস্তুকেই সাধারণতঃ গুরু বা লঘু বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রবৃত্তির অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতা বাহ্যের ন্যায় আভ্যন্তর বিষয়েও অনুভূত হয়—যেমন কোনও কল্পনা করা সহজ, আবার কোনও কল্পনা করা কঠিন। সুতরাং আভ্যন্তর স্থলেও পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে দুই প্রকার ধর্ম্ম আরোপ করা যায়; এই জন্য কল্পনার বা চিন্তার বেলাতেই লাঘব এবং গৌরব শব্দ ব্যবহার করা চলে। বাহ্য ও আভ্যন্তরে যে এই বিষয়ে সাদৃশ্য আমরা অনুভব করি তাহার অপর প্রমাণ এই যে, উভয় স্থলেই আমরা একপ্রকার ভাষা ব্যবহার করি। ইংরেজীতেও আমরা light এবং heavy বিশেষণদ্বয় বাহ্য ও মানসিক অবস্থা উভয়ের বেলাতেই প্রযুক্ত হইতে দেখি। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় বাহ্য ও আন্তর বিষয়ে এই সম্বন্ধে অবশ্যই কোন সামান্য কারণ আছে। এই সাম্যের মূল কোথায় তাহা সাংখ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

অভিব্যক্তি প্রবৃত্তির সফল অবস্থা। কোনও চেষ্টা সফল হইলে সুখ জন্মে; উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও কর্ম্মবেগের শান্তি হয়। সুতরাং এই পরিসমাপ্তির অবস্থা যে সুখের অবস্থা তাহাও অনুভবসিদ্ধ। সত্ত্বকে সেইজন্য সুখজনক বলা চলে। জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক চেষ্টা সফল হইলে সুখ অনুভূত হয়। কিন্তু যেখানেই সুখ সেখানেই তাহার পিছনে কোন সফল প্রবৃত্তি আছে কিনা বলা কঠিন। পূর্ব্বেই অমরা দেখিয়াছি এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যাহতে সুখদুঃখের পশ্চাতে কি সূক্ষ্ম প্রবৃত্তি বা চেষ্টা আাছ স্থূল দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়ে না। দৃষ্টস্থল হইতে এই সব অদৃষ্টস্থলে প্রবৃত্তির অনুমান করা যাইতে পারে মাত্র। তাহা ছাড়া ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যেখানে সুখ সেখানে প্রচেষ্টারও বিরাম হয়; সুখের অবস্থা যতক্ষণ অক্ষুন্ন থাকে ততক্ষণ নূতন উদ্যম আসে না। সুতরাং প্রকাশ, লাঘব, সুখ প্রভৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। সুখের অবস্থায় উদ্যম শান্ত হয় বলিয়াই সত্ত্বকে শান্তির কারণ ও বলা হয়।

গুণগুলির প্রত্যেকের সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে, আমাদের কল্পিত ব্যাখ্যা অনুসারে তাহা বুঝিবার কতদূর সুবিধা হয় ইহাই এপর্য্যন্ত দেখা গেল। এখন দেখিতে হইবে, এই ব্যাখ্যা দ্বারা গুণগুলির মধ্যে পরস্পারের যে সম্বন্ধের বর্ণনা আছে তাহা বুঝার সুবিধা হয় কিনা। আমরা পুর্ব্বেই

দেখিয়াছি গুণগুলির মধ্যে (পরমাণুসকলের ন্যায়) সংযোগ সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না। কারিকাতে বলা হইয়াছে, গুণগুলি পরস্পরকে অভিভূত করিয়া থাকে, পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে, পরস্পরকে জন্মায় এবং কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ থাকিতে পারে না। প্রথম সম্বন্ধটি বিরোধ-সূচক। তমঃ সত্ত্ব এবং রজঃকে অভিভূত করিয়াই থাকিতে পারে—তেমনি রজঃ তমঃ এবং সত্ত্বকে, ও সত্ত্ব তমঃ ও রজঃকে অভিভূত করিয়া থাকে। আমাদের কল্পিত অর্থ অনুসারে ইহার তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট। অনভিব্যক্ত অবস্থা অভিব্যক্তিমুখী প্রবৃত্তি ও অভিব্যক্তি এই উভয়কে অভিভূত না করিয়া কিরূপে সম্ভব হইবে? তেমনি প্রবৃত্তি যেমন একদিকে অনভি-ব্যক্তিকে দূর করার চেষ্টা স্বরূপ, অন্যদিকে ইহা অভিব্যক্তির সহিত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন; কারণ অভিব্যক্তি হইলে প্রবৃত্তি ক্ষান্ত হয়। অভিব্যক্তি ও যেমন অনভিব্যক্তিকে দূর করে, তেমনি প্রবৃত্তিরও সমাপ্তি ঘটায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রত্যেক পরিণামের তিনটি অবস্থার পিছনে যে তিনটি শক্তি আছে তাহা পরস্পরকে অভিভূত করিয়াই নিজ নিজ কার্য্য করে। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটি শক্তি এই ভাবে পরস্পরের বিরোধী। ইহাদের কোনও একটি অন্য দুইটিকে অভিভূত না করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে দুইটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ, অভিভব অর্থ নাশ নয়। যখন সত্ত্বের বিকাশ হয়, তখন রজঃ ও তমঃ এই দুইটি শক্তি একেবারে নষ্ট হয় না, অভিভূত বা পরাজিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, অভিভবের মাত্রাভেদ বা তারতম্য হইতে পারে। সেজন্য সাত্ত্বিক (বা রাজসিক বা তামসিক) পরিণাম সবই এক প্রকারের নয়। কোনটিতে সত্ত্ব বেশী উদ্রিক্ত, কোনটিতে কম; পক্ষান্তরে অন্য দুইটি গুণ কোনটিতে বেশী অভিভূত, কোনটিতে কিছু কম। সুতরাং দেখা যাইতেছে বিজ্ঞান-ভিক্ষু গুণগুলির সংখ্যার পার্থক্যদ্বারা সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ইত্যাদি পরিণামে গুণের হ্রাসবৃদ্ধির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্বীকার না করিয়াও অভিভবের মাত্রার পার্থক্য দ্বারা এই হ্রাসবৃদ্ধি স্বীকার করা যাইতে পারে। যদি গুণগুলিকে পরমাণুর ন্যায় সংযোগ-শীল মনে না করিয়া শক্তি বলিয়া মানা যায় তাহা হইলে সংখ্যার পরিবর্তে অভিভবের মাত্রাদ্বারাই উক্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

অভিভবের জন্য অভিভবকারী এবং অভিভাব্য উভয়েরই আবশ্যক। সুতরাং গুণগুলি পরস্পরকে আশ্রয় না করিয়াও থাকিতে পারে না। পরিণামের অব্যক্ত অবস্থায় তমঃ সত্ত্বকে ও রজঃকে অভিভূত করে, সুতরাং তমঃ সত্ত্ব ও রজঃ ছাড়া কাজ করিতে পারে না।

তেমনি প্রবৃত্তির অবস্থায় রজঃ তমঃ ও সত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া, উহাদিগকে অভিভূত করিয়া কার্য্য করে এবং অভিব্যক্তির অবস্থায় সত্ত্ব অপর দুই গুণকে আশ্রয় ও অভিভূত করিয়া কার্য্য করে।

এই স্থলে একটি শঙ্কা হইতে পারে। পরিণামের অবস্থা তিনটির মূলীভূত শক্তি তিনটিকে, আমরা তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব নাম দিয়াছি। অবস্থাগুলি কি ক্রমিক নহে? অনভিব্যক্তি, প্রবৃত্তি ও অভিব্যক্তি এই গুলি কি পর পর আসে না? তাহা হইলে গুণত্রয়ের যুগপৎ একত্র অবস্থান কি করিয়া সম্ভব এবং যুগপৎ না থাকিলে ইহারা পরস্পরকে আশ্রয়ই বা কিরূপে করিতে পারে? এই শঙ্কার সমাধানের জন্য উল্লেখ করা আবশ্যক যে আমরা প্রকৃতির পরিণামের উপাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া পূর্ব্বে দেখিয়াছি সাধারণতঃ যে সব দ্রব্যকে আমরা এক বলিয়া ভাবি তাহা বস্তুতঃ বহু ক্ষুদ্র ক্ষণিক পরিণামের সমষ্টি এবং প্রবাহ। এই ক্ষুদ্রতম পরিণামের বিশ্লেষণ করিয়াই তিনটি অবস্থার সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। এইরূপ পরিণাম ক্ষণিক বলিয়া তাহার ভিতরে আবার ক্ষণভেদ বা পূর্ব্ব-পশ্চাৎ ভেদ করা যায় না। সুতরাং পরিণামের যে তিনটি অবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ক্রমিক সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না; সবগুলিই সেই ক্ষুদ্রতম ক্ষণ-স্থায়ী সুতরাং যুগপৎ সেই পরিণামটিতে বর্ত্তমান। পরিণামের তিনটি অবস্থা বলাতে হয়ত কালের ধারণা আসিয়া পড়ে। পরিণামের তিনটি অবস্থা না বলিয়া তিনটি দিক্ বলিলে বোধ হয় সেই ধারণা হইবে না; তবে মনে রাখিতে হইবে এই তিনটি দিকের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা দেশগত পার্থক্যও নয়। পরিণামের ধারণা হয় প্রথমতঃ অনুভূতিতে। আমরা যখন একটি ক্ষুদ্রতম ক্ষণ-স্থায়ী বর্ণ, গন্ধ, রস বা এই প্রকার প্রকৃতির কোন পরিণাম অনুভব করি, সেই ক্ষণিক অনুভবের অভ্যন্তরে কোন কালগত বা দেশগত ভেদ অনুভব করি না। তখন বিষয়টি যুগপৎ অনুভূত হয়। কিন্তু যখন পরে সেই অনুভূত বিষয়ের উপাদানের সন্ধান করি তখন বুঝিবার সুবিধার জন্য (বহুক্ষণ দেশব্যাপী ঘটপটাদি সাধারণ দ্রব্যের দৃষ্টান্তে) এই অখণ্ড অনুভূতিকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া সাজাইতে চাই। এই কল্পনার সাহায্যেই আমরা ক্ষুদ্রতম পরিণামকেও অবস্থাত্রয়ে বিভক্ত করিয়াছি; যদিও বস্তুতঃ ইহা এক ও অখণ্ড পরিণামরূপেই অনুভূত হয়। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে সাংখ্যদর্শনের একটা বিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাংখ্যের সৃষ্টিপ্রক্রমে কারিকাতে দিক্ ও কালের কোনই উল্লেখ নাই। সাংখ্য-সূত্রে বলা হইয়াছে ইহাদের উৎপত্তি আকাশ হইতে। যদি তাহাই হয় তবে প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, উহা হইতে অহঙ্কার ইত্যাদি পরপর যে সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে তাহা আপাতদৃষ্টিতে কালিকক্রমে সংঘটিত মনে হইলেও

বস্তুতঃ সেইরূপ হইতে পারে না। অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের সৃষ্টিতে দেশ কালের স্থান নাই। মহাভূতের সৃষ্টির পর তাহাদের সংযোগ-বিভাগে যে ভৌতিক জগৎ গঠিত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহাতেই দেশ ও কালের স্থান। সাংখ্যের এই মত সম্বন্ধে গবেষণা ও আলোচনার অবকাশ যথেষ্ট আছে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই সম্বন্ধে আর বিস্তারিত আলোচনার অবসর নাই।

কারিকামতে গুণত্রয়ের মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত অপর একটি সম্বন্ধ এই যে উহারা পরস্পরকে জন্মায়। এখানে জন্মান অর্থ কি? তিন প্রকার পৃথক ও বিরুদ্ধ কার্য্য হইতে তাহাদের কারণস্বরূপ তিনটি ভিন্ন গুণের অনুমান করা হইয়াছে। সুতরাং গুণগুলি বিভিন্ন জাতীয় শক্তি এবং একটি হইতে অন্যটীর জন্ম স্বীকার করা যায় না। সেজন্য বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন 'জনন' অর্থ এখানে অন্যগুণকে নিজ নিজ রূপে অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য্যে পরিণত হওয়ার সাহায্য করা। তাহা হইলে বলিতে হইবে সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমঃকে নিজ নিজ কার্য্যোৎপাদনে প্রযুক্ত করে এবং রজোগুণও সত্ত্ব ও তমঃকে কার্য্যে প্রযোজিত করে, তেমনি তমোগুণ সত্ত্ব ও রজঃকে প্রযোজিত করে। ইহার অর্থ এই যে গুণগুলির কার্য্য পৃথক প্রকারের হইলেও ইহাদের কোন একটীর অস্তিত্ব ও কার্য্য অপর দুইটী ভিন্ন কল্পনা করা যায় না।

ইহাই আরও স্পষ্ট করার জন্য উক্ত কারিকাতে বলা হইয়াছে, গুণগুলি একত্র মিথুনভাবে অর্থাৎ অবিনাভাবী সহচররূপে অবস্থান করে। অনভিব্যক্তি ব্যতীত প্রবৃত্তি ও অভিব্যক্তি কল্পনা করা যায় না, তেমনি প্রবৃত্তি ব্যতীত অনভিব্যক্তি এবং অভিব্যক্তি বুঝা যায় না, এবং অভিব্যক্তি ভিন্ন অনভিব্যক্তি ও প্রবৃত্তির অর্থ হয় না। ইহারা পরস্পরসাপেক্ষ এবং অবিচ্ছেদ্য।

গুণত্রয়কে প্রকৃতির অবয়ব স্বীকার না করিয়া এবং ইহাদের মধ্যে সংযোগ-বিয়োগ প্রভৃতি সম্বন্ধ কল্পনা না করিয়া কিরূপে ইহাদের সম্পর্ক কল্পনা করা যায় তাহা কারিকানুসারে দেখাইবার চেষ্টা করা হইল। দেশ ও কাল যাহার পরিণাম তাহা স্বয়ং দেশ ও কালের সাহায্য ছাড়াও বিদ্যমান। অবয়ব, সংযোগ ও ক্রমিক পরিবর্ত্তন ইত্যাদি দেশকাল ব্যতীত বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং ইহাদের সাহায্য ব্যতীতই এখানে গুণত্রয়ের সম্পর্ক কল্পনা করার চেষ্টা করা হইয়াছে। এইজন্যই ইহাদিগকে তিনটী শক্তিরূপে কল্পনা করার প্রয়োজন হইয়াছে।

গুণগুলি সুখ, দুঃখ, মোহের কারণ ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। কারিকানুসারে সত্ত্ব সুখাত্মক বা সুখস্বরূপ, শুধু সুখের কারণই নয়। তেমনি রজঃ দুঃখস্বরূপ এবং তমঃ মোহস্বরূপ। সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যমতে কার্য্য কারণে অব্যক্ত-ভাবে থাকে। সুখ যাহার কার্য্য তাহাতেও সুখ আছে। দুঃখ ও মোহের বেলাতেও সেইরূপ। সুতরাং সুখের কারণকে সুখাত্মক বলাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। তথাপি প্রশ্ন হইতে পারে, সত্ত্বাদির প্রকাশ প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্যও ত আছে, তবে উহাদিগকে প্রকাশাত্মক ইত্যাদি না বলিয়া সুখাত্মক ইত্যাদি বলার তাৎপর্য্য কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, সাংখ্য জগৎকে প্রধানতঃ ভোগের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন; বিষয় সমূহ সাংখ্যের মতে পুরুষের ভোগ্যবস্তুরূপেই সৃষ্ট। ভোগ্যরূপে বিষয়ের বিচার করিলে বিষয়ের সুখ-দুঃখ-মোহ জন্মাইবার কথাই প্রথমে উঠে। সেই জন্যই ইহাদের উপর সাংখ্য বিশেষ জোর দিয়াছেন। এই প্রশ্নের মীমাংসা হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন হইতে পারে—চেতন জ্ঞাতা বা ভোক্তার অন্তঃকরণেই, এবং বিষয়ের সংস্পর্শেই, সুখ, দুঃখ, মোহ উৎপন্ন হয়। সুতরাং জ্ঞাতৃ-নিরপেক্ষ বিষয়ে সুখাদির অস্তিত্ব কল্পনা করা কিরূপে সঙ্গত হয়? পুষ্প কোন জ্ঞাতৃ-বিশেষের অন্তঃকরণেই সুখাকার বৃত্তি উৎপাদন করিতে পারে; কিন্তু পুষ্পকে সুখস্বরূপ বলা যায় কিরূপে? এই শঙ্কা দূর করিতে হইলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, সাংখ্যের মতে প্রকৃতির সকল পরিণামই পুরুষের সম্পর্কে ঘটে এবং পুরুষের সংসৃষ্ট অন্তঃকরণের পরিণামের ভিতর দিয়াই উহাদের সম্বন্ধে জ্ঞানও হয়। সুতরাং কোন বিষয় বা পরিণামই সাংখ্যমতে জ্ঞাতৃ-নিরপেক্ষ নয়। আমরা যখন যে রঙ্ দেখি তাহা সূর্য্যের আলোকের সম্পর্কেই সম্ভব হয়, কিন্তু এই সম্পর্ক সর্ব্বত্র বিদ্যমান বলিয়া ইহা আমরা উল্লেখ করি না। আমরা বলি চূণ লাগাইলেই দেওয়াল সাদা হয়, আলোক থাকিলেই সাদা হয় ইহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি; এবং সাধারণ কারণকে ত্যাগ করিয়া অসাধারণ কারণ চূণেরই উল্লেখ করি। সেইরূপ জ্ঞাতার সম্পর্কেই পুষ্প সুখ দেয় ইহা জানিলেও সাংখ্য সাধারণ কারণরূপ জ্ঞাতৃ-সম্পর্ক উল্লেখ না করিয়া অসাধারণ কারণ পুষ্পকেই সুখের কারণরূপে উল্লেখ করেন; এবং সৎকার্য্যবাদ অবলম্বন করিয়া সুখহেতুকে ও সুখাত্মক বলিয়া বিবেচনা করেন। সুতরাং এই যুক্তিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃকে যথাক্রমে সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক বলা কিছুই অসঙ্গত নয়। বস্তুতঃ প্রচলিত ভাষাতেও আমরা 'চাকুরী দুঃখেরই কারণ, সুখের কারণ নহে' ইহা বলিতে গিয়া কখনও কখনও 'চাকুরীতে দুঃখই, সুখ নাই', এইরূপ বলিয়া থাকি।

ত্রিগুণের যে ব্যাখ্যা আমরা এখানে করার চেষ্টা করিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে দুই তিনটি আপত্তি সংক্ষেপে বিবেচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমরা উপরে বলিয়াছি সাংখ্যমতে বিষয়ের পরিণাম জ্ঞাতৃ-নিরপেক্ষ নহে, কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম সাংখ্যমত বিজ্ঞানবাদ হইতে স্বতন্ত্র। আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি উক্তি বিরুদ্ধ মনে হইতে পারে। সেজন্য কি হিসাবে বিষয় জ্ঞাতা হইতে স্বতন্ত্র এবং কি হিসাবে উহা জ্ঞাতৃসাপেক্ষ তাহা পরিস্কার করিয়া বলা উচিত। বিজ্ঞানবাদ-মতে বিজ্ঞানই বিষয়ের উপাদান, কিন্তু সাংখ্য মতে বিষয়ের উপাদান ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। প্রকৃতির অস্তিত্ব জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ; কিন্তু প্রকৃতির বিষয়াকারে অভিব্যক্তি বা পরিণাম জ্ঞাতৃসাপেক্ষ। বদ্ধ পুরুষের ভোগবাসনার প্রেরণাতেই প্রকৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পরিণত হয়। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাংখ্যমতে পুরুষ বহু এবং তাহাদের বাসনাও বিভিন্ন, তাহা হইলে প্রকৃতি কিরূপে এক সামান্য জগৎ রূপে পরিণত হইতে পারে? ব্যক্ত জগৎ যে বহু দ্রষ্টার দ্বারা দৃশ্য, সুতরাং সামান্য তাহা কারিকাতে স্বীকৃত হইয়াছে। আবার কোনও পুরুষ মুক্ত হইলে প্রকৃতি তাহার লীলা সংহার করে, এ কথাও বলা আছে। সাংখ্য দর্শনের প্রকৃত অভিপ্রায় কি বুঝা বড়ই কঠিন। সাংখ্য কতটুকু বিষয়-স্বাতন্ত্র্যবাদী (realistic) তাহা নির্ণয় করা বিশেষ গবেষণা-সাপেক্ষ। আমরা সংক্ষেপে এখানে এই সমস্যার আংশিক বিচার করিয়া একটা স্থূল সমাধানের চেষ্টা করিব। সবদিক্ হইতে বিচার করিয়া উহা কতটুকু গ্রহণীয় হইবে বলিতে পারি না।

প্রত্যেক পুরুষের জন্য সৃষ্ট জগৎ যদি সম্পূর্ণ পৃথক হইত তবে ভাষা-দ্বারা ভাবের আদান প্রদান করা এবং কোনও সম্মিলিত চেষ্টা করা সম্ভব-পর হইত না। আবার প্রত্যেক পুরুষই ঠিক একই জগৎ প্রত্যক্ষ করে ইহাও স্বীকার করা যায় না। কারণ, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ জগৎ সম্বন্ধে এত দৃষ্টিভেদ ও অনুভূতিভেদ হইত না। সুতরাং জগৎ কিয়দংশে এক এবং কিয়দংশে পৃথক্ মানিতেই হইবে। আবার যদি পুরুষের বাসনাতেই প্রকৃতির সৃষ্টিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় তবে ইহাও মানিতে হইবে যে বহুপুরুষের বাসনার মধ্যেও অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে, যাহার দ্বারা তাড়িত হইয়া প্রকৃতি কিয়দংশে এক সাধারণরূপে পরিণত হয়। ইহাই সামান্য জগৎ। আবার সে যে অংশে বাসনার পার্থক্য, বাসনার সেই সেই অংশের প্রেরণায় এই সামান্য জগৎ প্রত্যেক পুরুষের জন্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে এই কল্পনা অনেকটা স্পষ্ট হইতে পারে। বহুলোকের সদৃশ প্রবৃত্তি বা বাসনার বলে একটা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট হয় এবং সদৃশ প্রবৃত্তি ও সদৃশ অধ্যয়নাদি রূপ পূর্ব্বকর্ম্মের ফলে নানা দেশ হইতে

বিভিন্ন ছাত্র ইহাতে অধ্যয়নের জন্য সমবেত হয়। কিন্তু সবের পক্ষে এই বিশ্ববিদ্যালয় যেমন কিয়দংশে এক, তেমনি কিয়দংশে স্বতন্ত্রও। পূর্ব্ব কর্ম্ম ও গুণানুসারে কাহারও নিকট ইহা জ্ঞান, সুখ, সম্মান, সমৃদ্ধির আকর বলিয়া প্রতিভাত হয়, কাহারও নিকট ইহা জটিলতা, বিভীষিকা, দুঃখ, দুশ্চিন্তারই কারণ। এই পার্থক্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র এক এক প্রকারের হয়। যে অংশে বহুলোকের প্রবৃত্তি সদৃশ, সেই অংশের ফলে এক সমানাকার বুদ্ধি তাহাদের মনে উদিত হয়; তাহা হইতে এক সামান্য চেষ্টা আসে ও সামান্য কার্য্য উৎপন্ন হয়। এই সামান্যবুদ্ধিই সমষ্টিবুদ্ধি। ইহাই সামান্য জগৎ সৃষ্টির কারণ। যে অংশে প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন, তাহাদ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রকৃতি বিভিন্ন বুদ্ধিতে পরিণত হয় এবং তাহা হইতে পৃথক্ পৃথক্ বিষয় সমূহের সৃষ্টি হয়।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তানুসারে এক জীব মুক্ত হইয়া গেলেও অন্য জীবদের সদৃশ বাসনাদ্বারা সৃষ্ট সদৃশ জগৎ তাহাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইবে। একজন ছাত্রের অধ্যয়নপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলেও অন্যদের অপূর্ণ বাসনা পরিপূর্ণ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু যদি সকলের বাসনা চরিতার্থ হইয়া যায়, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব আর থাকিতে পারে না; সেইরূপ সকল জীবের বাসনার উচ্ছেদ হইলে দৃশ্যমান জগৎও প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়।

এই আলোচনা হইতে মনে হইবে যে সাংখ্যমতে প্রত্যেক জীবের কর্ম্মবশে প্রকৃতি বিভিন্ন জগৎরূপে পরিণত হইলেও কর্ম্মের সাদৃশ্যবশতঃ এই সব জগৎ সদৃশ কিন্তু সম্পূর্ণ এক নয়। পিপীলিকার নিকট প্রতীয়-মান জগৎ মনুষ্যের নিকট প্রতীয়মান জগৎ হইতে অনেক স্বতন্ত্র; সেইরূপ শিশুর জগৎ হইতে বৃদ্ধের জগৎ স্বতন্ত্র এবং বৈরাগীর জগৎ হইতে কামুকের জগৎও স্বতন্ত্র।

এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্ববর্ণিত সাংখ্যের বিষয় প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ারই অনুযায়ী। কারণ পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, ইন্দ্রিয়সাহায্যে জীবের অন্তঃকরণ যে রূপে পরিণত হয়, বিষয় সেইরূপেই তাহার নিকট প্রত্যক্ষ হয়। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের পার্থক্যবশতঃ প্রত্যক্ষ বিষয়ের রূপেরও পার্থক্য হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং যাহা আমার নিকট সুখরূপে প্রতিভাত অন্যের নিকট তাহা দুঃখরূপে প্রত্যক্ষ হওয়া বিচিত্র নহে।

আমাদের কল্পিত গুণত্রয়ের ব্যাখ্যানুসারে প্রলয় ও সৃষ্টির অর্থ কি, এই সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে। প্রলয়কালে জগৎ অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে, সুতরাং আমাদের ব্যাখ্যানুসারে তখন শুধু তমঃ গুণেরই অস্তিত্ব থাকা উচিত। তখন ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা কিরূপে স্বীকার করা যায়? আবার সৃষ্টির অবস্থা অভিব্যক্তিরই অবস্থা, তাহাতে শুধু সত্ত্বেরই

অস্তিত্ব স্বীকার করা উচিত, তাহাতে ত্রিগুণের কল্পনা কিরূপে হইতে পারে? এই প্রকার সন্দেহের উত্তরে বলা দরকার যে, কোন একটি অবস্থাকেই নিরপেক্ষভাবে অভিব্যক্ত বা অনভিব্যক্ত বলা যাইতে পারে না। বীজ অতীত বৃক্ষের অভিব্যক্তাবস্থা, কিন্তু ভাবী বৃক্ষের অনভিব্যক্তাবস্থা। সুতরাং এক দিক হইতে যেমন ইহা সত্ত্বেরই কার্য্য, অন্য দিক হইতে তমের কার্য্য। আবার বীজের মধ্যে যে ভাবীবৃক্ষ সৃষ্টির দিকে উন্মুখতা আছে সেইজন্য উহাতে রজোগুণের অস্তিত্বও স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রলয়ের বা সৃষ্টির অবস্থাকেও এইরূপে বিভিন্ন দিক দিয়া বিচার করিলে তিনটি গুণের অর্থাৎ শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন মনে হইবে। সৃষ্টিকালের কোন তামসিক পরিণাম হইতে প্রলয়কালের অবস্থার পার্থক্য বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে সৃষ্টি কালে অভিব্যক্তির দিকে প্রবৃত্তি সর্ব্বদাই রহিয়াছে এবং অল্পাধিক মাত্রায় উহা সফলও হইতেছে। যদি অসফলতার মাত্রাই অধিক হয় তবে সেই পরিণামটি তামসিকরূপে (অজ্ঞানরূপে, গুরুরূপে বা মোহরূপে) অনুভূত হয়। কিন্তু প্রলয়কালে অভিব্যক্তির দিকে প্রবৃত্তি শুধু ব্যাহত নহে, ব্যাবৃত্ত বা অন্তঃসংহৃত। সেজন্য গুণগুলির পরস্পরকে অভিভূত করার প্রশ্নই নাই, এবং কোনও একটি গুণের আধিক্যের সম্ভাবনাও নাই। তাই ইহার নাম সাম্যাবস্থা।

সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব অতি গভীর, অথচ উহার বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত। সেইজন্য এই শাস্ত্রের পঠন-পাঠন আবৃত্তি দ্বারা সম্পন্ন করার রীতিই সমধিক প্রচলিত। যাঁহারা তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পদে পদে নিজ নিজ কল্পনার সাহায্য লইতে হইয়াছে। এইজন্য বাচস্পতি মিশ্রের একরকম ব্যাখ্যা, বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যা তাহার বিপরীত। সাধারণ বহির্ম্মুখ পাশ্চাত্য দর্শনের চিন্তার ধারায় যাঁহারা অভ্যস্ত তাঁহাদের নিকট সাংখ্য প্রথমতঃ বড়ই অদ্ভুত ও যুক্তিহীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকের মধ্যেও প্রাচীনকালে এবং বর্ত্তমান যুগে এমন কয়েকজন সূক্ষ্মদর্শী মনীষী ছিলেন ও আছেন যাঁহাদের চিন্তার ধারা বিভিন্ন বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিবার সাহায্য করে। আভ্যন্তর, অবিভক্ত প্রবৃত্তির উন্মেষে বাহ্য, বিভক্ত জগতের সৃষ্টি বুঝিবার পক্ষে ও সাংখ্যের অন্য কয়েকটি তত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে বার্গসোঁর দর্শন হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। জীববিদ্যাবিশারদ বার্গসোঁর মতে কর্ম্মার্থক চিন্তার প্রবৃত্তি হইতেই মস্তিষ্কের উৎপত্তি, মস্তিষ্ক হইতে চিন্তার উৎপত্তি নয়। এই মত অহঙ্কাররূপে পরিণত বুদ্ধি হইতে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের উৎপত্তির কথাই প্রকারান্তরে সমর্থন করে। আবার সাংখ্যের গুণত্রয়ের সঙ্গে বার্গসোঁর torpor, instinct, intelligence এই ত্রিধা বিভাগের

অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু আধুনিক প্রবীন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক হুয়াইট্‌হেডের দর্শনের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁহারা দেখিতে পাইবেন সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে তাঁহার মতের কত সাদৃশ্য! জগৎকে পরিণামের সমষ্টি এবং প্রবাহরূপে কল্পনা, প্রত্যেকটি পরিণামের জ্ঞাতৃ-সাপেক্ষতা ও প্রয়োজনসাধকতা, অবিভক্ত হইতে বিভক্তের সৃষ্টি ইত্যাদি বহু বিষয়ে উভয় দর্শনের আশ্চর্য্য মিল। অধিকন্তু দেশ-কালাতীত সৃষ্টি-শক্তি হইতে দেশকালময় জগতের উৎপত্তি উভয় দর্শনেরই অভিমত। কাল ছাড়া সৃষ্টির ক্রম কিরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে—সাংখ্য এই এই সম্বন্ধে প্রায় নীরব। হুয়াইট্‌হেড্‌ এই বিষয়ে তাঁহার Process And Reality গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেকটি পরিণামের অনুভূতি প্রথমতঃ দেশকাল সম্পর্কবর্জ্জিত এক ও অখণ্ডরূপেই জন্মে। তাহাকে খণ্ডিত করিয়া আমরা বিভিন্ন অংশে বিশ্লেষণ করি এবং পাশাপাশি বা পরপর সাজাই। অনুভূতির দিক দিয়া যাহা কালহীন তাহাকেই বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিলে কালগ্রস্ত মনে হয়। যাহা এক তাহাই খণ্ডিত হইয়া ক্রমিক ভাবে দেখা দেয়। কালের উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে ষোড়শগণের সৃষ্টি আমরা যদি এইভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে কেমন দাঁড়ায় বিবেচনীয়। আমাদের তবে ভাবিতে হইবে যে যদিও বাহ্য দিক্‌ হইতে বর্ণনা করিতে গেলে আমাদিগকে এই সৃষ্টি পরপর বা ক্রমে হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হয়, তথাপি বস্তুতঃ প্রকৃতি হইতে ষোড়শগণ পর্য্যন্ত সৃষ্টি একই অনুভূতক্ষণে হইয়া যায়। এক দিক হইতে যাহা অখণ্ডক্ষণ, অন্যদিক হইতে তাহাই বহু ক্রমিক ক্ষণাংশে গঠিত কালের ধারা। আমাদের দেশে এই তত্ত্ব নূতন নয়। পৌরাণিক কাহিনীতে ইহা সুপ্রচলিত—যদিও ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমরা সর্ব্বদা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। পৌরাণিকরা বলিয়াছেন, ব্রহ্মার নিমেষই মানুষের দৃষ্টিতে বহুসহস্রবর্ষ-ব্যাপী এক সর্গ-কাল। আমাদের দৃষ্টিতে যাহা ক্রমিক, ব্রহ্মার দৃষ্টিতে তাহা যুগপৎ বর্ত্তমান। ন্যায়-বৈশেষিকদর্শনে ঈশ্বরের গুণের মধ্যে স্মৃতি বা সংস্কারের উল্লেখ নাই। ইহার তাৎপর্য্যও একই। আমাদের নিকট যাহা ভূত-ভবিষ্যদ্‌-বর্ত্তমানরূপে প্রতিভাত হয়, ঈশ্বরের নিকট তাহা এক অখণ্ড প্রত্যক্ষানুভূতির বিষয়। একদিক হইতে যাহা ক্ষণমাত্র, অন্যদিক হইতে তাহারই গর্ভে এক যুগ নিহিত।[১] আমাদের দৈনন্দিন অনুভূতির মধ্যেও এই তত্ত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। অন্নদাতাকে মৃত্যুশয্যায় দেখিবা-

---

১। হুয়াইট্‌হেডের Epochal Theory Of Time অনুসারেও এক একটী বর্ত্তমান ক্ষণ এক একটি যুগ বা epoch.

মাত্র বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। একক্ষণে যাহা ঘটিল বা অনুভূত হইল, তাহা বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে বা বুঝাইতে গেলে তিনি কি ছিলেন, এখন কি অবস্থায় আছেন এবং ইহার ভবিষ্যৎ ফল কি, এই তিনকালের চিন্তা আসিয়া পড়ে।

সাংখ্যদর্শনের নিগূঢ় সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে বার্গসোঁ, হুয়াট্‌হেড্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের চিন্তার ধারা কোন কোন বিষয়ে সহায় হইতে পারে ইহাই সংক্ষেপে বলা হইল। কিন্তু এই সকল দর্শন বা আমাদের বৌদ্ধ দর্শন হইতে সাংখ্যের একটা বড় প্রভেদ স্মরণ রাখাও প্রয়োজন। সাংখ্য বিষয়-জগতে নিত্য পরিণামশীলতা মানিলেও সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ী আত্মা বা পুরুষের পরিণামাতীত অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সকল পরিবর্ত্তন বা পরিণাম যাঁহার উদ্দেশ্যে ঘটে, তিনি পরিণামের দ্রষ্টা বা ভোক্তা, সুতরাং পরিণাম হইতে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসিদ্ধ। ইহা স্বীকার না করিলে সাংখ্যের মত সর্ব্বাংশে ক্ষণিকবাদেই পরিণত হইত। বার্গসোঁ ও হুয়াইট্‌হেড্‌ অপরিণামী জ্ঞাতার অস্তিত্ব মানেন না।

প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে, এই প্রবন্ধে সাংখ্যের গুণত্রয়ের ও সৃষ্টিতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা করা হইল, তাহা সাংখ্যকারিকার ভিত্তিতেই কল্পিত। অন্যান্য অনেক দিক্ হইতে ইহার দোষগুণ বিচার করা আবশ্যক। সুতরাং বর্ত্তমান কল্পনাকে সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করিতে বলিতে পারি না। যাঁহাদের এই সম্বন্ধে কৌতূহল আছে, তাঁহাদিগকে এই ব্যাখ্যা কতটুকু যুক্তি-সঙ্গত এবং ইহাতে কি বিষয়ে আপত্তি বা অনুপপত্তি সম্ভব বিচার করিয়া দেখিতে বলি। ভবিষ্যতে 'দর্শনে' ইহার আরও আলোচনা বাঞ্ছনীয়। ভারতীয় সংস্কারও চিন্তার ধারার উপর 'সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ' এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে উহার অর্থনির্ণয়ের চেষ্টা বর্ত্তমান ভারতীয় দার্শনিকদের পক্ষে একটা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

শঙ্কর-বেদান্তে ব্রহ্ম ও জগৎ

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, এম, এ।

এই বিশ্বের উৎপত্তির কথা বলিতে গিয়া, নাম-রূপাদির অভিব্যক্তির বিবরণ দিতে গিয়া, ভাষ্যকার যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা 'সামান্য' ও 'বিশেষ'—এই দুইটী শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই সামান্যগুলি অনেক প্রকার এবং ইহারা ক্রমোর্দ্ধভাবে এক প্রজ্ঞান-ঘন 'মহাসামান্যের' অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, যেটী যাহার অন্তর্ভুক্ত, সেটী উহার ব্যাপক বলিয়া, উহা হইতে অধিক—উহা হইতে অন্য; কেন না নিজেই নিজকে ব্যাপিয়া রাখা যায় না। পাঠক-পাঠিকার বুঝিবার সুবিধা হইবে মনে করিয়া আমরা এ স্থলে ভাষ্যকারের সমগ্র মন্তব্যটী উদ্ধৃত করিতেছি:—

"সামান্য-বিশেষবানর্থো নাম-ব্যাকরণবাক্যে বিবক্ষিতঃ। অনেকে হি বিলক্ষণাশ্চেতনাচেতনরূপাঃ সামান্য-বিশেষাঃ —তেষাং পারম্পর্য্যগত্যা একস্মিন্ মহাসামান্যে অন্তর্ভাবঃ প্রজ্ঞান-ঘনে।" (বৃঃ ভাঃ, ২-৪-৯)। "যৎ যস্য অন্তর্ভবতি, তদ্ব্যাপকত্বাৎ ততোঽন্যঃ", "ন হি তেনৈব তদ্ব্যাপ্যতে।"

আমরা এই যে 'সামান্য' ও 'বিশেষ' - এই শব্দ দুইটী পাইতেছি, এই দুইটীই বেদান্তের পারিভাষিক শব্দ। কারণদ্রব্যকে সামান্য বলা হয়, এবং সেই কারণ হইতে যে বিকার বা কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিশেষ বলা হয়।

"সামান্যং' 'স্বরূপ' শব্দেন পরিভাষিতম্। স্বরূপপরিভাষা চ স্থিরতামাত্রেণ।"

শঙ্কর বলিয়াছেন—

"স্থিরস্বভাবানাং...কারণভাবদর্শনাৎ।"

দ্রব্যমাত্রেরই একটী স্বরূপ বা স্বভাব (nature, character) আছে, এবং এই স্বরূপটী স্থির, নিত্য। কারণ বস্তু মাত্রেরই একটী স্থির স্বভাব আছে এবং ইহাই আপনি স্থির থাকিয়া, উহা হইতে উৎপন্ন বিকার-গুলির মধ্যে—কার্য্যবর্গের মধ্যে—অনুগত হইয়া থাকে, অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহে।

"বিশেষা হি আগমাপায়িতয়া ন দ্রব্যস্থ স্বরূপাণি।"

"বিশেষস্তু বিক্রিয়া।"

'বিশেষ'শব্দটী বেদান্তে কারণ হইতে উৎপন্ন কার্য্যবর্গকে বুঝায়। সামান্য হইতেই বিশেষ উৎপন্ন হয় এবং সামান্যই আপন স্বরূপ দ্বারা বিশেষগুলিকে ধরিয়া রাখে।

"সামান্যাৎ হি বিশেষা উৎপদ্যন্তে। সামান্যমাত্মস্বরূপপ্রদানেন বিশেষান্ বিভর্ত্তি।"

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য 'কার্য্য' কাহাকে বলে তাহা বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রকার বিশেষ-রহিত যে 'সামান্য' বা কারণ-দ্রব্য, উহা যখন কোন বিশেষ অবস্থান্তর গ্রহণ করে, তাহাকেই উহার 'কার্য্য' বলা যায়।

"অপাস্তবিশেষং সামান্যং বিশেষবদবস্থান্তরমাপদ্যমানং কার্য্যসংজ্ঞাং লভতে।"

সর্ব্বপ্রকার বিশেষ বিশেষ গুণ, ধর্ম্ম, নাম-রূপাদি বর্জ্জিত বলিয়া, এখনও উহাতে নাম-রূপাদি, বিশিষ্ট গুণ, ধর্ম্ম প্রভৃতি অভিব্যক্ত হয় নাই বলিয়া, উহাকে 'নির্ব্বিশেষ সামান্য' বলা হয়। বট-বীজের মধ্যে যেমন, পরে উৎপন্ন পত্র-শাখাদি, বীজরূপে, শক্তিরূপে নিদ্রিত থাকে ('বট-কণিকায়ামিব বটবীজশক্তিঃ'), ঠিক সেইরূপ কারণবস্তুটীর মধ্যে গুণ-ধর্ম্ম-ক্রিয়া প্রভৃতি নিদ্রিত থাকে, বিলীন থাকে বলিয়াই, উহাকে নির্ব্বিশেষ বলা হয়। এই নির্ব্বিশেষ কারণ দ্রব্যই পরে বিশেষ বিশেষ অবস্থান্তর গ্রহণ করিয়া কার্য্যরূপে দেখা দেয়। পরম-কারণ ব্রহ্মকেও এইজন্য নির্ব্বিশেষ মহাসামান্য বলা হইয়াছে।

"সামান্যং হি ব্রহ্ম। অপোঢ়সর্ব্ববিশেষত্বাৎ সর্ব্বসামান্যাচ্চ ব্রহ্মণঃ।"

কারণ দ্রব্যটিকে কেন 'নির্ব্বিশেষ' বলা হয়, তাহা আমরা বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ইহা নির্ব্বিশেষ হইলেও, নিঃস্বরূপ নহে। কারণ বস্তু মাত্রেরই একটী করিয়া স্বরূপ বা স্বভাব আছে। এ কথা ভাষ্যকার আমাদিগকে নানাস্থানে, নানা ভাবে বলিয়া দিয়াছেন।

"যে পদার্থের যে স্বরূপ বা স্বভাব প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে, সেই পদার্থের সেই স্বভাব, দেশ-কাল বা অবস্থার পরিবর্ত্তনেও, তাহা ত্যাগ করে না।"[১]

১। যদ্ধর্ম্মকোঃ যঃ পদার্থঃ প্রমাণেন অবগতো ভবতি, স দেশকালাবস্থান্তরেষ্বপি তদ্ধর্ম্মক এব ভবতি (বৃঃ ভাঃ, ২।১।২০)।

"দ্রব্যের যেটী স্বভাব, তাহা স্বাভাবিক...সেই স্বভাব কখনই দেশ বা কালাদির পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয় না।"[২]

"কোন পদার্থই দেশান্তরে বা কালান্তরে নিজ নিজ স্বভাবকে পরিত্যাগ করে না।"[৩]

"যাহার যেটী স্বভাব, তাহার অন্যথাভাব হয় না।"[৪]

"পদার্থদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নাই, একথা কখনই বলা যায় না; এবং এই স্বভাবটী নিত্য।"[৫] ভাষ্যকার আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে,—

"সাংখ্যেরাই কারণ-দ্রব্যের অন্যথাভাব বা অবস্থান্তর স্বীকার করিয়া বলেন যে, কারণ দ্রব্যটাই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া কার্য্যাকার ধারণ করে। আমরা একথা স্বীকার করি না। আমরা বলি যে, কার্য্যাকার ধারণ করিলেও, কারণ দ্রব্যটী আপনার নির্ব্বিশেষ স্বরূপকে ত্যাগ করে না; উহা আপন স্বরূপে স্থির থাকিয়াই, কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট যায়।"[৬]

এই প্রকারে, ভাষ্যকার পরমকারণ ব্রহ্মেরও নির্ব্বিশেষ স্বরূপ বা স্বভাব স্বীকার করিয়াছেন।

"ব্রহ্মণঃ সত্তালক্ষণঃ 'স্বভাবঃ' আকাশাদিষু অনুবর্ত্তমানো দৃষ্টঃ।"

কারণ দ্রব্যের স্বভাব বা স্বরূপ আছে,—ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, উহা সৎ, উহা ভাবাত্মক (positive); স্বভাবটী অসৎ বা অভাবাত্মক (negative) হইতে পারে না। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেদান্তের নির্বিশেষ নিগুণ ব্রহ্মকে characterless nothing—without consciousness, without activity—void—বলিয়া জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন। তজ্জন্যই এস্থলে ভাষ্যকারের মত বিশেষ করিয়া বলিতেছি।

কারণবস্তুর যে স্বরূপ বা স্বভাবের কথা বলা হইল, উহা যে অসৎ বা অভাবাত্মক— Nothing নহে, ইহা দেখাইতে ভাষ্যকার তিন প্রকার প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। তাহা এইরূপ :—

২। স্বাভাবিকী দ্রব্যস্বভাবত এব সিদ্ধা ..সাপি ন কালান্তরে ব্যভিচরতি দেশান্তরে বা (সাঃ কাঃ ভাঃ ৪।৯)।

৩। ন পুনঃ পদার্থাঃ দেশান্তরে কালান্তরে বা স্বং স্বভাবং জহতি (কেঃ, ভঃ, ৩।১২)।

৪। যা প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ তস্যা অন্যথাভাবো নাস্তি (মাঃ কাঃ ভাঃ)।

৫। ন চ স্বাভাবিকো ধর্ম্মঃ নাস্তি পদার্থানামিতি শক্যং বক্তুং, ন চ স্বভাবাৎ অন্যং নিত্যং কল্পয়িতুং শক্যম্ (বৃঃ ভাঃ, ৪।৪।৬)।

৬। ...সাংখ্যাদিভি র্বাদিভিঃ তস্য (স্বভাবস্য) অন্যথাভাবঃ কল্প্যতে—কারণমেব কার্য্যাকারেণ পরিণমতে ইতি (মাঃ কাঃ ভাঃ ৪।১০।১১)।

(১) একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, যাহা নির্ব্বিশেষ, যাহার কোন প্রকার বিশেষ ধর্ম্ম, গুণাদি নাই, তাহাকে কিরূপে গ্রহণ করিব? কোন্ চিহ্ন দ্বারা তাহার পরিচয় পাইব? সুতরাং এরূপ কিছুর অস্তিত্ব—সত্তা - সিদ্ধ হইবে কিরূপে? এ আশঙ্কার উত্তর এই যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-চৈতন্যকে যখন (শ্রুতিতে) এই জগতের 'কারণ' বলা হইয়াছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, সেই কারণের একটা স্বরূপ বা স্বভাব আছে। ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি। এই জগৎরূপ 'কার্য্যই' তাঁহার পরিচায়ক চিহ্ন। এই কার্য্যদ্বারাই তাঁহাকে ধরিতে, ছুইতে, বুঝিতে পারা যায়। অতএব সেই কারণটার সত্তা আছে; উহা অসৎ, অভাবাত্মক হইতে পারে না। কেননা, আমরা এই জগতে দেখিতে পাই যে, "যাহা হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হয়, জন্মগ্রহণ করে, তাহার অস্তিত্ব আছে। ব্রহ্ম এই আকাশাদির কারণ; সুতরাং তাঁহার অস্তিত্ব নাই, ইহা হইতে পারে না। অসৎ হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হয়, ইহা আমরা জগতে দেখিতে পাইনা।"

"যস্মাচ্চ জায়তে কিঞ্চিৎ, তৎ অস্তীতি দৃষ্টং লোকে। আকাশাদি কারণত্বাৎ ব্রহ্মণঃ, ন নাস্তি ব্রহ্ম।" (তৈঃ ভাঃ, ২-৬-১) এবং "ন চ অসতো জাতং কিঞ্চিৎ গৃহ্যতে লোকে কার্য্যম্।"

(২) কার্য্যের উৎপত্তি দ্বারা যেমন উহার কারণের সত্তা বুঝিতে পারা যায়, এইরূপ কার্য্যের বিনাশের দ্বারাও কারণের সত্তা বুঝা যায়। কার্য্য বা বিকার গুলিকে নষ্ট করিতে করিতে সর্ব্বশেষে আমরা কারণের সত্তায় গিয়াই উপস্থিত হই। সেই সত্তার আর বিনাশ সম্ভব হয় না। কেন না, কার্য্যের সেই সত্তাকেও যদি লোপ কর, তাহা হইলে উহা যে একটা কোন বস্তু ছিল, তাহা বুঝা যাইবে না। সুতরাং বস্তুর সত্তার বিনাশ অসম্ভব।—

"সর্ব্ববিশেষরহিতোপি জগতো মূলমস্ত্যেব, কার্য্যপ্রবিলাপনস্য অস্তিত্বনিষ্ঠত্বাৎ।" (কঠঃ ভাঃ)।

আবার—"পরিশিষ্যমাণে কস্মিংশ্চিৎ ভাবে অকল্প্যতে, শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ ....অন্যথা নিরাস্পদত্বাৎ নোপলভ্যতে" (বেঃ ভাঃ, ৩-২-২৫)।

মনে করা যাউক্, বর্ণ, গন্ধ, আকার, পত্র, নাম, রূপ—এই সকল বিশেষ বিশেষ গুণ বা ধর্ম্ম লইয়া একটী ফুল আমার সম্মুখে। আমি একটীর পর একটী করিয়া এই বিশেষ গুণ বা ধর্ম্ম গুলিকে সরাইয়া লইতে লাগিলাম। যখন সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্মগুলি চলিয়া গেল, তখন কি অবশিষ্ট রহিল? সর্ব্বপ্রকার-বিশেষ-রহিত একটা সত্তামাত্র রহিল। এই নির্বিশেষ সত্তাই বিশেষ বিশেষ গুণ বা ধর্ম্মগুলিকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। এখন এই সত্তাটাই রহিল। ইহাকেও যদি সরাইয়া লও, তাহা হইলে এখানে কি ছিল, তাহারও উপলব্ধি হইবে না। অতএব

সেই সত্তার বিনাশ সম্ভব নহে। এইরূপ, যখন প্রলয়ে বিশেষ বিশেষ নাম-রূপ-গুণ-ধর্ম্মাদির বিলয় হইয়া একটা নির্ব্বিশেষ অবস্থায় উপস্থিত হয়, তাহা হইতেই পুনরায় জগৎ উৎপন্ন হয়। উহাকেই জগতের মূল বলা হয়। সে মূল বিনষ্ট হয় না।

(৩) অসৎ বা অভাবকে কার্য্যের কারণ বলা কখনই সম্ভব হয় না। শঙ্কর বলেন—

"নির্ব্বিশেষস্তু অভাবস্য কারণত্বাভ্যুপগমে, শশবিষাণাদিভ্যোপি অঙ্কুরাদয়ো জায়েরন্"। বেঃ ভাঃ ২-২-২৬)।

শশ-বিষাণ, আকাশ-কুসুম প্রভৃতি কল্পনা মাত্র; ইহারা কোন বস্তু নহে; ইহাদের অন্তরালে কোন স্বরূপ বা স্বভাব নাই। ইহারা কেবল শব্দদ্বারা পরিচিত, কোন বস্তু নহে। ইহারা নির্বিশেষ হইয়াও, স্বরূপ-রহিত। একান্ত অসৎ, অলীক। আমরা পূর্ব্বে যে 'সামান্যের' বা কারণবস্তুর কথা বলিয়াছি, উহাও নির্বিশেষ; কিন্তু উহা স্বরূপরহিত নহে। এইজন্য উহা অসৎ নহে, উহা সৎ; উহার স্বভাব বা স্বরূপ আছে। সেই স্বরূপ হইতেই বিশেষ বিশেষ কার্য্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শশ-বিষাণাদির কোন স্বরূপ নাই; উহারা একান্ত অসৎ। কাজেই উহারা কোই কার্য্য জন্মাইতে পারে না। শঙ্কর আরো বলিয়াছেন যে, শশবিষাণাদির ন্যায় অসৎ বা অভাব ত সর্ব্বত্রই রহিয়াছে, কেন না উহাদের ত কোন বিশেষ স্বরূপ নাই। তবেই যদি উহাদের ন্যায় অসৎকেই কারণ বলা যায়, তাহা হইলে সকল বস্তু হইতেই ত সকল বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে। তবে কেন আমরা দেখি যে, বীজ হইতেই অঙ্কুর জন্মে, মৃত্তিকা হইতে অঙ্কুর হয় না; মৃত্তিকা হইতে ঘটই জন্মে, অঙ্কুর জন্মে না? তবেই নির্ব্বিশেষ অভাব বা অসৎকে কারণ বলা যায় না। নির্ব্বিশেষ ভাবাত্মক বস্তুকেই কারণবস্তু বলা যায়।

"অবিশিষ্টে হি প্রাগুৎপত্তেঃ, সর্ব্বস্য সর্ব্বত্র অসত্ত্বে, কস্মাৎ ক্ষীরাদেব দধি উৎপদ্যতে, ন মৃত্তিকায়াঃ"? (বেঃ ভাঃ, ২-১-১৮)।

এই প্রকার যুক্তি দ্বারা ভাষ্যকার নির্ব্বিশেষ কারণ-দ্রব্যের স্বরূপ বা স্বভাবের সত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সেই স্বরূপটী যে ভাবাত্মক (positive), উহা যে অসৎ (nothing) নহে, তাহা ও বলিয়া দিয়াছেন।

"পদার্থানং......স্বেন স্বেন রূপেণ... ভাবাত্মনৈব উপলভ্যমানত্বাৎ।" পদার্থমাত্রেই নিজের নিজের স্বরূপ আছে আছে এবং উহা অসৎ নহে, উহা ভাবাত্মক (positive); সুতরাং বিশেষ বিশেষ কার্য্যের উহারা কারণ।

ভাষ্যকার পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, কারণ দ্রব্যের এই স্বরূপটী যত

প্রকার অবস্থান্তর গ্রহণ করুক্, যে কোন কার্য্যাকার ধারণ করুক্ ঐ নির্ব্বিশেষ স্বরূপটী এই সকল অবস্থান্তরের মধ্যে নিজকে হারাইয়া ফেলে না; উহার স্বরূপটীর কোন পরিবর্ত্তন হয় না; উহা আপন স্বরূপে স্থির থাকিয়াই কার্য্যাকার ধারণ করে।

"কার্য্যরূপে উদ্রিক্ত হইয়া উঠিলেও, করণটী উহার নিজের যে পূর্ণ স্বরূপ তাহাকে ত্যাগ করে না।" (বৃঃ ভাঃ)[১]

"উপাধিযোগে * বিশিষ্টরূপ ধারণ করিলেও, কারণের যেটী নির্ব্বিশেষ স্বরূপ তাহার কোন হানি হয় না।"[২]

"একটা বিশেষ আকার ধারণ করিল বলিয়াই যে বস্তুটী অন্য একটা কিছু হইয়া উঠে, তাহা নহে।"[৩]

"উপাধিযোগ হইল বলিয়াই যে একটা বস্তু অপর একটা বস্তু হইয়া উঠিল, তাহা নহে।"[৪]

"ভিন্ন ভিন্ন উপাধির মধ্যে ব্রহ্মবস্তু অভিন্ন থাকিয়া যান।"[৫]

এতক্ষণ আমরা কারণ দ্রব্য সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মতের আলোচনা করিয়া আসিলাম। এখন 'কার্য্য' বা নাম-রূপাদি বিকার সম্বন্ধে ভাষ্যকার কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করিব।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, যাহাকে আমরা 'কার্য্য' বলি, তাহা 'কারণেরই' একটা বিশেষ অবস্থা মাত্র। তাহা হইলেই, যখন যখন নাম-রূপাদি কার্য্য বা বিকার দেখা দেয়, তখন উহা আপন কারণকে পরিত্যাগ করিয়া দেখা দেয় না; উহার অন্তরালে কারণ দ্রব্যটী উপস্থিত থাকে। এ বিষয়ে আমরা ভাষ্যকারের কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"যস্য চ যস্মাদাত্মলাভঃ, স তেন অপ্রবিভক্তো দৃষ্টঃ।"

"ন হি মৃদমনাশ্রিত্য ঘটাদেঃ সত্ত্বং স্থিতির্বা সম্ভবতি।"

অর্থাৎ, যাহা হইতে কোন একটা বস্তু উৎপন্ন হয়, সেই বস্তুটা তাহা হইতে বিভক্ত হইয়া—স্বতন্ত্র হইয়া- থাকিতে পারে না। মৃত্তিকার আশ্রয় ব্যতীত, মৃত্তিকাকে ছাড়িয়া, ঘটাদির উৎপত্তি বা স্থিতি অসম্ভব।

(১) যদ্যপি কার্য্যাত্মনা উদ্রিচ্যতে, তথাপি যৎপূর্ণস্বরূপং তৎ জহাতি। (বৃঃ ভাঃ)।

* কারণের যখন কোন বিকার উপস্থিত হয়, সেই বিকার গুলিই কারণের 'উপাধি'।

(২) উপাধিযোগাৎ সবিশেষ ইব প্রতিভাসন্তে, তথাপি আত্মনঃ নির্ব্বিশেষতাং ন জহাতি।

(৩) ন হি বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি, স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ।

(৪) উপাধিবশাৎ অন্যাদৃশস্য বস্তুনঃ ন অন্যাদৃশঃ স্বভাবঃ সম্ভবতি।

(৫) প্রত্যুপাধিভেদমভেদমেব ব্রহ্মণঃ শ্রাবয়তি শাস্ত্রম্।

"যখন নাম-রূপের অভিব্যক্তি হয়, তখন উহারা কোন অবস্থাতেই আত্মস্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম হইতে দেশ-কালে বিভক্ত হইয়া অভিব্যক্ত হয় না।"

"চৈতন্য হইতে ব্যতিরিক্ত হইয়া, স্বতন্ত্র হইয়া, খণ্ড খণ্ড কোন বস্তুই উৎপন্ন হয় না, স্থিতি লাভ করে না, বা বিলীন হইয়া যায় না।"

"ভূত, ভবৎ, বা ভবিষ্যৎ কোন কালেই কোন বস্তু. আত্মা হইতে প্রবিভক্ত হইয়া থাকে না।"

এই প্রকারে ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন যে, কার্য্যমাত্রই উহার কারণ দ্রব্যকে ছাড়িয়া থাকে না। কারণ হইতে স্বতন্ত্র হইতে গেলেই কার্য্যগুলি অলীক, মিথ্যা হইয়া উঠে। শঙ্করাচার্য্য এইরূপেই নাম-রূপকে মিথ্যা, অসত্য শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া যদি কার্য্যগুলিকে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেই উহারা মিথ্যা হইল, অসৎ হইল। কার্য্যের মূলে, উহার কারণের সত্তা থাকা আবশ্যক। কারণ-সত্তাকে ভুলিয়া, আমরা যদি কেবল কার্য্যগুলিকেই স্বতন্ত্র, স্বতঃ-সিদ্ধ বস্তু বলিয়া গ্রহণ করি, ইহাকেই বেদান্তে মিথ্যা-দৃষ্টি বলে। আমরা জগতের নাম-রূপাদি বস্তুগুলিকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন, স্বতঃসিদ্ধ বস্তু বলিয়াই ধরিয়া লই ; উহারা যে ব্রহ্ম-চৈতন্যেরই রূপান্তর, আকার বিশেষ,—সে কথা আমাদের আর মনে আইসে না।

"সতোঽন্যত্বে অনৃতত্বং, সদাত্মনা তু সত্যত্বং সর্ব্ববিকারাণাম্।" অর্থাৎ, কারণের সত্তা হইতে ভিন্ন করিয়া লইলে, সকল বিকারই মিথ্যা হইয়া পড়ে ; কিন্তু কারণ সত্তার সহিত বিকার গুলিকে গ্রহণ করিতে পারিলে, উহারা মিথ্যা হয় না, তখন সবই সত্য হইয়া পড়ে।

"ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোন বস্তুই আমরা দেখিতে পাই, উহারা যদি আত্মা হইতে, কারণ-সত্তা হইতে, বিচ্ছিন্ন হয়, বিনির্ম্মুক্ত হয়, তাহা হইলেই উহারা অলীক, মিথ্যা হইল।"—

"অণু মহদ্বা যদস্তি কিঞ্চিৎ, তদাত্মনা বিনির্ম্মুক্ত'মসৎ' সম্পদ্যতে।" ভাষ্যকার আরো বলিতেছেন—

"সমস্ত কার্য্যই কারণদ্বারা অন্বিত হইয়া থাকে। কারণান্বয়রহিত হইলেই উহারা সক্তু-মুষ্টির ন্যায়—চূর্ণ 'ছাতুর' মত—বিশীর্ণ হইয়া পড়িবে, উহাদিগকে ধরিয়া রাখিবার কেহ থাকিবে না"

"কারণান্বয়হীনং কার্য্যং অবিভ্রংস্যমাণম্ স্থাতুং ন উৎসহতে,...... ...সক্তু মুষ্টিবৎ ব্যশীর্য্যেত।"

এই জন্যই শঙ্কর বলিয়াছেন যে, "নিঃস্বরূপ কোন বস্তুই ব্যবহারে আসিতে পারে না" ("ন হি নিরাত্মকং কিঞ্চিৎ ব্যবহারায় অব-কল্পতে")।

কারণ-স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইলে কার্য্যগুলি কি প্রকার অলীক, অসৎ, মিথ্যা হয়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভাষ্যকার—শশ-বিষাণ, বন্ধ্যা-পুত্র, আকাশ-কুসুম—প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। আকাশ-কুসুম প্রভৃতিকে 'বস্তু' বলা যায় না। আকাশ-কুসুম, বন্ধ্যা-পুত্র এপ্রকার কোন বস্তু পৃথিবীতে নাই। কেবল কতকগুলি শব্দপ্রয়োগ করিয়া ইহাদের পরিচয় দেওয়া হয়। পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে এই প্রকার কতকগুলিকে কল্পনার খেলা বলিয়াছেন। "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।" শঙ্কর বলিয়াছেন—"ন হি বস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি।" —শুধু বিকারকে 'বস্তু' বলা যায় না। ঘট মৃত্তিকার বিকার। সুতরাং ঘটকে বস্তু বলাটা ভুল; ঘটের কারণ মৃত্তিকাই প্রকৃত বস্তু। এই প্রকারে আকাশ-কুসুমাদিও বস্তু নহে। উৎপত্তির পূর্ব্বে উহারা কোন কারণ দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয় নাই। "অসতঃ শশ-বিষাণাদেঃ সমুৎপত্ত্য-দর্শনাৎ" (মাঃ ভাঃ)। উৎপত্তির পর স্থিতিকালেও উহারা কোন কারণ দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে না; ধ্বংসের পরও উহারা কোন কারণ সত্তায় বিলীন হইয়া যায় না—"নহি বন্ধ্যা-পুত্রো রাজা ভবতি (স্থিতি-কালে), ভবিষ্যতি বা (ধ্বংসের পর)।" কারণ-সত্তার সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া ইহাদিগকে 'বস্তু' বলা যায় না।

আমরা এই উপলক্ষে পাঠক-পাঠিকাকে একটা বিশেষ কথা বলিতে চাহিতেছি। শঙ্করাচার্য্য প্রচলিত 'পরিণাম-বাদ' বা scientific causality গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তৎপরিবর্ত্তে তিনি 'বিবর্ত্তবাদ' গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পরিণামবাদে কতকগুলি কার্য্যের মধ্যেই কার্য্য-কারণ-ভাব কল্পনা করিয়া লওয়া হয়। মৃচ্চূর্ণ হইতে মৃৎ-পিণ্ড, মৃৎ-পিণ্ড হইতে কপালদ্বয়, কপালদ্বয় হইতে ঘট নির্ম্মিত হইল। এস্থলে চূর্ণ, পিণ্ড, কপাল ও ঘট—সবগুলিই কার্য্য বা বিকার। কিন্তু তথাপি পূর্ব্ববর্ত্তী বিকারকে পরবর্ত্তী বিকারের 'কারণ' বলা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কোনটাই প্রকৃত কারণ নহে; সব গুলিই কার্য্য। যেটা প্রকৃত কারণ, সেটি হইতেছে মৃত্তিকার নির্ব্বিশেষ স্বরূপ। এই স্বরূপটাই চূর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘট পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্য বা বিকারগুলির মধ্যে অনুগত হইয়া রহিয়াছে। এই স্বরূপটা আপন সত্তাকে না হারাইয়াই প্রত্যেক অবস্থান্তরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। সেই স্বরূপটাই প্রকৃত কারণ। পরিণামবাদে কিন্তু সে স্বরূপের কোন কথা নাই। মৃচ্চূর্ণকেই মৃৎ-পিণ্ডের কারণ বলা হয়; আবার মৃৎ-পিণ্ডকে কপালদ্বয়ের কারণ ধরা হয়; আবার কপালকে ঘটের কারণ বলা হয়। এস্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণটা একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়া পরবর্ত্তী অবস্থাকে গ্রহণ করে। শঙ্কর বলিয়া দিয়াছেন যে—

"আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাকে পরবর্ত্তী অবস্থার কারণ বলি না। একটা বিকারকে অপর বিকারের কারণ বলি না। যেটী প্রকৃত কারণ, সেটী নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়। উহা আপন স্বরূপে স্থির থাকিয়া, প্রত্যেক বিকারের বা অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া অনুগত রহিয়াছে।" তাঁহার নিজের উক্তি এই—

"নাসাবুপমৃদ্যমানা পূর্ব্বাবস্থা উত্তরাবস্থায়াঃ কারণমভ্যুপগম্যতে। অনুপমৃদ্যমানানামেব স্থিরস্বভাবানাং অনুযায়িনাং বীজাদ্যবয়বানামঙ্কুরাদিকারণভাবাভ্যুপগমাৎ।" (বেঃ ভাঃ, ২-২-২৬)।

আমরা পরমকারণ ব্রহ্মবস্তুকে ভুলিয়া, নাম-রূপাদি বিকারগুলির মধ্যেই একটাকে আর একটার কারণ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। শঙ্কর এই পরিণামবাদকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি বিবর্ত্তবাদকে গ্রহণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক অবস্থান্তরের মধ্যে যেটী অনুগত থাকে, উহার ধ্বংস নাই। ঐটীই নির্ব্বিশেষ কারণদ্রব্য। অবস্থান্তরের মধ্যে উহা নিজকে হারায় না। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ভাষ্যকার, রজ্জু-সর্প, শুক্তি-রজত, মরু-মরীচিকা—প্রভৃতির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমার দৃষ্টিবিভ্রমের ফলে যখন একগাছা রজ্জু সর্পাকার ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে প্রতীয়মান হইল, তখনও উহার অন্তরালে রজ্জু আপন স্বরূপে ঠিকই থাকে। আবার যখন সর্পাকার চলিয়া যায়, তখনও সেই রজ্জু ঠিকই রহিয়া যায়। এই রজ্জু-সর্প প্রভৃতি বস্তুকে পূর্ব্বোক্ত আকাশ-কুসুমাদির ন্যায়, অসৎ, অলীক, মিথ্যা, অবস্তু বলা যায় না। কেন না, ইহারা আকাশ-কুসুমাদির মত নিঃস্বরূপ নহে। সর্প-বিভ্রম উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, সর্পাকার প্রতীতি জন্মিবার পূর্ব্বে, উহা রজ্জু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল।—"সতো বিদ্যমানস্য বস্তুনো রজ্জ্বাদেঃ সর্পাদিবৎ জন্ম যুজ্যতে।" (মুঃ কাঃ, ৩-২৭)। আবার সর্পাকার প্রতীতি উৎপন্ন হইবার পর, উহার স্থিতি কালেও উহা রজ্জুর আশ্রয়ে বিদ্যমান থাকে; রজ্জুই উহার স্বরূপ বা আস্পদ। "নহি মৃগতৃষ্ণিকাদয়োপি 'নিরাস্পদাঃ' ভবন্তি।" আবার সর্পবিভ্রম নিবৃত্ত হইয়া গেলে, উহা রজ্জুর মধ্যে লীন হইয়া যায় এবং রজ্জুমাত্রই অবশিষ্ট থাকে।—"সর্পবিকল্পনিবৃত্তৌ রজ্জুরেবেতি'।" (মাঃ, ২-১৮)। অতএব রজ্জু-সর্পাদি কখনই নিঃস্বরূপ, অবস্থাস্পদ্ হইতে পারে না। সুতরাং ইহাদিগকে শশ-বিষাণ, আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় অলীক, অসৎ, অবস্তু বলা যায় না।

আমরা এ বিষয়ে আর এক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আমার বাল্য, যৌবন, জরা—এই ত্রিবিধ অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। এই অবস্থাগুলি পরস্পর ভিন্ন, একটার পর অপরটা আইসে। যখন একটা আইসে, তখন পূর্ব্বাবস্থাটা থাকে না। কিন্তু এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে

আমার 'আমিত্ব' স্থির রহিয়া যায়। যে আমি বাল্যাবস্থা অনুভব করিয়াছি, সেই আমিই যৌবনাবস্থায় ছিলাম, আবার সেই আমিই আজ বৃদ্ধাবস্থা অনুভব করিতেছি। একটীর পর একটী করিয়া অবস্থাগুলি আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু আমিত্ব সকল অবস্থার মধ্যেই ঠিক্ আছে। আমার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা সম্বন্ধেও একথা খাটে। শঙ্কর তাঁহার অনন্যসাধারণ ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন—

"বাল্যাদিষ্বপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি,
ব্যাবৃত্তাস্বনুবৃত্তমানমহমিত্যন্তঃস্ফুরন্তং সদা।"

রজ্জু-সর্পাদি দৃষ্টান্তের বলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, নিয়তপরিবর্ত্তনশীল নাম-রূপাদি বিকারগুলির মধ্যে এক নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয় ব্রহ্ম চৈতন্য অনুগত, অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনিই এই সকল নাম-রূপাদির মূল, তিনিই ইহাদের আশ্রয়। তিনিই অন্তর্যামিরূপে ইহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। ইহারা তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া এক মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনে নিয়ত ধাবিত হইতেছে।

ভেদ-খণ্ডন

শ্রীসতীন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এচ্. ডি.

অদ্বৈতবেদান্তমতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং তদতিরিক্ত সকল বস্তুই মিথ্যা। জগদস্তিত্ববাদিগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, অদ্বৈতবাদ প্রত্যক্ষবাধিত, কারণ ঘটপটাদির ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ভেদ যদি সত্য হয় তবে ভেদমূলক বহুত্বও সত্য। এই যুক্তির বিরুদ্ধে অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে হইলে ভেদের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করা প্রয়োজন। অদ্বৈতাচার্য্যগণ বলেন যে ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয় এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও সত্য নয়। এই প্রবন্ধে আমরা আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য্যকৃত ন্যায়মকরন্দ ও চিৎসুখাচার্য্যকৃত তত্ত্বপ্রদীপিকা (চিৎসুখী) অবলম্বনে ভেদবিরোধী প্রধান যুক্তিসমূহ বিবৃত করিব।

ভারতীয় দর্শনে ভেদসম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটী মত দেখিতে পাওয়া যায়। ভাট্ট মতে ভেদ বস্তুর স্বরূপ এবং ন্যায়বৈশেষিকমতে ভেদ বস্তুর ধর্ম্ম বা গুণ। এই মতদ্বয় যথাক্রমে স্বরূপভেদবাদ ও ধর্ম্মভেদবাদ নামে পরিচিত। ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ ব্যতীতও সংক্ষেপে ইহাদের প্রভেদ বুঝান যাইতে পারে। "ঘট পট হইতে ভিন্ন"—প্রথম মতে এই বাক্যের অর্থ, পট হইতে ঘটের ভেদ ঘটের স্বরূপ; এবং দ্বিতীয় মতে পট হইতে ঘটের ভেদ ঘটের ধর্ম্ম বা গুণ। স্বরূপভেদবাদে পট হইতে ঘটের ভেদ ঘটাতিরিক্ত কোন পদার্থ নয়, কিন্তু ধর্ম্মভেদবাদে পট হইতে ঘটের ভেদ ঘটাতিরিক্ত একটী পদার্থ এবং ঘটের অন্যতম ধর্ম্ম। এইরূপ "দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত হইতে ভিন্ন"—স্বরূপভেদবাদানুসারে ইহার অর্থ, যজ্ঞদত্ত হইতে দেবদত্তের ভেদ দেবদত্তানতিরিক্ত বা দেবদত্তের স্বরূপ; কিন্তু ধর্ম্মভেদবাদানুসারে যজ্ঞদত্ত হইতে দেবদত্তের ভেদ দেবদত্ত হইতে অতিরিক্ত একটী পদার্থ এবং দেবদত্তের অন্যতম ধর্ম্ম। প্রথম দৃষ্টান্তে ঘট ধর্ম্মী এবং পট প্রতিযোগী; দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে দেবদত্ত ধর্ম্মী এবং যজ্ঞদত্ত প্রতিযোগী। আমরা স্বরূপভেদবাদ ও ধর্ম্মভেদবাদ উভয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি অবতারণা করিব।

ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয়

আচার্য্য মণ্ডন তাঁহার ব্রহ্মসিদ্ধি নামক গ্রন্থে ভেদের প্রত্যক্ষসিদ্ধত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কয়েকটী বিকল্প উপস্থিত করিয়াছেন :- (১) আমরা কি কেবল ভেদই প্রত্যক্ষ করি? অথবা (২) ভেদ এবং ধর্ম্মি-প্রতিযোগিরূপ বস্তুদ্বয় প্রত্যক্ষ করি? দ্বিতীয় বিকল্পে আমরা কি (ক) প্রথম ভেদ এবং পরে বস্তুদ্বয় প্রত্যক্ষ করি? অথবা (খ) প্রথম বস্তুদ্বয় ও পরে ভেদ প্রত্যক্ষ করি? অথবা (গ) বস্তুদ্বয় এবং তাহাদের ভেদ সমকালে প্রত্যক্ষ করি? প্রথম বিকল্প সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে আমরা ঘট ও পট প্রত্যক্ষ না করিয়া ঘট হইতে পটের ভেদ প্রত্যক্ষ করিতে পারি। বস্তুতঃ ধর্ম্মী ও প্রতিযোগীর জ্ঞান ব্যতীত তাহাদের ভেদের জ্ঞান হইতে পারে, ইহা কেহই স্বীকার করেন না। দ্বিতীয় বিকল্পও যুক্তিসহ নয়। (ক) প্রথম ভেদ পরে বস্তুদ্বয় প্রত্যক্ষ করি—ইহা প্রথম কল্পের মতই অসম্ভব, কারণ তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হয় যে ঘট ও পট প্রত্যক্ষ না করিয়া আমরা ঘট হইতে পটের ভেদ প্রত্যক্ষ করিতে পারি। যদি ঘট ও পট প্রত্যক্ষ না করিয়াও ভেদ প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী ভেদপ্রত্যক্ষে পরবর্ত্তী ঘট ও পটের প্রত্যক্ষের প্রয়োজনীয়তাই বা কি? (খ) প্রথমতঃ বস্তুদ্বয় এবং পরে ভেদ প্রত্যক্ষ করি—ইহাতেও ভেদপ্রত্যক্ষ পূর্ব্ববৎ অসম্ভব। বস্তুদ্বয়-প্রত্যক্ষ ও ভেদপ্রত্যক্ষ, দুইটী প্রত্যক্ষ। বস্তুদ্বয়প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে কোন আপত্তির অবকাশ নাই; কিন্তু দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ভেদপ্রত্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত কারণেই অসম্ভব। এই স্থলেও একটী প্রশ্ন ওঠে—যদি দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ কেবলমাত্র ভেদগ্রহণে সমর্থ হয় তবে বস্তুদ্বয়গ্রাহী পূর্ব্বপ্রত্যক্ষের প্রয়োজনীয়তা কি? (গ) বস্তুদ্বয়ের প্রত্যক্ষ ও তাহাদের ভেদের প্রত্যক্ষ সমকালীন—এই মতটী আপাতমধুর। বস্তুদ্বয়ের প্রত্যক্ষ হইলেই তাহাদের ভেদের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়, তাহা না হইলে সম্ভব হয় না। অতএব বস্তুদ্বয়প্রত্যক্ষ ভেদপ্রত্যক্ষের কারণ। কার্য্য ও কারণ সমকালীন হইতে পারে না—বস্তুদ্বয়প্রত্যক্ষ ভেদপ্রত্যক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে ভেদপ্রত্যক্ষ পূর্ব্ববৎ অসম্ভব হইবে। এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপ-শারীরককারের একটী যুক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা মণ্ডনের যুক্তির পরিপোষক। সংক্ষেপ-শারীরককারের যুক্তিটী এই—কেবলমাত্র দুইটী বস্তুর জ্ঞান হইলেই যে তাহাদের ভেদের জ্ঞান হয়, তাহা নহে। ঘট ধর্ম্মী ও পট প্রতিযোগী—এইরূপ ধর্ম্মি-প্রতিযোগিত্ব পুরঃসর জ্ঞান না হইলে, ঘট পট

হইতে ভিন্ন, এইরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। যদি ঘট কেবল ঘটরূপেই জ্ঞাত হয়, কিন্তু পট হইতে ভিন্ন এইরূপে জ্ঞাত না হয়, এবং পট যদি কেবল পটরূপেই জ্ঞাত হয়, কিন্তু ইহা হইতে ঘট ভিন্ন এইরূপে জ্ঞাত না হয়, তবে উভয়ের জ্ঞান সমকালীন হইলে ঘটের ও পটের জ্ঞান হইবে বটে কিন্তু তাহাদের ভেদের জ্ঞান হইবে না। পক্ষান্তরে ধর্ম্মি-প্রতিযোগিত্ব পুরঃসর জ্ঞান ধর্ম্মী ও প্রতিযোগীর ভেদের জ্ঞান ব্যতীত সম্ভব নয়। অর্থাৎ ঘট ধর্ম্মী ও পট প্রতিযোগী, এইরূপ জ্ঞান, ঘট ও পট যে বিভিন্ন দুইটী বস্তু, এইরূপ জ্ঞান না হইলে হইবে না। অতএব অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ অপরিহার্য্য হয়।

ভেদপ্রত্যক্ষবাদিগণের পক্ষ হইতে দেখিতে গেলে, বস্তুদ্বয় এবং তাহা-দের ভেদ সমকালেই গৃহীত হয়, এই মতটীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাঁহারা আচার্য্য মণ্ডনের যুক্তির বিরুদ্ধে বলিতে পারেন যে বস্তুদ্বয়প্রত্যক্ষের কেবলমাত্র যৌক্তিক পূর্ব্ববর্ত্তিতা (logical priority) আছে, কালিক পূর্ব্ববর্ত্তিতা (temporal priority) নাই। অতএব উভয় প্রত্যক্ষ সম-কালীন হইতে, অর্থাৎ একই প্রত্যক্ষের দ্বারা বস্তুদ্বয় ও তাহাদের ভেদ গৃহীত হইতে, কোন বাধা নাই। ইহার উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তপক্ষ হইতে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্ববর্ত্তিতা সাধারণতঃ কালিকই হইয়া থাকে, কেবল যৌক্তিক পূর্ব্ববর্ত্তিতার দৃষ্টান্ত খুব কম। অতএব ভেদপ্রত্যক্ষ-বাদিগণেরই ইহা প্রমাণ করিতে হইবে যে আলোচ্য স্থলে কেবলমাত্র যৌক্তিক পূর্ব্ববর্ত্তিতা বর্ত্তমান। বস্তুদ্বয়প্রত্যক্ষের যে কালিক পূর্ব্ববর্ত্তিতা আছে তাহা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি বস্তুদ্বয়প্রত্যক্ষ ও ভেদপ্রত্যক্ষ সমকালীন হইত তবে যে কোন দুইটী বস্তু প্রত্যক্ষ হইলেই তাহাদের ভেদও প্রত্যক্ষ হইত। কিন্তু তাহা হয় না। একখণ্ড বস্ত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হইলে উহার অংশসমূহও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু উহারা বিভিন্ন, এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয় না, অর্থাৎ অংশসমূহের ভেদ আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না। ভেদপ্রত্যক্ষবাদিগণ ভেদ-প্রত্যক্ষ বস্তুদ্বয়প্রত্যক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা স্বীকার করিতে পারে না। অতএব ভেদপ্রত্যক্ষ বস্তুদ্বয়প্রত্যক্ষের পরবর্ত্তী, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, ভেদপ্রত্যক্ষ বস্তুদ্বয়-প্রত্যক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তীই হউক বা পরবর্ত্তীই হউক, উভয়থাই অসম্ভব।

এতাবৎ কাল আমরা ভেদপ্রত্যক্ষ-নিরসনের উদ্দেশ্যে স্বরূপভেদবাদ ও ধর্ম্মভেদবাদের বিরুদ্ধে উভয়সাধারণ যুক্তির উল্লেখ করিয়াছি। নিম্নে প্রত্যেকটীর বিরুদ্ধে বিশেষ যুক্তির অবতারণা করিব।

ভেদ যদি বস্তুর স্বরূপ হয় তবে ধর্ম্মিপ্রত্যক্ষ হইলে প্রতিযোগিপ্রত্যক্ষ

ব্যতীতই ভেদপ্রত্যক্ষ হইবে। যথা, কেবলমাত্র ঘটপ্রত্যক্ষ হইলেই পট হইতে ঘটের ভেদ—এমন কি ঘটেতর সকল বস্তু হইতে ঘটের ভেদ—প্রত্যক্ষ হইবে, পটের কিম্বা ঘটেতর বস্তুসমূহের প্রত্যক্ষের প্রয়োজন হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে ভ্রম এবং সংশয় অসম্ভব হইবে। রজ্জুদর্শন মাত্র সর্প হইতে রজ্জুর ভেদ দৃষ্ট হইলে রজ্জুতে সর্পভ্রম হইতে পারে না। স্থাণু-দর্শন মাত্র পুরুষ হইতে স্থাণুর ভেদ দৃষ্ট হইলে "ইহা স্থাণু বা পুরুষ", এইরূপ সংশয় সম্ভব হয় না। ভাট্টগণ এই ত্রুটীর প্রতি উদৎসীন নহেন। তাঁহারা বলেন—যদিও ভেদ বস্তুর স্বরূপ তথাপি ভেদজ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞান-সাপেক্ষ। বহুস্থলেই দেখা যায় যে, বস্তুবিশেষের জ্ঞান অন্যবস্তুর জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। মনে করা যাউক যে একটী বস্তু দ্বিতীয় একটী বস্তুর অপেক্ষা হ্রস্বতর ও তৃতীয় একটী বস্তুর অপেক্ষা দীর্ঘতর। এই স্থলে প্রথম বস্তুর হ্রস্বতরত্বজ্ঞান ও দীর্ঘতরত্বজ্ঞান যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বস্তুর জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, যদিও দ্বিতীয় বস্তুর অপেক্ষা হ্রস্বতরত্ব ও তৃতীয় বস্তুর অপেক্ষা দীর্ঘতরত্ব প্রথম বস্তুর স্বরূপ। এই যুক্তি অসমী-চীন। প্রথম বস্তুটীর যে পরিমান তাহাই উহার স্বরূপ; দ্বিতীয় বস্তুর অপেক্ষা হ্রস্বতরত্ব ও তৃতীয় বস্তুর অপেক্ষা দীর্ঘতরত্ব উহার স্বরূপ নয়। হ্রস্বতরত্ব এবং দীর্ঘতরত্ব পরস্পরবিরোধী। উহারা যদি বস্তুর স্বরূপ হইত তবে একই বস্তু একই কালে অন্য কোন একই বস্তুর অপেক্ষা হ্রাস্বতর ও দীর্ঘতর হইতে পারিত। হ্রস্বতরত্বও দীর্ঘতরত্ব প্রথম বস্তুর স্বরূপ নয় বলিয়াই সমকালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বস্তুর অপেক্ষা যথাক্রমে হ্রস্বতর ও দীর্ঘতর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, এবং প্রথম বস্তুর হ্রস্বতরত্বজ্ঞান ও দীর্ঘতরত্বজ্ঞান যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বস্তুর জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। আলোচ্যস্থলে ভেদ বস্তুর স্বরূপ। অতএব পটজ্ঞান ব্যতীতও পট হইতে ঘটের ভেদের জ্ঞান কেবলমাত্র ঘটজ্ঞান হইলেই হওয়া উচিত —পটজ্ঞানের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকা উচিত নয়। অথচ প্রতিযোগি-জ্ঞান ব্যতীত ভেদজ্ঞান হইতে পারে, ইহা ভাট্টগণও স্বীকার করেন না।

ভেদ ধর্ম্ম হইলেও ভেদপ্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। স্বয়ং মহর্ষি কণাদ ও আচার্য্য কুমারিল ভট্ট বলেন যে, কোন একটী বস্তু ধর্ম্মবিশিষ্ট, ইহা জানিতে হইলে প্রথমতঃ ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মীর পৃথকভাবে জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। এইরূপ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর পৃথকভাবে জ্ঞান হওয়ার পর "এই ধর্ম্মী এই ধর্ম্ম বিশিষ্ট", এইরূপ জ্ঞান জন্মে। "এই বস্ত্রখণ্ড শ্বেতবর্ণ"—এইরূপ জ্ঞান হওয়ার পূর্ব্বে বস্ত্রজ্ঞান ও শ্বেতজ্ঞান পৃথকভাবে হইবে। ভেদ যদি বস্তুর ধর্ম্ম হয় তবে বস্তু এবং ভেদও পৃথক ভাবে জানা প্রয়োজন। দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত হইতে ভিন্ন, এইরূপ জ্ঞান হইতে হইলে দেবদত্তের জ্ঞান ও ভেদের

জ্ঞান পৃথক ভাবে হইবে। দেবদত্তের প্রত্যক্ষ পৃথক ভাবে হইতে অবশ্যই কোন বাধা নাই। কিন্তু ভেদের প্রত্যক্ষ কিরূপে পৃথক ভাবে হইবে? ধর্ম্মী (দেবদত্ত) ও প্রতিযোগী (যজ্ঞদত্ত) উভয়ের জ্ঞান না হইলে ভেদজ্ঞান হয় না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অথচ বর্ত্তমান স্থলে ধর্ম্মীর প্রত্যক্ষ ব্যতীতই ভেদের প্রত্যক্ষ সম্ভব, ইহা স্বীকার করিতে হয়। অতএব ধর্ম্মভেদবাদে ভেদপ্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না।

ভেদ সত্য নয়

ভেদপ্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে অদ্বৈতবেদান্তের প্রধান কয়েকটী যুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। অধুনা ভেদের সত্যতানিরসনের উদ্দেশ্যে যুক্তি সন্নিবিষ্ট করিব।

স্বরূপভেদবাদে ভেদ বস্তুর স্বরূপ। যদি তাহাই হয়, তবে প্রতি বস্তুর মধ্যে ভেদ প্রবিষ্ট হইবে এবং ফলতঃ কোন বস্তুরই একত্ব থাকিবে না। ঘটকে আমরা এক বস্তু বলিয়া মনে করি, কিন্তু ভেদ ঘটের স্বরূপ হইলে বিদারণাত্মক ভেদ ঘটের একত্ব নষ্ট করিয়া দিবে। এইরূপে এমন কি পরমাণু পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া একত্ববিহীন হইবে। এক না থাকিলে বহুও থাকিতে পারে না। এইরূপে স্বরূপভেদবাদ শূন্যবাদে পর্য্যবসিত হইবে। বলাবাহুল্য এইরূপ ক্ষেত্রে ভেদ থাকিতেই পারে না। স্বরূপভেদবাদিগণ বলেন যে বস্তুর দুইটী রূপ—ভাবাত্মক বা সদাত্মক এবং অভাবাত্মক বা অসদাত্মক। প্রত্যেকটী বস্তুতে তদতিরিক্ত সকল বস্তুর ব্যষ্টিগত ও সমষ্টি-গত অভাব রহিয়াছে—অতএব প্রত্যেক বস্তু কেবল ভাবাত্মক নয়, অভাবা-ত্মকও বটে। প্রতিবস্তু অভাবাত্মক বলিয়া অন্য সকল বস্তু হইতে তাহা স্বরূপতঃ ভিন্ন, অর্থাৎ ভেদ বস্তুর স্বরূপ। যদি তাহা হয়, তবে প্রত্যেক বস্তু আত্মসত্তার জন্য অন্য সকল বস্তুর সত্তার উপর নির্ভর করিবে। ঘটাপেক্ষায় পটের স্থিতি; পটাপেক্ষায় ঘটের স্থিতি; বদরির অপেক্ষায় আম্রের স্থিতি; আম্রের অপেক্ষায় বদরির স্থিতি; পট, বদরি ও আম্রের অপেক্ষায় ঘটের স্থিতি; ঘট, পট ও আম্রের অপেক্ষায় বদরির স্থিতি—এইরূপে প্রত্যেকটী বস্তুর স্থিতি তদতিরিক্ত বস্তু সমূহের প্রত্যেকটীর এবং সমষ্টির স্থিতির উপর নির্ভর করিবে। পরস্পরাপেক্ষায় অন্যোন্যাশ্রয়দোষ উপস্থিত হইবে এবং কোন বস্তুরই স্থিতি হইবে না।

ধর্ম্মভেদবাদানুসারে ভেদ বস্তু হইতে অতিরিক্ত এবং বস্তুর ধর্ম্ম বা গুণ। পট হইতে পটধর্ম্ম ভেদ যদি অতিরিক্ত, অর্থাৎ ভিন্ন, হয় তবে পট এবং ভেদকে ভিন্ন করিবার জন্য দ্বিতীয় একটী ভেদের প্রয়োজন। পট ও দ্বিতীয় ভেদকে ভিন্ন করিবার জন্য তৃতীয় একটী ভেদের প্রয়োজন।

এইরূপে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হইল। অতএব ভেদ বস্তু হইতে অতিরিক্ত এবং বস্তুর গুণ, এইকথা সমীচীন নয়, অর্থাৎ ধর্ম্মভেদবাদসম্মত ভেদের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। ইহার উত্তরে ন্যায়বৈশেষিকগণ বলেন, ভেদ যে কেবল ধর্ম্মী ও প্রতিযোগীকে ভিন্ন করে তাহা নয়, নিজকেও ধর্ম্মী ও প্রতিযোগী হইতে ভিন্ন করে। অতএব ভেদান্তরের অবকাশ নাই, অর্থাৎ অনবস্থা হয় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, পটের নীলত্ব যেমন পটাতিরিক্ত ও পটধর্ম্ম, ভেদও তেমনই পটাতিরিক্ত ও পট-ধর্ম্ম। পট ও নীলত্বকে ভিন্ন করিবার জন্য ভেদের প্রয়োজন হয় অথচ পট ও ভেদকে ভিন্ন করিবার জন্য ভেদের প্রয়োজন নাই, ইহা কিরূপ কথা ? ভেদ নিজকে বস্তু হইতে ভিন্ন করে ইহার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নাই। অতএব অনবস্থা নিবারিত হইল না। ন্যায়বৈশেষিকপক্ষ হইতে আরও একটী যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা বলেন -ভেদ বস্তু হইতে ভিন্ন, এইরূপ জ্ঞান আমাদের কখনও হয় না। অতএব কোন ভেদবিশেষকে জানিতে হইলে ভেদান্তরকে জানিবার প্রয়োজন হয় না। ফলতঃ অজস্র ভেদান্তর থাকিলেও অনবস্থা মূলক্ষতিকরী নয়। এই যুক্তিটীও দোষযুক্ত। ভেদ বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞাত হয় না, ইহা সত্য নয়। আমরা যখন বলি "ঘটের ভিন্নত্ব" অথবা "ঘট-পটের ভেদ" তখন ভেদ ভিন্ন বলিয়া জ্ঞাত হয়, যেমন "পটের নীলত্ব" বলিলে নীলত্ব পট হইতে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞাত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মহর্ষি কণাদের মতে দ্রব্য ও গুণ পৃথকভাবে জানিবার পর "এই দ্রব্য এই গুণবিশিষ্ট", এইরূপ জ্ঞান জন্মে। অতএব ভেদ ও বস্তু পৃথকভাবে জ্ঞাত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ বর্ত্তমান স্থলে অনবস্থা মূলক্ষতিকরী, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

উল্লিখিত ভেদখণ্ডন হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে অদ্বৈতবাদিগণ ঘটপটাদির ভেদ প্রত্যক্ষ করেন না বা দৈনন্দিন জীবনে ভেদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না—তাঁহারাও অন্য দশজনেরই মত ঘটদ্বারা জলাহরণ ও বস্ত্রদ্বারা শরীরাচ্ছাদন করেন। ভেদখণ্ডনের তাৎপর্য্য এই যে, ভেদ যুক্তিসহ নয় বলিয়া মিথ্যা অথবা অনির্ব্বচনীয়। মিথ্যা দুই প্রকারের —ব্যবহারিক (যথা, ঘট) ও প্রাতিভাসিক (যথা, রজ্জুসর্প)। অদ্বৈতবাদিগণ ভেদের পারমার্থিক সত্তা অস্বীকার করেন, ব্যবহারিক সত্তা অস্বীকার করেন না।

বেদান্তের সর্বাতিশয়িত্ব

(Vedantic Transcendence)

অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম, এম্. এ., পি-এচ্. ডি.

[ভারতীয় দর্শন-মহাসভার ষোড়শ অধিবেশনের ভারতীয়দর্শনশাখার সভাপতি ডা: শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্মের অভিভাষণ। শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর মুখোপাধ্যায়কর্ত্তৃক অনূদিত।]

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে ভারতীয় দর্শন বলিতে বেদান্ত-ভাষ্যে বর্ণিত শঙ্করাচার্য্যের মতবাদকেই বুঝিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই ধারণা নিতান্ত অসঙ্গত ও নহে। শঙ্করের দার্শনিক মতবাদটী অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতবাদ হইতে বহুল পরিমাণে বিভিন্ন, এবং অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক মতগুলির সদৃশ মতবাদ পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে দেখা গেলেও শঙ্করের মতটী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট নিতান্ত নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং উহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহারা প্রায়ই উহার ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা দূর হইতে ভারতীয় দর্শনের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেন তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেদান্ত দর্শনের অতীব গূঢ় রহস্যময় অর্থের প্রতি এক প্রকার বিস্ময়বিজড়িত অজ্ঞতামূলক শ্রদ্ধাপ্রকাশ মাত্র। আবার তাঁহারা সময়ে সময়ে যে ইহাকে অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা করেন তাহারও মূলে ঐ বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলির অসাধারণত্ব ও দুর্ব্বোধ্যতা। বর্ত্তমানে ভারতীয় দর্শন-আলোচনার ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তির বুঝিবার উপযোগী বেদান্তের একটি বিশুদ্ধ ব্যাখ্যাব বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। সেইজন্য ভারতীয় দর্শন-মহাসভার এই শাখার অধিবেশনের সভাপতি-রূপে আমি এই বিষয়টী আমার সম্ভাষণের বিষয়ীভূত করিয়াছি।

শঙ্করের মতে ব্রহ্ম জগৎকে অতিক্রম করিয়া আছেন। পক্ষান্তরে আবার ব্রহ্মই জগতের মূল ভিত্তি এবং আশ্রয়। ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া জগৎ প্রকাশমান, ইহার আর অন্য কোনও অবলম্বন বা আশ্রয় নাই।

এই কথার মধ্যে শঙ্করের কোন নূতনত্ব নাই। পাশ্চাত্য দেশের বহু দার্শনিকও এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু শঙ্কর ইহাও বলিয়াছেন যে জগৎ মিথ্যা—একটা 'অধ্যাস' মাত্র। ঠিক এই খানেই শঙ্করকে সকলে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে না। জগৎ ব্রহ্মের অভিব্যক্তি, প্রকাশ বা বিকাশ নয়, ইহাতে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। "জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়" ইহার অর্থ শুধু এই যে ইহার কোনও পৃথক্ সত্তা নাই, ব্রহ্মকে মূল ভিত্তি ও আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মের উপরেই জগৎ অবস্থিত। ব্রহ্ম অসীম ও সর্ব্বনিরপেক্ষ, এবং এই সসীম জগৎ হইতে অসীম ও সম্বন্ধ-রহিত ব্রহ্মের কোনরূপ ধারণাই করিতে পারা যায় না। রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, ঠিক সেইরূপ এই জগৎও ব্রহ্মের উপর একটা মিথ্যা অধ্যাস মাত্র। ব্রহ্মের সর্ব্বাতিশয়িত্ব বুঝাইবার জন্য, এবং এই জগৎ প্রপঞ্চ যে ব্রহ্মের স্বরূপকে আদৌ স্পর্শ করিতে পারে না, ইহাও দেখাইবার জন্য উক্ত রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে যখন সর্পের প্রকাশ হয় তখন যদিও রজ্জু ব্যতীত সর্পের অন্য কোনও সত্তাই থাকে না, তথাপি উহা রজ্জুরূপে প্রতীত না হইয়া সর্পরূপেই হয়। সেই-রূপ এই জগৎও বাস্তবরূপে প্রতীত হইতেছে, যদিও ইহার বাস্তবতা আপনাতে বিদ্যমান না থাকিয়া ব্রহ্মে বিদ্যমান। উল্লিখিত রজ্জু-সর্পের উপমা হইতে আমরা জগৎ-ব্রহ্ম-সম্বন্ধের এই দুইটী দিক্ দেখিতে পাই—(১) জগৎ ব্রহ্মাশ্রিত এবং (২) ব্রহ্ম জগৎ-অতীত।

ব্রহ্মের এই সর্ব্বাতিক্রান্ত ভাবটি দেশকালসম্বন্ধীয় অতিশয়িত্ব নহে। আমরা ব্রহ্মের অতিশয়িত্ব বলিতে এরূপ বুঝিব না যে এই জগতের যাবতীয় বস্তু সীমাবদ্ধ দেশকালের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া অনন্তকাল বিরাজ করিতেছেন। এইপ্রকার অতিশয়িত্বের ভাব ভারতীয় ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেরই বহু দার্শনিক মতবাদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শঙ্করের ব্রহ্ম কিন্তু এইরূপ সাধারণ অর্থে লোকাতীত নন,—শঙ্করের কথাটী সম্পূর্ণ নূতন। এই জগৎ কিয়ৎপরি-মাণে সত্য নহে, কিন্তু ইহা মিথ্যা, যদিও ইহা অসৎ বা অস্তিত্বহীন নয়। জগতের এই মিথ্যাত্ব শঙ্করের পাঠক ও ব্যাখ্যাকারদের নিকট একটা চিরজটিল সমস্যা। বস্তুতঃ শঙ্কর এই কথাই বলিতে চাহেন যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কার একটা অসামান্য বা বিশেষ অনুভূতি, যাহা সসীম বস্তুর অনুভূতির সঙ্গে একস্তরে থাকিতে পারে না। ইহা কেবল সসীমের অনুভূতির ক্রমবিস্তার বা প্রসারবৃদ্ধি নহে; ইহা সর্ব্বব্যাপক অথচ সর্ব্বাতীত, ইহা সম্পূর্ণরূপে ভিন্নপ্রকারের অনুভূতি—ইহার তুলনা নাই, ইহা সত্যই অদ্বিতীয়। ইহা এক প্রকার অনুভূতি যাহা কিছুই বর্জ্জন করে না, কিছুই অস্বীকার করে না, কোনও কিছুর প্রতিবাদ করে না, কিছুই উচ্ছেদ

করে না, অথচ ইহা কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর সমষ্টি বা সংমিশ্রণও নয়। ইহা সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞান, আবার এক দিক দিয়া কোনও বিষয়েরই জ্ঞান নহে। ইহা একটা খুব বৃহৎ সসীমের অনুভূতি নয়, এই সসীম জগতের কোনও বস্তুর সঙ্গেই ইহার তুলনা হইতে পারে না; এবং সমস্ত সসীম বস্তুর সমষ্টিদ্বারা আমরা এই অসীমের বিন্দুমাত্রও ধারণা করিতে পারি না। ব্রহ্ম 'জগৎ-বিলক্ষণ' এবং পরমার্থ সৎ, আর জগৎ 'মিথ্যা'। রজ্জুতে সর্প অধ্যস্ত (আরোপিত) হইলেও রজ্জু যেমন কোনও প্রকারেই সর্পের সমগুণবিশিষ্ট হয় না সেইরূপ এই প্রকাশমান মিথ্যা জগতের সহিত ব্রহ্মেরও কোনও রূপ সাদৃশ্য নাই। সম্ভবতঃ এই অর্থেই শঙ্কর জগৎকে 'মিথ্যা' বলিয়াছেন। ব্রহ্ম দেশ বা কালের দিক্ দিয়া জগৎকে অতিক্রম করেন না, কিন্তু ইহা এক তত্ত্বের অন্য তত্ত্ব হইতে অতি-ক্রমের ভাব। ব্রহ্ম এবং জগৎ এক স্তরের বস্তু নয়, এবং এই কারণেই জগৎ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে একথা বলিলে দ্বৈতবাদ বুঝায় না। সসীমের ভাব দিয়া অসীমের বা ব্রহ্মের চিন্তা করিতে গেলেই আমাদিগকে সসীম ও অসীমকে, ব্রহ্ম ও জগৎকে, দুইটী বস্তু বলিয়া অনুমান করিতেই হইবে এবং তাহা হইলেই দ্বৈতবাদ আসিয়া পড়িবে। সসীম অপেক্ষা অসীম একটি উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব এবং ব্রহ্ম জগৎ হইতে এক ভিন্ন স্তরের সত্তা। এই অর্থেই ব্রহ্ম জগৎ-অতীত। ব্রহ্ম 'পারমার্থিক সৎ'—চরম সত্য; জগৎ পারমার্থিক অর্থে (পারমার্থিকতত্ত্বেম) 'মিথ্যা'। ব্রহ্ম আর জগতে, অর্থাৎ ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা ও জগতের ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে, কোনও বিরোধ নাই। ব্রহ্মই জগতের মূল ভিত্তি ও আশ্রয়; এবং এই জন্যই উহাদের উভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ-সম্বন্ধ থাকিতেই পারে না। যে ব্রহ্ম জগতের বিরুদ্ধভাবাপন্ন সে ব্রহ্ম আসল ব্রহ্ম নয়—সে নকল বা মিথ্যা ব্রহ্ম। প্রকৃত ব্রহ্মের সহিত কাহারও বিরোধ হইতে পারে না। যাহা অন্য কোনও বস্তুর সহিত বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয় তাহা ঐ বিরোধসম্বন্ধের কেবলমাত্র একটা অঙ্গ এবং কখনই দ্বৈতাতীত ব্রহ্ম হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম বিশ্বের সকল বস্তুর পরম বা শ্রেষ্ঠ সমন্বয়, (synthesis) তাঁহার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী (antithesis) নাই। 'সৎ ব্রহ্ম' ও 'মিথ্যা জগতের' সহাবস্থিতি বেদান্তী কখনও অস্বীকার করেন না। প্রকৃত-পক্ষে ব্রহ্মালোকদ্বারাই এই জগৎ-প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছে এবং সেইজন্যই 'সৎ ব্রহ্ম' ও 'মিথ্যা জগতের' 'সহাবস্থান' বা যুগপৎ অবস্থিতি কোনও বেদান্তীই সঙ্গতভাবে অস্বীকার করিতে পারেন না। ঈশ্বর (বা সগুণ ব্রহ্ম) তাঁহার পরিপূর্ণ চিরোজ্জ্বল দিব্য জ্ঞানালোকদ্বারা এই বিশ্বের সকল বস্তুর তত্ত্বাবধান ও পরিচালন করিয়া থাকেন। জীবন্মুক্ত

জ্ঞানী পূর্ণজ্ঞান লাভ করিলেও জাগতিক বস্তুর সহিত অনায়াসেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। যোগী পুরুষের ব্যুত্থান ঘটিয়া থাকে—অর্থাৎ সমাধি ভঙ্গ হয়; জীবন্মুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তির কিন্তু কোনরূপ ব্যুত্থান নাই—অর্থাৎ তাঁহার অনুভূতির কখনও বিপর্য্যয় বা বিরতি ঘটে না। জীবন্মুক্তের জ্ঞান কুত্রাপি বাধিত বা ব্যাহত হয় না অর্থাৎ জাগতিক বিষয়বস্তুর জ্ঞান কুত্রাপি ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক হইয়া উঠে না, এবং এইজন্যই এই মিথ্যা জগতের প্রত্যক্ষের সহিত পরম ব্রহ্মজ্ঞানের কোনও প্রকার বিরোধ সম্পর্ক নাই। যে পর্য্যন্ত না এই "পারমার্থিক সৎ"-এর (স্বয়ংসিদ্ধ ব্রহ্মের) জ্ঞানোদয় হয়, সে পর্য্যন্ত এই জগৎকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হয়; ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলেই কিন্তু জগতের এই সত্যত্ব বোধ চলিয়া যায়। কিন্তু জগতের এই 'মিথ্যাত্ব' বোধের সহিত ব্রহ্মের পরমার্থসত্তার কেবল যে কোনও বিরোধ বা অসঙ্গতি নাই তাহাই নহে কিন্তু ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে ইহাই জগদ্-ব্রহ্ম সম্বন্ধের একমাত্র সঙ্গত ধারণা। যাঁহারা মনে করেন বেদান্তমতে জগতের ব্যবহারিক সত্তার (empirical reality) কোনও স্থান নাই, এবং এই জগতে ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানীদের কোনও ব্যবহার চলিতে পারে না, তাঁহারা স্পষ্টতঃ ঈশ্বরতত্ত্বের কথা ভুলিয়া যান এবং সত্য সত্যই বেদান্তের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না। আমরা যে ব্যাখ্যার ইঙ্গিত করিয়াছি তাহা গ্রহণ না করিলে বেদান্তের 'বাধ-সমাধি' এবং পতঞ্জলির 'লয়-সমাধি' এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য বা ভেদ আছে তাহার আর কোন অর্থই থাকে না। পারমার্থিক জগতে স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যবহারিক জগতে পারতন্ত্র্যের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ নাই। "পারমার্থিক সৎ" ব্রহ্ম যে অজ্ঞান এবং অজ্ঞানজাত বিষয়বস্তুর বিরোধী না হইয়া বরং উহাদের আশ্রয় ও মূল ভিত্তিস্বরূপ, এবং সকল সম্বন্ধাতীত অর্থাৎ দ্বৈতাতীত ব্রহ্মের যে কাহারও সহিত বিরোধ থাকিতে পারে না-বেদান্তে এই সকল কথার অতি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ধ্যানের অবস্থায় একটী বিষয়বস্তু অপর একটী বিষয়বস্তুকে স্থানচ্যুত করিতে না পারিলে, সম্বিদের (জ্ঞানের) ক্ষেত্র অধিকার করিতে পারে না; কিন্তু তত্ত্ব জ্ঞানের অবস্থায় এরূপ ঘটে না—তখন সম্বিদের সকল স্তরেই এককালে কার্য্য হইতে থাকে। সুরেশ্বরাচার্য্য তাঁহার বার্ত্তিকগ্রন্থে ধ্যাতা ও তত্ত্ববিদের মধ্যে ইহাই পার্থক্য বলিয়া সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বয়ংসিদ্ধ ব্রহ্মের ইহাই সর্ব্বাতিশয়িত্ব—একথা বেদান্ত স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। বেদান্তে সসীমকে (এই সসীম জগৎকে) একেবারে বর্জ্জন করা, ধ্বংস করা, অস্বীকার করা বা উপেক্ষা করা হয় নাই। বেদান্ত পরিণামবাদের উপদেষ্টা বা প্রচারক নহেন; যদি এইরূপ হইতেন, তাহা হইলে হয়ত সকল সম্বন্ধরহিত ব্রহ্মের আদিম স্বাভাবিক পূর্ণতা পুনরায় লাভ করিবার

উদ্দেশ্যে (অসম্ভব হইলেও) সসীমের (সসীম জগতের) ধ্বংস, বর্জ্জন বা লোপ সাধনের দাবী করিতেন। বেদান্তের মতে, স্বয়ংসিদ্ধ ব্রহ্মের কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর ঘটে না, এবং এই বাহ্য জগৎ তাহাকে আদৌ স্পর্শ বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। কেবলমাত্র মিথ্যা অজ্ঞান বা অজ্ঞতা হেতু আমরা এই পরিদৃশ্যমান জগতের বাস্তবতা বা অস্তিত্ববোধ করিয়া থাকি। অতএব এক্ষণে মিথ্যা অজ্ঞান বা অজ্ঞতাকে দূর করাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন। তাহা হইলেই পূর্ব্বে যাহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল তাহা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা—একথা আমরা যথার্থরূপে বুঝিতে পারিব। পূর্ব্বোক্ত সর্প যেমন রজ্জুর কোনও অংশ বা অঙ্গ নয়, ঠিক সেইরূপ এই জগৎও ব্রহ্মের কোনও অংশ নয়। প্রথমে যাহা সর্প-রূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল পরে দেখা গেল উহা মিথ্যা। রজ্জুর বাস্তবতা (অস্তিত্ব) এবং সর্পের মিথ্যা আবির্ভাব বা প্রতীতি এ দুইয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। সর্পের বাস্তবতার সহিত রজ্জুর বাস্তবতার বিরোধ আছে বটে, কিন্তু যখনই বুঝা গেল যে এই রজ্জুটিই ভ্রমবশতঃ সর্পরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল এবং অস্পষ্ট বা অল্পালোকে দেখিলে এখনও এই রজ্জুটীকে সর্পের মত দেখায়—তখনই রজ্জু-সর্প-সম্বন্ধ বিষয়ের যথার্থ ধারণা হয় ইতিপূর্ব্বে একটি সর্পের প্রতীতি হইয়াছিল,এক্ষণে একটী রজ্জু দেখিতেছি—ইহা বলিলেই ভ্রমসংশোধনের পক্ষে যথেষ্ট হইল না; কারণ ভ্রমে পতিত ব্যক্তি মনে করিতে পারেন যে তিনি প্রকৃতই একটী সর্প দেখিয়াছিলেন এবং ঐ সর্পটী দীপ আনয়ন করিবার পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছে। ঐ রজ্জু এবং ঐ প্রতীয়মান সর্প যে একই বস্তু ইহা নিশ্চয় করিতে না পারিলে ভ্রম সংশোধন হয় না। এই ভ্রমটী সংশোধন করিতে হইলে আমাদিগকে উক্ত বাস্তব রজ্জুকে এবং ঐ মিথ্যা সর্পকে যুগপৎ প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। এইরূপ আবেষ্টনীর মধ্যে দেখিলে রজ্জুটী সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে এবং ইহার সর্ব্বদাই এইরূপ অবস্থায় সর্পের ন্যায় প্রতীতি হইবার সম্ভাবনা আছে—এই বিচারের দ্বারাই উক্ত ভ্রমটী সংশোধিত হয় এবং তখন বুঝা যায় যে যাহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছিল সেটী প্রকৃত সর্প নয়, কিন্তু ঐ রজ্জুতে ভ্রমবশতঃ আরোপিত একটা মিথ্যা সর্প মাত্র। যে সর্পটী প্রতীয়মান হইয়াছিল তাহাকে অস্বীকার করা বা বর্জ্জন করা হইল না, কেন না উহা কোনও কালেই প্রকৃত বস্তু নহে। এমন কি উহা যখন সর্প বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল তখনও উহা বাস্তব ছিল না। উহার একটা 'ত্রৈকালিক নিষেধ' আছে উহা মিথ্যা, উহা অবাস্তব। জ্ঞানীর নিকট অস্বীকৃত বা পরিত্যক্ত কোনও বস্তু নাই, কিন্তু তাঁহার নিকট সকল পার্থিব বস্তুই অনুভূত অবস্তু অর্থাৎ অবস্তু বলিয়া অনুভূত হয় বলিয়াই তিনি জাগতিক পদার্থকে বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন

না। যখন উক্ত ভ্রমটী সংশোধিত হয় তখন আমরা এইভাবে বিচার করি "সর্প নাই, রজ্জু আছে।" কথাটা এইভাবে প্রকাশ করিলে আমাদের মনে হয় সর্পকে অস্বীকার বা বর্জ্জন করা হইতেছে। কিন্তু যদি এইভাবে বিচার করা যায় যে "যে সর্পটী আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল (প্রকাশ পাইয়াছিল) এবং যাহাকে আমি এ পর্য্যন্ত সর্প বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিলাম, উহা উক্ষণে রজ্জু বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে," তাহা হইলে আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইব—"সর্পটী রজ্জু ব্যতীত আর কিছুই নয়" কিম্বা কেবলমাত্র "সর্পটী রজ্জুই"; এবং তাহা হইলে রজ্জু ও মিথ্যা সর্পের মধ্যে একটা অভেদ জ্ঞান (একত্ব-বোধ) আসিয়া পড়ে। তখন উক্ত সিদ্ধান্তটী—"সর্পটী রজ্জুই বটে"—অনায়াসেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতএব এক হিসাবে "সর্পটী রজ্জু" বলিলে যাহা বুঝায়, "সর্পটী রজ্জু নয়" বলিলেও তাহাই বুঝায়। অর্থাৎ 'জগৎ ব্রহ্ম" এবং "জগৎ ব্রহ্ম নয়"—এই দুইটী কথার অর্থ এক হিসাবে একই দাঁড়ায়। এখানে সসীমকে অসীমে রূপান্তরিত করা হইতেছে না, Bradley যেরূপ মনে করেন। বেদান্ত সসীম ও (অসীম) ব্রহ্মের মধ্যে এইভাবের একটা মিট্‌মাট্ করিতে চাহেন না। যে কোনও উপায়েই হউক্ সসীমকে (জগৎকে) অসীমের (ব্রহ্মের) মধ্যে ধরিয়া রাখা বেদান্তের অভিপ্রেত নহে। বেদান্ত সসীমকে ব্রহ্মের সমান স্তরে তুলিতেও চাহেন না, আবার ব্রহ্মকে সসীমের স্তরে নামাইতেও চান না। বেদান্ত এই সমস্যার একটী নূতন সমাধান আমাদিগকে দিয়াছেন। ব্রহ্মই সসীমের (জগতের) সর্ব্বস্ব, ব্রহ্মই জগতের 'অধিষ্ঠান' ও 'আশ্রয়', 'উপাদান' ও 'অবলম্বন'; সসীম জগৎ ব্রহ্ম ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকে না এবং থাকিতে পারেও না। কিন্তু সত্য জ্ঞানের দিক্ দিয়া যিনি (যাহা) ব্রহ্ম, তিনিই (সেইটাই) আবার মিথ্যা বা সাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞানের দিক্ দিয়া সসীম বলিয়া প্রতীয়মান হন। পরব্রহ্মে সসীম পরিপূর্ণতা লাভ করে তাঁহার মধ্যে রূপান্তরিত ভাবে অবস্থান করিয়া নহে, Bradley যেরূপ অনুমান করেন, কিন্তু পরব্রহ্মেই আপনার অবিভক্ত পূর্ণ সত্তাটীকে দর্শন করিয়া। সসীম তখনই ব্রহ্মকে লাভ করে যখনই ইহা বুঝিতে পারে যে ইহার সসীমতা একটী অধ্যাস মাত্র এবং প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মই ইহার সত্তা। পরব্রহ্মের মধ্যে কোনরূপ সীমাবিশিষ্ট বস্তু আধেয়রূপে থাকিতে পারে না। সসীমকে যতই কেন রূপান্তরিত করা হউক না, যতই ইহার বৈসাদৃশ্য ও বহুরূপতা বর্জ্জন করা হউক্ না কেন, ইহা কখনই ব্রহ্মের আধেয় বস্তু হইতে পারে না। ব্রহ্মে কোন রূপ (সঙ্কীর্ণতা) সসীমতা নাই এবং সইজন্য কোনও প্রকার বিভিন্নতা ইহাতে আধেয়ভাবে থাকিতেই পারে না। অসীম বস্তুর কোনও প্রকার

বিভিন্নতা, নানাত্ব বা বহুরূপত্ব স্বীকার না করিলেও পরব্রহ্মের দ্বৈতাতীত সর্ব্বাতিশয়িত্বের সহিত কিছুতেই সঙ্গত হয় না। ব্রহ্মের মধ্যে অসীমের সঙ্কীর্ণতাকে প্রবেশ করাইলে ব্রহ্মের বিশুদ্ধ ভাবটী আর রক্ষা করা যায় না। ব্রহ্ম সসীম বস্তু আধেয়রূপে ধারণ করিতে পারেন এরূপ বিবেচনা করা বেদান্তের মতে অযৌক্তিক। ইনি যদি সম্বন্ধাতীত হন তাহা হইলে কোনও সসীম বস্তুকে আধেয়রূপে ধারণ করিতে পারেন না, আবার যদি ব্রহ্ম সসীম বস্তুকে ধারণ করেন তাহা হইলে ইনি সর্ব্বসম্বন্ধাতীত হইতে পারেন না। অন্তবিশিষ্ট, সীমাবিশিষ্ট, পদার্থ সমূহ পরস্পর বিসদৃশ। তাহাদের এই বৈসাদৃশ্যই তাহাদের সসীমতা বুঝাইয়া দেয়; সুতরাং উহারা অসীম ভূমা ব্রহ্মের আধেয়বস্তু হইতে পারে না। ব্রহ্ম অসীমের সংশ্লেষণ বা সামঞ্জস্য মাত্র নহেন। সসীম হইতে তাহার নানাত্বটুকু বাদ দিলেই ব্রহ্মের অনুভূতি সম্ভবপর হয় না। বৈদান্তিকেরা মনে করেন অসীম বা ব্রহ্ম সসীম বস্তু হইতে বহুল পরিমাণে ভিন্ন এবং সসীম(জেগৎ) হইতে অসীমে যাইতে হইলে একটা আমূল পরিবর্ত্তনের আবশ্যক। কারণ যে প্রকৃতির হয়, কার্য্যও সেই প্রকৃতির (প্রকৃতি বিশিষ্ট) হয়, এবং কারণের মধ্যে যাহা অদৃশ্য, গুপ্ত, প্রচ্ছন্নভাবে লীন থাকে কার্য্য তাহারই একটা প্রকাশমান অবস্থা মাত্র। 'কারণ' বা 'বীজ' অবস্থাটী 'সূক্ষ্ম'-অবস্থার কারণ, আবার 'সূক্ষ্ম'-অবস্থাটী 'স্থূল'-অবস্থার কারণ। এই তিনটী অবস্থা ('কারণ'-অবস্থা, 'সূক্ষ্ম'-অবস্থা ও 'স্থূল'-অবস্থা) পরস্পরসংযুক্ত কার্য্য-কারণ ব্যবস্থার অধিকারভুক্ত। কিন্তু আর একটী চতুর্থ অবস্থা আছে—ইহাকে প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটী অবস্থার সমপর্য্যায়ভুক্ত আর একটা অতিরিক্ত অবস্থা বলা যায় না, কিন্তু ইহা এমন একটী অবস্থা যাহা বস্তুতঃ উক্ত তিনটী অবস্থার মূলে অবস্থিত আবার ঐ তিনের অতীত—ইহা 'তুরীয়' অবস্থা যাহা 'কারণাতীত'—অর্থাৎ যাহা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের ক্ষেত্র হইতে ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ইহাই সর্ব্বসম্বন্ধাতীত পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্র যাহার কোনরূপ সাদৃশ্য কার্য্য-কারণ-ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় না। 'তুরীয়'-অবস্থাটী 'সর্ব্ববিলক্ষণ' অবস্থা—ইহা পরিদৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক বস্তু হইতে অতীব বিভিন্ন। প্রকাশমান জগৎ 'তুরীয়-অবস্থা' হইতেই উদ্ভূত হয়, ইহার বাহিরে তাহার আর কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই, কিন্তু প্রকাশমান জগতের অন্তর্নিহিত যে দ্বৈতভাব ও বিরোধ, বিভিন্নতা ও সীমাবদ্ধতা দেখা যায়, তুরীয়-অবস্থায় তাহাদের কোনও স্থানই নাই। দ্বৈতভাব বা বিরোধ সসীমজগতের একটী বিশেষ লক্ষণ। সেই অদ্বিতীয় একরস পরব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে এই সসীম জগতের উক্ত দ্বৈতভাব ও বিরোধকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। এই সসীম জগতের সত্তা ব্রহ্মে নিহিত। ইহাতে ইহা বুঝায় না যে সসীম ও অসীম

ব্রহ্ম একই শ্রেণীর বস্তু; ইহাতে শুধু ইহাই বুঝায় যে ব্রহ্মই সসীমের আশ্রয় এবং মূলভিত্তিস্বরূপ—ঠিক যেমন রজ্জু তাহা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন সর্পের প্রতীতির আশ্রয় হয়। এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, কারণ ব্রহ্মব্যতীত ইহার কোনও অস্তিত্বই নাই। জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিতে কিন্তু জগৎ ব্রহ্মের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ এইরূপ বুঝায় না। ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুই এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান জগতের আধার, স্বাতন্ত্র্যই কার্য্য-কারণ-পারতন্ত্র্যের মূল সত্য এবং আশ্রয়, ব্রহ্মই জগতের আধার ও আশ্রয়—এই সকল কথারই অর্থ এক। যেমন Kantএর মতে পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কার্য্যকারণব্যবস্থিতির সঙ্গে ইন্দ্রিয়াতীত স্বাতন্ত্র্যের কোনও অসঙ্গতি নাই, যেমন Spinozaর মতে পরিণামগ্রস্ত বস্তুর নানাত্বের সঙ্গে এক পরমবস্তুর পারমার্থিক সত্তার কোনও অসঙ্গতি নাই, সেইরূপ বেদান্তমতে এই দৃশ্যমান জগতের সঙ্গেও সর্ব্বসম্বন্ধাতীত ব্রহ্মসত্তার কোনও অসঙ্গতি নাই। কার্য্যকারণব্যবস্থা ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের সম্যক্ জ্ঞান হয় না—কার্য্য-কারণ-ব্যবস্থাযুক্ত স্বাতন্ত্র্য বা স্বাতন্ত্র্যমূলক কার্য্য-কারণ-ব্যবস্থা (a mechanised freedom or a free mechanism) পরস্পরবিরোধী বাক্য। ব্রহ্মের আধেয় বস্তু সসীম বলিলেও এইরূপ একটী বিরোধের অবতারণা করা হয়। মূলীভূত সত্তায় স্বাতন্ত্র্য (freedom in the graond) এবং প্রকাশমান জগতের মধ্যে কার্য্য-কারণ-ব্যবস্থা-মূলক পারতন্ত্র্য, এইরূপ বাক্য অসঙ্গত তো নহেই, বরং জগৎ-ব্রহ্ম-সম্বন্ধ-সমস্যার ইহাই একমাত্র সমাধাম বলিয়া বোধ হয়। অজ্ঞান বা অল্পজ্ঞানের স্তরে বহুত্ব বা নানাত্ব সত্য, প্রজ্ঞাস্তরে অর্থাৎ পরমার্থজ্ঞানে একত্ববোধ বা অভেদ-জ্ঞানই সত্য। অজ্ঞানের নিকট জগৎ বা নানারূপতা বা এই জগতের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ সত্য ও বাস্তব; জ্ঞানীর নিকট সকল সম্বন্ধাতীত এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যই সত্য। অবিভক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে একরস ব্রহ্ম কোনও এক অভাবনীয় উপায়ে নানারূপতার ও বিভাগের আকার ধারণ করিয়াছেন এবং সেইজন্যই এই সসীম জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এই দ্বৈতভাবটী অতিক্রম করিতে পারিলেই ব্রহ্মকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সসীম জগৎ ব্রহ্মের বহির্ভূত বস্তু নয় এবং ব্রহ্ম হইতে ইহা ভিন্নও নহে। জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিলে আর একটী পৃথক্ তত্ত্বের সৃজন হয় এবং তাহা হইলে বেদান্তের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ আর থাকে না। সসীমকে বর্জ্জন বা অস্বীকার করা হইল না, কিন্তু উহা ব্রহ্মের উপর অধ্যস্ত বা আরোপিত বলিয়া অনুভূত হইল। সুতরাং তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে উহাকে মিথ্যা না বলিয়া উপায় নাই। ইহার (এই সসীম জগতের) প্রতীতি হয় বটে

কিন্তু ইহার মধ্যে ইহার অধিষ্ঠানের উপাদান নাই; অতএব ইহা মিথ্যা।

আমাদের আর একটী বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে সসীম জগৎ ব্রহ্মের আধেয় না হইতে পারিলেও, ব্রহ্মকে অভিব্যক্ত করিতে বা প্রকাশ করিতে না পারিলেও, এই সসীমই ব্রহ্মকে ইঙ্গিত বা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। দ্বৈতাতীত, সর্ব্বসম্বন্ধাতীত ব্রহ্ম কখনও দ্বৈতবিরোধের একটা মাত্র অঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারেন না—ইহা অতি সুস্পষ্ট; আন্তরবিরোধযুক্ত না হইয়া পূর্ণব্রহ্ম যে জগতের নানা-প্রকার পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন জাতীয় বস্তুর সমষ্টি হইতে পারেন না, ইহাও অতি সুস্পষ্ট। সসীম বিশ্বের উক্ত দ্বৈত ও বিরোধভাবটাই এমন এক দ্বৈতাতীত ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, যিনি সকল বিরোধ অতিক্রম করিয়া সকল ভেদ ও পার্থক্যের উপরে অবস্থিত থাকেন। এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই যে সকল বস্তুর মূলে বিদ্যমান এবং তাহাতেই যে এই দ্বৈতভাব প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা নির্দ্দেশ করাই এবং এইরূপ ব্রহ্মকে জগতের আশ্রয় ও আধাররূপে উপলব্ধি করাই এই সসীম জগতের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বোত্তম প্রয়োজন। Bradleyর ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয় (দ্বি-শাখাবিশিষ্ট, bifurcating) দ্বৈতভাবযুক্ত তর্কবিতর্কসমন্বিত চিন্তা আত্মহত্যা না করিলে পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারে না। (যতক্ষণ দ্বৈতভাববিশিষ্ট তর্ক-বিতর্কজড়িত চিন্তা থাকে ততক্ষণ পরব্রহ্মের উপলব্ধি হইতে পারে না।) পরস্পরবিরুদ্ধভাবাপন্ন দ্বৈতাকার ধারণ করিয়া ব্রহ্ম তাঁহার অদ্বৈত প্রকৃতিটী বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই "রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপো বভূব, তদস্য রূপম্ প্রতিচক্ষণায়।"—এই উপনিষৎ-মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম। ইহা আপাতদৃষ্টিতে একটী অসঙ্গত বাক্য বলিয়া মনে হইলেও এইটীই সম্ভবতঃ সসীম ও অসীমের মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ। সসীম অসীমের সহিত আপনাকে সংযুক্ত করে, অসীমকে ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, যদিও সসীম অসীমকে প্রকাশ করিতে বা ব্যক্ত করিতে পারে না। ইহা অসীমকে ব্যক্ত করে আবার এক হিসাবে ব্যক্ত করেও না।

বেদান্তে ব্রহ্মের এই সর্ব্বাতিশয়িত্ব সম্যক্‌রূপে বুঝিতে না পারার জন্যই অনেকে শঙ্কর-মতবাদের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কোন কোন ভারতীয় পণ্ডিতেরা এরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে হেগেলের Absolute গতিশীল (dynamic) কিন্তু শঙ্করের ব্রহ্ম স্থিতিশীল (static)। স্পষ্টতঃ তাঁহারা ভুলিয়া যান যে শঙ্করের ব্রহ্ম গুণাতীত এবং দ্বৈতাতীত—অর্থাৎ স্থিতিশীলতা এবং গতিশীলতা প্রভৃতি সকল প্রকার বিরোধ ও দ্বৈতের (দ্বৈতভাবের) ঊর্দ্ধে। সুতরাং এমন অবস্থায় ব্রহ্মকে বিরোধের একটী অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা

যায় না। এই পরিবর্ত্তনশীল জগৎ ব্রহ্মের বহির্ভূত নয়, ব্রহ্ম হইতে ইহার আর কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ব্রহ্মই এই বিশ্বের মূল ভিত্তি, যদিও এই বিশ্ব ব্রহ্মের আধেয় নয়। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা মনে করেন যে শঙ্করের ব্রহ্ম একদেশি (one-sided), কারণ ইঁহাতে কোনও পরিবর্ত্তন বা গতি থাকিতে পারে না; ইনি নীরব, নির্ব্বাক্, তূষ্ণীম্ভাবাপন্ন, ইঁহাতে কোনই পরিবর্ত্তন ঘটে না, এবং এই হেতু ইনি পরিবর্ত্তনের বিরোধী। কিন্তু স্পষ্টতঃ এই ধারণা ভ্রান্ত। তূষ্ণীম্ভাব ও গতি (গতিশীলতা), নিস্তব্ধতা ও পরিবর্ত্তন—ইহাদের মধ্যে যে বিরোধ (opposition) তাহা সসীম জগতের দ্বৈতভাবের অধিকারভুক্ত (অন্তর্গত) এবং যেহেতু ব্রহ্ম সকল বিরোধের মূলে অবস্থিত আবার সকল বিরোধের অতীত, সেই হেতু তিনি কখনও নিজে উক্ত বিরোধের একটী অঙ্গ বা অংশ হইতে পারেন না। ব্রহ্মকে কে কখনও স্থিতিশীল নীরবতা বলিয়া বর্ণনা করা করা হইয়াছে তাহার অর্থ তিনি গতিশীলতার বিরোধী যে নীরবতা তাহা নহে কিন্তু ঐ বিরোধের উর্দ্ধে অবস্থিত যে গভীরতর নীরবতা তাহাই। ব্রহ্মকে "সত্যস্য সত্যম্" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইনি সত্যের সত্য অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্যের মূলে যে পরমার্থ সত্য তাহাই। অনেকে মনে করেন যে, যে অসীম সসীম জগৎকে আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া থাকেন এবং যাহা সসীমের উদ্ভব বা উৎপত্তির কারণ এবং যে অসীমের সগুণভাবে উপলব্ধি হয়, সেই অসীম বেদান্তের ব্রহ্ম অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে; কারণ উক্তপ্রকারের অসীম সত্তা বেদান্তের অপরিচিত নয়। বেদান্তশাস্ত্রে ঠিক এই ভাবেই 'প্রাণ' বা 'হিরণ্যগর্ভে'র বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। প্রাণ অসীম এবং অসংখ্য সসীম পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়া আপনাকে অনন্তকাল ধরিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম বা আত্মাকে যে সকল লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় তাহার প্রায় সকলগুলিই প্রাণে আছে। প্রাণে সকল পরিবর্ত্তন ও গতি অন্তর্ভুক্ত। ইহাই হেগেলের "Concrete Absolute" এর অনুরূপ তত্ত্ব। যাঁহারা উপরেউক্ত পরিবর্ত্তনশীল, গতিশীল, সগুণ ব্রহ্ম (Concrete Absolute) অপেক্ষা বেদান্তের ব্রহ্মকে নিম্নস্তরের তত্ত্ব বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভুলিয়া যান যে বেদান্ত প্রাণতত্ত্বকে ঐরূপ সগুণ ব্রহ্ম (Concrete Absolute) বা "পরিণামী নিত্য" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং বেদান্ত যখন ব্রহ্মকে প্রাণ অপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তখন বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মে প্রাণ অপেক্ষা অধিক ও অতিশয় কিছু আছে। সুতরাং ব্রহ্ম 'প্রাণ' অপেক্ষা নিম্নস্তরের কোনও বস্তু হইতে পারেন না। প্রাণের মধ্যে দ্বৈতভাব আছে, কিন্তু ব্রহ্ম দ্বৈতাতীত। ব্রহ্মকে স্থিতিশীল নীরবতা এবং

গতিশীল ক্রিয়া এই উভয় প্রকারে বর্ণনা করা যায় না, কেন না একটী অপটীর বিরোধী এবং দুইটী পরস্পরবিরোধী গুণকে এক অভিন্ন ব্রহ্মের গুণ বলিয়া ধারণা করিলে পরস্পরবিরোধী-বাক্য-দোষ ঘটে। ব্রহ্ম স্থিতি ও গতির উপরে, নীরবতা ও ক্রিয়াশীলতার ঊর্দ্ধে এবং সাধারণতঃ যে মনে করা হয় যে ইহা কেবলমাত্র স্থিতিশীল নীরবতা তাহাও নহে, কিম্বা স্থিতি-শীলতা এবং ক্রিয়াশীলতা এই উভয়ের সংযোগও নয়। যে নীরবতা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয় এবং উহারই সহিত মিলিত হইয়া কাজ করে সেই নীরবতা আপেক্ষিক মাত্র। প্রকৃত নিরপেক্ষ যে ব্রহ্ম তিনি স্থিতি ও গতির ঊর্দ্ধে যে গভীরতর নীরবতা তাহাই (the silence beyond silence)। তিনি জাগতিক সত্যের মূলে যে পরম সত্য তাহাই। সাংখ্যের 'পুরুষে'র বাহিরে 'প্রকৃতি' অবস্থিত এবং সেইজন্য যে নিস্পন্দতা স্পন্দনের বিরোধী সেই নিস্পন্দতা-দ্বারা সাংখ্যের পুরুষের বর্ণনা করা যাইতে পারে। বেদান্তের ব্রহ্মের বাহিরে কিছুই নাই—ইনি জগতের 'উপাদান' এবং 'নিমিত্ত' কারণ উভয়ই এবং সেইজন্যই ইনি কেবল শুদ্ধ নীরবতা, এবং পরিবর্ত্তনশীল জাগতিক বস্তুনিচয়ের কোও কারণ ইঁহার মধ্যে পাওয়া যায় না, এইরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। ব্রহ্মে জগৎ অস্বীকৃত ও হয় নাই স্বীকৃতও হয় নাই; যেহেতু ব্রহ্ম জগতের আশ্রয় এবং আধার হইলেও জগতের অন্তর্নিহিত দ্বৈতভাবটী ব্রহ্মে আদৌ দৃষ্ট হয় না। এই জগদ্-ব্রহ্ম-সম্বন্ধ একটা অভিনব সম্বন্ধ যাহা কেবল সর্ব্বাতিশয়িত্ব' (transcendence) এই একটীমাত্র শব্দদ্বারা বর্ণিত হইতে পারে।

এই সর্ব্বাতিশয়িত্বের ভাবটী যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় Henri Bergson এর ন্যায় মহাপণ্ডিত ব্যক্তিও ভারতীয় সাধন-রহস্যের (mysticism) মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছেন এবং, বড়ই দুঃখের বিষয়, উহার ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মে তিনি উদ্দীপনাপূর্ণ সক্রিয় রহস্য-সাধনের (the burning, active mysticism) সন্ধান পান নাই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম্মেও ঐরূপ সাধনযোগের কথা বহুল পরিমাণে বর্ণিত আছে। রহস্যবিদ্ হিন্দু সাধকগণ সৃজন-কারিণী শক্তি (the creative effort) বা প্রাণ-তত্ত্বের সহিত একটা সত্যকারের সংযোগ সংস্থাপনা করিয়া থাকেন। এই শক্তি হইতেই সকল জীবজীবনের উদ্ভব হয়। Bergson এর 'e'lan vital" বা প্রাণ-শক্তির প্রেরণাও যাহা, ছান্দোগ্য-উপনিষদে অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত "মুখ্যপ্রাণ"ও তাহাই। রহস্যবিদ্ যোগী "সর্ব্বভূতহিতে রত", সর্ব্বদাই সকল প্রাণীর মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত, যেহেতু তিনি সমবুদ্ধি, যেহেতু তিনি সকলের মধ্যে সেই একই

সমান আত্মা দেখিতে পান। যে মুহূর্ত্তে সৃজনকারিণী শক্তি বা "মুখ্য প্রাণ"-এর সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটে, সেই মুহূর্ত্তেই প্রাণশক্তির আধিক্য অনুভূত হয় এবং ঐ সংযোগের ফলে আলস্য ও অবসাদ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। এইরূপ প্রাণশক্তির বৃদ্ধি বা জাগরণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোকের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় এবং নিতান্ত অপরিহার্য্য। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—তেজহীন জনেরা এরূপ আত্মা লাভ করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ইহার অর্থ এই যে সার্ব্বভৌম শক্তির সহিত একটা সচেতন সংস্পর্শে বা সংযোগ না ঘটিলে আত্মার উপলব্ধি কখনই করা যায় না। বেদান্ত যে আত্মাকে 'শান্ত' নীরবতা বা নির্দ্দোষ সম বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন তাহার অর্থ যে আত্মার চরম নীরবতা (the supreme silence) সকল নীরবতা ও স্পন্দনের বিরোধভাবের পূর্ব্বাবস্থা বা মূলীভূত অবস্থা (prius)—ইহা সেই নীরবতা নয় যাহা পরিবর্ত্তনকে বর্জ্জন বা অস্বীকার করে বা যাহা পরিবর্ত্তন বা স্পন্দনের বিরোধী। সেইরূপ আবার যখন আত্মাকে শিবম্ অর্থাৎ এক মহান্ ও পরম মঙ্গলময় বস্তুরূপে বর্ণনা করা হয়, তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, ইনি অমঙ্গলের বিরোধী বস্তু নহেন, ইনি পরম মঙ্গলময় বস্তু যাহা পাপ-পুণ্য-বিরোধভাবের মূলীভূত পূর্ব্বাবস্থা। শ্রুতিও ইহাই বলিয়াছেন—শ্রুতি ইঁহাকে অদ্বৈতম্ শান্তম্ শিবম্ এবং সকল বিরোধ ও দ্বৈতভাবের উর্দ্ধাবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Bergson যাহা মনে করেন তাহা নহে, হিন্দু রহস্য সাধক একজন নীরব, অসহায়, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট দর্শমকাত্র নহেন; তিনি এক আত্মজয়ী মহাপুরুষ, যিনি এই জগতের সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে অবিচলিত রাখিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা উপলব্ধি ও সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রতীয়মান নিশ্চেষ্টতার মধ্যেও বহু প্রচেষ্টা (কার্য্যপরতা) থাকিতে পারে, আবার প্রতীয়মান প্রচেষ্টার মধ্যেও বহু নিশ্চেষ্টতা (নিষ্ক্রিয়তা) থাকিতে পারে। দৈহিক বাহ্য ব্যাপারদ্বারা কর্ম্মাকর্ম্মের প্রকৃত বিচার করা যায় না। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মধ্যে Bergson যে সজীব রহস্য-সাধন লক্ষ্য করিয়াছেন এবং যাহা তিনি সঙ্কীর্ণমনা হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শের ফল বলিয়া বিবেচনা করেন, সেইটী বেদান্ত-যোগরহস্যের একটী অপরিহার্য্য প্রাথমিক সূত্র—এবং বেদান্তের ন্যায়ই অতি প্রাচীন। তথাকথিত 'সজীব' রহস্যসাধন (active mysticism) বেদান্তের একটা স্তরমাত্র। বেদান্ত আরও এক উচ্চতর অবস্থার কথা জানেন এবং উল্লেখ করিয়া থাকেন,—যেখানে ক্রিয়াও নিষ্ক্রিয়ার মধ্যে বিরোধভাবটী অর্থহীন এবং অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় এবং এক উচ্চতর মহান্ একত্বে বিলীন হইয়া যায়। পরব্রহ্ম চির শান্তিতে নিমগ্ন থাকিয়াও সতত সক্রিয়

করিতেছেন, এবং সকল পরিবর্ত্তনের মূল হইয়াও চির শান্তরূপে বিরাজ করিতেছেন; কিম্বা আরও যথাযথভাবে বলিতে হইলে বলিতে হয় যে নিস্তব্ধতা ও গতিশীলতার মধ্যে যে বিরোধভাব তাহা কোন মতেই ব্রহ্মে প্রযোজ্য নয়। প্রেমিক ভক্তদিগকে উদ্দীপনাপূর্ণ তেজস্বী রহস্যবিদ্ যোগী বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সহজেই চিনিতে পারেন। হিন্দু ভক্তও যে কোনও খৃষ্টান যোগীর ন্যায় সমভাবে উদ্দীপনাপূর্ণ এবং এইরূপ ভক্তদের অসংখ্য কাহিনী ভক্তি সাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিস্তরের উর্দ্ধে সর্ব্বাতিশয়িনী যে জ্ঞানাবস্থা তাহাই পাশ্চাত্যদিগের মনে একটা ধাঁধাঁ লাগায়—একটা জটিল সমস্যা আনয়ন করে; এবং ভারতীয় কৃষ্টি এবং শিক্ষাদীক্ষায় অনভিজ্ঞ একজন বিদেশী পণ্ডিত যে ভারতের যোগরহস্যের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এই পর্য্যন্ত আমি ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছি যে জগদ্-ব্রহ্ম-সম্বন্ধ-সমস্যার বেদান্তমতবাদই একমাত্র সন্তোষজনক সমাধান। এরূপ বিবেচনা করিলে চলিবে না যে, জগৎ ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতেছে; কেন না তাহাতে ইহাই বুঝাইবে যে অসীম (অনন্ত) সসীমের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে এবং তাহা হইলে অসীম সসীমমের কেবলমাত্র সমষ্টি হইয়া পড়েন। আবার একথাও বলা যায় না যে জগৎ বা প্রকৃতি ব্রহ্মের একটা অংশ বা অঙ্গ। জগৎ ব্রহ্মের একটা অঙ্গ হইলে ব্রহ্মের মধ্যে একটা বিভাগ আসিয়া পড়ে এবং তাহা হইলে সনাতন ব্রহ্ম আর অবিভক্ত থাকেন না। বিষয়ী ও বিষয়, পুরুষ ও প্রকৃতি, আমি ও ইহা (অহং ও ইদং) এইরূপ দ্বৈতভাব নিশ্চয়ই ব্রহ্মের মধ্যেই উদয় হইয়াছে, তথাপি উক্ত দ্বৈতভাব ব্রহ্মকে আদৌ স্পর্শ করে নাই। ইহাই শঙ্করের 'বিবর্ত্তবাদ'। জগতে যে দ্বৈত ও বিরোধভাবের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি ঐ দ্বৈতভাব অধ্যাসমাত্র—একটা মিথ্যা প্রতীতি যাহা অধিষ্ঠান বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই জগৎ—এই মিথ্যা মায়াপ্রপঞ্চ—ব্রহ্মতেই তাহার পরিপূর্ণতা বা বাস্তবতা লাভ করিয়া থাকে, ঠিক যেমন প্রতীয়মান মিথ্যা সর্পটী তাহার বাস্তবতা রজ্জুতে লাভ করে। রজ্জুই ঐ মিথ্যা সর্পের পূর্ণ সমগ্র বাস্তবতা, অর্থাৎ সর্পের যাহা কিছু সত্তা তাহার সবই ঐ রজ্জুর মধ্যে। এই জগৎ ব্রহ্মকে ইঙ্গিত করে মাত্র এবং ইহার অস্তিত্ব অধিষ্ঠান ব্রহ্মের মধ্যে দেখিতে পায়। সুতরাং ব্রহ্মের মধ্যে জগৎকে বর্জন বা অস্বীকার করা হয় না।

বেদান্তের বিরুদ্ধে অনেক সময়ে একটী আপত্তি উত্থাপিত করা হয়, এক্ষণে আমি সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব। আপত্তিটী এই যে, বেদান্ত বেদবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং উহাকে বিশুদ্ধ দার্শনিক বিচারসমন্বিত মতবাদ (a genuine system of philosophy)

বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। অনুভূতিকে যুক্তিদ্বারা ব্যাখ্যা করাই, যুক্তিসম্মত বিচার দ্বারা স্থাপন করাই, দর্শনের প্রকৃত কার্য্য এবং প্রায় সকল স্থলেই দার্শনিক মতবাদ কোন না কোন অনুভূতির উপরে স্থাপিত—সেই অনুভূতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যই হউক আর অতীন্দ্রিয়ই হউক। সকল স্থলেই প্রথমে অনুভূতি হয়, পরে যুক্তিদ্বারা তাহার বিচার করা হয়। বেদান্ত এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নহেন। বেদান্ত শ্রুতিকে ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রুতি হইতেছেন তত্ত্বদর্শিদের অনুভব। বেদান্ত কেবল বেদমন্ত্রগুলির উদ্ধার বা পুনরুক্তি করেন না, যথাযথ যুক্তিদ্বারা বেদান্ত ইহাই প্রমাণ করেন যে শ্রুতি বাক্যগুলি যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা যায়। জগতের বহুত্ব ও নানাত্ব যে মিথ্যা—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—উপনিষদের এই মতবাদকে একটা যুক্তিসম্মত ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সুগম্ভীর 'অধ্যাস-ভাষ্য' রচনা করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান অধ্যাস বা ভ্রান্তপ্রতীতির আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন কি প্রকারে একটী বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিতে পারে—কি প্রকারে রজ্জু ভ্রমবশতঃ সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে পারে। অধ্যাস বা মিথ্যাপ্রতীতি একটা দৈনন্দিন ব্যাপার, প্রায়ই ঘটিয়া থাকে ; সুতরাং যে দার্শনিক মতবাদ এই দৈনন্দিন অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাকে অনুভূতিহীন একটা ধারণামাত্র বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। যুক্তি কেবলমাত্র সম্ভাবনার বিচার করিতে পারে, কিন্তু একমাত্র অনুভূতিই তত্ত্বের বাস্তবতা সম্বন্ধে আমাদিগকে পরিজ্ঞাত করিতে পারে। যখনই বেদান্ত প্রমাণ করে যে উপনিষদের মতবাদটি যুক্তিসম্মত, যখনই ইহা ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয় যে কি প্রকারে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম দ্বৈত ও বিরোধভাবাপন্ন জগৎকে নিজের মধ্যে অধ্যস্তরূপে গ্রহণ করিতে পারেন, যখনই ইহা প্রমাণ করিতে পারে যে এরূপ ধারণার মধ্যে কোন প্রকার অসঙ্গতি নাই তখনই ইহা দার্শনিক মতবাদ হিসাবে ইহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে। যিনি শ্রম স্বীকার করিয়া অদ্বৈত বেদান্তমতের বিশাল গ্রন্থরাজি পাঠ করিয়াছেন তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে উপরে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যই বৈদান্তিকেরা তাঁহাদের সম্মুখে সংস্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সকল যত্ন ও প্রয়াস যথেষ্ট পরিমাণে সার্থকও হইয়াছে। কেবলমাত্র যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়াই আচার্য্য শঙ্কর ও তাঁহার শিষ্যগণ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে "জগৎ মিথ্যা"। ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে এইরূপ ন্যায়ানুমোদিত সুসঙ্গত মতবাদও সত্যকারের দার্শনিক বিচারসমন্বিত নহে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিয়াছে।

ইংরেজ দর্শনে বিজ্ঞানবাদ বা আইডিয়ালিজ্‌ম্

(ঐতিহাসিক আলোচনা)

অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ

'ইংরেজ দর্শন' বলতে ইংলণ্ডবাসীদের দর্শনই শুধু বুঝবো না; ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্‌লণ্ড সমেত যে গ্রেট্ ব্রিটেন্ সেই দেশে যে দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে তাকেই আমরা এখানে 'ইংরেজদর্শন' বলে ধরেছি। ইংরেজ শাসন বলতে যেমন আমরা ব্রিটিশ শাসনই বুঝি তেমনি 'ইংরেজ দর্শন' বলতে আমরা 'ব্রিটিশ দর্শনকেই' লক্ষ্য করেছি। 'ইংরেজ' ও 'ব্রিটনের' অনেকটা পার্থক্য থাকলেও আমাদের দেশে 'ইংরেজ' ও 'ব্রিটিশ' শব্দের একই অর্থে প্রচলন আছে বলে আমরা এখানে 'ব্রিটিশ দর্শন' ব্যবহার না করে 'ইংরেজ দর্শন' ব্যবহার করেছি।

এখানে আর একটা শব্দের লক্ষণ প্রথমেই ঠিক করে নেওয়া দরকার এবং সেটী হচ্ছে 'বিজ্ঞানবাদ'। ভারতীয় দর্শনে বিজ্ঞানবাদের কথা উল্লেখ করলে আমরা সাধারণতঃ যোগাচার বৌদ্ধ দর্শনকেই বুঝে থাকি। আমরা এখানে মোটেই সেই অর্থে 'বিজ্ঞানবাদ' শব্দের ব্যবহার করি নাই। ইংরেজীতে যাকে মেটাফিজিকাল আইডিয়ালিজ্‌ম্ বলে সেই অর্থেই আমরা এখানে 'বিজ্ঞানবাদ' ব্যবহার করেছি। আইডিয়ালিজ্‌ম্ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে সবজেক্‌টিভ্ আইডিয়ালিজ্‌ম্ বা বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদের লক্ষ্য অন্তর্নিহিত থাকলেও পাশ্চাত্য দর্শনে আইডিয়া-লিজ্‌ম্ শব্দের সাধারণ অর্থে সবজেক্‌টিভিজ্‌ম্ বা সলিপ্‌সিজ্‌ম্ শব্দের ব্যবহার নাই। সুতরাং এখানে বিজ্ঞানবাদ বলতে প্রচলিত বার্কলের বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদ বা দৃষ্টিসৃষ্টিবাদকে লক্ষ্য করি নাই, আমরা লক্ষ্য করেছি ঠিক হেগেলীয় বিজ্ঞানবাদ বা পরাবিজ্ঞানবাদ বা অ্যাব্‌সলিউট্ আইডিয়ালিজ্‌ম্‌কে।

পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব দর্শন বলে একটী দর্শন আছে, এখন সে দর্শন ভালই হোক বা মন্দই হোক। এবং এই নিজস্ব দর্শনের মধ্যেই জাতির মহত্ব ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে—কোন্ জাতি কতটা উন্নত বা অনুন্নত প্রকৃতপক্ষে তার বিচার করবার মাপকাঠিই হচ্ছে তার স্বকীয় দর্শন। ইংরেজদেরও একটী নিজস্ব দর্শন আছে—সে দার্শনিক মতবাদটী হচ্ছে প্রত্যক্ষবাদ বা এম্‌পিরিসিজ্‌ম্। অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশেও অনেক কিছু মতবাদেরই সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সেসব মতবাদ

কিছুকালের জন্য প্রাধান্য বিস্তার করেছে আবার কিছুকাল পরেই সে প্রাধান্য একেবারে লোপ পেয়েছে—তারা শুধু এসেছে আর গিয়েছে। এই সব অস্থায়ী মতবাদের মধ্যে যে প্রচলিত চিন্তাধারাকে আমরা ইংরেজ জাতীয় চিন্তার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হতে দেখি সেটী এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় প্রত্যক্ষবাদ। এই প্রত্যক্ষবাদই বেকন্ ও হব্স্ থেকে আরম্ভ করে লক্, বার্ক্লে, হিউম এবং তারপর বেন্থাম্, মিল্ ও স্পেন্সার পর্য্যন্ত সবার দর্শনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকার ও নাম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এই প্রত্যক্ষবাদই ইংরেজ তত্ত্ববিজ্ঞানে সন্দেহবাদ ও অজ্ঞেয়বাদের সৃষ্টি করেছে, মনোবিজ্ঞানে সংসর্গবাদে (associationism) রূপান্তরিত হয়েছে এবং নীতিশাস্ত্রে সুখবাদ (hedonism) এবং উপযোগবাদ বা হিতবাদ (utilitaria-nism) নামে অভিহিত হয়েছে। এই দর্শনই ইংরেজের জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে উদারতা liberalism) এনেছে এবং এই প্রত্যক্ষ-বাদের প্রাধান্য হেতুই আমরা দেখতে পাই আদি ইংরেজ চিন্তায় ঈশ্বর-তত্ত্বগবেষণায় ঔদাস্য। সুতরাং প্রত্যক্ষবাদই হচ্ছে ইংরেজের জাতীয় দর্শন, বিজ্ঞানবাদ বা আইডিয়ালিজ্ম্ নয়।

বিজ্ঞানবাদ যে ইংরেজের জাতীয় দার্শনিক মত নয় একথা অবশ্য অনেক ইংরেজ দার্শনিক স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে বিজ্ঞানবাদের ধারা ইংরেজ জাতীয় চিন্তার মধ্যে পূর্ব থেকেই ছিল এবং পরবর্তীকালে সেটা বিজাতীয় বিজ্ঞানবাদ কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র। বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক জে. এচ. মূয়েরহেড্ (J. H. Muirhead) তাঁর 'ইঙ্গ-স্যাক্সন্ দর্শনে প্লেটনীয় চিন্তাধারা' (The Platonic Tradition in Anglo-Saxon Philosophy, 1931) নামক গ্রন্থটীতে এরকম সিদ্ধান্তেই উপনীত হবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস একথা সমর্থন করে না বলেই মনে হয়। যে বিজ্ঞানবাদের কথা আমরা এখানে বলতে যাচ্ছি সে বিজ্ঞানবাদ যে ইংরেজের কাছে একেবারেই বিজাতীয় দর্শন তারই প্রমাণ করে দর্শনের ইতিহাস। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রই আধ্যাত্মিক জীবনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে থাকেন এবং অধ্যাত্ম বিদ্যার রহস্য উপলব্ধি করে থাকেন বা করতে চেষ্টা করেন। সুতরাং ঈশ্বর-প্রণোদিত ব্যক্তি আদর্শবাদী ও আধ্যাত্মবাদী এবং এঁদের আদর্শবাদ ও অধ্যাত্মবাদ বিজ্ঞান-বাদেরই সিদ্ধান্ত। এরকম ধর্মপ্রাণ বিজ্ঞানবাদীর অভাব যে ইংরেজ জাতির মধ্যে ছিল তা আমরা বলছি না। ধর্ম-প্ররোচিত বিজ্ঞানবাদ হয়ত অনেক ইংরেজ জীবনেই পরিস্ফুঠ হয়ে উঠেছিল বা এখনও উঠে। সে বিজ্ঞানবাদ হচ্ছে আধ্যাত্মবাদেরই (spiritualism) নামান্তর—সে বিজ্ঞানবাদ জড়বাদের প্রতিপক্ষ। কিন্তু যে নবোদিত দার্শনিক বিজ্ঞান-

বাদের (Philosophical Idealism) আলোচনা আমরা এখানে করবো সে বিজ্ঞানবাদ হচ্ছে বস্তুতন্ত্রবাদের (Realism) প্রতিপক্ষ। এ বিজ্ঞানবাদের বীজ সম্পূর্ণ বৈদেশিক—এ বীজ এসেছিল জেরমান্ চিন্তা-পুষ্প হতে। এ দার্শনিক মত ইংরেজের মোটেই জাতীয় চিন্তাধারা নয়। মাঝে মধ্যে যদি কোন ইংরেজ দার্শনিকের চিন্তার মধ্যে এ বাদের আভাস আমরা পেয়ে থাকি তবে সে চিন্তাকে একটী বিচ্ছিন্ন সূত্রবিহীন ব্যক্তিগত চিন্তা বলেই স্বীকার করতে হবে। সে সব চিন্তাকে জাতীয় চিন্তা বলে ভাববার যথেষ্ট কারণ নেই; কেননা সে চিন্তার উপরে ইংরেজ জাতীয় জীবনের ভিত্তি মোটেই স্থাপিত নয়।

যাক্ সে সব আলোচনা; এ আলোচনা এখানে অবান্তর হয়ে পড়বে। তবে এইমাত্র বলা যেতে পারে যে গ্রেট্‌ব্রিট‌ন্-এ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে যে নব্য বিজ্ঞানবাদের আন্দোলন আরম্ভ হয় সে আন্দোলন এসেছে জেরমানীর হেগেলীয় দার্শনিক আন্দোলন থেকে। জেরমানীতে কান্ট্ থেকে হেগেল পর্য্যন্ত যে তুমুল দার্শনিক চিন্তার স্রোত বয়ে গিয়েছিল তারই একটা ধারা হচ্ছে এই ব্রিটিশ বিজ্ঞানবাদের আদি উৎপত্তি। এই বিজ্ঞানবাদ জেরমান দর্শনের সঙ্গে প্রকাশিত ভাবে সংশ্লিষ্ট, ইংরেজ দর্শনের সঙ্গে নয়।—বিশেষ করে বার্ক্‌লের মৃত্যুর পর থেকে-অর্থাৎ প্রায় ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ষ্টার্লিংএর বিখ্যাত পুস্তক, 'হেগেলের রহস্য' ('The Secret of Hegel') প্রকাশিত হওয়া (১৮৬৫ খৃঃ) পর্য্যন্ত এই শত বর্ষের মধ্যে ইংরেজ দর্শনে কিছুমাত্র বিজ্ঞানবাদের পরিচয় পাওয়া যায় না বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। সুতরাং এই নব্য আন্দোলন ইংরেজের জাতীয় দর্শনের সঙ্গে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত কোনভাবেই সম্বদ্ধ নয়।

এখন কথা হচ্ছে এই বিদেশীয় দর্শন কী ভাবে এসে গ্রেট ব্রিট‌ন্-এ রূপ পেল? একটা কথা এখানে ভুললে চলবে না যে সব সময়ই আমরা দেখতে পাই যে রাষ্ট্রীয় জয় না হলেও এক জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি অপর জাতিকে আকৃষ্ট করে—বিশেষ করে কোনজাতির সংস্কৃতির মধ্যে যদি কিছু ভাল ও মূল্যবান থেকে থাকে তবে ত কথাই নেই! এবং প্রত্যেক জাতীয় সংস্কৃতির মূলে থাকে জাতীয় চিন্তা; সুতরাং চিন্তার জগতেও চলে আদান প্রদান। এই আদানপ্রদান খুব সহজে ও ব্যাপক-ভাবে জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সাহিত্য, কাব্য, কলা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। দার্শনিক গবেষণার মধ্য দিয়ে যে চিন্তার ঘনিষ্টতা হয় তা হয় একটু দেরীতে এবং অনেককাল পর্য্যন্তই সে ঘনিষ্টতা থাকে সীমাবদ্ধ হয়ে কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে।

আর তা ছাড়া বিশ্বের সমস্ত মানব মনের যে সমষ্টিগত মন (universal mind) বা সমষ্টি চৈতন্য (universal consciousness) তাকে যদি আমরা একটা বিরাট বীণা বলে কল্পনা করি এবং ব্যক্তিগত মনগুলোকে (individual minds) যদি তার বিভিন্ন তার বলে মনে করি এবং এই তারগুলো একই সুরে যদি বাঁধা থাকে তবে যে কোন একটী তারে আঘাত করলে তার রেশ কম বা বেশী করে অন্যান্য তারেও প্রতিধ্বনিত হবে। যে তার যত কাছে এবং যার যত বেশী গ্রহণ শক্তি (receptivity) আছে তার ভেতরে তত বেশী বেজে উঠবে। চিন্তা জগতের (thought-world) ব্যাপার ইলেক্‌ট্রন্‌-জগত থেকেও সূক্ষ্ম, কাজেই একমনের চিন্তন যে মন থেকে মনান্তের সঞ্চারিত হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? মনোজগতের এ রহস্য সাধারণ মানব মনের কাছে অবোধ্য হবার কারণ আর কিছুই নয় সাধারণ মানব-মনটী একটী অসম্পূর্ণ রেডিও যন্ত্রের ন্যায় বায়ুমণ্ডলের গণ্ডগোলই শুনে অভ্যস্ত ও শুনতে সক্ষম। আরোও বিশেষ করে ব্যক্তি-মনের তারগুলো একসুরে বাঁধা নয়। কাঁচে কাদা মাখা থকলে যেমন কোন আলোর রশ্মীই প্রতিফলিত হয় না তেমনি আমাদের মনেও কোনরকম কাদা মাখা রয়েছে। মন যদি শুদ্ধ হয় তবেই তার গ্রহণযোগ্যতা বেশী হয় এবং গ্রহণযোগ্যতা বেশী হলেই ব্যক্তি-মন প্রত্যেক ভাবনার তরঙ্গকে (thought wave) গ্রহণ ও উপলব্ধি করতে পারে তখনই সে শুনতে পায় তার প্রজ্ঞা-কর্ণে এইসব তরঙ্গ-বার্তা। সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ মনের শুধু গ্রহণ-যোগ্যতাই থাকে না সঞ্চারক্ষমতা ও (power of transmission) থাকে।

সে যাই-হোক, কবি ও শিল্পীর মন বিশেষ করে সূক্ষ্ম ও ভাবপ্রবণ তাই এই বিরাট মনের একটী তারে যদি কোন অতীন্দ্রিয় রাজ্যের নিগূঢ় অব্যক্ত সুরের রেশ বেজে উঠে তবে এ মনে সর্বাগ্রে এবং অতি সহজেই তার প্রতিধ্বনি হয়। সুতরাং ইংলণ্ডেও এই বিজ্ঞানবাদের বার্তা দার্শনিক জগত থেকে প্রথম না এসে যদি বলি, এসেছিল কাব্য-জগত থেকে তবে আশ্চর্যোর বিষয় কিছুই নেই। ইংরেজী কাব্য-সাহিত্য যাকে বলে ভাববাদ বা রোমাণ্টিসিজ্‌ম্‌, এই বিজ্ঞানবাদের সুরও প্রথম বেজে উঠলো ইংলণ্ডে এই ভাববাদের মধ্যে। রোমাণ্টিক বা ভাববাদী কবিরাই প্রথম দিলেন এই নূতন বার্তা। বিজ্ঞানবাদের প্রথম ছায়া ফুটে উঠলো শেলী, কীট্‌স্‌, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোল্‌রিজের কাব্যের মধ্যে। এঁদের মধ্যে কোল্‌রিজের দানই দর্শন জগতে সব চেয়ে বেশী। কোল্‌রিজ্‌ শুধু কবিই ছিলেন না তিনি দার্শনিকও ছিলেন।

স্যামুয়েল টেলার কোল্‌রিজ্‌ (Samual Taylor Coleridge) —জন্ম ১৭৭২ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৩৪ খৃঃ।—এই দার্শনিক কবিই ইংরেজ

জাতীর চিন্তায় প্রথম বিপ্লব আনবার চেষ্টা করেন। ইনি কান্ট্, হেগেল ফিক্‌টে, শেলিং, প্রভৃতি দার্শনিকগণের দর্শন পড়ে এই জেরমান চিন্তা-ধারার সাথে এতই পরিচিত হলেন যে তিনি তাঁর বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত দার্শনিক গবেষণার দ্বারা তখনকার দিনে প্রচলিত বেনথামীয় চিন্তার ধারাকে তীব্র বাধা দিলেন। কোলরিজের অধ্যাত্ম-তত্ত্ব কী পরিমাণে ইংরেজ দর্শনকে আকৃষ্ট করেছিল তা আমরা মিলের লেখা 'তর্ক ও আলোচনা' (Dissertations and Discussions, 1859) নামক গ্রন্থখানির প্রথম ভাগ পড়লেই বুঝতে পারি। মিল্ এই কবিকে জেরমান বিজ্ঞানবাদের ইংরেজ ব্যাখ্যাকার বলে অভিহিত করেছেন। বেনথামীয় দার্শনিক মতবাদ কর্তৃক প্রণোদিত হয়েও মিল্ যে অচিরেই সেই চিন্তাধারা থেকে বেশ খানিকটা সরে এসেছিলেন তারও কারণ হচ্ছে এই দার্শনিক কবির সাহচর্য্য ও তৎপ্রবর্তিত চিন্তার প্রভাব। একথা শুধু যে ঐতিহাসিকদেরই মন্তব্য তা নয়, একথা মিল্ নিজেও স্বীকার করেছেন—যদিও তাঁর শেষ জীবনে তিনি এই প্রথমজীবনের কোলরিজ্-ভাবাপন্ন হওয়াকে ভুল বলেই মনে করেছেন। এই মন্তব্য তিনি তাঁর 'আত্মচরিতে' (Autobiography-1873) করেছেন।

এতটা দার্শনিক চিন্তা থাকা সত্ত্বেও কোলরিজ্ যে দার্শনিক জগতে একরকম অবিদিত ছিলেন তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে তাঁর দার্শনিক চিন্তাতে আমরা কোন ধারাবাহিক চিন্তার পরিচয় পাই না—বস্তুতঃ তাঁর চিন্তা ছিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও অসম্বদ্ধ—চিন্তার বিশেষ কোন পদ্ধতি ছিল না; আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, সমসাময়িক মিলের অপ্রতিদ্বন্দী প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে ও অসাধারণ ওজস্বিতার প্রাখর্য্যে তাঁর নিজের পাণ্ডিত্যের আলো ক্ষীণ হয়েই পড়েছিল। তাঁর দার্শনিক চিন্তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর অনেক কাল পরে। কবির বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু জোসেফ্ হেনরী গ্রীণ্ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে 'পরলোকগত এস্, টি, কোলরিজের শিক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক দর্শন' (Spiritual Philosophy, founded on the Teaching of the late S. T. Coleridge), নামে পুস্তক প্রকাশ করেন। ইদানীং অবশ্য আরও অনেক পুস্তক কোলরিজের উপর লেখা হয়েছে—তার মধ্যে স্নাইডারের (Snyder's) 'তর্কশাস্ত্রে ও পাণ্ডিত্যের উপর কোলরিজ্' (Coleridge on Logic and Learning, 1929) এবং মুয়েরহেডের 'দার্শনিক কোলরিজ্' (Coleridge as Philosopher, 1930) নামক পুস্তক দু'খানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কোলরিজের সমকালবর্তী সাহিত্যিকদের মধ্যে এখানে টমাস্ ডি কুইন্সি-র (Thomas De Quincey, 1785-1859) নাম উল্লেখ করা

যেতে পারে। তিনিও এই জের্‌মান দর্শনের সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে ইংরেজ চিন্তায় আমূল পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁর ভাব ও ভাষার জটিলতার দরুন তিনি বিশেষ কৃতকার্য্য হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু এই সময়ে টমাস্ কার্লাইলের আধিপত্য ইংরেজ চিন্তায় খুবই লক্ষণীয়। তিন জের্‌মান বিজ্ঞানবাদকে দর্শনের দিক থেকে বিশেষ দেখেন নাই বটে তবে ধর্ম ও ব্যবহারিক জীবনের দিক থেকে আদর্শ রূপেই ধরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজের অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রচলিত জাতীয় চিন্তায় তিনিই প্রথম পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং কোল্‌রিজ থেকেও এই নবীন আন্দোলনে কার্লাইলের দান এক হিসাবে অনেক বেশী। তিনিই প্রথম ইংরেজ ও জের্‌মান সংস্কৃতির মিলনের মূল কারণ। তিনি এই বিজ্ঞানবাদকে জীবনের দিক থেকে দেখেছিলেন বলেই শেলিং ও হেগেল অপেক্ষাও কাণ্ট্ ও ফিক্‌টীয় মতে বেশী মুগ্ধ হয়েছিলেন বলে মনে হয়। এ সময়ে ইংরেজ চিন্তাকে যে আর একজন মনীষী বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন তিনি হচ্ছেন ইমার্সন। ইনি আমেরিকাবাসী হলেও ইংরেজ চিন্তার উপর সে সময় খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

এইত গেল কাব্য ও সাহিত্য জগতে এই আন্দোলনের আদি উৎপত্তির কথা। এখন কথা হচ্ছে দার্শনিক জগতে এ বীজের বাপন কাজ কখন হলো এবং কে করালেন? দার্শনিক চিন্তার ইতিহাস আলোচনা করলে এটাই আমরা দেখতে পাই যে কি ছোট, কি বড় প্রত্যেকটী দার্শনিক মতই প্রকাশিত হয়েছে একটী পূর্ব্বপ্রচলিত চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ। কোন দর্শনের ঐতিহাসিকই এ কথা অস্বীকার করতে পারবেন না। এই নব্য বিজ্ঞানবাদই যখন পরবর্তী কালে বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ব্রাড্‌লে ও বোসাংকোএর চিন্তাতে উচ্চতম সীমায় এসে পৌঁছেছিল তখনই দার্শনিক জগতে প্রতিপক্ষরূপে প্রকাশ পেলো নব্য-বস্তুতন্ত্রবাদ বা নিও-রিয়্যালিজ্‌ম্-এর অঙ্কুর। এখানেও হ'ল একরকম তাই।

মিলের শক্তিশালী হিতবাদ বা ইউটিলিট্যারিয়ানিজম্ ইংরেজ চিন্তা ও জীবনের প্রত্যেকটী বিভাগকেই যখন সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে বসেছে তখন এসে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল প্রবল প্রতাপান্বিত ধর্মবিরোধী ডারউইন্-বাদ। ডারউইন্-বাদ পন্থীগণের ক্রোড়ে দানব শিশুর ন্যায় জড়বাদ বা দেহাত্মবাদ যে শুধু সুখে প্রতিপালিতই হচ্ছিল তা নয়, উজ্জ্বল চন্দ্রকলার ন্যায় সেউত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হচ্ছিল; এবং পরিশেষে এই অল্পজ্ঞানী বৈজ্ঞানিকশিশুর যুক্তিবাদের তীব্রোক্তি এসে জনসাধারণের মনেও যেন একরকম জাল বিদ্ধ করে দিতে লাগলো। মিল ও বেন্‌থামীয় দর্শন দেশে ধর্মের গ্লানি না এনে থাকলেও ধর্মে যে ঔদাসীন্য এনে দিয়েছিল তাতে কোনই

সন্দেহ নেই। ধর্মপ্রাণ চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই সে সময় জড়বাদের আক্রমণে যথেষ্ট অধীর ও মর্মাহত হয়ে পড়লেন। তাঁদের যে জাতীয় দার্শনিক মত প্রত্যক্ষবাদ তার আশ্রয় নিয়ে নিতান্তই হতাশ হয়ে পড়লেন, কেননা প্রত্যক্ষবাদের মধ্যে এমন যুক্তি-তর্ক খুঁজে পেলেন না যা দ্বারা এই জড়বাদের ধর্মবিরোধের বিপ্লবকে তাঁরা বাধা দিতে পারেন। সুতরাং এই সময় অক্সফোর্ডে একদল চিন্তাশীল যুবক বিশেষ দার্শনিক না হয়েও জের্মান বিজ্ঞানবাদের উপর ভিত্তি স্থাপনা করে এক মহা ধর্মান্দোলন আরম্ভ করলেন। এঁদের মধ্যে জন্ হেন্রী নিউম্যান্ ও উইলিয়াম্ জর্জ্ ওয়ার্ডের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য; এবং এই অক্সফোর্ডের আন্দোলন ব্যতীত যাঁরা স্বাধীনভাবে একই সময় এই মতবাদ প্রচার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মার্টিনো, উইলিয়াম্ নিউম্যান, আপটন্ ও মোক্ষমূলারের নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এখানে ফ্রেজার ও ফ্লিণ্ট্ এই দুটী স্কচ্ দর্শন-লেখকের নামও করা যেতে পারে।

মার্টিনোর দার্শনিক চিন্তা যে ১৮৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে বের্লিনে অবস্থান কালে জের্মান দর্শন কর্তৃক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল তাঁর নিজের উক্তিতেই আমরা তার প্রমাণ পাই। এই 'দ্বিতীয় শিক্ষার' ফলকে তিনি তাঁর 'এক নবীন আধ্যাত্মিক জন্ম' (a new spiritual birth) বলে স্বীকার করেছেন।* তাঁর চিন্তায় যে দুটী সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা আমরা খুব প্রবলভাবে দেখতে পাই সে দুটী হচ্ছে 'জ্ঞান' ও 'কার্য্য-কারণ' সম্বন্ধ। এ দুটীর মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধই (Problem of Causality) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রত্যক্ষবাদীর ন্যায় কার্য্য-কারণ সম্বন্ধকে শুধু একটী কালিক নিয়ত-পূর্ব্ববর্তীতা বা অনুধাবন (temporal invariable antecedence or succession) রূপে ধরে নিয়ে কারণকে শুধু দৃশ্যমান বা ব্যবহারিক (phenomenal) জগতের ব্যাপার (event) বলে স্বীকার করেন নাই। তিনি কারণকে উৎপাদক (productive) শক্তি এবং একটী পরম সত্তারূপে (noumenon) অভিহিত করেছেন। তিনি কারণ ও কার্য্যকে সমপ্রকৃতিক (homogeneous) না ভেবে ভেবেছেন বিষমপ্রকৃতিক (heterogeneons)। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধকে প্রকৃতির একরূপতা বা একবিধত্ব (the Law of the Uniformity of Nature) বলে ধরার ফলেই দার্শনিক জগতে পরতন্ত্রবাদ বা ডিটারমিনিজম্-এর সৃষ্টি এবং এই ডিটারমিনিজম্-ই হচ্ছে জড়বাদের মূল ভিত্তি। সুতরাং ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য (free will) সিদ্ধ করাই হচ্ছে মার্টিনোর কারণবাদের তাৎপর্য্য ও

* ড্রামণ্ড ও আপটন্ লিখিত 'জেমস্ মার্টিনোর জীবনী ও পত্রাবলী' ২য় ভাগ —Life and Letters of James Martineau Vol. 2. দ্রষ্টব্য।

উদ্দেশ্য। প্রকৃত কারণ বলতে তিনি আমাদের ইচ্ছা-শক্তিকেই বোঝেন-এই ইচ্ছা-শক্তির অধিষ্ঠান বাহ্য জগতে নয়, আমাদের অন্তর্জগতে বা আত্মায়। অতএব কারণ ও কার্য্য এক পর্য্যায়ভুক্ত হতে পারে না। প্রত্যেক কার্য্যের পূর্বে যে কারণরূপে আমাদের স্ব-ইচ্ছা সেই ইচ্ছা-শক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও আত্মজ, কোন বাহ্য নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা সেই কারণ সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং কার্য্য এই কারণ-ইচ্ছার প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু যেহেতু আমাদের এই মানব মনের ইচ্ছা-শক্তি বিশ্ব-জগৎকে সৃষ্টি করতে পারে না, সেই হেতু আমাদের আত্মাই বিশ্বের পরম সত্তা নয়। সমস্ত জাগতিক ঘটনাবলীর সমষ্টিরূপে যে কারণ সেই কারণ হচ্ছে বিশ্ব-ইচ্ছা (cosmic will) বা ঐশী-ইচ্ছা (divine will) এবং এই ঐশী-ইচ্ছাই হচ্ছে পরম সত্তা বা অ্যাব্‌সলিউট্‌। —এই কারণবাদের উপরই মার্টিনোর সমস্ত তত্ত্ব-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত এবং এই ভিত্তিকে অবলম্বন করেই দাঁড়িয়েছে তাঁর নীতি-শাস্ত্র বা এথিক্‌স্‌। তিনি এই নীতিশাস্ত্রে জীবাত্মার নৈতিক-স্বাতন্ত্র্যকে (moral freedom) এত বড় করেই দেখেছেন যে তিনি এই সিদ্ধান্তেই এসে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছেন যে,নৈতিক জীবরূপে মানুষ শুধু জাগতিক ব্যাপার থেকেই পৃথক নয়. এর আদি স্রষ্টা যে ঐশী-ইচ্ছা তার থেকেও সম্পূর্ণ পৃথক। এই দ্বৈতভাবাপন্ন হয়েই তিনি ও তাঁর মতাবলম্বীগণ পরে হেগেলীয় পরাবিজ্ঞানবাদের (Hegelian Absolutism) বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি হেগেলীয় বিজ্ঞানবাদকেও একপ্রকার পারতন্ত্র্য বা ডিটারমিনিজ্‌ম্‌ বলেই অভিহিত করেছেন।—সে যাই হোক. মার্টিনোর এই দার্শনিক মতই দর্শন-জগতে 'নৈতিক বিজ্ঞানবাদ' বা 'এথিকাল আইডিয়ালিজ্‌ম্‌' নামে সুপরিচিত।

এই সব ধর্মোদ্দীপিত দার্শনিকগণ ঈশ্বর-তত্ত্ব গবেষণায় ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রামাণ্যে রত হয়ে যে শুধু ধর্ম-তত্ত্বোপদেষ্টা (theologian) হয়েই নীরব ছিলেন তা নয়। এদের যুক্তি-তর্ক বিজ্ঞানবাদ ও অধ্যাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাতে দার্শনিক জগতেও এঁরা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন।—ইংরেজ দর্শনে এই-ই হ'ল নব্য বিজ্ঞানবাদের গোড়ার পত্তন। বিজ্ঞানবাদের আন্দোলন যে ইংলণ্ডে প্রথম আরম্ভ হয় ধর্মের উদ্দেশ্য করে তা আমরা বেশ প্রমাণ পাই স্টার্লিং, গ্রীণ, ওয়ালেস ও কেয়ার্ড প্রভৃতি এই আন্দোলনের প্রথম নেতাদের মধ্যে। এই ধর্মোদ্দীপনার ছায়া এই সব দার্শনিকের মধ্যে বেশ ভালভাবেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, যদিও এর পরবর্তী চিন্তার মধ্যে দার্শনিক উদ্দীপনাই একমাত্র পরিলক্ষিত হয়—তাতে ধর্মোদ্দীপনার লেশ মাত্রও নেই।

সুতরাং নব্য-বিজ্ঞানবাদের কারণ এই ধর্মোদ্দীপনা ব্যতীত দর্শনোদ্দীপনাতেও নিহিত ছিল। এই বিজ্ঞানবাদ একদিকে যেমনই প্রত্যক্ষবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিল তেমনই আর একদিকে তখনকার দিনে প্রচলিত হ্যামিল্টনীয় দর্শনেরও বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। স্যর উইলিয়াম্ হ্যামিল্টন (১৭৮২খৃঃ-১৮৫৬খৃঃ) একজন বিখ্যাত স্কচ্ দার্শনিক। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ এবং জেরমান দার্শনিক গ্রন্থসমূহের যেমন তাঁর বিস্তীর্ণ জ্ঞান ছিল এমন আর তাঁর সমসাময়িক দার্শনিকগণের মধ্যে কারও ছিল না। ইংরেজ দর্শনের সঙ্গে কান্ট্‌কে পরিচিত করান তিনিই প্রথম, যদিও সেই পরিচয়টা ছিল নিতান্তই উপর উপর বা অগভীর। তিনি যে কান্টীয় দর্শন প্রচার করেছিলেন সে হচ্ছে কান্টের নেতিবাদের দিকটা (negative aspect)। অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) ও দৃশ্যবাদই (phenomenalism) যে কান্টীয় দর্শনের মূল তাৎপর্য্য এটাই তিনি সিদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। স্বরূপ-সত্তার (thing-in-itself) অজ্ঞাতত্ব (unknownness ও অজ্ঞেয়ত্বই (unknowability) যে কান্টের অতীন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞানের (Transcendental philosophy) একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় তারই প্রমাণে হ্যামিল্টনীয় দর্শন প্রয়াস পেয়েছে। তাঁর মতে জ্ঞানের আপেক্ষিকতা (relativity of knowledge) প্রমাণই হচ্ছে কান্টের তত্ত্ববিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য। কান্টীয় দর্শনের এই একটা দিকের উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য ছিল সেটা হচ্ছে এই যে, হ্যামিল্টন তাঁর স্বদেশীয় দার্শনিক রীডের (Reid) লোকায়ত দর্শন (common-sense philosophy) ও কান্টীয় দর্শনের সমন্বয়ের বৃথা চেষ্টায় রত হয়েছিলেন।—সে যাহা হোক, এই কান্টীয় দর্শনের প্রচারের ফলে ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে যে শুধু প্রত্যক্ষবাদ দৃষ্টবাদে (positivism) পরিণত হয়েছিল তা নয়, পরন্তু ইংলণ্ডে কান্টের পরবর্তী দর্শনের আলোচনায় সম্পূর্ণরূপে অন্তরায় উপস্থিত হ'ল। এই হ্যামিল্টনীয় প্রভাব থেকে ইংরেজ দর্শনকে সরিয়ে নিয়ে আসবার প্রয়াসেই আমরা দেখতে পাই এর বিরুদ্ধে স্টার্লিং-এর তুমুল আন্দোলন। সুতরাং ইংরেজ দর্শনের এই চিন্তাতে নিমজ্জিত হয়ে দার্শনিকগণ যখন কোন সমাধানের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তখন যে হেগেলীয় বিজ্ঞানবাদ এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নবীন প্রাণ ও অসাধারণ শক্তি নিয়ে ইংরেজ-ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি!—এবং এই জন্যই কান্টের সঙ্গে পূর্ব হতে পরিচিত হয়েও কান্ট্ অপেক্ষা হেগেলই সে সময় ইংরেজ দর্শনে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। পূর্ব-লিখিত ধর্ম-আন্দোলনেও এই একই মন্তব্য প্রকাশ করা চলে। জেরমান দর্শনের মধ্যে তখন হেগেলীয় দর্শনই স্থান পায়

এবং এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকগণ দার্শনিক জগতে ইঙ্গ-হেগেলীয় (Anglo-Hegelians) বা নব্য-হেগেলীয় (Noe-Hegel ians) নামে অভিহিত।

এই নব্য-হেগেলীয় আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বে যে সব দার্শনিকের মধ্যে বিভিন্ন আকারে বিজ্ঞানবাদের আভাস দেখা দিয়েছিল তাঁদের মধ্যে জন গ্রোট (John Grote,)-১৮১৩—৬৬ খৃঃ, ও জেম্‌স্‌ ফেরীয়ারের (James F. Ferrier)—১৮০৮-৬৪ খৃঃ, নাম উল্লেখযোগ্য এবং এই সঙ্গে ফ্রেডেরিক ডেনিসন মরিস্‌-এর (F. D. Maurice,)—১৮০৫-৭২খৃঃ, নামও করা যেতে পারে। গ্রোট কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈতিক দর্শনের (Moral Philosophy) অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্বাধীনভাবে বিজ্ঞান-বাদের উপর ভিত্তি স্থাপনা করে দৃশ্য ও দৃষ্টবাদের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করেন। তাঁর প্রমাবিজ্ঞানকে (epistemology) হ্যামিলটনীয় অজ্ঞেয়বাদের আপেক্ষিকতার (agnostic relativism) দোষে দুষ্ট করে নাই। গ্রোটের মতে একটী বিষয়-বস্তুর মধ্য দিয়ে বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধির যে সমন্বয় তাকেই জ্ঞান বলা হয় এবং স্বরূপ-সত্তা কোন প্রকারেই অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় থাকতে পারে না, কারণ এই সত্তার স্বরূপ এবং এর জ্ঞাতা যে মন তার স্বরূপ একই প্রকারের। তিনি তাঁর দার্শনিক মতকে সহজ করে প্রকাশ করে উঠতে পারেন নি বটে তবে তাঁর বিজ্ঞানবাদের মধ্য দিয়ে একপ্রকার পরা-বিজ্ঞানবাদের পরিচয়ই পাওয়া যায়। ফেরীয়ারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর মৌলিক অজ্ঞানবাদে (theory of ignorance)। স্পিনোজার ন্যায় তিনিও কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ বাক্য (axioms) থেকে বিশেষানুমান বা অবরোহানুমান (deduction) দ্বারা দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁর প্রথম উপপাদ্যটী (theorem) হচ্ছে এই- যে কোন বিষয়ের সম্বন্ধে জ্ঞান হোক না কেন তার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতার নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রকার জ্ঞান থাকা আবশ্যক।* এই ব্যক্যটী তাঁর মতে সমস্ত প্রকার জ্ঞানেরই নিয়ামক। ফেরীয়ারের এই দার্শনিক মতের ফলে ইংলণ্ডে জের্‌মান দর্শনের প্রতি বেশ অনুরাগ উপস্থিত হলো- শুধু তাই নয়, ফেরীয়ার দর্শনের আর একটী উপকারিতা আমরা দেখতে পাই। সেটী হচ্ছে এই যে বার্ক্‌লের দর্শন ইংরেজ দর্শন থেকে একরকম লোপই তখন পেয়েছিল এবং ফেরীয়ারই এই বিস্মৃত বার্ক্‌লের প্রথম পুনরুদ্ধার করে থাকেন।

ঐতিহাসিকদের মতে এই ধর্মান্দোলন এবং দার্শনিক আন্দোলনই ইংলণ্ডে জের্‌মান বিজ্ঞানবাদের উৎপত্তির একমাত্র কারণ নয়। ইংরেজ

* "Along with whatever any intelligence knows, it must, as the ground or condition of its knowledge, have some cognizance of *itself*" Institutes of Metaphysic (1854).

দর্শনের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক ডক্টর মেট্জ্ তাঁর 'ব্রিটিশ দর্শনের শত বর্ষের ইতিহাস' নামক বিখ্যাত পুস্তকখানাতে এই মত প্রকাশ করেছেন যে ইংলণ্ডে বিজ্ঞানবাদের পুনরভ্যুদয় প্রথম সুরু হয় সাহিত্য জগতে, এর পরে কয়েকজন দার্শনিক পৃথকভাবে এর প্রচার করেন, কিন্তু আরও দুটী সহকারী কারণ এর উৎপত্তি ও স্থাপনে সহায়তা করেছে—সে দুটীর একটী হচ্ছে ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বে উদ্দীপনা এবং অপরটী হচ্ছে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উচ্চশ্রেণীর পৌরাণিক গ্রন্থাদি পাঠের উন্নতি সাধনের সঙ্কল্প। * সুতরাং এই উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থাদি পাঠ ও এই বিজ্ঞানবাদের উৎপত্তির আর একটী কারণ।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ করে এই উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থাদি পাঠ শুধু পৌরাণিক গ্রীক্ ও রোমান্ সাহিত্য ও দর্শনপাঠেই সীমাবদ্ধ হয়ে ছিল না; এখানে সঙ্গে সঙ্গে জের্মান দর্শনও তরুণ পণ্ডিতদের যথেষ্ট মুগ্ধ করেছিল। এবং এই আকর্ষণের কারণও আমাদের খুঁজে বার করতে বেশী পরিশ্রম করতে হয় না।—এক কথায় সেটী হচ্ছে এই প্লেটনীয় বিজ্ঞানবাদ ও জের্মান বিজ্ঞানবাদের অপূর্ব সাদৃশ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে যে অক্সফোর্ডে গ্রীক্ দর্শন অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে জের্মান বিজ্ঞানবাদের পাঠে ও সমালোচনায় তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হ'ল তার মূলে হলেন সুপ্রসিদ্ধ অক্সফোর্ডের অধ্যাপক বেঞ্জামিন্ জাওয়েট্ (Benjamin Jowett, 1817-93)। কি সাহিত্য কি দর্শন, কি অর্থশাস্ত্র সমস্ত জগতেই আমরা অধ্যাপক জাওয়েটের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত;—তাঁর সক্রোড়পত্র প্লেটোর কথোপকথনমূলক গ্রন্থসমূহের (Dialogues) অনুবাদ এবং বিখ্যাত থুসিডাইডিস্ (Thucydides) ও আরিষ্টট্লের 'রাজনীতি' বা 'পলিটিক্স্'এর অনুবাদের কথা কে না জানে?—কথিত আছে ১৮৪৪ ও ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জেরমানীতে গিয়ে তিনি জের্মান বিজ্ঞানবাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হ'ন। অনেকেরই মত যে তাঁর হেগেলীয় দর্শনের জ্ঞান নিতান্তই অসম্পূর্ণ ছিল। একথা সত্য হলেও তাঁরই প্ররোচনায় যে তরুণ অক্সফোর্ডীয় পণ্ডিতগণ দলে দলে হেগেলের দার্শনিক গ্রন্থাদি পাঠে মনোনিবেশ করেছিলেন তাতে কোন ভুলই নেই। হেগেলীয়বাদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা একাগ্রচিত্তে এই প্রথম অক্সফোর্ডে আরম্ভ হয়। এমন কি গ্রীণ্, এডোয়ার্ড কেয়ার্ড, নেট্ল্সিপ্ প্রভৃতি নব্য হেগেলীয়বাদের প্রথম

* The renaissance of Idealism in England, then, had its way prepared by literary currents, and was announced by a few isolted philosophers. But two further factors helped to originate and precipitate it, firstly religious and theological interests, secondly the cultivation of classical studies in the older universities'-(A Hundred years of British Philosophy - p. 248).

পথপ্রদর্শকগণ অধ্যাপক জাওয়েটেরই এক প্রকার শিষ্য। অক্সফোর্ডের ব্যালিয়ল কলেজে এই অধ্যাপকের সংস্রবে এসেই দলে দলে যুবকগণ হেগেলীয় দর্শনে পারদর্শী হয়ে গ্রেটবৃটেন্-এর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপনায় রত হয়ে নব্য-হেগেলীয়বাদ প্রচার করতে সুরু করলেন। অক্সফোর্ডের পরেই গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কেয়ার্ড ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্য দিয়ে এই নব্য-বিজ্ঞানবাদের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে। এবং এই আন্দোলন সমগ্র ব্রিটিশ চিন্তায় যে আমূল পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব এনে দিয়েছিল সে রকম বিপ্লব ইংরেজ দর্শনের ইতিহাসে আর কোন দিন ঘটে নাই বলল মোটেই অত্যুক্তি হবে না।—এ চিন্তার প্রাখর্য্য ও প্রসারতা ইংরেজ দর্শনকে ইতিহাসে এক অভিনব শক্তি দিয়ে সজীব ও উজ্জ্বল করে রেখেছে।—এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে এই আন্দোলন প্রথম যেমন হেগেলকে কেন্দ্রীভূত করেই সুরু হয়েছিল, কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর আর তেমন হেগেলেই এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নাই। তখন কাণ্ট্ থেকে হেগেল পর্য্যন্ত সমস্ত দার্শনিক চিন্তাকে এবং পরবর্তী কাণ্টীয় জেরমান্ চিন্তাকে একই শৃঙ্খলাবদ্ধ ধারারূপে ভাবা হয়েছে। এবং হেগেল ব্যতীত অপর যে এক বিখ্যাত দার্শনিক এই সময়ে ইংরেজ দর্শনে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন তিনি হচ্ছেন জেরমানীর গোয়েটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের (Göttingen University) স্বনামধন্য অধ্যাপক লোট্‌সে (Lotze)।

এই আন্দোলন বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবে অগ্রসর হতে থাকে। প্রথম ভাগে যে এর গতি সেটা আমরা দেখতে পাই এক রকম হেগেলীয় দর্শনের অনুবাদ, টীকা, সমালোচনা ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে। স্টার্লিং, গ্রীণ, কেয়ার্ড, ওয়ালেস্ প্রভৃতি নেতাগণই এ কাজে বিশেষ করে ব্যাপৃত ছিলেন। এঁদের চিন্তায় যে কোন মৌলিকত্বের পরিচয় আমরা পাই না তা নয়—এখানে আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে এঁরা হেগেলীয় চিন্তার উপর ভিত্তিস্থাপনা করে হেগেল-বাদের সম্প্রসারণেই বিশেষ তৎপর ছিলেন। কিন্তু পরে যখন এই আদি ভিত্তিকে লঙ্ঘন করে দার্শনিকগণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে বিশ্বের রহস্যের তথ্য নিয়ে মৌলিক গবেষণায় রত হয়েছিলেন তখন এই নব্য-হেগেলীয়বাদের শুধু অপূর্ব কল্পনা শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায় নাই, অধিকন্তু সেই সব দার্শনিকগণের চিন্তার নূতনত্ব ও মৌলিকত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এবং এই যুগে সর্বাপেক্ষা অধিক অনুধ্যানপরায়ণতার পরিচয় যে ব্র্যাড্‌লে ও ম্যাক্-ট্যাগার্ট্ দিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহই নেই,—বোসাঙ্কোয়ে, ওয়ার্ড, প্রিঙ্গ্‌ল্-প্যাটিসন, হ্যালডেন প্রভৃতিরও এ বিষয়ে গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল।—যথাক্রমে তারই পরিচয় আমরা পরে দেবার চেষ্টা করবো।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকীয়

'দর্শনের' দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান সংখ্যাটি লইয়া পত্রিকার চারি সংখ্যা প্রকাশ করা হইল। এই চার সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সম্বন্ধে একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে ইহাদের প্রত্যেকটিতে দুই শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে। কতকগুলি প্রবন্ধ সাধারণ বিষয়ে এবং সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। আবার কতকগুলিতে দর্শন শাস্ত্রের কোন বিশেষ তত্ত্বের বিচার করা হইয়াছে অথবা কোন জটিল দার্শনিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। শেষোক্ত প্রবন্ধগুলির ভাষা অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং স্থলবিশেষে নূতন পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করার জন্য দুর্ব্বোধ্যও মনে হইতে পারে। এই দুই শ্রেণীর প্রবন্ধের সমাবেশ করিয়া পত্রিকাটিকে সাধারণ পাঠক এবং দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি উভয়ের পাঠোপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দর্শন পত্রিকায় এই উভয় ধারার প্রবন্ধ প্রকাশ করার আর একটি উদ্দেশ্য হইতেছে দর্শনের প্রচার ও দার্শনিক চিন্তাধারার প্রসার। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষাতেই দর্শনের গ্রন্থাদি লিখিত হইত এবং পণ্ডিতদের মধ্যে দার্শনিক আলোচনাতেও এই ভাষা ব্যবহৃত হইত। ইহার ফলে দার্শনিক চিন্তা অল্পসংখ্যক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য তাঁহাদের দার্শনিক মত বা চিন্তা যে সাধারণ লোকের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই এমন কথা বলিতেছি না। পক্ষান্তরে ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ে তাঁহাদের মতামতই সাধারণ লোকের জীবন ও আচার ব্যবহারে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং তাহাদের সমাজব্যবস্থার অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তনও ঘটাইয়াছে। তথাপি একথা সত্য যে সাধারণ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দার্শনিক চিন্তা তেমন প্রসারলাভ করে নাই এবং দার্শনিক আলোচনাও তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে চলে নাই। অধুনা আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার খুব প্রচলন হইয়াছে এবং স্থলবিশেষে আমাদের মাতৃভাষা অপেক্ষা ইংরেজী ভাষার অধিক সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অবশ্য আমাদের অনেক বিষয়ে সুবিধা হইয়াছে। যেমন রাজকর্ম্ম লাভ করিতে, ভিন্নভাষাভাষীদের সহিত কাজকর্ম্ম ও ভাবের আদানপ্রদান করিতে ইংরেজী ভাষা আমাদের বিশেষ সহায়তা করে। কিন্তু তাই বলিয়া স্বজাতি ও সমভাষীদের সঙ্গে সাধারণ বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে আমরা যে ভূরি ভূরি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করি তাহাতে আমাদের বিশেষ উপকার সাধিত হয় নাই, বরং কিছু অপকারই হইয়াছে ও হইতেছে। অনেক সময় কোন ভাব প্রকাশ করিতে বা কোন বস্তুর নাম বলিতে গেলে আমরা উপযুক্ত বাংলা কথা খুঁজিয়া পাই না। ইহা ইংরেজী শিক্ষার কুফল না হইলেও যে আমাদের অভ্যাসের কুফল তাহা অস্বীকার করা যায় না; দার্শনিক চিন্তা ও আলোচনা ক্ষেত্রে

ইংরেজী ভাষার সমাদর এবং মাতৃভাষার অনাদর যে কতটা অনিষ্টকর তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ উপাধি পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে ভারতীয় দর্শনের কোন স্থান ছিল না। এই ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন চ্যান্সেলার মহামান্য লর্ড রোনাল্ডসে বলিয়াছিলেন 'যে ব্যবস্থায় কোন ভারতীয় ছাত্র ভারতীয় দর্শনের কিছু না পড়িয়া বা না জানিয়া দর্শনশাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়া সাধারণ বি. এ উপাধি মাত্র নহে, এমন কি সম্মানের উপাধি লাভ করিতে পারে তাহা একটা বড় রকমের অব্যবস্থা মাত্র।' এক্ষণে সে অব্যবস্থার অবসান হইয়াছে এবং উক্ত পরীক্ষায় দর্শনবিষয়ে ভারতীয় দর্শন অল্প একটু স্থান পাইয়াছে। এ জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। কিন্তু এখনও দর্শনের পঠনপাঠন ইংরেজী ভাষাতেই চলিতেছে। তাহার ফলে দর্শন চর্চ্চা করিতে আমরা সাধারণতঃ ইংরেজী ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকি, এমন কি ঐ ভাষার সাহায্যে আমাদের দার্শনিক চিন্তাধারাও প্রবাহিত হয়। কিন্তু এরূপ স্থলে আমাদের দার্শনিক চিন্তা তেমন ফলবতী হইতে পারে না এবং ধারণাগুলিও পরিস্ফুট হইতে চায় না। স্বাভাবিক খাদ্যাভাবে আমাদের দেহ যেমন খর্ব্ব ও বিকল হইয়া পড়ে, মাতৃভাষার অভাবে তেমনি আমাদের চিন্তা স্বচ্ছন্দগতিতে চলে না এবং ভাবপ্রকাশও সহজ হয় না। অপর দিকে ইংরেজীতে দর্শন আলোচনার ফলে আমাদের মধ্যে যাঁহারা ইংরেজী দর্শন জানেন না তাঁহাদের পক্ষে দর্শনের চর্চ্চা বা আলোচনায় যোগদান করা সম্ভব হয় না। অতএব আমাদের পক্ষে বাংলা ভাষাতেই দার্শনিক চিন্তা ও আলোচনা করা স্বাভাবিক ও হিতকর। কিন্তু ইহার আলোচনা করিতে যাইয়া যদি কেবল দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের যৌক্তিক বিচার করা যায় তাহাতে দর্শনাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কিছু উপকার হইলেও সাধারণ পাঠকের কোন উপকার হয় না। অবশ্য এরূপ আলোচনাও যে অত্যাবশ্যক তাহা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ বিষয়ে সহজভাবে দার্শনিক আলোচনাও বাঞ্ছনীয়। কারণ এইরূপেই দর্শনচর্চ্চার প্রসারবৃদ্ধি হইতে পারে। এজন্য "দর্শন" পত্রিকায় উভয়ধারার প্রবন্ধেরই সম্মানের স্থান আছে। এই দুই প্রকারের প্রবন্ধ কোন্ কোন্ বিষয়ে লিখিত হইতে পারে, অথবা প্রধানতঃ কোন্ কোন্ বিষয় লিখিত হইলে পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে তাহা আগামী সংখ্যায় আলোচনা করা যাইবে।

•

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক ডক্টর হীরালাল হালদার মহাশয় বিগত ভাদ্র মাসের ২৯শে তারিখে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি

ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন এবং বিশ্বের দার্শনিক সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মত একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও খ্যাতনামা দার্শনিকের মৃত্যুতে বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের যে ক্ষতি হইল তাহা শীঘ্র পূরণ হইবার নহে। ডাঃ হালদার প্রথম জীবনে বরিশাল রাজচন্দ্র কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করিয়া বহরমপুর কলেজে দীর্ঘ ১৮ বৎসরকাল কৃতিত্বের সহিত দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে দর্শনানুরাগী অধ্যাপক হালদার মহাশয়কে তাঁহার ঈপ্সিত দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থাদির অভাবে কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সিটি কলেজের অধ্যাপকরূপে কলিকাতায় আসার পর তাঁহার সে অসুবিধা দূর হয়। তিনি অবসরসময়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী প্রভৃতিতে দর্শনের নানাপ্রকার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার দর্শনপাঠাভিলাষ চরিতার্থ করেন। প্রধানতঃ দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিলেও তিনি ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয় গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বহু বৎসর ইংরেজী সাহিত্যেরও অধ্যাপক ছিলেন এবং তাঁহার লিখিত গ্রন্থাদিতে ইংরেজী রচনার পারিপাট্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সিটি কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিবার সময় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন এবং অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বিভাগের অধ্যাপনার কার্যে অংশগ্রহণ করিতেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি পূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার অধ্যাপনা-প্রণালী অতি মনোহর ও কার্য্যকরী ছিল। তিনি অতি সহজ ও সরল ভাষায় দর্শনের দুর্বোধ্য বিষয়গুলির যে প্রাঞ্জল অথচ গভীর ব্যাখ্যা করিতেন তাহা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। তিনি বহুবৎসর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম দর্শনাধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন এবং শেষ দিকে দুই বৎসরের জন্য 'জর্জফিফ্‌ত' নামক অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেটের সদস্যরূপে অনেক বৎসর কার্য্য করেন এবং তাহার সম্মান ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিছুদিনের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৩ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ হইতে অবসরগ্রহণ করেন এবং শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১৯৩৮ সালে সেনেটের সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

ডাঃ হালদার দর্শনবিষয়ে হেগেলমতাবলম্বী ছিলেন। কাণ্ট ও হেগেলের দর্শন তাঁহার জীবনের সাধনার বস্তু ছিল। এ বিষয়ে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফল তিনি দুইখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রথমটির নাম "হেগেলিয়ানিজম্ অ্যাণ্ড হিয়ুম্যান্ পারসনালিটি"। ইহা লিখিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এচ. ডি. উপাধি প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয়টিতে তিনি কয়েকজন খ্যাতনামা নব্য-হেগেলপন্থীদের মতবাদের আলোচনা করিয়াছেন এবং সেইজন্য তাঁহার

"নিয়ো-হেগেলিয়ানিজম্‌" নাম দিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে তিনি দর্শনবিষয়ে "এসেজ ইন ফিলসফি" ও "টু এসেজ অন্‌ জেনারেল ফিলসফি অ্যাণ্ড এথিকস্‌" নামক দুইখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ক্ষুদ্রগ্রন্থ রচনা করেন। ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতিতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি বহু প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং "ম্যান্‌স্‌ সারভাইভ্যাল অব ডেথ্‌" নামক একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি উপনিষদ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি পাঠ করিয়া কালাতিপাত করিতেন। তিনি একজন সত্যনিষ্ঠ, স্বধর্ম্মপরায়ণ ও উদার-মতাবলম্বী ব্রাহ্ম ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে যেমন তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল না, তেমনি স্বধর্ম্মে তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা থাকিলেও অন্যধর্ম্মের প্রতি কোন বিদ্বেষ বা অনাদরের ভাব ছিল না। বাংলার এই বরেণ্য মনীষী ও বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিকের পরলোকগমনে একটি আদর্শ জীবনের অবসান ঘটিল। আমরা তাঁহার স্বর্গত আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ও আত্মীয়দের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

পুস্তক-পরিচয়

The Foundations of Empirical Knowledge (প্রাকৃতজ্ঞানের ভিত্তি) মিঃ অলফ্রেড্. জে. এয়ার্, এম্. এ. কৃত।

আমরা সচরাচর নিঃসন্দেহে ধরিয়া লই যে, চক্ষু-প্রভৃতির সাহায্যে টেবিল চেয়ার ইত্যাদি যে সব জিনিষ অহরহ জানিতে পাই, সেগুলি বাস্তবিকই 'আছে', অর্থাৎ ইহারা জ্ঞান হইতে পৃথক্ ও স্বসত্তাবান্ বস্তু, জ্ঞানের বিষয়ীভূত কিন্তু জ্ঞানাতিরিক্ত ও স্বসত্তান্বিত বলিয়া গৃহীত এই যে বিবিধ পদার্থ, ইহাদের সাধারণ নাম 'প্রকৃতি' বা বাহ্যজগৎ। প্রাকৃতজ্ঞানের অর্থ প্রকৃতিবিষয়কজ্ঞান। মাঝে মাঝে ইহা ভ্রান্ত বলিয়া ধরা পড়ে। তাই প্রশ্ন উঠে, উহা কি কখনও যথার্থ, আর যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে, তাহা জানিবার উপায় কী? বর্ত্তমানযুগের ইউরোপীয় দর্শনে এই সমস্যা লইয়া অপর্য্যাপ্ত চর্চ্চা হইয়াছে। এখনও তাহার বিরাম হয় নাই। শ্রীযুক্ত এয়ার্ তাঁহার এই সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থে এই প্রশ্নগুলিরই সংক্ষেপে কিন্তু দক্ষতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন।

যে মতানুসারে ইন্দ্রিয়োপলব্ধিই প্রাকৃতজ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি, উহার সত্যতা নির্দ্ধারণের একমাত্র সম্বল, তাহাকে ইংরাজীতে এম্পিরিসিজম্ কহে। চক্ষুকে অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রতীক মানিয়া, বাংলায় এই মতবাদকে "ঈক্ষণবাদ" বলা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত এয়ার্ ঈক্ষণবাদী। গত ত্রিশবৎসর যাবৎ ইংলণ্ডদেশীয় ঈক্ষণবাদীদের লেখায় 'সেন্সডেট্‌ম্' বলিয়া একটি শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার হইতেছে। শ্রীযুক্ত এয়ার্ও নিজ মতামত প্রকাশ করিতে এই শব্দটির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আমি অন্যত্র ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছি 'ইন্দ্রিয়োপাত্ত'। রাসেল্, মুর্, ষ্টাউট, ব্রড, প্রাইস্, ডজহিল্স প্রমুখ দার্শনিকগণ এই ইন্দ্রিয়োপাত্তের স্বরূপ এবং তাহার সহিত জড়-বস্তুর সম্বন্ধ ইত্যাদি প্রশ্ন লইয়া বহু কল্পনাজল্পনা ও আলোচনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ, অধ্যাপক প্রাইস্‌লিখিত 'পার্সেপশন্' নামক গ্রন্থে, এ সম্বন্ধে বিস্তৃত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আছে। সকল দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ইহাই ইন্দ্রিয়োপাত্ত সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে যে সব সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত এয়ার্, অধিকাংশস্থলে, তাহাদেরই সমালোচনারূপে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এয়ারের গ্রন্থের প্রথম দুই পরিচ্ছেদের বিষয় ইন্দ্রিয়োপাত্তের স্বরূপনির্ণয়। অনেক দার্শনিক মনে করেন, ইন্দ্রিয়োপাত্ত-শব্দটি কোন নূতন মতবাদ অথবা নবাবিষ্কৃত কোন বস্তুর নির্দ্দেশক। কিন্তু এয়ারের মতে, ইহা ঠিক নহে। 'ইন্দ্রিয়োপাত্ত' একটি নূতন পরিভাষামাত্র। প্রাত্যহিক জীবনের অদার্শনিক ভাষায় যখন বলি, আমি একটি সাদা রঙের গৃহ দেখিতেছি, তখন 'দেখিতেছি' শব্দের ভিতর এই অর্থও নিহিত থাকে যে, মদ্দৃষ্ট সাদা রঙ, চতুষ্কোণ আকৃতি এবং মাঝারি রকমের আকারটি ঐ গৃহেরই সম্মুখভাগের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু একটু ভিন্ন দৃষ্টি-কোণ ও দূরত্ব হইতে এবং আলাদা রকম আলোকে, সেই গৃহের দিকে যখন দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, তখন অনুভবের যাথার্থ্য রাখিতে হইলে আমাকে বলিতে হয়, আমি একটি ধূসর বর্ণের ক্ষুদ্রাকার বিষমচতুষ্কোণ গৃহ 'দেখিতেছি', 'দেখিতেছি' শব্দের পূর্ব্বোক্ত সূচনাটি মানিয়া লইলে,

এই সব নূতন বর্ণ, আকার (অর্থাৎ সাইজ), এবং আকৃতি (অর্থাৎ শেইপ)ও ঐ গৃহের একই পৃষ্ঠভাগের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অথচ "একই জিনিষের একই অবচ্ছেদে একাধিকবর্ণ প্রভৃতি আছে," এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ সাধারণ ভাষার নিয়ম অনুসারে অর্থহীন ও বিরোধাত্মক, এই বিরোধ এবং অর্থহীনতা দূর করিবার জন্যই ইন্দ্রিয়োপাত্ত ভাষার উৎপত্তি। বিভিন্ন অবস্থায় গৃহের একই পার্শ্বের দিকে তাকাইয়া যে-বিভিন্ন বর্ণ, আকার ও আকৃতি দেখি, সেগুলিকে গৃহের পৃষ্ঠভাগের ধর্ম বা গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ না করিয়া, বলা যাইতে পারে যে, উহারা এমন 'একটা কিছু', যাহা গৃহের সহিত সংসৃষ্টভাবে উপলব্ধ হইলেও, গৃহের ধর্ম বা গুণ নহে। এবম্বিধ 'একটা কিছুকেই' ইন্দ্রিয়োপাত্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। একই গৃহের একই অবচ্ছেদে বিরুদ্ধ নানা ধর্ম্ম থাকা অসম্ভব বটে, কিন্তু বিরুদ্ধধর্ম্মান্বিত বিভিন্ন ইন্দ্রিয়োপাত্তের সহিত উহার কোন এক সম্বন্ধ থাকিতে আপত্তি কি? একই বসুনামধারী-ব্যক্তির রঙ ফরসা ও কাল হইতে পারে না, একথা নিশ্চয়ই সত্য; কিন্তু ফরসা ও কাল রঙের দুই বিভিন্ন ব্যক্তি পারিবারিক সম্বন্ধে একই বসুপরিবারে বিদ্যমান থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। একটি বস্তুর দিকে মন্দ আলোকে তাকাইয়া, সাধারণ ভাষায় যখন বলি, 'আমি একটি ধূসর ও আবর্ত্তুল বস্তু দেখিতেছি,' তখন ইন্দ্রিয়োপাত্তীয় ভাষায় বলিতে হইবে, 'আমি একটি ধূসর ও আবর্ত্তুল চক্ষুরূপাত্ত উপলব্ধি করিতেছি।' এরকম বলার সুবিধা এই যে, স্পষ্ট আলোকে ও কিঞ্চিৎ ভিন্ন স্থান হইতে ঐ বস্তুর দিকে তাকাইয়া "আমি একটি গোল ও সাদা ইন্দ্রিয়োপাত্ত দেখিতেছি" এইরূপ বাক্যোচ্চারণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত ধূসর ও আবর্ত্তুল ইন্দ্রিয়োপাত্ত বিষয়ক বাক্যের সহিত কোন বিরোধ ঘটে না. কারণ, এই বিরুদ্ধ ইন্দ্রিয়োপাত্তদ্বয়, একই বস্তুর সহিত সম্পর্কিত হইলেও, তাহার শরীরের অংশ কিংবা সাক্ষাৎ ধর্ম্ম নহে। এইভাবে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও যথাযথ বর্ণনা দেওয়ার কাজে, সাধারণ ভাষা হইতে ইন্দ্রিয়োপাত্তীয় ভাষা অধিক সুবিধাজনক। কিন্তু তাই বলিয়া 'টেবিল' 'চেয়ার' প্রভৃতি জড়পদার্থবাচকশব্দদ্বারা যে সব তথ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়, ইন্দ্রিয়োপাত্ত শব্দদ্বারা যে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকম তথ্যের নির্দ্দেশ করা হয়, এমন নহে, ইহাও ঠিক নয় যে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের সঠিক বর্ণনা একমাত্র ইন্দ্রিয়োপাত্তীয় ভাষাতেই সম্ভবপর। বস্তুজগতের একই তথ্য নানা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভবপর, ইন্দ্রিয়োপাত্ত-ভাষী দার্শনিক যখন বলেন, 'আমি একটি ধূসর বর্ণের আবর্ত্তুল চক্ষুরূপাত্ত অনুভব করিতেছি,' তখন তিনি নিম্নলিখিতভাবেও আপন মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন :— "আমি একটি জড়দ্রব্য দেখিতেছি—তাহা ধূসর ও আবর্ত্তুল দেখাইতেছে, অথবা অনুভবে সে রকম ভাসিতেছে (কে জানে, হয়ত, আসলে সেটি নীল ও গোল)।" যদি এমন হয় যে, আমার লক্ষ্যস্থলে ধূসর দেখাইতে পারে, এমন কিছু আদৌ নাই, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে. "সেখানে একটি ধূসর জড়দ্রব্য আছে এই রকম দেখাইতেছে অথবা অনুভবে ভাসিতেছে।" এইভাবে যেসব ইন্দ্রিয়োপলব্ধির বর্ণনায় 'দেখিতেছি' শব্দের প্রয়োগে বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা, সে সব স্থলে 'দেখাইতেছে' কিংবা 'আছে বলিয়া দেখাইতেছে' এবম্বিধ আভাসীয় শব্দের প্রয়োগে বিরোধ পরিহার সম্ভবপর।

দৈনন্দিনভাষার প্রয়োগরীতি কিয়ৎপরিমাণে বদলাইয়া লইলে, উহার সাহায্যেও এ সব ইন্দ্রিয়োপলব্ধির যথার্থ বর্ণনা দেওয়া একেবারে দুর্ঘট হইবে না। সাধারণ ভাষায় যে সব স্থলে 'দেখিতেছি' শব্দের প্রয়োগে বিরোধ উপস্থিত হয়, প্রণিধান

করিলে বুঝা যাইবে, সে সব স্থলে 'দেখিতেছি' শব্দের অর্থের ভিতর নিম্নলিখিত সূচনাগুলিও উহ্য অথবা গৃহীত থাকে :—

১। যাহা যেরূপে দেখিতেছি. তাহা ঠিক সেরূপে বাস্তবেও বর্ত্তমান।

২। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তনে দৃষ্টরূপের পরিবর্ত্তন সাধিত হইলেও, তদ্দ্বারা বস্তুর রূপ পরিবর্ত্তন ঘটে না।

ইহাদের ভিতর প্রথম নিয়মটির গুরুত্ব অধিক। যেখানে ইহার ব্যতিক্রম হয়, সেখানে আমরা 'দেখিতেছি' শব্দের প্রয়োগ করিতেই কুণ্ঠিত হই। যদি আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের অনুভূতরূপ বস্তুর বাস্তবরূপ হইতে পৃথক, তাহা হইলে আমরা ভুল সংশোধন করিয়া বলি, 'দেখিয়াছিলাম,' ঠিক এরকম বলা যায় না, তবে, দেখিতেছি বলিয়া বোধ হইতেছিল।' দ্বিতীয় নিয়মটিও বেশ প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই : কিন্তু উহা যে একেবারে অপরিহার্য্য এমন নহে। অর্থাৎ যদি কেহ বলে যে, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তনে বস্তুর রূপপরিবর্ত্তন ঘটে, তবে তাহার উক্তিদ্বারা তর্কশাস্ত্রীয় কোন নিয়মের ভঙ্গ হইবে না। একই বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন বিরুদ্ধধর্ম্ম একই সময়ে একই সম্বন্ধে থাকা অযৌক্তিক বটে : কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর রূপান্তরঘটা অসম্ভব নহে ; কারণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন কাল ও সম্বন্ধের পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভরশীল, চারটা পাঁচ মিনিটের সময় 'ক'বিন্দুতে দাঁড়াইয়া যখন একটি বস্তুকে বৃত্তাকৃতিরূপে দেখিয়াছিলাম, তখন তাহাতে বৃত্তাকৃতিই বর্ত্তমান ছিল, এবং চারটা দশ মিনিটের সময় 'খ' বিন্দুতে দাঁড়াইয়া যখন ঐ বস্তুটীকেই ডিম্বাকৃতিরূপে দেখিতেছি, তখন তাহার পূর্ব্বাকৃতি বদলাইয়া ডিম্বাকৃতি হইয়াছে,—এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ আমাদের এই পরিমার্জ্জিত নূতন ভাষার নববিধানে দোষাবহ হইবে না। তবে কি বুঝিতে হইবে বস্তুটি আসলে গোল নয় ? হাঁ, চারটা পাঁচমিনিটের সময় 'ক' বিন্দু হইতে গোল হইলেও, চারটা দশ মিনিটে 'খ' বিন্দু হইতে গোল নয়, এরকম ঐন্দ্রজালিক অদলবদল সম্ভবপর মনে করিলে, আমি যাহা যেভাবে দেখি, তাহাকে কখনও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করার প্রয়োজন থাকিবে না। মরুমরীচিকার সম্পর্কেও 'সত্য' শব্দের ব্যবহার অন্যায় হইবে না। তবে স্বীকার করা দরকার হইবে যে আমাদের উপলব্ধ সত্যবস্তুগুলির ভিতর অনেকগুলি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, এবং অনেকগুলি সকলের দৃষ্টিগম্য নহে। এ রকম ক্ষণভঙ্গুর বস্তু এবং বস্তুধর্ম্মকে সত্য বলিয়া ধারণা করিলে, সংসারধর্ম্ম পালন করা দুরূহ ব্যাপার হইলেও, এই রকম ধারণা তত্ত্বতঃ বিরোধাত্মক নহে।

সুতরাং ইন্দ্রিয়োপাত্তভাষী যদি মনে করেন যে, তাঁহার বক্তব্য ইন্দ্রিয়োপাত্তব্যতীত অন্যভাষায় সম্যক্ ব্যক্ত করা অসম্ভব. তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন। অবশ্য, সকল দিক বিবেচনা করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, প্রাকৃতজ্ঞানের প্রামাণ্যালোচনায় ইন্দ্রিয়োপাত্তীয় ভাষা অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা বেশী সুবিধাজনক। তাই শ্রীযুক্ত এয়ার্‌ও স্বীয় মতামত এই ভাষাতেই প্রকাশ করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়োপাত্তসংক্রান্ত আলোচনায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির গুরুত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত।

(ক) ইন্দ্রিয়োপাত্তে এমন কোন ধর্ম্ম বা গুণ প্রতিভাত হইতে পারে কি, যাহা উহাতে বাস্তবিক পক্ষে নাই ?

(খ) উহাতে এমন কোন ধর্ম্ম বা গুণ থাকিতে পারে কি, যাহা উহাতে মাঝে মাঝে প্রতিভাত হয় না ?

(গ) ইন্দ্রিয়োপাত্তকে জ্ঞাতার মন অথবা মস্তিষ্কের অন্তর্গত বলিয়া ধার্য্য করা যায় কিনা? গেলে, কী অর্থে?

এ সব প্রশ্ন লইয়া দার্শনিকদের ভিতর বাদবিবাদ কম হয় নাই, কিন্তু আজও উহাদের সম্বন্ধে কোন সর্ব্বজনমান্য সিদ্ধান্তের সন্ধান পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত এয়ার্ বলেন, প্রাকৃতজ্ঞান অথবা তাহার বিষয়বস্তুর স্বরূপ বিচার করিয়া, এ সব প্রশ্নের সমাধানকারক উত্তর দেওয়া অসম্ভব, কারণ, ইন্দ্রিয়োপাত্ত বলিতে, কোন নূতন বস্তু বা বস্তুর কোন নূতন ধর্ম্ম বুঝায় না, উহা একটী প্রস্তাবিত নূতন পরিভাষামাত্র। আলোচ্য প্রশ্নগুলির উত্তরদ্বারা শুধু এই নূতন পরিভাষার ব্যবহার বিধি নির্ণীত হইবে, এই যা। কিন্তু কোন নূতন ভাষার প্রয়োগবিধি কী হইবে, তাহা আমরা সুবিধা বুঝিয়া যেরূপ ইচ্ছা তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে পারি। সুতরাং যে সব সুবিধার জন্য এই নূতন পরিভাষার সৃষ্টি, সেগুলি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, এমনিভাবে প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া উচিত হইবে, এখন, ইন্দ্রিয়োপাত্ত শব্দের একটী প্রধান সুবিধা এই যে, উহার ব্যবহার দ্বারা, প্রমাপ্রত্যক্ষের বেলা ত বটেই, ভ্রমপ্রত্যক্ষের বেলাও, যাহা সাক্ষাৎ যে রকম ভাবে জানি, তাহাকে ঠিক সেই রকম ভাবেই অস্তিত্ববান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর হয়; আধুলি সম্পর্কিত বর্ত্তুল ও আবর্ত্তুল উভয় ইন্দ্রিয়োপাত্তই সমানভাবে সত্য, কিন্তু ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রতিভাত ধর্ম্ম তাহার স্বধর্ম্ম হইতে পৃথক্ হওয়া সম্ভব বলিয়া মানিলে উক্ত সুবিধাটুকু জলাঞ্জলি দিতে হয়। কারণ, প্রতিভাতরূপটিকে তখন আর 'আছে' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। জড়বস্তুবাচক শব্দের সহিত 'আছে' শব্দের প্রয়োগ করিতেহইলে, যেমন স্বরূপ ও অবভাসের পার্থক্য অবশ্যস্বীকার্য্য ইন্দ্রিয়োপাত্তশব্দের বেলাও তাহাই ঘটিবে। এবং তাহা হইলে এই নূতনশব্দের ব্যবহারদ্বারা দার্শনিক বাগাড়ম্বরবৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজন সাধিত হইবে কিনা সন্দেহজনক। সুতরাং ইন্দ্রিয়োপাত্ত শব্দটি যে-উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে তাহা স্মরণে থাকিলে, উপরিলিখিত প্রশ্নগুলির ভিতর প্রথম দুইটির 'না'-উত্তরই সমীচীন বলিয়া গণ্য হইবে। অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়ানুভবে প্রতিভাত হয় না এমন ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়োপাত্তে নাই, এবং যাহা ইন্দ্রিয়োপাত্তে প্রতিভাত হয় তাহা অবশ্যই সেখানে আছে—এইরূপ মানিয়া লওয়াই উক্ত উদ্দেশ্যের পক্ষে অনুকূল, অতএব সমীচীন হইবে। কিন্তু এইরূপ নিয়ম মানা না মানা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর, সুবিধার উপর, নির্ভর করে। উহা না মানিলে-যে বস্তুস্থিতির অপলাপ কিংবা যুক্তিশাস্ত্রের অবহেলা হইবে, এমন নহে। তবে, এরকম নিয়মদ্বারা ভ্রম ও প্রমার পার্থক্যনির্ণয়ে সুবিধা হইবে, এই যা।

ইন্দ্রিয়োপাত্তের স্থান মনের ভিতরে কি বাহিরে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া শ্রীযুক্ত এয়ার বিজ্ঞানবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদীর মতে, সকল বস্তুই মানসিক, কারণ, 'থাকা' মানেই 'অনুভূত হওয়া', অননুভূত-পদার্থ অর্থাৎ জড়বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব। কিন্তু এই মতের স্বপক্ষে যুক্তি কী? "অজ্ঞাত বস্তু আছে" এই বাক্যপ্রয়োগে তর্কশাস্ত্রীয় কোন নিয়মের ভঙ্গ হয়, অথবা বন্ধ্যাপুত্রের কল্পনার ন্যায় এই বাক্যে কোন স্ববিরোধ রহিয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই সঙ্গত হইবে না। হয়ত বিজ্ঞানবাদী আপত্তি করিবেন—অজ্ঞাতবস্তুর স্বভাব না বদলাইলে, অর্থাৎ ইহার অজ্ঞাতত্ব লোপ না পাইলে, উহার সম্বন্ধে 'জ্ঞাত'শব্দের প্রয়োগ অসমঞ্জস; অথচ জ্ঞানব্যতীত বস্তুর অস্তিত্ব নির্দ্ধারণের উপায়ান্তর নাই; এতএব অননুভূত বস্তুর অস্তিত্বপ্রকাশক বাক্যে বিশ্বাস করিবার যথাযোগ্য কারণ খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু এই আপত্তি বিচারে টিকিবেনা। "আমার অলক্ষিতে রান্নাঘরে বিড়াল ঢুকিয়াছে" এই বাক্যের সত্যতা শেষপর্য্যন্ত প্রত্যক্ষজ্ঞানদ্বারাই অবধারণ করিতে হয় বটে, তবু ঐ সত্যতা আমার জানা না জানার উপর নির্ভর করেনা—আমি জানি বা না জানি, বাক্যটি যদি সত্য হয় তবে তাহা সত্যই থাকিবে। অবশ্য, এইরূপ বাক্যের সত্যতা স্ব-তন্ত্র কিংবা অন্য-নিরপেক্ষ নহে। ইহাদের যাথার্থ্য নিম্নলিখিতরূপ বাক্যের সত্যতাদ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। যথা, যদি রান্নাঘরে আমার দৃষ্টি পৌছাইত, তাহা হইলে সেখানে একটি বিড়াল দেখিতে পাইতাম। শ্রীযুক্ত এয়ার্ এর মতে' অনমুভূত বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাসকরা, আর এবম্বিধ যদি—তবে' যুক্ত বাক্যে বিশ্বাস করা, একই কথা। এরকম বাক্যে 'যদি' শব্দ নির্দ্দিষ্ট যে সর্ত্তের উল্লেখ থাকে, বাস্তবে তাহার সম্পূর্ত্তি ঘটুক বা না ঘটুক, তাহাতে বিধানটির সত্যত্বের কোন হানি হয় না অর্থাৎ রান্নাঘরে আমার দৃষ্টি না পৌছাইলে, উক্ত বাক্যটি যে মিথ্যা হইয়া যাইবে, এমন নহে। "অনমুভূত বস্তুর অস্তিত্ব" অথবা "বস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ সত্তা" বলিতে, আমরা এইপ্রকার সর্ত্তসূচক বাক্যের সর্ত্তসম্পূর্ত্তিনিরপেক্ষ সত্যতা বুঝিয়া থাকি—এর বেশী কিছু নহে। অতএব 'অনমুভূত বস্তুর 'অস্তিত্ব'' এই শব্দসমূহের অর্থে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় কোন স্ববিরোধ বর্ত্তমান নাই। সুতরাং "সকল অস্তিত্ববান্ পদার্থই মানসিক" এরকম কথা প্রথমে তর্কবিজ্ঞানের সাহায্যে সমর্থন করিয়া, তাহার পর ইন্দ্রিয়োপাত্তকে মানসিক বস্তু বলিয়া প্রতিপাদন করা অসম্ভব। (পৃঃ ৬৭)।

এখন দেখা যাউক, ইন্দ্রিয়োপাদ্য (সেন্সিবিলে) অথবা অনমুভূত ইন্দ্রিয়োপাত্তের সত্তা স্বীকার করা সমীচীন কিনা। "আমার অজ্ঞাতসারে অমুক জড়বস্তু আছে" এই বাক্যের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, অসংখ্য সর্ত্তসূচক বাক্যের সাহায্য লইতে হয়; যথা, যদি 'অ'বিন্দু হইতে "আ" আলোকে, 'ই' দূরত্বে, 'উ'কোণে.... .. কেহ তাকায়, তবে সে 'প' আকৃতি, 'ফ'রঙ, 'ব' আকারের... একটা কিছু দেখিবে; আবার যদি 'ক' বিন্দু হইতে, 'খ' আলোকে .....তাকায়, তবে 'ত' আকৃতি, 'থ'রঙ ....প্রভৃতির একটা কিছু দেখিবে; .. ইত্যাদি। এবং এই অসংখ্য সর্ত্তীয় বাক্যের নির্দ্দেশ না করিয়া সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, অমুকস্থলে 'চ' নামক একটা জড়বস্তু আছে। সুতরাং অনমুভূত জড়বস্তুর অস্তিত্ব মানিলে, যথেষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়োপাত্তের বেলা সেরকম কোন সুবিধা দেখা যায় না। আমরা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি যে, এক ইন্দ্রিয়োপাত্ত শুধু একটিমাত্র বিশিষ্ট রঙ বা আকৃতি প্রভৃতির নির্দ্দেশক হইবে। সুতরাং "আমার অজ্ঞাতসারে অমুক ইন্দ্রিয়োপাত্তটি অমুকস্থলে আছে" এই বাক্যের যাথাতথ্য শুধু একটি সর্ত্তীয়বাক্যের সত্যতাদ্বারাই অবধারিত হইতে পারে। অর্থাৎ এই সর্ত্তীয়বাক্যটি যতটুকু তথ্যের বর্ণনা দেয় ইন্দ্রিয়োপাত্তের অস্তিত্ববাচক বাক্যটি তাহা অপেক্ষা অধিক তথ্য প্রকাশ করিতে সমর্থ নাই। কাজেই, অনমুভূত ইন্দ্রিয়োপাত্তের সত্তা মানিয়া বিশেষ সুবিধা বা লাভ নাই। তবে সর্ত্তসূচক বাক্য কিঞ্চিৎ দীর্ঘকায় হয় বলিয়া, উহার পরিবর্ত্তে 'ইন্দ্রিয়োপাদ্য' (অর্থাৎ অনমুভূত ইন্দ্রিয়োপাত্ত) শব্দের ব্যবহার সুবিধাজনক হইতে পারে। যথা, যদি "কেহ 'অ'-বিন্দু হইতে 'আ' আলোকে......তাকায়, তবে সে 'ই' ইন্দ্রিয়োপাত্ত অনুভব করিবে" এই লম্বা বাক্যটার পরিবর্ত্তে বলা যাইতে পারে, "অমুকস্থলে একটি 'ই' ইন্দ্রিয়োপাদ্য রহিয়াছে।"

যদি 'মানসিক বস্তু' বলিতে রাগদ্বেষ সুখদুঃখাদির ন্যায় মনের অবস্থা বা বৃত্তিবিশেষ বুঝায়, তাহা হইলে, ইন্দ্রিয়োপাত্ত অনুপলব্ধ অবস্থায় থাকে না" এই বাক্যদ্বারা

ইন্দ্রিয়োপত্তের মানসিকত্ব নিষ্পন্ন হয় না। ইন্দ্রিয়োপাত্তকে মানসিকবস্তুরূপে নির্দ্দেশ করিলে, খুব হয় ত, ইহাই প্রকাশ করা হয় যে, ইন্দ্রিয়োপাদ্যের অথবা অনুপলব্ধ ইন্দ্রিয়োপাত্তের অস্তিত্ব নাই; অথচ, এবম্বিধ নির্দ্দেশদ্বারা, ইন্দ্রিয়োপাত্তের স্বরূপ সম্বন্ধে (উহা রাগদ্বেষাদির ন্যায় মনের বৃত্তিবিশেষ কিনা এই প্রকার) অযথা সন্দেহ উঠা সম্ভবপর। প্রত্যক্ষানুভবের সাক্ষাৎ বিষয় ছাড়া অন্যকিছুকে ইন্দ্রিয়োপাত্ত শব্দে অভিহিত করিবনা, এই সংকল্পের ভিতর, এমন কোন স্বীকৃতি নাই যে, ইন্দ্রিয়োপাত্ত শব্দটি মনোবাহ্য জড়বস্তুর বর্ণনায় ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।

ইন্দ্রিয়ানুভবের বর্ণনায়, সাধারণতঃ "ইহা ঘট" "উহা দোয়াত", এবম্বিধ বাক্যের ব্যবহার হয়। অত্রত্য 'ঘট' 'দোয়াত' প্রভৃতি শব্দগুলি জড়বস্তুর নির্দ্দেশক। অর্থাৎ জড়বস্তুবাচক শব্দ বহিঃপ্রত্যক্ষের বর্ণনার সাধারণবাহন। এখন, কোন কোন দার্শনিক ইন্দ্রিয়োপাত্তবাচক শব্দকে তাহার বাহন করিতে চাহেন। ইহাতে আপত্তি করিবার হেতু নাই; কারণ, একই তথ্য বিবিধ পরিভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভবপর। তথাপি, যদি কেহ মনে করে যে, কোন বাংলা বাক্যের যেরূপ হুবহু ইংরাজী তরজমা হইতে পারে, তেমনি জড়পদার্থীয় বাক্যের ইন্দ্রিয়োপাত্তীয় ভাষায় অবিকল অনুবাদ করা সম্ভব, তাহা হইলে, তাহার ভুল হইবে। "আমি চেয়ারে বসিয়াছি" এই কথার পরিবর্ত্তে, যদি বলা যায় যে, "আমি একটি ধূসর ও মসৃণ ইন্দ্রিয়োপাত্তের উপর বসিয়াছি," অথবা "আমি একটি জায়মান ধূসর ও মসৃণ ইন্দ্রিয়োপাত্ত এবং তদ্বিধ কতকগুলি ইন্দ্রিয়োপাদ্যের একটি বর্গবিশেষের উপর বসিয়াছি," তাহা হইলে, শুধু যে অদ্ভুত শুনাইবে, এমন নহে, কিন্তু এই অদ্ভুত কথার অর্থ বাহির করাও দুষ্কর হইবে। ইহার কারণ, জড়পদার্থীয় ভাষার প্রয়োগরীতি ইন্দ্রিয়োপাত্তীয় ভাষার প্রয়োগরীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাহা ছাড়া জড়পদার্থীয় বাক্যের বক্তব্য ইন্দ্রিয়োপাত্তীয় ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে, অসংখ্য বাক্যের প্রয়োজন। কারণ, 'ঘট' বলিতে যাহা বুঝি, তাহা নানা অবস্থায় নানাভাবে প্রতিভাত হয়, এবং এই সব সম্ভবপর অবস্থার সংখ্যা অনন্ত বলিয়া, ঘটের প্রতিভাত-রূপ অথবা ঘটসংক্রান্ত ইন্দ্রিয়োপাত্তের সংখ্যাও অনন্ত। তবু, জড়বস্তু বলিতে ইন্দ্রিয়োপাত্ত হইতে অত্যন্ত ভিন্ন কোন পদার্থ বুঝায়, অথবা ইন্দ্রিয়োপাত্ত ত বুঝায়ই, অধিকন্তু তদতিরিক্ত অন্য কিছুও বুঝায়—এমন নহে। জড়বস্তুবাচক শব্দে যে-তথ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়, ইন্দ্রিয়োপাত্তবাচক শব্দে তাহাই ব্যক্ত হইয়া থাকে। তবে, জড়ীয় ভাষায় যে-তথ্য প্রকাশ করিতে ঘটপটাদির ন্যায় একটিমাত্র শব্দের প্রয়োজন, সেই তথ্যই ইন্দ্রিয়োপাত্তীয় ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে, ইন্দ্রিয়ো-পাত্তব্যঞ্জক অসংখ্য শব্দের ব্যবহার করিতে হয়।

অনেক দার্শনিক মনে করেন, নিজের মন হইতে পৃথক্ অন্য মনের অস্তিত্ব জানা অসম্ভব। কারণ স্বাতিরিক্ত মনকে জানিতে হইলে, তথাকার কোন অনুভবের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটা দরকার; অথচ, যে অনুভব একের মানসিক ইতিহাসের ঘটনা, তাহা অন্যের মানসিক ইতিহাসের অন্তর্গত নয়। আলোচ্যমান গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীযুক্ত এয়ার এই মতের প্রতিবাদে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যদিও একই অনুভবকে বিভিন্ন মনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা আমাদের প্রাত্যহিক ভাষার নিয়মদ্বারা অনুমোদিত নয়, তথাপি এইরূপ বাক্যপ্রয়োগে কোন যৌক্তিক বিরোধের উৎপত্তি হয় না; অর্থাৎ একের মনোভুক্ত অনুভব অন্যের মনে থাকিতে পারা তর্কশাস্ত্রীয় নিয়মে বেশ সম্ভবপর। (১৬৯ পৃঃ)। সুতরাং মদতিরিক্ত মন

আছে, এইরূপ উহ বা আন্দাজ (হাইপথেসিস্) বাস্তবে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হওয়া সম্ভবপর হইলেও, অযৌক্তিক কিংবা অসম্ভাবিত নহে। "বর্ত্তুল আয়তক্ষেত্র আছে", এই কথা যেমন স্ব-বিরোধী এবং অসম্ভাবিত, "আমা-হইতে পৃথক্ মন আছে", এই কথা তেমন নহে। একবার স্বাতিরিক্ত মনের স ়া সম্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করিলে তাহার পক্ষসমর্থক অন্যান্য যুক্তিগুলিও বেশ বলবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।" এই সব যুক্তি মুখ্যতঃ সাদৃশ্যমূলক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে কার্য্যকারণ নিয়মের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার সারমর্ম্ম এই। কার্য্যকারণ নিয়মে বিশ্বাস না থাকিলে-যে মানুষের চিন্তাধারাই ব্যাহত হইয়া যাইত, আহা নহে। নিয়মটি সার্ব্বত্রিক কিনা, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাবলীর পর্য্যবেক্ষণ ছাড়া নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। কিন্তু সে রকম পর্য্যবেক্ষণদ্বারা জগতের প্রত্যেক অংশেই-যে কার্য্যকারণ নিয়ম ধরা পড়ে, তাহা নহে। সুতরাং উহার সার্ব্বত্রিকতা মানার স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তির অভাব। অবশ্য যে সব স্থলে কোন প্রত্যাশিত নিয়মের ব্যাঘাত দেখা যায় সেখানেও আমাদের অলক্ষিতে অন্য কোন নিয়ম বিদ্যমান আছে, এইরূপ উহ বা আন্দাজ অযৌক্তিক নয়; বরং উহাতে নূতন নিয়ম আবিষ্কারে সাহায্য হইতে পারে। তবু, সেখানে—যে কার্য্যকারণ নিয়ম বাস্তবিকই আছে, তাহা প্রমাণিত হয় না। (পৃ: ২২০)

সে যাহা হউক, একথা মানিতেই হইবে যে, অননুভাব্য ঘটনা এবং অনুভূত ঘটনার ভিতর, কারণ ও কার্য্যের সম্বন্ধ লাগাইতে যাওয়া অযৌক্তিক। অর্থাৎ প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা দিতে যাইয়া,যাহারা উহার কারণরূপে কোন অজ্ঞেয় বস্তুর নির্দ্দেশ করে,তাহাদের মত যুক্তিহীন। ইন্দ্রিয়োপাত্তের যদি কোন কারণ থাকে, তবে ইন্দ্রিয়োপাত্তেই তাহার সন্ধান মিলিবে—কোন কারণধর্ম্মান্বিত ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুতে নহে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে ইন্দ্রিয়োপাত্তীয় ভাষায় জড়বস্তুর গঠন নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছে। জড়বস্তুবাচক শব্দের ব্যবহার দ্বারা যে সব ইন্দ্রিয়োপাত্তের বর্গ বা শ্রেণীর নির্দ্দেশ করা আমাদের ঈপ্সিত, তাহাদের স্বরূপ কী অথবা কীরকম সম্বন্ধ দ্বারা এই সব বর্গের ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি পরস্পরের সহিত একত্রিত বা সংহত হয়, এসব প্রশ্নের আলোচনা করা হইয়াছে। স্থানাভাবহেতু এখানে তৎসম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে পারা গেলনা।

শ্রীযুক্ত এয়ারের ঈক্ষণবাদ অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার দার্শনিক প্রতিবিম্ব। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ অগম্য অথবা তাহার সহিত একেবারে অসম্বদ্ধ—এরূপ অপ্রাকৃত জিনিষের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ধাতুবিরুদ্ধ। কিন্তু প্রাকৃতজ্ঞানের উৎকর্ষের প্রথম ধাপে, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের অভ্রান্ততায় যে অন্ধ শ্রদ্ধা এবং অগাধ বিশ্বাস লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের অত্যাধুনিক যুগে অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া, বেশ একটু সৌম্যাকার ধারণ করিয়াছে। ইংলণ্ডীয় দার্শনিকদের ভিতর বার্ট্রাণ্ড রাসেল্‌কে এবম্বিধ অতিরেক-বর্জ্জিত ঈক্ষণবাদের পুরোহিত বলা যাইতে পারে। এয়ার্ তাঁহারই মতের সমর্থন করিয়াছেন, এইরূপ বলিলে অন্যায় করা হইবে না। কিন্তু সমর্থনভঙ্গিটি তাঁহার নিজস্ব। তিনি স্পষ্ট স্বীকার করেন যে, সর্বপ্রকার প্রাকৃতজ্ঞানেই ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। যৌক্তিক যুক্তি কিংবা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়ানুভূতি, কিছুতেই ঘটাদিজ্ঞানবিশেষের সত্যতা জ্যামিতীয় নিশ্চয়তার সহিত নির্দ্ধারণযোগ্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া সুস্থ মস্তিষ্কে নয় নশরনে যখন কোন বস্তু সাক্ষাৎ অনুভব করি, তখন আমাদের

এই জ্ঞান যে ভ্রান্ত, তাহা প্রতিপাদন করাও প্রায় অসম্ভব। বরং, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, জ্ঞাতা এবং অন্যান্য উপায়ে পরীক্ষিত হওয়ার পর, যে সব ঘটাদিপ্রাকৃতজ্ঞান ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, তাহাদের ভ্রান্তিসম্ভাবনা একেবারে তিরোহিত না হইলেও, নিতান্তই উপেক্ষণীয়। প্রত্যুত এরূপ প্রাকৃতজ্ঞান-যে ভুল, একথা কেবল যৌক্তিক যুক্তিতে প্রমাণ করা একেবারে অসম্ভব। তাহা ছাড়া, যে কোন প্রাকৃতজ্ঞানবিশেষের সত্যতায় সন্দেহের স্থান থাকিলেও, সর্বপ্রাকৃত জ্ঞান সম্বন্ধে এবম্বিধ সন্দেহের অবকাশ নাই। কোন বস্তুকে যখন নীল বলিয়া দেখি, তখন সন্দেহ হইতে পারে, উহা বাস্তবিকই নীল কিনা। কিন্তু অত্রত্য সন্দেহের সহিত এই বিশ্বাসও জড়িত থাকে যে, উহার নিকটে যাইয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে, এই সন্দেহ দূরীভূত হইবে। অর্থাৎ যে কোন প্রাকৃতজ্ঞান সম্পর্কেই সংশয় উঠুক না কেন, ঐ সংশয়ের ভিতর এই ইঙ্গিতও রহিয়া যায় যে, অন্য এক বা একাধিক প্রাকৃতজ্ঞানদ্বারা তাহা দূর করা সম্ভব। কিন্তু যদি ভূত. বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্বপ্রাকৃতজ্ঞানই সর্বদার জন্য সংশয়াপন্ন হইত, তাহা হইলে সংশয় দূর করার কোন উপায় না থাকায়, উক্ত ইঙ্গিতটি নিরর্থক হইয়া পড়িত। সুতরাং যে 'সন্দিগ্ধ' শব্দের অর্থে এইরূপ ইঙ্গিত আছে, তাহার প্রয়োগও সর্ব্বত্র অপ্রাসঙ্গিক হইয়া যাইত। এই প্রসঙ্গে, আর একটি কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য। সন্দেহ দূর করার উপায় উপলব্ধ না হইলেই-যে সন্দিগ্ধ বস্তু মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, এমন নহে। সন্দিগ্ধ শব্দের অর্থ মিথ্যার নিশ্চিতি নয়, কিন্তু সত্যমিথ্যা ব্যাপারে নিশ্চিতির অভাব। "সকল ইন্দ্রিয়ানুভবই ভ্রান্ত", এই বাক্যটি সত্য হওয়া ত দূরের কথা, উহার কোন সামঞ্জস্যযুক্ত অর্থই হইতে পারে না।

কিন্তু আমার মনে হয় না, ইন্দ্রিয়ানুভবের সত্যতাসম্বন্ধে দেকার্ত যে সংশয়ের উত্থাপন করিয়াছিলেন, এয়ারের উপরোক্ত যুক্তিদ্বারা তাহার নিরসন সম্ভবপর। 'ক'কে মিথ্যা বলিলে, ইহা অবশ্যই উহ্য থাকে যে, 'ক' হইতে ভিন্ন অন্য কিছু সেখানে সত্য (যদিও এমন হইতে পারে যে, ঐ সত্য জ্ঞাতার নিকট অংশত: অজ্ঞাত)। সুতরাং "সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ানুভব মিথ্যা", এই বাক্যের অর্থের ভিতর, "তৎসংক্রান্ত অন্য কোন অনুভব সত্য", এই বাক্যার্থটুকু নিশ্চয়ই নিহিত থাকে। অত্রস্থ অধোরেখান্বিত "অনুভব" শব্দটির পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত এয়ার্ "ইন্দ্রিয়ানুভব" শব্দ ব্যবহার করিতে চাহিবেন। অর্থাৎ তিনি বলিবেন, এক ইন্দ্রিয়ানুভবকে মিথ্যা বলিয়া অবধারণ করিলে, সেখানে যে অনুভবটির সত্যতা উহ্য থাকে, তাহা ইন্দ্রিয়জ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এইরূপ নিয়ম মানিবার স্বপক্ষে আমি কোন যৌক্তিক বাধ্যবাধকতা দেখিতে পাই না। অবশ্য, এক ইন্দ্রিয়ানুভবকে মিথ্যা বলিবার সময়, সাধারণত: আমরা তৎসংক্রান্ত অন্য এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়জ প্রতীতিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু সাধারণতঃ এইরূপ করিলেও, ইন্দ্রিয়প্রতীতির মিথ্যাত্ব-যে ইন্দ্রিয়াজনিত অনুভবের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেই পারে না, ইহাও কি সত্যমিথ্যা শব্দের প্রয়োগবিধিতে অনিবার্য্যভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে? "সর্ব্ব ইন্দ্রিয়প্রতীতিই ভ্রান্ত," এই বাক্যটি সত্য হউক মিথ্যা হউক, ইহাকে অর্থশূন্য বাক্যাভাস বলিয়া মনে করিবার কোন যুক্তি নাই। বলা যাইতে পারে যে, ইন্দ্রিয়ানুভব ব্যতীত আমাদের ত অন্য কোন রকম অনুভবই হয় না। কিন্তু একথা অপ্রাসঙ্গিক। কারণ, ইন্দ্রিয়জপ্রতীতি ভিন্ন অন্য প্রতীতি বাস্তবে না ঘটিলেও, ঘটিতে পারিত কিংবা ঘটিতে পারে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ইন্দ্রিয়াজনিত অনুভবের সম্ভাবিতত্ব

তর্কশাস্ত্রীয় নিয়মের উল্লঙ্ঘন করে না। সুতরাং 'সর্বইন্দ্রিয়ানুভবে"র সম্পর্কে "ভ্রান্ত" শব্দের ব্যবহার বিরোধাত্মক বাক্যপ্রয়োগ নহে।

শ্রীযুক্ত এয়ার্ ইন্দ্রিয়োপাত্তের স্বরূপ সম্বন্ধে যে-মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা অংশতঃ অভিনব। এই নূতন মতের সমীচীনতা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া, এই পুস্তক-সমীক্ষণ শেষ করিব। শ্রীযুক্ত এয়ারের মতে, ইন্দ্রিয়োপাত্ত শব্দটি শুধু এক নূতন পরিভাষার নাম মাত্র; জড়পদার্থীয় ভাষার ব্যবহারবিধি হইতে এই নূতন পরিভাষার ব্যবহারবিধি ভিন্ন হইলেও, তাহাদের বর্ণিতব্য বিষয়-বস্তুটী একই: অথচ এই দুই ভাষার পারস্পরিক সম্বন্ধ বাংলা ইংরাজী, আরবী প্রভৃতি ভাষার পারস্পরিক সম্বন্ধের সহিত তুলনীয় নহে। আমার কাছে কিন্তু ইন্দ্রিয়োপাত্ত ও জড়বস্তুর এই সম্বন্ধটী বেশ অদ্ভুত এবং দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হয়। জড়পদার্থীয় ভাষায় যাহা "বস্ত্র" শব্দে প্রকাশিত হয় তাহাই ইন্দ্রিয়োপাত্তীয় ভাষায় 'ক, খ, গ ..প্রভৃতি অনন্তসংখ্যক ইন্দ্রিয়োপাত্তের 'ব' নামধারী একটী বর্গ বা সমূহ" এই নামে ব্যক্ত হয়। ইহা স্পষ্ট যে, ক, খ, গ প্রভৃতি অক্ষরগুলিকে অর্থশূন্য ধ্বনিমাত্র বলা যাইতে পারে না। যদি উহাদের কোন অর্থ থাকে, তবে সেই অর্থটীর সহিত "বস্ত্র' নামক পদার্থটীর সম্বন্ধ কী, উহারা বস্ত্রপদার্থের অংশ, না তৎসম্বন্ধ অন্য একটা কিছু, এ সব প্রশ্ন স্বভাবতঃই উত্থিত হয়। এবং এই সব প্রশ্নের উত্তরেই, কেহ বলেন, ইন্দ্রিয়োপাত্ত মানসিকবস্তু, কেহ বলেন, উহা জড়বস্তুর অংশবিশেষ, আবার কেহ নির্দ্দেশ করেন যে, উহা মন ও জড়বস্তু হইতে পৃথক তৃতীয় এক রকমের পদার্থ। একই দৈর্ঘ্য "১ মিটার' এই শব্দদ্বারা, অথবা "৩৯·৩৭ ইঞ্চি" এই শব্দদ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে: তাহা ছাড়া, মিটারের ভাষা ইঞ্চির ভাষা হইতে তফাৎও বটে; তবু, যদি কেহ বলে যে, ইঞ্চিশব্দের বাচ্যার্থ এবং মিটার শব্দের বাচ্যার্থ এক, তবে ভুল হইবে না কি? তেমনি "ক, খ, গ... প্রভৃতির 'ব' নামধারী সমূহ" এই বর্ণনায় যে তথ্যের নির্দ্দেশ হয়, "বস্ত্র" শব্দে সম্ভবতঃ ঐ তথ্যেরই নির্দ্দেশ হইতে পারে। তবু, ক, খ, গ প্রভৃতি উপাদানগুলি 'বস্ত্র' শব্দের সমার্থক হওয়া অসম্ভব। 'ইঞ্চি' ও 'মিটার' শব্দদ্বারা একই দৈর্ঘ্যের বর্ণনা সম্ভব হইলেও, উহাদের বাচ্যার্থ এক নহে। সুতরাং ক, খ, গ প্রভৃতির সহিত বস্ত্ররূপ জড়বস্তুর সম্বন্ধনির্ণয় একটি ন্যায়সঙ্গত সমস্যা, এবং এই সমস্যার উত্তর ইন্দ্রিয়োপাত্তভাষী দার্শনিকের সুবিধা অসুবিধা অথবা স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে পারে না। যদি বিচারান্তে দেখা যায় যে, এই সম্বন্ধ নিশ্চিতরূপে ঠিক করা অসম্ভব, তাহা হইলে বরং সোজাভাবে স্বীকার করা উচিত যে, ইন্দ্রিয়োপাত্ত শব্দটির কোন বোধগম্য বাচ্যার্থই নাই, উহা অর্থহীন ধ্বনিমাত্র এবং উহাদ্বারা দার্শনিক আলোচনায় কোন কার্য্যই সমাধা হইবে না। আমি যতদূর বুঝি, তাহাতে মনে হয়, ইন্দ্রিয়োপাত্তশব্দদ্বারা ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদী এমন এক পদার্থের নির্দ্দেশ করিতে চাহেন, যাহা ভ্রম এবং প্রমা উভয়প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভবেরই সাক্ষাৎ বিষয়, এবং যাহা উভয় প্রকার অনুভবেরই আলম্বনীভূত জড়বস্তুটীর সহিত কোন এক সম্বন্ধে সম্বন্ধ। সুস্থাবস্থায় কুন্দফুলে যে শ্বেতবর্ণ লক্ষিত হয়, এবং ঠিক ঐ সময়ে পাণ্ডুরোগী সেখানে যে পীতবর্ণ দেখে, সেই শ্বেত এবং পীত উভয় বর্ণই সমানভাবে সত্য এবং একই সম্বন্ধে কুন্দফুলের সহিত সংশ্লিষ্ট, এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই, তাঁহারা ইন্দ্রিয়োপাত্ত শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু উভয় বর্ণকে, সত্যশব্দের একই অর্থে, সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, কোনটীকেই কুন্দফুলের গায়ের রঙ্ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায় না। সুতরাং প্রশ্ন উঠে কুন্দফুলের গায়ে লাগিয়া নাই, অথচ তাহার সহিত সংসৃষ্ট আছে, এমন যে শ্বেত, পীত,

ধূসর প্রভৃতি বর্ণ বা চক্ষুরূপাত্ত, উহাদের স্বরূপ কী? একথা অবশ্য ঠিক যে, একই বস্তুর সম্পর্কে জ্ঞাতার বিভিন্ন অবস্থায় যে সকল বিভিন্ন এবং বিরুদ্ধ ধর্ম্ম প্রতিভাত হয়, তাহাদের প্রত্যেকটীকে সমানভাবে সত্য এবং ঐ বস্তুরই এক প্রকার ধর্ম্ম বলিয়া বর্ণনা করিব, এবম্বিধ সঙ্কল্পব্যতীত এ সব প্রশ্ন নিরর্থক; এবং এই হিসাবে প্রশ্নগুলি ভাষাগত। যদিও এইরূপ বর্ণনা করা না করা আমার স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, তবু এবম্বিধ বর্ণনা যথাযথভাবে বস্তুস্থিতিটীকে প্রকাশ করিতে পারিল কিনা, তাহা কিছুতেই আমার স্বাধীন ইচ্ছার অধীন নয়, তাহা বস্তুস্থিতিরই স্বরূপ আলোচনা-দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। যদি উক্তবিধ বাক্য বস্তুস্থিতির যথার্থ বর্ণনা দিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে যে ইন্দ্রিয়োপাত্তশব্দের সাহায্যে এই বর্ণনা সম্ভবপর হইল, তাহা নিশ্চয়ই বস্তুগত কোন ধর্ম্মবিশেষের দ্যোতক হইতে বাধ্য। কিন্তু বস্তুতে সে রকম ধর্ম্ম থাকা অসম্ভব বলিয়া প্রতিপাদিত হইলে, শুধু কয়েকজন দার্শনিকের সঙ্কল্পের জোরে ইন্দ্রিয়োপাত্তীয় ভাষার সার্থকতা রক্ষিত হইবে না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়োপাত্তবাচ্য পদার্থটীর স্বরূপনির্দ্ধারণ অত্যাবশ্যক, এবং তাহা আবার বস্তুস্বভাবের অনুগামী হওয়া প্রয়োজন। যদি কোন দার্শনিক নিছক তাঁহার সুবিধা ও খেয়ালমত ইন্দ্রিয়োপাত্তের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে যান, তাহা হইলে, উহার সাহায্যে বস্তুস্থিতির বর্ণনা দেওয়া যে অসম্ভব হইবে ইহাত অতি সহজবোধ্য কথা। একই বস্তুসম্পর্কে প্রতিভাত পরস্পরবিরুদ্ধ বিভিন্নধর্ম্মের সকলগুলির সম্বন্ধেই "সত্য" শব্দের প্রয়োগ উচিত কি অনুচিত, ইহা ব্যক্তিগত খেয়াল অনুসারে স্থির করা ন্যায্য হইবে না; অথচ এই ঔচিত্যানৌচিত্যের উপরই ইন্দ্রিয়োপাত্ত শব্দ ব্যবহারের সমীচীনতা নির্ভর করে। এই জন্যই রাসেল, ব্রড্, ষ্টাউট, প্রাইস্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়োপাত্ত-বাদী দার্শনিক ইন্দ্রিয়োপাত্তের স্বরূপ অবধারণের নিমিত্ত এত সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়োপাত্তবাচ্য পদার্থটী কি কেবল কয়েকজন দার্শনিকের কল্পনাবিধৃত মনোনির্ম্মাণ না মৃত্তিকাজলময় সাধারণ জগতেও তাহার স্থান আছে—এই সম্বন্ধে আমি এখানে মতামত ব্যক্ত করিতে চাহি না। আমি শুধু বলিতে চাহি যে, ইন্দ্রিয়োপাত্ত শব্দের ব্যবহারবিধি প্রণয়ন করিতে, দার্শনিকরা যদি বস্তুর যথাতথ্যবর্ণনার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছাই চালান, তাহা হইলে উহা দ্বারা কোন প্রকৃত দার্শনিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

পুস্তকপরিচয়ের স্বল্পপরিসরে ইহার বেশী লেখা ঠিক হইবে না। তাই গ্রন্থকারের অন্যান্য মত সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশে ক্ষান্ত রহিলাম। তবু, এখানে বলা উচিত হইবে যে, এই পুস্তকে কার্য্যকারণবাদ এবং যৌক্তিক দৃষ্টবাদ (লজিক্যাল পজিটিভিজম্)-এর যে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

শ্রীচন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য্য।
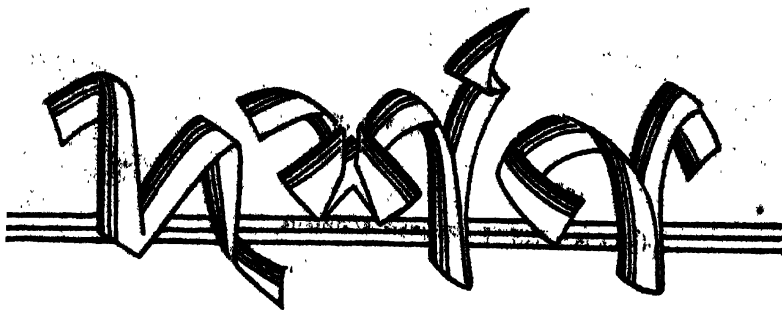
বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] কার্ত্তিক [১৩৪৯ সাল

সম্পাদক—

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ, পি-এচ্.ডি

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচীপত্র

কার্ত্তিক সংখ্যা

ধর্ম ও দর্শন

অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম. এ, পি-এচ্. ডি।

ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধ এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইলে তাহাদের প্রত্যেকটির অর্থ ও স্বরূপ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অতএব আমাদিগকে প্রথমেই বিবেচনা করিতে হইবে যে ধর্ম ও দর্শন বলিতে কি বুঝায় বা কি বুঝা উচিত। যদিও মানব সমাজের ইতিহাসের অতি প্রাচীন যুগ হইতেই উহাদের অভ্যুদয় ও প্রসার দেখা যায়, তথাপি উভয়ের সম্বন্ধেই যথেষ্ট মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই মতভেদ সাধারণ লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। বহু জ্ঞানী ও মণীষী ব্যক্তির মধ্যেও এ বিষয়ে প্রবল মতভেদ দেখা যায়। তাহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে এরূপ মতভেদ থাকার ফলে তাহাদের সম্বন্ধ বিষয়েও যে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে তাহা স্বাভাবিক ও অপরিহার্য। কারণ, দুইটী বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান দ্বারাই তাহাদের সম্বন্ধজ্ঞান নিরূপিত হইয়া থাকে। তাহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা বা মত পোষণ করি তদনুসারেই আমাদিগকে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান ব্যতীত তাহার সম্বন্ধের জ্ঞান হয় না। এজন্য ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে তাহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক।

ধর্ম শব্দটী বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ধর্ম বলিতে সমাজ-হিতকর বিধি (law) বা সুনীতি (morality) বুঝাইতে পারে। প্রথমোক্ত অর্থে বিচারালয়কে ধর্ম্মাধিকরণ এবং দ্বিতীয় অর্থে অহিংসাকে পরম ধর্ম বলা হয়। অথবা ধর্ম বলিতে পুণ্যকর্ম্ম বা শাস্ত্রানুযায়ী আচার বুঝা যাইতে পারে, যেমন যাগযজ্ঞকে ধর্মানুষ্ঠান বলা হয়। ধর্ম অর্থে স্বভাব, গুণ এবং শক্তিও বুঝায়। এই অর্থগুলির উপযোগ যথাক্রমে পশুধর্ম, কালধর্ম, অগ্নির ধর্ম পদনিচয়ে দেখা যায়। আবার ধর্মশব্দদ্বারা

আমরা পরম্পরাগত সামজিক আচার-অনুষ্ঠান বা বিহিত কর্ম্ম বুঝিতে পারি। সাধারণতঃ এতদর্থে আমরা হিন্দুধর্ম, ক্ষত্রধর্ম প্রভৃতি পদ ব্যবহার করিয়া থাকি। আবার ধর্ম শব্দে ইংরেজিতে যাহাকে 'রিলিজন্' বলে তাহাই আমরা এখন বুঝিয়া থাকি। ধর্ম শব্দটি যদি 'রিলিজন্' শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা যায় তবে তদ্বারা আমরা কোন বিশিষ্ট মনোবৃত্তি ও উপাসনা পদ্ধতি বুঝিতে পারি।

এই প্রবন্ধে ধর্ম শব্দটী উপরিস্থ শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইবে। এজন্য উহার একটু বিশদ আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম আমাদের মনের একটী বিশিষ্ট অবস্থা এবং একপ্রকার উপাসনা পদ্ধতি। মনোবিজ্ঞানে মানব-মনের বৃত্তিসমূহকে (functions) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই তিন শ্রেণীর মনোবৃত্তির সাধারণ নাম জ্ঞান (cognition), বেদনা (feeling) এবং কৃতি বা প্রযত্ন (conation or volition)। জ্ঞান বলিতে অর্থপ্রকাশ বা অর্থোপলব্ধি বুঝায়। নৈয়ায়িকেরা বলেন যে জ্ঞান, বুদ্ধি ও উপলব্ধি পর্য্যায়শব্দ। অতএব প্রত্যক্ষ, স্মরণ, মনন, সংকল্প, বিকল্প প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার জ্ঞানরূপ মনোবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। বেদনা বলিতে সুখ দুঃখের অনুভূতি, হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময়, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি মানসিক অবস্থা বুঝায়। কৃতি বা প্রযত্ন অর্থে সজ্ঞানে কৃত যে কোন প্রকার মানসিক বা শারীরিক ক্রিয়া বুঝায়। বাক্, বুদ্ধি ও শরীর দ্বারা সজ্ঞানে কৃত কর্ম্ম মাত্রই প্রযত্নের অন্তর্ভুক্ত। যদিও আমাদের মনোবৃত্তিগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, তথাপি একশ্রেণীর বৃত্তি অপরশ্রেণীদ্বয়ের বৃত্তির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ। বোধহয় আমাদের ব্যবহারিক জীবনে একশ্রেণীর বৃত্তি অপর দুই শ্রেণীর বৃত্তির সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। মানবপ্রকৃতির সাধারণ নিয়ম এই যে কোন বস্তুর জ্ঞান হইলেই তদ্বিষয়ে আমাদের প্রীতি বা অপ্রীতির ভাব উৎপন্ন হয় এবং বস্তুটিকে উপাদেয় বা হেয় বলিয়া জানিলে আমরা তাহার প্রাপ্তি বা পরিহারের জন্য যত্নবান হই। এখন ধর্মকে মানব-মনের কোন বিশিষ্ট অবস্থা বলিলে আমাদের বুঝা উচিত যে এই অবস্থা বা ভাবের মধ্যে জ্ঞান, বেদনা ও প্রযত্ন এই তিন প্রকার মনোবৃত্তিরই স্থান আছে। পরস্পর সম্বদ্ধ এই তিন প্রকার মনোবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিয়াছেন যে ধর্মের সার হইতেছে ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস, ভগবদ্‌ভক্তি ও ঈশ্বরোপাসনা। এই তিনটী মূল উপাদান লইয়া আমাদের ধর্মজীবন গঠিত। মহামতি মার্টিনো তাঁহার 'এ ষ্টাডি অব্ রিলিজন্' নামক উপদেশপূর্ণ গ্রন্থে ধর্মের লক্ষণের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঈশ্বরবিশ্বাস বা আস্তিক্য বুদ্ধিই ধর্মের সারবস্তু। ঈশ্বর বলিতে তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা ও জীবের

কর্মফলদাতা এক অজর, অমর ভগবৎসত্তা বা আত্মাকে বুঝিয়াছেন। এই আস্তিক্য বুদ্ধির সহিত কতকগুলি আবেগময়ী বেদনা বিজড়িত আছে। তন্মধ্যে বিস্ময়, বিহ্বলতা, প্রেম ও প্রণতি এইগুলি মূলভাব এবং এই সকল ভাবের আবেশ স্বতঃই সেবা, পূজা, উপাসনা ইত্যাদি কর্মে স্ফূর্তিলাভ করে। ডক্টর মার্টিনো ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই যে ঈশ্বরকে জীব ও জগতের নিয়ন্তা বলিয়া জানা, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার ভাব পোষণ করা এবং তাঁহার সেবা ও অর্চনা করাই প্রকৃত ধর্ম।

ডক্টর মার্টিনোর প্রদত্ত ধর্মের লক্ষণটি অনবদ্য না হইলেও যে অনেকাংশে গ্রহণীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত লক্ষণটির সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি এই যে উহা সর্বক্ষেত্রেও সব ধর্মের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। অনেক আদিম ও অসভ্য জাতির মধ্যে যে সব ধর্ম প্রচলিত আছে তাহাতে বিশ্বস্রষ্টা বা বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের কোন কথাই নাই। দৃষ্টান্তরূপে আমরা এখানে সর্বজীববাদ (animism), জড়পূজা (fetishism), প্রকৃতি-পূজা (nature-worship), পূর্বপুরুষ পূজা (ancestor-worship), পশু বা উদ্ভিদ্-পূজা (totemism) প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি। পক্ষান্তরে সুসভ্য ও সুশিক্ষিত মানব সমাজেও নিরীশ্বর ধর্মের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম, সাংখ্য, মীমাংসা ও অদ্বৈতবেদান্ত ধর্ম, এবং প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক কোম্‌তের মানবতার ধর্ম (religion of humanity) এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। ইংরেজিতে যাহাকে 'অ্যানিমিজম্' বলে আমরা তাহাকে সর্বজীববাদ বলিয়াছি। অনেক নৃতত্ত্ববিৎ (anthropologist) মনে করেন যে ইহার মধ্যেই আদিম মানবজাতির ধর্মভাব প্রথম বিকাশলাভ করে। মানুষ তাহার জ্ঞানোন্মেষের প্রথমাবস্থায় সকল দ্রব্যকেই সজীব ও সাত্মক বলিয়া ভাবিত এবং এজন্য প্রকৃতির সকল দ্রব্য, এমন কি জড়দ্রব্যকেও কোন না কোন আত্মার শরীর বা আধার বলিয়া পূজা করিত। কিন্তু এধর্মে ঈশ্বরের কোন স্থান ছিল বা আছে বলিয়া মনে হয় না। 'ফেটিসিজম্‌কে' আমরা জড়পূজা বলিয়াছি, কারণ ইহাতে জড়দ্রব্যবিশেষকে কোন আজ্ঞানুবর্তী আত্মা দ্বারা অধিষ্ঠিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় এবং তাহার সাহায্য পাইবার জন্য ঐ জড়দ্রব্যের পূজা করা হয়।* ইহাও এক প্রকার ধর্ম এবং ইহাতেও আমরা যাঁহাকে ঈশ্বর বলি তাঁহার কোন স্থান নাই। সেইরূপ কোন কোন জাতির মধ্যে প্রকৃতির গৌরবময় পদার্থনিচয়কে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিবার প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। প্রাচীন আর্যজাতির মধ্যে অনেক প্রাকৃতিক দ্রব্য, ঘটনা বা শক্তিকে ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, সূর্য প্রভৃতি দেবতারূপে গ্রহণ করিয়া অনেক পূজার্চনার ও যাগযজ্ঞের প্রচলন ছিল। পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মার

তৃপ্তি ও সন্তুষ্টিবিধানের জন্য শ্রাদ্ধাদি কর্মে অনেক পূজাপাঠের প্রচলন আজও আমাদের সমাজে দেখা যায়। 'টোটেমিজম্'এ কোন পশু, প্রাণী বা উদ্ভিদ্‌কে কোন বংশের বা জাতির ভাগ্যবিধাতা বলিয়া পরিগণনা করিয়া ভয় ও ভক্তি সহকারে তাহার পূজা করা হয় এবং তাহার প্রসাদ-লাভের জন্য তাহাকে ভোজন করা হয়। মহামনীষী সিগ্‌মণ্ড ফ্রয়েড তাঁহার 'টোটেম্ ও ট্যাবু' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে ইহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে 'টোটেম্' পূজাই মানবজাতির ইতিহাসে ধর্মের প্রথম বিকাশ। ইহার মধ্যেও আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের কোন সন্ধান পাই না। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের মত দুইটি বিরাট ও প্রচলিত ধর্মেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই। মহামুনি কপিল প্রবর্ত্তিত সাংখ্য দর্শনে জীবাত্মা বা পুরুষ ও প্রকৃতি ব্যতীত ঈশ্বর নামে কোন তৃতীয় তত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। জৈমিনির মীমাংসা দর্শনে যাগযজ্ঞ ও পূজাহোমের বিস্তৃত আলোচনা থাকিলেও বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, বরং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত প্রমাণগুলি খণ্ডন করা হইয়াছে। অবশ্য অনেকস্থলে যাগযজ্ঞ সম্পর্কে বৈদিক দেবতাগুলির উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এগুলি কেবল মন্ত্ররূপী দেবতা, অথবা ব্যক্তিবিশেষ এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। যদি তাঁহারা ব্যক্তিই হন, তাহা হইলেও মীমাংসা দর্শনে জগৎস্রষ্টা এক ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে বলা যায় না, কেবল বহু দেবদেবী স্বীকার করা হইয়াছে এই মাত্র বলা যায়। অদ্বৈতবেদান্তে ঈশ্বর নামে এক তত্ত্ব স্বীকার করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু ইহাতে ঈশ্বর পরমতত্ত্ব নহেন, তিনি ব্রহ্মের মায়াশক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন অপরতত্ত্ব। ব্যব-হারিক দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং পরব্রহ্ম বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা মায়াবী ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হন। কিন্তু যখন পার-মার্থিক দৃষ্টি লাভ করা যায়, তখন জীবজগৎ স্বপ্নবৎ অসৎ প্রতিপন্ন হয় এবং জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরেরও তিরোধান ঘটে। অতএব ঈশ্বর, জীব ও জগৎ সকলই মায়ার অধীন এবং মায়ার অবসানে তাহাদেরও অবসান হয়। কিন্তু ঈশ্বর ও জীবজগৎকে যে কোনভাবে মায়াময় বা অসত্য বলিয়া স্বীকার করিলে আমাদের ধর্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ডক্টর মার্টিনের মতানুসারে ঈশ্বরে ভক্তিবিশ্বাস ও ঈশ্বরোপাসনাই ধর্ম। কিন্তু ঈশ্বর যদি পরমতত্ত্ব না হন এবং জীব ও জগৎ যদি মিথ্যা হয় তবে ঈশ্বরোপাসনা চলে না এবং ধর্ম্মও লোপ পায়। তথাপি সাংখ্য, মীমাংসা ও অদ্বৈত বেদান্তের ভিত্তিতে যে একপ্রকার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং অনেকের ধর্মজীবন যে তদনুসারে গঠিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য জগতে নিরীশ্বর ধর্মের দৃষ্টান্তরূপে আমরা কোম্‌তের মানবতার ধর্মের উল্লেখ করিয়াছি। এই ধর্মানুসারে জীবসেবা বা

মানবজাতির কল্যাণসাধন ধর্মের সার; ঈশ্বরোপাসনা মানব সভ্যতার আদিযুগের ব্যবস্থা হইলেও বর্তমান কালে তাহা একটা কুসংস্কার বলিয়া বর্জন করা উচিত।' এই মানবতার ধর্মকে বর্তমানে শুদ্ধ মানবতা (humanism) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য জগতে ইহা বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। এখন আমরা যাহাকে সমাজতন্ত্র socialism) সমভোগবাদ (communism) বা মার্কস্‌বাদ (Marxism) বলি সেগুলিও এই মানবতার রূপান্তর মাত্র এবং তাহাদের প্রত্যেকটিতেই ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হইয়াছে।

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে ইহা বুঝা যাইবে যে ঈশ্বরে ভক্তিবিশ্বাস ও ঈশ্বরোপাসনা ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ নহে। যদি তাহাই হয় তবে ডক্টর মার্টিনোর প্রদত্ত ধর্মের লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। এই দোষ পরিহারের জন্য অন্যান্য দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ্‌ ধর্মের অন্যরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। এগুলির বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন; তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে ধর্মের আর যে সব লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বোধহয় কোনটিই একেবারে নির্দোষ নহে, তাহাদের মধ্যেও অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে এখানে ধর্মের কয়েকটি প্রসিদ্ধ লক্ষণের উল্লেখ করিতেছি। ম্যাথু আর্নল্ডের মতে ভাবাবেগ সংস্পৃষ্ট সুনীতিই (morality touched with emotion) ধর্ম। কিন্তু এরূপ হইলে পরদুঃখকাতরতা, সমবেদনা, করুণা প্রভৃতি নৈতিক ভাবকে (moral emotions) ধর্মভাব বলিতে কোন আপত্তি থাকে না, পক্ষান্তরে যোগধর্ম, নিষ্কামকর্ম, মীমাংসা ও বেদান্ত ধর্ম প্রভৃতিকে আর ধর্মপদবাচ্য বলা যায় না। ডক্টর এ. সি. ওয়াটসন্‌ বলেন যে মানুষ যখন মানবেতর বহির্জগতের প্রতি সামাজিক আচরণে প্রবৃত্ত হয় তখনই তাহার ধর্মভাব জাগিয়া উঠে (religion is man's social attitude to the extra-human environment), অর্থাৎ ধার্মিকের দৃষ্টিতে বহির্জগৎ জড় নহে, কিন্তু সজীব পুরুষবিশেষ এবং তাহার সহিত আমাদের বন্ধুভাবে ব্যবহার করা উচিত।" মিঃ জে. এচ্‌. লিয়ুবা প্রদত্ত ধর্মলক্ষণ কতকটা পূর্বলক্ষণের অনুরূপ। তাঁহার মতে দেবতাদিগের প্রতি মনুষ্যযোগ্য ব্যবহারই ধর্মের বিশেষ লক্ষণ, অর্থাৎ মানুষ যখন দেবতাদিগকে মনুষ্যজ্ঞানে আপ্যায়িত করে তখন তাহার ধর্মভাব দেখিতে পাওয়া যায় (religion is man's anthropomorphic behaviour towards gods)। ডক্টর ম্যারেট্‌ও মনে করেন যে অতিপ্রাকৃত শক্তিবর্গের সহিত সদ্ব্যবহার করাই ধর্ম (religion is a solutary way of dealing with supernormal powers)। স্যার জে. জি. ফ্রেজার ধর্মের লক্ষণ নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন যে মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চতর ও

মহত্তর শক্তিবর্গে বিশ্বাস এবং তাহাদিগের প্রীতি ও তুষ্টি সাধনের প্রচেষ্টা এই দুইটি মনোবৃত্তির মধ্যে ধর্ম নিহিত আছে (religion involves a belief in powers higher than man and an attempt to propitiate or please them)। পূর্বোক্ত লক্ষণগুলিতে যে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে বৌদ্ধ, জৈন, মানবতা প্রভৃতি ধর্মগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। এসব এবং আরও অন্যান্য অনেক ধর্মে কোন অপ্রাকৃত শক্তি বা দেবতা বা ব্যক্তিবিশেষে বিশ্বাস এবং তদনুরূপ আচরণ দেখা যায় না, অথচ এগুলিকে আমরা এক এক প্রকার ধর্ম বলিয়া স্বীকার করি।

শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার মৈত্র মহাশয় "ধর্ম ও যাদুবিদ্যা' নামক তাঁহার একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বিশ্বের বা পারমার্থিক তত্ত্বের reality) সহিত মিলনের ভাবই (sense of harmony) ধর্মের মূলভাব এবং তাহার দ্বারাই অন্যান্য বিদ্যা বা মনোবৃত্তি হইতে ধর্মের পার্থক্য বুঝিতে হইবে। তাঁহার মতে মিলনের পূর্বে অবশ্য বিচ্ছেদভাব থাকিবে, কিন্তু মিলনের ভাবই ধর্মের প্রধান অঙ্গ এবং উহা সকল ধর্মে ও ধর্মজীবনের সকল অবস্থায় বর্ত্তমান। কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে বিশ্বের বা পারমার্থিক তত্ত্বের সহিত বিয়োগ বা মিলন হইতে হইলে তাহা আমাদের সমপ্রকৃতি বলিয়া জানা আবশ্যক। কোন জড় বা শত্রুভাবাপন্ন শক্তির সহিত আমাদের মিলনের সম্ভাবনা নাই। যে তত্ত্ব সচেতন এবং আমাদের সুখদুঃখ বুঝে ও আমাদের প্রতি সহানুভূতি করিতে পারে, আমরা তাহারই সহিত মিলনসুখ অনুভব করিতে পারি; কোন অচেতন নির্মম শয়তানী শক্তির সহিত উহা সম্ভবপর নহে। যদি তাহাই হয় তবে ধর্মজীবনে মিলনানুভূতির মূলে একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি (spiritual experience থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ ভৌতিক জগতের অন্তরালে যে একটা আতিভৌতিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে তাহার কোনরূপ আভাস এবং তাহার সম্বন্ধে প্রত্যয় থাকা প্রয়োজন। যদি বিশ্বের সহিত মিলনভাব মাত্রই ধর্মভাব হয় তবে কোন কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের প্রাকৃতবাদ (naturalism) বা জড়বাদকে (materialism) ধর্মমত বলিতে হয়, কারণ জড় প্রকৃতি বা জগৎকে পরমতত্ত্ব বলিয়া তাহার নির্মম বিধানকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মানিয়া লওয়া যাইতে পারে, যদিও তাহাতে ঠিক মিলনসুখ হইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এরূপস্থলে ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে প্রভেদ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। আরও এক কথা কোন কোন ধর্ম বা ধার্মিকের মধ্যে মিলনভাব অপেক্ষা বিরহভাবের প্রাচুর্য দেখা যায়। দৃষ্টান্তরূপে আমরা এখানে গোপিনীদের প্রেমধর্ম, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জীবনী ও তাঁহার প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের উল্লেখ করিতে পারি। অবশ্য এখানেও বিরহের পর মিলনের

কথা আছে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে ধর্মজীবনে বিরহ ও মিলন উভয়েরই স্থান আছে। অতএব কেবল মিলনের ভাবকেই ধর্মভাব বলা সঙ্গত হইবে না। পক্ষান্তরে, কোম্‌তের মানবতার ধর্মে বিশ্বের বা পারমার্থিক তত্ত্বের সহিত মিলনের কোন কথাই নাই, কেবল মানবজাতির ঐকান্তিক সেবার কথাই আছে। অবশ্য এরূপ সেবার দ্বারা একটী আত্ম-প্রসাদ বা আত্মতুষ্টি লাভ করা যায়। কিন্তু যদি সমাজ বা জাতির সেবার দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভকে ধর্ম বলা যায়, তবে সমাজতন্ত্র, সমভোগবাদ ও মার্কস্‌বাদকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ইহাদের বিপক্ষ বা সপক্ষের কোন লোক তাহাদের উপর ধর্মনামের গৌরব বা কলঙ্ক লেপন করিতে প্রস্তুত নহেন।

ধর্ম বলিতে আমরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুভূতি ও স্বীকৃতি বুঝিব। সাধারণ বুদ্ধিতে (common sense) তত্ত্ব দুই প্রকার বলিয়া বোধহয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগৎ ভৌতিকতত্ত্ব (physical reality), এবং ভৌতিক জগতের অতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর আত্মা বা চিন্ময় পুরুষ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব (spiritual reality)। ভূত ও ভৌতিকের অতিরিক্ত যে একটী চিৎসত্তা আছে তাহা আমাদের অনুভবসিদ্ধ। আমরা সাক্ষাৎ প্রতীতি দ্বারা জানিতে পারি যে আমাদের আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত একটী চিৎসত্তা। এই আতিভৌতিক চিৎসত্তাকেই আমরা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বলিয়াছি এবং এই তত্ত্বের অনুভূতি ও স্বীকৃতিকেই আমরা ধর্মের প্রকৃত লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিব। এই দুইটীকে ধর্মের মূল এবং তাহার অন্তর্গত ধারণা, বেদনা, আচার, অনুষ্ঠানাদিকে উহার শাখাপ্রশাখা বলা যাইতে পারে। ধর্মের মূলরূপ আধ্যাত্মিক অনুভূতিটি সকল ধর্মেই প্রায় একরূপ। কিন্তু ঐ মূলভাব হইতে জাত এবং তাহার প্রকাশক প্রত্যয় বা বিশ্বাস, বেদনা ও আচার অনুষ্ঠানগুলি বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্নরূপ। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে কলহ ও দ্বন্দ্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বোধ হয় ধর্মের বাহ্যাবরণরূপ বিশ্বাস, মতবাদ ও আচারানুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ। সকল ধর্মের মূলে অতীন্দ্রিয় জগতের বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের একটী অনুভূতি এবং তাহার স্বীকৃতি বিদ্যমান আছে বলিয়া মনে হয়। তথাকথিত অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত সর্বজীববাদে ইহা স্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং জড়-পূজা, প্রকৃতি-পূজা, প্রেত-পূজা প্রভৃতিতেও ইহা অস্পষ্ট নহে। জড়-পূজাতে (fetishism) জড়দ্রব্যবিশেষকে কোন আত্মাদ্বারা অধিষ্ঠিত বলিয়াই পূজা করা হয়। প্রকৃতি-পূজাতেও প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবদেবীকেই পূজা করা হয়। আর্যরা অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতিকে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান দেবতারূপেই পূজা করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের স্তব-স্তুতি করেন। প্রেত-পূজাতেও মৃত ব্যক্তির দেহাতিরিক্ত ও দেহাতিক্রান্ত

আত্মারই তৃপ্তিসাধনের জন্য পূজাপাঠ ও দানধ্যানাদির ব্যবস্থা আছে। টোটেম্ পূজারীর স্থির বিশ্বাস যে টোটেম্ দ্রব্যটির মধ্যে পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মা বিরাজমান আছেন এবং তাঁহার বংশধরগণকে রক্ষা করিতেছেন। ডক্টর এ. এ. বোম্যান্ তাঁহার মহামূল্য গ্রন্থ "ষ্টাডিজ্ ইন্ দি ফিলজফি অব্ রিলিজন্" এর একস্থলে বলিয়াছেন যে টোটেম্ দ্রব্যগুলিতে অধিষ্ঠিত একাধিক আত্মাতে বিশ্বাস না থাকিলে টোটেম্ পূজার কোন অর্থই হয় না। আমাদের মনে হয় তাঁহার এই উক্তিটি সম্পূর্ণরূপে সত্য। অতএব নিম্নস্তরের ধর্মগুলিতে যে আধ্যাত্মিক সত্তা বিষয়ে একটা অস্পষ্ট বা স্পষ্ট অনুভূতি আছে এবং এই সত্তাকে নিঃসংশয়ে স্বীকার করিয়া মানুষ যে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা স্বীকার্য। কারণ কোন বিশ্বাসের মূলে তাহার পরিপোষক কোন একটা অনুভূতি বা সাক্ষাৎ জ্ঞান অবশ্য থাকিবে এবং যাহা অনুভব করা যায় তাহা মনেপ্রাণে স্বীকার না করিলে আমরা তাহার অনুরূপ কর্মে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হইতে পারি না।

সাংখ্য ও যোগ এবং মীমাংসা ও বেদান্তধর্ম যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বা আত্মার অনুভূতি ও স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা ভারতীয় দর্শনের সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। ইহাদের প্রত্যেকটিতেই ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলেও একথা সত্য যে আত্মা, পরকাল প্রভৃতিতে দৃঢ় বিশ্বাসের উপরই এই ধর্মগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে ঈশ্বর বা জগৎস্রষ্টা পরমপুরুষ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট স্বীকারোক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই ধর্ম দুইটির যে আত্মা, পরকাল, কর্ম ও কর্মফল প্রভৃতি আধ্যাত্মিক তত্ত্বে আস্থা আছে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। অবশ্য আত্মা বলিতে বৌদ্ধরা যাহা বুঝেন, জৈন বা অন্য ধর্মাবলম্বিগণ ঠিক তাহা বুঝেন না। তাঁহাদের মতে আত্মা নিত্য ও নির্বিকার চেতন দ্রব্য বা পুরুষ নহে, উহা একটি নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞানধারা মাত্র। সে যাহা হউক, বৌদ্ধরা যে দেহ ও ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত অর্থাৎ অভৌতিক আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাহা বোধহয় সকলেই স্বীকার করিবেন। যদি তাহাই হয় তবে নিরীশ্বর বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মূলে যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুভূতি ও স্বীকৃতি বিদ্যমান আছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম সম্বন্ধে যাহা বলা হইল কোম্তের মানবতার ধর্ম সম্বন্ধে তাহা প্রযোজ্য কিনা সন্দেহ। কারণ মানবতার ধর্মের মধ্যে ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক বা অন্য কোন অধ্যাত্ম তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যদি তাহাই হয় তবে বলিতে হইবে যে আমরা ধর্মের যে লক্ষণ গ্রহণ করিয়াছি তাহা মানবতার ধর্মের পক্ষে প্রযোজ্য নহে এবং তাহাতে অব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে ধর্মের আর যে সব লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে সেগুলির সম্বন্ধেও

বোধহয় এই একই আপত্তি হইতে পারে, কারণ মানবতার ধর্মে মনুষ্য-সেবা ব্যতীত ঈশ্বর, দেবতা, প্রেতাত্মা, পশু বা উদ্ভিদ-পূজার কোন স্থান নাই। কিন্তু কোন না কোন আকারে কোন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করা বা তাহার অর্চনা করা যে ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ তাহা ধর্মের অন্যান্য লক্ষণেও স্বীকৃত হইয়াছে। অবশ্য ম্যাথু আর্নল্ড প্রদত্ত ধর্মের লক্ষণটির সম্বন্ধে ঠিক একথা বলা যায় না, কারণ ইহাতে কোন দেবতার পূজার্চনার কথা নাই। কিন্তু এখানে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে আর্নল্ড ধর্ম বলিতে যাহা বুঝেন তাহা মানবতা ধর্মের রূপান্তর মাত্র। এরূপ স্থলে মানবতার ধর্মকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিলে ধর্মের কোন লক্ষণ গ্রহণ করা যায় না। ইহা দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে মানবতা যদি শুদ্ধ মনুষ্যজাতির সেবায় পর্যবসিত হয়, তবে তাহা ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে না এবং তাহাকে নিঃসংশয়ে ধর্মপদবাচ্য বলা যায় না। ইংরেজ দার্শনিক অধ্যাপক প্রিঙ্গেল প্যাটিসন্ তাঁহার "আইডিয়া অব্ গড্" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কোম্‌তের মানবতার ধর্মকে ধর্মের অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে কোম্‌তের মানবতার ধর্ম এবং স্পেন্সারের অজ্ঞেয়োপাসনা (worship of the unknowable) দুইটী অর্দ্ধ সত্য এবং পরস্পরের পরিপূরক (complementary half-truths)। অধ্যাপক প্যাটিসন্ যাহা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও ইহা সত্য সে মানবতামাত্রকে ধর্মের সারাংশ বা পরিপূর্ণ রূপ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মানবতা ধর্মের মূলে যে সব মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং যেগুলি অধুনা 'মানবতা', 'সমাজতন্ত্র', 'সাম্যবাদ বা সমভোগবাদ বা মার্কস্‌বাদ' নামে পরিচিত, সেগুলিকে কেহই ধর্ম আখ্যা দিতে প্রস্তুত নহেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে শুদ্ধ বা অবিমিশ্র মানবতাকে ধর্ম বা ধর্মের সারাংশ বলা যায় না। অবশ্য আমরা একথা অপকটে স্বীকার করিতেছি যে মানবজাতির, তথা জীবমাত্রের সেবা ধর্মজীবনের একটী প্রধান অঙ্গ। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি প্রাচ্য ধর্মে ইহা অল্পবিস্তর স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু ধর্মে মানুষকে মানুষ বলিয়া বা অন্য জীবকে জীবমাত্র বলিয়া সেবা করা হয় না। তাহারা কোন আত্মার আশ্রয়স্থল বা জীবভূত আত্মা বলিয়াই তাহাদের সেবা সম্ভবপর ও সমীচীন হয়। যদি তাহাই হয় তবে ইহা বলিতে হয় যে কোম্‌তের মানবতার ধর্ম প্রকৃত ধর্মপদবাচ্য নহে, অথবা উহার মধ্যেও আত্মা বা অধ্যাত্মতত্ত্বের অনুভূতি ও স্বীকৃতি আছে। অতএব ধর্মের প্রধান লক্ষণগুলির বিচার করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কোনরূপ অনুভূতি এবং কর্মজীবনে তাহার স্বীকৃতি ধর্মের প্রকৃত লক্ষণ।

এখন আমরা ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি। অবশ্য এজন্য আমাদিগকে দর্শনের স্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিতে হইবে।[১] দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝা যায় যে দর্শন শব্দটি সর্বত্র একই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। বিভিন্ন দার্শনিক দর্শনের বিভিন্ন লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। এই সব লক্ষণের বিশদ আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দর্শন একটি আধ্যাত্মিক শাস্ত্র এবং ইহা ধর্ম, বিজ্ঞান, নীতি ও শিল্পশাস্ত্র হইতে পৃথক। কেহ কেহ দর্শনের লক্ষণ নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন যে ইহা পরা বিজ্ঞান (super science) বা বিজ্ঞানসমন্বয় (synthesis of the sciences মাত্র। এখানে বিজ্ঞান অর্থে ইংরেজিতে যাহাকে 'সায়েন্স' বলে তাহাই বুঝিতে হইবে। যদি এই অর্থে দর্শনকে পরা-বিজ্ঞান বা বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয় বলা যায়, তবে দর্শনের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা যায় না। কারণ এক একটি সায়েন্স বা বিজ্ঞান জড়জগতের এক একটি বিভাগের জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করে এবং এজন্য ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও যান্ত্রিক পরীক্ষার (observation and experiment) সাহায্য লয়। এইরূপে বিজ্ঞান জড়জগৎ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে ও করিতেছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয়দ্বারা আমরা যে জ্ঞানলাভ করিব তাহাও জড়জগতের জ্ঞানই হইবে, অবশ্য কোনও একটি বিজ্ঞান হইতে উহা যে উচ্চতর ও ব্যাপকতর জ্ঞান হইবে তাহা বলা বাহুল্য। এখন দর্শনকে যদি বিজ্ঞানের সমষ্টি বলা যায় তবে তাহার দ্বারা আমরা যে জ্ঞানলাভ করিব তাহা স্বরূপতঃ বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইবে না, তাহাও জড়জগৎ সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞানমাত্র হইবে। যদি তাহাই হয় তবে দর্শন যে বিষয়ে জ্ঞানানুসন্ধান করিবে তৎসম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান বিজ্ঞানেই মিলিবে এবং পৃথক দর্শনের কোন উপযোগিতা থাকিবে না। এজন্য দর্শনকে একটা ব্যাপক বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান সমন্বয় বলিলে ভুল করা হইবে। অবশ্য এক হিসাবে দর্শনকে পরাবিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের সমন্বয় শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। কিন্তু বাহুল্য ভয়ে এখানে তাহার আলোচনা করা গেল না।

দর্শন বলিতে আমরা সাধারণতঃ তর্ক ও যুক্তিদ্বারা সমর্থিত জ্ঞানকেই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু ইহাও দর্শনের প্রকৃত লক্ষণ বলিয়া মনে হয় না। কারণ দণ্ড, নীতি, বার্তা প্রভৃতি শাস্ত্রেও যুক্তিদ্বারা সমর্থিত জ্ঞান লাভ করা যায়। বিভিন্ন জড়বিজ্ঞানেও আমরা যুক্তিতর্কের সাহায্যেই জ্ঞান

১। 'দর্শনের স্বরূপ' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দর্শন পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (কার্তিক ১৩৪৮) দ্রষ্টব্য।

লাভ করিয়া থাকি। ন্যায়শাস্ত্রে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারাই সকল বিষয় প্রতিপাদিত হয়। অতএব যুক্তিদ্বারা সমর্থিত জ্ঞানমাত্রকেই দর্শনপদবাচ্য বলিলে এগুলিকেও দর্শন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা কেহ করেন নাই, এবং তাহা করিলে দর্শনের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায়। অতএব দর্শনের লক্ষণে যৌক্তিক বিচারের সঙ্গে আরও কিছু বিশেষ ধর্মের উল্লেখ করা উচিত। দর্শনের বিশেষ ধর্ম এই যে উহা অধ্যাত্ম শাস্ত্র বা তত্ত্ব-বিজ্ঞান। ইহাতে যুক্তিতর্কের সাহায্যে আধ্যাত্মিক জগৎ বা পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের প্রয়াস থাকাতে ইহা অন্যান্য শাস্ত্র বা বিদ্যা হইতে ভিন্ন হইয়াছে। অবশ্য অন্যান্য শাস্ত্রের বিষয় বস্তু লইয়া দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণ চলিতে পারে বা চলিয়া থাকে। দর্শনেও বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু জড়জগৎ সম্বন্ধে আলোচনার আবশ্যকতা ও উপযোগিতা আছে। কিন্তু এরূপ আলোচনার মূলে তত্ত্বজ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং তত্ত্বজ্ঞানের আলোকেই উহা চলিয়া থাকে বা চলা উচিত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তত্ত্বজ্ঞানই দর্শনের বিশেষ লক্ষণ। ইহাকে পরাবিদ্যা বা পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচারসাপেক্ষ জ্ঞান বলিলে ইহার বৈশিষ্ট্য বুঝা যায়। সকল বিজ্ঞান বা শাস্ত্রই যুক্তিতর্ক দ্বারা নিজ নিজ বিষয়গুলি প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের কোনটিতেই পারমার্থিক তত্ত্ববিষয়ে জ্ঞান-লাভের চেষ্টা দেখা যায় না। কেবল দর্শনশাস্ত্রই এরূপ চেষ্টা করে বলিয়া উহাকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করা হয়। অতএব দর্শনের স্বরূপ বর্ণনায় বলিতে হইবে যে উহা আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক তত্ত্ববিষয়ে বিচারসাপেক্ষ জ্ঞান।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুভূতি ও স্বীকৃতি ধর্মের প্রকৃত লক্ষণ এবং আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক তত্ত্বের বিচারসাপেক্ষ জ্ঞান দর্শনের স্বরূপ। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ দার্শনিক হেগেলের মতে উভয়ের মধ্যে যে কেবল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহাই নহে, উহারা একই বস্তু। উহাদের উদ্দেশ্য ও বিষয়ীভূত তত্ত্ব অভিন্ন। কারণ পরমতত্ত্ব মহেশ্বরই ধর্ম ও দর্শনের চরম লক্ষ্য। দর্শন বিজ্ঞানের ন্যায় জড়জগতের জ্ঞানান্বেষণে ব্যাপৃত নহে। যিনি জগদ্ব্যাপ্ত হইয়াও জগৎকে অতিক্রম করিয়া আছেন সেই পুরুষোত্তমই দর্শনের বিষয়বস্তু। আবার ধর্মেও তিনিই আমাদের পরাগতি ও পরামুক্তি, এবং তাঁহার পরম পদ লাভ করাই আমাদের ধর্মজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব আমাদের ধর্মজীবন ও দার্শনিক চিন্তা একই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া চলিতেছে এবং তাহারই সাধনায় প্রবৃত্ত আছে। এদিক্ দিয়া উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু উহাদের উদ্দেশ্য এক হইলেও, ঐ উদ্দেশ্যসিদ্ধির পন্থা এক নহে। ধর্মজীবনে

ঈশ্বর আমাদের অনুভূতির (feeling) বিষয়, দর্শনে তিনি আমাদের চিন্তার বা প্রজ্ঞার প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রথমটিতে আমরা নানারূপ কল্পনা ও প্রতীকের সাহায্যে ঈশ্বরের উপাসনা করি, অপরটিতে শুদ্ধ ভাবনা ও প্রত্যয়দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করি। অতএব ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা উদ্দেশ্য বা বিষয়গত নহে, উহা কেবল একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের জন্যই হইয়াছে। অতএব দার্শনিকপ্রবর হেগেল্ ধর্ম ও দর্শনকে একরূপ অভিন্ন বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন।

কোন কোন দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিৎ হেগেলের উপরোক্ত মত পোষণ করেন না। তাঁহাদের মতে ধর্ম ও দর্শন যে কেবল ভিন্নবস্তু তাহাই নহে, উহারা পরস্পরের বিরোধী দুইটি ভাব বা মনোবৃত্তি। ধর্মে দার্শনিক যুক্তিতর্কের কোন স্থান নাই, বরং যুক্তিতর্কদ্বারা আমাদের ধর্মভাব বিপন্ন হইয়া পড়ে। ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্মের সার কথা ; ন্যায়শাস্ত্র বা দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। যাঁহাদের মধ্যে দার্শনিক চিন্তা অতি প্রবল তাঁহাদিগকে প্রায়ই নাস্তিকভাবাপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ এই যে যৌক্তিক বিচারদ্বারা তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারেন না। মহর্ষি কপিলের সাংখ্য দর্শন, বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাকদর্শন এবং পাশ্চাত্য জগতে জড়বাদ, দৃষ্টবাদ প্রভৃতি দার্শনিক মতবাদ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। মহামুনি কপিল বলিয়াছেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, কারণ তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। এই একই কারণে অধিকাংশ দার্শনিক ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াছেন। বোধ হয় এইজন্যই ধার্মিক ব্যক্তিরা দর্শনকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন এবং কোন কোন বিজ্ঞ দার্শনিকও ধর্মকে হেয়জ্ঞান করেন। এই সব দেখিয়া মনে হয় যে ধর্ম ও দর্শন এক বস্তু নহে এবং উহাদের মধ্যে কোন মিলও নাই, বরং উহারা সর্বতোভাবে ভিন্ন ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন দুইটি মনোভাব মাত্র।

ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধ বিষয়ে এই মতদ্বৈধ যে তাহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ হইতে জন্মিয়াছে তাহার আভাস আমরা পূর্বেই দিয়াছি। কিন্তু এখানে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমরা ধর্ম ও দর্শনের যে লক্ষণ দিয়াছি তাহাদের মূলে উহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব। আমাদের প্রদত্ত লক্ষণ গ্রহণ করিলে ধর্ম ও দর্শনকে ঠিক এক বস্তু বলা যায় না, আবার তাহাদিগকে বিরুদ্ধ বস্তুও বলা যায় না। দর্শনে পারমার্থিক তত্ত্ব বিষয়ে যে যৌক্তিক বিচার করা হয়, তাহার মূলে ঐ তত্ত্বের কোন অনুভূতি বা সাক্ষাৎজ্ঞান থাকা আবশ্যক। দার্শনিক যুক্তিদ্বারা তত্ত্বানুভূতি হয় না। দার্শনিকপ্রবর হেগেল যে দর্শনকে ধর্মের সহিত

অভিন্ন বলিয়াছেন তাহা বোধহয় ঠিক নয়। কারণ ধর্মের সার হইতেছে আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক তত্ত্বের অনুভূতি ও স্বীকৃতি, কিন্তু দর্শনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে তত্ত্বার্থবিচার। কিন্তু তত্ত্বানুভূতি ও তত্ত্বার্থবিচার এককথা নহে। কোন তত্ত্বের কোনরূপ সাক্ষাৎজ্ঞান না থাকিলে তাহার সম্বন্ধে বিচার করা চলে না এবং শুধু যৌক্তিক বিচারদ্বারা কোন তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় না। যেমন, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ব্যতীত আলোকের স্বরূপ কি তাহা বুঝা যায় না; কোন জন্মান্ধ ব্যক্তি অনুমানাদি প্রমাণের সাহায্যে আলোকের জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। যাঁহার আলোক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে তিনিই সে বিষয়ের বিচারবিশ্লেষণ করিতে পারেন। সেইরূপ আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক তত্ত্বের অনুভূতি থাকিলেই সে বিষয়ে যুক্তিতর্ক চলিতে পারে। যদি তাহাই হয় তবে বলিতে হইবে যে দর্শনে যে তত্ত্বার্থবিচার করা হয়, তাহার মূলে কোনরূপ তত্ত্বানুভূতি আছে, এবং ঐ তত্ত্বানুভূতি ধর্মের বৈশিষ্ট্য বলিয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে দর্শনের মূলে ধর্মজীবনের অনুভূতি বিদ্যমান। দার্শনিক বিচার দ্বারা ধর্মজীবনের আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলিকে নিঃসংশয়ে প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হয়। আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কোনরূপ অনুভূতি আছে বলিয়াই বোধহয় আমরা বিচার বুদ্ধিদ্বারা তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি এবং তাহা হইতেই দর্শনের উৎপত্তি হয়। অবশ্য হেগেল্‌প্রমুখ দার্শনিকের মতে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার (intellect or reason) সাহায্যে আমরা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারি এবং দার্শনিক এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে সচেষ্ট হন, আর ধার্মিক ব্যক্তি কেবল ভাবনাও কল্পনাদ্বারা পরমার্থ লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু হেগেল্ একথা ভুলিয়াছেন যে ধার্মিক ব্যক্তিও দার্শনিকের মত কল্পনাদির সাহায্য না লইয়া ন্যায়সঙ্গত যুক্তিদ্বারা স্বীয় ধর্মানুভূতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন এবং সে স্থলে তাঁহার ধর্মভাব ও-দার্শনিক চিন্তার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি দার্শনিক হইলেও তাঁহার ধর্মভাব ও দার্শনিক চিন্তার পার্থক্য লোপ করিতে পারেন না। তাঁহারও দার্শনিক চিন্তার মূলে ধর্মজীবনের আধ্যাত্মিক অনুভূতি বিদ্যমান এবং সেই অনুভূতিকেই আশ্রয় করিয়া ও তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার দার্শনিক চিন্তা চলে বা চলিতে পারে। অবশ্য কোন বিশেষ তত্ত্বানুভূতি ব্যতীত কোনরূপ দার্শনিক চিন্তা চলিতে পারে না এমন কথা বলিতেছি না। আমাদের বক্তব্য এই যে কোনরূপ তত্ত্বানুভূতি হইতেই দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হয়, এবং তাহার প্রতিষ্ঠার জন্যই দার্শনিক যুক্তিতর্কের অবতারণা হইয়াছে, এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির গভীরতা ও প্রকর্ষের সঙ্গে দার্শনিক চিন্তার গভীরতা ও উৎকর্ষ হয়। দর্শনে আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলিকে যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রতিপাদন করিবার

চেষ্টা করা হয় বলিয়া কোন কোন দর্শনাচার্য উহাকে অধ্যাত্মতত্ত্বের মনন-শাস্ত্র বলিয়াছেন।

অতএব আমরা ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারি। আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উহার পরিপুষ্টি এবং ব্যবহারিক জীবনে তাহার স্বীকৃতি ধর্মের সার কথা বা বিশেষ লক্ষণ। ধর্মজীবনে কখন কখন ভাবের প্রাবল্য এবং কল্পনা ও প্রতিমাদি প্রতীকের বহুল ব্যবহার দেখা যায়; কিন্তু এগুলি ধর্মের সারবস্তু নহে বা অপরিহার্য অঙ্গও নহে, এসব উহার বাহ্যরূপ বা আবরণ মাত্র। অবশ্য এসবের যে কোন উপযোগিতা নাই তাহা বলিতে পারি না। বরং এগুলির দ্বারাই যে আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধন হয় এবং তাহাদের অভাবে যে ধর্ম-জীবন নীরস ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে তাহা আমরা স্বীকার করি। এইজন্যই পূজা, উপাসনা, গীতবাদ্য, ললিতকলা প্রভৃতি ধর্মের অঙ্গ বা অংশরূপে পরিগণিত হইয়াছে। দর্শন বা দার্শনিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে উহাতে আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলিকে বিচারবুদ্ধিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানবজীবনের সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করা হয়। এই চেষ্টা প্রধানতঃ দুই প্রকারের হইতে পারে। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও তাহার বিষয়ীভূত পরমার্থিক তত্ত্বকে যুক্তি-তর্কদ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদের সহিত জীবজগতের ও মানবজীবনের অন্যান্য বৃত্তিগুলির একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করা যাইতে পারে অর্থাৎ পারমার্থিক তত্ত্বের সহিত জীব ও জগতের এবং দার্শনিক চিন্তার সহিত ধর্ম, বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির কোন বিরোধ নাই বরং তাহাদের মধ্যে পূর্ণ মিলন বা সামঞ্জস্যের ভাব আছে ইহা প্রদর্শন করিতে পারা যায়। রামানুজাচার্য প্রভৃতি ভারতীয় এবং হেগেল্ প্রমুখ পাশ্চত্য দার্শনিক তাঁহাদের দর্শনে এরূপ প্রচেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের দর্শনে যে অদ্বৈতবাদ দেখা যায় তাহাতে পরমতত্ত্বকে সগুণ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া জীবও জগৎকে তাঁহার শরীর বা অংশরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং বিশ্বসংসারকে তাঁহার লীলাভূমি বা ক্রমবিকাশের গতিরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এইরূপে এক ঈশ্বরের সহিত বহু জীব বা জড়দ্রব্যের যে কোন বিরোধ ঘটে না, ঈশ্বরে পরাভক্তির সহিত জীব ও জগতের কল্যাণসাধনের প্রচেষ্টার যে কোন অসঙ্গতি নাই এবং ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, বৈজ্ঞানিক সত্য প্রভৃতি যে পরমজ্ঞানেরই নিম্নস্তর তাহা দেখান যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যুক্তিতর্কের সাহায্যে পারমার্থিক তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সে সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিতে নিরস্ত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তাকে চিন্মাত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহাতে কোন ধর্মের বা শক্তির আরোপ না করা যাইতে পারে অথবা তাহার স্বরূপ ও ধর্ম আমাদের বুদ্ধিগম্য

নহে এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ স্থলেও আমাদের নৈতিক বা ধর্মজীবনের অন্যান্য অনুভূতি হইতে পারমার্থিক তত্ত্ববিষয়ে যে জ্ঞানলাভ করা যায় তাহার অপলাপ করিবার প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে ঐ জ্ঞানালোকের সাহায্যে পারমার্থিক তত্ত্বের স্বরূপ ও ধর্ম সম্বন্ধে যাহা জানা যাইবে তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে যদিও দার্শনিক বিচারে তাহা প্রমাণ করা যাইবে না। দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে যে ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্বকে ঈশ্বর অর্থাৎ জগৎস্রষ্টা ও জীবের কর্ম্মফলদাতা পুরুষবিশেষ বলিয়া যে আমরা বিশ্বাস করি তাহা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে নীতি ও ধর্মকর্মের জন্য অত্যাবশ্যক, কিন্তু দার্শনিক যুক্তিদ্বারা আমরা তাহা প্রমাণ করিতে পারি না। জার্মাণ দার্শনিক মহামতি কাণ্ট, ইংরাজ দার্শনিক ব্রাড্‌লে এবং প্রকারান্তরে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য তাঁহাদের দর্শনের পারমার্থিক তত্ত্বের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য দর্শনে পারমার্থিক তত্ত্বের অন্যরূপ ব্যাখ্যা এবং জীবনের সমস্যাগুলির অন্যরূপ সমাধান করা হইয়াছে এবং আরও অন্যপ্রকার হইতে পারে। এগুলির আলোচনা এখানে অনাবশ্যক বোধে করা হইল না। উপসংহারে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দর্শন আমাদের ধর্মজীবনের মূল আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতেই উদ্ভূত হইয়া তাহার যৌক্তিক বিচার বা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করে, পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক অনুভূতির উৎকর্ষ এবং দৈনন্দিন জীবনে তাহার যথাযথ অনুসরণই ধর্মের সারাংশ ও বিশেষ লক্ষণ; উহারা একেবারে অভিন্নও নহে এবং একেবারে ভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধীও নহে।

গীতায় ভগবান

শ্রীঅনিলবরণ রায়, এম. এ।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

—গীতা ৫।২৯

[মানবঃ] মাং যজ্ঞতপসাম্ ভোক্তারং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং জ্ঞাত্বা শান্তিম্ ঋচ্ছতি।

মানুষ যখন আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোকের মহেশ্বর এবং সকল জীবের সুহৃদ বলিয়া জানে তখনই সে শান্তি লাভ করে।

পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি শ্লোকে বলা হইয়াছে, প্রাণায়াম প্রত্যাহার প্রভৃতি দ্বারা রাজযোগের অভ্যাস করিয়া মানুষ চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে। সাধারণতঃ মোক্ষ বলিতে বুঝায় সমস্ত সাংসারিক জীবন ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল, নিরুপাধি ব্রহ্মে লীন হওয়া। কিন্তু তাহার ঠিক পরেই এই শ্লোকে ভগবানকে যে-ভাবে জানিবার কথা বলা হইল—তাহা ত ভগবানের নির্গুণ স্বরূপ নহে। তাহা হইলে এই শ্লোকটি পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি শ্লোকের ঠিক পরে কেন আসিল এবং ইহাদের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি? বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্নভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। শ্রীধর বলিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয়াদি সংযম করিলেই মুক্তি হয় না, জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি হয়—সেই জ্ঞানের কথাই এই শেষোক্ত শ্লোকে বলা হইতেছে। শঙ্করের অনুসরণ করিয়া মধুসূদন সরস্বতীও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যিনি এই প্রকার যোগযুক্ত তিনি কোন্ তত্ত্ব জানিয়া মুক্ত হন তাহাই বলিতেছেন, ভোক্তারম্ ইত্যাদি।" কিন্তু পূর্ব্ব দুইটি শ্লোকে রাজযোগের দ্বারা মুক্তি বা কৈবল্য লাভের কথা আছে—যাঁহারা ঐ সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি জয় করিয়াছেন এবং ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ নির্ম্মূল করিয়াছেন—তাঁহারা সদাই মুক্ত, তাঁহাদিগকে আর স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞানযোগের সাধনা করিতে হয় না। রামানুজ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে এই শেষ শ্লোকে গীতা কর্ম্ম যোগেরই প্রশংসা করিয়াছে—কর্ম্মযোগের দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিলেই সহজে মুক্তিলাভ করা যায়। মধ্বাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পূর্ব্ব দুইটি শ্লোকে ধ্যানের প্রণালী বর্ণনা করা হইয়াছে—কিন্তু কি ধ্যান করিতে হইবে তাহাই এই শেষ শ্লোকে বলা হইতেছে।

কিন্তু গীতা এই শেষ শ্লোকে ভগবানের যে বর্ণনা দিয়াছে তাহা হইতেছে পুরুষোত্তমের বর্ণনা—পুরুষোত্তমকে ধ্যানের বস্তু করিতে হইবে—এমন কোন উপদেশ পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রে নাই। আর শঙ্কর যে বলিয়াছেন, কি তত্ত্ব জানিয়া মুক্তিলাভ করা যায় তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারই মত হইতেছে নিগুণ নিষ্ক্রিয় নিরুপাধি ব্রহ্মের জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। অথচ এই শ্লোকে গীতা ভগবানের যে বর্ণনা দিয়াছে তাহা শঙ্করের বিজ্ঞেয়বস্তু নির্গুণ ব্রহ্ম নহে।

বস্তুতঃ পঞ্চম অধ্যায়ের এই শেষ শ্লোকটির সহিত কেবল যে উহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি শ্লোকেরই সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা নহে—সমগ্র অধ্যায়টিতে যাহা বলা হইয়াছে, এই শেষ শ্লোকে তাহারই সার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং পুরুষোত্তম তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করা হইয়াছে—এখানে শুধু জ্ঞানযোগ, শুধু কর্ম্মযোগ বা শুধু রাজযোগানুযায়ী ধ্যানের প্রশংসা করা হয় নাই। গীতা ভগবান সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভের কথা বলিয়াছে তাহা শুধু নিরুপাধিক আত্মা বা নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান নহে। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনটিকেই গীতা পূর্ণভাবে বিকাশ করিয়া তাহাদের মধ্যে অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়াছে। প্রথম ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়টিই বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে—পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে এই সমন্বয়টি সম্পূর্ণ হইয়াছে—এখানে যাহা আছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে সেইটিই আরও বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে।

গীতা ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন দিক দিয়া ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞানকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ভগবানের যে জগৎরূপে আত্মপ্রকাশ তাহাতে আছে বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন ধারা—ভগবান সম্বন্ধে এই বিভিন্ন রকম অনুভূতি লাভ করিয়া সে-সবের সমন্বয়ের দ্বারাই আমরা আমাদের জীবন ও কর্ম্মের পূর্ণতা সাধন করিতে পারি। ভগবানকে তাঁহার সকল তত্ত্বে জানিতে হইবে, সকল ভাবে তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে হইবে তবেই আমাদের মধ্যে ভাগবত জীবনের পূর্ণতা গড়িয়া উঠিবে, আমাদের সত্তার পূর্ণ ও সর্ব্বতোমুখী বিকাশ সাধিত হইবে। ভগবান যে শুদ্ধ আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন ও সর্ব্বভূত সেই আত্মার মধ্যে রহিয়াছে, সর্ব্বভূতের মধ্যে সেই আত্মা রহিয়াছে,

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি (৬।২৯)

এই উপলব্ধিই সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। ইহা শুধু একটি দার্শনিক মতবাদ বা মনের ধারণা হইলে চলিবে না—সাক্ষাৎভাবে ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে এবং রাজযোগের প্রক্রিয়া এই উপলব্ধিলাভের একটি বিশিষ্ট সাধনা। আত্মা অজাত, নিত্য, শাশ্বত—তাহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই, সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তাহা কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, যেমন সকলের মধ্যে তেমনই আমারও

মধ্যে এই একই আত্মা রহিয়াছে, আমার এই দেহের পতন হইলে আত্মার বিনাশ হইবে না, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। অর্জ্জুনের শোককে উপলক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতা এই আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন—কারণ এই আত্মজ্ঞানই হইতেছে আধ্যাত্মিকতা বা অধ্যাত্ম জীবনের আরম্ভ। পঞ্চম অধ্যায়ে এই আত্মতত্ত্ব আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে। যে-যোগী সর্ব্বভূতের এক আত্মাকে নিজের আত্মা বলিয়া জানিয়াছেন—তিনি কর্ম্ম করিয়াও বদ্ধ হন না। (৫।৭) যিনি আত্মতত্ত্ববিৎ তিনি জানেন আত্মা নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিই সকল কর্ম্ম করিতেছে, ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত। এই ভাবে সকল কর্ম্ম মনের দ্বারা সংন্যাস করায়, তিনি কর্ম্মের দ্বারা আর বদ্ধ হন না। দেহী ভগবানই আত্মারূপে এই নবদ্বারযুক্ত দেহে বিরাজ করিতেছেন, তিনি কিছু করেনও না, করানও না, কাহারও পুণ্যও গ্রহণ করেন না, পাপও গ্রহণ করেন না—সাধনার দ্বারা যে ব্যক্তি এই আত্মাকে অবগত হন, আত্মার সহিত যুক্ত হন, তিনি সকল বস্তু, সকল জীব, সকল ঘটনায় সমদর্শী হন—এই আত্মাই ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মে ক্ষুদ্র অহংভাবের জয় করিয়া তিনি নির্ব্বাণ ও পরম শান্তি লাভ করেন। এই উপলব্ধি লাভেরই একটি শক্তিশালী সাধনারূপে গীতা পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি শ্লোকে রাজযোগের বর্ণনা করিয়াছে এবং আবার ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহাই আরও বিশদ করিয়াছে কিন্তু ভগবানকে এইরূপে নির্ব্যক্তিক, নিষ্ক্রিয়, নিরুপাধি আত্মা রূপে জানাই ভগবান সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞান নহে, গীতা মানুষকে যে পূর্ণতম সিদ্ধিলাভের পথ দেখাইয়াছে তাহার জন্য এই জ্ঞান প্রাথমিক প্রয়োজন হইলেও ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে। ভগবানকে যদি ব্যক্তিরূপে, সোপাধিরূপে, সগুণরূপে না জানি, তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত নানা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে না পারি তাহা হইলে আত্মার জ্ঞানের দ্বারা আমাদের মনকে তৃপ্ত করিতে পারিব কিন্তু আমাদের হৃদয় পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিবে না এবং তাহার পূর্ণ বিকাশও সম্ভব হইবে না। প্রেম ও ভগবৎ-ভক্তি যে-সব বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া দেয় সে-সব হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। মন যে আত্মজ্ঞান চায় তাহা আমরা লাভ করিব, কিন্তু হৃদয়ের ভিতর দিয়া ভগবান সম্বন্ধে যে সমৃদ্ধ জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা আমরা পাইব না। মন ও হৃদয় উভয়েরই অতীত যে সত্য জ্ঞান তাহার মধ্যে এই দুই প্রকার জ্ঞানই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং একীভূত হইয়াছে। সেইজন্য গীতা বলিয়াছে ভগবানকে শুধু আত্মারূপেই জানিলে চলিবে না, তাঁহাকে ঈশ্বররূপেও জানিতে হইবে, তাঁহার শুধু নির্গুণ নির্ব্যক্তিক ভাব নহে, তাঁহার সগুণ ব্যক্তিভাবও উপলব্ধি করিতে হইবে, জানিতে হইবে শেষ শ্লোকে ইহারই ইঙ্গিত দিয়া গীতা পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ করিয়াছে।

ভগবান শুধু নির্গুণ, নির্ব্যক্তিক, উদাসীন, সাক্ষী, নিষ্ক্রিয় আত্মারূপেই আমাদের মধ্যে নাই, তিনি আমাদের অতি আপনার জন রূপে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। অর্জ্জুনের রথে সারথিরূপে শ্রীকৃষ্ণ, আমাদের হৃদয় রথে চিরবিরাজমান শ্রীকৃষ্ণেরই বাহ্য নিদর্শন। ভগবানকে যদি আমরা মানুষরূপে কল্পনা করি তাহাতে কোন ভুল হয় না, কারণ মানুষ ভগবান ছাড়া নহে, ভগবানের মধ্যে মানুষ ভাবও আছে—তবে তিনি ঐ ভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহেন, তিনি অনন্ত। মানুষের সহিত আমরা যে সব সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি, ভগবানের সহিতও আমরা সেই সব সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি বিশেষতঃ বন্ধুর সহিত বন্ধুর, প্রভুর সহিত ভৃত্যের শিশুর সহিত পিতামাতার পিতামাতার সহিত শিশুর এবং সর্ব্বোপরি প্রিয়ের সহিত প্রিয়ের যে অন্তরতম মধুরতম সম্বন্ধ—ভগবানের সহিত আমরা এই সব সম্বন্ধই স্থাপন করিতে পারি। ভারত যেমন ভগবানকে সচলভাবে আপনার মনে করিয়া উপাসনা করিয়াছে, এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। গীতা এইরূপে ব্যক্তিভাবের উপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছে (১২।১,২) রাজযোগ প্রভৃতি দ্বারা যে আত্মজ্ঞানলাভ করা যায়, সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা সে সবই অপেক্ষাকৃত সহজে লাভ করা যায়, তাহা ছাড়া এমন অনেক কিছু জ্ঞান ও উপলব্ধি লাভ করা যায় যে-সব না লাভ করিলে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, আমাদের সত্তার বিকাশ ও সিদ্ধি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

অতএব ভগবানকে সর্ব্বভূতের স্বামী ও ঈশ্বররূপে, সকলের বন্ধুরূপে পূজ্যরূপে ধারণা করিতে হইবে, উপাসনা করিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং। আর এই যে আমাদের পরম আত্মীয়, পরম সুহৃদ ভগবান—ইনি শুধু নিজেই অমাদের সুহৃদ নহেন, সকল জীবের মধ্যেই তিনি আমাদের সুহৃদ রূপে বিরাজ করিতেছেন, সকলের মধ্যে তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, সকলের ভিতর দিয়া, সকলের নিকট হইতে তাঁহারই ভালবাসা লাভ করিতে হইবে—এই ভাবে আমরা বহুর মধ্যে একত্বের উপলব্ধি লাভ করিতে পারিব। বহুর সহিত বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিব। কিন্তু তাহার ভিত্তি হইবে এক মূলগত ঐক্য বোধ—তখনই এই সব সম্বন্ধ তাহাদের পূর্ণতা লাভ করিবে, মানবীয় সম্বন্ধ দিব্য সম্বন্ধে, দিব্য জীবনে পরিণত হইবে।

আবার ভগবানকে জগতের সহিত, কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধেও জানিতে হইবে। ভগবানকে সুহৃদরূপে আত্মীয়রূপে জানা যেমন ভক্তিযোগের পক্ষে উপযোগী, তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী নির্ব্যক্তিক আত্মারূপে জানা যেমন জ্ঞানযোগের পক্ষে উপযোগী, তেমনিই ভগবানকে জগতের ঈশ্বররূপে জানা হইতেছে কর্ম্মযোগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী,—সর্ব্বলোক মহেশ্বরম্।

জগৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধেও ভগবানকে উদাসীন স্রষ্টা রূপে জানা যায়, আবার নিয়ন্তা ঈশ্বররূপেও জানা যায়। প্রথমভাবে ভগবানকে জানিয়া আমরা উপলব্ধি করি যে, প্রকৃতিই সকল কর্ম্ম করিতেছে, পুরুষ কেবল দেখিতেছে, অনুমতি দিতেছে, প্রকৃতির রূপ ও ক্রিয়া সকল উপভোগ করিতেছে কিন্তু নিজে নিশ্চল নিষ্ক্রিয় রহিয়াছে। এইরূপ উপলব্ধিলাভ করিবার জন্য রাজযোগের অভ্যাস হইতে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। প্রকৃতির সকল কর্ম্ম হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পুরুষের ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়--এইভাবে আমরা ক্ষুদ্র অহংভাব হইতে, বাসনা কামনার বন্ধন হইতে মুক্ত হই। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই গীতা পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছে—

বিগতেচ্ছাভয় ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ।

দ্বিতীয় ভাবে আমরা ভগবানকে জানি প্রকৃতির অধীশ্বর রূপে, নিজ প্রকৃতির দ্বারা তিনিই এই সমুদয় জগৎ কর্ম্ম পরিচালনা করিতেছেন— তাঁহার প্রতি আমরা আমাদের হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ও ভক্তি অর্পণ করি, এবং নিজদিগকে তাঁহার বিশ্ব কাজের যন্ত্র করি, নিমিত্ত করি। সে কর্ম্ম আমরা করি আমাদের নিজেদের জন্য নহে, পরন্তু ভগবানেরই প্রতিনিধি-রূপে, তাঁহারই ইচ্ছা পূরণের জন্যে, সে কর্ম্মের প্রেরণা ঊর্দ্ধ হইতে আইসে, কোনরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থ বা কামনা হইতে নহে।

এই যে ভগবানকে ব্যক্তিরূপে, পুরুষরূপে, ঈশ্বররূপে জানা, ভক্তি করা, কর্ম্মের দ্বারা উপাসনা করা -গীতা এই সাধনাটিকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়াছে। অন্যান্য সব যোগ, সব সাধনার ফল অপেক্ষাকৃত সহজে ও নিশ্চিত ভাবে এই এক সাধনার দ্বারাই লাভ করা যায়। এই যে ভগবানকে ঈশ্বর রূপে জানা, ইহা সাধারণ ধর্ম্মের ব্যক্তিগত সগুণ ঈশ্বর নহে, মানুষের তুলনায় কল্পিত স্বর্গে অধিষ্ঠিত কোন পুরুষ নহে। তাঁহার অনন্ত গুণ ও রূপ আছে, তাই তিনি সগুণ, সাকার আবার তিনি সকল গুণ, সকল রূপ ও আকারের অতীত, অতএব তিনি নির্গুণ, নিরাকার— তিনি কোন গুণ বা আকারে সীমাবদ্ধ নহেন বলিয়াই তিনি সকল গুণ ও আকার গ্রহণ করিতে পারেন—তিনি বিশ্বের অতীত পরম অনির্ব্বচনীয় সত্তা, তিনি বিশ্বের আত্মা, সকলের মধ্যে সকলকে ধরিয়া রহিয়াছেন, তিনি বিশ্বপুরুষ, বিশ্বেশ্বররূপে নিজ সত্তার মধ্যে এই বিশ্বকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। আবার তিনি ব্যক্তিগত মানবরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া মানুষের সহিত সকল সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছেন—নিজের দিব্য ব্যক্তিত্ব ও প্রেমের আকর্ষণে সকলকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিতেছেন। ইহাকেই গীতা পরে পুরুষোত্তম নামে অভিহিত করিয়াছে।

ভগবানকে সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা রূপে জানিতে হইবে। প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ এখানে যজ্ঞ বলিতে জ্যোতিষ্টোমাদি বৈদিক যজ্ঞ এবং তপস্যা বলিতে কৃচ্ছচান্দ্রায়ণাদি বুঝিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, গীতা যজ্ঞ শব্দকে উদার অর্থে গ্রহণ করিয়াছে—গীতার মতে বিশ্বপ্রকৃতির সকল কর্ম্মই হইতেছে ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ, ভগবানই সে সকলের ভোক্তা। আমাদের প্রকৃতির যে সব কর্ম্ম চলিতেছে সে সঙ্কে যখন আমরা সেই বিরাট বিশ্ব যজ্ঞের অংশ বলিয়া মনে করি এবং সজ্ঞানে ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে অর্পণ করি—তখন আমাদের সকল কর্ম্মেরই হয় যজ্ঞ। ভগবান বলিয়াছেন

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৯।২৭

আমরা যদি কোন বস্তু দান করি, যাহাই দান করি এবং যাহাকেই দান করি, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আমরা ভগবানকেই দিতেছি, সর্ব্বভূতের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন আমার ঐ দানে তিনিই প্রীত ও পরিতৃপ্ত হইতেছেন। আমরা যখন ভোজন করি তখনও মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের মধ্যে ভগবানই ভোজন করিতেছেন। আহারের দ্বারা আমরা শুধুই আমাদের রসনাতৃপ্তি করিতেছি না। ভগবানকেই তৃপ্ত করিতেছি।

তপস্যা বলিতে লোকে সাধারণতঃ কষ্টসাধ্য পীড়াদায়ক ক্রিয়াই বুঝিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা তপস্যার মূল স্বরূপ নহে। গীতা যেমন ব্রহ্মকেই যজ্ঞ বলিয়াছে উপনিষদে তেমনিই তপস্যাকেও ব্রহ্ম বলা হইয়াছে—তপো ব্রহ্ম। ব্রহ্মের যে ইচ্ছাশক্তির কেন্দ্রীভূত প্রয়োগ তাহাই তপ বা তপস্যা। আমরাও যখন কোন কর্ম্ম করিবার জন্য আমাদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করি তখন তাহা হয় তপস্যা। তাহা যে পীড়াদায়ক হইবেই এমন কোন কথা নাই—অনেক দুঃসাধ্য ও কঠিন কর্ম্মে শক্তি প্রয়োগ করিতে আমরা তীব্র আনন্দ পাই। মোট কথা কষ্টকরতাই তপস্যার লক্ষণ নহে, কোন কর্ম্মের জন্য ইচ্ছাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করাই তপস্যা। সকল কর্ম্মের মধ্যেই কিছু না কিছু তপস্যা আছে, সকল কর্ম্মই যজ্ঞভাবে অর্পণ করিতে হয়। অতএব যজ্ঞ ও তপস্যা বলিতে গীতা কোন বিশেষ সাধনা বা অনুষ্ঠান বুঝে নাই, সকল কর্ম্মকেই যজ্ঞ ও তপস্যার ভাব লইয়া করিতে হয় এবং সে সবই ভগবানে অর্পণ করিতে হয়। কারণ যেখানে যে যাহাই করুক সবেরই মূল উৎস ভগবান এবং লক্ষ্যও ভগবান। ইহাই গীতার শিক্ষা। যখন আমরা কোন মহৎ কর্ম্মে ব্রতী হই, নিজেদের জন্য, অপরের জন্য বা নিখিল মানবের জন্য কোন সাধনা বা কঠিন প্রয়াসে ব্রতী হই, তখন আমাদিগকে নিজেদের

কথা ভুলিতে হইবে, অপরের কথা বা নিখিল মানবের কথা ভুলিতে হইবে, আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে আমরা যাহা করিতেছি তাহা হইতেছে সকলের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহারই উদ্দেশে যজ্ঞ। তিনি হইতেছেন অনন্ত, পরমতম, শুধু তাঁহার দ্বারাই সকল শ্রম, সকল মহদাকাঙ্ক্ষা সম্ভব হয়, তাঁহার জন্যই প্রকৃতি আমাদের নিকট হইতে সকল শ্রম ও মহদাকাঙ্খা আদায় করিয়া দেয় এবং সে-সব তাঁহারই বেদীমূলে অর্পণ করে। এমন কি আমাদের মধ্যে যে সকল কর্ম্ম প্রকৃতির ক্রিয়া বলিয়া আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি, আমরা কেবল সাক্ষী মাত্র—সে সব কর্ম্মেও ঐ একই স্মৃতি ও চৈতন্য রাখিতে হইবে। আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন এ সবকেও ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ বলিয়া দেখিতে হইবে।

ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই ভাব ও স্মৃতি লইয়া কর্ম্ম করিলে, সাধনা করিলে ইহারই দ্বারা আমাদের মধ্যে ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্ম-যোগ তিনেরই পূর্ণ বিকাশ হইবে এবং এই ভাবেই আমরা পরম শান্তি লাভ করিতে পারিব। প্রথমে যদি ভক্তির ভাব নাও থাকে তথাপি সর্ব্বদা সকল বস্তুতে, সকল কর্ম্মে ভগবানকে স্মরণ করিয়া, ক্ষণে ক্ষণে আমাদের সমগ্র জীবনকে ভগবানে উৎসর্গ করিয়া আমাদের মধ্যে ভগবানের প্রতি নিরতিশয় ভক্তি ও প্রেমের বিকাশ হইলে এবং সেই সঙ্গেই সকল মনুষ্য, সকল জীব, ভগবানের সকল রূপের প্রতিই আমাদের সার্ব্বজনীন প্রেমের বিকাশ হইবে। অতএব এই পন্থা হইতেছে পূর্ণ ভক্তিযোগের পন্থা। আবার সকলের মধ্যে ভগবানকে, ভগবানের মধ্যে সকলকে স্মরণ করিতে করিতে শেষে আমাদের পূর্ণ উপলব্ধি হইবে যে, এক ভগবানই এই সব হইয়াছেন আমরা যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু শ্রবণ করি, যাহা কিছু অনুভব করি সে সবে আমরা আর কাহাকেও বা কিছুকেই নহে সেই এক ভগবানকেই দেখি. শ্রবণ করি, অনুভব করি। অতএব এই পন্থা হইতেছে পূর্ণ জ্ঞানযোগের পন্থা।

আবার এইরূপ যজ্ঞভাবে সকল কর্ম্ম করিতে করিতে আমাদের কর্ম্মে সকল অহংভাব নির্ম্মূল হইয়া যায়, কারণ সবই করা হয় ভগবানের জন্য, নিজেদের জন্য নহে, অপরের জন্যও নহে। প্রতিবেশী, বন্ধু, পরিবারবর্গ দেশ, মানবজাতি বা অন্য জীব—ইহাদের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আছে বলিয়া, ইহাদের জন্য কর্ম্ম করিলে আমাদের অহংয়ের তৃপ্তি হয় বলিয়া কোন কর্ম্ম করা হয় না। এইভাবে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের এই উপলব্ধি না হইয়াও পারে না যে, সকল কর্ম্ম সকল জীবনই হইতেছে এক মহা যজ্ঞ—ভগবান নিজের সত্তার মধ্যে নিজেই নিজেকে

সকল জীবন ও কর্ম্ম যজ্ঞরূপে অর্পণ করিতেছেন,—গীতার ভাষায় ব্রহ্মৈব ব্রহ্মণা হুতম্। অতএব এই পন্থা হইতেছে পূর্ণ কর্ম্মযোগের পন্থা এই তিনটি সমজাতীয় যোগ এখানে স্বভাবতঃ মিলিত হইয়া একই সাধনায় পরিণত হইয়াছে।

সর্ব্বমুক্তি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ

(১)

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র সমূহে বহু বিষয়ের আলোচনা থাকিলেও প্রধান আলোচ্য বিষয় মুক্তি বা মোক্ষ। মোক্ষ কি এবং মোক্ষলাভের উপায় কি—ইহাই ভারতীয় দর্শনের প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য। মোক্ষ নিরূপণের জন্যই মোক্ষের বিপরীত বন্ধ বা সংসারের স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে এবং বন্ধের কারণ কি তাহারও আলোচনা করা হইয়াছে। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি বৈদিক দর্শনের মত বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অবৈদিক দর্শনেরও আলোচ্য বিষয় উহাই। অবান্তর মতভেদ থাকিলেও প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য যে মোক্ষ, তাহা সকলেই বলিয়াছেন।

জীব অনাদি কাল হইতে নিরন্তর দুঃখধারা ভোগ করিতেছে। এই দুঃখধারার চির অবসানই মুক্তি। মুক্ত জীব আর দুঃখ ভোগ করিবে না, চিরদিনের জন্য তাহার দুঃখের অবসান হইবে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রকারগণ ইহা এক বাক্যে স্বীকার করিষাছেন। মুক্ত জীবের সর্ব্ববিধ দুঃখের নিবৃত্তি হইলেও মুক্তাবস্থাতে সুখ থাকে কি না, ইহা লইয়া শাস্ত্রকারগণের বহু মতভেদ দেখা যায়।

জীবের দুঃখধারা অনাদি হইলেও তাহা অনন্ত অবিনাশী নহে। একদিন এই অনাদি দুঃখধারার উচ্ছেদ হইবে। অনাদিকাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত জীব দুঃখই ভোগ করিবে, ইহা হইতে পারে না। জীবের দুঃখ প্রবাহ অনন্তকাল স্থায়ী হইলে মোক্ষ প্রতিপাদক শাস্ত্র নিতান্তই ব্যর্থ হইয়া যাইত। মুমুক্ষু পুরুষের মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা বাতুলতামাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়িত; যেহেতু জীবের দুঃখ প্রবাহ অনাদি অনন্ত—কোনও দিন তাহার অবসান হইবে না, যাহার অবসান নাই তাহার অবসানের জন্য প্রয়াস হস্তাদি দ্বারা আকাশের পরিমাণ নিরূপণের প্রয়াসের ন্যায় বাতুলতামাত্র।

এজন্য ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রকারগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, জীবের দুঃখ প্রবাহ অনাদি হইলেও অনন্ত নহে। মুক্তির যাহা সাধন তাহার অনুষ্ঠান করিলেই দুঃখের চিরনিবৃত্তি হইবে। দুঃখের চিরনিবৃত্তির সাধন কি? তাহাই নিরূপণ করিবার জন্য ভারতীয় বৈদিক ও অবৈদিক সকল প্রকার দর্শনশাস্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে।

ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রসমূহ মোক্ষ ও মোক্ষের সাধনের আলোচনায় পরিপূর্ণ। জীব চির শান্তিলাভ করিবে, চিরদিনের জন্য শোক মোহের গ্রাস হইতে উত্তীর্ণ হইবে, সর্ব্ববিধ ভয়ের অতীত হইবে, ইহা অপেক্ষা আর বড় কথা কি হইতে পারে? এই মোক্ষের আলোচনাতে একটি বিশেষ প্রশ্ন সকলেরই মনে উদিত হয় যে—সমস্ত জীবই কি একদিন মোক্ষলাভ করিবে? না কেহ কেহ মোক্ষলাভ করিলেও সকলের মোক্ষ কখনও হইতে পারিবে না। ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই আলোচনাও বিশেষভাবে করিয়াছেন, কিন্তু এই আলোচনায় দার্শনিকগণ একমত হইতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন—সর্ব্বজীবের মুক্তি কোন মতেই সম্ভাবিত নহে, কেহ কেহ মুক্তিলাভ করিলেও সকলেই মুক্তি লাভ করিবে ইহা অত্যন্ত অসম্ভব, পরন্তু ইহাতে মহা অনর্থই ঘটিবে। আবার কেহ বলিয়াছেন—জীবমাত্রই মুক্তির অধিকারী, সমস্ত জীবই মুক্তি লাভ করিবে। এমন সময় আসিবে যখন এক জীবও আর বদ্ধ থাকিবে না। জীব অনন্ত কাল দুঃখভোগ করিবে ইহা অত্যন্ত অসম্ভব। সমস্ত জীবের মুক্তি হইলে মহা অনর্থ ঘটিবে—এইরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা অনর্থ কাহাকে বলে তাহাই বুঝিতে পারেন নাই। এইরূপে "সর্ব্বমুক্তি" পক্ষ অবলম্বন করিয়া দর্শনশাস্ত্রে বহু বাদ-বিবাদ দেখা যায়। এই প্রবন্ধে আমরা সর্ব্বমুক্তিবাদিগণের অভিপ্রায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

ন্যায়াচার্য্য উদয়ন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কিরণাবলী গ্রন্থে সর্ব্বমুক্তিবাদের অবতারণা করিয়াছেন।[১] প্রথমতঃ আচার্য্য এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন যে সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি মুক্তি হইলেও এই মুক্তিলাভ জীবের অসম্ভব; কারণ মানুষকে এইরূপ উপদেশ করা উচিত যাহা মানুষ স্বীয় যত্ন দ্বারা সম্পাদন করিতে পারে, যাহা মানুষের যত্নসাধ্য নহে সেরূপ উপদেশ নিতান্ত ব্যর্থ। অভিপ্রায় এই যে জীবের দুঃখ তিন ভাগে বিভক্ত,

১। তথাপি দুঃখোচ্ছিত্তিরপুরুষার্থঃ * অনাগাতস্য নিবর্ত্তয়িতুমশক্যত্বাৎ; বর্ত্তমানস্য চ পুরুষপ্রযত্নমন্তরেণৈব বিরোধিগুণান্তরোপনিপাতনিবর্ত্তনীয়ত্বাৎ; অতীতস্যাতীতত্বাদেব। সোসাইটী মুদ্রিত দ্র: কি: পৃ ৫২—৫৩।

* পুরুষ প্রযত্নাসাধ্যত্বেনাপুরুষার্থত্বমাহ তথাপীতি। কাশী মুদ্রিত কি: ভা: ১৭ পৃ।

অতীতদুঃখ, বর্ত্তমান দুঃখ ও ভাবি দুঃখ জীব স্বীয় যত্ন দ্বারা অতীত দুঃখের নিবৃত্তি করিতে পারে না ; কারণ তাহার যত্নের পূর্ব্বেই অতীত দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে, সুতরাং অতীত দুখের নিবৃত্তি যত্নসাধ্য হইতে পারে না। এইরূপ বর্ত্তমান দুঃখের নিবৃত্তিও যত্নসাধ্য নহে, কারণ সুখ দুঃখ প্রভৃতি আত্মার ক্ষণস্থায়ী বিশেষ গুণ এবং অবশ্য বেদ্য ; সুখ দুঃখ উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘ সময় থাকে না, উৎপত্তির তৃতীয়ক্ষণে স্বভাবতঃই নষ্ট হইয়া যায়। সুখ দুঃখ উৎপন্ন হইলে, তাহা অবশ্য বেদ্য বিশেষ গুণ বলিয়া দ্বিতীয়ক্ষণেই ঐ উৎপন্ন সুখ দুঃখের জ্ঞান অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আত্মার প্রত্যক্ষ যোগ্য বিশেষ গুণমাত্রই পরবর্ত্তী বিশেষ গুণ উৎপন্ন হইলে নষ্ট হইয়া যায়, ইহাই আত্মার যোগ্য বিশেষ গুণের স্বভাব। সুতরাং বর্ত্তমান দুঃখও স্বভাবতঃই নিবৃত্ত হইবে। এই নিবৃত্তির জন্য যত্নের অপেক্ষা নাই। এইরূপ ভাবি দুঃখের নিবৃত্তিও যত্ন সাধ্য হইতে পারে না। ভাবি দুঃখ উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া অনুৎপন্ন দুঃখের নিবৃত্তিও যত্নসাধ্য হইতে পারে না। যখন যত্ন থাকিবে তখন দুঃখ থাকিলে যত্ন দ্বারা সেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়। কিন্তু ভাবি দুঃখ ও বর্ত্তমান যত্ন একসময়ে থাকিতে পারে না। যাহা বর্ত্তমান ও স্থায়ী, যত্ন দ্বারা তাহারই নিবৃত্তি হইতে পারে, দুঃখ স্বভাবতঃ ক্ষণিক, সুতরাং দুঃখের নিবৃত্তি যত্ন-সাধ্য হইতেই পারে না। যাহা যত্নসাধ্য নহে তাহার উপদেশ করাও অসঙ্গত।

এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া পরে আচার্য্য বলিয়াছেন যে যদিও পুরুষ স্বীয় যত্ন দ্বারা দুঃখের সাক্ষাৎ নিবৃত্তি করিতে পারে না, কোনও দুঃখেরই নিবৃত্তি সাক্ষাৎ পুরুষের যত্ন সাধ্য নহে, তথাপি দুঃখের হেতুর উচ্ছেদ পুরুষের যত্ন সাধ্য। যেমন প্রায়শ্চিত্ত দুঃখের সাক্ষাৎ নিবৃত্তি করে না কিন্তু অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে পাপ উৎপন্ন হয়, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই পাপেরই সাক্ষাৎ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। পাপই দুঃখের হেতু সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত দুঃখের সাক্ষাৎ নিবর্ত্তক না হইয়া দুঃখের হেতু পাপের সাক্ষাৎ নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। সেইরূপ সংসারদুঃখের হেতু মিথ্যাজ্ঞান ও মিথ্যা জ্ঞান জন্য বাসনা বা সংস্কার। এই মিথ্যাজ্ঞান জন্য বাসনার সহিত মিথ্যাজ্ঞানই জীবের অনাদি দুঃখ ধারার কারণ। এই মিথ্যাজ্ঞান ও বাসনা বীজ ও অঙ্কুরের মতই প্রবাহরূপে অনাদি। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাসনার সহিত এই মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাসনার সহিত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে মিথ্যাজ্ঞান জন্য রাগের নিবৃত্তি হয়, কারণ রাগের হেতুই মিথ্যাজ্ঞান। রাগ নিবৃত্তিতে ধর্ম্মাধর্ম্মের নিবৃত্তি হয়। এই ধর্ম্মাধর্ম্মের হেতুই রাগ বা ইচ্ছা। ধর্ম্মাধর্ম্মের উচ্ছেদ হইলে জন্মের উচ্ছেদ হয়, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই জন্মের কারণ।

জন্মের উচ্ছেদ হইলে দুঃখ ধারার উচ্ছেদ হয়। এই দুঃখধারার উচ্ছেদই মুক্তি। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান হইতে জীবের মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। দুঃখ নিবৃত্তি যত্ন সাধ্য না হইলেও দুঃখ নিবৃত্তির হেতু তত্ত্বজ্ঞান পুরুষের যত্ন সাধ্য বলিয়া দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মোক্ষও পুরুষের যত্নসাধ্য[২] হইতে পারে।

আচার্য্য উদয়ন অনাদি দুঃখধারার উচ্ছেদই মোক্ষ, এবং উহা তত্ত্বজ্ঞান সাধ্য এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয় যে এই অনাদি দুঃখধারার উচ্ছেদরূপ মোক্ষে প্রমাণ কি? কোন্ প্রমাণ দ্বারা আমরা সেই অনাদি দুঃখ প্রবাহের উচ্ছেদ জানিতে পারি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য উদয়ন পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রদর্শিত অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। উদয়নেরও পূর্ব্ববর্ত্তী অতি প্রাচীন আচার্য্যগণ মোক্ষে যে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এস্থলে আচার্য্য উদয়নও সেই অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। অনুমানটি এই; দুঃখ সন্ততি, অত্যন্ত উচ্ছিন্ন হইবে, যেহেতু তাহাতে সন্ততিত্ব ধর্ম্ম আছে। অবিচ্ছিন্ন ভাবে দীর্ঘ সময় ধরিয়া একজাতীয় বস্তু প্রতিক্ষণ বিশীর্ণ হইতে থাকিলে তাহাকে সন্ততি, ধারা বা প্রবাহ বলা হয়। যাহা সন্ততি, ধারা বা প্রবাহ তাহার উচ্ছেদ একসময় অবশ্যই হইবে। কোনও ধারা বা প্রবাহ অনন্ত কাল থাকে না। যেমন এই প্রদীপসন্ততি. প্রদীপ একটা স্থির বস্তু নহে; প্রতিক্ষণে নূতন নূতন প্রদীপ শিখা উৎপন্ন হইতেছে ও বিশীর্ণ হইতেছে। আমরা যদিও একটীই প্রদীপ শিখা বলিয়া মনে করি কিন্তু তাহা নহে, অবিচ্ছিন্ন ভাবে একজাতীয় দীপ শিক্ষা উৎপন্ন ও বিশীর্ণ হইতেছে বলিয়া ঐ দীপশিখাকে এক বলিয়া মনে হয়। জীবেরও অনাদি কাল হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে পূর্ব্ব দুঃখের সমান জাতীয় দুঃখ প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে বলিয়া জীবের ঐ দুঃখ রাশিকে দুঃখ-ধারা বা দুঃখসন্ততি বলা হয়। এই সন্ততি বা ধারা দুই প্রকার সাদি ও অনাদি, প্রদীপ সন্ততি সাদি কিন্তু দুঃখ সন্ততি অনাদি। এই সাদি প্রদীপ সন্ততির উচ্ছেদকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া অনাদি দুঃখ সন্ততির উচ্ছেদ অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত অনুমানে দুঃখ সন্ততি পক্ষ, ইহার অত্যন্ত উচ্ছেদ সাধ্য, সন্ততিত্ব হেতু, এই প্রদীপ সন্ততি—উদাহরণ।[৩]

২। ইতি চেন্ন হেতূচ্ছেদে পুরুষব্যাপারাৎ প্রায়শ্চিত্তবৎ। তথাহি মিথ্যাজ্ঞানং সবাসনমিহ সংসারমূল-কারণম্। তচ্চ তত্ত্বজ্ঞানেন বিরোধিনা নিবর্ত্ত্যতে। তন্নিবৃত্তৌ রাগাদ্যপায়ে প্রবৃত্তেরপায়াৎ জন্মাদ্যপায়ঃ। তথাচ দুঃখসন্তানোচ্ছেদঃ। তচ্চ তত্ত্ব-জ্ঞানং পুরুষপ্রযত্ন-সাধ্যমিতি। সোসাইটী মুদ্রিত কিরণাবলী পৃঃ ৫৩—৫৭।

৩। "কিং পুনরত্র প্রমাণম্ "দুঃখসন্ততিরত্যন্তমুচ্ছিদ্যতে সন্ততিত্বাৎপ্রদীপসন্ততিবৎ ইত্যাচার্য্যাঃ"—কিরণাবলী সোসাইটী মুদ্রিত পৃঃ ৫৭—৫৮.

এই অনুমান প্রয়োগে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—আচার্য্য কি যে কোনও একটি দুইটি দুঃখ সন্ততির উচ্ছেদের অনুমান করিতেছেন? অথবা সমস্ত দুঃখ সন্ততির উচ্ছেদের অনুমান করিতেছেন? প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিতে কোনও আপত্তি নাই, কারণ যাঁহারা মোক্ষ স্বীকার করেন, তাঁহাদের দুঃখ সন্ততির উচ্ছেদ মানিতেই হইবে। কিন্তু এই অনুমান দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ যাহার দুঃখ সন্ততির উচ্ছেদ হইবে ও যাহার দুঃখ সন্ততির উচ্ছেদ হইবে না—এই উভয়ের দুঃখ সন্ততিতেই সন্ততিত্ব রূপ হেতু আছে কিন্তু অত্যন্ত উচ্ছেদরূপ সাধ্য নাই; এজন্য সন্ততিত্ব হেতুটি ব্যভিচারী অর্থাৎ অনৈকান্তিক। ঐকান্তিক হেতুই যথার্থ হেতু, অনৈকান্তিক হেতু ব্যভিচারী। তাহা দ্বারা সাধ্যের সিদ্ধি হইতে পারে না।

ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধরাচার্য্য ও ন্যায়লীলাবতীকার শ্রীবল্লভ প্রভৃতি আচার্য্যগণ সর্ব্বমুক্তিবাদ স্বীকার করেন না। এজন্য তাঁহারা আচার্য্যের প্রদর্শিত সন্ততিত্ব হেতুটিকে ব্যভিচারী বলিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে—প্রদীপসন্ততির যেমন উচ্ছেদ ঘটে সেইরূপ সন্ততিমাত্রেরই যদি অত্যন্ত উচ্ছেদ ঘটে তাহা হইলে এক সময় পার্থিব পরমাণুর রূপরসাদি সন্ততিরও অত্যন্ত উচ্ছেদ হইয়া পার্থিব পরমাণুগুলি নীরূপ ও নীরস প্রভৃতি হইয়া পড়িবে। কারণ পাকবশতঃ পার্থিব পরমাণুর রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এজন্য বলা যাইতে পারে যে-পার্থিব পরমাণুর রূপধারা রসধারা প্রভৃতি অনাদিকাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে। সমস্ত সন্ততির উচ্ছেদ হইলে পার্থিব-পরমাণু সমূহেরও রূপসন্ততি, রসসন্ততি প্রভৃতিরও অত্যন্ত উচ্ছেদ হওয়া উচিত, কিন্তু ইহা ত অসম্ভব: পৃথিবী পরমাণু থাকিবে কিন্তু তাহাতে রূপ গন্ধ প্রভৃতি থাকিবে না, এরূপ অবস্থা কল্পনাও করা যায় না। পৃথিবী পরমাণুতে পৃথিবীত্ব থাকিবে কিন্তু গন্ধাদি থাকিবে না, ইহা হইতে পারে না, কারণ পৃথিবীত্ব ধর্ম্মটী গন্ধের সমবায়িকারণতা অবচ্ছেদকরূপেই সিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং সন্ততিত্ব হেতু পার্থিব পরমাণুর রূপাদি সন্তানে ব্যভিচারী হইয়া পড়িবে।[৪]

আর আচার্য্য যদি সমস্ত দুঃখ সন্ততির উচ্ছেদের অনুমান করেন তাহাও অসম্ভব। কারণ জীবমাত্রেরই মুক্তি হইবে ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা।

যাঁহারা সর্ব্বমুক্তি মানেন না, তাঁহাদের এইরূপ আপত্তির উত্তরে আচার্য্য উদয়নের বক্তব্য এই যে—পূর্ব্বোক্ত আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে; সমস্ত আত্মার বা সমস্ত জীবের দুঃখ সন্ততিই আমার প্রদর্শিত অনুমানে পক্ষ। এই পক্ষে অত্যন্ত উচ্ছেদরূপ সাধ্যের সিদ্ধিতে সর্ব্বমুক্তিবাদই সিদ্ধ হইবে। সর্ব্ব-

৪। পার্থিব-পরমাণুগত-রূপাদি-সন্তানেন অনৈকান্তিক মিদমিতি চেৎ।—সোসাইটী মুদ্রিত কিরণাবলী পৃঃ ৫৮।

মুক্তিবাদই পূর্ব্বাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। সুতরাং পার্থিব পরমাণুর রূপাদি সন্ততিও ফলতঃ প্রদর্শিত অনুমানের পক্ষের অন্তর্গতই হইয়া পড়িতেছে অর্থাৎ প্রদর্শিত অনুমানে দুঃখসন্ততি পক্ষ হইলেও পার্থিব পরমাণুর রূপাদি-সন্ততি পক্ষসম হইবে। যাহারা সর্ব্বমুক্তি স্বীকার করেন, তাঁহারা পার্থিব পরমাণুর রূপাদিধারার বিচ্ছেদও স্বীকার করেন।[৫] আর যাহা পক্ষের অন্তর্গত, তাহাতে ব্যভিচার দোষের উদ্ভাবন নিষিদ্ধ, পক্ষে ও পক্ষসমে ব্যভিচার দোষ হইলে অনুমানমাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া যাইবে।

পার্থিব পরমাণুর রূপাদি সন্ততি কিরূপে ফলতঃ পক্ষের অন্তর্গত হইবে, তাহাই দেখাইবার জন্য আচার্য্য বলিয়াছেন[৬] যাঁহারা সর্ব্বজীবের মুক্তি স্বীকার করেন, তাঁহারা সর্ব্বমুক্তি দশাতে অদৃষ্টমাত্রেরই উচ্ছেদ স্বীকার করেন। মুক্ত জীবের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম রূপ অদৃষ্ট থাকিতে পারে না, থাকিলে মুক্তিই হয় না। এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কার্য্যমাত্রের কারণ, এই কারণ না থাকিলে কোন কার্য্যই উৎপন্ন হইতে পারে না। সমস্ত কার্য্যেরই কারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। সুতরাং কার্য্যের উৎপত্তির বীজ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সর্ব্ব-মুক্তি দশাতে থাকে না বলিয়া কোন কার্য্যেরই উৎপত্তি হইতে পারে না। আরও কথা সমস্ত ভোক্তৃজীবের মুক্তি হইলে কার্য্যের উৎপত্তির কোন প্রয়োজনও নাই। জীবের সুখ দুঃখ ভোগের জন্যই কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বমুক্তিদশাতে কার্য্যের উৎপত্তিও নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ বীজ আর সুখদুঃখ ভোগরূপ প্রয়োজন না থাকিলে কোন কার্য্যেরই উৎপত্তি হইতে পারে না।

যে সমস্ত আচার্য্যগণ সর্ব্বমুক্তি স্বীকার করেন না, তাঁহারা আচার্য্যের এইরূপ প্রদর্শিত যুক্তির বিরুদ্ধে বলেন যে[৭] সর্ব্বমুক্তিই আমরা স্বীকার করি না; সুতরাং প্রদর্শিত সন্ততিত্বরূপ হেতু পার্থিব পরমাণুর রূপাদি সন্ততিতে ব্যভিচারীই হইবে। ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধরাচার্য্য এই আপত্তিই ন্যায়কন্দলীগ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। আচার্য্য উদয়ন ন্যায়কন্দলী গ্রন্থ

৫। ন সর্ব্বাত্মগত-দুঃখসন্ততি-পক্ষীকরণে ফলতস্তস্যাপি পক্ষে অন্তর্ভাবাৎ। সোসাইটী মুদ্রিত কিরণাবলী পৃঃ ৫৮।

৬। নহি সর্ব্বমুক্তিপক্ষে সর্ব্বোৎপত্তিমন্নিমিত্তস্য অদৃষ্টস্যাভাবাৎ তদুৎপত্তৌ বীজমস্তি, ন চ সর্ব্বভোক্তৃণামপবৃক্তৌ তদুৎপত্তেঃ প্রয়োজন মস্তি। নহি বীজ প্রয়োজনাভ্যাং বিনা কস্যচিদুৎপত্তিরস্তি। কিরণাবলী সোসাইটী মুদ্রিত পৃঃ ৬২।

৭। তত্ত্বাদহিতনিবৃত্তিরাত্যন্তিকী মহোদয় ইতি যুক্তং, তস্যাঃ সদ্ভাবে কিং প্রমাণং? দুঃখসন্ততিধর্ম্মিণী অত্যন্তমুচ্ছিদ্যতে সন্ততিত্বাদ্দীপসন্ততিবদিতি তার্কিকাঃ তদযুক্তং, পার্থিবপরমাণুরূপাদিসন্তানেন ব্যভিচারাৎ অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে ইতি [illegible] প্রমাণমিতি চে[illegible] । ন্যায়কন্দলী, [illegible] পৃঃ।

হইতেই এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন একথা বলা যায় না ; কারণ যাঁহারা সর্ব্বমুক্তি মানেন না তাঁহাদের ইহাই প্রসিদ্ধ যুক্তি। কন্দলীকার ও পূর্ব্বাচার্য্যগণের অভিপ্রায় অনুসারেই ঐরূপ বলিয়াছেন। কন্দলী-কার আচার্য্যের এই অনুমান প্রদর্শন করিয়াই আচার্য্য প্রদর্শিত ব্যভিচার দোষটিও দেখাইয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য উদয়ন ব্যভিচার দোষটিও যেমন দেখাইয়াছেন তাহার সমাধানও তেমনি দেখাইয়াছেন। কন্দলীকার তাহা করেন নাই কেবল দোষটিই দেখাইয়াছেন, সমাধান দেখান নাই ; কারণ কন্দলীকার সর্ব্বমুক্তি স্বীকার করেন না। কন্দলীকার এই অনুমানটি দেখাইয়া বলিয়াছেন "তার্কিকেরা" এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। উদয়ন কিন্তু বলিয়াছেন "আচার্য্যেরা" এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

তত্ত্বপ্রদীপিকা (চিৎসুখী) গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে চিৎসুখাচার্য্য [৮] আচার্য্য উদয়নের এই সর্ব্বমুক্তি সাধক অনুমান এবং ন্যায়কন্দলীকারের আপত্তি ও আচার্য্য উদয়নের প্রদর্শিত সমাধানগুলি লিখিয়াছেন এবং আচার্য্য উদয়নের সমাধানের প্রতিবাদ যাহা শ্রীবল্লভ ন্যায়লীলাবতী গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও লিখিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য্য বলিয়াছেন যে, কন্দলীকার লীলাবতীকার প্রভৃতি কতিপয় বৈশেষিক আচার্য্য সর্ব্বমুক্তি পক্ষ স্বীকার করেন না। এই বৈশেষিক আচার্য্যগণের মতে কতকগুলি জীব চিরদিনই বদ্ধ থাকিবে। তাহাদের অনাদি দুঃখধারার অবসান কোন কালেও হইবে না।

যে সমস্ত বৈশেষিক আচার্য্যগণ সর্ব্বমুক্তি স্বীকার করেন না পরন্তু আচার্য্য উদয়ন প্রদর্শিত অনুমানে ব্যভিচার দোষ প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের সেই প্রদর্শিত দোষের সমাধানের জন্য আচার্য্য উদয়ন বলিতেছেন [৯] যদি সর্ব্বমুক্তি স্বীকার না করা যায় তবে যাহাদের মুক্তি হইবে না তাহাদের দুঃখসন্ততির অবসানও হইবে না। তাহাদেরই সেই দুঃখ সন্ততিতে প্রদর্শিত সন্ততিত্বরূপ হেতু আছে, কিন্তু অত্যন্ত উচ্ছেদরূপ সাধ্য না থাকায় সন্ততিত্ব হেতু ব্যভিচারী হইতেছে। এই ব্যভিচার

৮। অস্তুতর্হি "দুঃখসন্ততি রত্যন্তমুচ্ছিদ্যতে সন্ততিত্বাৎ প্রদীপসন্ততিবৎ" ইতি কিরণাবলীকারপ্রয়োগঃ ইতিচেৎ ন পার্থিব পরমাণুরূপাদিসন্তানে ত্বন্মতে ব্যভিচারাৎ! নম্ন সর্ব্বমুক্তৌ সাপি সন্ততিঃ উচ্ছিদ্যতে ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যনিমিত্তস্য সুখদুঃখভোগ লক্ষণ প্রয়োজনস্য চাভাবাদিতি চেৎ নৈবং সর্ব্বমুক্ত্যনঙ্গীকারবাদিনং প্রতি এবং পর্য্যনুযোগা-যোগাৎ। কন্দলীকার-লীলাবতীকার-প্রভৃতিভিঃ কৈশ্চিদ্ বৈশেষিকৈঃ সর্ব্বমুক্তে রনঙ্গীকারাৎ। কেষাঞ্চিদাত্মনাং সংসার্য্যেকস্বভাবতাঙ্গীকারাৎ। বোম্বে মুদ্রিত চিৎসুখী ৪র্থ পরিচ্ছেদ ৩৫৭ পৃঃ।

৯। সর্ব্বমুক্তিস্থিত্যেব নেষ্যত ইতি চেৎ তর্হি য এব নাপবৃজ্যতে তস্যৈব দুঃখসন্তানেন অনৈকান্তিকমিদং কিমুদাহরণান্তরগবেষণায়া। সোসাইটী মুদ্রিত কিরণাবলী পৃঃ ৬২।

দোষ দেখাইবার জন্য আর পার্থিব পরমাণুর রূপাদি সন্ততি পর্য্যন্ত অনুসরণ করিবার আবশ্যকতা কি? যাহা সমীপেই আছে, তাহার জন্য দূরে যাইতে হইবে কেন?

আচার্য্য উদয়নের এই কথার উত্তরে অসর্ব্বমুক্তিবাদী প্রতিবাদিগণের [১০] বক্তব্য এই যে চিরবদ্ধজীবের দুঃখ সন্ততিতেই সন্ততিত্ব হেতু ব্যভিচার হইবে, উদাহরণ বিশেষের প্রতি আমাদের কোনও আগ্রহ নাই, যে কোনও স্থলে সন্ততিত্ব হেতুর ব্যভিচার প্রদর্শনই উদ্দেশ্য।

এতদুত্তরে আবার উদয়ন বলিতেছেন [১১] না এরূপ বলিতে পারা যায় না, কোনও জীব চিরকালই বদ্ধ থাকিবে ইহা কোনও মতেই সিদ্ধ হয় না। কতকগুলি জীব চিরবদ্ধ থাকিবে এরূপ যদি স্বীকার করা যায় তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে যাহারা চিরবদ্ধ থাকিবে যাহাদের দুঃখের উচ্ছেদ হইবে না, তাহারা আমাদের মতই বদ্ধ জীব। আমরা যেমন অনাদিকাল হইতে দুঃখ প্রবাহে পতিত রহিয়াছি তাহারাও সেইরূপ। কেবলমাত্র তাহাদের দুঃখ প্রবাহের অবসান হইবে না এই মাত্রই তাহাদের সহিত আমাদের প্রভেদ, আর অন্য কোনও প্রভেদ নাই। আর তাহা হইলে স্বভাবতঃ সকলেরই এইরূপ প্রবল আশঙ্কা হইবে যে [১২] "আমিও তাহাদের মতই কিনা" অর্থাৎ যাহারা মুক্তিলাভ করিবে না আমিও তাহাদের মধ্যেই একজন কিনা? আমি যে চিরবদ্ধজীব নই তাহা নিরূপণ করিবার কোনও উপায় নাই। আমিও যদি চিরবদ্ধ জীবই হই তবে আমার মোক্ষ শাস্ত্রশ্রবণ, সন্ন্যাসগ্রহণ সবই বৃথা হইবে। ঐহিক পারলৌকিক সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদি কঠোর ব্রত পরিপালন পূর্ব্বক যাবজ্জীবন বৃথা দুঃখ ভোগই মাত্র সার হইবে এইরূপ প্রবল আশঙ্কাতে কেহ মোক্ষলাভের জন্য যম নিয়মাদি ও ব্রহ্মচর্য্যাদি জন্য দুঃখ ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। আর তাহাতে মোক্ষ কথাই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। একটি জীবও আর মোক্ষপ্রার্থী হইবে না।

আচার্য্যের এই কথার উত্তরে প্রতিবাদী অসর্ব্বমুক্তিবাদিগণ বলেন— বেশ কথা [১৩] তোমার মতই না হয় মানিয়া লইলাম সকলেরই মুক্তি

১০। এবমস্তু নচোদাহরণমাদরণীয়মিতি চেৎ। সোসাইটী মুদ্রিত কিরণাবলী পৃ: ৬২

১১। ন অসিদ্ধেঃ। সিদ্ধৌ বা সংসার্য্যেকস্বভাবা এব কেচিদাত্মানঃ ইতি স্থিতে। সোসাইটী মুদ্রিত কিরণাবলী পৃ: ৬৩।

১২। অতমেব যদি তথাস্যাংতদামম বিপরীত প্রয়োজনং পারিব্রাজকমিতিশঙ্কয়া ন কশ্চিৎ তদর্থং ব্রহ্মচর্য্যাদি দুঃখমনুভবেৎ। সোসাইটী মুদ্রিত কিরণাবলী পৃ: ৬৩।

১৩। অথ যদি সর্ব্বদুঃখসন্ততিনিবৃত্তির্ভবিষ্যতি তর্হি ইয়তা কালেন কিং নাম নাভূৎ- একৈকস্মিন্কল্পে যদি একৈকোঽপি অপবৃজ্যেত তথাপ্যুচ্ছিন্নঃ সংসারঃ স্যাৎ কল্পানা- [illegible]

হইবে কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি এই অনন্ত অতীতকালের মধ্যে সকলের মুক্তি হইল না কেন? এক একটি কল্পেও যদি এক একটি জীব মুক্তি লাভ করিত তবে আজ পর্য্যন্ত সংসার উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত একটি জীবেরও আর মুক্তি বাকী থাকিত না। কারণ অনন্তকল্প অতীত হইয়াছে। এই অনন্ত অতীতকালের মধ্যে যাহা হয় নাই তাহা ভবিষ্যতে হইবে ইহা দুরাশা ভিন্ন আর কি হইতে পারে। প্রতিবাদীর কথাটি শুনিতে ভালই তবে প্রতিবাদীকে আমরাও জিজ্ঞাসা করি জীব ত অনাদি সুতরাং প্রতিবাদীরও ত অনন্তকল্প অতীত হইয়াছে কিন্তু তাঁহার ত মুক্তি হয় নাই তবে ভবিষ্যতে হইবে ইহা দুরাশা ভিন্ন আর কি হইতে পারে, যাহা অনন্তকালেও হয় নাই তাহা আর হইবে না সুতরাং দুরাশা ত্যাগ করিয়া মোক্ষ শাস্ত্রের আলোচনা পরিত্যাগ করিলেই ত ভাল হইত।

যাহা হউক আচার্য্য প্রতিবাদিগণের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন [১৪] হাঁ ঠিক কথাই বটে যেমন অনন্তকল্পও অতীত হইয়াছে সেইরূপ অনন্তজীবও মুক্তিলাভ করিয়াছে কিন্তু সকল জীব মুক্তিলাভ করে নাই যেহেতু সংসার প্রত্যক্ষসিদ্ধই রহিয়াছে, সকলের মুক্তি হইলে সংসার থাকিত না। আচার্য্যের কথার প্রতিবাদে অসর্ব্বমুক্তিবাদীগণ বলেন যে [১৫] ইহাইত হইতে পারে না। তোমরা যে বলিতেছ সর্ব্বমুক্তি অবশ্যই হইবে কিন্তু অতীত অনন্তকালের মধ্যে হয় নাই ইহাইত হইতে পারে না, সর্ব্বমুক্তি যদি হইত তবে আজ পর্য্যন্ত হওয়া উচিত ছিল যখন আজ পর্য্যন্তও হয় নাই তবে আর হইবে না।

ইহার উত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন যে প্রতিবাদিগণের ইহা বড়ই অসঙ্গত কথা কারণ [১৬] যাহা হইবে তাহা এতদিনের মধ্যে হইতে হইবে এইরূপ কালের নিয়মে কোনও প্রমাণ নাই যাহা হইবে তাহা যদি ভবিষ্যতে হয় এতদিনের পরে হয় তবে কি তাহার হওয়া হইল না।

অসর্ব্বমুক্তিবাদিগণ এখন একটি নূতন আপত্তি তুলিয়া বলিতেছেন যে [১৭] সমস্ত উৎপত্তিমৎ বস্তুর অর্থাৎ সমস্ত জন্য বস্তুর নিমিত্তকারণ অদৃষ্ট যাহা কিছু উৎপন্ন হয় সমস্তই অদৃষ্ট জন্য। অদৃষ্ট না থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। সর্ব্বমুক্তিও উৎপত্তিমতী এজন্য সর্ব্বমুক্তিরও নিমিত্তকারণ অদৃষ্ট মানিতে হইবে। যদি অদৃষ্ট মানা যায় তবে মুক্তিই হইতে পরিবে না কারণ আত্মার সমস্ত বিশেষ গুণের উচ্ছেদেই মুক্তি।

১৪। সত্যমনন্তা এবহি অপবৃক্তাঃ নতুসর্ব্বে, সম্প্রতি সংসারস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ। সোসাইটী মুদ্রিত কিরণাবলী পৃ: ৬৪।

১৫। নম্বু এতদেব নস্তাৎ ইত্যুচ্যতে ইতি চেৎ। সোসাইটী কিরণাবলী মুদ্রিত পৃ: ৬৪।

১৬। ন কালনিয়মে প্রমাণাভাবাৎ। কিরণাবলী পৃ: ৬৪।

১৭। নচ সর্ব্বোৎপত্তিমন্নিমিত্তাদৃষ্টানুৎপত্তৌ সর্ব্বমুক্তেরনুৎপত্তিঃ। কিরণাবলী পৃ: ৬৫।

মুক্তিদশাতে আত্মার কোনও বিশেষ গুণ থাকিতে পারে না, অদৃষ্ট আত্মার বিশেষগুণ এই বিশেষগুণ থাকিতে আত্মার মুক্তি হইতে পারে না।

আর যদি অদৃষ্ট না থাকে তবেও মুক্তি হইতে পারে না কারণ অদৃষ্ট জন্য মাত্রেরই কারণ, কারণ না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না। মুক্তি-জন্য বস্তু সুতরাং অদৃষ্টজন্য হইবে অদৃষ্ট না থাকিলে মুক্তি হইতে পারে না। প্রতিবাদিগণের অভিপ্রায় এই যে মুক্তির কারণ অদৃষ্ট থাকিলে বা না থাকিলে উভয় যাই মুক্তি হইতে পারে না।

এতদুত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন যে [১৮] না তাহা নহে মুক্তি অদৃষ্ট জন্য নহে। ভোগ ও ভোগের সাধনই অদৃষ্টজন্য হইয়া থাকে, মুক্তি ভোগ ও নহে ভোগের সাধনও নহে সুতরাং মুক্তি অদৃষ্টজন্য নহে। অদৃষ্টের নিবৃত্তিও যদি অন্য অদৃষ্ট সাপেক্ষ হইত তবে একটি জীবেরও মুক্তি হইতে পারিত না। সর্ব্বমুক্তি স্বীকার না করিলেও মুক্তি ত স্বীকার করেন তাহাও ত হইতে পারিবে না। অদৃষ্টের নিবৃত্তি না হইলে মুক্তি হইবে না আর এই অদৃষ্টের নিবৃত্তি ও অন্য অদৃষ্টজন্য সুতরাং জনক অদৃষ্ট থাকিতে হইবে। আর অদৃষ্ট থাকিতে মুক্তি হইবে না।

আচার্য্যের কথার উত্তরে প্রতিবাদিগণ বলিতেছেন মুক্তি অদৃষ্টজন্য নাইবা হইল কিন্তু তোমরা যে প্রদীপ সন্তুতির উচ্ছেদ দেখিয়া দুঃখ সন্ততির উচ্ছেদের অনুমান করিতেছ ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত, কারণ প্রদীপ-সন্ততি [১৯] সাদি অর্থাৎ আদিমৎবস্তু আর দুঃখসন্ততি অনাদি, আদিমৎবস্তুর উচ্ছেদ হয় বলিয়া যে অনাদি বস্তুরও উচ্ছেদ হইবে ইহা কোনও মতেই বলা যায় না বরং বিপরীতই বলা উচিত যেমন [২০] দুঃখসন্ততি অত্যন্ত উচ্ছিন্ন হইবে না যে হেতু তাহা অনাদি, যাহা অত্যন্ত উচ্ছিন্ন হয় তাহা সাদি যেমন এই প্রদীপসন্ততি এইরূপ বিপরীত অনুমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। সুতরাং অনাদি দুঃখসন্ততি চিরদিনই অনুবর্ত্তন করিবে।

প্রতিবাদিগণের এইরূপ আপত্তির উত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন যে সাদি বলিয়া প্রদীপসন্ততির উচ্ছেদ হয় আর অনাদি বলিয়া দুঃখসন্ততির উচ্ছেদ হইবে না একথা অসঙ্গত, যাঁহারা সর্ব্বমুক্তি স্বীকার করেন না তাঁহারা ত মুক্তি মানেন। একটি জীবের মুক্তি হইলেও ত তাহার অনাদি দুঃখসন্ততির উচ্ছেদ স্বীকার করিতেই হইবে, অনাদি সন্ততির উচ্ছেদ না

১৮। অপবর্গস্য ভোগতৎসাধনেতরত্বাৎ। নহি অদৃষ্টনিবৃত্তিঃ একস্যাপি অনপবর্গপ্রসঙ্গাৎ ইতি। কিরণাবলী পৃ: ৬৫।

১৯। স্যাদেতৎ আদিমতী প্রদীপসন্ততিনিবর্ত্ততে দুঃখসন্ততিস্তু অনাদিরিয়-মনুবর্ত্তিষ্যতে ইতি চেৎ। কিরণাবলী পৃ: ৬৬।

২০। দুঃখসন্ততির্নাত্যন্তমুচ্ছিদ্যতে অনাদিত্বাৎ যন্নৈবংতন্নৈবং যথৈতৎপ্রদীপ-

হইলে একটি জীবেরও মুক্তি হইতে পারিবে না। যদি বলা যায় অনাদি সন্ততির উচ্ছেদ হয় না বলিয়া কাহারও মুক্তি হইবে না এতদুত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন সাদিসন্ততির নিবৃত্তি হইবে অনাদি সন্ততির নিবৃত্তি হইবে না এরূপ বলা যায় না সাদিত্ব নিবন্ধন সন্তানের উচ্ছেদ হয় এরূপ নহে।[২১] সন্তানের মূলোচ্ছেদ নিবন্ধন সন্তানের উচ্ছেদ হয় সন্তানের মূলানুবৃত্তিতে সন্তানের অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। সাদিত্ব নিবন্ধনই যদি সন্তানের উচ্ছেদ হইত তবে সমস্ত সাদি সন্তানেরই এক সময় উচ্ছেদ হইয়া যাইত কিন্তু এরূপ দেখা যায় না।[২২] সাদি সন্তানেরও বিভিন্নকালে উচ্ছেদ দেখা যায়। কোনও প্রদীপ সন্ততি প্রহরমাত্র অনুবর্ত্তন করে আবার কোনও প্রদীপ সন্ততি অহোরাত্র অনুবর্ত্তন করে এইরূপ অনিয়ত সময়ে প্রদীপ সন্ততির উচ্ছেদ, প্রদীপ সন্ততির মূল তৈলাদির উচ্ছেদের অনিয়ম প্রযুক্তই হইয়া থাকে। সুতরাং দুঃখসন্ততি অনাদি হইলেও সন্ততির মূলোচ্ছেদ হইলে তাহার উচ্ছেদ হইবে। এই দুঃখসন্ততির মূল মিথ্যাজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান-বাসনা, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা এই দুঃখসন্ততির মূল উচ্ছিন্ন হইলে দুঃখসন্ততিরও উচ্ছেদ হইবে।

২১। ন মূলোচ্ছেদানুবৃত্ত্যোঃ প্রযোজকত্বাৎ। মূলোচ্ছেদাদ্ধি সন্ততেরুচ্ছেদঃ মূলানুবৃত্তৌ চানুবৃত্তিঃ। কিরণাবলী পৃঃ ৬৭-৬৮।

২২। অন্যথাত্বাদিমত্ত্বাবিশেষেঽপি কালানিয়মো ন স্যাৎ। কাচিৎ প্রদীপসন্ততিঃ প্রহরমনুবর্ত্ততে কাচিদহোরাত্রং ইত্যাদ্যনিয়মোহি তৈলাদিমূলোচ্ছেদাদ্যনিয়মপ্রযুক্ত ইতি-কিরণাবলী সোসাইটী মুদ্রিত পৃঃ ৬৮-৬৯।

সুখ ও দুঃখ

অধ্যাপক শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত, এম. এ।

"আমরা কি চাই? অথবা কি পাইলে আমাদের জীবন সার্থক [illegible]। মনে হয়?" এই প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ ব্যক্তিই বলিবেন, [illegible]মরা সুখ চাই, সুখলাভ করিতে পারিলেই আমরা জীবন সার্থক বলিয়া [illegible]। সাক্ষাৎ ভাবেই হউক অথবা পরোক্ষভাবেই হউক সুখের অন্বেষণেই আমরা ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছি। আপাতদৃষ্টিতে যেখানে বোধ হয় যে কোনও ব্যক্তি সুখ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তু লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে সেখানেও দেখা যাইবে যে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য সুখ-[illegible] ব্যতীত আর কিছুই নয়। উপাদেয় খাদ্য, বহুমূল্য পরিচ্ছদ, সুরম্য [illegible]ভবন, অর্থ, মান, যশ প্রভৃতি অন্য যাহা কিছু আমরা কামনা করিয়া থাকি সে সকলই এই সুখের জন্য, তাহারা সুখলাভের উপায় মাত্র। আমরা যে অনেক সময়ে বহু কষ্টসাধ্য কাজ করি বা স্বেচ্ছায় দুঃখভোগ করি তাহারও উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে অধিকতর সুখলাভ। বিষয়াসক্ত ভোগী, পর-হিতব্রতী কর্ম্মী, জ্ঞানপিপাসু বৈজ্ঞানিক, সংসারে অনাসক্ত সন্ন্যাসী সকলেরই আকাঙ্ক্ষা সুখলাভ, যদিও তাঁহাদের সকলের ঈপ্সিত সুখ এক-শ্রেণীর নয়, এবং সেই সুখ পাইবার পন্থাও বিভিন্ন। সুতরাং যিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন অথবা যিনি যে কার্য্যই করুন না কেন তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য কোনও না কোনও প্রকারের সুখলাভ। দুঃখের জন্য দুঃখকে কেহ চাহে না। যাহাতে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কেবলই দুঃখ পাওয়া যায় এরূপ কোনও কার্য্যে কখনও কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুখ পাইবার আশাতেই মানুষ বাঁচিয়া থাকে এবং কোনও না কোনও সময়ে কোনও না কোনও ভাবে সুখ পাওয়া যাইবে এই ভরসাতেই সকলে অনেক সময়ে বহু ক্লেশকর কার্য্য করিয়া থাকে।

সুখলাভই আমাদের জীবনের চরম কাম্য ইহা যে কেবলমাত্র সাধারণ প্রচলিত বিশ্বাস তাহাই নহে, বহু দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিও এই কথার পোষকতা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে আমাদের শারীরিক ও মানসিক গঠনই এইরূপ যে সুখ ভিন্ন অন্য কোনও বস্তুই আমাদের চরম কাম্য হইতে পারে না। কোনও বস্তু কামনা করা এবং তাহা হইতে কোনও না কোনও ভাবে সুখপ্রাপ্তির আশা করা একই ব্যাপারের দুইটি দিক মাত্র।* আবার অনেকে বলিয়া থাকেন যে যাহা সুখকর, তাহাই

---

*"Desiring a thing and finding it pleasant, aversion to it and thinking of it as painful are phenomena entirely inseparable or rather two parts of the same phenomenon." J. S. Mill's Utilitarianism

আমাদের জীবন ও বংশরক্ষার সহায়ক এবং যাহা ক্লেশকর তাহা জীবন ও বংশরক্ষার প্রতিকূল, সুতরাং মানবজাতি যে এখনও বাঁচিয়া আছে ইহাতেই বুঝা যায় যে আমরা জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক যাহা সুখকর তাহা পাইবার জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকি এবং যাহা ক্লেশকর তাহা পরিহার করিয়া থাকি। সকলেই যদি দুঃখ ক্লেশ বা মৃত্যু কামনা করিত তাহা হইলে বহুকাল পূর্ব্বেই মানবজাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইত। মানবজাতি অথবা সমগ্র প্রাণীজাতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই যেন প্রকৃতিদেবী বিধান করিয়াছেন যে প্রাণীমাত্রেই সকল সময়ে সুখের অন্বেষণ করিবে, ইহা জীবধর্ম্মেরই একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ।

সুখই যদি আমাদের একমাত্র ঈপ্সিত হয় এবং সুখের অভাবে যদি আমাদের জীবন ব্যর্থ হয় তাহা হইলে সাধারণবুদ্ধিতে ইহাই বলিয়া থাকে যে যত প্রকারে সম্ভব প্রভূততম সুখলাভের চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। সুখলাভ ও দুঃখপরিহার একই প্রচেষ্টার দুইটী দিক। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন যতদূর সম্ভব সুখলাভের চেষ্টা করিবেন সেই-রূপ সর্ব্বপ্রযত্নে দুঃখকেও পরিহার করিবার চেষ্টা করিবেন। আবার সুখই যদি আমাদের একমাত্র ঈপ্সিত হয় তাহা হইলে সেই সুখ যাহাতে স্থায়ী হয় তাহার জন্যই চেষ্টা করা উচিত। যাহাতে আপাততঃ সুখ পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু পরিণামে অধিকতর দুঃখ পাইতে হয় তাহা করা কখনই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উচিত নয়। যে সুখের সহিত দুঃখ বা ক্লেশ অল্পাধিক পরিমাণেও মিশ্রিত থাকে সেরূপ সুখ সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। কিন্তু সকলস্থলেই ইহা দেখা যায় যে সুখভোগের সঙ্গে সঙ্গে অথবা কিছুকাল পরেই আমাদের দুঃখও লাভ হইয়া থাকে। দুঃখলেশহীন চিরস্থায়ী সুখভোগ সাধারণতঃ আমাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু এইরূপ মিশ্র সুখ অথবা অস্থায়ী সুখ আমাদের পূর্ণ পরিতৃপ্তি দিতে পারে না। সুতরাং দুঃখকে মানবজীবন হইতে একেবারে পরিহার করিয়া কেবলমাত্র অমিশ্র নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব কিনা এবং হইলে কি উপায়ে সম্ভব এই প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। বিভিন্নদেশের ও বিভিন্নজাতির চিন্তাধারা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এই চিরন্তন সমস্যার চরম সমাধানের জন্য জিজ্ঞাসু মানবের মন বার বার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। পৃথিবীতে দুঃখ ক্লেশ বলিয়া কিছুই থাকিবে না, সকলেই সর্ব্বদা পরম সুখে কালযাপন করিবে এইরূপ একটা আদর্শ কি করিয়া বাস্তবে পরিণত করা যায় এই চিন্তা অনেক মণীষীকেই তাঁহাদের গভীর তম প্রেরণা দিয়াছে। কোনও সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিবিশেষের জীবনে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত অমিশ্র নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ ঘটিয়াছে কিনা তাহা অবশ্য নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কিন্তু আমাদের বিচার্য্য হইতেছে যে

কোনও সুচিন্তিত ও সুনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিলে এইরূপ সৌভাগ্য-লাভ সকলের পক্ষেই ঘটিতে পারে কি না। এই পদ্ধতি বা উপায়টী এরূপ হওয়া আবশ্যক যে তাহা প্রয়োগ করিলে আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি অবশ্য-ম্ভাবী। যে উপায়ের মধ্যে নিশ্চয়তা নাই সেরূপ উপায়ের কথা শুনিয়া আমাদের পূর্ণ সন্তোষ লাভ হইতে পারে না। প্রচুর অর্থলাভ করিলে সুখলাভ হইতে পারে আবার নাও হইতে পারে সুতরাং আমাদের চরম অভীষ্টলাভের পক্ষে প্রচুর অর্থলাভই যে যথার্থ উপায় একথা বলা চলে না। আবার এই উপায়টি সর্ব্বজন সাধ্য হওয়া চাই। সকলের পক্ষেই সুসাধ্য বা অল্পায়াসসাধ্য না হইলেও উহা সকলের পক্ষে অথবা অনেকের পক্ষে একেবারে সাধ্যাতীত হইলে চলিবে না। যদি বলা যায় যে কোনও বিশেষ দেশে বা বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই আমাদের চরম অভীষ্টলাভ হইতে পারে তাহা হইলে এইরূপ উপায় অবলম্বন করা কাহারও আপন সাধ্যায়ত্ত হইবে না। অথবা যদি বলা যায় যে অন্যের উপর সর্ব্বতোভাবে প্রভুত্ব করিতে পারিলেই আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইতে পারে তাহা হইলে এই উপায়টি সকলে অবলম্বন করিতে পারে না, কারণ একজন প্রভুত্ব করিলে অনেককেই তাহার অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। সকলেই একই সময়ে অন্য সকলের উপর সর্ব্বতোভাবে প্রভুত্ব করিবে ইহা অসম্ভব। অর্থাৎ যে উপায় অবলম্বন করিলে একের সুখ ও অন্যের দুঃখ অবশ্যম্ভাবী নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি কখনই তাহা সমর্থন করিতে পারে না।

ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও অমিশ্র, অবিচ্ছিন্ন, চিরস্থায়ী অথবা জীবন-ব্যাপী সুখলাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা কি এ প্রশ্নের অনেক প্রকার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটী উত্তর এই যে আমাদের দুঃখভোগের জন্য কিছু পরিমাণে প্রতিকূল অবস্থা বা ঘটনা দায়ী হইলেও অধিকাংশ স্থলেই ইহার কারণ আমরা নিজে, অর্থাৎ আমাদের যথেষ্ট উদ্যম এবং আত্মসংযমের অভাব এবং দুরাকাঙ্ক্ষা ও অবিবেচনার জন্যই আমরা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি এবং সুখের সন্ধান পাই না। সুতরাং প্রথমতঃ পর্য্য-বেক্ষণ ও ভূয়োদর্শন দ্বারা স্থির করিতে হইবে যে কোন্ কর্ম্মের ফলে কি পরিমাণ দুঃখ বা সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহার পর সেই অভিজ্ঞতাই আমাদের পথপ্রদর্শকের কার্য্য করিবে। আলস্য, উদ্যমহীনতা ও রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া সাময়িক উত্তেজনার বশে আপাত সুখকর কার্য্য করাই আমাদের দুঃখভোগের প্রধান কারণ। সুতরাং সুবিবেচনা, আত্মসংযম ও ও আলস্যহীনতাই আমাদের দুঃখপরিহারের বা সুখলাভের উপায়। ইহাই হইল সাধারণবিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উত্তর। এই উপায়টি সরল বা অনায়াসসাধ্য মোটেই নয়, তাহা হইলেও ইহা সকলেরই না হউক অধিকাংশ ব্যক্তিরই সাধ্যায়ত্ত বটে। একান্ত জড়বুদ্ধি অথবা বিকলাঙ্গ

ব্যতীত সকলেই এই উপায়ে সুখলাভের চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে এই উপায়ে আমাদের চরমলক্ষ্য লাভ হইতে পারে না। আমরা যতই সতর্ক, বুদ্ধিমান্, নিরলস ও উদ্যমশীল হইনা কেন জড়জগতের বিরোধী শক্তির সংঘর্ষে আসিয়া অনেকস্থলেই আমরা হতবুদ্ধি হইয়া যাই ও আমাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। প্রাকৃতিক উপদ্রব, রোগ, শোক, জরা প্রভৃতির হাত হইতে সকল স্থানে চিরকালের জন্য অব্যাহতি পাওয়া আমাদের সাধ্যাতীত। আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ। অনেক স্থলেই আমরা হয়ত জীবনযুদ্ধে একেবারে পরাজয় স্বীকার করিয়া অশেষ দুঃখভোগ করিয়া থাকি নহে ত যে সুখ আমরা ভোগ করিয়া থাকি তাহা অনেকাংশেই দুঃখমিশ্রিত। সুতরাং সুবিবেচনার সহিত উদ্যমশীল হইলেই যে আমরা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই অমিশ্র চিরস্থায়ী সুখের অধিকারী হইব তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ধর্ম্মই সুখলাভের একমাত্র উপায়, ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই সুখের অধিকারী। কিন্তু প্রকৃত অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এমতটিও সত্য বলিয়া মনে হয় না। অনেক ধর্ম্মভীরু ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি সংসারে নানাবিধ দুঃখ ও ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন। স্বাস্থ্য, অর্থ, যশ, প্রভাব, প্রতিপত্তি প্রভৃতির অভাব তাঁহাদের অনেকেরই মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকস্থলে এমন কি ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে যে ব্যক্তি যত অধিক ধার্ম্মিক তাঁহার দুঃখ ক্লেশও সেই পরিমাণ অধিক। এই সকল দেখিয়া কেহ কেহ একথাও বলিয়াছেন যে ধর্ম্ম সুখপ্রাপ্তির উপায় নহে, ধর্ম্ম নিজেই নিজের পুরস্কার। ("Virtue is its own reward") আবার কেহ কেহ বলেন যে ধর্ম্মের পুরস্কার বা ফল যে সুখ তাহা ইহজীবনে লভ্য নয়, তাহা পরলোকে বা জন্মান্তরে লভ্য। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা অধিকাংশ সময়েই দুঃখভোগ করিয়া থাকেন এবং অধার্ম্মিক ব্যক্তিরা সুখভোগ করিয়া থাকে এইরূপ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা মাত্র ইহজীবনের জন্য। কোনও এক অদৃশ্য শক্তির অমোঘ বিধানে পুণ্যের ফল সুখ এবং পাপের ফল দুঃখ সঞ্চিত হইয়া থাকে, এবং নিজ নিজ কর্ম্মের ফল সকলকেই পরলোকে কিংবা জন্মান্তরে ভোগ করিতে হয়। জার্ম্মাণ দার্শনিক Kant বলিয়াছেন যে ইহজীবনের এই দারুণ বৈষম্য আমাদের এত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় যে আমরা পুণ্য ও পাপের ফলদাতা এক সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হই এবং আমাদের এই দেহের ধ্বংসের সহিত যে আমাদের সব শেষ হইয়া যায় না ইহাও আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হয়। সুতরাং আপাততঃ অন্যরূপ মনে হইলেও যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে ইহজীবনে ধর্ম্মাচরণ করিয়া যাইবেন তিনিই যে [illegible] বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের বাণীতে যাঁহাদের অবিচলিত বিশ্বাস তাঁহারা এইরূপ কথায় যথেষ্ট সান্ত্বনালাভ করিয়া থাকেন এবং সংসারে অসীম দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াও নানাবিধ প্রলোভনের মধ্যে ধর্ম্মের পথ পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মের আশ্রয় লন না, কিন্তু যাঁহারা বিশ্বাসের উপরে যুক্তিকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকট এ মতটী বিশেষ সারবান্ বলিয়া মনে হয় না। কারণ পরলোক বা জন্মান্তর যে আছে তাহার কোনও অকাট্য প্রমাণ থাকা দূরে থাকুক, আধুনিক বিজ্ঞানে বিশ্বাস করিতে হইলে এই দুইটী সম্বন্ধেই গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হয়। আর যদিই বা পরলোক থাকে এবং পাপপুণ্যের ফলদাতা পরমকারুণিক ঈশ্বর কেহ থাকেন তাহা হইলে ইহজীবনেই ধার্ম্মিক ব্যক্তির সুখী এবং অধার্ম্মিক ব্যক্তির দুঃখী হইবার বাধা কি? ইহজীবনে আমরা যাহা অহরহঃ দেখিতেছি সেই ব্যবস্থাই যে পরলোকেও চলিবে না তাহার প্রমাণ কি? সুতরাং যাহা অদৃশ্য এবং অনিশ্চিত তাহার ভরসায় যাহা বর্ত্তমান ও সুনিশ্চিত তাহাকে উপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। যদি আমরা প্রত্যক্ষ করি যে যাহাকে আমরা সাধারণ ভাষায় অধর্ম্মাচরণ বলি সেইরূপ কার্য্য করিয়াই অনেক সময়ে সুখভোগ করা যায় তাহা হইলে পরলোকের বৃথা আশায় মুগ্ধ না হইয়া ইহজীবনেই যাহাতে যতদূর সম্ভব সুখলাভ করিতে পারা যায় তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। হয়ত সে সুখ চিরস্থায়ী হইবে না, হয়ত তাহাতে দুঃখ মিশ্রিত থাকিবে কিন্তু তাহা হইলেও ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পুণ্য ও পাপের একটা কাল্পনিক ভেদ খাড়া করিয়া নিশ্চিত সুখের ভরসা ত্যাগ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট সুখের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকি কেন? সুতরাং পরলোক ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দিহান তাঁহাদের উপদেশ এই যে জীবনের পথে চলিতে চলিতে যখন যেখানে যেভাবে হউক্ যতটুকু সুখ পাওয়া যায় তাহা লইয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। অমিশ্র চিরস্থায়ী সুখের কল্পনা মরীচিকা মাত্র, তাহার পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলে কোনও লাভ হইবে না, আত্মপ্রবঞ্চনাই সার হইবে।

এই সকল বিবেচনা করিয়া হয়ত আমাদের মনে হইতে পারে যে আমরা যে কোনও উপায়েই এইরূপ সুখলাভ করিবার চেষ্টা করি না কেন তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। কিন্তু মানবের বুদ্ধি কোনও সমস্যার সমাধান-কেই একেবারে অসম্ভব বলিয়া ছাড়িয়া দিতে চায় না। সুতরাং সমস্যাটিকে আরও তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। সুখ ও দুঃখ আমরা ভোগ করি কেন? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারিলে হয়ত আমাদের সমস্যার একটা সমাধান মিলিয়া যাইবে। বাহিরের কোনও পদার্থ বা শক্তি আমার ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে আমাকে অর্থাৎ আমার মনকে কখনও একভাবে কখনও অন্যভাবে নাড়া দিয়া থাকে, এবং তাহাতেই আমি কখনও সুখ কখনও বা দুঃখভোগ করিয়া থাকি। আমার

সুখ বা দুঃখের অনুভূতি কেবলমাত্র যে বহির্জ্জগতের পদার্থ বা শক্তি-বিশেষের স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে এমন নয় তাহা কতকাংশে আমার মনের প্রকৃতি বা অবস্থার উপরেও নির্ভর করিয়া থকে। আমি যদি বহুকাল উৎকৃষ্ট খাদ্যে অভ্যস্ত হই তাহা হইলে একদিন অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট খাদ্য পাইলে আমার ক্লেশ হইতে পারে, কিন্তু বহুকাল অনশন বা অর্দ্ধাশনের পর সেই খাদ্যই আমার কাছে অতি উপাদেয় বলিয়া মনে হয়। উৎসব ও আনন্দের দিনে যে ব্যঙ্গোক্তিকে সহাস্যে অবহেলা করি, দৈন্য ও দুর্দ্দশার সময়ে সেই একই ব্যঙ্গোক্তি আমার মনে কশাঘাত করিয়া থাকে। সুতরাং কোনও উপায়ে যদি মনের অবস্থা এইরূপ করা যাইতে পারে যে বহির্জ্জগতের কোনও পদার্থ বা শক্তিই মনকে আঘাত করিতে সক্ষম না হয় তাহা হইলেই দুঃখের হাত হইতে সম্পূর্ণভাবে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। চেষ্টা ও অভ্যাস দ্বারা এরূপ করা যে কতকাংশে সম্ভব তাহা ত আমাদের প্রত্যহের অভিজ্ঞতাতেই পাইয়া থাকি। কিন্তু যদি কোন উপায়ে মনের বেদনা পাইবার শক্তিটাই একেবারে লোপ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে বাহিরে যাহা কিছুই ঘটুক না কেন তাহা আমার দুঃখের বা অশান্তির কারণ হইবে না। কিন্তু মনের যে অবস্থা ঘটিলে দুঃখের অনুভূতি হওয়া অসম্ভব হয় তাহাতে সুখের অনুভূতি হওয়াও অসম্ভব হইবে. সুখ ও দুঃখের অনুভূতি আমাদের অভিজ্ঞতায় এরূপভাবে পরস্পরের সহিত জড়িত থাকে যে একটির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইলে অপরটির প্রতিও সম্পূর্ণভাবে উদাসীন হইতে হইবে। মনের অনুভূতির ক্ষমতার বিলোপ সাধন করিয়া যদি দুঃখকে রোধ করিতে হয় তাহা হইলে সেই সঙ্গে সুখ-কর বস্তুর সুখ উৎপাদনের সম্ভাবনাও আর থাকিবে না। ফলতঃ কেবল-মাত্র সুখকেই বাছিয়া লইব এবং দুঃখকে পরিহার করিব এই উপায়ে তাহা সম্ভব হয় না। ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তি করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে সুখলাভের আশাও পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহা হইলেও যখন দেখা যাইতেছে যে সুখমাত্রই অনিত্য, অনিশ্চিত, দুঃখের সহিত মিশ্রিত ও পরবর্ত্তী দুঃখের কারণ তখন এইরূপ সুখলাভ না হইলেও বাস্তবিক কোনও ক্ষতি নাই। অতএব শিক্ষা, সংযম, অভ্যাস অথবা অন্য যে কোনও উপায়ে যদি মনে সুখদুঃখের অনুভূতি হইবার সম্ভাবনা লোপ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেই দুঃখমিশ্রিত সুখ এবং বিশুদ্ধ দুঃখ এই উভয়ের হাত হইতেই চরম নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে ও দর্শনে অনেক স্থলে এই ভাবেই সুখলাভের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীসে Stoic দের উপদেশের মধ্যেও এই ভাবের কথা পাওয়া যায়। দুঃখ-ভোগের মূল কারণ আমাদের বাসনা বা বিষয়াসক্তি। বাহ্যবিষয়ের সহিত

সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের মনে যে ভোগ করিবার বাসনা বা প্রবৃত্তি উপস্থিত হয় ও আমাদিগকে নানারূপ কার্য্যে প্ররোচিত করে তাহাই আমাদের দুঃখভোগের একমাত্র কারণ। এই বাসনা বা প্রবৃত্তির যদি উচ্ছেদ সাধন করা যায় তাহা হইলে দুঃখভোগের আশঙ্কাও একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। এই কথাটাই একসময়ে ভারতে নানাভাবে প্রচার করা হইয়াছিল এবং ইহাকে একটা সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। আমরা দুঃখভোগ করি কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনেই বলা হইয়াছে যে অজ্ঞান বা অবিদ্যাই এই দুঃখভোগের মূল কারণ। আমাদের আত্মা মূলতঃ নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার। বিষয়াসক্তি ও তজ্জন্য সুখদুঃখাদিভোগ সমস্তই দেহ, মন অথবা বুদ্ধিতে ঘটিয়া থাকে। আমরা অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশতঃ আত্মা ও অনাত্মার (অর্থাৎ দেহ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির) প্রভেদ ভুলিয়া একের ধর্ম্ম অন্যেতে আরোপ করিয়া থাকি, অর্থাৎ আমিই দেহ, মন বা বুদ্ধি অতএব দেহ মন বা বুদ্ধির সুখদুঃখ আমারই সুখদুঃখ এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যার নাশ হইলেই দেহ বা মনে যে সুখ দুঃখ বাসনা প্রবৃত্তি প্রভৃতি হইয়া থাকে তাহাদিগকে আর আপনার বলিয়া মনে হয় না, সুতরাং দুঃখ বা সুখভোগের পরিসমাপ্তি ঘটিয়া থাকে। কেবলমাত্র মনকে বশ করিয়া নয় পরন্তু মনকে অনাত্মা জ্ঞান করিয়া উহা হইতে সম্পূর্ণভাবে আপনাকে (আত্মাকে) বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে পারিলেই বাসনা বা প্রবৃত্তি সমূহের সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ ঘটিতে পারে এবং তাহা হইলেই সুখদুঃখবোধেরও সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। আত্মার এই অবস্থা-কেই বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে মুক্তি, কৈবল্য, অপবর্গ ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই অবস্থাতে যেমন দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ ঘটে তেমনই তাহার সঙ্গে সুখানুভূতিরও লোপ হইয়া থাকে।

আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে চরম ভেদবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এই যে দার্শনিক মত ইহা সম্পূর্ণ বিচারসহ কিনা এখানে সে আলোচনা না করিয়াও এই মতের বিরুদ্ধে যে গুরুতর আপত্তি উঠিতে পারে সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। সম্পূর্ণভাবে সুখদুঃখবিনির্ম্মুক্ত এই যে আত্মার অবস্থার কথা বলা হইয়াছে তাহা সম্ভব হইলেও বাঞ্ছনীয় কিনা? এইরূপ অবস্থার সহিত একটি শিলাখণ্ডের অবস্থার প্রভেদ কি? শিলাখণ্ডে দুঃখ, ক্লেশ বা শোকের অনুভূতি হওয়া অসম্ভব। সুতরাং বলিতে হইবে যে যে অবস্থা প্রাপ্তির জন্য শাস্ত্র ও দর্শনে নানাবিধ বিচারের অবতারণা করা হইয়াছে ও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সে অবস্থা ত শিলাখণ্ডে চিরকালই বর্ত্তমান আছে। সুতরাং শিলাত্বপ্রাপ্তি হইলেই কি মনুষ্যজীবনকে সার্থক বলিয়া মনে করিতে হইবে? এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে

শিলাখণ্ড অচেতন কিন্তু মানব চৈতন্যধর্ম্মবিশিষ্ট। সুতরাং মানব যখন সুখদুঃখবিনির্ম্মুক্ত অবস্থা লাভ করে তখনও তাহাতে চৈতন্য থাকে এবং তজ্জন্য আত্মা যে অসীম, দেশকাল সুখদুঃখের অতীত এইরূপ বোধ তখন বর্ত্তমান থাকে এবং যে অবস্থাতে এই বোধ বর্ত্তমান থাকে সেই অবস্থা শিলাখণ্ডের অবস্থা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন উঠিবে—কেন বাঞ্ছনীয়? যে অসীমতাবোধের সহিত সুখানুভূতির সম্পর্কমাত্র নাই তাহা আমাদের প্রার্থনীয় কি করিয়া হইতে পারে? আমরা দুঃখেরপরিসমাপ্তি কামনা করি বটে কিন্তু তাহা সুখের জন্যই। অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকিয়া ভোগ্যবস্তু ভোগ করাতেই সুখ আছে এবং অধিকাংশ সময়েই আমরা সেই সুখভোগ করিয়া থাকি। প্রতিকূল অবস্থা বা ঘটনা মাঝে মাঝে দুঃখের উদ্রেক করিয়া সেই সুখভোগে বাধা দেয় মাত্র। দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটিলে অর্থাৎ দুঃখের কারণ নিবারিত হইলে আমরা নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করিতে পারিব এই আশাতেই আমরা দুঃখনিবৃত্তির বাসনা করিয়া থাকি। এই রূপরসগন্ধপূর্ণ মৃত্তিকাময় ধরণীর প্রতি ধূলিকণার সহিত অচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িত যে "আমি", সুখদুঃখের আন্দোলনে আন্দোলিত, বিচিত্র আশা ও আকাঙ্ক্ষার লীলাভূমি যে "আমি", সেই "আমি"র সহিতই আমাদের চির জীবনের পরিচয়। এই "আমি" যাহাতে চরম পরিতৃপ্তি পায় অর্থাৎ যাহাতে ইহার সর্ব্বপ্রকারে সুখলাভ হয় তাহাই আমাদের একান্ত কামনার বিষয়। আর "অসঙ্গ", "নিষ্কল", "নিষ্ক্রিয়", "নির্ব্বিকার" বলিয়া যে আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা আমাদের নিতান্তই অপরিচিত। সহস্রবার "বৈরাগ্যশতক" বা "আত্মতত্ত্ববিবেক" শুনিলেও তাহাকে আপন বলিয়া মনে করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং এই অনাত্মীয় (?) আত্মাকে লাভ করিবার জন্য আমাদের এই একান্ত পরিচিত আত্মার সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইতে হইবে এবং তৎসঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সুখভোগের আশা ত্যাগ করিতে হইবে এরূপ নির্দ্দেশ আমাদের মনে কোনও রূপ উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারে না।

সকল আসক্তি উচ্ছেদ করিয়া সুখ ও দুঃখ উভয়কেই ত্যাগ করিতে হইবে এইরূপ মতের বিরুদ্ধে যে আপত্তি তাহা কেবল বর্ত্তমানশিক্ষাভিমানী ব্যক্তির মুখেই যে শুনা যায় এমন নহে প্রাচীনকালেও যে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ আছে। যেমন, বৈরাগ্যধর্ম্মের সমালোচনা করিয়া কেহ বলিতেছেন, "যদি সুখ দুঃখমিশ্রিতই দেখা যায় বলিয়া সুখেও বৈরাগ্য হইবে তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—সুখের অনুষঙ্গবশতঃ দুঃখেও অনুরাগ কেন হয় না? সেই কারণে সুখ পাইতে হইলে দুঃখ পরিহারে প্রযত্ন করিতে হয় এবং সেই দুঃখ অবর্জ্জনীয় বলিয়া উপস্থাপিত হইলেও তাহার পরিহারপূর্ব্বক সুখমাত্র ভোগ করা যাইবে।

যেমন মৎস্যার্থী ব্যক্তি শল্ক এবং কণ্টকের সহিত মৎস্য ধরিয়া যাহা গ্রহণ যোগ্য তাহারই গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত হয়, অথবা ধান্যার্থী ব্যক্তি পলালাদি-সহ ধান্য আহরণ করে এবং যাহা গ্রহণযোগ্য তাহাই গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত হয় ইহাও তদ্রূপ। সেই হেতু দুঃখের ভয়ে অনুকূলবেদনীয় ঐহিক ও পারত্রিক সুখকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। মৃগ আছে বলিয়া কেহ ধান্য বপন করে না, তাহা নহে। ভিক্ষুক আছে বলিয়া কেহ যে রন্ধন করে না তাহা নহে।" অর্থাৎ দুঃখের সহিত মিশ্রিত বলিয়া সুখকেও পরিত্যাগ করা নির্ব্বোধের কার্য্য হইবে। ন্যায়শাস্ত্রকারের মুক্তিবাদের সমালোচনাসূত্রে তাঁহার নাম লইয়া যে ব্যঙ্গোক্তি * করা হইয়াছিল তাহাও সুবিদিত। বস্তুতঃ যেহেতু জগতে দুঃখের অস্তিত্ব আছে এবং জীবনধারণ করিতে গেলে অথবা সুখভোগ করিতে গেলে মাঝে মাঝে দুঃখ ক্লেশ পাইতে হয় অতএব সুখ ও দুঃখ উভয়ই ত্যাগ করিয়া জীবনের গতিরোধ করিয়া ফেলিতে হইবে এরূপ উপদেশ কোনও সুস্থ বলিষ্ঠ মনই অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারে না।

এইবার বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক মানব এই প্রশ্নের কি উত্তর দিয়া থাকেন দেখা যাউক। সুখই যে মানবের চরম কাম্য সে বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মনে কোনও সন্দেহ নাই। মানুষের পক্ষে তাহার ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের ইচ্ছা করা অন্যায় নহে এবং এই ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া একান্ত অসম্ভবও নহে। এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে প্রধানতঃ দুইটি জিনিষের প্রয়োজন। প্রথম, মনুষ্যজীবনের সকলক্ষেত্রে যথাযথভাবে বিজ্ঞানের প্রয়োগ এবং দ্বিতীয়, সমগ্র মানবসমাজের সমষ্টিগত চেষ্টা। আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন মনকে সর্ব্বতোভাবে কুসংস্কার ও গতানুগতিক চিন্তার জড়তা হইতে মুক্ত করা। কুসংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়া জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে যথার্থ জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে। এ জ্ঞান তথাকথিত তত্ত্ববিদ্যা বা জগতের আদি কারণের জ্ঞান নহে। আমাদের সম্মুখে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে কোনও অদৃশ্য শক্তি বা অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে কিনা বা থাকিলে তাহার প্রকৃতি কিরূপ এ সকল আলোচনার সহিত আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোনও সম্পর্ক নাই এবং সেইজন্যই তাহারা নিরর্থক। যে জগতের সহিত প্রত্যহ আমাদের সংস্পর্শে আসিতে হয় সেই জগৎ

---

* "মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে মহামুনিঃ।
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিত্থ তথৈব সঃ॥"

সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞানলাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান উপায়। পর্য্যবেক্ষণ, ভূয়োদর্শন ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা লব্ধ সুসংবদ্ধ জ্ঞানই আমাদের প্রয়োজন। এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই বাহ্যজগতের উপর আমাদের প্রভুত্ব জন্মে। জগৎ হইতে আপনাকে অপসারণ করিয়া নয় পরন্তু জগতের উপর সম্পূর্ণভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস যে ইহা করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে, প্রয়োজন শুধু সকলের সমবেত চেষ্টা। বিজ্ঞান আজ যে স্তরে উপনীত হইয়াছে তাহাতে ইহা জোর করিয়াই বলা যায় যে অন্ন বস্ত্র ও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনও জিনিষই প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব। সুতরাং এই সকল বস্তুর অভাবে কাহারও দুঃখ পাওয়া অবশ্য-ম্ভাবী নয়। সকল প্রকার ব্যাধির ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যে হইতে পারে সে আশ্বাস আধুনিক বিজ্ঞান আমা-দিগকে দিবার স্পর্দ্ধা রাখে। এমন কি জরা ও মৃত্যু—অন্ততঃ অকাল-মৃত্যুর কবল হইতেও রক্ষা পাইবার বৈজ্ঞানিক উপায় যে একদিন না এক দিন আবিষ্কৃত হইবেই এমন ভরসাও বিজ্ঞান আমাদিগকে দিয়া থাকে। বস্তুতঃ জড়-জগতের উপর মানুষের আধিপত্য কতদূর বিস্তারলাভ করিতে পারে তাহার সীমারেখা আজ পর্য্যন্ত টানা সম্ভব হয় নাই। মানুষের যে ক্ষমতাকে এককালে সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে করা গিয়াছিল আজ চাক্ষুষ প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়া দেওয়া হইতেছে যে তাহাকে কোনও সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না। মানুষের উদ্যম, উদ্ভাবনীশক্তি ও ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞান তাহাকে তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিকে ক্রমাগত আগাইয়া লইয়া যাইতেছে। সুতরাং সকল প্রকার দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বিজ্ঞানের শরণ লও, ইহাই বর্ত্তমান যুগসভ্যতার বাণী। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য চালাইয়া যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন কর। বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা যে সকল ব্যাধির আজ পর্য্যন্ত ঔষধ বা প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয় নাই তাহাদের নিবারণ করিবার চেষ্টা কর। সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা অনাবশ্যক মনুষ্যসংখ্যাবৃদ্ধি বন্ধ করিয়া দাও। সৌজাত্যবিদ্যার সাহায্যে যাহাতে বিকলাঙ্গ, অপরিপুষ্ট, দুর্ব্বল বা জড়বুদ্ধি সন্তান না জন্মায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখ। কৃত্রিম ভেদবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দোষে যদি কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষ কোনও সুখ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সমাজের ও রাষ্ট্রের আমূল পুনর্গঠন কর। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে তাহার শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী সুশিক্ষা পাইয়া কর্ম্মক্ষম ও উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা কর। তাহা হইলেই মানুষের উদ্দেশ্যসিদ্ধি অর্থাৎ অমিশ্র নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ আর অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে না।

ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যাহা অসম্ভব বা দুঃসাধ্য সমবেত মানবজাতির সুনিয়ন্ত্রিত চেষ্টার ফলে তাহাই সুসাধ্য। সুতরাং সমগ্র মানবজাতির নিরলস চেষ্টার ফলে একদিন না একদিন প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সকল-প্রকার দুঃখনিবৃত্তি ও সুখলাভ হইবেই এরূপ আশা করা যায়। কাল হউক, কয়েক বৎসর বা কয়েক শতাব্দী পরেই হউক এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন দুঃখ ক্লেশ বলিয়া কোনও বস্তুই পৃথিবীতে থাকিবে না, এবং ইহা বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে হওয়াই সম্ভব।

বৈজ্ঞানিকের এই উক্তিতে আমরা খানিকটা আশ্বস্ত হই সত্য, কিন্তু এখানেও প্রশ্ন উঠে এবং সে প্রশ্নের সমাধান সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সকলপ্রকার অভাবরহিত, দৈন্যব্যাধিমুক্ত সম্পূর্ণ সুখী মানব সমাজের যে চিত্র বৈজ্ঞানিক আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেন তাহা হইতেছে সুদূর ভবিষ্যতের। সুষ্ঠুভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমাদের সমগ্র জীবন পরিচালিত হইলে হয়ত ভবিষ্যতে কখনও মানবসমাজের সে সুদিন আসিতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমানে এবং অদূর ভবিষ্যতে যে অসংখ্য নরনারী অবশ্যম্ভাবী দুর্ব্বহ দুঃখের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে তাহারা ইহাতে কী সান্ত্বনা অনুভব করিবে? অনির্দ্দিষ্ট সুদূর ভবিষ্যতে মানবসমাজ সম্পূর্ণতা লাভ করিবে এই সম্ভাবনার কল্পনায় যে সুখ তাহা আমাদের বর্ত্তমান দুঃখ দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আরও বিবেচনা করিবার কথা এই যে ভবিষ্যতে আমাদের ঈপ্সিত এই অবস্থা যে আসিবেই তাহারও কোনও নিশ্চয়তা নাই। কারণ বিজ্ঞানের উন্নতি একদিকে যেরূপ কতকগুলি দুঃখ ও অভাব দূর করিতেছে তেমনই আবার প্রত্যহ নূতন নূতন দুঃখ ও অভাব সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহিত সমগ্রভাবে মানুষের সুখও যে বাড়িয়াছে বা ভবিষ্যতে অবশ্যই বাড়িবে এরূপ কোনও নিশ্চয়তা নাই।

তাহা হইলে কি আমরা ইহাই সিদ্ধান্ত করিব যে মানুষের যাহা চরম কাম্য * তাহা তাহার পাইবার কোনও উপায়ই নাই? অর্থাৎ মনুষ্য জীবন সম্পূর্ণভাবে সার্থক করা অসম্ভব? এ যাবৎ এই প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে তাহাদের কোনওটি সম্পূর্ণ সন্তোষ-জনক নহে। এক্ষণে অন্য কোনও পথে এই প্রশ্নের উত্তর মিলে কিনা দেখিবার চেষ্টা করা যাক্। ইহা করিতে হইলে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে

* 'কাম্য' কথাটির দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে—(১) আমরা যাহা কামনা করি এবং (২) আমাদের যাহা কামনা করা উচিত। এখানে প্রথম অর্থেই 'কাম্য' ব্যবহার করা হইল।

বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই যে বলা হইয়াছে আমরা সকলে সুখ কামনা করি প্রথমতঃ ইহা সত্য কিনা এবং সত্য হইলে কি অর্থে সত্য? বিচার করিয়া যদি ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে আমরা যাহা ঐকান্তিকভাবে কামনা করি তাহা অমিশ্র নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ নহে, অন্য কিছু, তাহা হইলে এইরূপ সুখলাভ যে আমাদের হইতে পারে না তাহা জানিতে পারিলেও আমাদের জীবনকে ব্যর্থ বলিয়া মনে করিবার কারণ নাও থাকিতে পারে।

আমাদের কামনার চরম লক্ষ্য কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে যখন বলি যে আমরা সুখ কামনা করি তখন একথার একমাত্র অর্থ এই যে সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় আমরা যে কোনও কার্য্য সচেতনভাবে করি তাহার উদ্দেশ্য বর্ত্তমানে অথবা ভবিষ্যতে সুখভোগ। যদি এরূপ কোনও বস্তু থাকে যাহাকে তাহার নিজের জন্যই কামনা করি তাহা সুখ ভিন্ন আর কিছু নয়। সুখই একমাত্র উপেয় আর যাহা কিছু কামনা করি তাহা ইহার উপায় মাত্র। এই কথাটী অনেক সময়ে স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মতই মনে হইয়া থাকে বটে, কিন্তু একটু ধীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। ইহা শুনিলে কাহারও কাহারও মনে হয়ত বিস্ময়ের উদ্রেক হইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে আমরা যাহা চাই তাহা ত আমাদের নিকটে খুবই স্পষ্ট, সে বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন কি? কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে আমরা বাস্তবিকই কি চাই তাহা আমরা নিজেরাই অনেকস্থলে জানি না। সুতরাং আমাদের সমস্ত কামনার চরম লক্ষ্য কি সে সম্বন্ধে মতভেদ হওয়া অসম্ভব নয়।

"সুখ" বলিতে কি বুঝায়? সুখের কোনও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়। যে কখনও সুখ অনুভব করে নাই তাহাকে সুখ কি ইহা বুঝান যাইবে না। এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে সুখ একপ্রকার অনুভূতি। সুখাদ্য ভোজনে, সুন্দরবস্তু দর্শনে, সুমিষ্ট সঙ্গীত শ্রবণে মনে যে ভাবের উদ্রেক হয় তাহাই সুখ। এই সুখই যদি আমাদের একমাত্র কাম্য হয় তাহা হইলে যে সকল বস্তু বা বিষয় আমাদের মনে সুখানুভূতির উদ্রেক করিয়া থাকে তাহারা নিমিত্তমাত্র, অর্থাৎ তাহাদের নিজস্ব কোনও মূল্যই নাই। সুখকরবস্তু সমূহ বিভিন্নভাবে আমাদের মনে অনুভূতির উদ্রেক করিয়া থাকে এবং এই সকল অনুভূতির মধ্যে নানাপ্রকার তারতম্যও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহা সাধারণ অর্থাৎ যে মানসিক অবস্থাটি এইরূপ সমস্ত অনুভূতিতেই বর্ত্তমান তাহাই সুখ। রসনাপ্রিয় সুখাদ্য ভোজন করিয়া আমাদের মনে যে অনুভূতি হইয়া থাকে এবং কোনও সরস কবিতাপাঠ করিয়া যে অনুভূতি হইয়া থাকে তাহার মধ্যে

গুণগত তারতম্য থাকিলেও মনের একটা তৃপ্তি, আরাম বা স্বচ্ছন্দতার অনুভূতি এই দুইয়েতেই সমানভাবে বর্ত্তমান- যাহা বৃশ্চিকদংশনজনিত বেদনা বা বন্ধুবিচ্ছেদজনিত কাতরতার মধ্যে বর্ত্তমান নাই, এবং ইহাই সুখ।

এক্ষণে দেখা যাউক "আমরা সকল সময়ে সুখ চাই" এই উক্তি সত্য কিনা? উপরে সুখের যে অর্থ দেওয়া হইল এবং যে অর্থে ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই অর্থে যদি সুখই আমাদের একমাত্র কাম্য বা ঈপ্সিত হয় তাহা হইলে যে সুখ পরিমাণে যত অধিক তাহাই আমাদের প্রবলতর কামনার বিষয় হইবে। অর্থাৎ দুইটি সুখের সম্ভাবনা যদি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকে এবং এই দুইটিকেই একত্রে পাইবার কোনও উপায় না থাকে তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যেটি পরিমাণে অধিক তর তাহাই স্বভাবতঃ সেক্ষেত্রে আমাদের কামনার বিষয় বা লক্ষ্য হইবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল সময়ে এরূপ ঘটে না। অর্থাৎ অনেক সময়েই আমরা যে সুখের পরিমাণ অধিক তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যাহা অপেক্ষাকৃত অল্প তাহাই কামনা করিয়া থাকি। কেন এরূপ করি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে সাধারণতঃ দুই স্থলে আমরা এইরূপ করিয়া থাকি। প্রথমতঃ আমরা যখন বিচার করিয়া দেখি যে কোনও একটা বস্তুলাভ করিলে অথবা কোনও একটি কার্য্যকরিলে বর্ত্তমানে যে সুখ উৎপন্ন হয় তাহা পরিমাণে অধিক হইলেও ভবিষ্যতে তাহা হইতে সুখ অপেক্ষা দুঃখের সম্ভাবনাই অধিক তখন সেইরূপ আপাতমধুর সুখকে উপেক্ষা করিয়া আমরা যাহা হইতে বর্ত্তমানে হয়ত কিছু কম সুখ হয় কিন্তু ভবিষ্যতে অধিকতর সুখ উৎপন্ন হইতে পারে এইরূপ বস্তু লাভ করিবার বা এইরূপ কার্য্য করিবার কামনা করিয়া থাকি। এক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের মূলনিয়মের বাস্তবিক কোনও ব্যতিক্রম হইল না। কারণ বর্ত্তমানে অল্প পরিমাণ সুখ কামনা করিলেও বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই দুই মিলাইয়া আমরা মোটের উপর যাহাতে সুখের পরিমাণ বেশী হয় তাহাই কামনা করিয়া থাকি। দ্বিতীয়তঃ অনেক সময়ে আমরা বর্ত্তমানকালে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত যে সুখ তাহা পরিমাণে অল্প হইলেও এবং ভবিষ্যতে তাহা হইতে প্রভূত দুঃখের সম্ভাবনা আছে জানিয়াও অন্য অনাগত অধিকতর সুখকে উপেক্ষা করিয়া তাহাই কামনা করিয়া থাকি। এখানে এই ব্যাপারটিই আমাদের বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। একজন কলহপ্রিয় ব্যক্তি কোনও তুচ্ছ বিষয় লইয়া কলহ করিয়া যে সুখ বা মানসিক আরাম পায় তাহার পরিমাণ সামান্য হইলেও সে অন্য কোনও সম্ভাবিত অধিকতর সুখ অপেক্ষা এই সুখটিকেই কামনা করিয়া থাকে। কলহজনিত সুখের পরিমাণ যে বেশী নয় এবং অন্য উপায়ে যে অধিকতর সুখ পাওয়া যাইতে

পারে সুস্থচিত্তে চিন্তা করিলে হয়ত সেইব্যক্তি নিজের স্বীকার করিবে কিন্তু কলহের সামান্য কারণ উপস্থিত হইলেই সে একথা বিস্মৃত হইয়া কলহে প্রবৃত্ত হয়। ভবিষ্যতে অধিকতর সুখপ্রাপ্তির আশাতেই যে সে এইরূপ করিয়া থাকে ইহা বলাও সকলক্ষেত্রে সঙ্গত হইবে না। যে ব্যক্তি কলহ করিয়াই সুখ পায় তাহার মস্তিস্কে ভবিষ্যতের চিন্তা অধিকাংশ সময়েই থাকে না অথবা অনেক সময়েই কলহে তাহার আপনারই ক্ষতি ও দুঃখ হইবে ইহা স্পষ্টতঃ জানিয়াও সে কলহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সুখই যদি সকলক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র কাম্য হইত তাহা হইলে ইহা কিরূপে সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে হয়ত কেহ বলিবেন যে কলহজনিত সুখ পরিমাণে অল্প হইলেও ইহা সম্মুখে উপস্থিত, নিশ্চিত এবং সেই হেতু তীব্রতায় অধিক, এবং সেইজন্যই অনাগত সুখ বা দুঃখের কথা চিন্তা না করিয়াই সে ব্যক্তি এই সুখের জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। কিন্তু এই উত্তরও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হইবে না। কারণ সে যখন কলহে মত্ত তখন তাহাকে অতি সুস্বাদু খাদ্য বা পানীয়ের লোভ দেখাইলেও সে কলহ হইতে নিবৃত্ত হইবে না অর্থাৎ অধিকতর সুখপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে এখনই তাহার আয়ত্তের মধ্যে থাকিলেও সে কলহজনিত সুখ পরিত্যাগ করিয়া অন্যবিধ সুখলাভের কামনা করিবে না। আর একটি উত্তর এই হইতে পারে যে কলহের কারণ উপস্থিত হইলে তাহার আর বিচার করিবার সামর্থ্য থাকে না, তাহার মনে যে ক্ষণস্থায়ী মূঢ়তা উৎপন্ন হয় সেইজন্যই সে অধিকতর সুখের সম্ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া অল্প সুখের জন্য লোলুপ হইয়া উঠে। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন উঠিবে—কেন এরূপ হয়? কোনও একটি বিশেষ বস্তু বা বিষয়ের সংস্পর্শে আসিলে আমাদের মনে এইরূপ ক্ষণিক মূঢ়তা উৎপন্ন হয় কেন? এই প্রশ্নের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত উত্তর হইতেছে যে সেই বস্তু বা বিষয়টির নিজেরই এমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে তাহা পাইবার জন্য আমাদের মনে এক দুর্নিবার কামনা উপস্থিত হয়। কলহপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে কলহেরই একটা মূল্য আছে। তেমনই ক্রীড়ানুরক্ত ব্যক্তির পক্ষে ক্রীড়ায় জয়লাভেরই একটা আকর্ষণ আছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে সকলক্ষেত্রে কেবলমাত্র সুখই আমরা কামনা করিয়া থাকি একথা সত্য নয়।

এইবার আর একটি দিক হইতে এই বিষয়টির আলোচনা করা যাক। আমরা সকলেই স্বীকার করি যে যে সকল সুখ আমরা উপভোগ করি তাহাদের মধ্যে যেমন পরিমাণগত তারতম্য আছে তেমনই গুণগত অথবা শ্রেণীগত তারতম্যও আছে। অর্থাৎ একটি সুখ আরেকটি সুখের অপেক্ষা যেমন তীব্রতা, প্রগাঢ়তা, স্থায়িত্ব অথবা পরিমাণে অধিকতর হইতে পারে তেমনই একটি আরেকটির অপেক্ষা গুণ হিসাবে উৎকৃষ্ট অর্থাৎ উচ্চতর

শ্রেণীর হইতে পারে। অল্প পরিমাণে সুখাদ্য ভোজন করিয়া যে সুখ পাওয়া যায় অধিক পরিমাণে সুখাদ্যভোজন করিলে রসনাসুখের পরিমাণও অধিক হইবে। বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অথবা দ্রুতগামী যানে আরোহণ করিয়া যে সুখ পাই সেই সুখ তীব্রতর হইয়া দেখা দেয় যখন আমার দরিদ্র প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের সহিত আমার সৌভাগ্যের তুলনা করি। সুরম্য অট্টালিকায় একমাস বাস করিলে যে সুখ পাই তাহাতে একবৎসর বাস করিলে আমার সুখ আরও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। কিন্তু সুখাদ্যভোজনজনিত রসনাসুখ আর উচ্চাঙ্গের সাহিত্যচর্চ্চাজনিত সুখ এই দুইয়ের পার্থক্য অন্যরকমের। ইহা গুণগত বা শ্রেণীগত পার্থক্য। দ্বিতীয়টি প্রথমটির অপেক্ষা উচ্চস্তরের সুখ। এই শ্রেণীগত পার্থক্য অবশ্য সকল সময়ে সকলের কাছে ধরা নাও পড়িতে পারে, কিন্তু এই পার্থক্য যে আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাও সত্য যে যাঁহাদের এইরূপ দুই শ্রেণীর সুখেরই অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা সকল সময়ে না হউক অনেক সময়েই অধিক পরিমাণের নিম্নস্তরের সুখকে উপেক্ষা করিয়া অল্প পরিমাণের উচ্চতর শ্রেণীর সুখকেই কামনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ কোনও কোনও শ্রেণীর সুখের প্রতি আমাদের যে একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুখের এই প্রকার গুণগত বা শ্রেণীগত পার্থক্য স্বীকার করার অর্থ কি তাহা বিচার করিলে আমাদের মূল বক্তব্যটি আরও পরিস্ফুট হইবে। যখনই আমরা সুখভোগ করি তখনই সেই সুখের হেতুস্বরূপ কোনও না কোন বস্তু বা বিষয় আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। কোনও বস্তুই জানিতেছি না অথবা কোনও কিছুই চিন্তা করিতেছি না অথচ সুখ বা আনন্দ অনুভব করিতেছি এরূপ ঘটা অসম্ভব। যখন মনে হয় যে কোনও জ্ঞাতব্য বিষয় নাই অথচ সুখ অনুভব করিতেছি তখন হয়ত বায়ুর শীতলতা অথবা আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্য বা স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। যে বস্তু হইতে আমরা সুখ পাই তাহার প্রকৃতি অনুসারেই সুখের প্রকৃতি হইয়া থাকে। কলহজনিত সুখ অপেক্ষা সাহিত্যচর্চ্চাজনিত সুখ উচ্চতর শ্রেণীর, কারণ ইহা যে বস্তু হইতে পাই তাহা কলহ অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর বস্তু। কোনও বস্তু বা বিষয়ের বিশেষগুণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া কোনও সুখ উপভোগ করা অসম্ভব। সুতরাং যখন কোনও নিম্নশ্রেণীর সুখের পরিবর্ত্তে উচ্চশ্রেণীর সুখ কামনা করি তখন যে সুখ নামে অভিহিত মানসিক অবস্থা হইতে পৃথক আরও কিছু কামনা করি ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অর্থাৎ সাহিত্যচর্চ্চার সুখ যখন কামনা করি তখন একটু মানসিক আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়াও অন্য জিনিষ—যথা সাহিত্যরস, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি—আমাদের কামনার লক্ষ্যস্থল হইয়া থাকে।

সুতরাং সুখের শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করিলেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা সুখ ভিন্ন অন্য কতকগুলি বস্তু ও তাহাদের নিজেদের জন্যই কামনা করিয়া থাকি।

আরও অন্য কতকগুলি উদাহরণ দ্বারাও এই উক্তি সমর্থন করিতে পারা যায়। কোনও বালক যখন একজন নিপুণ শিল্পীকে শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত দেখে তখন ঠিক সেইরূপ কার্য্য করিবার জন্য তাহার মনে এক অদম্য কামনা জন্মিয়া থাকে এবং শিল্পী যে যন্ত্রদ্বারা কাজ করে তাহা দ্বারা শিল্পীর অনুকরণে কোনও কিছু নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিয়া সুখ পায়। এস্থলে মনে হইতে পারে বটে যে এই সুখটুকু পাওয়াই তাহার উদ্দেশ্য এবং কামনার লক্ষ্য, কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে এই ধারণা ভ্রান্ত। বালক যখন সমস্ত মন দিয়া শিল্পীকে কর্ম্মনিরত দেখে তখন তাহাকে অন্য কোনও সুখের প্রলোভন দেখাইয়া সে স্থান হইতে সরাইতে পারা যাইবে না, তাহার অদম্য ইচ্ছা যে শিল্পীর যন্ত্রটি লইয়া তাহারই ন্যায় সুনিপুণ কৌশলে কোনও বস্তু নির্ম্মাণ করে। সে যে কোনও ভবিষ্যৎ সুখের কামনায় এইরূপ ইচ্ছা করে তাহাও নয়। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে সে যদি ইহাতে সুখ না পায় তবে কিসের আকর্ষণে সে শিল্পীর অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়? ইহার যথার্থ উত্তর এই যে ইহা করিবার জন্য বালকের মনে স্বতঃই এক কামনা বা প্রেরণা জন্মিয়া থাকে এবং এই কামনা আছে বলিয়াই তাহার মনে সুখ বা আনন্দ হয়। কোনও বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া আমরা প্রথমে সুখের আস্বাদ পাই এবং তাহার পর সেই সুখের জন্য কামনা জাগে, না প্রথমে মনে কোনও এক কামনার উদয় হয় এবং তাহা পরিতৃপ্ত হইলে সুখ পাওয়া যায় এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে বাধ্য যে অনেকস্থলে দ্বিতীয় বিকল্পটিই সত্য। যখন কোনও দুষ্কর কার্য্য করিবার কামনা আমাদের মনে জাগে তখন আমাদের উক্তির সত্যতা আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। যখন কাহারও মনে কোনও কষ্টসাধ্য ক্রীড়ায় জয়লাভ করা অথবা কোনও দুর্গম গিরিশিখরে আরোহণ করার কামনা জন্মে তখন সেই কামনাকে সকলক্ষেত্রেই নিকট বা সুদূর ভবিষ্যতে সুখলাভের কামনা বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। কেহ কেহ হয়ত অর্থলোভে বা অন্যের প্রশংসা পাইবার লোভে বা ভবিষ্যতে কোনও সুবিধা পাইবার আশায় এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে কিন্তু অনেকস্থলে যে এইরূপ কার্য্য করাই মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ কামনার লক্ষ্যস্থল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ক্রীড়ায় জয়লাভ করিলে সুখ পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার ক্লেশভোগও করিতে হয় এবং সেই সুখ হইতে এই সকল ক্লেশের সমপরিমাণ সুখ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা অপেক্ষা অধিকতর সুখ অর্থাৎ আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্য অন্য অনেক উপায়ে পাওয়া

যাইতে পারে। দুর্গম গিরিশিখরে পদব্রজে বহু কষ্টে উঠিয়া যে সুখ বা আরাম পাওয়া যায় তদপেক্ষা কোনও সুসাধ্য উপায়ে বিনা ক্লেশে সেই স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলে নিঃসন্দেহেই অধিকতর সুখ বা আরাম পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ক্রীড়াকুশল ব্যক্তির পক্ষে বহু ক্লেশ বা পরিশ্রম সহ্য করিয়া জয়লাভের কামনাই অধিকতর তীব্র হয়, এমন কি প্রতিদ্বন্দ্বী যত অধিক বলবান্ ও কুশলী অর্থাৎ জয়লাভ যত অধিক ক্লেশসাধ্য ততই তাহার জয়লাভের কামনা অধিকতর তীব্র হইয়া থাকে। দুঃসাহসী ব্যক্তির পক্ষে দুর্গম গিরিচূড়ায় আরোহণ করিতে যত বেশী বাধা অতিক্রম করিতে হয় অর্থাৎ যত অধিক ক্লেশস্বীকারের প্রয়োজন হয় ততই সেই বাধা অতিক্রম কবিবার কামনা তাহার মনে বলবতী হইয়া উঠে। ঠিক এইরূপে কোনও দুর্দ্দান্ত বন্য জন্তুকে বশে আনিবার কামনা অথবা কোনও জটিল যন্ত্রকে বহু আয়াসে আপন আয়ত্তে আনার কামনাকে সকলস্থলেই সুখলাভের কামনা বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। এই সব ক্ষেত্রে বরং ইহাই সত্য যে কোনও একটি বিশেষ বস্তু লাভ করিবার জন্য অথবা কোনও বিশেষ কার্য্য করিবার জন্য আমাদের মনে কামনা থাকে এবং সেই কামনা পরিতৃপ্ত হইলে আমরা সুখ অথবা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকি। এই কথা বলা এবং আমরা সকলক্ষেত্রে সুখের কামনায় কার্য্য করিয়া থাকি এই দুইটি সমার্থক নহে এবং এই দুইটি সমার্থক বলিয়া মনে করাতেই দ্বিতীয় উক্তিটি যেন অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের ন্যায়ই মনে হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুইটি উক্তির মধ্যে যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে তাহা একটু চিন্তা করিলেই ধরা পড়িয়া যাইবে।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে ইহা কেবল ভাষাগত পার্থক্য। আমরা সুখ কামনা করি ইহা না বলিয়া যদি বলি যে আমরা কতকগুলি সুখকর বস্তু কামনা করি অথবা আত্মপ্রসাদ কামনা করি তাহা হইলেও একই কথা বিভিন্নভাবে বলা হইল। বাস্তবিক ইহা সত্য নহে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে কামনা পরিতৃপ্তি করিয়া যে আত্মপ্রসাদ বা সুখ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে দুঃখ বা ক্লেশেরও উপাদান হিসাবে স্থান থাকিতে পারে। যে দুঃসাধ্য কার্য্য করিবার জন্য বহু ক্লেশের প্রয়োজন হয় তাহা যখন করিয়া সুখ বা আত্মপ্রসাদ পাই বা আপনার অশেষ ক্ষতি স্বীকার করিয়া যখন প্রিয়জনের হিতসাধন করিয়া আনন্দ পাই তখন সেই সুখের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হইতেছে ক্লেশ বা দুঃখভোগ। দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করার বা প্রিয়জনের হিতসাধন করার যে সুখ তাহা এই ক্লেশ বা দুঃখের অনুভূতি আছে বলিয়াই। এস্থলে হয়ত আপত্তি হইতে পারে যে দুঃখ বা ক্লেশ নিজেই আমাদের কামনার বিষয় নয়, সুখলাভের উপায় স্বরূপ বলিয়াই, অথবা সুখের সহিত অনিবার্য্যভাবে উপস্থিত হয় বলিয়াই

আমরা দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিতে প্রস্তুত হই, কিন্তু যদি উহাদের কোনওরূপে নিবারণ করা সম্ভব হইত তাহা হইলে আমরা উহাদের আদৌ কামনা করিতাম না। এই আপত্তিও কিন্তু টিকিবে না। এমন অনেক সুখ আছে যাহা দুঃখ বা ক্লেশসাপেক্ষ, অর্থাৎ সেই সুখানুভূতির উপাদান বা অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে দুঃখ না থাকিলে সেই সুখও থাকিবে না। দেহের কোনও ক্ষত নিরাময় করিবার জন্য যখন অস্ত্রোপচারের কামনা করি তখন অস্ত্রোপচারজনিত ক্লেশ ভবিষ্যতে সুখভোগের উপায় ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি কোনও উপায়ে অস্ত্রোপচার ব্যতীতই ক্ষত নিরাময় করিতে পারা যায় তাহা হইলে তজ্জনিত সুখ বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইবে না। কিন্তু কোনও কোনও শারীরিক অবস্থায় অঙ্গমর্দ্দন করিয়া যে সুখ পাওয়া যায় পীড়নজনিত ক্লেশ তাহার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ অর্থাৎ এইরূপ ক্লেশ না থাকিলে এই সুখও থাকিতে পারে না। এইরূপ মরীচ সংযুক্ত খাদ্য ভক্ষণ করিয়া যে রসনা সুখ পাওয়া যায় মরীচের আস্বাদজনিত একপ্রকার ক্লেশ তাহার অপরিহার্য্য অঙ্গ। আবার আমাদের অভিজ্ঞতার উচ্চতর স্তরেও দেখিতে পাওয়া যায় যে যখন আমরা করুণরসাত্মক কাব্য, উপন্যাস ও বিয়োগান্তক নাটকাদি পাঠ করিয়া সুখ পাই তখন অনেকটা দুঃখই সেই সুখের অঙ্গীভূত হইয়া থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে আমরা আগে দুঃখভোগ করিয়া পরে সুখভোগ করি এরূপ নয়, পরন্তু দুঃখভোগের ভিতর দিয়াই সুখভোগ বা আত্মপ্রসাদলাভ সম্ভব হইয়া থাকে। দুঃসাধ্য কার্য্য করিবার সময়ে অথবা এইরূপ কাব্য নাটকাদি পাঠ করিবার সময়ে প্রতিমুহূর্ত্তেই যে পরিমাণে আমাদের কামনা চরিতার্থ হয় সেই পরিমাণেই আমাদের সুখ বা আত্মপ্রসাদ লাভ হইয়া থাকে। কোনওরূপ দুঃখ স্বীকার না করিয়াই যদি সুখ পাওয়া যাইত তাহা হইলে হয়ত সে সুখ কামনা করিতাম না। পূর্ণ আহারে পরিতৃপ্ত কোনও সুস্থ ব্যক্তি গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হইবার অব্যবহিতপূর্ব্বে কয়েকমুহূর্ত্ত একপ্রকার আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য বা সুখ অনুভব করে যাহার মধ্যে দুঃখ বা ক্লেশের কোনও স্থান নাই। কিন্তু কোনও ব্যক্তির অদৃষ্টে যদি আজীবন ঠিক এইরূপ সুখলাভ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে সে আপনাকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিবেনা নিশ্চয়ই। নিশ্চিন্ত আরাম, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ নাগরিক জীবন অপেক্ষা আরব বেদুইনের জীবনযাপন অধিকতর কাম্য একথা মনে উদয় হওয়ার সম্ভাবনা নিছক কবিকল্পনা নয়। সুতরাং যে সুখের উপাদান অথবা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে ক্লেশ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে সেই সুখ যখন কামনা করি তখন যে দুঃখ কামনার বস্তু হইতে পারে একথা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সুখই আমাদের একমাত্র কাম্য একথা বলিলে বুঝাইবে যে অমিশ্র, নিরবচ্ছিন্ন সুখ আমাদের কাম্য,

কিন্তু নানাবিধ বস্তু অথবা কামনাপরিতৃপ্তিজনিত আত্মপ্রসাদই আমাদের কাম্য একথা বলিলে আর তাহা বুঝাইবে না। দুঃখের জন্যই দুঃখকে কেহ চাহে না, আবার যে সুখের মধ্যে দুঃখ, প্রযত্নজনিত উদ্বেগ, আশাভঙ্গজনিত আশঙ্কা বা বহির্জগতের সহিত ঘাতপ্রতিঘাতজনিত ক্লেশের লেশমাত্র নাই তাহাও আমাদের কামনার চরম লক্ষ্যস্থল নয়, অর্থাৎ তাহা আমাদের পূর্ণ-তৃপ্তি দিতে পারে না। কেহ হয়ত বলিতে পারেন "হাঁ, আমি এইরূপ সুখই চাই।" সুতরাং এখানে পুনরায় বলা আবশ্যক যে আমরা বাস্তবিকই কি চাই তাহা বলা সহজ নয়; কারণ আমাদের প্রত্যেক কামনার মধ্যে সচেতন ও অবচেতন এই দুইটি অংশ থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে কোনও ব্যক্তি মুখে যাহা কামনা করে তাহা পাইলে তাহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় অর্থাৎ তাহার আপনার মুখ হইতেই "আমি ত ইহা কামনা করি নাই" এরূপ কথা শুনা যায়। আমরা বাস্তবিক কি কামনা করি তাহা কেবলমাত্র আমাদের মুখের কথাতেই স্থির হইবে না, অনেক পর্য্যালোচনা করিয়াও নানা ক্ষেত্রে নানা ঘটনার মধ্যে আমাদের ব্যবহার দেখিয়া ইহা স্থির করিতে হইবে। এবং এইভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে অমিশ্র নিরবচ্ছিন্ন সুখ আমাদের সমস্ত কামনার চরম লক্ষ্য নয়।

ক্রমশঃ

সম্পাদকীয়

"দর্শন" পত্রিকার গত শ্রাবণ সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমরা উহাতে এযাবৎ প্রকাশিত প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম এবং বারান্তরে আরও কিছু মন্তব্য লিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে "দর্শন" পত্রিকায় সাধারণ পাঠকের এবং দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির পাঠোপযোগী উভয়বিধ প্রবন্ধেরই সম্মানের স্থান আছে। এই দুই ভাবের প্রবন্ধ প্রধানতঃ কোন্ কোন্ বিষয়ে লিখিত হইতে পারে অথবা কি কি প্রকারের হইতে পারে এখন তাহারই আভাস দিতেছি।

দার্শনিক রচনা প্রধানতঃ চারি প্রকারের হইতে পারে। প্রথম, মৌলিক চিন্তামূলক রচনা। ইহাই দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান স্থান পাইবার যোগ্য। ইহাতে লেখক দার্শনিক সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব দার্শনিক মত-বাদকে নূতনভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, অথবা নূতন দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি করিতে পারেন। পাশ্চাত্য দেশে সমসাময়িক দার্শনিক মতবাদগুলি বোধহয় এই ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা এখানে মিঃ বারট্রাণ্ড রাসেল্, অধ্যাপক সামুয়েল আলেক্‌জাণ্ডার প্রমুখ নব্য বস্তুতন্ত্রবাদিগণের, এড্ওয়ার্ড কেয়ার্ড, এফ্. এচ্. ব্র্যাড্‌লে প্রভৃতি নব্য হেগেলপন্থীদের, এবং বেনেডেটো ক্রোচে, গিওভান্নি জেন্টিলে প্রভৃতি ইতালীয় নব্য বিজ্ঞানবাদীদের দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ করিতে পারি। ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডক্টর হীরালাল হালদার, অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ প্রভৃতি ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় বা য়ুরোপীয় দর্শন সম্বন্ধে এরূপ মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিলেও, এ পর্য্যন্ত বাংলা বা অন্য কোন ভারতীয় ভাষায় এই প্রকারের কোন উল্লেখযোগ্য রচনা হয় নাই বলিলেই চলে। বাঙ্গালীদের মধ্যে চিন্তাশীল ও সূক্ষ্মদর্শী সুধীজনের অভাব আজিও ঘটে নাই বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি, এবং তাঁহাদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তিদিগকে বাংলা ভাষায় মৌলিক দার্শনিক রচনার কার্য্যে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছি।

আর এক প্রকারের দার্শনিক রচনা আছে, যাহাকে আমরা সংক্ষেপে গবেষণামূলক বলিতে পারি। এরূপ রচনায় লেখক বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কোন দর্শন বিষয়ে নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। দর্শন বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান দুই প্রকারের হইতে পারে, এবং

এজন্য এ বিষয়ে গবেষণাও দুই প্রকারের হইবে। এক প্রকারের গবেষণা দ্বারা ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিতে পারা যায়; অন্য প্রকারের দ্বারা কোন দর্শন বা দার্শনিকের অভিমত ও স্বীকৃত তথ্যগুলি উদ্ধার করিয়া তাহাদের নূতনরূপ ব্যাখ্যা বা প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায়। এইরূপ গবেষণামূলক দার্শনিক রচনা আমাদের দেশে প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষাতেই কিছু কিছু হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় এরূপ রচনার কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। সম্প্রতি ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয় একটি মূল্যবান গ্রন্থ (বেদান্ত-দর্শন—অদ্বৈতবাদ, ১ম খণ্ড) লিখিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য শাখার, বিশেষ করিয়া চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে বাংলা ভাষাতে প্রবন্ধাদি রচনার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। বৈষ্ণব, শৈব ও তান্ত্রিক দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধেও গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আছে। সাধারণভাবে ভারতীয় দর্শনগুলির ইতিহাস আজিও তমসাচ্ছন্ন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অপর দিকে এই সব দর্শনে নিবদ্ধ মুখ্য ও গৌণ অনেক তথ্য আজ পর্যন্ত পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় নাই। দৃষ্টান্তরূপে আমরা এখানে বেদান্তের মায়া, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অলৌকিক প্রত্যক্ষ প্রভৃতির এবং সাংখ্য-যোগ দর্শনের প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি। য়ুরোপীয় দর্শনের মধ্যেও অনেক তত্ত্ব নিহিত আছে, যাহাদের যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যা আজিও আদরণীয় হইবে। মহামতি প্লেটো, আরিষ্টট্‌ল্‌, হিয়ুম, কাণ্ট, হেগেল, ব্র্যাড্‌লে, বের্গসোঁ, হুয়াইট্‌হেড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতবাদ সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ বাংলা ভাষাতে লিখিত হইলে দর্শনানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই উপকার হইবে এবং বাংলা ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। মোটের উপরে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় দর্শন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও দার্শনিক গবেষণার যথেষ্ট অবসর আছে, এবং এখানে উল্লিখিত বা অনুল্লিখিত বিষয় অবলম্বনে যিনি এই কার্য্যে অগ্রসর হইবেন তিনিই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন। দার্শনিক আলোচনা ও রচনার আরও কয়েকটি ধারার কথা "দর্শনের" আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বর্ত্তমানে যে বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তজ্জন্য পত্রিকা প্রকাশে বহু বাধা বিঘ্ন ঘটায় পত্রিকা প্রকাশ করিতে আমাদের বিলম্ব হইয়াছে। পাঠকবর্গ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত দোষত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

* * *

কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য এটর্ণি ও প্রবীন বৈদান্তিক হীরেন্দ্র

নাথ দত্ত মহাশয় গত ভাদ্র মাসের ২৯শে তারিখে তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ আর একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, বৈদান্তিক, সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিককে হারাইল। বঙ্গমাতার যে কয়টি সুসন্তান জীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা বাংলা ভাষার মর্য্যাদা ও বাঙ্গালী জাতির সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন মনস্বী হীরেন্দ্র নাথ দত্ত তাঁহাদের অন্যতম। বাল্যকাল হইতেই হীরেন্দ্র বাবু খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি বি. এ পরীক্ষায় তিনটি বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর সম্মানোপাধি লাভ করেন। এম. এ পরীক্ষায় তিনি ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তৎপরে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন এবং বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৪ সালে এটর্ণিবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণির কাজে যোগদান করেন এবং শেষ বয়স পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

হিন্দুধর্ম্ম, ভারতীয় দর্শন এবং বাংলা ভাষার প্রতি হীরেন্দ্র বাবুর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি সরল বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া সাধারণে প্রচার করা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। বাংলা ভাষায় তিনি যে অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার লিখিত 'উপনিষদ, যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ, বেদান্ত পরিচয়, সাংখ্য পরিচয়, গীতায় ঈশ্বরবাদ, অবতার তত্ত্ব, বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা, প্রেমধর্ম্ম, কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর, রাসলীলা, মেঘদূত, বুদ্ধি ও বোধি' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে এবং বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পদরূপে গণ্য হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি যে "কমলা লেকচার" প্রদান করেন তাহাতে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও অসামান্য বাগ্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রথম মৃত্যুস্মৃতিবার্ষিকী সভার সভাপতিরূপে তিনি যে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাই দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথের শেষ অবদানরূপে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি আজীবন দেশের ও মাতৃভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের তিনি একজন প্রধান নেতা ছিলেন। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য তাঁহার অবদান অপরিমেয়। তিনি থিওজফিক্যাল আন্দোলনের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নানারূপে থিওসফিক্যাল সোসাইটির সেবা করিয়াছেন। কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া তিনি দেশের অনেক কল্যাণ সাধনের

চেষ্টা করিয়াছিলেন। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বহুমুখী প্রতিভা ও দেশহিতৈষণার কথা ভাবিলে মনে হয় যে তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের একটা দিক শূন্য হইয়া গেল এবং ইহার উন্নতির একটা ধারা রুদ্ধ হইয়া পড়িল। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

* * *

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সূর্য্যনারায়ণ শাস্ত্রী এম. এ, বি-এস-সি, বার-এট-ল মহাশয় অগ্রহায়ণ মাসের ২৩শে তারিখে (ইং ৯-১২-১৯৪২) পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মাদ্রাজ প্রদেশের এক উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং অত্রস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিলাভ করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের বি-এস্-সি উপাধি প্রাপ্ত হয়েন ও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ থাকায় তিনি আইন ব্যবসায় না করিয়া দর্শনের অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ভারতীয় দর্শনের উন্নতি ও প্রসারকল্পে অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রায় ২০ বৎসর দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ভারতীয় দর্শন মহাসভার সম্পাদকরূপে তিনি ১০ বৎসর যে পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার মত একজন একনিষ্ঠ ও সুদক্ষ সম্পাদক পাওয়া দর্শন মহাসভার পক্ষে কঠিন হইবে। দর্শন বিষয়ে তাঁহার অবদানও সামান্য নহে। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে তিনি 'সাংখ্য কারিকা অব্ ঈশ্বরকৃষ্ণ' 'শঙ্করাচার্য্য' প্রভৃতি নামে কয়েকটি মূল্যবান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ, ভামতী প্রভৃতি কয়টি প্রাচীন গ্রন্থ অনূদিত ও সম্পাদিত করিয়াছেন। তিনি অতি অমায়িক, সদালাপী ও সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মত দর্শনানুরাগী, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির অকাল মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি, এবং ভারতীয় দর্শন, বিশেষতঃ দর্শন মহাসভা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমরা তাঁহার স্বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

পুস্তক পরিচয়

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা। অধ্যাপক শ্রীহরিদাস চৌধুরী প্রণীত। সোল এজেন্টস্—আর্য্য পাবলিশিং হাউস, ৬৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

মানবজাতির জটিল সমস্যাসমূহের যে সমাধান শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন তাহা শুধুই উপসর্গের চিকিৎসা নহে, তাহা হইতেছে মূল রোগীরই চিকিৎসা—তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে গতানুগতিক ভাবধারা পরিত্যাগ করিয়া, পাশ্চাত্য দেশ হইতে আনীত স্যোসালিজম্, ফ্যাসিজম্, ইম্পিরিয়ালিজম্, কম্যুনিজম্ প্রভৃতি বাঁধাবুলির মোহ পরিত্যাগ করিয়া একটু গভীরভাবেই চিন্তা করা আবশ্যক হয়। অধ্যাপক শ্রীহরিদাস চৌধুরীর বইখানি পাঠকগণকে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া জীবনের সমস্যা-সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে উদ্বুদ্ধ করিবে। শ্রীঅরবিন্দ দেশের বা জগতের কোথায় কি হইতেছে তাহার কোন সংবাদই রাখেন না, জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই, আধ্যাত্মিকতাই ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে নূতন কিছু নাই, তিনি সেই পুরাতন ঐতিহ্যকেই ধরিয়া রহিয়াছেন অথবা শ্রীঅরবিন্দ ভারতের ঐতিহ্যকে অবহেলা করিয়া একটা নূতন কিছু করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—এইরূপ সব নানা মন্তব্য যে ভ্রান্ত চিন্তারই পরিচায়ক হরিদাস বাবু তাহা সুন্দরভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে মহান আদর্শ জগতের সম্মুখে ধরিয়াছেন, নানা গ্রন্থে ও প্রবন্ধে তিনি তাহা বিশদভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন, আশা করি হরিদাসের বইখানি পাঠকগণকে শ্রীঅরবিন্দের নিজ বচনাসমূহ পাঠে উৎসাহিত করিবে।

হরিদাস বলিয়াছেন, "অরবিন্দ ভারতকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, তাই দেশমাতার চরণে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তিনি বুঝিলেন যে, ভারতের সমস্যা সমগ্র জগতের সমস্যার সহিত এক সূত্রে গাঁথা। ...বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্বলাভের পথ দেখাইতে পারে শুধু ভারত তাহার যুগযুগান্তরের সঞ্চিত তপোবলের দ্বারা।" এই তপোবলের অর্থ নৈতিক বল (তথাকথিত soul force) নহে, গতানুগতিক ধর্ম্মাচরণও নহে। শ্রীঅরবিন্দ কোন ধর্ম্ম আন্দোলনের সূত্রপাত করিতেছেন না কারণ ঐতিহ্যমূলক ধর্ম্ম মানব সমাজের যত উপকারই করুক (অনিষ্টও বড় কম করে নাই) তাহা মানব চরিত্রের মূলগত কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই। আর এইরূপ পরিবর্ত্তন না হইলে ধর্ম্ম, নৈতিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি কোন কিছুর দ্বারাই মানবীয় সমস্যা সকলের সমাধান হইতে পারে না। কি করিলে মানুষের চৈতন্যের, মানুষের চরিত্রের মূলগত পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর হইতে পারে শ্রীঅরবিন্দ সেই সাধনায় প্রবৃত্ত আছেন। ইহা একদিকে যেমন সম্পূর্ণ নূতন, অন্যদিকে ইহার ভিত্তি রহিয়াছে ভারতের সনাতন অধ্যাত্ম সাধনার উপর।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার কার্য্যে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার আদর্শ মানবজাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার অনুকূল অবস্থাসকল সৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে—ঠিক এই

সময়ে জার্মান জাতি এমন এক আদর্শ লইয়া বিশ্বসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে যাহাতে মানুষের অধ্যাত্মবিকাশের সকল সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে—পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে জার্মানীর অধীনে ভারবাহী পশুর মত জীবন যাপন করিতে হইবে। জগতের সম্মুখে আজ যে কত বড় বিপদ, আমাদের দেশের লোক এখনও তাহা ধারণাই করিতে পারে নাই—তাই তাহারা শ্রীঅরবিন্দের আচরণের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতেছে না।

শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ, শ্রীঅরবিন্দের সাধন প্রণালী ও বর্ত্তমান কর্ম্মধারা সম্বন্ধে আজিকার মানুষের মনে স্বতঃই যে-সব প্রশ্ন উঠে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস চৌধুরী এই গ্রন্থে সংক্ষেপে অতি সুন্দরভাবে সে-সবের উত্তর দিয়াছেন।

শ্রীঅনিলবরণ রায়

তর্কবিজ্ঞানের পরিভাষা

অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত, এম. এ

[অধ্যাপক শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃত এবং 'দর্শনের' দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'আরিষ্টটল্ এবং মিলের তর্কবিজ্ঞানের পরিভাষার' তালিকামধ্যস্থ কতকগুলি শব্দের নূতন প্রতিশব্দ]

২। Definition—সংজ্ঞা

৩। Province—ক্ষেত্র

৪। Thought—চিন্তন, চিন্তা

৭। Art—শিল্প, কলা। Applied Science—প্রয়োগবিজ্ঞান, Practical Science—ব্যবহারিক বিজ্ঞান

৮। Truth—সত্য। True knowledge—প্রমা

৯-১০। Formal—আকারগত বা আকারতন্ত্র। Formal truth—আকারগত সত্য। Material—বস্তুগত বা বস্তুতন্ত্র। Material truth—বস্তুগত সত্য। Formal Logic—আকারতন্ত্র তর্কশাস্ত্র, Material Logic—বস্তুতন্ত্র তর্কশাস্ত্র।

১১-১২। Deduction—ন্যায়। Induction—ব্যাপ্তিগ্রহ

২৬। Judgmenr—বিচার

৩০। Object—জ্ঞেয় বা বিষয়, Subject—জ্ঞাতা বা বিষয়ী

৩১-৩২। Positive (science)—বস্তুবিষয়ক (বিজ্ঞান)
Normative (science)—আদর্শবিষয়ক (বিজ্ঞান)

৩৭। Rule—সূত্র

৩৯-৪০। Postulate—স্বীকার্য্য. Axiom—স্বতঃসিদ্ধ

৪১। Nature—প্রকৃতি

৪২। Law of Identity—তাদাত্ম্য-নিয়ম

৪৩। Law of Contradiction—অবিরোধ-নিয়ম

৪৫। Law of Sufficient Reason—যথেষ্ট কারণসাধক নিয়ম

৪৬-৯১। Concept—প্রত্যয়। Conceptualism—প্রত্যয়তন্ত্রবাদ, Nominalism—নামতন্ত্রবাদ। Realism—বস্তুতন্ত্রবাদ

৫৩। Inverse Variation—প্রতিলোম বা বিপরীত পরিবর্ত্তন, (ভেদ—Difference)

৫৪। Psychological or Subjective Connotation—জ্ঞাতৃতন্ত্রসার ধর্ম্ম

৫৭-৭০। Predicable—বিধেয়শ্রেণী

৭১। Categorematic Word—স্বয়ংপদবাচক শব্দ
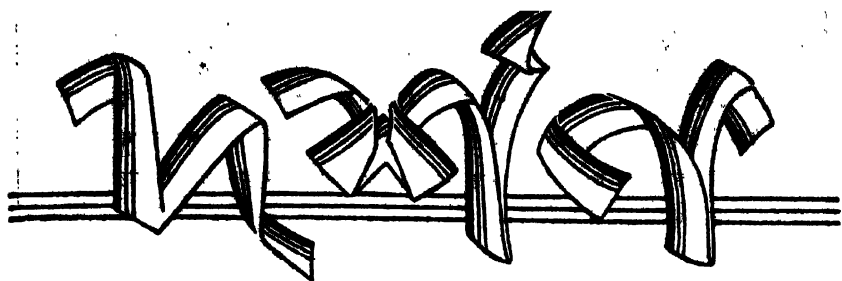
বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

৩য় বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা] কার্ত্তিক ও মাঘ ১৩৫০ সাল

সূচীপত্র

দর্শন পত্রিকার কয়েকটি নিয়ম

১। দর্শন পত্রিকার বৎসর পরিষদের বৎসরের ন্যায় বৈশাখ হইতে গণনা করা হইবে। যিনি যে বৎসরের জন্য গ্রাহক হইবেন বা পরিষদের সভ্য (বিশেষ বা সাধারণ) থাকিবেন তিনি সেই বৎসরের পত্রিকা পাইবেন।

২। 'দর্শনে'র বাৎসরিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ) ৪৲ (চারি টাকা); প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ (এক টাকা)।

৩। 'দর্শনে'র বাৎসরিক গ্রাহক হইতে হইলে ইহার বাৎসরিক মূল্য (চারি টাকা) অগ্রিম দিতে হইবে। তাহা না দিয়া কেহ কোন সংখ্যা কিনিলে ডাকমাশুল ব্যয় তিনি বহন করিবেন। পত্রিকা-সম্পাদককে লিখিলে ভি. পি. ডাক-যোগে পত্রিকা পাঠান হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—বঙ্গীয় দর্শন পরিষৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিতে হইবে।

শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ.
১২, বিপিন পাল রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।

দর্শনের স্বরূপ

ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এম.এ., পি-এচ. ডি. (কলিকাতা ও কেম্‌ব্রিজ্), ডি.লিট্.,
জর্জ দি ফিফ্‌থ অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

'দৃশ্'-ধাতু থেকে হয়েছে 'দর্শন' শব্দ, ক্লীবলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ দুই লিঙ্গেই এর ব্যবহার দেখা যায়, যেমন 'দর্শনম্' ও 'দর্শনঃ'। ক্লীবলিঙ্গটির সাধারণ অর্থ 'দেখা', আর পুংলিঙ্গটির অর্থ 'যার মধ্যে দেখা যায়' অর্থাৎ প্রতিবিম্বের আশ্রয় আদর্শ। 'যথামুখসম্মুখস্য দর্শনঃ খঃ' (৫।২।৬) এই পাণিনি সূত্রে এর উল্লেখ দেখা যায়। ক্লীবলিঙ্গ 'দর্শন' শব্দটির আর একটি অদ্ভুত অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। সে অর্থটি হচ্ছে 'উচ্চারণ'। "নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ" (১।১।১৮) এই জৈমিনি সূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শবর বলেছেন—"দর্শনম্ উচ্চারণম্"। অন্য কোথাও এই অর্থ পেয়েছি বলে' মনে হয় না। তথাপি আচার্য্য শবরের প্রামাণ্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা এখানে মুখ্যতঃ 'দেখা' অর্থে যে 'দর্শন' শব্দ তারই গতি অনুসরণ করব। শতপথব্রাহ্মণে (১৪।৫।৪।৫) এই 'চোখের দেখা' অর্থে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—'দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং শব্দং বিদিতম্'। 'চোখের দেখাই' সব চেয়ে স্পষ্ট। সেইজন্য প্রত্যক্ষই জ্যেষ্ঠ প্রমাণ। অনেক সময় কাণে শোনাও চোখের দেখার মত স্পষ্ট হয়। সেইজন্য কাণে শোনাকে 'যেন চোখে দেখা' এই রকম বর্ণিত হয়েছে। যেমন, মহাভারত (১৩।৯·১)—"এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য প্রত্যক্ষমিব দর্শনম্"। মহাভাষ্যে 'দর্শন' শব্দ 'দেখা' এবং 'ব্যবহার' এই উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হ'তে দেখা যায়, 'ব্যবহার' অর্থে, যেমন,—ভাষ্য (১।২।৭১)—"দর্শনম্ হেতুরিতি চেৎ তুল্যমেতদ্ ভবতি"। কিন্তু দর্শন-শব্দে বা দৃশ্-ধাতুর 'আলোচনা' অর্থেও প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন 'ভারদ্বাজমতং দৃষ্ট্বা', কিংবা 'দদর্শ রাজকার্য্যানি', অথবা 'কো নাম আবয়োঃ ব্যবহারং দ্রক্ষ্যতি'। আবার আমরা শুনতে পাই যে ঋষিরা ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা। যেমন শতপথব্রাহ্মণে (১।৫।৩।৩) 'দেবা এতান্ প্রযাজান্ দদৃশুঃ। আবার নিরুক্তে 'ঋষির্দর্শনাৎ স্তোমান দদর্শ'। আমি অনেক ভেবেও

ঠিক করতে পারি নি যে শব্দময় মন্ত্রকে ঋষিরা চোখে দেখতেন কি করে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আচার্য্য শবর 'দর্শন' শব্দের অর্থ 'উচ্চারণ' বলেছেন। এই অর্থ গ্রহণ করলে আমরা ঋষিরা কি অর্থে মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন তা বুঝতে পারি। অনাদি মন্ত্র কণ্ঠতাল্বাদির অভিঘাতের দ্বারা তাঁরা উচ্চারণে অভিব্যক্ত করতেন। 'দর্শন' শব্দ যেমন 'উচ্চারণ' অর্থে ব্যবহার হয়েছে তেমনি যেখানে একেবারে দেখা যায় না সেখানেও 'যেন দেখা যায়' এই অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অমাবস্যার একটি নাম দর্শ। সে সময় চাঁদ দেখা যায় না। শতপথব্রাহ্মণে (১১।২।৪।১) এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—'এষ এব দর্শো যচ্চন্দ্রমা দদৃশে ইবহ্যেষঃ'।

কিন্তু 'চোখের দেখা' ছাড়া অতীন্দ্রিয় বস্তুতেও 'দেখা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; যেমন কালিদাস রঘুবংশে বলেছেন—'অতীন্দ্রিয়েষ্বপ্যুপপন্নদর্শনঃ' অর্থাৎ যিনি অতীন্দ্রিয় বস্তুও দেখতে পান। আবার 'দর্শন' শব্দ 'জ্ঞান' অর্থেও প্রযুক্ত দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—'সম্যক্ দর্শনসম্পন্নঃ কর্ম্মভির্ননিবধ্যতে', কিংবা 'দর্শনেন বিহীনস্তু সংসারং প্রতিপদ্যতে'। আবার রামায়ণে (১।৯) 'ধ্যানের দ্বারা যা উপলব্ধি করা যায়' তাকেও 'দেখা' বলা হয়েছে। যেমন—'দৃষ্টা বৈ ধ্যানচক্ষুষা'। আবার মনুতে চিত্তের দ্বারা দেখা যায় এ কথাও বলা হয়েছে, যেমন 'এতা দৃষ্টাস্য জীবস্য গতীঃ স্বেনৈব চেতসা' অর্থাৎ নিজের চিত্তের দ্বারা জীবের এই সমস্ত গতি দেখে'। এই সমস্ত প্রয়োগগুলি পর্য্যালোচনা করলে মনে হয় যে দৃশ্ ধাতুর প্রয়োগ শুধু যে চোখের দেখা সম্বন্ধে হ'ত তা নয়, চিন্তা, ধ্যান, মনন প্রভৃতির দ্বারা আমরা যা কিছু আলোড়ন করি না কেন, যা কিছু চিন্তা করি না কেন, এবং তার ফলে যে রকম জ্ঞানই লাভ করি না কেন, সে সমস্তগুলিকেই 'দেখা'র পর্য্যায়ের মধ্যে ফেলা যেতে পারত। কোন বিষয়ে নানা দিক দিয়ে যখন আমরা আলোড়ন করি তখন আমরা 'লোচন' অর্থাৎ 'চক্ষু' শব্দ ব্যবহার করে' থাকি, যেমন 'আলোচন', বা 'আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি'।

আবার যোগসূত্রে 'দ্রষ্টৃ' শব্দে চিন্ময়পুরুষকে লক্ষ্য করা হয়েছে, যেমন 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্'। অর্থাৎ তখন দ্রষ্টা নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন। আবার পঞ্চশিখের সূত্রে দেখা যায়—'একমেব দর্শনম্ খ্যাতিরেব দর্শনম্', অর্থাৎ ব্যুত্থানকালে চিত্তের যে সমস্ত বৃত্তি হয় চিন্ময় পুরুষে তদতিরিক্ত আর কোনও বৃত্তি থাকে না (ব্যুত্থানে যাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ তদবিশিষ্টবৃত্তিঃ পুরুষঃ) অর্থাৎ বুদ্ধি যখন নানাপ্রকারে রঞ্জিত হয়ে পুরুষের সম্মুখীন হয় তখন পুরুষ সেই বুদ্ধির রূপ ছাড়া অন্য কোন রূপে আপনাকে প্রকাশ করে না। এই যে পুরুষের সঙ্গে বুদ্ধির একরূপে প্রকাশ, একেই বলা যায় 'দর্শন' (একমেব দর্শনম্)। বুদ্ধির যে বৃত্তি, যা নিরন্তর চঞ্চল হয়ে ফিরছে, তাকেই বলা যায় 'খ্যাতি'। অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের নাম 'খ্যাতি'। ইংরেজীতে সহজ ভাষায় আমরা 'খ্যাতিকে' বলব experience. পুরুষের চৈতন্য তার স্বভাব, তার

কোনও experience হয় না, সেইজন্য তাকে 'খ্যাতি' বলা যায় না। এই চৈতন্য লোকপ্রত্যক্ষগোচর নয়, আগম ও অনুমানের দ্বারা এর সন্ধান পাওয়া যায়। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে বুদ্ধিগত যে কোনও অবস্থা experience আকারে বা খ্যাতিরূপে প্রকাশ পায়, সে সমস্তগুলিকেই 'দর্শন' বলা যায়। সমস্ত ঐন্দ্রিয়ক বোধ—অনুমান, ভ্রম, বিকল্প, প্রজ্ঞা, এমন কি প্রজ্ঞার চরমভূমি বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত সমস্ত অবস্থাকেই 'দর্শন' বলা যায় এবং এই সমস্ত অবস্থাগুলি চেতনা-দ্বারা দৃষ্ট হয় বলেই সেগুলিকে দর্শন বলা হয় এবং চেতনস্বরূপ পুরুষকে বলা যায় দ্রষ্টা। পুরুষ দ্রষ্টা, বুদ্ধি দৃশ্য। এই দৃশ্য 'বুদ্ধি' যখন দ্রষ্টাকে এমন করে' আড়াল করে যে দ্রষ্টা স্বস্বরূপে প্রকাশ না পেয়ে দৃশ্যের রূপই তোলেন ফুটিয়ে, তখন ঘটে আমাদের experience, তখন ঘটে আমাদের দর্শন। পতঞ্জলির সিদ্ধান্তে এই দ্রষ্টৃর স্বরূপকে দর্শনের বিষয়গত করা সম্ভব নয়, তথাপি আমরা এ রকম প্রয়োগও পাই—'যদ্যোগেনাত্মদর্শনম্' অর্থাৎ যোগের দ্বারা আত্মদর্শন ঘটে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত আছে—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ', অর্থাৎ গুরুমুখে শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করে, সেই বিষয়ে মনন করে' নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি-দ্বারা আত্মা দর্শনযোগ্য হন। এই যে আত্মার দর্শন তা সাধারণ দ্বৈত দর্শন নয়, তা 'একীভবন'। বেদান্তে এই আত্মাকে দৃক্-স্বরূপ বলা হয়েছে এবং যদিও এই আত্মার দর্শন লাভ করা যায় এমন কথা শাস্ত্রে অনেকবার অনেক সময় ব্যবহার হয়েছে তথাপি এ দেখা সাধারণ দেখা নয়, সে দেখা নয় যেখানে কর্ত্তা ও কর্ম্ম থাকে, কিন্তু এ সেই দেখা যেখানে কর্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে 'দেখা'টিই থাকে কেবলমাত্র অবশিষ্ট, সে দেখায় 'কে দেখে' নাই, 'কি দেখে' নাই, আছে কেবলমাত্র 'দেখা'। ইংরেজী ভাষায় তর্জ্জমা করলে একে বলা যেতে পারে pure experience. যোগসূত্রে (২।২০) পতঞ্জলি লিখেছেন—'দ্রষ্টা দৃশি মাত্রঃ' অর্থাৎ কেবলমাত্র দ্রষ্টাকেই দৃক্-শক্তি বা দৃশি বলে। কিন্তু 'দৃশি' শব্দেরও কেবল 'দেখা' অর্থে প্রাচীন ও আধুনিক প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন—'উর্দ্ধ্বে স্নাতী দৃশয়ে নো অস্থাৎ' (ঋগ্বেদ, ৫।৮০।৫)। কিংবা 'ন ততৃপুঃ দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো নার্য্যঃ' (ভাগবত ৯।২৪।৬৪)।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে 'দর্শন' শব্দের দ্বারা চোখে দেখা, কাণে শোনা, চিন্তা দ্বারা যা অনুভব করা যায়, শাস্ত্র পড়ে' যা জানা যায়, বুদ্ধিবিবেচনা ব্যবহার করে' যা পাওয়া যায়, শুধু তাই নয়, যোগের দ্বারা যে নানা বিষয়ের সাক্ষাদ্দর্শন ঘটতে পারে সেগুলি এবং বুদ্ধির সমস্ত স্তরের সমস্ত প্রকার জ্ঞানই একরূপ এই 'দর্শন' শব্দের দ্বারা বোঝা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, সাংখ্যযোগ ও বেদান্তমতাশ্রিত বিবিধ মতে যে একটি চৈতন্য স্বরূপকে আমাদের বুদ্ধ্যুপাহৃত সমস্ত জ্ঞানক্রিয়ার যথার্থ অন্তরঙ্গ কারণ বলে' স্বীকৃত হয়েছে তাকেও বলা হয়েছে 'দৃশি' বা 'দৃক্'। 'দর্শন' বলতে আমাদের

সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান, প্রজ্ঞা প্রভৃতি বুঝে থাকি। দৃক্-শক্তির সাহায্যে ঘটে' থাকে আমাদের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান। এই দৃক্-শক্তি বা চৈতন্যের সাহায্যে যা ঘটে তাকেই বলা যায় 'দর্শন'। সাধারণতঃ দ্রষ্টা ও দৃশ্য না থাকলে দর্শন হয় না, কিন্তু এমনও দর্শন আছে যার মধ্যে দ্রষ্টা ও দৃশ্য নিমগ্ন হয়ে যায় এবং স্ফুরণ হয় বিশুদ্ধ চৈতন্যের। কিন্তু 'দর্শন' শব্দটির যতপ্রকার অর্থই দেওয়া যাক না কেন সমস্তগুলি কোন না কোন উপলব্ধি বিষয়ক। মোক্ষ সম্বন্ধেও এই দর্শন শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন মহাভারতকার বলেছেন 'হেতুভির্মোক্ষদর্শনৈঃ' অর্থাৎ যে সমস্ত হেতু-দ্বারা মোক্ষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বা উপলব্ধি ঘটতে পারে। কিন্তু প্রাচীন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে কোন পন্থাবিশেষের মত হিসাবে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ দেখেছি বলে' মনে হয় না। হরিভদ্র সূরি তাঁর গ্রন্থের নাম রেখেছিলেন "ষড়দর্শন-সমুচ্চয়"। মাধব তাঁর গ্রন্থের নাম রেখেছিলেন—"সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ"। কিন্তু প্রাচীন যে সমস্ত প্রয়োগ আছে তাতে মীমাংসাদর্শন, সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন প্রভৃতির প্রয়োগ দেখা যায় না। যতদূর মনে পড়ে, মহাভারতে এক স্থলে আছে "ব্রতানাং ধারণং তুল্যম্ দর্শনং ন সমং তয়োঃ" অর্থাৎ যোগ ও সাংখ্য উভয় মতে ব্রতধারণবিধি আছে, কিন্তু উভয়ের দর্শন একপ্রকার নয়। এখানে 'দর্শন' শব্দের ঠিক কি অর্থ তা জোর করে' বলা যায় না। হয়ত বা 'মত' অর্থেও 'দর্শন' শব্দের এখানে ব্যবহার হতে পারে কিংবা 'দর্শন' মানে উপলব্ধি। অর্থাৎ সাংখ্য এবং যোগ এরা উভয়েই যদিও ব্রতধারণবিধি স্বীকার করেন তথাপি এদের উপলব্ধিপ্রক্রিয়া একরকম নয়। সাংখ্যমতে বিবেকখ্যাতির পরই প্রকৃতি পুরুষকে পরিত্যাগ করে কিন্তু যোগমতে বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্তই চিত্তচেষ্টিত, তার পরে আসে সর্ব্বনিরোধ। এই সর্ব্বনিরোধ সমস্ত প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞাকৃত সংস্কারবিরোধী। চিত্তের সম্পূর্ণ নিবৃত্তির পর পুরুষ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হতে পারে। এইখানেই হ'ল উভয় মতের একটি বৈষম্য। এ ছাড়া অন্য বৈষম্যও আছে, কাজেই 'দর্শন' শব্দটি মহাভারতের ঐ স্থলে যে 'মত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা জোর করে' বলা যায় না। এইরূপ অর্থে ভাগবতেও 'দর্শন' শব্দের ব্যবহার হয়েছে বলে' মনে হয়, যেমন—'যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলং' (১।৫।৮) এখানে 'দর্শন' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। অন্ততঃ শ্রীধর এই অর্থই করেছেন। যে জ্ঞানে ভগবান সন্তুষ্ট হন না সেই জ্ঞান শ্রেষ্ঠ নয়। কিন্তু ভাগবতে (৮।১৪।১০) দেখা যায় 'বিমোহিতাত্মভিঃ নানাদর্শনৈর্ন চ দৃশ্যতে'—এই স্থলে শ্রীধর 'দর্শন' অর্থ করেছেন 'শাস্ত্র' কিন্তু এখানে 'দর্শন' শব্দের 'মত' অর্থেও ব্যাখ্যা করা চলে। কিন্তু "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকে দার্শনিক মত হিসাবে 'দর্শন' শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই; যেমন 'সুগত দর্শন', 'নৈয়ায়িক দর্শন'। এ পর্য্যন্ত আমরা যেটুকু আলোচনা করেছি তাতে 'দর্শন' শব্দের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে একটি অর্থ পাওয়া গেল। অর্ব্বাচীন কালে বিশেষ বিশেষ তত্ত্বচিন্তার মতকে 'দর্শন' বলা হত কিন্তু সাধারণভাবে

এবং ব্যাপকভাবে তত্ত্বচিন্তামাত্রকেই যে দর্শন বলা হ'ত তা বলা যায় না। ভাষায় আমাদের 'দার্শনিক' শব্দটির প্রয়োগ আছে কিন্তু এই শব্দটি পাণিনিসূত্র দ্বারা নিষ্পন্ন করা যায় বলে' মনে হয় না এবং এই শব্দটি কি প্রাচীন কি অর্ব্বাচীন কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে পড়েছি বলে' মনে হয় না। 'দার্শনিক' শব্দটি নিষ্পন্ন করতে হ'লে ঢক্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন করতে হবে। "ক্রতুকৃথাদি সূত্রান্তাৎ ঢক্" যেমন, ঔকৃথিক, নৈয়ায়িক, পৌরাণিক। ক্রতুবিশেষবাচী শব্দের উত্তর, উকৃথাদি শব্দের উত্তর বা কোনও সূত্রান্ত শব্দের উত্তর, 'তা অধ্যয়ন করে' বা 'তা জানে' এই অর্থে 'ঢক্' প্রত্যয় হয়। এই নিয়মের মধ্যে 'দর্শন' শব্দ পড়ে না এবং ভাষ্যবার্ত্তিকেও 'দার্শনিক' শব্দের কোনও নামগন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। তা হ'লে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে সাধারণ তত্ত্ববিদ্যা হিসাবে 'দর্শন' শব্দ ব্যবহৃত হ'ত না এবং দর্শনশাস্ত্র নামে কোন শাস্ত্রের কথা আমরা সংস্কৃতে কোথাও পাই না। চন্দ্রকীর্ত্তি তাঁর 'প্রসন্নপদা'র নমস্কারে 'দর্শন' শব্দটির ব্যবহার করেছেন, তিনি লিখেছেন—'যস্য দর্শন-তেজাংসি পরবাদিমতেন্ধনম্, দহন্ত্যদ্যাপি লোকস্য মানসানি তমাংসি চ।' অর্থাৎ যাঁর দর্শনের তেজ শত্রুপক্ষের মতের সমস্ত কাষ্ঠ এবং সকল লোকের অন্ধকার ও সকল লোকের চিত্তকে আজও দগ্ধ করে' থাকে। এখানেও দর্শন শব্দ কোনও দার্শনিক মত হিসাবে ব্যবহৃত হয় নি। নিজের শাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি করবার জন্য চন্দ্রকীর্ত্তি বলছেন—'যচ্ছাস্তি বঃ ক্লেশরিপূন্ অশেষান্ সন্ত্রায়তে দুর্গতিতো ভবাচ্চ। তচ্ছাসনাৎ ত্রাণগুণাচ্চ শাস্ত্রম্ এতদ্বয়ং চান্যমতেষু নাস্তি।' চন্দ্রকীর্ত্তি বলছেন—আমাদের এই গ্রন্থকে শাস্ত্র বলা যায় কারণ ইহা একদিকে যেমন শাসন করে অপর দিকে তেমনি ত্রাণ করে। অন্য কোন মতে এই দুইটিকে একত্র দেখা যায় না। অর্থাৎ ন্যায় সাংখ্য প্রভৃতি সরণিকে মত বলা যায় আর একমাত্র মাধ্যমিক সিদ্ধান্তকেই 'শাস্ত্র' বলা যায়। বিভিন্ন সরণির তত্ত্বালোচনাকে মত বা শাস্ত্র বলা যায় কিন্তু 'দর্শন' বলা যায় না। চন্দ্রকীর্ত্তির নমস্কারের প্রথম শ্লোকে যে 'দর্শন' শব্দের উল্লেখ দেখা যায় তার অর্থ 'দিব্যদৃষ্টি' কিন্তু পালিতে একটি শব্দ দেখা যায় 'দিট্‌ঠি' বা 'দৃষ্টি'। এই 'দিট্‌ঠি' শব্দের অর্থ বৌদ্ধেতর দার্শনিক মত। বুদ্ধ ৬২টি 'দিট্‌ঠি'র উল্লেখ করেছেন। 'দিট্‌ঠি' অর্থ 'মিথ্যাদৃষ্টি'। সংস্কৃতে 'দৃষ্টি' শব্দ 'চক্ষু' কিংবা 'প্রদর্শন' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, 'প্রসন্নদৃষ্টি', 'শাস্ত্রদৃষ্টি', 'বদ্ধদৃষ্টি'। কোন দার্শনিক মত হিসাবে দৃষ্টি শব্দের কোন প্রয়োগ নেই।

বসুবন্ধু তাঁর "অভিধর্ম্মকোষে" ৫ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির উল্লেখ করেছেন। এই-গুলিকে বলে 'সৎকায়দৃষ্টি'—এদের মূল অহঙ্কার ও মমকার। এ ছাড়া ২ প্রকার সম্যক্‌দৃষ্টির উল্লেখ করেছেন—সাস্রব কুশল চিত্তে যে প্রজ্ঞা হয় এবং যে সাধু এখনও অর্হত্ব পান নি তাঁর শৈক্ষী দৃষ্টিকে বসুবন্ধু 'সম্যক্ দৃষ্টি' বলেছেন। অর্হৎদিগের দৃষ্টিকে 'অশৈক্ষী দৃষ্টি' বলে। তা হলে দৃষ্টি হল চার প্রকার, মিথ্যাদৃষ্টি বা সৎকায়দৃষ্টি, প্রজ্ঞা,

শৈক্ষী ও অশৈক্ষী দৃষ্টি। দৃষ্টি শব্দের অর্থ হ'ল তা হ'লে 'দেখবার রকম' বা perspective। এ ছাড়া ৬২ প্রকার মিথ্যা মতেরও বসুবন্ধু উল্লেখ করেছেন। সে সমস্তগুলিরই মূল হচ্ছে কোন না কোন রকমের শাশ্বত দৃষ্টি অর্থাৎ সকল বস্তুকে স্থির ও অচঞ্চল মনে করার থেকেই ঐ সমস্ত মিথ্যা মত বা সিদ্ধান্ত পৃথিবীতে ঠাঁই পেয়েছে। বসুবন্ধু জ্ঞান ও দর্শনের আপাত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করে' পরিশেষে জ্ঞান ও দর্শনের একত্ব স্বীকার করেছেন কিন্তু জ্ঞান ও দর্শন 'দৃষ্টি' নয়। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। বসুবন্ধু আর একটি কথা উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে 'দর্শনমার্গ'। ধর্ম্মচক্রকেই বলা যায় দর্শনমার্গ। এর স্বরূপ সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ সমাধি। এই দর্শনমার্গকে দ্বাদশার ভবচক্রের সহিত এক বলে মনে করা উচিত নয় কারণ যে চোদনার দ্বারা বা প্রেরণার দ্বারা ক্রমারোহে মানুষ অবিদ্যা থেকে মুক্তি পেতে পারে তাকেই বসুবন্ধু বলেছেন দর্শনমার্গ। দর্শনমার্গ প্রবর্ত্তনাস্বরূপ। নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত যে প্রবর্ত্তনা আমাদের প্রেরিত করে' ভবচক্রকে অতিক্রম করায় তারই নাম দর্শনমার্গ কিন্তু এ বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের এই ক্ষুদ্র আলোচনায় আমরা যে সিদ্ধান্তে পোঁছিলাম তাতে দেখা যাচ্ছে যে সাধারণভাবে তত্ত্ববিদ্যা আলোচনা অর্থে দর্শন শব্দের সংস্কৃত সাহিত্যে প্রয়োগ নেই এবং সেই অর্থে দার্শনিক শব্দেরও প্রয়োগ নেই। বলা বাহুল্য যে দর্শন শব্দের সংস্কৃত অর্থের ইতিহাস অনুসরণ করলে এই শব্দটিকে ইংরেজী Philosophy শব্দের অনুরূপ অর্থে আমরা ব্যবহার করতে পারি না। আমাদের দর্শনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছিল এমন একটা উপলব্ধি যে উপলব্ধির পরিণামে আমরা সর্ব্ববন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি। মতে মতে অনেক পার্থক্য ছিল কিন্তু সকল মতের লোকেরাই একটি অতি সম্ভ্রান্ত মহিলাকে প্রমাণ বলে মানতেন। সে মহিলাটি ভগবতী শ্রুতি। বৌদ্ধ বা জৈনেরা শ্রুতি মানতেন না কিন্তু বুদ্ধবচন বা জিনবচনকে অভ্রান্ত বলে' মানতেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আজ আমরা যে দর্শন সভার উদ্বোধন করতে এসেছি এখানে আমরা কোন্ অর্থে দর্শন শব্দকে গ্রহণ করব। আমরা কি সকলে একত্র হয়ে আমাদের পরস্পরের দর্শণীয় রূপ দর্শন করব, না পরস্পরে একত্র হয়ে আমরা আত্মদর্শন করব, না কোনও একটি বিশেষ দেশী বা বিদেশী মতের আলোচনা করব, না ইংরেজীতে যাকে Philosophy বলে সেই অর্থেই দর্শন শব্দ গ্রহণ করে' আমাদের আলোচনা পদ্ধতি নির্ণয় করব। ইংরেজী Philosophy শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। নানাবিধ ব্যাপার বা ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত কোনও মূল কারণ, ন্যায় বা কার্য্যকরী ধারণা কিংবা কোনও যুক্তিসম্বলিত মত এই সকল অর্থে Philosophy শব্দের ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হয়। In the widest sense Philosophy means explanation of any set of

phenomena by reference to its determining principles whether practical, causal or logical ; theory, reasoned doctrine. এই অর্থে সকল ব্যাপারেরই যে একটি মূল সূত্র আছে তাহার অন্বেষণকে Philosophy বলা চলে। আবার সকল ব্যাপার এবং সকল ঘটনাই যে একটি মূল কারণকে অপেক্ষা করে এই ভাবে ও এই দৃষ্টিতে সকল বিষয় দেখিবার অভ্যাস ও শক্তি তাকেও Philosophy বলে। আমাদের মধ্যে এমন একটি তত্ত্বানুসন্ধিৎসা আছে যার দ্বারা প্রেরিত হয়ে আমরা আমাদের সকল কাজেরই একটা কারণ খুঁজি। আমরা মনে করি যে ব্যক্তি এই কারণদৃষ্টিতে নিষ্ণাত সে ঘটনাচক্রের তাড়নায় অভিভূত হয় না। আমরা বলি লোকটার মধ্যে একটা Philosophy আছে, অনেক দুঃখ কষ্টেও সে দমে না। Philosophy means the power and habit of referring all events or special facts to some general principle and of behaving (of reacting to the events and facts) in the light of this reference ; the working theory of things as exhibited in conduct. Thus we say he took it philosophically ; he is a real philosopher. দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত-স্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে—এই মুনিধর্ম্মকেও Philosophy আখ্যা দেওয়া হয়। আবার যা একান্তভাবে পরমার্থসৎ তার অন্বেষণ করাকে Philosophy বলা হয়। Philosophy in its technical sense means an investigation into the nature of the fundamentally real so far as from its consideration, laws and truths may be derived applying to all facts and phenomena. যথার্থ পরমার্থসৎ কি তা নির্ণয় করে' সেই দৃষ্টিতে সমস্ত জগতের সমস্ত ব্যাপারকে উপপাদন করা Philosophyর একটি প্রধান কাজ। আবার সত্য কি, পরমার্থসৎ কি, উপলব্ধি কি, তার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করে' আমাদের সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে উপনীত হওয়াকেও Philosophy বলে। Philosophy is a theory of truth, reality or experience, taken as an organised whole and so giving rise to general principles which unite the various branches or parts of experience into a coherent unity ; as such it is not so much any one discipline of science as it is the system and animating spirit of all. মোটামুটি দেখতে গেলে Philosophy হচ্ছে সেই বিদ্যা যে বিদ্যা দ্বারা সমস্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়ে আমরা একটা মূল সত্যে পৌঁছতে পারি এবং সেই মূল সত্যের দৃষ্টিতে সমস্ত ঘটনাপরম্পরা এবং জীবনের গতিকে একটা মূল সত্যের মধ্যে বিধারণ করতে পারি। আমি এখানে Philosophy শব্দের ইউরোপে প্রচলিত কয়েকটি অর্থ মাত্র দিলাম। এই অর্থের

সহিত সকলে যে একমত হবেন তা আমি মনে করি না। এই শাস্ত্র উত্তরোত্তর অর্ব্বাচীন-কালে তার পূর্ব্বতর লক্ষণসীমাকে নিরন্তর উল্লঙ্ঘন করতে চেষ্টা করছে কাজেই Philosophy শব্দের একটা কায়েমী লক্ষণ দেওয়া যায় না।

কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের আলোচনার বিষয় এই যে আমাদের দেশের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত একত্র হয়ে যে এই দর্শন-সভা স্থাপন করেছেন এর তাৎপর্য্য কি এবং উদ্দেশ্য কি। আমরা দেখেছি যে আমাদের দেশে দর্শন শব্দের কয়েকটি প্রধান অর্থ আছে। একটি হচ্ছে ইন্দ্রিয়-দ্বারা বিশেষত চক্ষুর দ্বারা দেখা। দ্বিতীয় হচ্ছে মনের দ্বারা আলোচনা করা এবং মনের ভিতরের বস্তু মনের দ্বারা নিরীক্ষণ করা। তৃতীয়, ধ্যানের দ্বারা বিশেষ বিশেষ সত্যের উপলব্ধি করা। চতুর্থ, উপলব্ধিব্যাপ্য সমস্ত জ্ঞান সুখদুঃখাদি সমস্ত অনুভব, নানাবিধ ইচ্ছা প্রযত্ন প্রভৃতি, অলৌকিক অনুভব, সমাধিজ প্রজ্ঞা প্রভৃতি এ সমস্তই উপলব্ধি-পদবাচ্য বা দর্শন-পদবাচ্য, ইংরেজীতে যাকে বলে experience। শুধু দৃক্-পদবাচ্য যে pure experience বা দৃশি তাকেও আমরা এই দর্শনের মধ্যে নামিয়ে আনতে পারি। এই সরণী অবলম্বন করে' আমি বলব যে দর্শন হচ্ছে সেই শাস্ত্র বা আলোচনা-পদ্ধতি যা-দ্বারা দৃষ্ট বা আনুমানিক উপায়ে আমাদের সমস্ত প্রকারের উপলব্ধিকে আমরা কোনও একটী শৃঙ্খলা বা পর্য্যায়ের মধ্যে এনে আমাদের উপলব্ধি ও উপলব্ধব্যের নবতর রহস্য ও নবতর সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে পারি। এই লক্ষণ-অনুসারে আমরা কোনও শ্রুতিবচন বা আপ্তবচনের অভ্রান্ত সত্যতা মানব না। কিন্তু শ্রুতিবচন ও আপ্তবচনের মধ্যে মহাজনদের অনুভূতির যে একটা সত্যতা আছে তা অস্বীকার করিতে পারি না। তেমনই যোগী বা ভক্তের উপলব্ধিও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সমস্ত মনুষ্যলোকের সমস্ত উপলব্ধিই আমাদের কুলক্রমাগত সম্পত্তি। কিন্তু কোনও উপলব্ধিকে মানতে হলে কি সেই উপলব্ধিলব্ধ বস্তুর তাত্ত্বিক বা পারমার্থিক সত্তা আছে বা তাঁরা যে তাঁদের উপলব্ধির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে ব্যাখ্যাই সত্য তাও মানবার কোনও প্রয়োজন নেই। উপলব্ধিটা তাঁদের পাওয়া কিন্তু ব্যাখ্যাটা তাঁদের বুদ্ধিপ্রয়োগের ফল। কাজেই সেখানে তাঁরা আমাদের সমধর্ম্মী।

বর্ত্তমানকালে নানাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে চাক্ষুষবিজ্ঞানের ক্ষেত্র অনেক বেশী-পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। তাছাড়া মানুষের যুক্তিপ্রণালীও নব নব মার্গে প্রেরিত হচ্ছে এবং নবতর রূপ ধারণ করছে। পৃথিবীর সমস্ত জাতির ইতিহাস ও কার্য্যকলাপ, তাদের সুখদুঃখ, চিন্তাপ্রণালী, সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা বিবর্ত্তন আজ আমাদের কাছে করামলকবৎ। জৈবলীলার বহু রহস্য আজ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। শষ্পলোক থেকে মনুষ্যলোক পর্য্যন্ত যে স্রোত ক্রমাবরোহে বয়ে চলেছে তার মধ্যে জৈবলীলার যে রহস্য আমরা দেখ্‌তে পাই তাতে আমাদের সম্মুখে একটা নূতন জগৎ উন্মুক্ত হয়েছে। গণিত ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্র, জড়জগতের নানা রহস্য, নানা নিয়ম,

নানা শৃঙ্খলা আজ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই সমস্ত বিবেচনা করলে দেখা যায় আজ আমাদের দর্শনের ক্ষেত্র এত প্রসারিত হয়েছে যে অন্য কোনও যুগের মানুষের পক্ষে তা কল্পনারও যোগ্য হ'ত না।

আবার উপলব্ধির ক্ষেত্র এত বিস্তৃত হওয়া সত্বেও মানুষের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, বুদ্ধি প্রভৃতির স্বরূপে কোনও পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। এমন কি ভারতবর্ষ ও ইউরোপের তত্ত্বালোচনার পদ্ধতি তুলনা করলে দেখা যায় যে অতি-আধুনিক কালে যে সমস্ত চিন্তা এসে নূতন বলে' প্রচারিত হচ্ছে বিচ্ছিন্ন ভাবে তাদের অনেকখানিই আমাদের প্রাচীন চিন্তাধারার মধ্যে পাওয়া যায়। আবার আর একদিকে একথা বলে' বসে থাকা যায় না যে এই সমস্ত চিন্তা ত' আমাদেরও ছিল অতএব ইউরোপীয় চিন্তায় আমাদের শেখবার কি আছে। একই সত্বরজস্তম যেমন সর্ব্ববস্তুরই মূল কারণ হয়েও প্রত্যেক অবস্থাভেদে নব নব বস্তুর সৃষ্টি করেছে তেমনি নানা চিন্তাধারার মূলগত ঐক্য থাকলেও বিভিন্ন সমাবেশে আমাদের সম্মুখে বিবিধ বিচিত্র সৃষ্টি নিরন্তর ভেসে আসছে।

আবার বর্ত্তমানকালে বৈজ্ঞানিক যুগের বিচিত্র পরিবর্ত্তনে যে বিচিত্র জ্ঞান, বিচিত্র আদর্শ, বিচিত্র প্রকারের ক্ষুধা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, উদ্রিক্ত হচ্ছে তাতে আমাদের মত ও বিশ্বাস ও রুচি নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। পৌরাণিককালে নারদ ঋষি নিরন্তর আকাশমার্গে গমনাগমন করতেন। দেবতারা অসুরের সহিত যুদ্ধে মানুষের সাহায্য চাইতেন। কারীরি যজ্ঞ করলে তখন হ'ত বৃষ্টি, মারণ-দ্রাবণ-অভিচারে শত্রু যেত পালিয়ে, আনাচে-কানাচে দেখা পাওয়া যেত রম্ভা-মেনকা-উর্ব্বশী-তিলোত্তমাদের। ব্রাহ্মণেরা করতে পারতেন অভিশাপে ভস্ম কিংবা মানুষকে পরিবর্ত্তন করতে পারতেন অজগর সর্পে। তপস্যা করলে শিবঠাকুর প্রসন্ন হয়ে দিতেন বর। যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্ব-ভূত-পিশাচেরা প্রায়ই এমোড়ে-ওমোড়ে ঘুরে বেড়াত। হনুমান যেতেন একটি লম্ফে ভারতবর্ষ থেকে লঙ্কাদ্বীপে। এই সমস্ত প্রাচীন কল্পলোক যেখানে আছে সেইখানেই থাকুক, তাদের অবিশ্বাস করে ফল কি। সেটী হোক আমাদের কাব্যের মানসলোক। তাদের নিয়ে আমরা নাড়াচাড়া করতে চাই না। সেকালের লোকেরা যা তাদের চোখে দেখেছেন বা কল্পনায় পেয়েছেন তা লিখে রেখে গেছেন তাঁদের গ্রন্থে। আমরা আজ একালের লোক। প্রাচীন সুরলোকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ গেছে চিরকালের মতন ছিন্ন হয়ে। আজ আমরা একালের লোক, আমাদের চোখের দেখায় আর একটা নূতন জাতীয় কল্পলোক এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। আমরা উর্ব্বশীর সঙ্গীত শুনতে পাই না বটে কিন্তু দূরশ্রুতির আমাদের অভাব নেই। পাতালপুরী থেকে সুরলহরী আমরা ইচ্ছামত যন্ত্রসহযোগে শুনতে পাই। আমাদের পুষ্পক রথ নাই, মাতলি নাই কিন্তু ইচ্ছা করলেই আমরা বিমানে আরোহণ করে আকাশের যেখানে সেখানে বেড়াতে পারি। মহাসমুদ্রের তলা দিয়ে আমরা সপ্তসমুদ্রে বিচরণ করতে

পারি। ঘোটকবিহীন রথে আমরা অতি দ্রুতবেগে পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারি। আমাদের পাশুপতাস্ত্র নাই, ব্রহ্মাস্ত্র নাই কিন্তু আমরা যে ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংস করতে পারি তা দেখ্‌তে পেলে ইন্দ্র ও রুদ্র যে একান্ত বিস্মিত হতেন একথা হলপ করে বলা যায়। যে চাক্ষুষ ও আনুমানিক উপায়ে বর্ত্তমানযুগ এই নূতন কল্পলোক সৃষ্টি করেছে—সেই উপায় অবলম্বন করেই কেবল মনুষ্যসুলভ নয়, সর্ব্বপ্রাণিসুলভ যত প্রকার উপলব্ধি আছে সমস্ত উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করে' ব্যাপকভাবে বা খণ্ডভাবে আমরা নিরন্তর নব নব দৃষ্টি, নব নব রহস্য উদ্ঘাটন, নব নব সম্বন্ধের আবিষ্কার করে আমাদের ভূয়োদর্শনকে আমরা বাড়িয়ে চল্‌ব। আমরা জানি যে এই ব্রহ্মাণ্ড কি বৃহৎ, আমাদের উপলব্ধির ক্ষেত্র কি অসীম। সমস্ত তত্ত্বের পারমার্থিক মীমাংসা হয়ত বা কোনওকালে মনুষ্যজাতির ভাগ্যে নাই। কিন্তু মনুষ্যজাতির ভাগ্যে আছে দৃষ্টির প্রসার-বৃদ্ধি। এই দৃষ্টির প্রসার-বৃদ্ধিতেই দর্শনের প্রসার-বৃদ্ধি।

আমি ইতিপূর্ব্বে বলেছি যে আমাদের দর্শনের আলোচনা প্রধানত দর্শন ও অনুমানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ক্ষেত্রে ভগবতী শ্রুতির বা কোনও সাধু মহাপুরুষের সমাধিলব্ধ কোন বাক্যকে পরমার্থসৎ বলে মান্‌ব না। আমরা যে অর্থে দর্শন শব্দ বা philosophy শব্দ ব্যবহার করেছি সে অর্থে উপনিষদ্‌ দর্শন বা philosophy নয়। কিন্তু আমার এ কথা থেকে আমাদের এই দর্শনের বিচারের ক্ষেত্রে উপনিষদের বাক্যকে যে পরম প্রমাণ বলে মনে করতে পারি না এ কথায় উপনিষদের প্রতি কোনও অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি তা যেন কেউ মনে না করেন। ভগবতী শ্রুতিকে সর্ব্বান্তঃকরণে অভিবাদন করে আমি বল্‌ব, মা, তুমি আমাদের এই কিচির-মিচিরের মধ্যে এস না। এক একটী ক্ষেত্র আছে যেখানে পরম পূজ্যপাদের বাক্যকেও স্বীকার করা যায় না। একবার তর্কশাস্ত্রের মধ্য কি উপাধি পরীক্ষায় একটী ছাত্র সকল উত্তর-পত্র জুড়িয়ে ৮ কি ১০ নম্বর পেয়েছিল, সে ছাত্রটির যিনি ছিলেন অধ্যাপক তাঁর কাছে আমিও কিছু ন্যায় আলোচনা করেছিলুম। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক। তাঁকে আমি অত্যন্ত ভক্তি করতুম, তিনি আমাকে আদেশ করলেন ছেলেটিকে পাশ করিয়ে দিতে। এ অবস্থায় তাঁর আদেশ প্রতিপালন করতে পারিনি কিন্তু কদাচ মনে করি না যে কোনও সময়ে তাঁর প্রতি আমার ভক্তির ন্যূনতা ছিল। দর্শন হচ্ছে সেই পথ যে পথে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে মননের দ্বারা ও মননলব্ধ জ্ঞানকে ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের দ্বারা যাচাই করে প্রকাশ করি এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রকে করি প্রসারিত। কাজেই শ্রুতিবাক্যের এখানে প্রবেশ অসঙ্গত। যদি ধরে' নেওয়া যায় যে ঋষিরা যে সমস্ত অতীন্দ্রিয় সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন উপনিষদে সেই সমস্তই তাঁরা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন ভাষায়। কিন্তু অতীন্দ্রিয় সত্যকে, সমাধিলব্ধ জ্ঞানকে, প্রজ্ঞাকে যখনই আমরা করি ভাষায় প্রকাশ তখনই আমরা

তাঁকে অনুবাদ করে' আনি সাধারণ জ্ঞানের পর্য্যায়ের মধ্যে কারণ ভাষা আমাদের সাধারণ পর্য্যায়ের জ্ঞানকেই করতে পারে কথঞ্চিৎ প্রকারে প্রকাশ। আজ ইউরোপের নব্য নৈয়ায়িকেরা এই কথা প্রমাণ করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন যে আমরা যা চোখে দেখি এবং যা ভাষায় প্রকাশ করি এই দুইয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য। আমরা বলি এটা এবং ওটা, এটা কিংবা ওটা কিন্তু জগতে 'কিংবা' 'এবং' বলে কোনও বস্তু প্রত্যক্ষীভূত হয় না, এমন কি আমরা যখন বলি এটা আছে তখন 'এটা'কে আমরা প্রত্যক্ষ করি 'আছে'টা একেবারেই অপ্রত্যক্ষ অথচ এই 'আছে' নিয়েই এবং 'আছে'র স্বরূপনির্ণয় নিয়েই অধিকাংশ দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। ভাষায় যখনই প্রকাশিত হ'ল তখনই অতীন্দ্রিয় সত্যের মর্য্যাদা গেল বিনষ্ট হয়ে। 'ব্রহ্ম কি' এই প্রশ্ন নিয়ে বাহ্ব ছিলেন একেবারে নীরব। সেই নীরবতাই একমাত্র প্রকাশ করতে পারে ব্রহ্ম কি। উপনিষদের ভাব যখন বাক্যে প্রকাশিত হ'ল তখন পড়ে' গেল তা বাক্যের নিয়মে যুক্তির নিয়মে, সে নিয়মগুলি পড়ে সাধারণ জ্ঞানের পর্য্যায়ে তাই আমরা দেখ্‌তে পাই উপনিষদ্ কি বলেছেন, তার তাৎপর্য্য নিয়ে আমাদের দেশে শত শত বৎসর ধরে চলেছে বাদী-প্রতিবাদীর মধ্যে তর্কযুদ্ধ, উৎপন্ন হয়েছে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ইত্যাদি। সেইজন্যেই বাক্যের মধ্যে যা প্রকাশ পেয়েছে তার সত্যতা আর অভ্রান্ত বলে মানা যায় না। সাগরের জল এসে পড়েছে কূপের মধ্যে। আমি যোগ পড়াই এবং যোগ-সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখি টিখি—একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কি যোগী যে যোগ পড়ান? আমি তাকে বলেছিলুম যে না। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, তবে আপনি যোগ পড়ান কি করে? আমি তাকে বললুম—আমি শাস্ত্রবাক্যের অর্থ করি এবং শাস্ত্রবাক্যের যে যুক্তি তাই অনুকূল উদাহরণের দ্বারা বুঝ্‌তে ও বোঝাতে চেষ্টা করি। তিনি বল্লেন—যোগীর জ্ঞান না হলে যোগ পড়ান যায় না। আমি তাঁকে বল্লুম—ধরুন আমি মহর্ষি পতঞ্জলি কি ঋষি বামদেব, আমার নানাবিধ যৌগিক প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, সেই প্রজ্ঞাকে আমি আমার ছাত্রকে জানাব কি করে? যে মুহূর্ত্তে আমি ভাষায় প্রজ্ঞাকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি সেই মুহূর্ত্তেই তা বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে পরিণত হয়ে তার আপন অলৌকিকত্ব বর্জ্জন করেছে, তা এসে পড়েছে সত্যানৃতমিথুনীকৃত ব্যবহারলোকের মধ্যে। আচার্য্য শঙ্কর এই কথার আলোচনা করে' প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে মিথ্যা সঙ্কেতের দ্বারাও সত্য প্রতিপত্তি হ'তে পারে কিন্তু তার জবাবে এই বলা যায় যে সেই প্রতিপত্তি যে এক রকমই হবে তার প্রমাণ কি। ভগবতী শ্রুতিকে ত' সকলেই মানে অথচ একই শ্রুতি বিভিন্ন বাদীরা বিভিন্ন অর্থ করেন এবং সেইজন্যই আচার্য্য শঙ্কর স্বমত স্থাপনের জন্য বহু বাদী-প্রতিবাদীর সহিত অনেক দ্বন্দ্ব করেছেন। অতএব এ কথা মান্‌তেই হয় যে মিথ্যার দ্বারা সত্যকে বোঝা গেলেও তা' যে একরূপ ভাবে

বোঝা যাবে তা বলা যায় না আর একরূপ ভাবে বোঝা না গেলেই সত্যাপ্রত্যায়কতা হবে অবিসম্বাদিত। তার মূল্য সেখানে হ'ল বিনষ্ট কারণ এই বাদী-প্রতিবাদীর মতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য তা নির্ণয়ের ভার পড়ল বুদ্ধির উপর, তা পড়ে' গেল আমাদের সাধারণ জ্ঞানপর্য্যায়ের মধ্যে।

আর একটি কথা এই যে ধ্যানের দ্বারা বা অলৌকিক প্রতিভাসের দ্বারা, যোগ বা সমাধির দ্বারা বা কৈবল্যভাগীয় প্রাক্তন কর্ম্মের দ্বারা যে অলৌকিক প্রতিভাস ঘটে তা যদি মূল সত্যকে ব্যক্ত করেও তথাপি সেই প্রতিভাসের দ্বারা ব্যবহারিক লোকে জ্ঞানপর্য্যায়ের দর্শন বা experienceএর কোনও উপকার বা উপযোগিতা নাই। ঘটশরাবাদির মধ্যে মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য এ হয় ত সত্য হতে পারে কিন্তু ব্যবহারিক লোকে মৃত্তিকা জানলেই আর সমস্ত মৃত্তিকাজাত বস্তুর জ্ঞান সম্পন্ন হয় না। লোহা জানি বলেই সমস্ত ইঞ্জিন কলকব্জা সবই জানি এ কথা বলা চলে না। কাজেই কোনও অলৌকিক জ্ঞানের দ্বারা আমাদের লৌকিক জ্ঞানপর্য্যায়ের কোনও প্রসারবৃদ্ধি সম্ভব নয়। অলৌকিক জ্ঞানের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে যে জ্ঞান বিধৃত হয়ে রয়েছে হয় ত কোটি কোটি বৎসর ধরে' তাকেই আমরা ব্যাখ্যা করব অসংখ্যেয় নবতর ও কল্যাণতর মূর্ত্তিতে। সেইখানেই ব্রহ্মজ্ঞান পরিণত হয় তার যথার্থ বৃহত্ত্বে এবং মনুষ্যজাতির মঙ্গলের প্রেরণায় এবং এই রকম জ্ঞানই কোনও দর্শনপরিষদের বিচারের বিষয় হতে পারে। কোনও যোগী বা তপস্বী, কোনও অলৌকিক সম্পদ্‌ বা বিজ্ঞান সেইভাবে কোনও দর্শনপরিষদের আয়ত্বের মধ্যে পড়ে না।

কোনও যোগী বা সাধু, কোনও ফকির বা মহাপুরুষ যদি জগতের তত্ত্বটি আমাদের হাতে তুলে দিতে পারতেন তবে ভারতবর্ষে যেখানে শতশত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন সেখানে আমাদের দশাটা এখন যেমন ঘটেছে তেমন ঘটত না। আমরা যে কেবলমাত্র ধনে বলে ও বিজ্ঞানে একান্ত পশ্চাৎপর তা নয়, ধর্ম্মে ও নীতিতেও আমরা কোনও জাতির চেয়ে অগ্রণী নই। সেই ব্রাহ্মণ এখনও সেই আছে, তার গৌরকান্তি এখন মসীময় হয়েছে, তার ক্ষমা, শৌচ, দয়া কোথায় বিলুপ্ত হয়েছে। পৃথিবী ভস্ম করা দূরে থাকুক, সে ব্রহ্মাগ্নিতে আজকাল একটি তৃণ পর্য্যন্ত জ্বলে না। যে ব্রহ্মের শক্তিতে আগুণে তৃণ জ্বলে, বায়ুতে তৃণ ওড়ে, সে ব্রহ্মের শক্তি আজ আর আমাদের নাই। যিনি দৃক্‌-স্বরূপ তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন আমাদের দর্শনে আমাদের অনুমানে। আমরা প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানকে অনেক দিন ধরে তুচ্ছ করে অবলম্বন করেছিলুম বিশুদ্ধ তর্কজালের ঘূর্ণিকে। জ্ঞানের পথ থেকে ব্যবহারকে করেছিলুম বিচ্ছিন্ন, কাপুরুষতাকে মনে করেছিলুম ক্ষমা। আলস্যকে মনে করেছিলুম মুনিধর্ম্ম। তাই আমরা নেমে এসেছি গড়িয়ে সোপানের নীচে। আমাদের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের আদর্শের যে পুণ্যবল যে চরিত্রবল তাকে চোখের সামনে রেখে আমাদের দর্শন তার গভীর দৃষ্টির দ্বারা আমাদের জাতির

মধ্যে আসুক নূতন চিন্তা যে-চিন্তার বলে জাতি জ্ঞানে ও বীর্য্যে, চরিত্রে ও ধর্ম্মে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন নিতে পারে। এই দর্শনপরিষদ্‌কে উদ্‌বুদ্ধ করবার জন্যে একটিমাত্র মন্ত্রের কথা আমার মনে হয় সেটি হচ্ছে আমাদের চিরন্তন গায়ত্রী মন্ত্র 'ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ' যিনি আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরিত করেন দেবতার সেই পরম বরণীয় তেজকে আমরা ধ্যান করি। আধুনিক যুগের সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত উপলব্ধি, সমস্ত জ্ঞান করব আমরা আহরণ। আমাদের প্রাচীনদের কুলক্রমাগত সমস্ত সম্পত্তি আমরা সম্পূর্ণভাবে করব আবিষ্কার এবং এই উভয় লোককে আমরা বিধারণ করব আমাদের দর্শনের দ্বারা, আমাদের মননের দ্বারা।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।*

* বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে প্রদত্ত উদ্বোধন বক্তৃতা।

জৈনসম্মত অনেকান্ত-বাদের স্বরূপ

শ্রীঅনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, তর্কতীর্থ

ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বাহ্য ও আভ্যন্তর এই উভয়বিধ পদার্থেরই পারমার্থিকত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। যথা—চার্ব্বাক, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্বমীমাংসা, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মাধ্বাদি-বৈষ্ণবদর্শন, বৌদ্ধদর্শনের সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায়। এই সব মতাবলম্বিগণ যথার্থজ্ঞানে বাহ্যবস্তু ঘটাদির যে স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা পারমার্থিক সত্য বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ হয় ত স্থিরতা স্বীকার করেন কেহ বা স্থিরতা মানেন না, বস্তুত্বনিবন্ধনই ঘটপটাদির ক্ষণিকত্ব স্বীকার করেন অর্থাৎ উৎপত্তির অনন্তর স্থিরতা স্বীকার করেন না। কিন্তু স্থিরত্ববাদিগণ যেমন ভাবে ঘটাদি বস্তুর পারমার্থিকত্ব মানেন অস্থিরতাবাদিগণও তেমনই পারমার্থিকতা স্বীকার করেন। অর্থাৎ স্থিরত্বাস্থিরত্ব-সম্বন্ধে বিবাদ থাকিলেও বাহ্যবস্তুর পারমার্থিকত্বে ইঁহাদের কোনও মতভেদ নাই। এইরূপ আন্তর বস্তু-জ্ঞান, সুখ, দুঃখাদিরও ইঁহারা বাস্তবিকতা স্বীকার করেন। বিশেষতঃ ইঁহাদের মতে অভিধেয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি কেবলান্বয়ী। অর্থাৎ পদার্থমাত্রকেই ইঁহারা নাম-প্রকাশ্য এবং যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া স্বীকার করেন। পদার্থের স্বরূপ যতই জটিল ও সূক্ষ্ম হউক না কেন "ইদমিত্থম্ভাবে" সকলেরই শব্দব্যবহার্য্যত্ব আছে এবং জ্ঞান-প্রকাশ্যত্বও রহিয়াছে বলিয়া ইঁহারা বলেন।

বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের আর এক শাখা রহিয়াছে, যাঁহারা যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা বাহ্যবস্তু ঘটপটাদির পৃথক্ অস্তিত্বই মানেন না। তাঁহারা কেবল আভ্যন্তর বস্তুবিজ্ঞানেরই পারমার্থিকত্ব স্বীকার করেন। জ্ঞানের আকার ভিন্ন বিষয় হিসাবে ঘট, পটাদি কোনও বাহ্য বস্তু আছে বলিয়া ইঁহারা মানেন না। অভিধেয়ত্ব বা প্রমেয়ত্বকে ইঁহারা কেবলান্বয়ী বলিয়া মানেন না। ইঁহাদের মতে নিরাকার চিৎ-সন্ততির কোনও বাচক অভিধান বা প্রকাশক জ্ঞানান্তর নাই। কাজেই উহা অভিধেয় বা প্রমেয় নহে।

বৌদ্ধদের আর এক শাখা রহিয়াছে যাঁহারা শূন্যবাদী বা মাধ্যমিক নামে প্রসিদ্ধ; তাঁহারা বলেন যে, বাহ্য বা আভ্যন্তর কোনও বস্তুরই পারমার্থিক সত্তা নাই। বস্তুমাত্রই সংবৃতি-সৎ, ব্যবহার-পর্য্যন্তই বস্তুর অস্তিত্ব। ব্যবহারের অতীত অবস্থায় কোন বস্তুরই অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ইঁহারা সুষুপ্তিকে দৃষ্টান্ত করিয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে চান। সুষুপ্তিই হইল ব্যবহার-রহিত অবস্থার দৃষ্টান্ত, উহাতে বাহ্যবস্তু ঘটপটাদি

বা আভ্যন্তর বস্তু বিজ্ঞানাদি কাহারও অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই বস্তুমাত্রই ব্যবহারে সৎ, পরমার্থতঃ কোনও বস্তুই সৎ নহে।

আস্তিকদর্শনের অপর একটী প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় রহিয়াছে, যাঁহারা অদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রখ্যাত। তাঁহারা বলেন বাহ্যবস্তু ঘটপটাদি বা আভ্যন্তর বস্তু বৃত্তিজ্ঞানাদি ইহাদের কোনটাই পারমার্থিক সৎ নহে। এ সমস্ত বাহ্য বা আন্তর প্রপঞ্চ সবই ব্যবহারিক, সবই মিথ্যা, সবই কল্পিত। ঘট, পটাদি বাহ্যবস্তু বা বৃত্তিজ্ঞানাদি আভ্যন্তর বস্তু অপরোক্ষ হিসাবে ভাসমান হইলেও এগুলি সবই অনির্ব্বচনীয়। ব্রহ্মজ্ঞানানন্তর বাধা প্রাপ্ত হইয়া যায়, তাই সৎ-রূপে নির্ব্বচনার্হ নহে এবং অপরোক্ষ জ্ঞানে প্রকাশ পায় বলিয়া অসৎও নহে। অসৎ বস্তুর কখনও অপরোক্ষ বিজ্ঞান দেখা যায় নাই। এইরূপে সৎ বা অসৎ বলিয়া নির্ব্বচন হয় না, তাই দ্বৈতপ্রপঞ্চমাত্রই অনির্ব্বচনীয়। অপর প্রণালীতেও দ্বৈত বস্তুর অনির্ব্বচনীয়ত্ব বুঝিতে পারা যায়। যথা,—ক্ষুদ্র বটবীজ হইতে অঙ্কুরাদি মহামহীরুহ উৎপন্ন হইল, অল্পপরিণাম শুক্র হইতে বিচিত্র শরীর প্রাদুর্ভূত হইল, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল, এ তত্ত্ব আজ পর্য্যন্তও বুঝা গেল না, ভবিষ্যতেও বুঝা যাইবে না। যাঁহারা বুঝেন বলিয়া অভিমান করেন সেই জড়বাদিগণও ইহার ইহার সমবধানে এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া থাকে এই পর্য্যন্তই বলেন, কেন হইল কেমন করিয়া হইল বলিতে পারেন না। জিজ্ঞাসা করিলেই জিজ্ঞাসুকে মূর্খ বলিয়া তিরস্কারের ধাপ্পাবাজীতে আত্মগোপনের আনন্দানুভব করিয়া চরিতার্থ হয়েন। বেদান্তিগণ বলেন "একোঽহং বহু স্যাং" এইরূপ ঈশ্বর-সংকল্প হইতেই আকাশ-বাতাসাদি বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হইল। অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াশক্তির প্রভাবেই পরমাণু প্রভৃতি উপাদান-নিরপেক্ষ রচনা সম্ভব হইল ঈশ্বরীয় শুদ্ধসংকল্পের ফলে। যেমন আমরা প্রতিদিনই স্বপ্নে প্রত্যক্ষসিদ্ধ পাহাড়, পর্ব্বত, মনোরম নগর, নানাবিধ জীবজন্তুর সৃষ্টি করিয়া থাকি সংস্কারাতিরিক্ত উপাদানের অপেক্ষা না রাখিয়া। কিন্তু জাগরণে আর ঐ স্বপ্ন-রচিত প্রপঞ্চের অস্তিত্ব পাই না এবং বলিয়া থাকি মিথ্যাই এই সকল দেখিয়াছি, কতই না কল্পনা করিয়াছি। তুল্য যুক্তিতে জাগরণকালের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ পাহাড়-পর্ব্বতাদি বিশ্ব-প্রপঞ্চও মিথ্যা বলিয়াই অনুভূত হয় ব্রহ্মাত্মার অপরোক্ষ অনুভূতির পরে। স্বপ্ন-প্রপঞ্চের মত জাগরণের বিশাল প্রপঞ্চও যে কল্পনামাত্র, মায়া-মাত্র-শরীরই, পারমার্থিকতা যে উহাদের আদৌ নাই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। যেমন স্বপ্ন না ভাঙ্গিতে স্বাপ্ন-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব কিছুতেই বুঝা যায় না উহা পরম সত্য বলিয়া স্বপ্নকালে মনে হয়, তেমনই যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ব্রহ্মাত্মার সাক্ষাৎকার হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিশাল প্রপঞ্চ যে গন্ধর্ব্ব-নগরের মতই কল্পনামাত্র ইহা বুঝা যায় না। এত এত জাহাজ-ডুবি বোমা, ব্যোম-যান, কামান, ট্যাঙ্ক এ সবই মিথ্যা ইহা যে বলে তাহাকেও নিতান্ত আহাম্মক ছাড়া বা প্রতারক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। প্রদর্শিত

ব্যাখ্যানুসারে অদ্বৈত-বাদে অনাত্ম-প্রপঞ্চ মিথ্যা অর্থাৎ কল্পিত হইলেও মাধ্যমিক-বাদের মত উহা শূন্যে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয় নাই। কল্পনার নিরাধারত্ব সম্ভব হয় না বলিয়াই কল্পনার অধিষ্ঠান হিসাবে চিদ্বস্তুকেই একমাত্র সৎ বলা হইয়াছে। স্বপ্নদৃষ্ট নগরাদি জাগরণে বাধা প্রাপ্ত হইলেও ঐ সকল বস্তুর যে প্রকাশ তাহা বাধা প্রাপ্ত হয় না। জাগরণেও দেখাটা সত্যই থাকে, কিন্তু যাহা দৃষ্ট হইয়াছিল সেই দৃশ্য-জাতই বাধিত হয়। তুল্য যুক্তিতে ব্রহ্মাত্মার অপরোক্ষানুভূতির পরেও সংসারকালীন প্রকাশের বাধা হয় না, বাধা হয় প্রকাশ্য বস্তুর। বিশেষতঃ সর্ব্ব-প্রমাণ-মুকুট-মণি বেদান্ত-বাক্যসমূহও সমস্বরে ব্রহ্মাত্মার ত্রিকালসত্যতা এবং অনাত্ম-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। এই সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া এবং বিদ্বদনুভব-বলে অদ্বৈতবাদিগণ অনাত্ম-প্রপঞ্চের সাংবৃতিকত্ব এবং অখণ্ডানন্দৈকরস পরিপূর্ণ স্বপ্রকাশস্বভাব চিদাত্মার পারমার্থিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

দ্বৈত, অদ্বৈত ও শূন্যবাদিগণের এই যে সব মৌলিক সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইল, ইহাদের সর্ব্বত্রই একান্ত-পক্ষপাতিত্ব রহিয়াছে। একটু অনুধাবন করিলেই এই এক-পক্ষপাত বেশ বুঝা যায়। কেহ কেহ বাহ্য ও আভ্যন্তর এই সকল বস্তুরই পরমার্থতা স্বীকার করিয়াছেন, মিথ্যাত্ব মানেন নাই। সুতরাং সর্ব্বত্র পারমার্থিকত্বরূপ একান্ত-বাদী। যিনি বিজ্ঞানের সত্যতাবাদী তিনিও বাহ্যের সত্যতা না মানায় একান্ত-পক্ষপাতী। শূন্যবাদীও কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার না করায় এক-পক্ষপাতী হইয়াছেন। অদ্বৈতবাদীও পূর্ণানন্দৈকরস স্বপ্রকাশস্বরূপ চিৎবস্তুমাত্রেরই পারমার্থিকত্ব স্বীকার করায় বিজ্ঞানবাদীর মতই একান্তবাদী হইয়াছেন।

বিজ্ঞানবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ অথবা অদ্বৈতবাদী বেদান্তিগণ যেমন একান্ত-বাদী জৈনসম্প্রদায় সেইরূপ একান্তবাদী নহে। কারণ তাঁহারা বাহ্য ও আভ্যন্তর এই উভয়বিধ পদার্থের পারমার্থিকতা অঙ্গীকার করিয়াছেন। এক্ষণে যদি আপত্তি করা যায় যে প্রমাণজ্ঞানে ভাসমান পদার্থমাত্রেরই বাস্তবিকতা স্বীকার করিয়া ন্যায়-বৈশেষিকাদি সম্প্রদায় যেমন একান্তবাদী হইয়াছেন, তেমন জৈন দার্শনিকগণও একান্তবাদী হইয়া পড়িলেন। কারণ ইঁহারাও যথার্থজ্ঞানে ভাসমান পদার্থমাত্রেরই পারমার্থিকতা স্বীকার করেন। তথাপি উত্তরে বলা যায় যে, ইন্দ্রিয়জন্য "মতি-জ্ঞানে" ভাসমান পদার্থও আপন স্থিতিকালে যেমন সত্য পারমার্থিক "কেবল-জ্ঞানে" ভাসমান দ্রব্য ও তৎসূক্ষ্মাংশ অনন্তপর্য্যায়ও আপন আপন স্থিতিকালে তেমনই সত্য; ইহা ন্যায়াদি মতের সহিত সমান হইলেও জৈন-দার্শনিকগণ অনেক সূক্ষ্ম পদার্থের সত্যতা স্বীকার করিয়াও অনির্ব্বচনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই ন্যায়বৈশেষিকাদির মত সকল পদার্থের অভিধেয়ত্ব স্বীকার না করায় ঐ অংশে ন্যায়বৈশেষিকাদির দৃষ্টিতেও জৈনসম্প্রদায় অনেকান্তবাদীই হইয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন মতানুসারে প্রমেয়-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিলেও বুঝা যায় যে, জৈনদর্শন অনেকান্তবাদী, একান্তবাদী নহে। জগতের উৎপত্তি বিষয়ে যত যত মতবাদ আছে (ভারতীয়) সেই সব মতগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে আমরা বিভক্ত করিতে পারি। আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ।

চার্ব্বাক, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন আরম্ভবাদী। ঘট, পটাদি স্থূলদৃশ্যের বিশ্লেষণ আরম্ভ হইলে ঐ বিশ্লেষণ বা বিভাগ যেখানে বিশ্রান্ত হয় তাহাই পরমাণু। বিশ্লেষণ-সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা নিতান্তই অজ্ঞতা-প্রসূত যে, পরমাণুবাদী নৈয়ায়িক বা বৈশেষিক সম্প্রদায় আগেকার যুগ অনুসারে (প্রাক্তযুগানুসারে) যেখানে বিশ্লেষণের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন বিশ্লেষণকারী শক্তিমান্ যন্ত্রের অভাবে তখন তাহা অবিভজ্যমানই ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান এই বৈজ্ঞানিক যুগে আর উহা অবিভজ্যমান নাই, এক এক পরমাণু হাজার হাজার বিভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ন্যায় বা বৈশেষিক সম্প্রদায় এমন আহাম্মক নহেন যে, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন এইটী পরমাণু, ইহা আর বিশ্লিষ্ট হয় না। তাঁহাদের পরমাণু নিরাকার অর্থাৎ নিরবয়ব। বিশ্লেষণের যান্ত্রিক বিভাগও সাধারণ কথা, মানস বিভাগ অর্থাৎ বিভাগ-কল্পনাও যেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাংশে বিশ্রামলাভ করে তাহাই পরমাণু। ইহা নিরবয়ব কারণ সাবয়ব হইলেই অনিত্যত্বনিবন্ধন বিভক্ত হইবে। এই নিরবয়ব পরমাণুকেও যেই যন্ত্র বা যান্ত্রিকগণ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছেন বলিহারি তাহাদের ক্ষুরধার বুদ্ধির! সেই দেবানাং প্রিয়গণ উপেক্ষণীয়, সমাদরণীয় বা তাড়নীয় তাহা নির্দ্ধারণ করা বোধ হয় অনাবশ্যক।

আরম্ভবাদী সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যজাত অসৎই, যাহা সমুৎপত্তির দ্বারা আত্মলাভ করিল তাহা সর্ব্বাংশেই অভিনব। অর্থাৎ অবয়ব-সংযোগের ফলে যে দ্ব্যণুকাদি ঘট-পটান্ত কার্য্যসমূহ উৎপন্ন হইল তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বেও যে আপন আপন উপাদানে সূক্ষ্মাবস্থায় লুক্কায়িত ছিল এবং অবয়ব-সংযোগের ফলে তাহাই স্থূলরূপ-পরিগ্রহে প্রাদুর্ভূত হইল ইহা নহে। পরন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে উহা কোনও অবস্থায়ই নিজ নিজ উপাদানে ছিল না, অবয়বসমূহের মেলনের ফলে সম্পূর্ণ নূতন নূতন বস্তুই উৎপন্ন হইল। এবং উপাদান-বিভাগের ফলেও উহা আবার সূক্ষ্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া অবয়বে লয়প্রাপ্ত হইল তাহা নহে; পরন্তু সম্পূর্ণভাবে উহা বিনাশপ্রাপ্ত হইল, কারণ-যোগে বিনষ্টই হইয়া গেল। লুকোচুরি খেলার নামান্তরমাত্র লয়প্রাদুর্ভাব ইঁহারা মানেন না। আরম্ভবাদে নিরবয়ব অবয়বগুলিকে চার জাতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যেমন পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়। ইহাদের মধ্যে পার্থিব পরমাণুর রূপ-রসাদি গুণগুলিও অনিত্য বিজাতীয় তেজঃ-সংযোগ-রূপ পাকের ফলে পূর্ব্ব রূপরসাদির বিনাশ, নূতন রূপরসাদির উৎপত্তি হয়। কিন্তু

অপর ত্রিবিধ পরমাণুর নিজ নিজ গুণগুলিও আশ্রয়ীভূত পরমাণু দ্রব্যের মতই নিত্য। এই মতে অবয়ব-সংযোগের ফলে যখন নূতন নূতন অবয়বী উৎপন্ন হইল, তখনও কারণীভূত অবয়বসমূহের কোনও বিকার অর্থাৎ অবস্থান্তরই হইল না, তাহারা পূর্ব্বের মত অবিকারীই থাকিয়া গেল এবং আপন ক্রোড়ে অবয়বীকে গ্রহণ করিল। চার্ব্বাক ভিন্ন এই মতবাদিগণের অপর সকলেই চৈতন্য গুণে গুণবান্ অসংখ্য নিত্য আত্মা স্বীকার করিয়াছেন। আত্মার চৈতন্য গুণের উৎপাদবিনাশ হইলেও আশ্রয়ীভূত চেতন আত্মার উৎপাদ বা বিনাশ হয় না। ইহাই অতিসংক্ষিপ্ত আরম্ভবাদ।

পরিণাম-বাদকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। "প্রধান-পরিণাম-বাদ," "ব্রহ্ম-পরিণাম-বাদ" ও "প্রধান বা মায়ার পরিণাম-সহ ব্রহ্ম-বিবর্ত্ত-বাদ"। পরিণাম-বাদীরা কেহই আরম্ভ-বাদিগণের ন্যায় কার্য্য ও কারণের বা গুণ-গুণীর সর্ব্বথা ভেদ স্বীকার করেন না। ইঁহারা সকলেই "সৎ-কার্য্য-বাদী"। অর্থাৎ তন্তুরূপ উপাদান হইতে যে পটরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয়, ঐ কার্য্য পট উৎপত্তির পূর্ব্বে আদৌ ছিল না ইহা নহে; পরন্তু উপাদানভূত তন্তুতে উহা উৎপত্তির পূর্ব্বেও সূক্ষ্ম-রূপে বিদ্যমান ছিল, কেবল সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ সংঘাতের একত্র সমবধানের ফলে ঐ লুক্কায়িতরূপে বিদ্যমান পটই প্রাদুর্ভূত হইল মাত্র, নূতন কিছুই হইল না। আরও পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইলে বলিতে হয় যে, কর্ত্তা উপাদানাদি কারণ-নিবহের মেলন ঘটাইয়া কার্য্য বস্তুর আবিষ্কারই করেন সৃষ্টি করেন না। যেমন ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ কয়লার খনির সৃষ্টি করেন না, পরন্তু পূর্ব্বসিদ্ধ উহার আবিষ্কার মাত্রই করেন। দুইয়ের মধ্যে তফাৎ এই যে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কয়লার উপাদান সংগ্রহ করেন না, মাটি খুঁড়িয়াই বাহির করেন, আর একজন কয়লার উপাদানাদি সংগ্রহ করিয়া ঐ উপাদানের মধ্যে লুকায়িত ছিল যে সূক্ষ্ম কয়লা তাহারই স্থূলরূপে প্রাদুর্ভাবমাত্র করান, সৃষ্টি করান না। উপাদানের এই পরিণাম কোন কোনও স্থলে পূর্ব্বাবস্থা-বিশেষের লয় হইলে হয়, কোথাও পূর্ব্বাবস্থার লয় না হইয়াও অবস্থান্তর-প্রাপ্তিতে হয়। যেমন অগ্নিদাহের ফলে কাষ্ঠ ভস্মে পরিণত হইল বা অম্লবস্তু-সংযোগে দুগ্ধ দধিরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হইল। এই সকল স্থলে উপাদানগত স্থূল কাষ্ঠাবস্থা আর ভস্ম, কিংবা উপাদানগত স্থূল দুগ্ধাবস্থা আর দধিতে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বলিতে হয় ঐ পূর্ব্বের কার্য্যাবস্থাগুলি সূক্ষ্মরূপে লীন হইলে তবে ভস্ম বা দধিরূপ পরিণাম হইল। সুবর্ণ বা তন্তু যে বলয় বা পটরূপে পরিণাম-প্রাপ্ত হইল, তাহাতে সুবর্ণত্ব বা তন্তুত্বের লয় হইল না, উহারা যথাক্রমে সুবর্ণ ও তন্তু থাকিয়াই বলয় ও পটরূপে পরিণাম-প্রাপ্ত হইল। ভস্ম বা দধি স্থলে যদি বলা যায় যে কাষ্ঠ বা দুগ্ধ ঐরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয় নাই, পরন্তু কাষ্ঠ বা দুগ্ধের যে উপাদান অর্থাৎ যে উপাদান পূর্ব্বে কাষ্ঠ বা দুগ্ধরূপে পরিণত হইয়া ছিল তাহাই আবার নিমিত্তান্তর অগ্নি বা অম্লাদি-সংযোগে ভস্ম বা দধিরূপে পরিণাম-প্রাপ্ত হইল, তাহা হইলে এই

স্থলেও উপাদানের পূর্ব্বাবস্থার লয় কল্পনা করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না। এই পরিণামবাদীরা তাহাকে প্রধান নামে পরিভাষিত করেন যাহা সমগ্র বিশ্বের চরম-সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন। অর্থাৎ যে সূক্ষ্ম উপাদানে এই কার্য্যকারণসংঘাত সবই লয়প্রাপ্ত হইয়া যায় এই সমগ্র বিশ্বই যে সূক্ষ্ম উপাদানে সূক্ষ্মাবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং যাহা হইতে আকাশাদি ক্রমে বা মহত্ত্বাদি ক্রমে এই বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হয় সেই চরমসূক্ষ্ম উপাদানই প্রধান প্রকৃতি বা মায়া নামে অভিহিত। এই প্রধান বা মায়া সাংখ্য ও পাতঞ্জল-মতে অনাদি ও অনন্ত। অদ্বৈতবাদে ইহা সান্ত হইলেও অনাদি ঠিকই। এই প্রধান বা মায়া কূটস্থ না হইলেও নিজে বিনাশপ্রাপ্ত না হইয়াই অনন্ত এবং বিচিত্র কার্য্যাকারে পরিণত হয়। ইহাতেই সমগ্র বিশ্ব সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান আছে এবং ইহা হইতেই বিশ্বের স্থূলরূপে প্রাদুর্ভাব হয়। নূতন কিছু হয়ও না এবং একান্ততঃ কাহারও বিনাশ নাই। ইহাই সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি পরিণামবাদীদের অভিপ্রায়। এই মতেও অনাদিনিধনও সর্ব্বব্যাপী অনন্ত চেতনবস্তু স্বীকৃত হইয়াছে। পরন্তু আরম্ভবাদীদের ন্যায় ইহাদের চেতন চৈতন্যরূপগুণে চেতন নহে পরন্তু ইহা স্বয়ংই চিৎ বা প্রকাশ। ইহা সর্ব্বথা অসঙ্গ। কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব বা কামক্রোধাদির লেপ ইহাদের আদৌ নাই। ঐগুলি সবই বুদ্ধির বিকার। চেতন পুরুষ সর্ব্বথা নির্ব্বিকার উহা কূটস্থ। এই মতের নির্ব্বিকার বা কূটস্থ সম্বন্ধে এ কথা বলিলেও বোধ হয় অপসিদ্ধান্ত হইবে না যে, চেতন বস্তুও যদি চৈতন্যগুণেও চেতন হয় এবং ঐ চৈতন্যগুণের উৎপত্তি ও বিনাশ মানা যায়, তাহা হইলে চেতন বলার বিশেষ কোনও অর্থ হয় না। কারণ সূক্ষ্ম বা স্থূল জড়বস্তুও যেমন উৎপাদ-বিনাশশীল গুণ-ধর্ম্মের আশ্রয় চেতনও ফলতঃ ঐরূপই হইয়া পড়িল। কাজেই চেতন ও জড় এই বিভাগ কথা মাত্রই হইল, তত্ত্বতঃ বিশেষ কোনও প্রভেদ থাকিল না। যেমন জলের শীতলস্পর্শ আছে কিন্তু উষ্ণস্পর্শ নাই আবার তেজের উষ্ণ-স্পর্শ আছে শীতলস্পর্শ নাই। এইরূপে পরস্পরের মধ্যে গুণ-ধর্ম্মের অনৈক্য না থাকিলেও উহারা উভয়েই সমান ভাবে জড়। তেমন চেতন বস্তুকেও উৎপাদবিনাশশীল চৈতন্যগুণের আশ্রয় বলিলে জড়ের সহিত উহার কোনও বৈলক্ষণ্যই থাকিল না, পরন্তু ঘটাদি দৃষ্টান্তে বিকারিত্বহেতুর দ্বারা উহারও জড়ত্বই প্রমাণিত হইয়া যাইবে। এই কারণেই জড়বস্তুর সহিত সর্ব্বথা বৈলক্ষণ্য সম্পাদন করিতে গিয়া চেতনবস্তুকে উঁহারা স্বয়ং চিৎ এবং নির্ব্বিকার বা কূটস্থ বলিয়াছেন।

ব্রহ্ম-পরিণামবাদিগণ বলেন প্রধান-পরিণাম স্বীকার করিলে প্রধান এবং তৎ-পরিণামভূত ঘট-পটাদি কার্য্যের জড়ত্বনিবন্ধন আবার পৃথক্ পৃথক্ অনন্ত চেতন মানা আবশ্যক হয়। এইভাবে মূলীভূত চেতন ও জড় এই দুই জাতীয় পদার্থ স্বীকার না করিয়া যখন একমাত্র পরিণামী নিত্য চেতনবস্তু স্বীকার করিলেই সমস্ত উপপন্ন হয়, তখন দুই জাতীয় পদার্থ স্বীকারে নিষ্প্রয়োজন গৌরবই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং একমাত্র

চেতনই মুলপদার্থ ; উহা হইতেই অর্থাৎ উহা অপরের অপেক্ষা-রহিত হইয়াই নানা-প্রকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া জীবজগদাদি নানা বিচিত্রতাময় এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করিয়াছে। কার্য্য-কারণের অভেদ-নিবন্ধনই জীব বা জগৎ চেতন ব্রহ্মবস্তু হইতে ভিন্ন নহে, সবই ব্রহ্মময়। এই প্রকারের একত্বই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "একোঽহং বহু স্যাম্" ইত্যাদি বেদান্তবাক্য-সমূহের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই প্রকার ব্রহ্ম-পরিণাম-বাদ প্রধানতঃ ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ ও বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি কতিপয় বৈষ্ণবের মত।

মায়াপরিণামসহ ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদ অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের মত। উহাতে মায়া বা প্রধানের পরিণাম সাংখ্যাদি মতের ন্যায় স্বীকৃত হইয়াছে। বিশেষ এই যে উক্ত মায়াও কল্পিত বা মিথ্যাভূত। সুতরাং ঐ কল্পিত বা মিথ্যাভূত মায়া বা অজ্ঞানের বিষয় ও আশ্রয় স্বপ্রকাশ চিদ্বস্তু। ঐ চিদাশ্রিত মায়া স্বাশ্রয়ীভূত চিদধিষ্ঠানেই ঈশ্বর সংকল্পানুসারে তন্নিয়ন্ত্রিত হইয়া আকাশ, বাতাসাদি অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। পরে পঞ্চীকরণ-রীত্যনুসারে পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে জগতের সৃষ্টি হয়। নিরধিষ্ঠান এবং অনিয়ন্ত্রিত জড়ের পরিণাম সম্ভব নহে বলিয়াই ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রণে চিদধিষ্ঠানে মায়া পরিণাম প্রাপ্ত হয়। কল্পিত বস্তুর পৃথক্ সত্তা না থাকায় এবং জড়ের স্বতন্ত্র প্রকাশ সম্ভব না হওয়ায় মায়া এবং তৎপরিণাম জগৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ অধিষ্ঠানভূত চিৎবস্তুর সত্তায়ই সত্তাবান, চিদ্‌বস্তুর প্রকাশই উহাদের প্রকাশ। মিথ্যাভূত জড়জগতের পৃথক্ সত্তা বা প্রকাশ নাই। মিথ্যাভূত মায়ার মিথ্যাভূত পরিণামের মিথ্যাভূতসম্বন্ধে পরমার্থসৎ স্বপ্রকাশ চিদ্বস্তুই জগদাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু চিদ্‌বস্তুর জগদাকারে প্রকাশ হইলেও জগদাকারে পরিণাম হয় না। কারণ উহা কূটস্থ সর্ব্বথা বিকাররহিত এবং অসঙ্গ। এই যে পরিণত না হইয়াও পরিণত বস্তুরূপে প্রকাশ, ইহারই নাম বিবর্ত্ত। চিৎবস্তুই অপরিণত থাকিয়া পরিণত বস্তুরূপে প্রকাশিত হয়; সুতরাং বিবর্ত্ত ব্রহ্মের। মিথ্যাভূত মায়া সমসত্তাপন্ন জগদাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয় বলিয়াই এই মতে মায়ার পরিণাম মানা হইয়াছে। ইহাও অভ্যুপগমবাদেই জগতের ব্যবহারিকতা মানিয়া বুঝিতে হইবে। পরমার্থতঃ সৃষ্টি ত্রৈকালিকরূপেই এই মতবাদে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও জড়বস্তু বা ব্রহ্ম-প্রকাশাতিরিক্ত কোনও প্রকাশই এই মতে পারমার্থতঃ স্বীকৃত নহে।

প্রতীত্যসমুৎপাদবাদিগণ ন্যায়বৈশেষিকাদি সম্প্রদায়ের মতই কার্য্য ও কারণের পরস্পর অত্যন্ত-ভেদ স্বীকার করেন এবং তাঁহাদেরই মত উৎপত্তির পূর্ব্বে যাহা আদৌ ছিল না এমনই নূতন কার্য্যের সৃষ্টি মানেন। সাংখ্য বা যোগের ন্যায় উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে বিদ্যমান থাকে এবং ধ্বংসের পরেও পুনরায় কারণেই উহা বিলীনভাবে থাকিয়া যায় ইহা প্রতীত্যসমুৎপাদ-বাদীরা আদৌ মানেন না। প্রতীত্য-সমুৎপাদবাদী সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকসম্প্রদায় অর্থাৎ বাহ্যাস্তিত্ববাদিগণ জড় বস্তুর

বিভাগের বিশ্রাম-স্থান-হিসাবে পরমাণু স্বীকার করেন। কিন্তু এই পরমাণু আরম্ভবাদের পরমাণু হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। আরম্ভবাদে পার্থিব পরমাণুর নিত্যতা ও অপরিণামিত্ব স্বীকৃত হইলেও উহাদের রূপ-রসাদিগুণের নিত্যতা স্বীকার করা হয় নাই। পাক-বশে পার্থিব পরমাণুর পূর্ব্ব পূর্ব্ব রূপ-রসের বিনাশ এবং তাহার স্থানে নব নব রূপ-রসের উৎপত্তি সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। প্রতীত্যসমুৎপাদবাদিগণ ক্ষণিক অর্থাৎ স্থিতিকালের সহিত সম্পর্করহিত ঐ সূক্ষ্ম রূপ-রস প্রভৃতিকেই পরমাণু বলিয়াছেন। ঐ জাতীয় রূপ-রসের আধারভূত কোন চিরস্থির বা ক্ষণিক পৃথক্ দ্রব্য পদার্থ তাঁহারা মানেন নাই। বিশেষতঃ আরম্ভ-বাদের ন্যায় কেবল জড় পরমাণু এই মতে সিদ্ধান্ত নহে; চেতনেরও সূক্ষ্মাংশ-হিসাবে এই মতে চেতন-পরমাণু স্বীকৃত হইয়াছে। এস্থানেও চৈতন্যগুণের আধার-হিসাবে কোনও স্থায়ী বা ক্ষণিক দ্রব্য স্বীকৃত হয় নাই যেমন জড় পরমাণু রূপাদির বিনাশোৎপাদসন্তানরূপে জড়জগতের সৃষ্টি মানা হইয়াছে, তেমন প্রোক্তসূক্ষ্ম-চিত্তের বিনাশোৎপাদসন্তানরূপেই চেতন-জগতের সৃষ্টি এই মতে স্বীকৃত হইয়াছে। এই কারণেই উক্ত তত্ত্বগুলিকে পরমাণু বলা হয় যেহেতু উহা অবিভজ্যমান সূক্ষ্মাংশ এবং যেহেতু এইগুলি নিত্য কোনও দ্রব্য নহে এই কারণে আরম্ভ বাদের হিসাবে এই তত্ত্বসমূহ পরমাণু নহে। সাংখ্যের গুণ ধর্ম্মাদি-রহিত চেতন-পুরুষ যেমন অনুপযোগী পদার্থ তেমন উৎপাদবিনাশশীল রূপ-রসাদিগুণের আশ্রয়ীভূত নিত্য দ্রব্য পদার্থও সর্ব্বথা অনুপযোগী। ঐ গুণগুলির বিনাশোৎপাদধারা হইতেই সমস্ত ব্যবহার নির্ব্বাহ হইয়া যায়। এই সব নানা যুক্তি দেখাইয়া ইঁহারা আশ্রয়ীভূত পৃথক্ দ্রব্য মানেন নাই। আরম্ভ-বাদীরা যেমন উপাদান-দ্রব্যের কার্য্যে অন্বয় স্বীকার করেন অর্থাৎ উপাদানে আশ্রিত হইয়াই দ্রব্যাদি কার্য্য-জাত উৎপন্ন হয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; ইঁহারা কিন্তু ঐরূপ বলেন না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রূপাদি উপাদান-ক্ষণের বিনাশেই পর পর রূপাদি-কার্য্যক্ষণ উৎপন্ন হয় বলিয়াই ইঁহারা মানেন। অর্থাৎ বিনাশোন্মুখ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিণাম-ক্ষণের অস্তিত্বমাত্র হইতেই উত্তরোত্তর পরিণাম-ক্ষণ নিরাধারই উৎপন্ন হইতে থাকে ইহাই ইঁহারা বলেন। পরমাণু-বাদী বা পরিণাম-বাদী না হইয়াও ইঁহারা ঐ ঐ ঢং-এই বাক্যবিন্যাসে নিরাধার উৎপত্তি মানিয়াছেন।

অনেকান্ত-বাদিগণ এই স্থূলদৃশ্য জগৎ ছাড়া দুই প্রকার সূক্ষ্মতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ঐ সূক্ষ্মবস্তুগুলির একাংশ জড় ও অপর অংশ চেতন। এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জড়জগৎ প্রোক্ত সূক্ষ্মজড়-তত্ত্বেরই কার্য্য বা রূপান্তর। সূক্ষ্মজড়তত্ত্বসমূহ ন্যায়, বৈশেষিক বা পূর্ব্বমীমাংসার পরমাণুর স্থলাভিষিক্ত। অবশ্যই ইঁহারা স্বসিদ্ধান্তিত সূক্ষ্মতত্ত্বগুলিকে ন্যায়াদি-সম্মত পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম বলিতে চাহেন। অনেকান্ত-বাদিগণ সূক্ষ্ম অথচ নিত্য পরমাণু স্বীকার করিয়াও পরিণাম-বাদী। সাংখ্য, যোগ, বা চরকাদির ন্যায় স্থূল জগৎকে ইঁহারা ঐ সূক্ষ্ম জড়তত্ত্বেরই পরিণাম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কিন্তু এই পরিণাম-বাদের সহিত সাংখ্যাদিসম্মত পরিণাম-বাদের অনেক বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। সাংখ্যাদি দর্শনে চেতনের পরিণাম স্বীকার করা হয় নাই। এবং চেতনকে তাঁহারা চৈতন্যগুণের আশ্রয়ীভূত দ্রব্য-হিসাবে মানেন নাই। স্বপ্রকাশ চিৎই তাঁহাদের মতে চেতন। এই মতে জড়বস্তুর ন্যায় চেতন-তত্ত্বের পরিণাম স্বীকৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ পরিণাম-বাদ-হিসাবে সাংখ্যাদি দর্শনে যেমন অসৎ কার্য্যের উৎপত্তি অস্বীকৃত হইয়াছে, এই অনেকান্ত-বাদে অসৎ কার্য্যেরও উৎপত্তি মানা হইয়াছে। এবং চেতনকে ইঁহারা চৈতন্যগুণের আশ্রয়ীভূত দ্রব্য-হিসাবেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পরমাণু-দ্রব্যের এবং উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের অনন্তর কার্য্যের অসত্তাও স্বীকার করায় ইঁহারা আরম্ভ-বাদেও সর্ব্বথা অনাস্থাবান্ নহেন। অর্থাৎ অনেকান্ত-বাদিগণ উপাদান-কারণে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তা এবং অসত্তা এই দুইই মানেন। অভিপ্রায় এই যে, কটক, বলয়াদির উপাদান সুবর্ণে উৎপত্তির পূর্ব্বে ও কটক, বলয়াদি প্রযোজকশক্তি অবশ্যই আছে। অন্যথা উহা হইতে কটক, বলয়াদি হইত না। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বেও সুবর্ণে শক্তিরূপে বা কারণরূপে কটক-বলয়াদি ছিলই বলিতে হইবে। এইরূপে শক্তি-হিসাবে সৎ হইলেও সামগ্রী উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে কটক-বলয়াদির আবির্ভাব বা উৎপত্তি না হওয়ায় উহা স্থূলরূপে কারণে অসৎও বাস্তবিকই। তুল্য যুক্তিতে বিনাশের পরেও কার্য্যের সত্তা ও অসত্তা বুঝিতে হইবে। এবং অবয়বীকে ইঁহারা কেবল পরমাণু পুঞ্জাত্মকও বলেন না বা কেবল অপূর্ব্ব অবয়বীও বলেন না। পুঞ্জাত্মকতা এবং অপূর্ব্বতা এই উভয়াবস্থাই ইঁহারা স্বীকার করেন। এই কারণেই ইঁহারা একান্ত-বাদী নহেন, পরন্তু অনেকান্ত-বাদী। ইঁহারা বিবর্ত্ত-বাদ ও প্রতীত্যসমুৎপাদ-বাদকে সর্ব্বথাই উপেক্ষা করিয়াছেন। বস্তুমাত্রেরই পরিণামি-স্থিরতা স্বীকার করায় ইঁহারা প্রতীত্য-সমুৎপাদ-বাদে এবং জড় ও চেতনের তুল্য-ভাবে পারমার্থিকতা মানায় বিবর্ত্ত-বাদে বিশ্বাসী নহেন। অনেকান্ত-বাদে চেতনের বহুত্ব স্বীকৃত হইলেও সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্বমীমাংসা বা চরকের স্বীকৃত চেতন অপেক্ষা এই চেতনের অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন ঐ সব মতে চেতনকে বিভু বলা হইয়াছে। অনেকান্ত-বাদে কিন্তু তেমন চেতনের বিভুত্ব মানা হয় নাই। কোনও কোনও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে যেমন চেতনের অণুত্ব মানা হইয়াছে এই মতে কিন্তু চেতন তেমন অণুও নহে। জৈনাভিমত সমস্ত চেতন দ্রব্যই মধ্যমপরিমাণ এবং সংকোচ বিকাশবান্। ন্যায় বৈশেষিকাদি মতে যেমন আত্মত্ব বা চেতনা সমান-ভাবে থাকিলেও জীব এবং ঈশ্বরের অত্যন্ত ভেদ মানা হইয়াছে, এই মতে তেমন ভাবে জীব ও ঈশ্বরের আত্যন্তিক ভেদ মানা হয় নাই। ইঁহারা বলেন যে প্রত্যেক জীবেই ঈশ্বরশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, সাধন-শক্তির দ্বারা ঐ শক্তির বিকাশে সকলেই ঈশ্বর হইতে পারেন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন। কাজেই ন্যায়বৈশেষিকাদির ন্যায় ইঁহারা পরমাত্মার একত্ব-বাদী নহেন। অতএব দেখা যাইতেছে

যে কেবল আরম্ভ-বাদে বা কেবল পরিণাম-বাদে আশ্রয় না থাকায় এবং উভয়েরই কথঞ্চিৎ সমাবেশ থাকায় ইঁহারা অনেকান্ত-বাদী।

পূর্ব্বপ্রদর্শিত প্রণালীতে অপরাপর দর্শনের প্রমেয়তত্ত্বের সহিত একত্র বিচার করিলে প্রমেয়তত্ত্ব-নিরূপণে জৈনদর্শনের অনেকান্ত-বাদিতা আমরা যেমন বুঝিতে পারি, তেমনই প্রমাণতত্ত্বের বিশ্লেষণেও জৈনমতের অনেকান্ত-পক্ষপাত আমরা অবধারণ করিতে পারি।

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন মত-বাদে প্রমাণ-শক্তি যে ভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে তাহাতে ঐ মত-বাদগুলিকে আমরা প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব। বোধ হয় ইহাতেই সব মত সংগৃহীত হইবে। **প্রথম, ইন্দ্রিয়-পক্ষপাত, দ্বিতীয়, অনিন্দ্রিয়-পক্ষপাত, তৃতীয়, উভয়-পক্ষপাত, চতুর্থ, আগম-পক্ষপাত, পঞ্চম, উপপ্লব-পক্ষপাত।**

ইন্দ্রিয়-পক্ষপাতীরা বলেন যে প্রমাণ-শক্তিমাত্রই ইন্দ্রিয়ের উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভরশীল। মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে কোনও বিষয়ের যথাযথ অবধারণই করিতে পারে না। উহা সর্ব্বথা ইন্দ্রিয়েরই অনুগমন করিয়া যাহা করিবার করে। যেখানে ইন্দ্রিয়ের গতিবিধি নাই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত এমন কোনও বস্তুই যথার্থতঃ নাই যেগুলিকে আমরা ইন্দ্রিয়-সাহায্য ব্যতিরেকেই মনঃসামর্থ্যের দ্বারা বুঝিতে পারি। চার্ব্বাক-সম্প্রদায়ই এই মতে আস্থাবান্। পূর্ব্বোক্ত নিরূপণের ফলে ইহা বুঝিলে বোধ হয় ভুলই হইবে যে চার্ব্বাকগণ অনুমান বা শব্দাধীন যে সর্ব্বদা জ্ঞান হয় তাহাই মানেন না। পরন্তু ঐরূপ জ্ঞানের দ্বারা বস্তুর সম্ভাবনামাত্রই হইয়া থাকে, অবধারণ হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের দ্বারা আনুমানিকাদি জ্ঞানের সংবাদ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ আনুমানিকাদি জ্ঞান বস্তু সাধনে অক্ষমই থাকিয়া যায়। কাজেই অতীন্দ্রিয় বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের ঐন্দ্রিয়ক সংবাদ হয় না বলিয়াই অতীন্দ্রিয় বস্তুকে তত্ত্ব-হিসাবে চার্ব্বাকগণ গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। ইহাই ইন্দ্রিয়-পক্ষপাতী চার্ব্বাকগণ বলিয়া থাকিবেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। অনুমান বা শব্দাদির দ্বারা কোনও জ্ঞানই আদৌ হয় না এই যা চার্ব্বাকের মত-হিসাবে বিদ্বৎসম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে তাহা ঠিক্ ঠিক্ চার্ব্বাকের অভিপ্রায় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ঐরূপভাবে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ আনুমানিকাদি জ্ঞানের অপলাপী হইলে চার্ব্বাকের প্রত্যক্ষমাত্র প্রামাণ্য-বাদই স্বব্যাঘাত দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে। সুতরাং এমন কিছু কোন দার্শনিক বলিতে পারেন না যাহা অতি সহজেই ব্যাহত হইয়া যায়। প্রোক্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই আমি এই ভাবে চার্ব্বাক মতের উপস্থাপন করিলাম। সুধী-সমাজ অবশ্যই বিচার করিবেন। ফলে ইহাই পর্য্যবসিত হইল যে, যে সকল আনুমানিকাদি জ্ঞানে প্রত্যক্ষের অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের সংবাদ আছে এমন আনুমানিকাদি জ্ঞানের প্রামাণ্যও চার্ব্বাক-সম্প্রদায় মানেন।

অনিন্দ্রিয় পক্ষপাত-বাদের আমরা এই ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারি যে, বাস্তবিক পক্ষে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাক্ষাৎ কোনও জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না পরন্তু প্রত্যক্ষ-স্থলে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অন্তঃকরণ বা চিত্তই জ্ঞানরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয় কেবল দ্বার-স্বরূপে চিত্তের বহির্দ্দেশগমনে অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ের সহিত চিত্তের সন্নিকর্ষে সহায়তা করে। চিত্তই বিষয়াকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান-সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। অনুমান বা শব্দাদি স্থলে চিত্তের এই বিষয়াকার পরিণামে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যও অপেক্ষিত নহে। সাংখ্য, পাতঞ্জল, বিজ্ঞান-বাদ, শূন্য-বাদ ও বিবর্ত্ত-বাদেই এই অনিন্দ্রিয় পক্ষপাত স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাহ্যবস্তুর পারমার্থিকতাবাদী সাংখ্য বা পাতঞ্জল মতে যদিও ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ চিত্তবৃত্তিরূপ জ্ঞানের ঘটপটাদি-বিষয়ে যথার্থতঃ প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে তথাপি কিন্তু বিজ্ঞান-বাদ, শূন্য-বাদ বা বিবর্ত্ত-বাদে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য-প্রাপ্ত জ্ঞানে বাস্তবিক প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় নাই, ব্যাবহারিক প্রামাণ্যই স্বীকৃত হইয়াছে। প্রথমোক্ত মতে বাহ্যাস্তিত্ব এবং দ্বিতীয় মতে কাহারও অস্তিত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় ইন্দ্রিয়-সাহায্যে উৎপন্ন জ্ঞান যথা যথা স্বরূপ প্রকাশে সর্ব্বথাই অক্ষম। উহা যাহার যাহা তত্ত্ব নহে তাহাই তাহাতে প্রকাশ করে, ইন্দ্রিয় জন্য ঘটপটাদি বিষয়কজ্ঞানে উহাদের বাহ্যত্ব বা অস্তিত্বই প্রকাশিত হয় আন্তরত্ব অর্থাৎ জ্ঞানাকারতা বা শূন্যত্ব আদৌ প্রকাশিতই হয় না। কাজেই ব্যবহারে প্রামাণ্য থাকিলেও পরমার্থতঃ ঐ জাতীয় জ্ঞানের কোনও প্রামাণ্যই নাই। শেষোক্ত মতবাদীরা বলেন যে অনাত্ম বস্তুর মিথ্যাত্ব-নিবন্ধন ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় উৎপন্ন যে ঘটপটাদি অনাত্ম বস্তুবিষক জ্ঞান তাহার ব্যবহারে প্রামাণ্য থাকিলেও পরমার্থতঃ প্রামাণ্য নাই। কারণ পরমার্থতঃ অনাত্ম বস্তুও চিৎস্বরূপই চিৎসত্তাতিরিক্ত কোনও সত্তাই উহাতে নাই। অথচ ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানে উহা চিদতিরিক্ত বস্তু-হিসাবেই প্রকাশিত হয়। এই মতত্রয়েই সাধনাদিসম্পন্ন বিশুদ্ধান্তঃকরণ বৃত্তিরূপ জ্ঞানেরই বস্তুর যথাযথ স্বরূপ প্রকাশত্বনিবন্ধন বাস্তব প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। ঐরূপ জ্ঞানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কোনও সামর্থ্যই নাই। বিজ্ঞানবাদী বলেন যে, সাধনসম্পন্ন চিত্তের দ্বারাই ঘটপটাদির জ্ঞানাকারতা অপরোক্ষভাবে অনুভূত উহাতে ইন্দ্রিয় বিকল উহারা পঙ্গু। শূন্যবাদী বলিয়াছেন বিশুদ্ধচিত্তের দ্বারা সর্ব্বশূন্যত্বের অপরোক্ষানুভূতি হয় অন্যথা নহে। উহাতে ইন্দ্রিয় কিছুই করিতে পারে না। বিবর্ত্ত-বাদিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ অঙ্গদ্বয়যুক্ত যে বেদান্তবাক্যের বিচার ইহাই চরম সাধন, এই সাধনসম্পন্ন চিত্তেরই ব্রহ্মাত্মভাব প্রত্যক্ষে সামর্থ্য আছে। জীবের ব্রহ্মাত্মতাই পারমার্থিক সত্য। উহা কখনও বাধা প্রাপ্ত হয় না। প্রোক্তসাধনসম্পন্ন বিশুদ্ধচিত্তই "তত্ত্বমস্যা"দি মহাবাক্যের সাহায্যে অদ্বয় পরিবস্ত্বাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। উহাই যথার্থ তত্ত্বের প্রকাশক অজ্ঞান খণ্ডনের দ্বারা, এবং তখনই চিত্ত জগতের মিথ্যাত্বাবধারণে সমর্থ হয়। সুতরাং এই মতেও ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রামাণ্য ভিন্ন অপর কোনও প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই।

উভয়পক্ষপাতীরা বলেন যে, ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের যেমন তত্ত্বাবধারণসামর্থ্য আছে, তেমন সাধনশুদ্ধচিত্তেরও তত্ত্বাবধারণে পূর্ণসামর্থ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন কি ব্যাপ্তি পক্ষধর্ম্মতাবিশিষ্ট সদ্ধেতু বা আপ্তবাক্য জন্য যে সমস্ত জ্ঞান আমাদের হয় ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের সংবাদ তাহাতে না থাকিলেও ঐ সকল জ্ঞানের তত্ত্বাবধারণ সামর্থ্যের অণুমাত্রও ন্যূনতা নাই। স্থলবিশেষে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান প্রবৃত্তি-সামর্থ্য রহিত হইয়া তত্ত্বাবধারণে অক্ষম হইলেও ইন্দ্রিয়ের আদৌ তত্ত্বাবধারণ-সামর্থ্যই নাই ইহা যেমন ঠিক নহে তেমন স্থল-বিশেষে হেতু বা বাক্য জন্য জ্ঞানের অসমর্থ প্রবর্ত্তকত্বনিবন্ধন তত্ত্বাবধারণ-সামর্থ্য না থাকিলেও অনুমান বা শব্দজ্ঞানের আদৌ পারমার্থিক তত্ত্বাবধারণসামর্থ্য নাই এরূপ পক্ষপাতও ঠিক নহে। কারণ উভয়েরই তত্ত্বাবধারণের সামর্থ্য স্থল-বিশেষে অনুভবসিদ্ধ। যোগজ ধর্ম্মসম্বদ্ধ চিত্তের দ্বারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট, অতীত বা অনাগত বস্তু-সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষানুভব হইয়া থাকে সাধারণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি তাহাতে সর্ব্বথা অসমর্থ বা পঙ্গু হইলেও ঐ সকল জ্ঞান তত্ত্বাবধারণে আশ্চর্য্যজনক সামর্থবান্‌ ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্বমীমাংসক, সাংখ্য, যোগ, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকগণ এই উভয় পক্ষপাত সমর্থন করেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যদিও চিত্তের বিষয়াকার পরিণাম বিশেষকেই জ্ঞান বলিয়া থাকেন এবং এই অংশে ইঁহারা বিবর্ত্ত-বাদ বা বিজ্ঞান-বাদের সঙ্গে সমানই; তথাপি সাংখ্য ও যোগসম্প্রদায়কে আমরা উভয় পক্ষপাতীই বলিব। কারণ এই উভয় মতেই ন্যায় বা বৈশেষিকের মত বাহ্য ও আভ্যন্তর এই দ্বিবিধ বস্তুরই অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সাপেক্ষজ্ঞানে ঘটপটাদি বস্তুর যে স্বরূপ প্রকাশিত হয়, সেই স্বরূপেও ঐ সকল বস্তুর পারমার্থিকতা অনঙ্গীকৃত নহে। সুতরাং ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানে বস্তুর বিকৃত স্বরূপই প্রকাশ পায় এবং ইন্দ্রিয়গুলি কেবল ধোকাবাজীই করে এরূপ ইঁহারা বলেন না। পূর্ব্বোক্ত উভয়-পক্ষপাতীদিগের মধ্যে ন্যায়, বৈশেষিক ও যোগসম্প্রদায়ে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্‌ এবং জীব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ঈশ্বর বা পরমাত্মা স্বীকৃত হইয়াছে। পরমাত্মার ঐ সর্ব্বজ্ঞতা স্বাভাবিক অর্থাৎ কোনও কারণবিশেষের সাহায্যে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন কিন্তু স্বতঃই তিনি সর্ব্বজ্ঞ। অতএব এই ঈশ্বরীয় নিত্য সর্ব্বজ্ঞতাকে যদি আমরা স্বতন্ত্র বা আত্ম-তন্ত্র বলি তাহাতেও বোধসিদ্ধান্তে হানি হইবে না। এইরূপ নিত্য অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ বা আত্ম-তন্ত্র কোনও জ্ঞান সাংখ্যমতে স্বীকৃত নহে এবং অপরাপর মতেও জীবে ঐরূপ স্বাভাবিক জ্ঞান মানা হয় নাই।

আমরা তাঁহাদিগকেই আগম-পক্ষপাতী বলিতেছি যাঁহারা এমন কোনও বস্তু স্বীকার করেন যে বস্তু কেবল শব্দ-প্রমাণের সাহায্যেই জানা যায়, অপরাপর সকল প্রমাণই তাহাতে পঙ্গু। প্রধানতঃ পূর্ব্বমীমাংসা ও বিবর্ত্ত-বাদী সম্প্রদায়কে আমরা আগম-পক্ষপাতী বলিতে পারি। কারণ মীমাংসকগণ শুভাশুভ কর্ম্ম জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মকে বেদমাত্র প্রমাণগম্য বলিয়াছেন এবং বিবর্ত্ত-বাদীরা ধর্ম্মাধর্ম্মের ন্যায় ব্রহ্ম বস্তুকেও শব্দমাত্র

প্রমাণগম্যই বলিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মহত্যা বা পরদার গমনাদি অশুভ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে যে অনুষ্ঠাতা জীবের কোনও অধর্ম্ম অর্থাৎ অশুভসংস্কার বিশেষ উৎপন্ন হয় অথবা জ্যোতিষ্টোম অশ্বমেধাদি শুভকর্ম্ম যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে অনুষ্ঠাতা পুরুষের ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বর্গাদিফলক শুভসংস্কার বিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা কেহই উপদেশবাক্য ছাড়া নিজ বুদ্ধিবলে কখনও বুঝিতে পারেন না। কেবল "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" "পরদারান্নগচ্ছেৎ" "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি শ্রৌত-স্মার্ত্ত উপদেশ-বাক্যের সাহায্যেই লোক বুঝিতে পারে যে ঐগুলি ধর্ম্মাধর্ম্মের হেতু। ঐরূপ অনুষ্ঠাতা পুরুষের পাপ পুণ্য হয়। এইরূপ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের জ্ঞানও বেদান্তবাক্যের দ্বারাই হইয়া থাকে এবং বাক্যাতিরিক্ত সকল প্রমাণই ঐরূপ বস্তুর অবধারণে অক্ষম বলিয়া বিবর্ত্ত-বাদিগণ ব্রহ্মাত্মাকেও বাক্যমাত্রপ্রমাণগম্যই বলিয়াছেন। এ বিষয়ে বাচস্পতিমিশ্রের মতকে আমরা বেদান্তের মত বলি না। উহা তাঁহার মনমাফিক, তিনি বলিয়াছেন ইহাই আমাদের ধারণা। ন্যায় বা বৈশেষিক সম্প্রদায় শব্দমাত্র প্রমাণাধিগম্য কোনও বস্তু মানেন কি না সেই বিচারের ইহা স্থল নহে। কারণ উহা অত্যন্ত বিস্তৃত হইবে। তবে এ স্থলে এইমাত্রই আমি বলিতেছি যে, ন্যায় বা বৈশেষিক সম্প্রদায়ও ধর্ম্মাধর্ম্মে শব্দমাত্রেরই প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। কারণ প্রত্যেক প্রমাণেরই খাস নিজের একটা বিষয় থাকে। অন্যথা অনুবাদকমাত্রই হইয়া যায়। সংক্ষেপতঃ এই হইল আগম পক্ষপাত-বাদের পরিচয়।

প্রমাণোপপ্লব-পক্ষপাত বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় বা তদ্ভিন্ন অনুমান, আগমাদি কোনও প্রমাণেরই এমন সামর্থ্য নাই যে, উহারা বাধা-রহিত জ্ঞান জন্মাইতে পারে। কারণ যেরূপভাবে যাহাই বুদ্ধিস্থ হউক না কেন বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়া বিচার করিলে তাহাতে বাধা উপস্থিত হইবেই। সুতরাং প্রত্যেক প্রমাণই বস্তুর তত্ত্বাবধারণে পঙ্গু। কেবল পঙ্গুই নহে পরন্তু প্রতারণাপরায়ণ। ইহাই সংক্ষেপতঃ উপপ্লব-বাদীদের কথা। ইঁহারা চার্ব্বাকেরই এক শাখার অন্তর্গত। জয়রাশি কৃত "তত্ত্বোপপ্লব" গ্রন্থে এই মতের বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে। বিশেষ জিজ্ঞাসু তাহা হইতেই জানিতে পারিবেন।

এই যে পাঁচ প্রকারে প্রমাণ-সামর্থ্যের বিভাগ প্রদর্শিত হইল ইহাদের মধ্যে উভয় পক্ষপাতই জৈন-দর্শনের অর্থাৎ অনেকান্ত-বাদের নিজ সিদ্ধান্ত। এই মতে ঘট-পটাদি বাহ্যবস্তুর এবং জ্ঞান, সুখ, দুঃখাদি আভ্যন্তর বস্তু এই উভয়বিধ বস্তুরই পারমার্থিকতা সমর্থিত থাকায় ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ মনোমাত্র জন্য জ্ঞান এই দুই-এরই বস্তুর পারমার্থিক তত্ত্বপ্রকাশে সামর্থ্য স্বীকৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ স্ব স্ব আগমিক সাধনসম্পন্ন মনের অন্য কোনও কিছুর সাহায্য নিরপেক্ষভাবেই কি বাহ্য কি আভ্যন্তর সমস্ত পদার্থের পারমার্থিক তত্ত্বাবেদন-সামর্থ্য নিরঙ্কুশভাবেই মানা হইয়াছে।

ন্যায় বা বৈশেষিক সম্মত ঈশ্বরীয় আত্মতন্ত্র সর্ব্বজ্ঞতার ন্যায় এই মতেও সাধন-সিদ্ধির উচ্চ সীমায় আত্মমাত্র তন্ত্রসর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। এই বিষয়ে ন্যায় বা বৈশেষিকের সহিত অনেকান্ত-বাদের পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত মতে কেবল ঈশ্বরেরই আত্মতন্ত্র সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিমত্তা মানা হইয়াছে, কিন্তু জীবের উহা স্বীকৃত হয় নাই। জীব সাধন-সিদ্ধির যতই উচ্চ হইতে উচ্চতরাদি অবস্থায় উন্নীত হউক না কেন উহার স্বতন্ত্র সর্ব্বজ্ঞতা বা সর্ব্বশক্তিমত্তা আসে না। অনেকান্ত-বাদীরা প্রত্যেক জীবেরই এই জাতীয় প্রসুপ্ত সামর্থ্য স্বীকার করিয়াছেন। সাধন-সিদ্ধির উচ্চতরভূমিতে অবস্থিত হইতে পারিলেই ঐ প্রসুপ্ত স্বতন্ত্র সর্ব্বজ্ঞত্বাদি জীবের ফুটিয়া উঠে ও তখন জীব স্বতন্ত্র সর্ব্বজ্ঞ হয়। সুতরাং ন্যায়াদি মতে যেমন একেশ্বর-বাদ স্থাপিত আছে, এই মতে তাহা নহে। কারণ সাধন-সিদ্ধির চরম সীমায় প্রত্যেক জীবেরই নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য (যাহা পূর্ব্ব হইতেই নিজের মধ্যে লুক্কায়িত বা প্রসুপ্ত ছিল) প্রস্ফুটিত হয়, প্রত্যেক জীবই তখন ঈশ্বর হইয়া থাকে বলিয়াই অনেকান্ত-বাদিগণ অঙ্গীকার করিয়াছেন পূর্ব্বমীমাংসক বা অদ্বৈতবাদী যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম বা ব্রহ্মবিষয়ে আগম-পক্ষপাতী, অনেকান্ত-বাদীরা কিন্তু সেরূপ আগম পক্ষপাত কোনও বিষয়েই স্বীকার করেন নাই। ইঁহারা সাধনসিদ্ধ মনের সর্ব্ববিষয়েই নিরঙ্কুশ সামর্থ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং সিদ্ধাবস্থায় আত্ম-সামর্থ্যের ত কথাই নাই।

আয়ুর্বেদে তত্ত্বজিজ্ঞাসা

অধ্যাপক শ্রীতারাপদ চৌধুরী, এম.এ., বি.এল., পি-এচ.ডি.

[পূর্বানুবৃত্তি]

আত্মা

গর্ভাবক্রান্তি-প্রকরণে (৩।৩।৪) উক্ত হইয়াছে[১] : "সেই মুহূর্তেই দৈবসম্বন্ধ-হেতু ক্ষেত্রজ্ঞ, বেদয়িতা[২], স্প্রষ্টা, ঘ্রাতা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, রসয়িতা, পুরুষ, স্রষ্টা, গন্তা, সাক্ষী, ধাতা, বক্তা, 'যিনি', 'কে', 'তিনি'[৩] ইত্যাদি পর্য্যায়বাচক নাম দ্বারা যাঁহাকে অভিহিত করা হয়, সেই অক্ষয়, অব্যয়, অচিন্ত্য, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এবং দৈব, আসুর ও অপর ভাবের সহিত[৪] সংসৃষ্ট হইয়া সূক্ষ্ম লিঙ্গ-শরীরের সহিত গর্ভাশয়ে উপস্থিত হন,—বায়ুকর্তৃক প্রেরিত হইয়া গর্ভাশয়ে প্রবেশ করেন ও অবস্থান করেন।" অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়া এবং তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভের জন্য শবব্যবচ্ছেদের উপদেশ দিয়া এই আত্মার সম্বন্ধে বলিতেছেন (৩।৫।৫০)[৫] : "শরীরে চক্ষু দ্বারা সূক্ষ্মতম বিভুকে দেখিতে পাওয়া যায় না ; যাঁহাদের জ্ঞানরূপ চক্ষু এবং যাঁহাদের তপোরূপ চক্ষু আছে তাঁহারা দেখিতে পান।" একস্থলে (৩।৩।৩৩) ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আয়ু এবং সুখদুঃখাদিকে আত্মজ বলিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে ডল্হণ বলেন[৬] : 'আত্মজ' বলিতে 'আত্মসন্নিধানজাত' বুঝিতে

১ ততোঽগ্নীষোমসংযোগাৎ সংসৃজ্যমানো গর্ভাশয়মনুপ্রপদ্যতে ক্ষেত্রজ্ঞো বেদয়িতা স্প্রষ্টা ঘ্রাতা দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা পুরুষঃ স্রষ্টা গন্তা সাক্ষী ধাতা বক্তা যঃ কোঽসাবিত্যেবমাদিভিঃ পর্যায়বাচকৈর্নামভিরভিধীয়তে দৈবসংযোগাদক্ষয়োঽব্যয়োঽচিন্ত্যো ভূতাত্মনা সহান্বক্ষং সত্ত্বরজস্তমোভির্দৈবাসুরৈরপরৈশ্চ ভাবৈর্বায়ুনাভিপ্রের্যমাণো গর্ভাশয়মনুপ্রবিশ্যাবতিষ্ঠতে।

২ 'বেদয়িতা মনসো জ্ঞাপয়িতা। ইন্দ্রিয়াণাং চ পঞ্চানাময়মেব জ্ঞাপক ইতি দর্শয়ন্নাহ—স্প্রষ্টেত্যাদি।...অস্য কর্মপুরুষস্য নিরাধারাং স্থিতিং নিরাকুর্বন্নাহ—পুরুষ ইতি ; পুরি ভৌতিকে শরীরে বসতীতি পুরুষঃ।...স্রষ্টা চেতনাযোগেন তস্যৈব কর্তৃত্বাৎ।...গন্তা সংসরণশীলঃ। তথা সাক্ষী জ্ঞত্বাৎ। ধাতা শরীরাদিসংযোগধারণহেতুত্বাৎ। বক্তা বদত্যয়মেব, এতেন কর্মেন্দ্রিয়াণামপি বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দেষ্বয়মেব হেতুঃ।'—ডল্হণ।

৩ 'যঃ কঃ ইতি সর্বনামপদদ্বয়ং তস্য দুর্বোধত্বজ্ঞাপনার্থম্। অসাবিতি সর্বনামপদং তস্য সর্বগতত্বং সদ্গুরূপদিষ্টত্বং চ জ্ঞাপয়তি।'—ডল্হণ।

৪ ডল্হণের মতে 'দৈবাদি ভাব কর্তৃক বায়ুদ্বারা প্রেরিত হইয়া' ইত্যাদি : ভাবঃ সত্ত্বং মন ইত্যর্থঃ ; তেন দেবাদীনাং সপ্তানাং সপ্তভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈঃ, অসুরাদীনাং ষণ্ণাং ষড্‌ভী রাজসৈর্ভাবৈঃ, অপরৈশ্চ পশ্বাদিজৈস্ত্রিভিস্তামসৈর্ভাবৈঃ। সত্ত্বস্য চ মনঃপর্যায়স্য প্রেরকত্বং তন্ত্রান্তরে প্রতিপাদিতম্। তদুক্তং চরকে—"অস্তি খলু সত্ত্বমৌপপাদুকং যজ্জীবস্পৃক্ শরীরেণাভিসংবধ্নাতি"(চসং. ৪।৩।১৯)।

৫ ন শক্যশ্চক্ষুষা দ্রষ্টুং দেহে সূক্ষ্মতমো বিভুঃ। দৃশ্যতে জ্ঞানচক্ষুর্ভিস্তপশ্চক্ষুর্ভিরেব চ ॥

৬ আত্মজানীতি আত্মসন্নিধানজাতানি, ন ত্বাত্মতো জাতানি, আত্মনো নির্বিকারস্য বিকারজনকত্বাভাবাৎ প্রকৃতিভাবানুপপত্তেঃ ; স্বাভাবিকপ্রকৃতিভাবে চ মোক্ষানুপপত্তিঃ, তস্য হি তৎস্বভাবত্বে ভাবস্যাপরিত্যাজ্যত্বাৎ।

হইবে, 'আত্মা হইতে জাত' বুঝা ঠিক হইবে না, কারণ নির্বিকার আত্মা বিকারের জনক হইতে পারেন না বলিয়া কিছুরই প্রকৃতি হইতে পারেন না; তাঁহার প্রকৃতিভাব স্বাভাবিক হইলে মোক্ষ সম্ভবপর হইত না, কারণ তাহাই তাঁহার স্বভাব হইলে ভাব অপরিত্যাজ্য হইত।

দ্রব্য ও রসের পরস্পর সম্বন্ধবিচার-প্রসঙ্গে আত্মা ও দেহের পরস্পরাপেক্ষিতা-বিষয়ে সুশ্রুতের এই উক্তি (১।৪০।১৬) পাওয়া যায়[১]: 'দ্রব্য ও রসের জন্ম অন্যোন্য-সাপেক্ষ ধরা হয়, ঠিক যেমন দেহ ও আত্মার জন্ম অন্যোন্যসাপেক্ষ।' নিদ্রা ও স্বপ্নের সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিসমূহ[২] (৩।৪।৩৪-৩৭) বিচার করিলে ইন্দ্রিয়সকল এবং মনের সহিতও আত্মার অন্যোন্যসাপেক্ষতা স্পষ্টতর হইয়া উঠে: "হে সুশ্রুত, হৃদয় শরীরীদিগের চেতনাস্থান বলিয়া উক্ত হয়; তাহা তমঃ দ্বারা অভিভূত হইলে নিদ্রা দেহীকে আক্রমণ করে। তমঃকে নিদ্রার এবং সত্ত্বকে জাগরণের হেতু বলা হয়, অথবা স্বভাবই[৩] গরীয়ান্ হেতু বলিয়া কীর্তিত হয়। নিদ্রাযুক্ত শরীরের প্রভু ভূতাত্মা রজোযুক্ত মনের দ্বারা পূর্বদেহে অনুভূত শুভাশুভ ইন্দ্রিয়ার্থের উপলব্ধি করিয়া থাকেন।[৪] তমোগুণ কর্তৃক করণসকলের বৈকল্য সর্বতোভাবে বর্ধিত হইলে নিদ্রিত না হইয়াও ভূতাত্মা প্রসুপ্ত বলিয়া অভিহিত হন।[৫]

১ জন্ম তু দ্রব্যরসয়োরন্যোন্যাপেক্ষিকং স্মৃতম্। অন্যোন্যাপেক্ষিকং জন্ম যথা স্যাদ্দেহদেহিনোঃ॥ এই প্রসঙ্গে টীকাকার বলেন, 'কার্যকারণভাবেঽপি যথাগ্নের্ধূমো জায়তে নৈবং রসাদয়ো দ্রব্যাজ্জায়ন্তে, কিং তর্হি দ্রব্যরসাদীনাং চ সহৈব জন্মেতি দর্শয়ন্নাহ—জন্ম ত্বিত্যাদি। অন্যোন্যাপেক্ষিকমিতি অন্যোন্যাশ্রিতমেকবেলোৎপত্তিরিত্যর্থঃ।'

২ হৃদয়ং চেতনাস্থানমুক্তং সুশ্রুত দেহিনাম্। তমোভিভূতে তস্মিংস্তু নিদ্রা বিশতি দেহিনম্॥ নিদ্রাহেতুস্তমঃ সত্ত্বং বোধনে হেতুরুচ্যতে। স্বভাব এব বা হেতুর্গরীয়ান্ পরিকীর্ত্যতে॥ পূর্বদেহানুভূতাংস্তু ভূতাত্মা স্বপতঃ প্রভুঃ। রজোযুক্তেন মনসা গৃহ্ণাত্যর্থাঞ্ শুভাশুভান্॥ করণানাং তু বৈকল্যে তমসাভিপ্রবর্ধিতে। অস্বপন্নপি ভূতাত্মা প্রসুপ্ত ইব চোচ্যতে॥

৩ 'সত্ত্বাদীনাং সদা সান্নিধ্যাৎ পরস্পরবিরোধিনোঃ স্বাপবোধয়োরনুপপত্তিং মন্যমান আহ—স্বভাব এব বেত্যাদি।'—ডল্হণ।

৪ 'ননু বোধাভাবঃ স্বাপঃ; স্বাপাভাবো বোধঃ, তৎকথং স্বপতঃ স্বপ্নদর্শনং ভবতীত্যাহ—পূর্বেত্যাদি। ননু চ যঃ কশ্চিদর্থাববোধঃ স সর্বোঽপি বাহ্যার্থাবলম্বনো দৃষ্টঃ, ন চ স্বপ্নে বাহ্যার্থস্য সত্ত্বং বিদ্যতে, তৎ কথং তত্রাববোধ ইতি উচ্যতে—স্মৃতিরেবেয়ং পূর্বানুভূতেঽর্থে, ন চাননুভূতবিষয়া পরিস্ফুরতি। ননু তাদৃশ্বিধস্যার্থস্যাদৃষ্টাশ্রুতাননুভূতত্বাৎ কথং স্মৃতিত্বমিত্যাহ—পূর্বদেহানুভূতাংস্ত্বিত্যাদি। এতচ্চোপলক্ষণম্, অতোঽনেনাপি দেহেনানুভূতান্।...স্বপতঃ স্বাপযুক্তস্য শরীরস্য প্রভুঃ স্বামী ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ, তদ্বশেন সর্বক্রিয়াপ্রবৃত্তেঃ। কথং পুনরর্থান্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যান্ নিদ্রাণেষিন্দ্রিয়েষু গৃহ্ণাতীত্যাহ—মনসেতি। মনসঃ সর্বদৈব সত্ত্বাৎ সদা স্বপ্নদর্শনপ্রসঙ্গ ইত্যাহ—রজোযুক্তেনেতি; রজঃপ্রেরিতেনেত্যর্থঃ, রজসঃ প্রবর্তকত্বাৎ; তমোযুক্তেন চ মনসা ন কিমপি সুপ্তঃ পশ্যতি, তমস আবরণাত্মকত্বাৎ।'—ঐ।

৫ 'ইন্দ্রিয়গ্রামস্য তমসা বৈকল্যে আপাদিতে আত্মা নির্বিকারোঽপি সুপ্ত ইব ভবতীতি প্রতিপাদয়ন্নাহ—করণানামিতি। অভিপ্রবর্ধিতে ইতি অভি সর্বতো বহিরন্তশ্চ প্রবর্ধিতে। তত্র বহিরিন্দ্রিয়াণাং বিষয়ভূতেঽর্থে, অন্তর্মনোঽর্থেঽপি সুখদুঃখাদৌ'—ঐ।

মন

সুশ্রুত হৃদয়কে মনের অধিষ্ঠান বলিয়াছেন, যথা ৩।৩।৩২[১], "'গর্ভের উৎপত্তিকালে প্রথমতঃ মস্তক উৎপন্ন হয়' এই কথা শৌনক বলেন, কারণ প্রধান ইন্দ্রিয়সকলের মস্তকই মূল; কৃতবীর্য বলেন 'হৃদয় (প্রথমে উৎপন্ন হয়), কারণ উহা বুদ্ধি ও মনের স্থান'।" অন্যত্র (৩।৪।৩১) উহাকে বিশেষ-রূপে চেতনাস্থান বলাতেও সেই কথাই সূচিত হয়, কারণ উক্ত স্থলের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ডল্‌হণ বলেন[২]: "তাহা অর্থাৎ হৃদয় বিশেষরূপে চেতনাস্থান অর্থাৎ চৈতন্যের আস্পদ, সামান্যভাবে কিন্তু সমস্ত শরীরই চেতনাস্থান। ঐ কথা চরকে বলা হইয়াছে, 'কেশ, লোম, নখাগ্র, অন্ন, মল, দ্রব ও গুণসকলকে ছাড়িয়া দিয়া ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট শরীর ও মন অনুভূতিসকলের অধিষ্ঠান।' চেতনাসহচর মনও বিশেষ করিয়া হৃদয়াশ্রিতরূপে অভিপ্রেত।" ইহা সত্ত্বরজস্তমোময়: 'অগ্নি, সোম, বায়ু, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ভূতাত্মা এইগুলি প্রাণ' সুশ্রুতের এই বাক্যের (৩।৪।৩) ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ডল্‌হণ বলেন[৩], 'সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, মনোরূপে পরিণত, ভূতাত্মা কর্তৃক দেহান্তরের গ্রহণ ও মোক্ষের হেতু।' এইজন্য সুশ্রুত অপর একস্থলে (৩।৬।২৫) হৃদয়কে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃর অধিষ্ঠান বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সত্ত্বের উৎকর্ষাপকর্ষ দ্বারা মনের বলাবল নির্ণীত হয়।[৪] সুশ্রুত বলিয়াছেন (১।৩৫।৩৭-৩৮)[৫] 'সত্ত্ব ব্যসন- ও অভ্যুদয়-ক্রিয়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে অবৈক্লব্যকর। সত্ত্ববান্ নিজেই নিজেকে দৃঢ় করিয়া সমস্ত সহ্য করে, রাজস ব্যক্তি অন্যকর্তৃক দৃঢ়ীকৃত হইয়া সহ্য করে, এবং তামস ব্যক্তি সহ্য করিতেই পারে না।' এই সত্ত্বাদির প্রাধান্যানুসারে প্রকৃতিভেদ নির্দেশ করিতে গিয়া (৩।৪।৮১-৯৭) ব্রাহ্ম, মাহেন্দ্র, বারুণ, কৌবের, গান্ধর্ব, যাম্য ও আর্ষ এই সপ্তবিধ সাত্ত্বিক, আসুর, সার্প, শাকুন, রাক্ষস, পৈশাচ ও প্রেত এই ষড়্‌বিধ রাজস, এবং পাশব, মাৎস্য, ও বানস্পত্য এই ত্রিবিধ তামস কায়ের লক্ষণ দিয়াছেন।

মন ও আত্মার মধ্যে যেরূপ, মন ও শরীরের মধ্যেও সেইরূপ—পরস্পরসাপেক্ষ বলিয়া—সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। শুধু যে নিজ শরীরের উপরই মনের প্রভাব দেখা যায়

১ গর্ভস্থ খলু সম্ভবতঃ পূর্বং শিরঃ সম্ভবতীত্যাহ শৌনকঃ, শিরোমূলত্বাৎ প্রধানেন্দ্রিয়াণাং; হৃদয়মিতি কৃতবীর্যো, বুদ্ধের্মনসশ্চ স্থানত্বাৎ।

২ তদ্ হৃদয়ং বিশেষেণ চেতনাস্থানং চৈতন্যাস্পদং, সামান্যেন তু সকলশরীরমেব চেতনাস্থানম্। তদুক্তং চরকে—"বেদনানামধিষ্ঠানং মনো দেহশ্চ সেন্দ্রিয়ঃ। কেশলোমনখাগ্রান্নমলদ্রবগুণৈর্বিনা॥" চেতনাসহচরিতং মনোঽপি বিশেষেণ হৃদয়াধিষ্ঠানং মতম্।

৩ সত্ত্বং রজস্তমশ্চ মনোরূপতয়া পরিণতং ভূতাত্মনঃ শরীরান্তরগ্রহণমোক্ষণে হেতুরিতি।

৪ 'সত্ত্বং মনোবলং গুণবিশেষো রজস্তমসোর্বিপক্ষঃ'—ডল্‌হণ এবং 'সত্ত্বং সত্ত্বগুণো মনোগতঃ তদুৎকর্ষাদ্ মনো বলবদ্ ভবতি'—চক্রপাণি, সুসং. ১।৩৫।৩৭-৩৮।

৫ সত্ত্বং তু ব্যসনাভ্যুদয়ক্রিয়াদিস্থানেষবিক্লবকরম্॥ সত্ত্ববান্ সহতে সর্বং সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা। রাজসঃ স্তভ্যমানোঽন্যৈঃ সহত্যে নৈব তামসঃ॥

তাহা নহে, সুশ্রুতের উক্তি-অনুসারে গর্ভের উপরও মাতাপিতার মনোভাবের বিশিষ্ট প্রভাব পড়ে; যথা ৩।২।৫২[১], 'মাতাপিতার নাস্তিক্য এবং পুরাকৃত অধর্মের জন্য বাতাদির প্রকোপ-বশতঃ গর্ভ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়।' এবং ৩।৩।১৯-২১[২], 'গর্ভিণী যে যে ইন্দ্রিয়ার্থ সেবা করিতে চাহেন গর্ভাবাধের ভয়ে বৈদ্য সেই সকল সংগ্রহ করিয়া দেওয়াইবেন। দৌহৃদ প্রাপ্ত হইলে তিনি গুণবান্ পুত্র প্রসব করেন, দৌহৃদ না পাইলে গর্ভ অথবা নিজের সম্বন্ধে তাঁহার ভয়ের কারণ ঘটে। যে যে ইন্দ্রিয়ার্থের সম্বন্ধে দৌহৃদে বিমাননা ঘটে সন্তানের সেই সেই ইন্দ্রিয়ে পীড়া জন্মায়।'

শরীর

[৩]'গর্ভাশয়স্থ শুক্রশোণিত, আত্মা, প্রকৃতিসকল ও বিকৃতিসকলের সহিত মিশ্রিত হইয়া গর্ভ-নামে কথিত হয়। চেতনা-হেতু অবস্থিত তাহাকে বায়ু বিভক্ত করে, তেজঃ পাক করে, জল ক্লিন্ন করে, পৃথিবী সংহত করে, আকাশ বিবর্ধিত করে; এইরূপে বিবর্ধিত হইয়া উহা যখন হস্ত, পাদ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, কর্ণ, নিতম্ব প্রভৃতি অঙ্গ-সমন্বিত হয় তখন শরীর আখ্যা লাভ করে।[৪]'—৩।৫।৩। অন্যত্র (৩।৪।৩)[৫] দেহস্থিতির হেতুরূপে[৬] এবং দেহারম্ভের নিমিত্তরূপে[৭] অগ্নি, সোম, বায়ু, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ভূতাত্মা এই দ্বাদশটি প্রাণের[৮] উল্লেখ

---

১ মাত্রাপিত্রোস্তু নাস্তিক্যাদশুভৈশ্চ পুরাকৃতৈঃ। বাতাদীনাং প্রকোপেণ গর্ভো বৈকৃতমাপ্নুয়াৎ॥

২ ইন্দ্রিয়ার্থাংস্তু যান্ যান্ সা ভোক্তুমিচ্ছতি গর্ভিণী। গর্ভাবাধভয়াত্তাংস্তান্ ভিষগাহৃত্য দাপয়েৎ॥ সা প্রাপ্তদৌহৃদা পুত্রং জনয়েত গুণান্বিতম্। অলব্ধদৌহৃদা গর্ভে লভেতাত্মনি বা ভয়ম্॥ যেষু যেষিন্দ্রিয়ার্থেষু দৌহৃদে বৈ বিমাননা। প্রজায়েত সুতস্যার্তিস্তস্মিংস্তস্মিংস্তথেন্দ্রিয়ে॥

৩ শুক্রশোণিতং গর্ভাশয়স্থমাত্মপ্রকৃতিবিকারসংমূর্ছিতং গর্ভ ইত্যুচ্যতে। তং চেতনাবস্থিতং বায়ুর্বিভজতি, তেজ এনং পচতি, আপঃ ক্লেদয়ন্তি, পৃথিবী সংহন্তি, আকাশং বিবর্ধয়তি; এবং বিবর্ধিতঃ স যদা হস্তপাদজিহ্বাঘ্রাণকর্ণনিতম্বাদিভিরঙ্গৈ-রুপেতস্তদা শরীরমিতি সংজ্ঞাং লভতে।

৪ 'আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ, প্রকৃতয়ঃ প্রধানাদয়োঽষ্টৌ, বিকারা পঞ্চভূতান্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি চেতি ষোড়শ;......এতেন যোগিনামুপযোগী পঞ্চবিংশতিকো রাশিরুক্তঃ। তমিদানীং ভিষজামুপযোগিনং ষড়্‌ধাতুকং কৃত্বা নির্দিশন্নাহ—তমিত্যাদি। চেতনয়া হেতুভূতয়া যাবদ্গর্ভপ্রসবকালমবস্থিতং চেতনাবস্থিতম্, অন্যথা কুথিতবিশীর্ণং স্যাৎ। তং বায়ুর্বিভজতি দোষধাতুমলাঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিভাগেন; তেজ এনং পচতি রূপাদ্রূপান্তরেণাবস্থানং প্রাপয়তি; আপঃ ক্লেদয়ন্তি বিভাগপরিণামকারিণোরনিলানলয়োঃ শোষণেঽপ্যার্দ্রতাং জনয়ন্তি; পৃথিবী সংহন্তি অপ্তিঃ ক্লিন্নমপি কঠিনং মূর্তিমৎ করোতি;......আকাশং বিবর্ধয়তি অনিলানল-বিদারিতস্রোতসামাপ্যায়নেনোর্ধ্বমধস্তির্যগ্‌বিবর্ধিতমবকাশদানেন বিবর্ধয়তি।'—ডল্হণ।

৫ অগ্নিঃ সোমো বায়ুঃ সত্ত্বং রজস্তমঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি ভূতাত্মা ইতি প্রাণাঃ।

৬ 'তেষু প্রাণানামতীব দেহস্থিতিহেতুত্বাৎ প্রাগুপাদানমাহ'—ডল্হণ ৩।৪।৩।

৭ 'প্রাণসদ্ভাব এব শুক্রশোণিতস্য পরিণামেন ত্বগাদিসম্ভব ইতি......'—ঐ ৩।৪।৪।

৮ 'অগ্নিরত্র পাচকভ্রাজকালোচকরঞ্জকসাধকানাং পাঞ্চভৌতিকানাং সর্বধাত্বনুগানাং চোষ্মণাং শক্তিরূপতয়াঽবস্থিতো বাচোঽধিদৈবত্বমাপন্নো বোদ্ধব্যঃ। শ্লেষ্মরসশুক্রাদীনাং তোয়াত্মকানাং ভাবানাং রসনেন্দ্রিয়স্য চ শক্তিরূপতয়াবস্থিতো মনসোঽধিদৈবত্বমাপন্নঃ সোম ইতি। বায়ুঃ পঞ্চাত্মকঃ প্রাণাদিভেদেন।......ভূতাত্মা শুভাশুভকর্মভিঃ পরিগৃহীতঃ কর্মপুরুষঃ। এতে চাগ্নীষোমাদয়ঃ প্রাণয়ন্তি জীবয়ন্তীতি প্রাণাঃ। তত্রাগ্নিস্তাবদাহারপাকাদিকর্মণা প্রাণয়তি, সোমশ্চ সৌম্যধাতো-রোজঃপ্রভৃতেঃ পোষণেন, বায়ুশ্চ দোষধাতুমলাদীনাং সঞ্চারণেনোচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাভ্যাং চ, সত্ত্বং রজস্তমশ্চ মনোরূপতয়া পরিণতং

করিয়াছেন। ধন্বন্তরির মতে গর্ভের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যুগপৎ উৎপন্ন হয়, গর্ভ সূক্ষ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। যেমন পরিপক্ক আম্রফলে কেশর, মাংস, অস্থি, ও মজ্জাসমূহ পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট হয়, সেগুলি কিন্তু তরুণ ফলে সূক্ষ্মতা-হেতু দৃষ্টিগোচর হয় না,—কাল তাহাদিগের প্রব্যক্ততা আনয়ন করে, তেমনই গর্ভের তরুণাবস্থায় সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকা সত্ত্বেও সৌক্ষ্ম্যবশতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইগুলিই আবার কালকৃত পরিণাম-বশতঃ প্রব্যক্ত হয়।[১] এস্থলে যেমন সুশ্রুতের সৎকার্যবাদিতা বা পরিণামবাদিতা স্পষ্ট, অনুরূপ এক স্থলেও (১।১৪।১৮) তদ্রূপ: "যেমন ফুলের কুঁড়ির মধ্যে গন্ধ আছেও বলিতে পারা যায় না, নাইও বলিতে পারা যায় না; অথচ আছে,—বিদ্যমান ভাবসকলেরই অভিব্যক্তি হয় ইহা জানিয়া, কেবল সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত অভিব্যক্ত হয় না; উহাই আবার ফুলে পাপড়ি ও কেশর প্রকট হইলে কালান্তরে অভিব্যক্ত হয়; সেইরূপ বালকদিগেরও বয়ঃপরিণাম-হেতু শুক্রের এবং নারীদিগের রোমরাজি-প্রভৃতি বিশেষসকলের প্রকাশ হয়"।[২]

এইভাবে নির্মিত পাঞ্চভৌতিক শরীর পাঞ্চভৌতিক আহারের দ্বারা পুষ্ট হয়: ১।৪৬।৫২৬[৩], 'পঞ্চভূতাত্মক দেহে পাঞ্চভৌতিক আহার পঞ্চপ্রকারে[৪] বিপক্ব হইয়া নিজ নিজ গুণকে বর্ধিত করে।'

ইতঃপূর্বে (পৃঃ ২২, পং ১) বলা হইয়াছে যে মাতাপিতার নাস্তিক্য এবং পুরাকৃত অশুভ কর্মের জন্য বাতাদির প্রকোপ-বশতঃ গর্ভ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। উক্ত স্থলে গর্ভের উপর দৌহৃদের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির প্রভাবের কথাও সূচিত হইয়াছে। শেষোক্ত প্রসঙ্গে সুশ্রুত বলেন (৩।৩।৯)[৫]:

কর্ম

'প্রাণীর কর্মপ্রেরিত ভবিতব্য যেমন হইবার থাকে সেই অনুসারেই দৈবযোগে হৃদয়ে দৌহৃদ জন্মায়।' [৬]'যে কর্মদ্বারা প্রেরিত হয় পুনর্জন্মে তাহাই প্রাপ্ত হয়; পূর্বদেহে যেসকল গুণ অভ্যাস করিয়াছিল, সেই সকলই প্রাপ্ত হয়।' 'পূর্বদেহে' যাঁহাদের

ভূতাত্মনঃ শরীরান্তরগ্রহণমোক্ষণে হেতুরিতি তদপি প্রাণয়তি, পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি রূপাদিগ্রহণকর্মণা প্রাণয়ন্তি, এবং ভূতাত্মা কর্মপুরুষোঽপ্যশেষস্যৈব কর্মরাশেশ্চেতনাহেতুরিতি প্রাণয়তি।'—ডল্হণ।

১ ৩।৩।৫২,…সর্বাণ্যঙ্গপ্রত্যঙ্গানি যুগপৎ সম্ভবন্তীত্যাহ ধন্বন্তরিঃ, গর্ভস্য সূক্ষ্মত্বান্নোপলভ্যন্তে বংশাঙ্কুরবচ্চূতফলবচ্চ; তদ্যথা—চূতফলে পরিপক্কে কেশরমাংসাস্থিমজ্জানঃ পৃথক্ পৃথগ্দৃশ্যন্তে কালপ্রকর্ষাৎ, তান্যেব তরুণে নোপলভ্যন্তে সূক্ষ্মত্বাৎ; তেষাং সূক্ষ্মাণাং কেশরাদীনাং কালঃ প্রব্যক্ততাং করোতি; এতেনৈব বংশাঙ্কুরোঽপি ব্যাখ্যাতঃ। এবং গর্ভস্য তারুণ্যে সর্বেষ্বঙ্গপ্রত্যঙ্গেষু সৎস্বপি সৌক্ষ্ম্যাদনুপলব্ধিঃ, তান্যেব কালপ্রকর্ষাৎ প্রব্যক্তানি ভবন্তি।

২ যথাহি পুষ্পমুকুলস্থো গন্ধো ন শক্যমিহাস্তীতি বক্তুং, নৈব নাস্তীতি; অথ চাস্তি, সতাং ভাবানামভিব্যক্তিরিতি জ্ঞাত্বা কেবলং সৌক্ষ্ম্যান্নাভিব্যজ্যতে; স এব বিবৃতপত্রকেশরে পুষ্পে কালান্তরেণাভিব্যক্তিং গচ্ছতি; এবং বালানামপি বয়ঃপরিণামাচ্ছুক্রপ্রাদুর্ভাবো ভবতি, রোমরাজ্যাদয়শ্চ বিশেষা নারীণাম্।

৩ পঞ্চভূতাত্মকে দেহে হ্যাহারঃ পাঞ্চভৌতিকঃ। বিপক্বঃ পঞ্চধা সম্যগ্ গুণান্ স্বানভিবর্ধয়েৎ॥

৪ 'পঞ্চধা সম্যগিতি পঞ্চভির্মহাভূতাগ্নিভিঃ।'—ডল্হণ।

৫ কর্মণা চোদিতং জন্তোর্ভবিতব্যং পুনর্ভবেৎ। যথা তথা দৈবযোগাদ্ দৌহৃদং জনয়েদ্ধৃদি॥

৬ ৩।২।৫৮, কর্মণা চোদিতো যেন তদাপ্নোতি পুনর্ভবে। অভ্যস্তাঃ পূর্বদেহে যে তানেব ভজতে গুণান্॥

৭ ৩।২।৫৭, ভাবিতাঃ পূর্বদেহেষু সততং শাস্ত্রবুদ্ধয়ঃ। ভবন্তি সত্ত্বভূয়িষ্ঠাঃ পূর্বজাতিস্মরা নরাঃ॥

অন্তঃকরণ শাস্ত্রচিন্তায় ভাবিত তাঁহারা শাস্ত্রবুদ্ধি হন, এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সত্ত্ববহুল তাঁহারা পূর্বজাতিস্মর হন।'

[1]'ব্যাধিসমূহের মধ্যে কতকগুলি কর্মজ, কতকগুলি দোষজ, এবং অপর কতকগুলি উভয়জ। তন্মধ্যে কর্মজগুলি নিদানরহিতভাবে উৎপন্ন হয়, এবং কর্মক্ষয় হইলে চিকিৎসাক্রিয়া ছাড়াও এবং প্রায়শ্চিত্তাদি ক্রিয়া দ্বারাও শান্ত হয়। যেগুলি দোষজ তাহারা দোষক্ষয়ের কারণসমূহের জন্য শান্ত হয়। তাহাদের মধ্যে যেগুলি নিদান অল্প হইলেও কষ্টদায়ক, অথবা বহুদোষারব্ধ হইয়াও মৃদু, তাহারা কর্মদোষোদ্ভব ; যাহা কর্ম ও দোষ উভয়ের নাশক তাহাই তাহাদের চিকিৎসা।' উভয়জ ব্যাধির বিশিষ্ট উদাহরণ কুষ্ঠ। ইহার নিদানরূপে মিথ্যাহারাচারাদি ত্রিদোষকোপ-হেতুর উল্লেখ করিয়া অন্তে বলিয়াছেন (২।৫।৩০-৩২)[2] : 'ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক ও সজ্জনের বধ, পরস্বহরণ প্রভৃতি কর্মের জন্য পাপরোগ কুষ্ঠের উৎপত্তি হয়। কুষ্ঠের জন্য যদি মৃত্যু হয়, জন্মান্তরেও তাহা উপস্থিত হয়।...আহার এবং আচারের উপদিষ্ট বিপুল ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া বিশিষ্ট ওষধিসকল এবং তপস্যার সেবন দ্বারা যে ব্যক্তি তাহা হইতে মুক্ত হয় সে শুভ গতি লাভ করে।'

মৃত্যুর কারণ নির্দেশ করিতে গিয়াও সুশ্রুত বলিয়াছেন (১।৩১।৩০)[3], 'বিষম উপচারের জন্য, পুরাকৃত কর্মসকলের জন্য[4], এবং (স্বভাবতঃ) অনিত্য বলিয়া প্রাণীদিগের জীবনের অবসান হয়।' অন্যত্র (১।৩৪।৬) বলিয়াছেন[5], 'অথর্ববেদ-বিদ্গণ একশত-এক মৃত্যুর কথা বলিয়া থাকেন, তন্মধ্যে একটি কালজ, বাকীগুলি আগন্তু।'

ক্রমশঃ

১ ৬।৪০।১৬৩-১৬৬, কর্মজা ব্যাধয়ঃ কেচিদ্দোষজাঃ সন্তি চাপরে। কর্মদোষোদ্ভবাশ্চান্যে কর্মজাস্তেষ্বহেতুকাঃ ॥ নশ্যন্তি স্বক্রিয়াভিস্তে ক্রিয়াভিঃ কর্মসংক্ষয়ে। শাম্যন্তি দোষসম্ভূতা দোষসংক্ষয়হেতুভিঃ ॥ তেষামল্পনিদানা যে প্রতিকষ্টা ভবন্তি চ। মৃদবো বহুদোষা বা কর্মদোষোদ্ভবাস্তু তে। কর্মদোষক্ষয়কৃতা তেষাং সিদ্ধির্বিধীয়তে ॥

২ ব্রহ্মস্ত্রীসজ্জনবধপরস্বহরণাদিভিঃ। কর্মভিঃ পাপরোগস্য প্রাহুঃ কুষ্ঠস্য সম্ভবম্ ॥ ম্রিয়তে যদি কুষ্ঠেন পুনর্জাতেঽপি গচ্ছতি ॥......আহারাচারয়োঃ প্রোক্তামাস্থায় মহতীং ক্রিয়াম্। ওষধীনাং বিশিষ্টানাং তপসশ্চ নিষেবণাৎ। যস্তেন মুচ্যতে জন্তুঃ স পুণ্যাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥

৩ বিষমেণোপচারেণ কর্মভিশ্চ পুরাকৃতৈঃ। অনিত্যত্বাচ্চ জন্তূনাং জীবিতং নিধনং ব্রজেৎ ॥

৪ 'প্রকৃতের্বলাদীন্ ভাবানবেক্ষ্য কৃত উপচারঃ সমোপচারঃ, তদ্বিপরীতো বিষমোপচারঃ। পুরাকৃতৈঃ পূর্বজন্মার্জিতৈঃ কর্মভিঃ শরীরস্থাপকৈঃ 'ক্ষীণৈঃ' ইত্যধ্যাহারঃ।'—ডল্হণ।

৫ একোত্তরং মৃত্যুশতমথর্বাণঃ প্রচক্ষতে। তত্রৈকঃ কালসংযুক্তঃ শেষা আগন্তবঃ স্মৃতাঃ ॥ টীকাকার এই শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অকালমৃত্যুর বিরুদ্ধে শঙ্কা উত্থাপন করিয়া নিম্নোক্তভাবে তাহার সমাধান করিয়াছেন: "যখনই কাহারও মৃত্যু হয় তাহাই তাহার কালমৃত্যু, সুতরাং 'অকালমৃত্যু' কেমন করিয়া বলা হয়? সেইরূপ বলাও হইয়াছে, 'কেহ অকালে মৃত হয় না, অকালজ মৃত্যু নাই। যে যখনই মারা যায় তাহাই তাহার মৃত্যুকাল।' ব্যাসভট্টারকও বলিয়াছেন, 'শত শত শর দ্বারা বিদ্ধ হইলেও কেহ অকালে মৃত হয় না ; হে কৌন্তেয়, যাহার কাল উপস্থিত হইয়াছে, তৃণসকলও তাহার পক্ষে বজ্রবৎ আচরণ করে।' ইহাই বস্তু নহে, কারণ আচার্যগণ উপমানাদি প্রমাণ দ্বারা বহুপ্রকারে অকালমৃত্যু স্থাপিত করিয়াছেন। এই যেমন,—'অকালে যেমন বর্ষণ, যেমন ফুল, যেমন ফল, যেমন দীপনির্বাণ হয়, অকালে মরণও সেইরূপ।'......অন্যেরাও বলিয়াছেন, 'কালকে দেবতারাও বঞ্চনা করিতে পারেন না ; অপমৃত্যু-বিনাশের বিধান বলিতেছি। যদি মৃত্যুই হয়, অপমৃত্যু কিছুতেই না হয়, চরক-সুশ্রুত-বাগ্‌ভট-প্রভৃতি তাহা হইলে ব্যর্থ।' অতএব মৃত্যু কালেও হয়, অকালেও হয়।"

ন্যায়মতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের স্বরূপ.

অধ্যাপক শ্রীশীতাংশুশেখর বাগচী, এম.এ., বি.এল.

পূর্বানুবৃত্তি

কেহ কেহ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সেই অনুমান এইরূপ—জ্ঞানত্বং নিষ্প্রকারত্ব সমানাধিকরণং, সকলজ্ঞানবৃত্তিত্বাৎ, সত্তাবৎ অর্থাৎ জ্ঞানত্ব ধর্ম—নিষ্প্রকারকত্ব ধর্মের সমানাধিকরণ; যেহেতু জ্ঞানত্ব ধর্মটি সকল জ্ঞানবৃত্তি। যে যে ধর্মসকল জ্ঞানবৃত্তি তাহা নিষ্প্রকারকত্ব ধর্মের সমানাধিকরণ হইয়া থাকে। যেমন সত্তারূপ ধর্ম। এই সত্তা ধর্মটি জাতি এবং উহা দ্রব্য, গুণ কর্মমাত্রেই আছে। জ্ঞান গুণ পদার্থ। একন্য সত্তা জাতি সকল জ্ঞানবৃত্তি ধর্ম হইয়া থাকে এবং এই সত্তা জাতি নিষ্প্রকারকত্ব ধর্মের সমানাধিকরণ হইয়াছে। কারণ ঘটপটাদি দ্রব্য, রূপরসাদি গুণ এবং উৎক্ষেপণাদি কর্ম—ইহারা নিষ্প্রকারক। অথচ এই দ্রব্যাদিতে সত্তা জাতি আছে। সুতরাং সত্তা জাতি সকল জ্ঞানবৃত্তি ধর্মও বটে এবং নিষ্প্রকারকত্ব ধর্মের সমানাধিকরণও বটে। জ্ঞানত্বও সত্তার মতই সকল জ্ঞানবৃত্তি ধর্ম। তাহাও নিষ্প্রকারকত্ব ধর্মের সমানাধিকরণ হইবে। জ্ঞানত্ব ধর্ম নিষ্প্রকারক ঘটপটাদি বস্তুতে নাই। ঘটপটাদি দ্রব্য, তাহাতে জ্ঞানত্ব জাতি থাকিতে পারে না। জ্ঞানত্ব জাতি ঘটপটাদিতে বাধিত। জ্ঞানরূপ গুণেই মাত্র জ্ঞানত্ব জাতি থাকে। সুতরাং জ্ঞানত্ব নিষ্প্রকারকত্ব ধর্মের সমানাধিকরণ হইতে হইলে নিষ্প্রকারক জ্ঞান মানিলেই তাহা সম্ভব। যদি কোন জ্ঞান নিষ্প্রকারক হয়, তবে সেই জ্ঞানে জ্ঞানত্ব ধর্মটি নিষ্প্রকারকত্ব ধর্মের সমানাধিকরণ হইতে পারিবে। আর নিষ্প্রকারকত্ব ধর্ম সমানাধিকরণ জ্ঞানত্ব সিদ্ধি হইলেই নির্বিকল্পক জ্ঞান ও সিদ্ধি হইল। নিষ্প্রকারক জ্ঞানকেই নির্বিকল্পক জ্ঞান বলে। সপ্রকারক জ্ঞানের নাম সবিকল্পক জ্ঞান। সুতরাং নির্বিকল্পক জ্ঞানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলেও এই প্রদর্শিত অনুমানই নির্বিকল্পক জ্ঞানে প্রমাণ হইবে। কিন্তু এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ প্রদর্শিত অনুমানে বিপক্ষবাধক তর্ক নাই বলিয়া হেতুটি অপ্রয়োজকতা দোষে দুষ্ট। অভিপ্রায় এই যে—সকল জ্ঞানবৃত্তিত্বরূপ হেতুটি যদি নিষ্প্রকারকত্ব ধর্মের সমানাধিকরণ না হয় তবে কি অনিষ্ট প্রসঙ্গ হইবে? এস্থলে কোন অনিষ্ট প্রসঙ্গইত দেখা যায় না। সুতরাং হেতুর বিপক্ষবৃত্তিতার বাধক কোন তর্ক নাই বলিয়া ঐ হেতুটি অপ্রয়োজক।

১ তত্ত্বচিন্তামণি, প্রত্যক্ষখণ্ড, ৮০৯ পৃঃ

এই অনুমানে আরও দোষ এই যে—যদি কেহ প্রদর্শিত হেতু ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে এরূপ অনুমান করেন যে, জ্ঞানত্ব ধর্মটি ঘটত্ব ধর্মের সমানাধিকরণ হইবে। যেহেতু জ্ঞানত্ব সকল জ্ঞানবৃত্তি ধর্ম। যে যে সকল জ্ঞানবৃত্তি ধর্ম তাহা ঘটত্ব সমানাধিকরণ হইয়া থাকে। যেমন সত্তা জাতি সকল জ্ঞানবৃত্তি ধর্ম অথচ ঘটত্বের সমানাধিকরণ। সুতরাং প্রদর্শিত হেতুটি এইরূপ দুষ্ট অনুমিতিরও জনক হইতে পারে। এজন্য প্রদর্শিত অনুমানটি অতিপ্রসঙ্গদোষ দুষ্ট বলিয়া, ইহা দ্বারা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সিদ্ধি হইতে পারে না।[১]

কেহ কেহ নির্বিকল্পক সাধক অন্যরূপ অনুমানও করিয়া থাকেন। তাহা এই—চক্ষুঃ চাক্ষুষসবিকল্পকাতিরিক্তজ্ঞানকরণং, জ্ঞানকরণত্বাৎ ঘ্রাণবৎ অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়—চাক্ষুষ সবিকল্পক জ্ঞানের অতিরিক্ত জ্ঞানের করণ; যেহেতু চক্ষু জ্ঞানের করণ। যাহা যাহা জ্ঞানের করণ তাহা চাক্ষুষ সবিকল্পক জ্ঞানের অতিরিক্ত জ্ঞানের করণ হইয়া থাকে। যেমন ঘ্রাণেন্দ্রিয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয় জ্ঞানের করণও বটে এবং তাহা চাক্ষুষ সবিকল্পক জ্ঞানের অতিরিক্ত সৌরভাদি জ্ঞানের করণ হইয়া থাকে। নির্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকার না করিয়াও ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপ দৃষ্টান্তে সাধ্যের প্রসিদ্ধি আছে। যেহেতু ঘ্রাণেন্দ্রিয় সৌরভাদি গন্ধবিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞানের জনক হইয়া থাকে। এই সৌরভাদি গন্ধবিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞান চাক্ষুষ সবিকল্পক জ্ঞানের অতিরিক্তই বটে। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় যদি চাক্ষুষ সবিকল্পক জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞানের করণ বলিয়া সিদ্ধ হয়, তবে ফলবলে চাক্ষুষ নির্বিকল্পক জ্ঞানের করণই চক্ষু হইয়া পড়িল। এই অনুমানটিও পূর্বপ্রদর্শিত অনুমানের মতই অপ্রযোজকতা দোষ দুষ্ট। যেহেতু এই অনুমানেও কোন অনুকূল তর্ক নাই। কারণ কোন জ্ঞানের করণ যদি চাক্ষুষ সবিকল্পকাতিরিক্ত জ্ঞানের করণ না হয়, তবে কি অনিষ্ট প্রসঙ্গ হইবে? অর্থাৎ পক্ষে হেতুটি থাকিলেও যদি সাধ্য না থাকে তবে কোন অনিষ্ট প্রসঙ্গই নাই। সুতরাং এই অনুমান অনুকূল তর্করহিত বলিয়া অপ্রযোজক।

আরও কথা এই যে—যাঁহারা নির্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকার করেন এই অনুমানটি তাঁহাদেরও অনভিপ্রেত অনিষ্টের সাধক হইতে পারে। যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়—চাক্ষুষ নির্বিকল্পকও সবিকল্পকজ্ঞান ভিন্ন জ্ঞানের জনক হইবে, যেহেতু চক্ষু জ্ঞানের করণ। যে যে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের করণ তাহা চাক্ষুষ নির্বিকল্পক সবিকল্পকাতিরিক্ত জ্ঞানের করণ হইয়া থাকে। যেমন ঘ্রাণেন্দ্রিয় ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষের করণ হইয়া থাকে। এই সৌরভাদি বিষয়ক ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ, চাক্ষুষ নির্বিকল্পক সবিকল্পকাতিরিক্ত জ্ঞানই বটে। যাঁহারা চাক্ষুষ নির্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকার করেন তাঁহারা কিন্তু চাক্ষুষ নির্বিকল্পক সবিকল্পকাতিরিক্ত

১ তর্কতাণ্ডব, প্রথম খণ্ড, ১৮৪ পৃঃ

চাক্ষুষজ্ঞান স্বীকার করেন না। এরূপে তাঁহাদের মতেও অতিপ্রসঙ্গ দোষই ঘটিবে। সুতরাং প্রদর্শিত অনুমান দুইটি স্বব্যাঘাতক বলিয়া জাত্যুত্তর।[১]

কেহ কেহ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে এরূপ অনুমান প্রদর্শন করেন যে, জাগ্রদাদ্যং গৌরিতিজ্ঞানং জন্য বিশেষণজ্ঞানজন্যং, জন্যবিশিষ্টজ্ঞানজন্যত্বাৎ, দণ্ডী পুরুষ ইতি জ্ঞানবৎ অর্থাৎ 'সুপ্তোত্থিত পুরুষের প্রাথমিক গৌঃ এইরূপ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ জাগরণের প্রাথমিক অবস্থায় গৌঃ এইরূপ প্রত্যক্ষ, জন্যবিশেষণজ্ঞান জন্য হইবে। যেহেতু গৌঃ এই প্রত্যক্ষটি জন্যবিশিষ্টজ্ঞান। যাহা যাহা জন্যবিশিষ্টজ্ঞান তাহা জন্যবিশেষণ জ্ঞানজন্য হইয়া থাকে। যেমন দণ্ডীপুরুষ—এইরূপ জন্যবিশিষ্টজ্ঞান, জন্যবিশেষণজ্ঞান অর্থাৎ দণ্ডজ্ঞান জন্য হইয়া থাকে। গৌঃ এইরূপ প্রত্যক্ষকে পক্ষরূপে নির্দেশ না করিয়া জাগরণের আদ্যক্ষণে গৌঃ এইরূপ প্রত্যক্ষকে পক্ষ করিবার অভিপ্রায় এই যে—জাগরণের প্রাথমিক সবিকল্পকজ্ঞানকে গ্রহণ করিবার জন্যই এইরূপ বলা হইয়াছে। জাগরণদশাতে দ্বিতীয়, তৃতীয় সবিকল্পকজ্ঞান, প্রথম দ্বিতীয় সবিকল্পকজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া সিদ্ধসাধন দোষ হইবে। অর্থাৎ নির্বিকল্পকজ্ঞান সিদ্ধ না হইয়াও সাধ্য সিদ্ধি হইতে পারিবে। আর তাহাতে এই অনুমানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। নির্বিকল্পক-জ্ঞান সিদ্ধির জন্যই এই অনুমানটি প্রদর্শন করা হইয়াছে। তাহা যদি প্রথম বা দ্বিতীয় সবিকল্পক জ্ঞান দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া যায়, তবে অনুমানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। এজন্যই পক্ষে উক্ত বিশেষণটি যোগ করা হইয়াছে।[২] আর সাধ্যে যে জন্য বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে তাহা না দিলে জন্যবস্তু মাত্রই নিত্য ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞানজন্য বলিয়া অর্থান্তরতা দোষ হইত। অর্থাৎ নির্বিকল্পক জ্ঞান-জন্যত্ব সিদ্ধ না হইয়া নিত্য ঈশ্বরজ্ঞান-জন্যত্বের সিদ্ধি হইয়া পড়িত। সুতরাং অনুমানের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইত না। হেতুতে যে জন্য বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে তাহা না দিলে হেতুটি ব্যভিচারী হইয়া পড়িত। যেহেতু বিশিষ্টজ্ঞানমাত্রই বিশেষণজ্ঞান জন্য নহে। অন্ততঃ ঈশ্বরের বিশিষ্টজ্ঞান নিত্য বলিয়া তাহাতে বিশিষ্ট জ্ঞানত্ব হেতু আছে। কিন্তু বিশেষণজ্ঞান-জন্যত্ব সাধ্য নাই।

১ তত্ত্বচিন্তামণি, প্রত্যক্ষখণ্ড, ৮১৬ পৃঃ

২ জাগরণের প্রথম অবস্থাতে 'গৌঃ' এই বিশিষ্টজ্ঞানটি যখন উৎপন্ন হইবে, আর তাহাতে জন্যবিশেষণজ্ঞান-জন্যত্ব সিদ্ধি হইলে গোত্ববিষয়ক নির্বিকল্পক জ্ঞানেরই সিদ্ধি হইবে। কারণ গৌঃ এই বিশিষ্ট জ্ঞানে গোত্ব বিশেষণ ও গো ব্যক্তি বিশেষ্য। এই বিশেষণ গোত্বধর্মের জ্ঞানই বিশেষণ জ্ঞান। এই বিশেষণ জ্ঞানও বিশিষ্ট জ্ঞান হইলে, এই বিশিষ্ট জ্ঞানের জন্য আবার বিশেষণ জ্ঞানের অপেক্ষা হইত। এইরূপে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়িত। এজন্য 'গোত্ব'রূপ বিশেষণের জ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞান নহে, ইহাই অনবস্থা ভয়ে স্বীকার করিতে হইবে। আর এই অবশিষ্টরূপে গোত্ববিশেষণের জ্ঞানই নির্বিকল্পক জ্ঞান। এই বিশিষ্ট প্রতীতির জনকরূপে যে অবশিষ্ট বিশেষণ জ্ঞানটি সিদ্ধ হইল- ইহাই এই অনুমানের ফল। তদ্দ্বারাই গোত্ববিষয়ক নির্বিকল্পক জ্ঞান সিদ্ধ হইল। ইহাই অনুমান প্রদর্শনকারীর অভিপ্রায়।

'দণ্ডী-পুরুষ' এই বিশিষ্টজ্ঞানরূপ দৃষ্টান্তটীতে হেতু ও সাধ্য উভয়ই আছে। কেননা এই জ্ঞানটি জন্যবিশিষ্টজ্ঞান এবং দণ্ডজ্ঞানরূপ জন্যবিশেষণ জ্ঞান-জন্যও বটে।[১]

এই প্রদর্শিত অনুমানটিও অসঙ্গত। কারণ এই অনুমানে প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটি সাধ্যবিকল হইয়াছে। এই দৃষ্টান্তে সাধ্যরূপ ধর্মটি নাই। অর্থাৎ "দণ্ডীপুরুষ" এই প্রত্যক্ষ, দণ্ডরূপ বিশেষণজ্ঞান জন্য নহে। দণ্ড ও পুরুষ এই দুইটি বস্তুতে যুগপৎ ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হইয়া দণ্ড ও পুরুষে অসংসর্গের আগ্রহ আছে বলিয়া "দণ্ডী পুরুষ" এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিবে। আর ইহাই অনুভবসিদ্ধ। এই বিশিষ্ট জ্ঞানের পূর্বে দণ্ডজ্ঞান হইবার কোন আবশ্যকতা নাই।[২]

চিন্তামণিকার কর্তৃক নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে অনুমান প্রদর্শন

চিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রত্যক্ষচিন্তামণি গ্রন্থে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সিদ্ধি করিবার জন্য প্রদর্শিত অনুমানের পক্ষটি কিঞ্চিৎ বিশেষিত করিয়া বলিয়াছেন। তিনি যে অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার আকার এইরূপ—মানুষ জন্ম গ্রহণ করিবার

১ জন্য বিশিষ্ট (=সবিকল্পক) প্রত্যক্ষজ্ঞান নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষজন্য হইলেও এমন কতকগুলি জন্যবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে যাহা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষজন্য নহে। সেই জন্য সবিকল্পক প্রত্যক্ষগুলি নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষপূর্বক না হইয়া প্রথমতঃই সবিকল্পক প্রত্যক্ষরূপ হইয়া থাকে। তার্কিকগণও ইহা স্বীকার করেন। তাহা আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। তার্কিকগণ ঈশ্বর স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। তাহারা বলেন ঈশ্বরের যে সর্ববিষয়ক জ্ঞান আছে তাহা নিত্যজ্ঞান। ঈশ্বরের কোন জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। ঈশ্বরে সর্বদাই সর্ববিষয়ক জ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে। ঈশ্বরের এই সর্ববিষয়ক নিত্যজ্ঞান মাত্র একটি। ঈশ্বরের জ্ঞান অনেক নহে অর্থাৎ একাধিক নহে। সুতরাং ঈশ্বরের সমূহালম্বনরূপ সর্ববিষয়ক নিত্য জ্ঞান। ঈশ্বরের এই নিত্যজ্ঞান প্রত্যক্ষরূপ—পরোক্ষরূপ নহে। তাঁহারা বলেন—ঈশ্বর সাধক প্রমাণই ঈশ্বরে সর্ববিষয়ক নিত্যপ্রত্যক্ষরূপ একটি জ্ঞানের সিদ্ধি করিয়া থাকে। ঈশ্বরের অনুমতি বা উপমিতিরূপ পরোক্ষজ্ঞান নাই। পরোক্ষজ্ঞান মাত্রই নিত্য হইতে পারে না। এজন্য ঈশ্বরের জ্ঞান পরোক্ষ হইতে পারে না। ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য। যদিও ব্যাপ্তি প্রভৃতির জ্ঞান-জন্য পরোক্ষ জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় তথাপি ঈশ্বরের প্রত্যক্ষজ্ঞান নিত্য বলিয়া তাহা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য নহে। যেমন অনুমিতি প্রভৃতি পরোক্ষ জ্ঞান ঈশ্বরের নাই সেইরূপ স্মৃতিজ্ঞানরূপ পরোক্ষজ্ঞানও ঈশ্বরের নাই। ঈশ্বর কোন বিষয়েরই স্মর্তা বা অনুমাতা নহেন। কিন্তু সর্ববিষয়ের (প্রত্যক্ষ) দ্রষ্টা। যদিও এসম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের মতভেদ দৃষ্ট হয় তথাপি নৈয়ায়িকগণ এইরূপই স্বীকার করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের নিত্যপ্রত্যক্ষ সবিকল্পরূপ, নির্বিকল্পরূপ নহে। বিশিষ্টপ্রত্যক্ষের জনকরূপেই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকার করা হয়। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জন্য নহে বলিয়া তাহার জনক নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকার আবশ্যকতা নাই। জন্যপ্রত্যক্ষ বিশেষণজ্ঞান-জন্য হয়। নিত্যপ্রত্যক্ষ জন্যই নহে। এজন্য বিশেষণজ্ঞান-জন্যও নহে। নৈয়ায়িকগণের মতানুসারে সমস্ত সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞান, বিশেষণ জ্ঞানজন্য—এরূপ বলা যায় না। কারণ তাঁহাদের মতে বিশিষ্ট প্রত্যক্ষজ্ঞান ঈশ্বরেরও আছে। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সবিকল্পক প্রত্যক্ষজ্ঞান। তাহা বিশেষণ জ্ঞানজন্য নহে। ঈশ্বরের এই নিত্য জ্ঞানের ব্যাবৃত্তির জন্য, জন্যবিশিষ্ট প্রত্যক্ষজ্ঞান বিশেষণজ্ঞান জন্য—এইরূপ তাঁহারা বলেন।

২ তর্কতাণ্ডব, প্রথম খণ্ড, ৪৮৫ পৃঃ

পরে সর্ব প্রথম তাহার যে 'গৌঃ' এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ হয় এই বিশিষ্ট প্রত্যক্ষটিকে পক্ষরূপে নির্দেশ করিয়া পূর্বপ্রদর্শিত সাধ্য ও হেতু যথাবৎ নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ এই জন্মে প্রাথমিক গৌঃ ইত্যাকারক প্রত্যক্ষ জ্ঞান, জন্যবিশেষণ জ্ঞানজন্য হইবে। যেহেতু প্রাথমিক গৌঃ এইরূপ প্রত্যক্ষে জন্যবিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপ হেতু আছে। ইহার দৃষ্টান্ত অনুমিতি। অনুমিতিরূপ জ্ঞান জন্যবিশিষ্ট জ্ঞান বলিয়া, তাহাতে জন্য-বিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপ হেতু আছে। এবং অনুমিতি সাধ্যজ্ঞান জন্য হইয়া থাকে বলিয়া জন্যবিশেষণ জ্ঞান জন্যও বটে। 'পক্ষঃ সাধ্যবান্' এইরূপ অনুমিতি হইয়া থাকে। অনুমিতিতে সাধারণতঃ পক্ষ বিশেষ্যরূপে ও সাধ্য বিশেষণরূপে ভাসমান হয়। সাধ্যজ্ঞান না থাকিলে অনুমিতি হইতে পারে না। সুতরাং অনুমিতি সাধ্যরূপ বিশেষণজ্ঞানজন্য হইয়া থাকে।[১]

এই জন্মে প্রাথমিক গৌঃ এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানও জন্যবিশেষণ জ্ঞানজন্য হইবে। যেহেতু তাহা জন্যবিশিষ্টজ্ঞান। জন্যবিশিষ্টজ্ঞান মাত্রই জন্যবিশেষণ জ্ঞানজন্য। সুতরাং এই জন্মে প্রাথমিক 'গৌঃ' এইরূপ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ জন্যবিশেষণ জ্ঞানজন্য হইলে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের সিদ্ধি হইবে। 'গৌঃ' এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষে 'গোত্ব' বিশেষণ এবং 'গো' ব্যক্তি বিশেষ্য। চিন্তামণিকারের মতে বিশেষণের সহিত বিশেষ্যের সমবায় সম্বন্ধই বৈশিষ্ট্য। 'গৌঃ' এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষে সমবায় সম্বন্ধে গোত্ববিশিষ্ট গোব্যক্তি ভাসমান হইয়া থাকে। এজন্যই ইহাকে বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ বলা হয়। এই বিশিষ্ট প্রত্যক্ষে বিশেষণ শুদ্ধ 'গোত্ব'। এই শুদ্ধ গোত্ববিষয়ক জ্ঞানই বিশেষণজ্ঞান। এই বিশেষণজ্ঞান নির্বিকল্পকরূপ। 'গোত্ব' ধর্মে অপর কোনও ধর্ম বিশেষণরূপে ভাসমান হয় না বলিয়া শুদ্ধ 'গোত্ব'জ্ঞান সবিকল্পক হইতে পারে না। আর এইরূপে প্রদর্শিত অনুমান দ্বারা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের সিদ্ধি হয়, ইহাই চিন্তামণিকারের আশয়। এই অনুমানে প্রদর্শিত সাধ্যে যে 'জন্য' বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ বিশেষণ-জ্ঞানজন্য না বলিয়া জন্যবিশেষণজ্ঞানজন্য বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় পূর্ব অনুমানে দেখানই হইয়াছে।

এই প্রদর্শিত অনুমানে এরূপ আশঙ্কা করা চলে না যে এ জন্মে প্রাথমিক গৌঃ এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষজন্য বিশেষণজ্ঞানজন্য হইলেও অর্থাৎ গোত্ববিষয়কজন্য জ্ঞানজন্য হইলেও, গোত্ববিষয়ক স্মৃতিজ্ঞানই জন্যবিশেষণ জ্ঞান হইবে; এবং গোত্ববিষয়ক স্মৃতিজন্য বলিয়া প্রদর্শিত বিশিষ্টপ্রত্যক্ষ উপপন্ন হইতে পারিবে—এরূপ আপত্তি করা যায় না। কারণ এ জন্মে যাহার গোত্ববিষয়ক অনুভব হয় নাই, তাহার গোত্ববিষয়ক

---

১ তথাপি 'এতজ্জন্মনি প্রাথমিকং গৌরিতি প্রত্যক্ষং জন্যবিশেষণ জ্ঞানজন্যং জন্যবিশিষ্ট জ্ঞানত্বাদনুমিতিবৎ' ইতি প্রত্যক্ষানুমানং মানম্। তর্কতাণ্ডব, পৃঃ ৪৮৫।

স্মৃতিও হইতে পারে না। এ জন্মে সর্বপ্রথম 'গৌঃ' এইরূপ প্রত্যক্ষ হইবার পূর্বে গোত্ববিষয়ক স্মৃতি হইতে পারে না। 'গোত্ব' বিষয়ক প্রত্যক্ষ বলিলে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই হইবে।[১]

আর এরূপ আপত্তিও করা যায় না যে বালকের আদ্যস্তনপানে প্রবৃত্তির কারণ যে ইষ্টসাধনতার জ্ঞান তাহা যেমন অদৃষ্টবশতঃ জন্মান্তরীয় সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া ইষ্ট-সাধনতার স্মৃতি হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষও সেইরূপ অদৃষ্টবশতঃ জন্মান্তরীয় গোত্ব সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া গোত্ববিষয়ক স্মৃতি জন্মাইবে। কারণ বালকের স্তন্যপানে জন্মান্তরীয় সংস্কারের উদ্বোধ হয়, এরূপ যে স্বীকার করা হইয়া থাকে, তাহা নিরুপায় হইয়াই স্বীকার করা হইয়া থাকে। কেবল অদৃষ্টবশতঃ জন্মান্তরীয় সংস্কারের উদ্বোধ স্বীকার, অন্য উপায় থাকিলে করা উচিত নহে। সর্বত্রই জন্মান্তরীয় সংস্কারবশতঃ জ্ঞান হইতে পারিলে গো ঘটাদির জ্ঞানও জন্মান্তরীয় সংস্কার বশতঃই হইতে পারিবে। আর জাতমাত্র বালকের সবিকল্পক প্রত্যক্ষই বা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি?[২]

আরও কথা এই যে কেবলমাত্র অদৃষ্টবশতঃ জন্মান্তরীয় সংস্কার জন্য যদি গোত্বাদি ধর্মের স্মৃতি সম্ভাবিত হয় তবে গো-ব্যক্তির সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ না হইয়াও কেবল অদৃষ্টবশতঃই গোত্বের স্মৃতি হইতে পারিবে। গো-ব্যক্তির সহিত সন্নিকর্ষ হইয়া পরে জন্মান্তরীয় সংস্কারবশতঃ 'গোত্ব' ধর্মের স্মরণ কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি? সন্নিকর্ষ ব্যতিরেকেই কেবল অদৃষ্টবশতঃ জন্মান্তরীয় সংস্কারজন্য গোত্বের স্মৃতি হইতে পারিবে। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ অনুভবেরই জনক। স্মরণের জনক নহে। জাতমাত্র বালকের গোত্ব ধর্মের সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের পরে জন্মান্তরীয় সংস্কারবশতঃ গোত্বের স্মৃতি হয় এইরূপ বলিলে সন্নিকর্ষকে জন্মান্তরীয় সংস্কারের উদ্বোধকমাত্র বলিতে হইবে। তদপেক্ষা গোত্বের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকে গোত্বের অনুভবেরই কারণ বলা উচিত। কারণ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষে অনুভবের কারণতা সর্বস্বীকৃত।[৩]

আরও কথা এই যে গোত্বের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ জন্মান্তরীয় গোত্ব সংস্কারের উদ্বোধকরূপে যেমন গোত্ব স্মৃতির জনক, সেইরূপ গোত্ব সন্নিকর্ষ সাক্ষাদ্ভাবে অনুভবেরও জনক। সুতরাং স্মৃতি সামগ্রী হইতে অনুভবের সামগ্রী প্রবল বলিয়া গোত্বের স্মৃতি না হইয়া, গোত্বের অনুভবই হওয়া উচিত। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষকে জন্মান্তরীয় সংস্কারের উদ্বোধক বলিয়া স্বীকার করিলে নিত্যবস্তুমাত্রে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষমাত্রে বালকের স্মৃতিই হওয়া উচিত। কারণ নিত্যবস্তুসমূহ জন্মান্তরে অনুভূত ছিল। জন্মান্তরে নিত্যবস্তু

---

১ ন চ তত্র বিশেষণজ্ঞানং স্মৃতিরূপম্। এতজ্জন্মনি তেন গোত্বস্যাননুভবাৎ। তর্কতাণ্ডব, পৃঃ ৪৮৫।

২ ন চাদ্যস্তনপানাদাবিবাত্রাপ্যদৃষ্টমেব জন্মান্তরীয় সংস্কারোদ্বোধকম্। তস্যানন্যগতিকত্বাভাবাৎ। অতিপ্রসঙ্গাৎ।

৩ তদ্বদেবায়সন্নিকর্ষেপি প্রথমং গোত্বস্মৃত্যাপাতাচ্চ।

ছিল না বা তাহার অনুভব ছিল না, এ কথা বলা যায় না। এই জন্মে গোবিষয়ক বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের জন্য এই বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের কারণ গোত্ববিষয়ক বিশেষণজ্ঞান স্মৃতিরূপ না হইয়া অনুভবই হইবে। কারণ স্মৃতি বলিলে জন্মান্তরীয় অনুভব জন্য বলিতে হইবে। আর তাহাতে যে বহু দোষের সম্ভাবনা ঘটিবে তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে। এ জন্য গোত্ববিষয়ক অনুভব নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষরূপই হইবে।[১]

যদি এই গোত্ববিষয়ক অনুভব নির্বিকল্পক না হইয়া সবিকল্পকরূপ হয় অর্থাৎ বিশিষ্টবিষয়ক হয়, অন্য কোনও ধর্মবিশিষ্টরূপেই গোত্বরূপ বিশেষণের অনুভব হয় তবে এই বিশেষণানুভব বিশিষ্টবিষয়ক অনুভব বলিয়া বিশেষণজ্ঞানজন্য হইবে। সেই বিশেষণানুভবও বিশিষ্টবিষয়ক হইলে তাহাও বিশেষণজ্ঞানজন্য হইবে—এইরূপে অনবস্থাই হইয়া পড়িবে।[২] এ জন্য বালকের এই জন্মের প্রাথমিক গোবিষয়কবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ গোত্ববিষয়ক বিশেষণজ্ঞানজন্য বলিয়া, এই গোত্ববিষয়ক বিশেষণজ্ঞান বিশিষ্টজ্ঞান হইতে পারিবে না, এবং গোত্ববিষয়ক স্মৃতিও হইতে পারিবে না। সুতরাং গোত্ববিষয়ক-জ্ঞান যাহা বিশেষণজ্ঞানরূপে বিশিষ্টজ্ঞানের জনক তাহাকে বাধ্য হইয়াই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষরূপ বলিতে হইবে। সুতরাং জাতমাত্র বালকের এই জন্মে সর্বপ্রথম গো-ব্যক্তির সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হইবার পর গোত্ববিষয়ক নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই বিশেষণজ্ঞান। এই বিশেষণজ্ঞানজন্য সমবায় সম্বন্ধে গোত্ববিশিষ্ট 'গো'ব্যক্তির সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আর এইরূপে প্রদর্শিত অনুমানের দ্বারা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের সিদ্ধি হয়, ইহাই চিন্তামণিকারের অভিপ্রায়।

এই অনুমান প্রদর্শন করিয়া চিন্তামণিকার প্রদর্শিত অনুমানে অনুকূল তর্ক প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে অনুমিতিরূপ বিশিষ্টজ্ঞানে সাধ্যজ্ঞান কারণ। শাব্দবোধাত্মক বিশিষ্টজ্ঞানে পদার্থস্মরণ কারণ এবং উপমিতিরূপ বিশিষ্টজ্ঞানে, বাচকপদ-জ্ঞান কারণ। অনুমিতিতে সাধ্য। শাব্দবোধে পদার্থ। এবং উপমিতিতে বাচকপদ বিশেষণ। অনুমিতি, শাব্দবোধ, এবং উপমিতি এই তিনটিই বিশিষ্টজ্ঞান। বিভিন্ন-জাতীয় বিশিষ্টজ্ঞানে বিভিন্নরূপ বিশেষণজ্ঞান কারণ। এ জন্য জন্যবিশিষ্টজ্ঞানমাত্রে বিশেষণজ্ঞান কারণ হইবে।[৩]

১ গোত্বসন্নিকর্ষস্থাপ্যপেক্ষয়োঃ তু সন্নিকর্ষাদেবাত্মানুভব এবোচিতঃ। তস্যানুভব এব হেতুত্বমস্তুলঘুত্বাৎ। স্মৃতিসামগ্রীতোঽনুভবসামগ্র্যাঃ বলবত্বাৎ। তর্কতাণ্ডব, পৃঃ ৪৮৬।

২ ন চ গোত্বরূপবিশেষণানুভবঃ সবিকল্পকঃ। তথাত্বে তস্যাপি বিশেষণজ্ঞানজন্যত্বাবশ্যম্ভাবেনানবস্থানাৎ। তর্কতাণ্ডব, পৃঃ ৪৮৬।

৩ অনুমিতিশাব্দজ্ঞানাদৌ হি সাধ্যপ্রসিদ্ধিপদার্থোপস্থিত্যাদির্হেতুঃ। সাধ্যাদীনি চ বিশেষণানি। তর্কতাণ্ডব, পৃঃ ৪৮৭।

যজ্জাতীয় বিশেষে যজ্জাতীয় বিশেষের কার্যকারণভাব প্রমাণসিদ্ধ, তজ্জাতীয় সামান্যেও তজ্জাতীয় সামান্যের কারণভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে, যদি কোনও বাধক প্রমাণ না থাকে। বাধক প্রমাণ না থাকিলে যজ্জাতীয় বিশেষে কার্যকারণভাব প্রমাণসিদ্ধ, তজ্জাতীয় সামান্যেও কার্যকারণভাব স্বীকৃত হয়। অনুমিতি, শাব্দবোধ, উপমিতি বিশেষজ্ঞান। অর্থাৎ বিশিষ্টবিষয়কজ্ঞান। এই বিশিষ্টবিষয়ক বিশেষজ্ঞানগুলিতে সাধ্যরূপ বিশেষণের জ্ঞান। পদার্থরূপ বিশেষণের স্মরণ, কারণ হইয়া থাকে। এ জন্য জন্যবিশিষ্টজ্ঞানমাত্রই বিশেষণজ্ঞানজন্য হইল। অনুমিতিতে সাধ্যজ্ঞানরূপে সাধ্যজ্ঞান কারণ হইলেও অনুমিতি একটি জন্যবিশিষ্টজ্ঞান বলিয়া জন্যবিশিষ্টজ্ঞানত্বরূপে অনুমিতিতে জন্যবিশেষণ জ্ঞানত্বরূপে সাধ্যজ্ঞানরূপ বিশেষণজ্ঞান কারণ হইবে। অনুমিতিত্ব কার্যতাবচ্ছেদক, সাধ্যজ্ঞানত্ব কারণতাবচ্ছেদক। শাব্দবোধত্ব কার্যতাবচ্ছেদক, পদার্থস্মৃতিত্ব কারণতাবচ্ছেদক। উপমিতিত্ব কার্যতাবচ্ছেদক বাচকজ্ঞানত্ব কারণতাবচ্ছেদক। এই ত্রিবিধ কার্যতাবচ্ছেদক সাধারণ জন্যবিশিষ্টজ্ঞানত্ব কার্যতাবচ্ছেদক। এবং ত্রিবিধ কারণতাবচ্ছেদক সাধারণজন্যবিশেষণ জ্ঞানত্ব কারণতাবচ্ছেদক। সুতরাং জ্ঞানত্বজাতীয় বিশেষ বিশেষ বিশিষ্ট বিষয়ক জন্যজ্ঞানে বিশেষ বিশেষরূপে জন্যবিশেষণজ্ঞান কারণরূপে প্রমাণসিদ্ধ ছিল। এজন্য জন্যবিশিষ্টজ্ঞান সামান্য, জন্যবিশেষণজ্ঞান সামান্যেরও একটি সাধারণভাবে কার্যকারণভাব সিদ্ধ হইবে।[১]

বিশেষ বিশেষরূপে যে স্থলে কার্যকারণভাব গৃহীত হইয়া থাকে, বাধক না থাকিলে সামান্যরূপেও সে স্থলে কার্যকারণভাব গৃহীত হইয়া থাকে। যেমন কোনও একটি বিশেষ দণ্ড কোনও একটি বিশেষ ঘটের কারণ। অন্য একটি বিশেষ দণ্ড অন্য একটি বিশেষ ঘটের কারণ হয় বলিয়া দণ্ডত্ব সামান্যরূপে দণ্ডের, ঘটত্ব সামান্যরূপে ঘটের প্রতি কারণতা স্বীকৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঘটত্বরূপে ঘটের প্রতি দণ্ডত্বরূপে দণ্ডের কার্যকারণভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে। তদ্‌ঘটত্ব কার্যতাবচ্ছেদক, ও তদ্দণ্ডত্ব কারণতাবচ্ছেদক সিদ্ধ হইলে বিশেষভাবে কার্যকারণভাব সিদ্ধ হইল। এবং কেবল ঘটত্ব কারণতাবচ্ছেদক সিদ্ধ হইলে সামান্যরূপে ঘটের সহিত দণ্ডের কার্যকারণভাব সিদ্ধ হয়।

আর এই প্রদর্শিতরূপে জন্যবিশিষ্টজ্ঞানমাত্রই যদি জন্যবিশেষণ জ্ঞানজন্য হয় তবে জন্য সবিকল্পক প্রত্যক্ষও জন্যবিশিষ্টজ্ঞান বলিয়া জন্যবিশেষণ জ্ঞানজন্য হইবে। এইজন্য সবিকল্পক প্রত্যক্ষের জনক যে জন্যবিশেষণ জ্ঞান তাহাই জন্য নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞান। আর এইরূপেই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সিদ্ধি হইবে। ইহাই চিন্তামণিকারের গূঢ় অভিপ্রায়।

ইহাতে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তদ্-ঘট, তদ্-দণ্ডজন্য হইল

---

১ এবং চ যদ্বিশেষয়োঃ কার্যকারণভাবঃ অসতি বাধকে তৎসামান্যয়োরপি স ইতি ন্যায়েন সাধ্যপ্রসিদ্ধ্যাদের্জন্য, বিশিষ্টজ্ঞান সামান্যে জন্যবিশেষণজ্ঞানত্বেন হেতুত্বসিদ্ধিরিতি।

বলিয়া তদ্-ঘট ব্যক্তির সহিত তদ্-দণ্ড ব্যক্তির কার্যকারণভাব যেমন প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, ব্যভিচাররূপ বাধক না থাকায় ঘট সামান্যের সহিত দণ্ডসামান্যেরও কার্যকারণভাব বিশেষ কার্যকারণভাব সাধক প্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ হইবে। বিশেষ কার্যকারণভাব গ্রাহক প্রমাণ ব্যভিচাররূপ বাধক না থাকিলে সামান্যরূপে কার্যকারণভাবেরও সাধক হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যভিচাররূপ বাধক থাকিলে বিশেষ কার্যকারণভাব সামান্যরূপে কার্যকারণভাবের সাধক হয় না। যেমন, ব্যভিচার নাই বলিয়া প্রদর্শিত দণ্ড ও ঘটের কার্যকারণভাব ঘটত্ব ও দণ্ডত্ব সামান্যরূপে গৃহীত হইলেও দণ্ড ও ঘট উভয়েই পৃথিবী এবং উভয়েই দ্রব্য। এজন্য পৃথিবী সামান্যের প্রতি দ্রব্য সামান্য কারণ হইতে পারে না। কারণ তাহাতে ব্যভিচার হইবে। পৃথিবীত্ব কার্যতাবচ্ছেদকই নহে। কারণ পরমাণুরূপ পৃথিবী নিত্য। নিত্য পৃথিবীতে পৃথিবীত্ব থাকিলেও কার্যত্ব নাই। এজন্য পৃথিবীত্ব কার্যতাবচ্ছেদক হয় না। আর দ্রব্যত্বও কারণতাবচ্ছেদক হইতে পারে না; হইলে যে কোনও দ্রব্য পৃথিবীর কারণ হইয়া পড়িত কিন্তু তাহা হয় না। এজন্য ঘটত্ব দণ্ডত্বরূপে কার্যকারণভাব সিদ্ধ হইলেও পৃথিবীত্ব দ্রব্যত্বরূপে কার্যকারণভাব সিদ্ধ হয় না। এজন্যই চিন্তামণিকার বাধক না থাকিলেই বিশেষকার্যকারণভাব সাধক প্রমাণ সামান্যরূপে কার্যকারণভাবেরও সাধক হইয়া থাকে একথা বলিয়াছেন।

চিন্তামণিকারের মতখণ্ডন

চিন্তামণিকার যেরূপে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষসিদ্ধির জন্য প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত মনে হয় না। কারণ প্রদর্শিত অনুমিতি প্রভৃতিতে সাধ্যজ্ঞানাদিরূপ বিশেষণ জ্ঞানের কারণতা যদি প্রমাণসিদ্ধ হইত তবে 'যদ্বিশেষয়োঃ কার্যকারণভাবঃ অসতি বাধকে তৎসামান্যয়োরপিম্' এই ন্যায় অনুসারে সামান্যরূপেও কার্যকারণভাব সিদ্ধ হইতে পারিত। কিন্তু অনুমিতি প্রভৃতি জন্যবিশিষ্টজ্ঞানে সাধ্য জ্ঞানাদির কারণতাই নাই। সুতরাং বিশেষরূপে কার্যকারণভাব না থাকিলে সামান্যরূপে কার্যকারণভাব সিদ্ধির সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং প্রদর্শিত ন্যায়ের এস্থলে অবকাশ নাই। যদি বলা যায় অনুমিতিতে সাধ্যজ্ঞানের কারণতা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া তাহাও অস্বীকার করা যায় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্মতাজ্ঞানই অনুমিতির কারণ। সাধ্যজ্ঞান অনুমিতির কারণ নহে। ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান থাকিলে সাধ্যজ্ঞান নাই বলিয়া অনুমিতির উৎপত্তিতে বিলম্ব ঘটে না। সাধ্যজ্ঞানও অনুমিতির কারণ হইলে, ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান থাকিলেও, সাধ্যজ্ঞান না থাকিলে অনুমিতি হইতে পারিত না। অথচ সেরূপ দেখা যায় না।[১]

---

১ তত্ত্ব। অনুমিত্যাদৌ সাধ্যপ্রসিদ্ধ্যাদেরেবাহেতুত্বেন যদ্বিশেষয়োরিতি ন্যায়া ন তু কারণাৎ। ন হি ব্যাপ্ত্যাদি-জ্ঞানে সতি তদ্বিশেষানুমিত্যাদিবিলম্বঃ। তর্কতাণ্ডব, পৃঃ ৪৮৭।

যদি বলা যায় যে ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্পাদন করিবার জন্যই ত সাধ্যজ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। সাধ্যের ব্যাপ্তিইত হেতুতে গৃহীত হইবে। সাধ্য না জানিলে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবে কিরূপে? সাধ্যজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ। সাধ্যজ্ঞান না থাকিলে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবে না। আর ব্যাপ্তিজ্ঞান না হইলে অনুমিতিও হইবে না। কিন্তু এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ যাঁহারা অনুমিতির কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞানেরকারণ সাধ্যজ্ঞান বলেন, তাঁহারাইত সাধ্যজ্ঞানকে অনুমিতির অকারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। যেহেতু কারণের কারণ অন্যথাসিদ্ধ। এজন্য সাধ্যজ্ঞান অনুমিতির কারণই নহে। সুতরাং চিন্তামণিকার যে বিশেষ কার্যকারণভাবদ্বারা সামান্য কার্যকারণভাব সিদ্ধ করিবার জন্য নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষসিদ্ধির প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহা আর হইতে পারিল না।[১]

প্রদর্শিতরূপে সাধ্যজ্ঞান অনুমিতির কারণ না হইলেও 'সাধ্যজ্ঞান অনুমিতির কারণ' এইরূপে চিন্তামণিকারের মত মানিয়া লইলেও সাধ্যজ্ঞান অনুমিতির প্রতি বিশেষণজ্ঞানত্ব-রূপে কারণ হইতে পারিবে না। আর সাধ্যজ্ঞানের বিশেষণজ্ঞানত্বরূপে কারণতা সিদ্ধি না হইলে চিন্তামণিকারেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না। 'বহ্নিমান্' ইত্যাদিরূপ অনুমিতির প্রতি বহ্ন্যাদির জ্ঞান বিশেষণজ্ঞানত্বরূপে কারণ হইতে পারে না। 'বহ্নিমান্' এইরূপ জ্ঞানে বহ্নি বিশেষণ ও বহ্নিমান্ পর্বতাদি বিশেষ্য হইয়া থাকে। এই অনুমিতিরূপ বিশিষ্টজ্ঞানে বহ্নিজ্ঞানই বিশেষণজ্ঞান। এই বিশেষণ বহ্নিদ্রব্য পদার্থ। এজন্য 'দ্রব্যম্' এইরূপ জ্ঞানও বহ্নিজ্ঞান বটে। কারণ দ্রব্যত্ব জাতি বহ্নিতে আছে। সুতরাং দ্রব্যত্বরূপে দ্রব্যের জ্ঞানও বহ্নির জ্ঞান বটে। অথচ 'দ্রব্যম্' এইরূপ বিশেষণ জ্ঞানজন্য 'বহ্নিমান্' এইরূপ অনুমিতি হয় না।[২]

এজন্য যদি চিন্তামণিকার এরূপ বলেন যে, যে কোনওরূপে সাধ্যরূপ বিশেষণের জ্ঞানকে আমরা অনুমিতির কারণ বলি না। কিন্তু বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে সাধ্যরূপ বিশেষণের জ্ঞানই অনুমিতির কারণ। 'বহ্নিমান্' এইরূপ অনুমিতিতে, 'বহ্নি' বিশেষণ, ও 'বহ্নিত্ব' বিশেষণতাবচ্ছেদক। সুতরাং বহ্নিত্বরূপে বহ্নির জ্ঞানই প্রকৃতস্থলে সাধ্যরূপ বিশেষণের জ্ঞান। দ্রব্যত্বরূপে বিশেষণের জ্ঞান সাধ্যরূপ বিশেষণের জ্ঞানই নহে। চিন্তামণিকারের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে বিশেষণের জ্ঞান বিশিষ্টজ্ঞানের জনক স্বীকার করিলেও তদ্দ্বারা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সিদ্ধির কোনও আশা নাই। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ নিষ্প্রকারকজ্ঞান। বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারক

১ ন চ ব্যাপ্ত্যাদিধীরেব তেনচিন্না নেতি বাচ্যম্। এবং হি তস্য হেতু হেতুত্বেনান্যথাসিদ্ধত্বাদনুমিত্যাদি হেতুতা। তর্কতাণ্ডব, পৃঃ ৪৮৮।

২ অস্তু বা সাধ্যপ্রমিত্যাদিরনুমিত্যাদি হেতুঃ। তথাপি বহ্নিমানিত্যাদিজ্ঞানং প্রতি বহ্ন্যাদি জ্ঞানস্য ন বিশেষণজ্ঞানত্বেনৈব কারণতা। দ্রব্যত্বাদিনা বহ্নিজ্ঞানেঽপি অভাবাৎ। তর্কতাণ্ডব, পৃঃ ৪৮৮।

বিশেষণজ্ঞান সপ্রকারকজ্ঞান। সপ্রকারক বিশেষণজ্ঞান বিশিষ্টবুদ্ধির জনক হইলেও নিষ্প্রকারকবিশেষণজ্ঞানরূপ নির্বিকল্পকজ্ঞান সিদ্ধি হইবে না। জন্যবিশিষ্ট জ্ঞানমাত্র যদি সপ্রকারক বিশেষণজ্ঞানজন্য সিদ্ধি হয়, তাহাতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সিদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? [১]

চিন্তামণিকারের কথায় আরও বক্তব্য এই যে অনুমিত্যাদিতে সাধ্যাদি বিশেষণের জ্ঞান কারণ হইলেও তাহা বিশেষণজ্ঞানত্বরূপে কারণ নহে। বিশেষণজ্ঞানত্বরূপে কারণ বলিলে যে দোষ হয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 'দ্রব্যম্' এইরূপ জ্ঞান হইতেও 'বহ্নিমান্' এইরূপ অনুমিতির আপত্তি হইতে পারে। এজন্যই চিন্তামণিকার বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে বিশেষণের জ্ঞানকে কারণ বলিয়াছেন। 'দ্রব্য' এইরূপ জ্ঞান অনুমিতির বিশেষণ বহ্নিবিষয়ক হইলেও অর্থাৎ বহ্নিদ্রব্যই বটে, এজন্য 'দ্রব্য' এরূপজ্ঞানের বিষয় বহ্নি হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে বহ্নি দ্রব্যজ্ঞানের বিষয় হয় না। কিন্তু দ্রব্যত্বরূপেই বহ্নি দ্রব্যজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। বহ্নিত্বরূপে বহ্নি দ্রব্যজ্ঞানের বিষয় হয় নাই।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে বিশেষণের জ্ঞানকে অনুমিত্যাদি জ্ঞানের কারণ না বলিয়া বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে যে কোনও বস্তুর জ্ঞানই অনুমিত্যাদির কারণ হইতে পারে। বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে বিশেষণের জ্ঞানের কারণতা বলা অপেক্ষা বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে যে কোনও বস্তুর জ্ঞানকে কারণ বলিলে লাঘব হয়। অনুমিত্যাদির কারণীভূত জ্ঞানে বিশেষণকেও বিষয় হইতে হইলে গৌরব হয়। বহ্নিত্বরূপে যে কোনও বহ্নির জ্ঞান থাকিয়াও 'বহ্নিমান' এইরূপ অনুমিতি হইতে বাধা নাই। কিন্তু এরূপ বলিবার আবশ্যকতা মনে হয় না যে 'বহ্নিমান্' এই অনুমিতিতে বিশেষণীভূত বহ্নিব্যক্তিটিরই বহ্নিত্বরূপে জ্ঞান 'বহ্নিমান্' এই অনুমিতির কারণ। আর এরূপ বলিলে অর্থাৎ বিশেষণীভূত বহ্নির ব্যক্তিটিকেই জানিতে হইলে সামান্যলক্ষণ প্রত্যাসত্তিই মানিতে হইবে। যাঁহারা এই প্রত্যাসত্তি মানেন না তাঁহারা বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে বিশেষণ ব্যক্তিটির জ্ঞান অনুমিতিতে কারণ বলিতেই পারেন না। সামান্যলক্ষণ প্রত্যাসত্তি স্বীকার করিলেও অকারণ গৌরব স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। আর বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে বিশেষণের জ্ঞান অনুমিত্যাদির প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও নির্বিকল্পক জ্ঞানসিদ্ধির কোনও আশা নাই। [২]

১ ...নাপি বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক বিশেষণ জ্ঞানত্বেন। তেন নির্বিকল্পকাসিদ্ধেঃ।

২ গৌরবাচ্চ ...... তথাচ ন নির্বিকল্পকসিদ্ধিঃ। তর্কতাণ্ডব, পৃঃ ৪।৮।

দেশ আমাসাপেক্ষ কি না ?

অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য, এম. এ.

'দর্শন' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় "দেশবিচার" নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশবিষয়ে কান্টের যে মত আছে তাহা একদিকে আধুনিক চিন্তাভঙ্গী ও অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাভঙ্গীতে প্রকাশ করা। আপাতদৃষ্টিতে উহা লেখকের নিজের মত মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহার কোন কথাটিই নূতন নহে। শ্রীযুক্ত শুকদেব সেন এই পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ও গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিসহকারে ঐ প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য ('দেশ আমা-সাপেক্ষ') খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান ত্রুটি হইয়াছে ঐ প্রবন্ধের যুক্তিগুলিকে কান্টেরই যুক্তি মনে না করা। নচেৎ তিনি কয়েকটি ক্ষেত্রে কয়েকটি যুক্তিকে লঘুভাবে দেখিতেন না।

দেশ আমা-সাপেক্ষ—এখানে 'আমি' শব্দের অর্থ 'জ্ঞাতা', শ্রীযুক্ত সেন ইহা ঠিকই ধরিয়াছেন। কিন্তু 'বাহিরে' ও 'জগৎ'—এই দুইটি শব্দের অর্থ নানাভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিলেও একটি কথা তাঁহার মনে আসে নাই যে শেষ পর্য্যন্ত কাণ্ট্ যে সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন তাহাতেই ঐ দুইটি শব্দের অর্থ স্ফুট হইয়াছে। আপত্তি হইতে পারে—তাহা হইলে ত দেশের আমাসাপেক্ষত্ব স্থাপনের প্রথম যুক্তিটি নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু উত্তর এই যে—না নিরর্থক নহে; জগৎ আমার বাহিরে এই যে মৌলিক বোধটি আমাদের আছে তাহার বিশ্লেষণেই পাওয়া গেল যে দেশ আমা-সাপেক্ষ। জগতের বহিঃসত্ত্বার বোধে বহিঃশব্দটি যে দৈশিক অর্থে গৃহীত হয় না শ্রীযুক্ত সেনের এই কথা অভ্রান্ত, 'বাহিরে' শব্দের অর্থ 'আমা হইতে ভিন্ন' এ কথাও হয় ত অনেকাংশে যথার্থ। কিন্তু ইহাতে অভিনব আর একটি বোধও রহিয়াছে যে আমি-রূপ জ্ঞাতা জগৎ হইতে ভিন্ন কিংবা অভিন্ন কিছুই বলিতে পারিতেছি না, অথবা হয় ত ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। এই অভিনবত্ব বোধটি সরলভাবে বুঝাইবার জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে জগৎ আমার বাহিরে এই কথা বলিতে পারিলেও আমি জগতের বাহিরে একথা বলিতে পারি না। কথাটা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে জগতের সহিত আমার দেহের সম্পর্ক বুঝা উচিত। তাহা আমি 'দর্শনের' দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় "লৌকিক ও প্রাতিভজ্ঞান" নামক প্রবন্ধের 'ঘ' অংশে তাত্ত্বিক বহির্বোধের বিশ্লেষণে বিচার করিয়াছি। প্রথম প্রবন্ধে অবশ্য আমি লিখিয়াছিলাম যে 'আমি' শব্দের দ্বারা দেহ অভিপ্রেত নহে, কিন্তু সেখানে দেহ অর্থে 'লৌকিক দেহ' বুঝিয়াছিলাম, তখন প্রাতিভদেহের কথা আমার বুদ্ধিতে আসে নাই। অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের লিখিত Subject as Freedom পুস্তকের 'Body as Felt and Perceived' অধ্যায়টি পাঠ করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে কান্টের কথা এই দুই প্রকার দেহের প্রভেদ দেখাইয়া ভাল করিয়া বুঝান যাইতে পারে। আরও বুঝা যায় যে কান্টের কথার পরও অনেক কথা আছে।

'জগৎ' শব্দটির অর্থে 'সমগ্র' ধরিলে ক্ষতি নাই, হয়ত 'জ্ঞেয়' ধরিলেও ক্ষতি নাই। 'সমগ্র'রূপ জগতে আমি রূপ জ্ঞাতার স্থান কোথায় তাহা 'দেশবিচারে' আমি দেখাই নাই। কিন্তু 'লৌকিক ও প্রাতিভজ্ঞান' নামক প্রবন্ধে তাহা বিশদভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। শুকদেব বাবুকে তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 'জগৎ' অর্থে 'জ্ঞেয়' বুঝিলেও ক্ষতি নাই এইজন্য যে জ্ঞেয় জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন বোধ হইলেও জ্ঞাতা জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ আমাদের হয় না। অথবা হয় ত বলিতে হইবে যে জ্ঞাতা জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন বোধ হইলেও জ্ঞেয় জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন হয় না। ঠিক কোন্ কথাটি সত্য তাহা এখনও আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। তবে এইটুকু সত্য বলিয়া মনে হয় যে উভয়মুখী কোনও সম্পর্ক এখানে নাই। কেন-না জ্ঞাতার বোধ একপ্রকার অস্ফুট প্রাতিভজ্ঞান—অর্থাৎ লৌকিক অবস্থায় জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন করিয়া বুঝিলেও স্বরূপতঃ স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার এক প্রাতিভবোধ থাকে। ইহার ব্যাখ্যার জন্য পুনরায় 'লৌকিক ও প্রাতিভজ্ঞান' প্রবন্ধটি পড়িবার অনুরোধ করিতেছি।

শুকদেব বাবু তাঁহার প্রবন্ধের ৪৬ পৃষ্ঠার শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে বলিয়াছেন—"যদি বা কোন যুক্তিতে ধরিয়া নেওয়া যায় যে জ্ঞাতা হইতে জ্ঞেয় ভিন্ন হইলেও জ্ঞেয় হইতে জ্ঞাতা ভিন্ন নয় তাহা হইলেও উহা হইতেই কি করিয়া প্রমাণ হয় যে দেশ নামক জ্ঞেয় পদার্থ আমাসাপেক্ষ তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।" ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে আমিও ভাল করিয়া বুঝি নাই। তবে এইটুকু বুঝিয়াছি বলিয়া মনে হয় যে দেশের আমাসাপেক্ষত্বের বোধ একপ্রকার প্রাতিভজ্ঞান যাহার সূচনা পাই দেশের সহিত আমার অভিনব সম্পর্ক বিচারে। এবং ঐ সূচনাই আরও বিশদ করিবার জন্য আমি দ্বিতীয় প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছিলাম।

দ্বিতীয় প্রমাণের বিচারে শুকদেব বাবু অনেক সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তাহাদের বিচারের প্রয়োজন। কিন্তু শুকদেব বাবুর একটা প্রাথমিক ভুল প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল। ভুলটির জন্য দায়ী শুকদেব বাবু নহেন, দায়ী আমিই নিজে। আমি কেবল 'ঐ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলাম এবং তাহাতে পাঠকের মনে ভুল হওয়া স্বাভাবিক যে 'ঐ' শব্দটি 'এই' হইতে ভিন্ন। আমার কিন্তু 'ঐ' ও 'এই'এর মধ্যে প্রভেদ করিবার অভিপ্রায় ছিল না। 'ঐ' ও 'এই' আমি একই অর্থে ধরিয়াছিলাম।

শুকদেব বাবু বলিয়াছেন—"আমরা এইরূপ ব্যাপ্তি নিতে পারি যে কোন একটি প্রথম বস্তুকে অবধি করিয়া কোন একটি দ্বিতীয় বস্তুর স্থান নির্দেশ করিতে হইলে

প্রথম বস্তুটীকে স্থানে থাকিতেই হইবে। দৃশ্যমান জগতে ইহার উদাহরণের অভাব নাই, কিন্তু ইহার ব্যভিচার আছে বলিয়া আমরা জানি না। জ্ঞাতা বা আত্মা এখানে সন্দিগ্ধস্থল, সুতরাং ইহার উল্লেখ অগ্রাহ্য।" ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে শুকদেব বাবু যে স্থান নির্দ্দেশের কথা বলিতেছেন তাহা আপেক্ষিক স্থান নির্দ্দেশ। কিন্তু একান্ত স্থান নির্দ্দেশ হয় আত্মার বা 'প্রাতিভদেহের' অপেক্ষায়। ইহারও উদাহরণের অভাব নাই—প্রতি লোকই এই কায করে, এবং ইহার ব্যভিচার আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আপেক্ষিক ও একান্ত স্থান নির্দ্দেশের প্রভেদ আমি মূলপ্রবন্ধে দেখাইয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়।

দেহসম্পর্কহীন বিশুদ্ধ জ্ঞাতার সহিত সম্পর্ক না হইলে 'ঐ'ত্ব বা 'এই'ত্ব বুঝা যায় না, শুকদেব বাবু ইহা মানিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার কথাই ঠিক। আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে আমার কথা ভুল হইয়াছিল। সেইজন্য বর্ত্তমানে 'আমি' অর্থে প্রাতিভদেহ ধরিতেছি। 'আমি' শব্দটি আমরা নানা অর্থে ব্যবহার করি। উহা দ্বারা কখন প্রাতিভদেহ, কখন তন্মাত্র (pure sensation), কখন মন, কখন অহংকার, কখন বুদ্ধি ও কখন বিশুদ্ধ জ্ঞাতা বুঝি। সবগুলিক্ষেত্রেই 'আমি' শব্দ ব্যবহার করি এইজন্য যে সবগুলির বোধই আন্তরজ্ঞান। ('লৌকিক ও প্রাতিভজ্ঞান' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

শুকদেব বাবু বলিয়াছেন—"এখানে 'ঐ' শব্দের অর্থ শুধু 'ভেদ' বা বহিঃসত্তা নয়। তারপর একথাও বলা চলে না যে যাহা কিছু জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন পদার্থ বা জ্ঞেয় হইবে তাহা দৈশিকও হইবে, কারণ সুখদুঃখই বহু পদার্থকে সাধারণতঃ জ্ঞেয় বলিয়া স্বীকার করা হয়, কিন্তু সেগুলিকে সব সময় দৈশিক বলা চলে না।" 'ঐ' বা 'এই' শব্দের দ্বারা সর্বদাই দৈশিকত্ব বুঝি—একথা হয় ত আমি ভুল বলিয়াছি, কেন না আমি আমার প্রাতিভদেহ, বুদ্ধি, মন, আত্মা প্রভৃতিকেও 'এই' বলি। সুতরাং 'এই' বা 'ঐ' শব্দ দৈশিকত্ব অপেক্ষা ব্যাপক। কিন্তু তাহাতেও আমার দ্বিতীয় প্রমাণটির বিশেষ কিছু আসে যায় না। কারণ বহিঃপ্রত্যক্ষে বিষয়কে এই ব্যাপক অর্থে 'এই' বা 'ঐ' বলা সত্ত্বেও সঙ্কীর্ণতর, অন্য এক অর্থেও সর্বদাই 'এই' বা 'ঐ' বলি। সেই সঙ্কীর্ণতর অর্থটি হইল 'একান্তরূপে স্থান নির্দ্দেশ।' ঐ প্রকার একান্তরূপে স্থান নির্দ্দেশ না হইলে বহিঃপ্রত্যক্ষই হয় না।

তৃতীয় প্রমাণ বিচারে শুকদেব বাবু যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহাতে মনে হয় আমি আমার বক্তব্য ভাল করিয়া বুঝাইতে পারি নাই। কোনও তত্ত্বজিজ্ঞাসুর বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় অপবাদ এই যে সে একটি সন্দিগ্ধ মতবাদ বিনা প্রমাণে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। শুকদেব বাবু আমার বিরুদ্ধে তাহাই বলিয়াছেন। তাঁহার মতে—"তৃতীয় প্রমাণটীর মূলে রহিয়াছে জ্ঞান সম্বন্ধে একটি বিশেষ মতবাদ" এবং

"অন্ততঃ একথা ঠিক যে কালিদাস বাবুর মতটী সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ হইতে পারে ; সুতরাং এই মতটী যাঁহারা মানিতে রাজী নহেন তাঁহারা এই মতটীর উপর নির্ভরশীল বলিয়া কালিদাস বাবুর তৃতীয় প্রমাণটীও গ্রহণযোগ্য মনে করিবেন না।"

প্রকৃত পক্ষে আমি বিজ্ঞানবাদ বা বিষয়স্বাতন্ত্র্যবাদ কোনটিই নির্বিচারে মানি নাই। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিষয়জ্ঞানের বিশ্লেষণের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি (সিদ্ধান্তটি কাণ্টেরই) যে জ্ঞানের বিষয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাননিরপেক্ষ নহে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত ধর্মই জ্ঞানের আকার ; অথচ একটা কিছু স্বতন্ত্র পদার্থ দেওয়া আছে যাহার অবশ্য আর নির্বচন হয় না, কেন না নির্বাচ্য সমস্ত ধর্মই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অতএব জ্ঞানাকার-মাত্র। সংক্ষেপে ও যথাসম্ভব সরলভাবে আমার বক্তব্যটির পুনরুক্তি করিতেছি। বিশদ আলোচনার জন্য মূলপ্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

যাহাকে আমরা সচরাচর একটি রক্তবর্ণ পদার্থ বলি তাহার প্রত্যক্ষ হইলে জ্ঞানের একটি আকার হয়, কেন না প্রত্যক্ষ না করিলে ঐ জ্ঞানটি হয় না,* এবং ঐ জ্ঞানের সহিত অন্য এক জ্ঞানের পরিনিষ্ঠিত যে পার্থক্য তাহাই ঐ জ্ঞানের আকার। এখন, জ্ঞানের কি আকার হইয়াছে তাহা জানা যায় একমাত্র অনুব্যবসায় দ্বারা। অনুমানাদির দ্বারাও যে পরোক্ষভাবে জানা যায় না তাহা নহে, কিন্তু অনুব্যবসায়দ্বারা যাহা পাইতেছি তাহা দ্বারাই যদি সর্বাঙ্গীন উপপত্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে অনুব্যবসায়-দ্বারা অলব্ধ কিছু আকার মানিবার প্রয়োজন নাই। এখন, অনুব্যবসায়দ্বারা বহিঃস্থ রক্তবর্ণব্যতীত আন্তর কোনও রক্তবর্ণ আমরা পাই না। অথচ জ্ঞানের একটি আকার হইয়াছে ইহাও স্থির। অতএব বলিতে হইবে যে বহিঃস্থ রক্তবর্ণটিই জ্ঞানের আকার। এখন, জ্ঞানাকারকেই বহিঃস্থরূপে পাই বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে যে বহিস্থ জ্ঞানেরই ব্যাপার, অর্থাৎ দেশ আমাসাপেক্ষ।

ধরিয়া লওয়া যাউক যে শুকদেব বাবু তৃতীয় প্রমাণ বিচারে যে সকল কথা বলিয়াছেন সেগুলি আমার এই যুক্তিরই প্রতিবাদ। তাঁহার শেষ আপত্তিটিই আমি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। তিনি বলিয়াছেন অনেকের মতে বিষয়ের আকার ভিন্ন জ্ঞানের কোন আকার নাই। অর্থাৎ অনুব্যবসায়ে আমরা বিষয়েরই আকার পাই। এখন আমাদের প্রশ্ন হইতেছে এই—অনুব্যবসায়ে '(বিষয়) ঘট জানিতেছি' বলিয়া যে বোধ হয় তাহাতে কি বিষয়ের বোধ ও জ্ঞানের বোধ পৃথক্ থাকে ? অর্থাৎ জ্ঞানাংশের যে জ্ঞান হয় তাহা কি বিশুদ্ধজ্ঞানের জ্ঞান এবং বিষয়াংশের যে জ্ঞান হয় তাহা কি একান্ত বাহ্য ও একান্ত জ্ঞান-নিরপেক্ষ বিষয়ের জ্ঞান ? অর্থাৎ অনুব্যবসায়ের রূপ কি ইহাই—বিষয় রহিয়াছে ও জ্ঞান রহিয়াছে ? আমাদের ত তাহা মনে হয় না। আমাদের মনে হয় পরস্পরসম্বদ্ধ বিষয় ও জ্ঞানের বোধ রহিয়াছে। অর্থাৎ এখানে দুইটি বোধ নাই, দুই অসম্বদ্ধ পদার্থের এক বোধও নাই, আছে দুই সম্বদ্ধ পদার্থের এক বোধ।

এই সম্বন্ধও একান্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। ব্যবসায়রূপ বহির্জ্ঞানে জ্ঞানের দিক্ আমরা পাই না, পাই কেবল বিষয়; অতএব সে অবস্থায় জ্ঞান ও বিষয়ের সম্বন্ধ পাই না। অনুব্যবসায়েই প্রথম দুই দিকের বোধ হয়, অথচ এমন বোধ হয় না যে বিষয়নিরপেক্ষ জ্ঞান ও জ্ঞাননিরপেক্ষ বিষয় পাইয়াছি, কেন না দুইটিকে এইরূপ ভিন্ন করিয়া ধরিলে উহাদের সম্পর্কটি কি বুঝিতেই পারি না। অথবা যদি বা ভিন্ন করিয়া ধরি তাহা হইলে উহাদের সম্পর্কটি কি উভয়াতিরিক্ত অন্য এক পদার্থ বা উহা জ্ঞানেরই ব্যাপার বা উহা বিষয়েরই ব্যাপার? উভয়াতিরিক্ত পদার্থ বলিতে ইচ্ছা হয় না। অতএব বলিতে হইবে যে উহা হয় জ্ঞানেরই ব্যাপার না হয় বিষয়েরই ব্যাপার। জ্ঞানের ব্যাপার মানিলে বলিতে হইবে যে জ্ঞান বিষয়াকারে প্রকাশ পায়, এবং বিষয়ের ব্যাপার মানিলে বলিতে হইবে যে বিষয় জ্ঞানের আকারে প্রকাশ পায়। যে দিক্ দিয়াই হউক জ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যে একপ্রকার ঐক্যাধ্যাস মানিতে হইবে। আমি মূলপ্রবন্ধে জ্ঞানের দিক্ হইতে ব্যাপারটি বুঝিয়াছিলাম। বিষয়ের দিক্ হইতে ধরিয়াও আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন তত্ত্বজ্ঞান হয় ত পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কোন দিক্ হইতেই শুকদেব বাবুর সুবিধা হইবে না, কেন না দুই দিকেই জ্ঞান ও বিষয়ের ভিন্নত্ব মানিয়াও অভিন্নত্ব মানিতে হইবে। আর তিনি যে বিষযাকারই একমাত্র আকার—এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে আমার সুবিধাই হইল, কেন না ঐ মত ও আমাদের মতের তাৎপর্য্য অনেকাংশে একই। তদ্রূপবি ঐ মত খণ্ডন করিতে না পারিলেও উহার দ্বারা আমাদের মতও খণ্ডিত হয় না, দুইটি মতই অন্ততঃ সমবলবান্।

শুকদেব বাবুর দ্বিতীয় আপত্তি এই যে "কোন বিশেষ্যকে যখন বিশেষণবিশিষ্ট বলিয়া জানি, বিশেষণটি তখন ঐ বিশেষ্যেরই ধর্ম।" কিন্তু একথা আমরাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত। 'পুষ্পটি রক্তবর্ণ' বলিলে রক্তবর্ণকে পুষ্পেরই ধর্ম বলিয়া বুঝি, কিন্তু 'পুষ্প' জ্ঞাননিরপেক্ষ ইহা কি করিয়া শুকদেব বাবু বুঝিলেন? একটা কিছু জ্ঞাননিরপেক্ষ পদার্থ আছে একথা আমরা মূলপ্রবন্ধে বারবার স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু তাহা পুষ্প নহে। কারণ পুষ্প অর্থে আমরা বুঝি কতকগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ বা ধর্মের আশ্রয়রূপ এক 'দ্রব্য'। এতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়জ্ঞানের যে বিচার আমরা করিয়াছি তাহাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধর্মগুলিকে আমরা জ্ঞানের আকার বলিয়াছি; বর্তমানে পুষ্পরূপ আশ্রয় দ্রব্যের যে বোধ হয় তাহার যদি উপপত্তি করিতে পারি তাহা হইলে ঐ জ্ঞানবিচারে দোষ থাকে না। এখন, যদি আমরা বলি যে কতকগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্তনশীল পদার্থের সহিত সহভাবী এক অপরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ পাইলেই ঐ অপরিবর্তনশীল পদার্থটিকে আমরা সকলেই ঐ পরিবর্তনশীল পদার্থগুলির আশ্রয়রূপ দ্রব্য বলিয়া ধরিয়া লই এবং ধরিয়া লইতে বাধ্য হই—তাহা হইলে ক্ষতি কি? অভিপ্রায় এই যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অপরিবর্তনশীল বিষয়টিও জ্ঞানেরই আকার, কিন্তু উহা

অপরিবর্তনশীল বলিয়া এবং পরিবর্তনশীল ধর্মগুলির সহভাবী বলিয়া উহা ঐগুলির দ্রব্যরূপ আশ্রয়—এইপ্রকার পরোক্ষ নিশ্চয় হয়, যে নিশ্চয় নিজে জ্ঞান নহে, কেবল নিশ্চয়, অর্থাৎ চিন্তায় এক অপরিহার্য ভঙ্গীবিশেষ (মূলপ্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

একটি উদাহরণ দিয়া বুঝা যাউক। একটি আমকে কচি অবস্থা হইতে পরিপক্ব অবস্থা পর্যন্ত লক্ষ্য করিলাম, বলি যে আমটি কচি অবস্থা হইতে পরিপক্ব অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। এখানে আমটিকে আশ্রয়দ্রব্য বলিয়া কেবল-নিশ্চয় হয় এইজন্য যে পরিবর্তনশীল বর্ণরসাদি পদার্থের সহভাবীরূপে matter-রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় পাইয়াছি। Matter ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এইজন্য যে শুদ্ধ বর্ণরসাদির ইন্দ্রিয়প্রতীতি হয় না, সহভাবী matter এর সহিতই উহাদের ইন্দ্রিয়প্রতীতি হয়। [দেশের ইন্দ্রিয়প্রতীতি হয় না, কারণ উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধর্মের সহভাবী হইলেও বহিস্তারূপে ইহাই ঐন্দ্রিয়-গ্রহণের দ্বারা অপেক্ষিত (কাণ্ট দ্রষ্টব্য), এবং অনেক স্থলে উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধর্মের সহভাবীও নহে, যথা অন্ধকার প্রতীতিতেও একটি পাত্রের মধ্যস্থ দেশপ্রতীতিতে।] আশ্রয়রূপ দ্রব্যপ্রতীতিসম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা কাণ্টেরই মত। অধিক ব্যাখ্যার জন্য কাণ্টের First Analogy of Experience দ্রষ্টব্য।

শুকদেব বাবু বলিয়াছেন—"আবার একটা বস্তুকে পুষ্পভাবে না বুঝিয়া শুধু 'আছে' বা 'সত্তাবান্'ভাবেও জানিতে পারি। এ ক্ষেত্রেও তাহা হইলে অনুরূপ যুক্তিতে স্বীকার করিতে হইবে যে 'সত্তা' বা 'অস্তিত্ব'ও বস্তুর ধর্ম নয়, উহাও প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠ।" ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে সত্তা বাস্তবিকই বস্তুর ধর্ম নহে, উহা বস্তুসম্বন্ধীয় একপ্রকার প্রাতিভজ্ঞানের ব্যাপারমাত্র। কথাটা ভাল করিয়া বুঝা যাউক। যখন কোন বিষয়ের জ্ঞান হয় তখন সচরাচর 'বিষয়টি আছে' একথা আমরা বলি না—লাল ঘট প্রত্যক্ষ করিলে 'ঘটটি লাল' এই কথাই আমরা বলি। ধূম নিরীক্ষণ করিয়া যে অনুমান হয় তাহার সাধ্যও সচরাচর 'বহ্নি'ই, বহ্নির অস্তিত্ব নহে যখন জোর করিয়া 'লাল ঘট আছে' বা 'বহ্নি রহিয়াছে' বলি তখন আমাদের প্রকৃত বক্তব্য এই যে প্রত্যক্ষ বা অনুমিতিরূপ প্রথাটি যথার্থ। বিষয়ের অস্তিত্ব পদের অর্থ সেখানে বিষয়-জ্ঞানের যাথার্থ্য। অন্ততঃ এইটুকু ঠিক্ কথা যে বিষয়জ্ঞানের যাথার্থ্য শব্দের অর্থই হইল বিষয়ের অস্তিত্ব, বিষয়জ্ঞানের যাথার্থ্যে আর কিছুই আমরা বুঝি না। এখন প্রশ্ন এই—বিষয়জ্ঞানের যাথার্থ্যজ্ঞান কি বিষয়জ্ঞান অথবা অনুব্যবসায়ের মতই একপ্রকার জ্ঞান?

যাথার্থ্যজ্ঞান অপেক্ষা অযাথার্থ্যজ্ঞানের বিচার সহজ। সুতরাং অযাথার্থ্যজ্ঞানের বিচারই প্রথমে করা যাউক। রজ্জুসর্পভ্রমনিরসনের পর সর্পজ্ঞানটি অযথার্থ এই জ্ঞান কোনও লৌকিক জ্ঞানের মত নহে। 'সর্পজ্ঞানটি অযথার্থ' এই জ্ঞানটি আর মিথ্যা নহে, অথচ ইহার কি কোনও বিষয় আছে? অন্য এক দিক্ দিয়া ধরিলেও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হইবে—সর্পটি মিথ্যা, এই জ্ঞানেরই বা বিষয় কি? এই জ্ঞান কোনও বিষয়ের আকারে

আকারিত নহে। এখন সর্পের মিথ্যাত্বজ্ঞান ও সর্পজ্ঞানের অযাথার্থ্যজ্ঞান ইহাদের কোন্‌টি গৌণ তদ্বিষয়ে কোনও বিচার আছে কি না আমি জানি না।

আমার মনে হয় 'লাল ঘট আছে' এই জ্ঞানের অর্থ যেমন 'ঘটটি লাল' এই জ্ঞানের যাথার্থ্যজ্ঞান তদ্রূপ 'সর্পটি মিথ্যা' এই জ্ঞানও প্রকৃত পক্ষে 'সর্পজ্ঞানটি অযথার্থ' এইজ্ঞান। অর্থাৎ ভ্রম প্রথম হইতেই এক প্রকার জ্ঞানবিষয়কজ্ঞান। অথচ ইহা অনুব্যবসায় নহে, কেন না অনুব্যবসায়ের বিষয় আছে, ব্যবসায়ের বিষয়ই অনুব্যবসায়ের বিষয়। কিন্তু মিথ্যাজ্ঞানের নিজস্ব বিষয় ত নাইই, এমন কি উহার অধীন কোন ব্যবসায়ই নাই। অতএব জ্ঞানের অযাথার্থ্যজ্ঞান কোন লৌকিকজ্ঞানই নহে—উহা একপ্রকার প্রাতিভজ্ঞান।

জ্ঞানের যাথার্থ্যজ্ঞানও অযাথার্থ্যজ্ঞানের সমপর্যায়ভুক্ত। অযাথার্থ্যজ্ঞানও যেমন অলৌকিক যাথার্থ্যজ্ঞানও তদ্রূপ। শুধু যে বিশ্লেষণে অযাথার্থ্যজ্ঞান নির্বিষয় প্রতিপন্ন হয় বলিয়াই অলৌকিক এমন নহে, উহা এমন সহসা ঘটে যে উহার অলৌকিকত্ব যেন প্রথম হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এখানে রজ্জু ছিল, এবং রজ্জু থাকিলে ঐ একই সময়ে সর্প থাকিতে পারিত না একথাও সত্য। কিন্তু কেবল এই কারণে সর্পজ্ঞান অযথার্থ হইয়া যায় না, রজ্জুজ্ঞানও ঐ একই কারণে অযথার্থ হইতে পারে। জ্ঞানের উত্তরভাবিত্ব বা পূর্বভাবিত্বের দ্বারা কিছুই নির্ধারিত হয় না, কেন না একটি সরল কাঠিকে প্রথমে সরল জানিয়া পরে জলে ডুবাইলে উহার যে বক্রত্ব প্রতীতি হয় ঐ বক্রত্বের জ্ঞান পরভাবী হইলেও উহাই অযথার্থ মনে হয়। সত্যজ্ঞানটি অধিক বলবান্ বলিয়া কোনই লাভ নাই, কেন না বল কথার অর্থ বুঝি না; যে জ্ঞানটি অন্যান্য জ্ঞানের সহিত সঙ্গত তাহাই অধিক বলবান্ একথারও বিশেষ কোন মূল্য নাই, কেন না এত সঙ্গতি অসঙ্গতি বিচার করিবার অনেক পূর্বেই মিথ্যাজ্ঞান দূর হইবার হইলে ঠিক্‌ই দূর হইয়া যায়। সর্পজ্ঞানের অযাথার্থ্য যেমন সহসা জানা যায় তেমনই, অর্থাৎ তাহার সঙ্গে সঙ্গেই, রজ্জুজ্ঞানের যাথার্থ্যও জানা যায়—কোন্‌টি পূর্বে, কোন্‌টি পরে জানি না। অতএব যাথার্থ্যজ্ঞান অন্ততঃ এই স্থলে অলৌকিক। অন্যস্থলেও অলৌকিক এইজন্য যে জ্ঞানের যাথার্থ্যজ্ঞানের কোনও বিষয় নাই। বস্তুতঃ জ্ঞানের যাথার্থ্যজ্ঞান হইল প্রমাণের প্রামাণ্যজ্ঞান, এবং এই প্রামাণ্যজ্ঞান যে একান্ত অলৌকিক তাহা আমরা 'লৌকিক ও প্রাতিভজ্ঞান' প্রবন্ধে অতি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি।

অতএব দেখা গেল যে বিষয়ের যাথার্থ্যজ্ঞান নির্বিষয় বলিয়াই অস্তিত্ব বা সত্তা বিষয়ের কোনও ধর্ম নহে। অন্যভাবে কাণ্ট্‌ও এই মত স্থাপন করিয়াছেন। (তাঁহার ontological argument বিচার দ্রষ্টব্য।)

শুকদেব বাবু বলিয়াছেন যে দেশের আমাসাপেক্ষত্ব বিষয়ে আমি যে চতুর্থ প্রমাণ দিয়াছি তাহা অনেকটা তৃতীয় প্রমাণের উপর নির্ভর করে, সুতরাং তাহার অতিরিক্ত খণ্ডন অনাবশ্যক। মূলপ্রবন্ধটি আমার নিকট নাই। কিন্তু আমার ধারণা

উহাতেও অনেক বিচার্য বিষয় ছিল। কাণ্টের প্রতি কথাই নূতন, এবং যাহা গৌণ বলিয়া আপাততঃ মনে হয় তাহাই আবার একভাবে মুখ্য, অর্থাৎ তাহা হইতেও পূর্বের কথার সূচনা পাওয়া যায়। যাহা হউক আমিও চতুর্থ প্রমাণের বিচার পরিত্যাগ করিলাম।

পঞ্চম প্রমাণটির বিরুদ্ধে শুকদেব বাবু যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। অবশ্য তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে প্রমাণটিতে কোনও গূঢ়তত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে যাহা তিনি বুঝেন নাই। সেইজন্য তাঁহার বিচারের উপর পুনর্বিচার না করিয়া আমি আমার (প্রকৃত পক্ষে কাণ্টের) বক্তব্যটি আর একবার ভাল করিয়া বলি।

প্রমাণটির উদ্দেশ্য হইল যে বাম-দক্ষিণরূপ দৈশিক order বস্তুনিষ্ঠ ধর্ম নহে। কারণ যখন বাম হস্তটি দর্পণের নিকট ধরিলে উহা দক্ষিণরূপে প্রতীয়মান হওয়া সত্ত্বেও ঐ প্রতিবিম্বটিকে আমার বাম হস্তই বলি তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে দক্ষিণত্ব বা বামত্ব হস্তনিষ্ঠ ধর্ম নহে। দর্পণে আমার মুখের প্রতিবিম্ব পড়িলে তত্ত্বজ্ঞ আমি বলি যে উহা আমারই মুখ। তদ্রূপ বামহস্তের যে প্রতিবিম্ব দর্পণে পড়িয়াছে উহাকে বামহস্তই বলি। বাম হস্তের বর্ণ ও অন্যান্য ধর্মগুলি প্রতিবিম্বরূপ দক্ষিণ হস্তে রহিয়াছে, কিন্তু বামত্বরূপ দৈশিক ধর্মটি ঐ প্রতিবিম্বে নাই, উহাতে বরং দক্ষিণত্বরূপ বিপরীত ধর্ম রহিয়াছে। ধর্মের ভেদ সত্ত্বেও কি করিয়া বিম্ব ও প্রতিবিম্বকে একই পদার্থ বলিতে পারি? আপত্তি হইতে পারে একটি কচি আম পরিপক্ক হইলে ত কচি আমও পরিপক্ক আমের ধর্ম ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও একই আম রহিয়াছে বলি। কিন্তু আমাদের উত্তর এই যে বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ঐক্য উহা অপেক্ষা অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ। বিম্ব-প্রতিবিম্ব স্থলে একান্ত ঐক্যই বিবক্ষিত। আমরা বলি আমার মুখই আমি সত্য দেশে না দেখিয়া মিথ্যা দেশে দেখিতেছি। অর্থাৎ দুইএর মধ্যে যাহা কিছু ভেদ তাহা প্রথম হইতেই মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করি।

পুনরায় আপত্তি হইতে পারে, প্রতিবিম্বের স্থানরূপ দেশও ত ভিন্ন। উত্তর এই যে ঐ ভিন্নত্ব সত্ত্বেও যখন প্রতিবিম্বকে বিম্বই বলি তখন স্বীকার করিতে হইবে যে স্থানও বস্তুর ধর্ম নহে। বস্তুতঃ দেশের যে কোন প্রকার ভেদই অবস্তুনিষ্ঠ, কোনটাই বস্তুর ধর্ম নহে; তাহার দক্ষিণত্ব ও বামত্বরূপ প্রকার ভেদের বিচারই কাণ্ট এই প্রমাণে করিতেছেন। পুনরায় আপত্তি হইতে পারে বিম্ব ও প্রতিবিম্বের মধ্যে আয়তন ও আকার-রূপ দৈশিক প্রকারের ভেদ ত নাই। উত্তর এই যে তাহাতে কিছু আসে যায় না, অর্থাৎ তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে ঐগুলি বস্তুনিষ্ঠ। কি করিয়া অদ্ভুতভাবে কতকগুলি দৈশিক প্রকার বিম্ব ও প্রতিবিম্ব উভয়েই থাকিয়া যায় তাহা দেশেরই এক অভিনব ধর্ম।

বলিয়াছি বস্তুতঃ দেশের যাবতীয় প্রকার ভেদই অবস্তুনিষ্ঠ। কোন বস্তুর দেশ তাহার রূপরসের মত তন্নিষ্ঠ ধর্ম নহে, কেন না বস্তুর রূপরসাদির মধ্যে পরস্পর যে সম্পর্ক উহাদের সহিত তাহার দেশের সম্পর্ক সেরূপ নহে—রূপরসাদি দেশস্থ ব্যতীত

কল্পনাই করা যায় না, কিন্তু দেশকে অনায়াসে রূপরসাদিবিহীন কল্পনা করা যায়। আবার রূপরসাদির সহিত কূটস্থ বস্তুটির যে সম্পর্ক দেশের সহিত তাহার সম্পর্ক একেবারে বিপরীত। অতএব দেশ বস্তুনিষ্ঠ পদার্থ নহে।

ষষ্ঠ প্রমাণের বিরুদ্ধে শুকদেব বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহার অনেকখানি আমি বুঝিতে পারি নাই। আমি বলিয়াছিলাম "দেশের অপরোক্ষপ্রতীতি ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে" এবং যাহার অপরোক্ষ প্রতীতি ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে তাহাকে আমানিরপেক্ষ বলা যায় না।" অপরোক্ষ প্রতীতি দুই প্রকার ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য ও ইন্দ্রিয়জন্য, ইহা ত আমি মানিয়াইছি, কারণ মূলপ্রবন্ধের প্রথমেই আমি দেখাইয়াছি যে অপরোক্ষ প্রতীতি হয় অপরোক্ষ জ্ঞাননিশ্চয়, না হয় অপরোক্ষ কেবল নিশ্চয়। ইহা হইতে কি করিয়া শুকদেব বাবু সিদ্ধান্ত করিলেন যে "সুতরাং দেশের অপরোক্ষপ্রতীতি ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে না বলিয়া (কালিদাস বাবুর) বলা উচিত দেশের অপরোক্ষ জ্ঞানই হয় না" তাহা বুঝিলাম না। জ্ঞাননিশ্চয় ও কেবলনিশ্চয়ের পার্থক্য যে মানিয়াছে তাহার পক্ষে অসঙ্গতিটা কোথায়? ৫৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আমি কি বলিয়াছি তাহা মনে নাই। হয় আমার অজ্ঞাতে কোন ভুল হইয়া গিয়াছে না হয় শুকদেব বাবুই ভুল বুঝিয়াছেন। আমি ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ মানিতে প্রস্তুত নহি—একথা নিশ্চয়ই ঠিক্ নহে।

শুকদেব বাবুর প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে যাহা বলা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে আমার দুইটি কথা বলিবার আছে। যদি বিচারে প্রতিপন্ন হয় যে দেশ আমানিরপেক্ষ নহে তাহা হইলে কি উহাকে আমাসাপেক্ষ বলিব না? অবশ্য উহা অনির্বাচ্যও হইতে পারে। কিন্তু লৌকিকজ্ঞান ব্যতীত প্রাতিভজ্ঞান স্বীকার করিলে কি আমাসাপেক্ষত্ব বিষয়ের অর্থ কিছুটা বুঝা যায় না? মূলপ্রবন্ধে ত আমি জ্ঞাননিশ্চয় ও কেবলনিশ্চয়ের পার্থক্য করিয়াছি। তাহা সত্য হইলেও কি আমাসাপেক্ষত্ব কথাটা একান্ত প্রলাপ বলিয়া মনে হয়? তাহা ছাড়া যোগদর্শনে কাল ও দেশকে যে বিকল্পমাত্র বলা হইয়াছে তাহা কি একান্ত অসম্ভব?

দ্বিতীয়তঃ ভ্রমপ্রত্যক্ষের বিষয় আমাসাপেক্ষ এইটুকুও যদি শুকদেব বাবু (মানুন বা না মানুন) বুঝিতে পারেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল। কি করিয়া বহির্বিষয় (তাহা মিথ্যা হউক না কেন) আন্তর হইতে পারে ইহা যিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন—যিনি ইহা বাতুলোক্তি বলিয়া উড়াইতে দিতে পারেন নাই—তাঁহারা কল্পনাশক্তি অনেকখানি। দেশের আমাসাপেক্ষত্ব আমিও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই; তবে তাহার সূচনা যে আছে ইহা বুঝিতে পারি। শুকদেব বাবু মিথ্যা বহির্বস্তুর আমাসাপেক্ষত্ব বুঝিলেও দেশের বেলায় তাহা বুঝিলেন না কেন? সত্য মিথ্যা প্রভেদের জন্য কোথায় কল্পনায় বা চিন্তায় গোলমাল বাধিল দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

উপনিষদ এবং মূর্ত্তিপূজা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

উপনিষদে নিরাকার ব্রহ্মের উপদেশ আছে। এজন্য আজকাল কথা উঠিয়াছে যে ঈশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করা উপনিষদের মতের বিরুদ্ধ। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। উপনিষদে কোথাও মূর্ত্তিপূজা নিষেধ করা হয় নাই। অধিকন্তু উপনিষদে ইহা বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না, মনে চিন্তা করা যায় না, সুতরাং যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহেন। কেহ যদি মনে করেন, "আমি ব্রহ্মের কোনওরূপ মূর্ত্তি নিমাণ করিয়া পূজা করি না, তাঁহার উদ্দেশ্যে স্তব বা কবিতা পাঠ করি, মনে মনে তাঁহাকে চিন্তা করি, সুতরাং আমি ঠিক ব্রহ্মেরই উপাসনা করি," তাহা হইলে তাঁহার বুঝিবার ভুল হইবে। ব্রহ্ম অনন্ত, অচিন্তনীয়, এজন্য তাঁহার উপাসনা করা সম্ভব নহে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মের একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে সেও যেমন যথার্থ ব্রহ্মকে পূজা করে না, সেইরূপ যে ব্যক্তি তাহার মনে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোনও ধারণা করিয়া স্তব স্তুতি পাঠ করে, বা ধ্যান করে, সেও যথার্থ ব্রহ্মের উপাসনা করে না। যথার্থ ব্রহ্মের উপাসনা করা সম্ভব নয়। উপাসনা করিলেই কোনও একটি বস্তুকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করিতে হইবে,—তাহা একটি মূর্ত্তিই হউক, অথবা একটি মানসিক ধারণাই হউক।

কেনোপনিষদ বলিয়াছেন যে চক্ষু বাক্য বা মন দ্বারা ব্রহ্মকে গ্রহণ করা যায় না,—

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ,—(কেন ১।৩)

যাঁহাকে উপাসনা করা হয় তিনি ব্রহ্ম নহেন,

নেদং যদিদমুপাসতে।

কেহ যদি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উপাসনা করেন, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মের উপাসনা করিতেছেন না, কারণ ব্রহ্মকে চোখে দেখা যায় না,

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ (কেন ১।৬)

"যাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখা যায় না, যাঁহার শক্তিতে চক্ষুকে দেখা যায় (চক্ষুর দৃষ্টি ক্রিয়া উপলব্ধ হয়), তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, যাঁহাকে উপাসনা করা হয় তিনি ব্রহ্ম নহেন।"

এই ভাবে কেনোপনিষদ বলিলেন যে যাঁহারা সাকারের উপাসনা করেন তাঁহারা ব্রহ্মের উপাসনা করেন না। কিন্তু কেনোপনিষদ ইহাও বলিয়াছেন যে যাঁহারা নিরাকারের উপাসনা করেন তাঁহারাও ব্রহ্মের উপাসনা করেন না, কারণ যাঁহারা নিরাকারের উপাসনা

করেন তাঁহারাও তাঁহাদের মনে ব্রহ্মকে চিন্তা করিয়া উপাসনা করেন, কিন্তু ব্রহ্মকে চিন্তা করা যায় না।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ (কেন ১।৫)

"যাঁহাকে মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না, যাঁহার শক্তিতে মনকে চিন্তা করা যায় তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও, যাঁহাকে উপাসনা করা যায় তিনি ব্রহ্ম নহেন।"

ব্রহ্ম অনন্ত। আমাদের মনের দ্বারা যাহা চিন্তা করি তাহা সান্ত। সুতরাং আমরা মনের দ্বারা যাহা চিন্তা করি তাহা ব্রহ্ম নহেন।

উপনিষদ বলিয়াছেন "নেদং যদিদমুপাসতে"—ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে উপনিষদ্ মূর্ত্তিপূজা নিষেধ করিয়াছেন। এই বাক্যে কোনও নিষেধের কথা নাই, কেবল ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উপাসনা করিলেই একটি সান্ত বস্তুকে উপাসনা করিতে হইবে, তাহা একটি স্থূলমূর্ত্তিই হউক, অথবা সূক্ষ্ম মানসিক ধারণাই হউক। যদিও উপাসিত বস্তুটি ব্রহ্ম নহেন, তথাপি উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির হয়, নির্মল হয়, এজন্য উপাসনা ব্রহ্মোপলব্ধির সহায়ক। এজন্য উপনিষদে বিভিন্ন বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে প্রতীক-উপাসনা বলা হয়।

মনো ব্রহ্ম ইতি উপাসীত (ছান্দোগ্য ৩।১৮।১)।

মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে। ব্রহ্ম সূক্ষ্ম, মনও সূক্ষ্ম। মন ও ব্রহ্মের মধ্যে এই সাম্য লক্ষ্য করিয়া মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকার উপাসনার দ্বারা সূক্ষ্মবস্তুকে ধারণা করিবার শক্তি হয়। পূর্বোদ্ধৃত বাক্যের পরেই বলা হইয়াছে যে আকাশকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে। আকাশ ব্রহ্মের ন্যায় সর্বগত, সূক্ষ্ম এবং উপাধিহীন, এজন্য আকাশকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবার উপযোগিতা আছে।

সত্যকাম-জাবালের উপাখ্যানে (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪।৫, ৬, ৭, ৮) পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিককে ব্রহ্মের প্রকাশময় অংশরূপে উপাসনা করিবার কথা আছে; পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ এবং সমুদ্রকে ব্রহ্মের অনন্তবান্ অংশরূপে উপাসনা করিবার কথা আছে; অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র এবং বিদ্যুৎকে ব্রহ্মের জ্যোতির্ময় অংশরূপে উপাসনা করিবার কথা আছে; প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র এবং মনকে ব্রহ্মের আয়তনবান্ অংশরূপে উপাসনা করিবার কথা আছে। পরিশেষে উক্ত হইয়াছে যে এইভাবে উপাসনা করিবার ফলে সত্যকাম ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন—গুরু তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—ব্রহ্মবিদ্ ইব সোম্য ভাসি (ছান্দোগ্য ৪।৯।২)। পরবর্ত্তী উপাখ্যানে (উপকোসল কামলায়নের উপাখ্যানে) সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী পুরুষ, চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষ,

বিদ্যুন্মণ্ডলবর্তী পুরুষ এবং চক্ষুর্মধ্যবর্তী পুরুষের উল্লেখ আছে এবং ইঁহাদের উপাসনা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার কথা আছে।

উপনিষদে কোনও কোনও স্থলে কেবল ব্রহ্মকে উপাসনা করিবার কথা আছে, কোনও বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করা হইবে ইহা বলা হয় নাই। যথা মুণ্ডকে—

উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাঃ তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ (মুণ্ডক ৩।২।১)—"যাহারা নিষ্কামভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করে তাঁহারা সংসার অতিক্রম করিতে পারে।"

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে উপনিষদ বলিয়াছেন যে যাঁহাকে উপাসনা করা হয় তিনি ব্রহ্ম নহেন, "নেদং যদিদমুপাসতে।" সুতরাং উপনিষদ এক স্থানে বলিয়াছেন যে ব্রহ্মকে উপাসনা করা যায় না, আবার অন্য স্থানে ব্রহ্মকে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে। উপনিষদের এই দুই অংশ কি পরস্পর বিরোধী? না, তাহা নহে। যদিও ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপকে উপাসনা করা যায় না (কারণ তাঁহাকে মন দ্বারা চিন্তা করা যায় না, হৃদয়ে ধারণা করা যায় না), তথাপি কোনও বাহ্য বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করা যায়, অথবা ব্রহ্ম সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটি ধারণা করিয়া তাঁহাকে উপাসনা করা যায়। মনের মধ্যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে ধারণা করিয়া উপাসনা করিলে সে ধারণা সাকারও হইতে পারে, নিরাকারও হইতে পারে। বলা বাহুল্য, নিরাকার অপেক্ষা সাকারের ধারণা সহজ এবং স্বাভাবিক। এ জন্য দেখা যায় যে যাঁহারা সাকার উপাসনার বিরোধী তাঁহারাও ব্রহ্মকে উপাসনা করিবার সময় তাঁহার চরণতলে প্রণাম করেন, তাঁহার প্রসন্ন মুখের উল্লেখ করেন।

যাহার দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ নাই তাহাই জ্যামিতির রেখা। বলা বাহুল্য এরূপ রেখা কেহ আঁকিতে পারে না। অথচ রেখা না আঁকিলে জ্যামিতি শেখা যায় না। অগত্যা কতকটা রেখার ন্যায় একটী পদার্থ আঁকিতে হয় এবং তাহাকেই রেখা বলিয়া ধরিয়া লইলে জ্যামিতি শেখা যায়। সেইরূপ ব্রহ্মকে চোখে দেখা যায় না, মনে চিন্তা করা যায় না। এরূপ ব্রহ্মকে উপাসনা করাও যায় না। অথচ ব্রহ্মকে উপাসনা না করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। অগত্যা কোনও একটী বস্তু বা ধারণাকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করিতে হয়। উপনিষদ এইভাবেই ব্রহ্মকে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। যেখানে কেবলমাত্র এইরূপ উল্লেখ আছে যে ব্রহ্মকে উপাসনা করিতে হইবে (যথা, "উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাঃ"), অথচ কাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিতে হইবে তাহার কোনও উল্লেখ নাই, সেখানেও বুঝিতে হইবে যে উপনিষদের উদ্দেশ্য এই যে কোনও দ্রব্য বা ধারণাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিতে হইবে।

"অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি ইতি বাদরায়ণঃ" (ব্রহ্মসূত্র ৪।৩।১৫) এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে যাঁহারা প্রতীক উপাসনা করেন তাঁহারা (দেবযান পথে গমন করিয়া) ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে যাঁহারা নামকে ব্রহ্ম

বলিয়া উপাসনা করেন, নাম যতদূর আছে, তাঁহারা ততদূর পর্যন্ত ইচ্ছানুরূপ প্রাপ্ত হইতে পারেন ("স যো নাম ব্রহ্ম ইত্যুপাস্তে যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামাচারো ভবতি" ছান্দোগ্য উপনিষদ ৭।১।৫)। তাহার পর বাক্য, মন, সঙ্কল্প প্রভৃতিকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিলে কতদূর গতি লাভ হয় তাহা বলা হইয়াছে। শঙ্কর ও রামানুজ পূর্বোদ্ধৃত ৪।৩।১৫ সূত্রের ভাষ্যে এই সব প্রতীক উপাসকদিগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

যো হি ব্রহ্মক্রতুঃ স ব্রাহ্মম্ ঐশ্বর্য্যম্ আসীদেৎ ইতি শ্লিষ্যতে, "তং যথা যথা উপাসতে তৎএব ভবন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। ন তু প্রতীকেষু ব্রহ্মক্রতুত্বম্ অস্তি। প্রতীক প্রধানত্বাৎ উপাসনস্য।

"যে উপাসক ব্রহ্মকে চিন্তা করে সে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে ইহা যুক্তিযুক্ত। কারণ বেদ বলিয়াছেন—তাঁহাকে যে যেভাবে উপাসনা করে তাহাই হয়। প্রতীকে ব্রহ্মের চিন্তা হয় না। কারণ প্রতীক উপাসনায় প্রতীকেরই প্রাধান্য।" যেখানে নাম, বাক্য, মন প্রভৃতি বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করা হয় সেখানে এই মন্তব্য প্রযোজ্য। কিন্তু যেস্থলে শ্রীকৃষ্ণ, রাম, শিব বা দুর্গার মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করা হয় সেস্থলে এই মন্তব্য প্রযোজ্য নহে। যে ব্যক্তি মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে সে মনের কথাই চিন্তা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কোনও মূর্ত্তির উপাসনা করে সে ব্যক্তি ঐ মূর্ত্তির মধ্যে যে শিলা, ধাতু বা মৃত্তিকা আছে তাহার কথা চিন্তা করে না, সর্বজ্ঞ সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বরের কথাই চিন্তা করে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের মূর্ত্তির পূজা করে তাহার মনের ভাব এবং যে ব্যক্তি নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করে তাহার মনের ভাব, একই জাতীয়, সাধারণতঃ প্রথমোক্ত ব্যক্তির আগ্রহ কিছু অধিক হয়, এইমাত্র প্রভেদ। সুতরাং যে ব্যক্তি নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করে তাহার ন্যায় যে ব্যক্তি ঈশ্বরের মূর্ত্তির পূজা করে সে ব্যক্তিও দেবযান পথে গমন করিয়া ব্রহ্ম লাভ করিবে এরূপ সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত। পূর্বোদ্ধৃত ব্রহ্মসূত্রে যে উদ্দেশ্যে "প্রতীকালম্বন" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে ঈশ্বরের মূর্ত্তিপূজকগণ ঐ শব্দের উদ্দিষ্ট হইতে পারেন না ইহা সহজেই প্রতীত হয়।

উপনিষদের সারভাগ গীতাতে সংগৃহীত হইয়াছে ইহাই আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিপূজকগণের শ্রেষ্ঠতা খ্যাপন করিয়াছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হে ভগবন্, যাঁহারা এইরূপে সর্বদা আপনার চিন্তা করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগী, অথবা যাঁহারা অক্ষর অব্যক্তের (ব্রহ্মের স্বরূপ) উপাসনা করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ?" ইহার উত্তরে ভগবান বলিয়াছেন, "উভয় প্রকার উপাসকই আমাকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাঁহারা সাক্ষাৎ আমার উপাসনা করেন তাঁহারা সহজে আমাকে প্রাপ্ত হন, যাঁহারা অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা

করেন তাঁহাদের কষ্ট অধিক।" নবম অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন যে যাঁহারা দেবতা প্রভৃতির পূজা করেন তাঁহারা দেবতা প্রভৃতি প্রাপ্ত হন, যাঁহারা ভগবানকে পূজা করেন তাঁহারা ভগবানকে প্রাপ্ত হন। পরবর্ত্তী ২৬ শ্লোকে ভগবানকে পূজা করিবার প্রণালী উক্ত হইয়াছে, পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি ভক্তিপূর্বক ভগবানকে অর্পণ করিলে ভগবান তাহা গ্রহণ করেন। সুতরাং এখানে যে মূর্ত্তিপূজাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং মূর্ত্তিপূজা করিয়া যে সাক্ষাৎ ভগবানকে লাভ করা যায় তাহাও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য এবং রামানুজ উভয়েই ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া উপনিষদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ উভয়েই মূর্ত্তিপূজা করিয়াছেন—সুতরাং "অপ্রতীকালম্বনান্" (ব্রহ্মসূত্র ৪।৩।১৫) এই শব্দ যে মূর্ত্তিপূজককে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিযুক্ত। শ্রীচৈতন্য এবং তুলসীদাসও মূর্ত্তিপূজা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে ঈশ্বর লাভ করিয়া-ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রামপ্রসাদ এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস মূর্ত্তিপূজা করিয়াই ঈশ্বরলাভ করিয়াছিলেন। আরও অনেক বিখ্যাত এবং অখ্যাত সাধকও মূর্ত্তিপূজা করিয়া ঈশ্বর লাভ করিয়াছিলেন ইহা সুবিদিত। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া ব্রহ্মলাভ করিয়াছিলেন এরূপ সাধক আজকাল অতিশয় দুর্লভ—প্রায় নাই বলিলেও চলে। উপনিষদে মূর্ত্তিপূজার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিবার কারণ এই যে সেই যুগের মানবদের মানসিক শক্তি অতিশয় প্রবল ছিল, মূর্ত্তির সাহায্য ব্যতীতও ব্রহ্মোপাসনা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, মানসিক শক্তির হ্রাস হওয়ার দরুণ আজকাল মূর্ত্তিরূপ আলম্বনের প্রয়োজন আছে।

দর্শনের স্বরূপ ও লক্ষ্য কি ?

অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম. এ.

সাধারণতঃ ইংরাজি Philosophy ও বাংলা "দর্শন" এই দুইটী শব্দ এক অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইহাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এক নহে। Philosophy শব্দটি জ্ঞানতৃষ্ণা এই অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু দর্শন শব্দটী দ্বারা অনেক সময় বিশেষ এক প্রকার জ্ঞানকে বুঝায়। সাধারণতঃ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে আত্মপ্রত্যক্ষজনিত জ্ঞানকেই দর্শন বলা হয়। এই অর্থে ইন্দ্রিয়ের, মনের অথবা বুদ্ধির সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা দার্শনিকজ্ঞান পদবাচ্য নহে। অবশ্য সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে ইন্দ্রিয়ের, মনের ও বুদ্ধির সাহায্য আবশ্যক, কিন্তু ইহাদের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহাকে অতিক্রম করিয়াই আত্মপ্রত্যক্ষজনিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব, ভারতীয় দার্শনিকদের সাধারণতঃ এইরূপ অভিমত। Philosophy বলিতে আমরা সচরাচর এইরূপ আত্মপ্রত্যক্ষজনিত জ্ঞানকে বুঝি না। য়ুরোপীয় দার্শনিকগণ সাধারণতঃ মনে করেন যে দার্শনিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়ের, মনের ও বুদ্ধির সাহায্যেই আমাদিগকে উক্ত জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। অবশ্য য়ুরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যেও আত্মপ্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক অনেক আছেন। তাই বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক দেকার্তে মনে করেন যে "আমি আছি", ইহা একটী আত্মপ্রত্যক্ষজনিত স্বতঃসিদ্ধ সত্য। অন্যরূপ জ্ঞানকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা যাইতে পারে, কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব-রূপ জ্ঞানকে কোনরূপে সন্দেহ করা যায় না, অবশ্য ওয়াটশন প্রমুখ দার্শনিকগণ বলেন যে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। ইঁহাদের মতে বাহ্যিক ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে এবং অনুমানের সাহায্যেই আমরা আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করি, সে যাহাই হউক, প্লেটো, প্লটাইনাস, স্পিনোজা, শেলিং, হেগেল, গেটে, বার্গসঁ, ব্রাড্‌লে প্রভৃতি খ্যাতনামা দার্শনিকগণ আত্মপ্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। এই সব দার্শনিকদের মতে চরম সত্য রহস্যাবৃত এবং এই সত্য ইন্দ্রিয়গম্য অথবা বুদ্ধিগম্য নহে। আত্মপ্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণ স্বতঃসিদ্ধ একত্ব-রূপ এক বিশেষ সত্যকেই দর্শনের ভিত্তি বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহারা অন্যরূপ জ্ঞানকে এই চরমসত্যের জ্ঞানের মাপকাঠির সাহায্যেই যাচাই করিয়া থাকেন। ফলে ইঁহাদের মতে জ্ঞান দুই প্রকার, দার্শনিকজ্ঞান ও ব্যবহারিকজ্ঞান। ইঁহারা দার্শনিক-জ্ঞানকে উচ্চস্তরের জ্ঞান এবং ব্যবহারিকজ্ঞানকে নিম্নস্তরের জ্ঞান বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদের মতে বৈজ্ঞানিকজ্ঞানও নিম্নস্তরের ব্যবহারিকজ্ঞান। গীতার ভাষায় চরমজ্ঞান এক, অবিভক্ত ও দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন। কিন্তু ব্যবহারিকজ্ঞান বহুমুখী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

সুতরাং জগতের দার্শনিকদিগকে আমরা এই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। এক শ্রেণীর মতে আমরা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদির সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করি তাহা ভ্রান্ত জ্ঞান অথবা ব্যবহারিক জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞান দার্শনিক জ্ঞান নহে। আমরা আত্মপ্রত্যক্ষের সাহায্যেই দার্শনিক জ্ঞান লাভ করিতে পারি। অপর শ্রেণীর দার্শনিকদের মতে আত্মপ্রত্যক্ষজনিত জ্ঞানকে কোনরূপেই দার্শনিক জ্ঞানের ভিত্তি করা চলে না, কারণ এরূপ জ্ঞান অপ্রামাণিক। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদির সাহায্যেই আমরা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, সুতরাং ব্যবহারিক জ্ঞানই দার্শনিক জ্ঞানের ভিত্তি। অপ্রামাণিক কোন জ্ঞানকেই দার্শনিক জ্ঞান বলিয়া মনে করা ভুল, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের মনের ও বুদ্ধির সাহায্যেই আমাদের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। অন্য কোন উপায়ে প্রামাণিক জ্ঞান লাভ করা যায় না। ইঁহাদের মতেও দার্শনিক জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অথবা জনসাধারণের জ্ঞানের সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে। জনমতকে ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়াই আমরা দার্শনিক জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। জনমতের ভুল সংশোধন করিয়াই আমরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করি এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে সমালোচনা করিয়া এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাধারণ সত্যকে উপলব্ধি করিয়া এবং উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আমরা দার্শনিক জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। দার্শনিক জ্ঞান খণ্ড সত্যের জ্ঞান নহে, ইহা সমগ্র বিশ্বের দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন সাধারণ জ্ঞান। সুতরাং জনমতকে অতিক্রম করিয়া আমরা লাভ করি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া আমরা লাভ করি দার্শনিক জ্ঞান। ইহা হইলেও অন্যান্য জ্ঞান যে প্রকার আমরা মননের সাহায্যে লাভ করি সেইরূপ দার্শনিক জ্ঞান লাভ করিতেও আমাদের মননের সাহায্য অপরিহার্য্য। আমরা জনমতের ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অসামঞ্জস্য ও অপূর্ণতা দূর করিয়াই মননের সাহায্যে দার্শনিক জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। দার্শনিক জ্ঞান বিশ্বসম্বন্ধে সার্ব্বিক জ্ঞান, কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অখণ্ড না হওয়ায় উহা পূর্ব্বোক্ত অর্থে সার্ব্বিক জ্ঞান নহে।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা এখন দেখিতে পাই যে দর্শনের স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিকগণ একমত নহেন। এবং ইঁহাদিগকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। আত্মপ্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণের মতে, মননের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা দার্শনিক জ্ঞান নহে। দার্শনিক জ্ঞান রহস্যাবৃত ও গুহানিহিত। এই স্থলে আমরা ধর্ম্ম ও দর্শনের যোগাযোগ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে পারি। আমরা এখন জানি যে যাদুবিদ্যা হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি। যাদুবিদ্যা ও ধর্ম্ম উভয়ই রহস্যাবৃত অস্তিত্বে বিশ্বাসী। উভয়েরই একটী ব্যবহারিক দিক আছে। যাদুবিদ্যা মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে রহস্যাবৃত শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাইতে চেষ্টা করে এবং ধর্ম্ম, প্রার্থনা, পূজা ও সেবার সাহায্যে মানবের অনধীন শক্তির আধারকে মানুষের কাজে লাগাইতে

চেষ্টা করে। যাদুবিদ্যার রহস্যাবৃত অদৃশ্য শক্তি নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু ধর্ম্মের রহস্যাবৃত শক্তির আধার ব্যক্তিরূপী ও চৈতন্যস্বরূপ। যাদুবিদ্যার স্তর অতিক্রম করিয়া এবং উহার অসামঞ্জস্য দূর করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র আজ আপনার জন্য একটী বিশেষ স্থান রচনা করিয়াছে। আমাদের এই স্থলে প্রধান বক্তব্য এই যে আত্মবাদী দর্শনের সহিত জগতের প্রধান ধর্ম্মগুলির যোগ গভীর। আত্মবাদী দর্শনের মতে চরমসত্য এক এবং এই সত্যকে ব্রহ্ম, অদ্বৈত প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ধর্ম্মের মতেও চরম সত্য এক এবং ধর্ম্ম এই সত্যকে ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত করে। দ্বিতীয়তঃ আত্মবাদী দর্শনের মতে চরম সত্যকে আত্মপ্রত্যক্ষের সাহায্যে জানা যায়, মননের সাহায্যে ইহাকে জানা যায় না। ধর্ম্মের মতেও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়, ধ্যানধারণার সাহায্যে। বিচারের সাহায্যে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তাই ধর্ম্ম বিশ্বাসকে মননের উর্দ্ধে স্থান দিয়াছে, বিশ্বাসের সাহায্যে ভগবানকে পাওয়া যায় তর্ক দ্বারা নহে। সুতরাং আত্মবাদী দর্শনের ও ধর্ম্মের মত এই যে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষজ্ঞানও অনুমানলব্ধজ্ঞান নিম্নস্তরের জ্ঞান এবং উহাদের সাহায্যে চরম সত্যকে জানা যায় না। বিশেষ আত্মপ্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানদ্বারাই চরমসত্যকে জানা যায়। সেইজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আত্মপ্রত্যক্ষবাদী দর্শনের সহিত ধর্ম্মের যোগ গভীর। এই কারণেই আত্মপ্রত্যক্ষবাদী দর্শনকে অনেক সময় ধর্ম্ম বলা হয়, তাই বেদান্তকে কখনও দর্শন কখনও ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করা হয়। স্পিনোজার দর্শনকেও এই অর্থে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে, হেগেল যদিও ধর্ম্ম হইতে দর্শনের পার্থক্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার দর্শনের সহিত ধর্ম্মের প্রভেদ অতি সামান্য। সে যাহাই হউক আত্মবাদী দর্শনের সহিত ধর্ম্মের দুই একটী প্রধান পার্থক্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হওয়া আবশ্যক।

আত্মবাদী দর্শনের চরমসত্য সাধারণতঃ নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু ধর্ম্মের চরমসত্য ঈশ্বর ব্যক্তিরূপী। দ্বিতীয়তঃ আত্মপ্রত্যক্ষবাদীর দর্শন এক প্রকার বিশেষ জ্ঞান, ইহার সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের সম্বন্ধ আন্তরিক নহে। কিন্তু ধর্ম্মের সহিত ব্যবহারিক জীবনের সম্বন্ধ আন্তরিক। গীতায় আমরা আত্মপ্রত্যক্ষবাদী দর্শনের সঙ্গে ও ব্যবহারিক জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাই, সেই জন্য গীতা একাধারে দর্শন ও ধর্ম্ম। আমরা পূর্ব্বে দর্শনকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। আমরা আত্মবাদী দর্শনের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগাযোগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয় শ্রেণীর দার্শনিকদের মতে বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের যোগ আন্তরিক ও অপরিহার্য্য। বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়ই মনন শাস্ত্র, সুতরাং দ্বিতীয় শ্রেণীর দার্শনিকদের মতে ধর্ম্ম ও দর্শন বিভিন্ন শাস্ত্র। দর্শন বিচারের উপর নির্ভরশীল কিন্তু ধর্ম্ম বিশ্বাস ও আত্মোপলব্ধির উপর নির্ভরশীল। দার্শনিক জ্ঞান ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের ও অনুমানাদির সাহায্যে লাভ করা যায়। কিন্তু ধর্ম্মের

চরমসত্যকে উহাদের সাহায্যে জানা যায় না। সুতরাং এই দার্শনিকদের মতে অপ্রামাণিক ধর্ম্মশাস্ত্রকে দর্শনের বহির্ভূত বলিয়া মনে করা একান্ত আবশ্যক। ইঁহাদের মতানুসারে দর্শনকে জ্ঞানের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা বলা যাইতে পারে।

এখন প্রশ্ন এই যে দর্শনের স্বরূপ সম্বন্ধে এই যে দুই বিপরীত মত বর্ত্তমান, ইহাদের কোনটী গ্রহণীয়। দার্শনিক জ্ঞানকে যদি জগৎ সত্য সম্বন্ধে মানবজাতির আদর্শ প্রামাণ্যজ্ঞান বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে সেরূপ জ্ঞানকে কোন বিশেষ ব্যক্তির আত্মোপলব্ধিজনিত জ্ঞান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। কারণ প্রমাণাভাবে এবং উপলব্ধির পার্থক্যবশতঃ এরূপ জ্ঞান সর্ব্বমানবের আদর্শস্থানীয় হইতে পারে না। আমি যদি কোন বিশেষ উপলব্ধির সাহায্যে কোন বিশেষ জ্ঞনলাভ করি তাহা হইলে সেইরূপ আত্মপ্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান, এবং যতদিন পর্য্যন্ত প্রমাণাদির সাহায্যে এইরূপ জ্ঞানকে সার্ব্বিক জ্ঞানের পর্য্যায়ে উন্নীত করা না যাইবে ততদিন উহা মানবসমাজের আদর্শ জ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। আমার আত্মপ্রত্যক্ষলব্ধ সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান আমার ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করিতে পারে সত্য, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ ঐরূপ আত্মপ্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানলাভ না করিবে ততদিন পর্য্যন্ত উহারা এইরূপ জ্ঞানকে পরাবিদ্যা বলিয়া গ্রহণ করিবে না। আমি যদি মনে করি যে যে সত্য আমার কাছে স্পষ্ট সকলের কাছেই উহা তদ্রূপ স্পষ্ট হইতে পারে তাহা হইলে আমি ভুল করিব। তাই আমরা দেখি যে যাঁহারা সত্য দ্রষ্টা বলিয়া অভিহিত তাঁহারা তাঁহাদের পরাসত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার জন্য কবিত্বের আশ্রয় নিয়া থাকেন, তাই তাঁহাদের আত্মপ্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান সর্ব্বদাই রহস্যজালে আবৃত থাকে। এরূপ জ্ঞানের কোন বিশেষ রূপ নাই, ইহার সংজ্ঞা নিরূপণ করা অসম্ভব এবং ইহা সর্ব্বদাই ধূম্রজালে আবৃত। সুতরাং এইরূপ আত্মপ্রত্যক্ষজনিত অথবা ইন্‌টুইটিভ জ্ঞানকে দর্শনের ভিত্তি বলিয়া মনে করা বাঞ্ছনীয় নহে। দার্শনিক জ্ঞান সামাজিক জ্ঞান, সমাজ শরীরের ভিতরেই ইহা পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে, ইহা কেবল-মাত্র ব্যক্তিগত জ্ঞান নহে। দার্শনিক জ্ঞানকে মানবের অভিজ্ঞতার সাহায্যে এবং অনুমানের সাহায্যে প্রমাণিত করা যায়। সুতরাং আমার বক্তব্য এই যে দার্শনিক জ্ঞান সামাজিক জীবনের ফলস্বরূপ। উহা ব্যক্তিগত কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা নহে। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে দার্শনিক জ্ঞান কোন স্বতঃসিদ্ধ চিরন্তন ও অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের জ্ঞান নহে; কারণ জগৎ পরিবর্ত্তনশীল এবং মানব সমাজও যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মানবের অভিজ্ঞতা ইতিহাসের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নব নব ভাবে বিকাশ লাভ করে। সুতরাং কোন সত্যই চিরন্তন নহে, এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবের জ্ঞানেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ইহা হইলেও প্রত্যেক সত্যই কোন কালোপযোগী এবং সেই হিসাবে উহাকে ঐ বিশেষ কালে এবং কোন বিশেষ ঐতিহাসিক

পরিস্থিতির মধ্যে সত্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, মানব-সমাজ পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং মানবের জ্ঞানও পরিবর্ত্তনশীল। তাই যুগে যুগে মানুষের জ্ঞান নব নব রূপে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকের অথবা দার্শনিকের চিন্তাধারা তৎকালীন ব্যবহারিক জীবন ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। আমরা যদি স্থিরভাবে চিন্তাধারার গতি অনুধাবন করি তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের চিন্তাধারা উক্ত রাষ্ট্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সামাজিক জীবনের উপর নির্ভরশীল। তদ্‌ব্যতীত আরও আমরা দেখিতে পাই যে মানব সমাজে শ্রেণী-বিভাগের ফলে ধনিকের ও শ্রমিকের চিন্তাধারার বৈষম্য বর্ত্তমান। তাই সাম্যবাদী দর্শনের ভাবধারার সঙ্গে ধনতান্ত্রিক দর্শনের বৈষম্য সুস্পষ্ট। কায়েমী স্বার্থ কোন বিশেষ সমাজ ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য বিজ্ঞানের, দর্শনের ও ধর্ম্মের সাহায্য লইয়া থাকে, এবং অন্য দিকে নিপীড়িত শ্রেণী, চলমান সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী বলিয়া প্রমাণিত করিতে সমভাবে দর্শনের ও বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া থাকে। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে একদল দার্শনিক ভাববাদী এবং তাহারা অচঞ্চল সত্যের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিতে বিশেষ আগ্রহশীল, এবং অপর-দিকে পরিবর্ত্তনই জগতের স্বরূপ ইহা প্রমাণিত করিতে বস্তুবাদী দার্শনিকগণ সমভাবে আগ্রহশীল। সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে বস্তুবাদের সঙ্গে ভাববাদের এবং ধ্রুবসত্যবাদের সহিত অধ্রুবসত্যবাদের দ্বন্দ্ব দর্শনের ইতিহাসে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। হেগেলও তাঁহার ইতিহাস-দর্শনে এক বিশেষ সত্যেরস্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে সমস্ত ইতিহাসের পরিবর্ত্তন অনুধাবন করিলে ইহা স্পষ্ট হয় যে স্থান কাল পাত্র অনুসারে বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্বের ফলে মানব সমাজে নব নব পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং নিম্নস্তরের সমাজব্যবস্থা উচ্চস্তরের সমাজব্যবস্থার মধ্যে সমন্বিত হয়। প্রকৃতির ও মানব ইতিহাসের গতি তাঁহার মতে ডায়েলেক্‌টিক্ অর্থাৎ বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব ও এই দ্বন্দ্বের সমন্বয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ক্রমোন্নতি বলিতে তিনি বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্বের ফলে যে উচ্চতর সমন্বয় ঘটিয়া থাকে সেই সমন্বয়কে বুঝেন। সর্ব্বত্রই এই দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বের সমন্বয় চলিতেছে এবং ইহার ফলে প্রকৃতি, মানবসমাজ ও মানবের চিন্তাধারা নব নব রূপে অভিব্যক্ত হইতেছে। তাই পারিপার্শ্বিক ঘটনার সংঘাতে মানবসমাজ ও রাষ্ট্র নব নব রূপে বিকাশলাভ করিয়াছে। মানবের চিন্তাও দ্বন্দ্বসমন্বয়ের নিয়মানুসারে অসম্পূর্ণ ধারণা হইতে সম্পূর্ণতর ধারণার অভিমুখে অগ্রসর হয়। হেগেল কিন্তু মনে করেন যে অদ্বৈতের ভিতরে সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই স্থলে প্রশ্ন এই যে সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বের যে এক শেষ সমন্বয় আছে, অভিজ্ঞতার সাহায্যে ইহা প্রমাণ করা অসম্ভব। যদি জগতের অভিব্যক্তির মূলে দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে যখন দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব থাকিবে না তখন চলমান জগৎ স্থির

ও নিশ্চল হইয়া যাইবে এবং ইহার ফলে জগতের বিলোপ সাধিত হইবে। যদি অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা প্রকৃতির, মানবসমাজের ও মানব চিন্তাধারার গতি অনুসরণ করি তাহা হইলে আমরা বলিতে বাধ্য যে যতদিন পর্য্যন্ত না জগতের বিলোপ সাধিত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান থাকিবে। এবং নব নব দ্বন্দ্বের সমন্বয়ের ভিতর দিয়া জগৎ অভিব্যক্ত হইবে। আমার এইস্থলে শেষ বক্তব্য এই যে চিন্তাকে কোনরূপেই মানবের কর্ম্মজীবন হইতে অথবা ব্যবহারিক জীবন হইতে বিশ্লিষ্ট করা সম্ভব নহে। মানবের কর্ম্মময় ব্যবহারিক জীবন তাহার চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং এই চিন্তাধারাই আবার মানবের ব্যবহারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। দার্শনিকগণ দর্শনকে ব্যবহারিক জীবন হইতে বিশ্লিষ্ট করিতে গিয়া দর্শনকে মানবজীবন হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন এবং ইহার ফলে দর্শন হইয়াছে সমাজে অভিজাত শ্রেণীর মানসিক বিলাসের বস্তু। দর্শন যে মননশাস্ত্র, এই সম্বন্ধে দ্বিমতের স্থান নাই। কিন্তু এই দর্শন যে মানবের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট এ কথা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। ইহার ফলে দর্শন হইয়া উঠে ন্যায়শাস্ত্রের নিস্ফল সূক্ষ্ম বিচারের লীলাক্ষেত্র। ন্যায়শাস্ত্রের আবশ্যকতা অবশ্যই আছে, কিন্তু ইহা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে আমাদের পারিপার্শ্বিক ঘটনার সাহায্যেই বাস্তব ন্যায়শাস্ত্রের সূত্র রচনা করিতে হইবে, নতুবা এই শাস্ত্র নিস্ফল ও প্রাণহীন হইয়া পড়িবে। মননশাস্ত্রের অথবা দর্শনের উদ্ভব মানবের ব্যবহারিক জীবন হইতে এবং ব্যবহারিক জীবনের সাহায্যেই দার্শনিক সত্যকে প্রমাণিত করিতে হইবে। সেইজন্যই ইহা বলা যাইতে পারে যে দর্শনের লক্ষ্য কেবলমাত্র জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা নহে, ইহার প্রধান সমস্যা হইল জগৎকে কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সমর্থনে আমরা জ্ঞানের উদ্ভব সম্বন্ধে এইস্থলে কিছু আলোচনা করিতে পারি। মানুষের সহজাত সংস্কারই তাহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, এবং এই কর্ম্মপ্রেরণা হইতেই জ্ঞানের উদ্ভব হয়। সেই জন্যই বলা হয় যে জীবনধারণের প্রেরণা হইতেই জ্ঞানের উদ্ভব। জীবের সহজাত সংস্কারের মধ্যে দুইটী প্রধান, এই দুইটী সংস্কারকে আত্মরক্ষার ও বংশরক্ষার সংস্কার বলা যাইতে পারে। আবার এই দুইটীর মধ্যে প্রথমটীই মূলীভূত। প্রত্যেক জীবকেই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে এবং সেই জন্য তাহাকে নানারূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। অন্য জীবের ন্যায় মানবকেও জীবনধারণের জন্য নানারূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয় এবং ইহার ফলে সে নানারূপ জীবনধারণের উপায় উদ্ভাবন করে এবং নানারূপ যন্ত্রের আবিষ্কার করে। প্রথমে মানুষ প্রস্তরাদির দ্বারা যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া খাদ্য-সংগ্রহের ও গৃহ-নির্ম্মাণাদির ব্যবস্থা করিত এবং পরে তাহারা নানারূপ ধাতব পদার্থের সাহায্যে যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া জীবনধারণের ব্যবস্থা সহজতর করে। যান্ত্রিক যুগে অর্থোৎপাদনের

ব্যবস্থা বহুমুখী হইয়াছে এবং নানাবিধ উপায়ে জীবনযাত্রার পথ অধিকতর সুগম করা হইয়াছে। প্রস্তর যুগে মানুষের জীবন ছিল সরল এবং সমাজের গণ্ডী ছিল ক্ষুদ্র, ফলে সেই যুগের চিন্তাধারা ছিল সরল ও সহজ এবং সমাজের চিন্তাধারা দ্বারাই ব্যক্তির চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত হইত; ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। সমাজ ছিল সাম্য-বাদী, ফলে ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র সম্পত্তির অধিকার ছিল না। এই সমাজে জ্ঞানের একটী বিশেষ রূপ ছিল এবং উহা উক্ত সাম্যবাদী সমাজের ব্যবহারিক জীবন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। ধাতুযুগে পূর্ব্বোক্ত সমাজ ব্যবস্থার বহুল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এই যুগের সমাজ ব্যবস্থাকে ক্রমান্বয়ে দাসযুগীয় ও মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক জায়গীরদারী ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। ধাতুযুগের ধনোৎপাদনের ও ধনবণ্টনের ব্যবস্থা দ্বারা তখনকার সামাজিক জীবনে মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইল এবং এই সময়ের বিজ্ঞান ও দর্শন তৎকালীন সামাজিক জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। যান্ত্রিকযুগে সমাজশরীরের এক বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে। নানারূপ যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে ধনোৎপাদনের ও ধনবণ্টনের ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং ইহার ফলে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা ধূলিসাৎ হইয়া যায়। এই যান্ত্রিকযুগের সমাজ-ব্যবস্থাও এই যুগের ধনোৎপাদনের ও ধনবণ্টনের ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রস্তরযুগের ও ধাতুযুগের রাষ্ট্রব্যবস্থা হইতে স্বতন্ত্র। এই যান্ত্রিকযুগের ধনোৎপাদনের ব্যবস্থার ফলে মানব-সমাজ ধনিক ও শ্রমিক এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই যুগের বিজ্ঞান ও দর্শন যুগোপযুক্ত সমাজব্যবস্থা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মানবসমাজে শ্রেণী-বিভাগের ফলে দুই শ্রেণীর দর্শনের উদ্ভব হইয়াছে, এক শ্রেণীর দর্শন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং অপর শ্রেণী সাম্যবাদী। ধনিকদের হাতে প্রধানতঃ রাষ্ট্রপরিচালনার ভার থাকায় এখন পর্য্যন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শনেরই প্রভুত্ব চলিতেছে। হয় ত যুগপরিবর্ত্তনের ফলে পরবর্ত্তী দর্শনের রূপ সাম্যবাদী হইবে। সমাজশরীরে আজ যে দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান ইহার ফলে হয় ত এই দ্বন্দ্বের এক নূতন সমন্বয় ঘটিবে। সমাজজীবনের সহিত যে দর্শনের সম্বন্ধ আন্তরিক ও গভীর এবং যে দর্শন প্রগতিশীল তাহাই ভবিষ্যতে জয়যুক্ত হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে মানবসমাজের যে বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহা দ্বারাই ভবিষ্যতের দার্শনিক চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। আধুনিক ধনতান্ত্রিক অবৈজ্ঞানিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তিতে আজ ফাটল ধরিয়াছে, হয় ত ভবিষ্যতে এই ভিত্তিকে আর সুদৃঢ় রাখা সম্ভব হইবে না। ইহার ফলে যদি মানবের সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে হয় ত সাম্যবাদী-দর্শনই জয়যুক্ত হইবে। মনে হয় যে এই দর্শন আধুনিক সমাজের ব্যবহারিক জীবনধারাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যাচাই করিয়া নিতে সমর্থ হইয়াছে। যে দর্শন সামাজিক ব্যবহারিক জীবনধারা দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষিত হইয়াছে বা হইবে তাহাই সত্য দর্শন।

এখন আমরা দার্শনিক জ্ঞানলাভের উপায় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে পারি। আমি পূর্ব্বেই আভাষ দিয়াছি যে যদিও দার্শনিক জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র, তথাপি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত দার্শনিক জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। দার্শনিক জ্ঞানের ভিত্তি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং বিজ্ঞানসমূহের ভিতরে যে অসামঞ্জস্য আছে তাহা দূর করিয়াই এবং তাহাদের ভিতরে ঐক্য স্থাপন করিয়াই আমরা বিশ্ব সম্বন্ধে দার্শনিক জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভ করিতে যে প্রকার নিরীক্ষণের ও পরীক্ষণের সাহায্য আবশ্যক, দার্শনিক জ্ঞানলাভ করিতেও সমভাবে উহাদের সাহায্য আবশ্যক। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানলাভ করিতেই তিনটী প্রধান প্রমাণের সাহায্য আবশ্যক। এই প্রমাণ তিনটীর নামের সঙ্গে আমরা সকলেই সুপরিচিত। ইহাদের নাম প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ অথবা টেষ্টিমনি। আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতার সাহায্যে অথবা শব্দের বা টেষ্টিমনির সাহায্যে যে জ্ঞানলাভ করি, অনুমান দ্বারা উক্ত জ্ঞানকে আমাদের যাচাই করিয়া লইতে হয়। ন্যায়শাস্ত্র এই তিনরূপ প্রমাণ সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া থাকে। ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা এই প্রবন্ধে আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মানবসমাজের ব্যবহারিক জীবন-যাত্রা হইতে বিশ্লিষ্ট ন্যায়শাস্ত্রের সাহায্যে আমরা জ্ঞানের সত্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান ও শব্দলব্ধ জ্ঞান সন্দেহমুক্ত নহে। প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের সত্য সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে এবং এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। অভিজ্ঞতাই অনুমানের ভিত্তি। অনুমানের প্রতিজ্ঞা সত্য না হইলে, অনুমানের সাহায্যে সত্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। তদ্‌ব্যতীত অনুমানের নিয়ম নির্ভুল হওয়া আবশ্যক। অবশ্য গাণিতিক অনুমানের যে একটী বিশেষ স্থান আছে তাহা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু এই অনুমানলব্ধ জ্ঞানকেও শেষ পর্য্যন্ত অভিজ্ঞতার সাহায্যে যাচাই করিয়া লওয়া আবশ্যক। আমরা প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদির সাহায্যে যে জ্ঞানলাভ করি সেই জ্ঞানকে সন্দেহমুক্ত করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বদাই সামাজিক, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে হইবে; কারণ জ্ঞানের স্বরূপ সামাজিক জীবন-যাত্রার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং ইহা আমাদের সামাজিক জীবনের ফলস্বরূপ। জ্ঞান ও সামাজিক ব্যবহার একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞান ও কর্ম্ম ওতঃপ্রোত-ভাবে সংযুক্ত এবং ইহারা পরস্পরের রূপ ও গতি নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং আমাদের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে ব্যবহারিক জীবনের ও মানব সমাজের অভিজ্ঞতার সাহায্য লওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

পূর্ব্বের আলোচনার সাহায্যে আমরা এখন দর্শনের স্বরূপ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে পারি এবং আমাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমাকে অনেক কথা বলিতে হইয়াছে যাহার উপযুক্ত প্রমাণ দেওয়া সম্ভবপর

হয় নাই। এই ত্রুটি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আয়তনের দিক দিয়া বিচার করিলে অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে আত্মপ্রত্যক্ষজনিত-জ্ঞান দর্শনশাস্ত্রের বহির্ভূত। ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ জ্ঞানের স্থান আছে। দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে দর্শনের ভিত্তি মানব জাতির সমগ্র জীবন। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদির সাহায্যেই দার্শনিক জ্ঞানলাভ করা যায়। কর্ম্ম ব্যতীত জগৎ সত্যের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব এবং তদ্রূপ জ্ঞান ব্যতীত কর্ম্মের স্বরূপ অনুধাবন করা অসম্ভব। মানবের সামাজিক জীবনযাত্রাই জ্ঞানের ভিত্তি। ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টনের ব্যবস্থা দ্বারাই প্রধানতঃ মানবসমাজের রূপ নিয়ন্ত্রিত হয়; কারণ জীবন-ধারণের সমস্যাই জীবনের প্রধান ও আদিম সমস্যা। দর্শনের সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে মানবের সামাজিক জীবনযাত্রার স্বরূপ অবশ্যই অনুধাবন করিতে হইবে। সমাজের বাহিরে ব্যক্তির কোন স্থান নাই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অবান্তর। দর্শন বাস্তবজীবনের সঙ্গে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট; সুতরাং দর্শনকে হইতে হইবে বাস্তববাদী অথবা বস্তুবাদী। সুতরাং দর্শনের লক্ষ্য হইল সুপরীক্ষিত উপায়ে জ্ঞানলাভ করিয়া মানব-সমাজকে পরিপালিত করা। দার্শনিককে স্বপ্নবিলাসী হইলে চলিবে না; তাঁহাকে হইতে হইবে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত কর্ম্মী, তাঁহাকে হইতে হইবে নিষ্কাম ও নিরলস, কারণ লোক সংগ্রহই তাঁহার প্রধান কাজ। এই চলমান জগতে মানব-সমাজও চলমান এবং এই মানব-সমাজকে বাস্তবতর ও উন্নততর জীবনযাপন করিতে সাহায্য করিতে পারেন একমাত্র দার্শনিক। ধনোৎপাদনের ও ধনবণ্টনের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থার উপরই মানবের সুখ দুঃখ প্রধানতঃ নির্ভরশীল। সুতরাং দার্শনিককে সুসংহত চিন্তা দ্বারা স্থির করিতে হইবে যে কি ভাবে ইহা করা সম্ভব। দার্শনিকের লক্ষ্য কেবল শুষ্ক তত্ত্বজ্ঞান নয়, তাঁহাকে স্থির হইতে হইবে যে কি উপায় অবলম্বন করিলে জীবের মঙ্গলের জন্য এই জগতের পরিবর্ত্তনসাধন করা যাইতে পারে।

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশন

১৩৫০ সালের ২রা আশ্বিন (ইং ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিংএ বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এম্.এ., পি-এচ্. ডি., ডি.লিট্., মহাশয় এই অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। এই অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দর্শন পরিষদের সভ্যগণের এক পরিচালনা-সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে পরিষদের কয়েকটি সাধারণ নিয়মের পরিবর্ত্তন করা হয়। সংশোধিত নিয়মাবলী বর্ত্তমান সংখ্যার শেষে মুদ্রিত হইল। তৎপরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্.এ., ডি.লিট্., বার-এ্যাট-ল., মহাশয় পরিষদের পৃষ্ঠপোষক নির্ব্বাচিত হইলেন। ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়কে সভাপতি করিয়া এক নূতন কার্য্যকরী-সমিতি গঠিত হইল। পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক হইলেন শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত, এম্.এ., এবং শ্রীজ্যোতিশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ., 'দর্শন'-পত্রিকা-সম্পাদনের ভার একটি সম্পাদকীয় সমিতির উপর ন্যস্ত হইল। ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্.এ., পি.এচ্.ডি. প্রধান সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ রহিলেন। পরিষদের সহকারী সভাপতিগণ, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ ও সম্পাদকীয় সমিতির অন্যান্য সভ্যগণের নামের তালিকা অন্যত্র প্রকাশিত হইল। পরিষদের সম্পাদক ডক্টর শ্রীরাসবিহারী দাশের অনুপস্থিতিতে সহকারী সম্পাদক শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের বিগত দুই বৎসরের কার্য্যবিবরণী ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পাঠ করিয়াছিলেন।

পরিচালনা-সভার অধিবেশনের পর অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় 'দর্শনের স্বরূপ'-সম্বন্ধে তাঁহার উদ্বোধন-বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতা অন্যত্র প্রকাশিত হইল। পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় 'মায়াবাদ'-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাহার পর কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হয়।

সর্ব্বশেষে সহকারী সম্পাদক শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের পক্ষ হইতে পরিষদকে যাঁহারা নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুই বৎসর পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ পরিষদের কোনও অধিবেশনে যোগ দিতে না পারিলেও বিবিধ সুপরামর্শদানে তিনি নানাভাবে পরিষদের যে মহোপকার করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিষদের পৃষ্ঠপোষক হইতে সম্মত হওয়ায় তাঁহাকে পরিষদের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করা হয়। অতঃপর ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তর সভার কার্য্য শেষ হয়।

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ

(১৩৪৮ ও ১৩৪৯ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব)

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের ১৩৪৮ ও ১৩৪৯ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। যাঁহারা পরিষদকে নানাভাবে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নামের তালিকা স্থানাভাববশতঃ এই সংখ্যায় দিতে পারিলাম না বলিয়া আমরা দুঃখিত। পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আয়		ব্যয়	
১। সভ্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত চাঁদা (১৩৪৮ ও ১৩৪৯ সাল)—	৯৫৯৲	১। ছয় সংখ্যা পত্রিকা (১৩৪৮-১৩৪৯) ছাপাইবার খরচ (কাগজ সমেত)—	৮৩৯৶/১০
২। বিজ্ঞাপনের মূল্য বাবদ—	৫০৲	২। ডাকটিকিট—	৮৪৷/১৫
৩। পত্রিকা নগদ বিক্রয়—	২৩৷/০	৩। ট্রাম ও বাস ভাড়া—	৩২৸১৫
৪। ডাঃ শ্রীধীরেন্দ্রমোহন দত্তের নিকট হইতে প্রাপ্ত এককালীন দান—	৯৪৲	৪। বিজ্ঞপ্তিপত্র ছাপাইবার খরচ—	৬৸০
		৫। পত্রিকার প্যাকিং—	৩৸০
		৬। কোর্টে নামজারি লইবার খরচ—	২৲
		৭। চিঠির কাগজ, খাম ইত্যাদি ছাপাইবার খরচ (কাগজ সমেত)—	১৬৷৵০
		৮। ফাইল, খাতা, কাগজ, আঠা ইত্যাদি—	২৸/৫
মোট—	১১২৬৷/০	মোট—	৯৮৭৸৶/৫

মোট আয়- -১১২৬৷/০

মোট ব্যয়- -৯৮৭৸৶/৫

উদ্বৃত্ত—— ১৩৮৷/১৫

কোষাধ্যক্ষ
শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যুগ্ম-সম্পাদক
শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
চন্দ্র গুপ্ত

ভারতীয় দর্শন মহাসভা

(INDIAN PHILOSOPHICAL CONGRESS)

(অষ্টাদশ অধিবেশন)

বিগত ডিসেম্বর মাসের ২০শে, ২১শে, ২২শে এবং ২৩শে লাহোরে ভারতীয় দর্শন মহাসভার অষ্টাদশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে মূল সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পি. এন্. শ্রীনিবাসাচারী। বিভিন্ন শাখার সভাপতিদের নাম যথাক্রমে (১) ভারতীয় দর্শন শাখা—মিঃ এচ্. এন্. রাঘবেন্দ্রাচার (মহীশূর), (২) তর্ক ও তত্ত্ববিজ্ঞান শাখা—ডাঃ জে. এন্. চাব্ (বোম্বাই), (৩) মনস্তত্ত্ব শাখা—অধ্যাপক শ্রীশম্ভুনাথ রায় (পাটনা), (৪) মুস্লিমদর্শন শাখা—মিঃ এম্. উমারুদ্দিন (আলিগড়)। নীতিবিজ্ঞান শাখার সভাপতি মিঃ পি. এম্. ভবানি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। পঞ্জাবের অর্থসচিব স্যার মনোহরলাল মহাসভার উদ্বোধন করেন। প্রিন্সিপ্যাল জি. সি. চ্যাটার্জ্জী মহাশয় সমবেত প্রতিনিধিগণ ও ভদ্রমণ্ডলীকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া এক বক্তৃতা করেন। ডাঃ টি. এম্. মহাদেবনের প্রস্তাবক্রমে অধ্যাপক শ্রীযুত পি. এন্. শ্রীনিবাসাচারী মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণে তিনি আধুনিক দর্শনের বিভিন্ন শাখায় চিন্তাধারার গতি- ও প্রকৃতি-সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং সমন্বয়বাদের ভিত্তিতে তাহাদের ভবিষ্য পরিণতি কি ভাবে হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করেন। ২১শে এবং ২৩শে মহাসভার বিভিন্ন শাখার অধিবেশন হয় এবং নানাবিষয়ে প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা হয়। তাহা ছাড়া দুইদিন দুইটি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিষয় লইয়া সাধারণ সভায় আলোচনা হইয়াছিল—(১) "দর্শনশাস্ত্রের নিজস্ব কোনও জ্ঞানলাভের পদ্ধতি আছে কি না?" (২) "সৌন্দর্য্য বিষয়গত অথবা জ্ঞানগত?" অধ্যাপক এ. আর. ওয়াদিয়া, অধ্যাপক খোজা আবদুল হামিদ, অধ্যাপক শ্রীনিবাসাচারী এবং ডাঃ বি. এল্. আত্রেয় জনসাধারণের জন্য বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বক্তৃতার বিষয় ছিল যথাক্রমে (১) সমাজতত্ত্ব-দর্শনের ব্যবহারিক রূপ, (২) স্রষ্টা কবি ইক্বাল, (৩) ভারতের আত্মা, (৪) দর্শনশাস্ত্রের সহিত মনোবিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণার সম্বন্ধ।

২৩শে ডিসেম্বর অধ্যাপক এ. আর. ওয়াদিয়া মহাশয়ের সভাপতিত্বে মহাসভার এক সাধারণ অধিবেশন হয়। ইহাতে মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও কৃতী সেবক শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ শাস্ত্রী ও একজন বিশিষ্ট সভ্য শ্রীযুক্ত ই. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অধ্যাপক শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে এইরূপ স্থির করা হয় যে প্রত্যেক বৎসর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের মধ্যে কোনও দার্শনিক বিষয়ে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইবে এবং এই প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকারীকে একটি যোগ্য পুরস্কার দেওয়া হইবে। কার্য্যকরী সমিতি যাহাতে এই উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ করেন তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৪৪ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত মহাসভার নিম্নলিখিত কর্ম্মকর্ত্তাগণ নির্ব্বাচিত হইলেন:—

কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি—অধ্যাপক এ. আর. ওয়াদিয়া।

যুগ্মসম্পাদক—অধ্যাপক এম্. আস্লাম এবং ডাঃ টি. এম্. পি. মহাদেবন্।

সহকারী সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই বৎসর ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে লক্ষ্ণৌতে অধ্যাপক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে মহাসভার পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে। নিম্নলিখিত দুইটি বিষয়ে আলোচনা হইবে বলিয়া স্থির হয় :—

(১) আত্মা এক না বহু ?

(২) চিরন্তন শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি কি ?

পরলোকগত অধ্যাপক এস্. এস্. সূর্য্যনারায়ণ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা

অধ্যাপক ডাঃ এস্. রাধাকৃষ্ণন্, অধ্যাপক এ. আর. ওয়াদিয়া এবং অধ্যাপক পি. এন্. শ্রীনিবাসাচারী ভারতীয় দর্শন মহাসভার সদস্য ও দর্শনানুরাগী ব্যক্তিদের উদ্দেশে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি আবেদন প্রচার করিয়াছেন :—

"মহাশয়, পরলোকগত শ্রীসূর্য্যনারায়ণ শাস্ত্রী, এম্.এ., বি.এস্.সি. (অক্সফোর্ড), বার.-এ্যাট-ল., মহাশয় ১৯৩১ সালে ভারতীয় দর্শন মহাসভার অন্যতম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং প্রায় একাদশ বৎসর সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যাঁহারাই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার কার্য্যদক্ষতা, আন্তরিকতা ও সৌজন্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। ১৯৪২ সালের ৯ই ডিসেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (রীডার) ছিলেন এবং শিক্ষকতাকার্য্যে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সম্পাদনা-কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, বিচারশক্তি, ও দর্শনানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার অকালমৃত্যুতে দর্শনশাস্ত্রের একজন অক্লান্তকর্ম্মা সেবক অন্তর্হিত হইলেন।

১৯৪৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর লাহোরে ভারতীয় দর্শন মহাসভার একটি সাধারণ অধিবেশনে অধ্যাপক শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই অর্থ হইতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের মধ্যে কোনও দার্শনিক বিষয়ে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইবে এবং এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারীকে একটি যোগ্য পুরস্কার দেওয়া হইবে।

দর্শন মহাসভার নির্দ্দেশে আমরা আপনাকে সূর্য্যনারায়ণ শাস্ত্রী স্মৃতিভাণ্ডারে মুক্তহস্তে দান করিতে অনুরোধ করিতেছি। যথোপযুক্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইলে অন্যূন দুই হাজার পাঁচ শত টাকার প্রয়োজন। আমরা আশা করি এই অর্থ সংগৃহীত হইবে। সম্ভব হইলে এই অর্থ হইতে পরলোকগত অধ্যাপক মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ একটি পুস্তক প্রকাশ করা হইবে।

আপনার বন্ধুবর্গ ও পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহারা এ বিষয়ে অনুরাগী তাঁহাদের নাম আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব।

Dr. T. M. P. Mahadevan, *Secretary*, Indian Philosophical Congress, Department of Indian Philosophy, University of Madras, Triplicane P.O. Madras.

এই ঠিকানায় অর্থ পাঠাইতে হইবে। সমস্ত দানেরই যথারীতি প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।"

বঙ্গীয় দর্শন-পরিষদের মূল নিয়মাবলী

নাম—

১। এই পরিষদটি "বঙ্গীয় দর্শন-পরিষদ্‌" নামে অভিহিত হইবে।

উদ্দেশ্য—

২। বাঙ্‌লা ভাষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের বিচারমূলক আলোচনা, তদ্বিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ এবং এতদনুরূপ উপায়ে বাঙ্‌লা ভাষায় দার্শনিক চিন্তার প্রসার এই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সভ্য—

৩। এই পরিষদে পৃষ্ঠপোষক, বিশেষ ও সাধারণ এই তিন প্রকার সভ্য গৃহীত হইবে।

৪। পৃষ্ঠপোষক, বিশেষ ও সাধারণ সভ্যের বাৎসরিক চাঁদার হার যথাক্রমে ২৫৲ (পঁচিশ টাকা), ১০৲ (দশ টাকা) ও ৪৲ (চারি টাকা)। ইহারা পরিষদের মুখপত্র বিনামূল্যে এবং পরিষদ্‌ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাদি কম মূল্যে পাইবেন।

৫। বিশেষ ও সাধারণ সভ্যদের পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য ও সভাপতি ইত্যাদি নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হইবার এবং ভোট দিবার অধিকার থাকিবে।

৬। সকল প্রকার সভ্যেরই প্রথম সভ্য হইবার সময়ে পরিষদের আবেদনপত্র স্বহস্তে যথাযথভাবে পূর্ণ করিয়া সম্পাদকের নিকট দিতে হইবে।

৭। ১লা বৈশাখ হইতে পরিষদের বৎসর গণনা করা হইবে। পরিষদের সভ্যপদ ছাড়িয়া দিতে চাহিলে বৎসর আরম্ভ হইবার অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে পরিষদ্‌-সম্পাদককে লিখিয়া জানাইতে হইবে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি—

৮। পরিষদের কার্য্যাবলী ইহার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণ প্রতি বৎসর পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভ্যগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

৯। বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে উক্ত সমিতিই নূতন সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন।

১০। এই সমিতিতে সভাপতি, পরিষদ্‌-সম্পাদক, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সহ-সম্পাদক পদবলে সদস্য থাকিবেন। ইহারা প্রত্যেকেই এবং অন্যান্য সদস্য প্রতিবৎসর পরিষদের সাধারণ বাৎসরিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত হইবেন। এই সমিতি হইতেই ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন। এই সমিতিই পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব-পরীক্ষক নিযুক্ত করিবে।

১১। এই সমিতির অধিবেশনে চারিজন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই সভার কার্য্য চলিতে পারিবে।

১২। প্রয়োজন অনুসারে এই সমিতির অতিরিক্ত সদস্য-নির্ব্বাচনের অধিকার থাকিবে।

অধিবেশন ও সভা—

১৩। প্রতিবৎসর নিয়মিতভাবে কলিকাতায় ও ইহার সহরতলীতে বিভিন্নস্থানে পরিষদের অধিবেশন হইবে। উক্ত অধিবেশনসমূহে বাঙ্‌লাভাষায় দার্শনিক প্রবন্ধাদি পাঠ ও তাহার আলোচনা এবং দর্শন-সম্বন্ধীয় বক্তৃতাদি হইবে।

১৪। এতদ্ব্যতীত বৎসরের প্রথমে পরিষদের সাধারণ বাৎসরিক অধিবেশন হইবে। এই বাৎসরিক অধিবেশনে একাধিক সভার অনুষ্ঠান হইবে। এই সকল সভায় সভ্যগণ-কর্ত্তৃক দার্শনিক বিচার (Symposium), প্রবন্ধ-পাঠ ও তৎসম্বন্ধীয় আলোচনা প্রভৃতি হইবে।

১৫। সাধারণ বাৎসরিক অধিবেশনের স্থান ও কাল কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি ঠিক করিবে। সাধারণতঃ এই অধিবেশন প্রতিবৎসর বৈশাখের প্রথমাংশে হইবে।

১৬। এতদ্ব্যতীত পরিষদের অন্যূন ১০ জন সভ্য বিশেষ কারণ দেখাইয়া লিখিয়া সম্পাদককে অনুরোধ করিলে তিনি পরিষদের সাধারণ অধিবেশন বৎসরের অন্য সময়েও আহ্বান করিতে পারেন।

১৭। বাৎসরিক অধিবেশনের একটী সভা 'পরিচালনা সভা' (Business meeting) বলিয়া অভিহিত হইবে। ঐ সভায় পরিষদের পরিচালনা-সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ আলোচিত ও নির্দ্ধারিত হইবে; যথা:—(ক) পরিষদ্-সম্পাদক-কর্ত্তৃক বিগত বৎসরের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী-পাঠ; (খ) কোষাধ্যক্ষ-কর্ত্তৃক আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব পাঠ; (গ) নূতন বৎসরের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি-গঠন; (ঘ) নূতন বৎসরের জন্য পরিষদের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও পত্রিকা-সম্পাদক-নির্ব্বাচন; (ঙ) বিবিধ।

১৮। সম্পাদক অথবা সহ-সম্পাদক পরিষদের প্রত্যেক অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে এবং বাৎসরিক অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি অন্ততঃ ৭ দিন পূর্ব্বে প্রত্যেক সভ্যকে লিখিয়া জানাইবেন; এবং পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত ও সঙ্কলিত পুস্তকাদির সংবাদ সভ্যদের জানাইবেন।

১৯। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি এবং সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সহ-সম্পাদক পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

২০। পরিষদের গঠনতন্ত্রের নিয়মাবলীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিতে হইলে তৎসম্বন্ধীয় প্রস্তাব সাধারণ বাৎসরিক অধিবেশনের অন্ততঃ ছয় মাস পূর্ব্বে পরিষদ্-সম্পাদককে লিখিয়া জানাইতে হইবে; এবং পরিষদ্-সম্পাদক ঐ প্রস্তাব পরিষদের সকল প্রকার সভ্যকে অধিবেশনের অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে লিখিয়া জানাইবেন। এইরূপ প্রস্তাব উপস্থিত সভ্যগণের অন্যূন ত্রিচতুর্থাংশ-সংখ্যক সভ্যের সম্মতি ব্যতীত মঞ্জুর হইবে না।

মুখপত্র—

২১। 'দর্শন' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা পরিষদের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হইবে। এই পত্রিকায় কেবলমাত্র দর্শন-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি মুদ্রিত হইবে।

২২। পত্রিকা-সম্পাদনের জন্য একজন সম্পাদক অথবা একটী সম্পাদকীয় সমিতি (Editorial Board) নিযুক্ত থাকিবে এবং এই সম্পাদক অথবা সম্পাদকীয় সমিতির সদস্যগণ প্রতিবৎসর কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

২৩। এই সম্পাদকীয় সমিতি পরিষদের মুদ্রণ ও সঙ্কলন ব্যাপারে যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিবেন।

দর্শনের নিয়মাবলী—

২৪। 'দর্শন' প্রতিবৎসর বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক ও মাঘ এই চারি মাসে যথাক্রমে চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে—সাধারণতঃ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

২৫। দর্শন-পত্রিকার বৎসর পরিষদের বৎসরের ন্যায় বৈশাখ হইতে গণনা করা হইবে। যিনি যে বৎসরের জন্য গ্রাহক হইবেন বা পরিষদের সভ্য (বিশেষ বা সাধারণ) থাকিবেন তিনি সেই বৎসরের পত্রিকা পাইবেন।

২৬। 'দর্শনে'র বাৎসরিক মূল্য—ডাকমাশুলসহ ৪৲ (চারি টাকা); প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ (এক টাকা)।

২৭। 'দর্শনে'র বাৎসরিক গ্রাহক হইতে হইলে ইহার বাৎসরিক মূল্য (চারি টাকা) অগ্রিম দিতে হইবে। কোন সংখ্যা পৃথক্‌ভাবে কিনিলে ডাকমাশুলের ব্যয় গ্রাহক বহন করিবেন। পত্রিকা-সম্পাদককে লিখিলে ভি. পি. ডাক-যোগে পত্রিকা পাঠান হইবে।

২৮। 'দর্শনে'র পুরাতন সংখ্যা সম্ভব হইলে যথামূল্যে পাওয়া যাইবে।

২৯। 'দর্শনে'র প্রবন্ধ-সমূহ যথাসম্ভব পরিষদের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ-সমূহ হইতে সংগৃহীত হইবে এবং সাধারণতঃ পরিষদের সভ্যগণ-কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধাদি দর্শনে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু পত্রিকা-সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে—অর্থাৎ পরিষদের সভ্য নহেন এমন ব্যক্তির প্রবন্ধও প্রকাশিত হইতে পারে।

৩০। 'দর্শনে' প্রবন্ধ ছাপাইতে হইলে লেখক পরিষ্কার হস্তাক্ষরে অথবা মুদ্রিত অক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় উহা লিখিয়া পত্রিকা-সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

৩১। প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনে পত্রিকা-সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে। প্রত্যাখ্যাত প্রবন্ধ ডাক টিকিট না পাঠাইলে লেখককে ফেরত পাঠান হইবে না।

৩২। 'দর্শনে' কেবল সম্পাদকীয়-সমিতি-কর্তৃক অনুমোদিত বিজ্ঞাপন ছাপান হইবে। বিজ্ঞাপনের চাঁদার হার ঐ সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে স্থিরীকৃত হইবে।

সঙ্কলন—

৩৩। পরিষদ্ হইতে বাঙ্‌লাভাষায় লিখিত দার্শনিক পুস্তকাদি প্রকাশিত ও সঙ্কলিত হইবে। গ্রন্থকারের সহিত পরামর্শ করিয়া সম্পাদকীয়-সমিতি এই সকল সঙ্কলিত ও প্রকাশিত পুস্তকাদির মূল্য পরিষদের সভ্যদের জন্য যথারীতি ধার্য্য করিয়া দিবেন।

৩৪। আবশ্যকতা অনুসারে সম্পাদকীয়-সমিতির পরিষদের মুদ্রণ ও সঙ্কলন-সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিবার অধিকার থাকিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পরিষদ্-কার্য্যালয়—১২নং বিপিন পাল রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।

কোষাধ্যক্ষের ঠিকানা :—৫৯ বি, হিন্দুস্থান পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

বঙ্গীয় দর্শন-পরিষদের ১৩৫০ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণের নামের তালিকা

পৃষ্ঠপোষক— ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম.এ., ডি.লিট., বার-এ্যাট্-ল

সভাপতি— ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এম.এ., পি-এইচ. ডি., ডি. ফিল., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সহকারী সভাপতি—(১) ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার মৈত্র, এম.এ., পি-এইচ.ডি., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(৩) অধ্যাপক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য, এম.এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(৪) ডক্টর শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম.এ., পি-এইচ. ডি., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম সম্পাদক— { অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ., আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা
অধ্যাপক শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত, এম.এ., পি.আর. এস., রিপন কলেজ, কলিকাতা

কোষাধ্যক্ষ— ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম.এ., পি-এইচ.ডি., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যান্য সদস্য

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত আশুতোষ অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

২। অধ্যাপক শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, এম এ. (অবসরপ্রাপ্ত)

৩। অধ্যাপক শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ, এম এ. (অবসরপ্রাপ্ত)

৪। ডক্টর শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার, এম.এ., পি-এইচ. ডি. (অবসরপ্রাপ্ত)

৫। ডক্টর শ্রীরাসবিহারী দাস, এম.এ., পি-এইচ. ডি., অধ্যাপক, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ফিলজফি, অমলনের, বোম্বাই

৬। ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, এম.এ., পি-এইচ. ডি., অধ্যাপক, পাটনা কলেজ, পাটনা

৭। ডক্টর শ্রীসরোজকুমার দাস, এম.এ., পি-এইচ. ডি., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৮। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, এম.এ. (অক্সন্), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৯। ডক্টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, এম.এ., পি-এইচ. ডি., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১০। ডক্টর শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম, এম.এ., পি-এইচ. ডি., অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা

১১। ডক্টর শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র, এম.এ., পি-এইচ. ডি., কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়

১২। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম.এ., পি-এইচ. ডি., অধ্যাপক, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়

১৩। অধ্যাপক শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম.এ., এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়

১৪। অধ্যাপক শ্রীনিশিকান্ত সেন, এম.এ., দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

১৫। ডক্টর শ্রীযদুনাথ সিংহ, এম.এ., পি-এইচ. ডি., অধ্যাপক, মীরাট কলেজ, মীরাট

১৬। ডক্টর শ্রীশৈলেশ্বর সেন, এম.এ., পি-এইচ. ডি., অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ালটায়ার, মাদ্রাজ

১৭। অধ্যক্ষ শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন, বি.এস-সি., এম. এড. (লীডস্), এফ্. আর. জি. এস., কৃষ্ণনগর কলেজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

১৮। অধ্যাপক শ্রীরণদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, এম.এ. (সহকারী অধ্যক্ষ, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া)

১৯। অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার দে, এম.এ., স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ, কলিকাতা

২০। অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য, এম.এ., বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা

২১। অধ্যাপক শ্রীঅবনীমোহন রায়, এম.এ., সিটি কলেজ, কলিকাতা

২২। অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, এম.এ., বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা
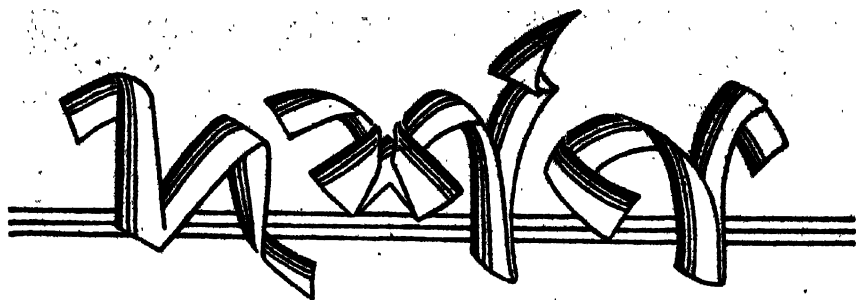
বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

মূল্য ২৲ বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুল সহ) ৪৲

দর্শন কার্য্যালয় :—১২ নং বিপিন পাল রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা

'দর্শন' পত্রিকার কয়েকটি নিয়ম

১। 'দর্শন' পত্রিকার বৎসর পরিষদের বৎসরের ন্যায় বৈশাখ হইতে গণনা করা হইবে। যিনি যে বৎসরের জন্য গ্রাহক হইবেন বা পরিষদের সভ্য (বিশেষ বা সাধারণ) থাকিবেন তিনি সেই বৎসরের পত্রিকা পাইবেন।

২। 'দর্শনে'র বাৎসরিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ) ৪৲ (চারি টাকা); প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ (এক টাকা)।

৩। 'দর্শনে'র বাৎসরিক গ্রাহক হইতে হইলে ইহার বাৎসরিক মূল্য (চারি টাকা) অগ্রিম দিতে হইবে। তাহা না দিয়া কেহ কোন সংখ্যা কিনিলে ডাকমাশুল-ব্যয় তিনি বহন করিবেন। পত্রিকা-সম্পাদককে লিখিলে ভি. পি. ডাক-যোগে পত্রিকা পাঠান হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—বঙ্গীয় দর্শন পরিষৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিতে হইবে:—

শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ.
১২, বিপিন পাল রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।

নীতিবিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত, এম. এ.

নৈতিকবোধের স্বরূপ

১। নৈতিকবোধের উপাদান—চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষবিচার, সদসদাচরণের ভেদজ্ঞান ও তৎসম্বন্ধে নিন্দাপ্রশংসা, মন্দকর্ম্ম করিয়া অনুতাপ এবং সৎকার্য্যের ফলে আত্মতৃপ্তি, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও দায়িত্ববোধ প্রভৃতি যাবতীয় নৈতিক মনোভাবকে আমরা নৈতিকবোধ এই সাধারণ নামে অভিহিত করিতে পারি। এক কথায় বলিতে গেলে চরিত্র বা আচরণের দোষগুণ-সম্বন্ধে বোধ বা চেতনাই নৈতিক বোধ। এই বোধ অন্য সকল প্রকার বোধ হইতে স্বতন্ত্র এক বিশিষ্টধরণের বোধ। ইহা এক মৌলিক অনুভূতি। ইহা বস্তুতঃ অবিভাজ্য হইলেও নৈয়ায়িক বিশ্লেষণের অযোগ্য নহে। একটী সমতল ক্ষেত্রকে ভাঙ্গিয়া তাহার দৈর্ঘ্য হইতে প্রস্থকে পৃথক্ করা যায় না সত্য, তথাপি সমতল ক্ষেত্রের এই দুইটী ধর্ম্মকে পৃথক্ করিয়া দেখা মোটেই অসম্ভব নহে। বরং সমতল ক্ষেত্রকে বুঝিতে হইলে উহার এই দুইটী দিক পৃথক্ করিয়া দেখাই আবশ্যক। তদ্রূপ নৈতিকবোধের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে উহার বিভিন্ন দিকগুলি পৃথক্ করিয়া দেখা বা উহার বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। নৈতিকবোধের বিশ্লেষণ করিলে আমরা উহার ত্রিবিধ উপাদান দেখিতে পাই:—(ক) জ্ঞানাত্মক উপাদান, (খ) বেদনাত্মক উপাদান ও (গ) বাসনাত্মক উপাদান। অর্থাৎ এই বোধের মধ্যে আছে একটা জানার দিক, একটা হৃদয়ানুভূতির দিক ও একটা ইচ্ছার দিক।

নৈতিকবোধের ত্রিবিধ উপাদান—জ্ঞানাত্মক, বেদনাত্মক ও বাসনাত্মক।

(ক) জ্ঞানাত্মক উপাদান—নৈতিকবোধের জানার দিকে প্রথমেই দেখিতে পাই, ইহাতে আছে কোন্ আচরণ ভাল, কোন্ আচরণ মন্দ এই বিষয়ে জ্ঞান। ক্ষুধিতকে অন্নদান, পীড়িতকে ঔষধদান, মূর্খকে বিদ্যাদান, সত্যভাষণ, ক্রোধদমন, লোভবর্জ্জন, ইন্দ্রিয়-সংযম এই সকল কাজ ভাল, এইরূপ জ্ঞান নৈতিকবোধের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে দুর্ব্বলকে পীড়া দেওয়া, চুরি করা, মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, ভোগবিলাসে গা ঢালিয়া দেওয়া এই সকল আচরণ মন্দ ইহা জানাও

জ্ঞানাত্মক উপাদানে পাই :- (১) আচরণ-বিশেষের ভাল-মন্দ-জ্ঞান,

নৈতিকবোধের অঙ্গ।

কিন্তু নীতিজ্ঞান কেবল বিশেষ বিশেষ আচরণ ভাল কি মন্দ ইহা জানাই নয়, ইহা প্রধানতঃ ভাল-মন্দ-সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়মের জ্ঞান। রাম শ্যামের টাকা চুরি করিয়াছে, এই কাজটী অন্যায় হইয়াছে ইহা জানা বা হরি দুর্ভিক্ষের সময়ে বহু দুঃস্থলোককে অন্নদান করিয়াছে, তাহার এই আচরণটী প্রশংসনীয় ইহা অবগত হওয়া নীতিজ্ঞান সন্দেহ নাই। কিন্তু নীতিজ্ঞান মুখ্যতঃ কতকগুলি সার্ব্বজনীন শাশ্বত চারিত্রিক বিধির জ্ঞান। এমন কতকগুলি সর্ব্ববাদিসম্মত নিয়ম বা নীতি আছে যাহাদ্বারা সকলকালের সকলদেশের সজ্জনগণ নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন, যাহা দ্বারা তাঁহাদের চরিত্র বা আচরণ নীত বা নিয়মিত হইয়া থাকে। জাগ্রত ও কর্ষিত নৈতিকবোধ এই সকল নিয়ম বা নীতি-সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত থাকিবে। এস্থলে এরূপ গুটিকতক নিয়মের উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(২) নৈতিকবিধিসমূহের জ্ঞান,

(১) সদা সত্যকথা বলা উচিত।

(২) পরের দ্রব্য অপহরণ করা অনুচিত।

(৩) জীবহিংসা করা উচিত নহে।

(৪) পরোপকার করা কর্ত্তব্য।

(৫) পরপীড়ন সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

আবার নৈতিক বিধিসমূহের জ্ঞানই নীতিজ্ঞানের চরম সীমা নির্দ্দেশ করে না। বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রচলিত বিধি লঙ্ঘন করাই আমাদের কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। সুধীজনের মার্জ্জিত বিবেক উহাই অনুমোদন করে। মহাভারতে * একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন. যে তাঁহাকে গাণ্ডীব ত্যাগ করিতে বলিবে তিনি তাহার শিরশ্ছেদ করিবেন। একদিন দৈবক্রমে উত্তেজনার মুখে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। সত্য বটে ধর্ম্মরাজ তাঁহার প্রাণতুল্য জ্যেষ্ঠসহোদর, কিন্তু সত্যনিষ্ঠা ক্ষত্রিয়ের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। সুতরাং অর্জ্জুন সেই মুহূর্ত্তে একটা কাণ্ড করিয়া বসিতেন সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন, তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "তুমি যাহাকে সত্য বল তাহা সত্য নয়, এ বিষয়ে একটা গল্প শোন। এক পথিক দস্যুর হাতে পড়িয়া দৌড়িয়া পলাইতেছিল। দস্যু খানিকটা পিছনে পড়িয়া যাওয়াতে উহাকে দেখিতে না পাইয়া পথে একটী তাপস ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করিল। সেই ব্রাহ্মণ ছিলেন সত্যব্রতী, তিনি পলায়মান পথিককে দেখিয়াছিলেন এবং সত্যের অনুরোধে দস্যুকে বিপন্ন পথিকের সন্ধান দিয়া তাহার বধের হেতু হইলেন। এই তথাকথিত সত্যনিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণ নিরয়গামী হইলেন।" অর্জ্জুনের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, তিনি নিরস্ত হইলেন। সুতরাং "সদা সত্য কহিবে" এই সাধারণ বিধি সর্ব্বত্র প্রযোজ্য নহে। স্থলবিশেষে ইহা মহত্তর নৈতিক কল্যাণের পরিপন্থীও হইতে পারে, তখনই উহা পরিত্যাজ্য। বিধিনিষেধের উপযোগিতা আপেক্ষিক। মহত্তর কল্যাণের উপায়স্বরূপ বলিয়াই বিধির আদর, কদাচ তাহার অন্তরায় হইলেই বিধি বর্জ্জনীয়। এরূপ ব্যতিক্রমের ক্ষেত্র বিরল হইলেও তাহার একান্ত অভাব নাই। অতএব প্রশ্ন উঠে, মানবের চরম কল্যাণ কি?

(৩) নৈতিক বিচার ও চরম লক্ষ্যের জ্ঞান।

* মূল মহাভারত, কর্ণপর্ব্ব।

বা তাহার পরম পুরুষার্থ কি? অথবা মানুষের আচরণের চরম লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? উত্তর বহুবিধ। কেহ বলেন, উহা সুখ; কেহ বলেন, উহা পূর্ণতা; কেহ বা বলেন অন্য কিছু। এই বিচারও নৈতিকজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। পরিপুষ্ট সমুন্নত নৈতিক দৃষ্টি বিধিজ্ঞানের উর্দ্ধে প্রসারিত। কথিত নৈতিকবোধ চরম কল্যাণের সন্ধানে নিরত।

(খ) বেদনাত্মক উপাদান—জানার দিক ছাড়া নৈতিকবোধে একটা হৃদয়ানুভূতির দিকও আছে। দুষ্কর কর্ত্তব্যসম্পাদনে এক প্রকার আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। অন্যকে উহা করিতে দেখিলেও আমরা প্রশংসামুখর হইয়া উঠি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক প্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পিতৃঋণ শোধ করিয়াছিলেন। উত্তমর্ণগণের আইনগত দাবী ছিল না, কিন্তু তাঁহার জাগ্রত বিবেকের দাবী মিটাইবার জন্য তিনি ভোগৈশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিলেন। এই কাহিনী শ্রবণে আমাদের প্রশংসোন্মুখ ও শ্রদ্ধান্বিত হৃদয় স্বতঃই উচ্ছ্সিত হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমাদের হৃদয় অনুশোচনার ভারাক্রান্ত হয়। অন্যের দুষ্কার্য্য দর্শন করিলেও আমরা নিন্দা করি, ক্লেশানুভব করি ও ঘৃণাবোধ করি। ঐতিহাসিক তৈমুরলঙ্গ ও চাঙ্গিস্ খাঁ বা আধুনিক যুদ্ধরত রাষ্ট্রনেতাদের ও তদনুচরবর্গের নৃশংসতার কাহিনী শ্রবণে আমাদের হৃদয় দুঃখে ঘৃণায় ও নিষ্ফলক্রোধে জর্জ্জরিত হয়। এবংবিধ নানাপ্রকার আবেগ বা বেদনা নৈতিকবোধের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

নিন্দাপ্রশংসা, আত্মতুষ্টি ও অনুশোচনা ইত্যাদি।

(গ) বাসনাত্মক উপাদান—জ্ঞান ও বেদনা ব্যতীত ইচ্ছাও নৈতিকবোধের উপাদান। ইচ্ছা বা কর্ম্মপ্রেরণা উহার অন্তর্নিহিত অঙ্গ। নৈতিকবোধ একটা নিষ্ক্রিয় চেতনামাত্র নহে। কর্ম্মের ভালমন্দজ্ঞান ও তজ্জনিত নিন্দাপ্রশংসাদি হৃদয়ানুভূতি সর্ব্বদাই তদনুরূপ বাসনা ও কর্ম্মপ্রেরণা যোগাইয়া থাকে। আমি যে কাজ ভাল বলিয়া জানি এবং যাহার প্রশংসা করি, আবশ্যক হইলে আমি নিজেও স্বেচ্ছায় ঐ কাজ করিব; এবং যে কর্ম্ম নিন্দনীয় বলিয়া জানি উহা সর্ব্বথা বর্জ্জন করিব। সুস্থ নৈতিকবোধের ইহাই নিয়ম। ইহার ব্যতিক্রম দুই কারণে হইতে পারে, কপটতা ও মানসিক বিকৃতি। যদি কেহ প্রকাশ্যসমাজে পুনঃপুনঃ পরস্বাপহরণের নিন্দা করিয়াও সুযোগ পাওয়ামাত্র সরকারী লক্ষ টাকার তহবিলও আত্মসাৎ করিতে ইতস্ততঃ না করে, তবে বুঝিতে হইবে তাহার চৌর্য্যের নিন্দা নিতান্তই মৌখিক ও কৃত্রিম। ইহা অসৎকার্য্য এই জ্ঞান বস্তুতঃ তাহার হয় নাই এবং ইহার প্রতি ধিক্কারও তাহার হৃদয়ে সত্যই জন্মে নাই। সুতরাং উহা বর্জ্জনের ইচ্ছাও হয় নাই। এই স্থলে কপটতাহেতু দৃশ্যতঃ উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেও উহা প্রকৃত ব্যতিক্রম নহে। এক্ষণে আর এক ধরণের ব্যতিক্রমের কথা বলিব। কখনও আমরা দেখিতে পাই যে সবাক্ চলচ্চিত্রের দর্শক অভিনয়ে দরিদ্রের লাঞ্ছনা দেখিয়া অবিরল অশ্রুপাত করিতেছে। কিন্তু রঙ্গালয়ের বাহিরে তাহারই গৃহপার্শ্বে দুঃস্থলোকের আর্ত্তনাদে কর্ণপাতও করিতেছে না। উপন্যাস-পাঠে যে ব্যক্তি নায়ক বা নায়িকার প্রতি অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া ক্রোধে ক্ষোভে জ্বলিতেছে, সংসারক্ষেত্রে হয় ত সেই ব্যক্তি অবিকল সেইরূপ অন্যায় আচরণ অম্লানবদনে করিয়া যাইতেছে। এইরূপ অসামঞ্জস্য নৈতিকবোধের বিকৃতি। বিবেকানুমোদিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান অভ্যাস না করিলে ক্রমে ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল হয় ও কর্ম্মবিমুখ ভাবালুতা প্রশ্রয় পাইয়া চরিত্রকে বিকল করে।

নৈতিক ইচ্ছা ও কর্ম্মপ্রবণতা।

নৈতিকবোধের সার দায়িত্ববোধ, এবং এই দায়িত্ব কর্ম্মসম্বন্ধীয়, ইহাতে কর্ম্মেরই ইঙ্গিত আছে। কর্ম্মবিমুখ নীতিজ্ঞান ও নৈতিক ভাবপ্রবণতা নিতান্তই অর্থহীন ও নিষ্ফল। সুস্থ নৈতিকবোধে জ্ঞান, বেদনা ও কর্ম্মপ্রবণতা বা ইচ্ছা তিন অঙ্গই সুসমঞ্জসভাবে বিদ্যমান।

নৈতিকবোধ মুখ্যতঃ কর্ম্ম-সম্বন্ধে দায়িত্ববোধ।

২। **ভালমন্দ, সঙ্গতাসঙ্গত** * —আমরা এখন নীতিবিজ্ঞানের মূলীভূত কয়েকটী শব্দ বা প্রত্যয়ের অর্থবিচার করিব। ভাল ও মন্দ, সঙ্গত ও অসঙ্গত এই উভয় শব্দযুগল নৈতিকবিচারে এক মুখ্যস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে প্রথম শব্দযুগলের অর্থ অধিকতর ব্যাপক এবং ঐ দুইটী শব্দ অনৈতিক বস্তুর প্রতিও প্রযোজ্য। আমরা শুধু মানুষের সঙ্গত আচরণকেই (যথা পরোপকার করা, সত্যকথা বলা ইত্যাদি) ভাল বলি না, এবং শুধু তাহার অসঙ্গত আচরণকেই (যথা, মিথ্যা বলা, পরপীড়ন করা ইত্যাদি) মন্দ বলি না। পরন্তু আমরা পূর্ণিমা রজনীকে ভাল, অমানিশাকে মন্দ, শরৎকালকে ভাল, বর্ষাঋতুকে মন্দ, মিষ্ট আমকে ভাল, টক আমকে মন্দ, এবং এইরূপ ফল ফুল, খাদ্যপানীয়, বস্ত্র অলঙ্কার ইত্যাদি যাবতীয় বস্তুকে রুচি অনুসারে ভাল কি মন্দ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি। এই শেষোক্ত পর্য্যায়ে যাহা কিছু আমাদের কোনও আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন মিটায় তাহাই ভাল, আর যাহা তাহা করে না তাহাই মন্দ। বলা বাহুল্য এই শেষোক্ত অর্থ অনৈতিক বা নীতিবিজ্ঞানের গণ্ডীবহির্ভূত।

ভালমন্দে'র অর্থ-বিচার।

অপর শব্দ দুইটী, সঙ্গত ও অসঙ্গত সম্পূর্ণরূপে নৈতিকগুণবাচক। মানুষের আচরণ বা কার্য্যের সম্পর্কেই মাত্র এগুলির ব্যবহার হইয়া থাকে। অন্য কোনও অনৈতিক বস্তু বা বিষয়ের সম্পর্কে ইহাদের প্রয়োগ নাই। শুধু তাহাই নহে, নৈতিক গণ্ডীর ভিতরেও 'ভালমন্দ' বা 'সদসৎ' শব্দগুলির অর্থ 'সঙ্গতাসঙ্গত' অপেক্ষা ব্যাপকতর। প্রথমোক্ত শব্দগুলি নৈতিক কর্তা ও কর্ম্ম, স্বভাব ও আচরণ উভয়ের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু শেষোক্ত শব্দযুগল শুধু কর্ম্ম বা আচরণের প্রতিই প্রযোজ্য। আমরা একদিকে ভাললোক,

'সঙ্গতাসঙ্গতে'র অর্থ-বিচার।

* ইংরেজী নীতিবিজ্ঞানের ভাষায় মুখ্য নৈতিক শব্দ—good and bad, right and wrong. ইংরেজী good badএর যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ ভাল মন্দ। উভয় শব্দযুগলের অর্থ সমান ব্যাপক এবং উভয়েরই নৈতিক ও অনৈতিক দ্বিবিধ প্রয়োগ আছে। আবার good শব্দের বিশেষ প্রয়োগ আছে, তখন অর্থ হয় হিত, মঙ্গল বা কল্যাণ এবং তাহার প্রতিযোগী শব্দ হয় evil। চলতি বাংলায় good and evil এর প্রতিশব্দ হিসাবেও ভাল মন্দ বেশ খাটে।

ইংরেজী right and wrongএর প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা 'সঙ্গত' ও 'অসঙ্গত' শব্দদ্বয় ব্যবহার করিলাম। এই বাংলা শব্দদ্বয়ের অনৈতিক প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। কিন্তু উক্ত ইংরেজী শব্দদ্বয় গণিত ইত্যাদিতে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ এই অনৈতিক অর্থেও যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। বৈধ ও অবৈধ প্রায় সমার্থক। তবে বিধি দ্বিবিধ, রাষ্ট্রবিধি ও নৈতিকবিধি। প্রচলিত বাংলায় রাষ্ট্রবিধি বা আইন সম্পর্কে এগুলির ব্যবহার আছে, যথা, অবৈধজনতা। এখানে অবৈধ=বেআইনী, নীতিবিরুদ্ধ নহে। বাংলা সৎ অসৎ শব্দযুগল নিছক নৈতিক অর্থদ্যোতক, সুতরাং দ্ব্যর্থরহিত এবং তন্নিমিত্ত good-bad, ভালমন্দ হইতেও নীতিবিজ্ঞানের অধিকতর উপযোগী। অবশ্য সংস্কৃতদর্শনে এই শব্দদ্বয় অস্তিত্বশীল ও অস্তিত্বহীন এই অনৈতিক, তাত্ত্বিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাংলায় তাহা প্রায় হয় না। আমরা এই বিস্তৃত শব্দবিচার করিলাম শুধু নীতিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য। নতুবা সকল দেশের ভাষায় প্রায় সকল শব্দই একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হয়। প্রয়োগস্থল লক্ষ্য করিলে আর অর্থসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। অতএব আমরা শুধু এইটুকু স্মরণ রাখিয়া উল্লিখিত যে কোনও শব্দ আবশ্যকমত ব্যবহার করিতে পারি।

মন্দলোক, সজ্জন, অসজ্জন, সৎস্বভাব, অসচ্চরিত্র ইত্যাদি ও অন্যদিকে ভালকাজ, মন্দব্যবহার, সৎকার্য্য, অসদাচরণ ইত্যাদি কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু সঙ্গত আচরণই বলি, সঙ্গত লোক বলি না, অসঙ্গত কার্য্যই বলি, অসঙ্গত ব্যক্তি কখনও বলি না। আর এক কথা এই যে 'সঙ্গতাসঙ্গত' শব্দযুগলের মধ্যে নৈতিক বিধির ইঙ্গিত আছে। 'সঙ্গত' বিধিসম্মত এবং 'অসঙ্গত' বিধিবিরুদ্ধ বুঝায়।

৩। **পরমকল্যাণ বা নিঃশ্রেয়স**—* নৈতিকবোধের জ্ঞানাত্মক অংশে বা জানারদিকে মানবের পরমকল্যাণের জ্ঞানও নিহিত আছে, ইহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। এখন এই পরমকল্যাণের অর্থ আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। কল্যাণ, মঙ্গল, হিত, ইষ্ট এই সকল শব্দ সমার্থক। এখন এই কল্যাণ কি বস্তু? ইহার সহজ উত্তর, **মানুষ যাহা চায়, তাহাই তাহার কল্যাণ।** যাহা তাহার বাঞ্ছিত তাহাই তাহার ইষ্ট। ইষ্ট শব্দের ধাতুগত অর্থ ঈপ্সিত। কিন্তু এই উত্তর কি একটা হেঁয়ালী নয়? দস্যু পরধন-লুণ্ঠন কামনা করে বলিয়া উহাই কি তাহার কল্যাণ? সুতরাং উল্লিখিত উত্তরের বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। বাসনার বস্তুনিচয়ের মধ্যেই আমাদের ইষ্টকে খুঁজিয়া পাইতে হইবে, ইহা সত্য হইলেও বাঞ্ছিত বস্তুমাত্রই আমাদের ইষ্ট বা কল্যাণ নহে। বিবেক বা নৈতিক বিচারবুদ্ধির আলোকে বহু উদগ্রলালসাকে অনিষ্ট বা অকল্যাণের হেতু জানিয়া আমরা বর্জ্জন করিতে বাধ্য হই। কল্যাণ শুধু অভিলষিত নহে, ইহা বিশেষরূপে অভিলষিত, বিবেকানুমোদিত হইয়া অভিলষিত। সুতরাং ইহা শুধু বাঞ্ছিত নহে, ইহা বাঞ্ছনীয়। পূর্ব্বোক্ত দস্যুর মধ্যে ব্যক্তিগত স্বত্ব বা অধিকারের মর্য্যাদারক্ষার বাসনাও রহিয়াছে এরূপ আমরা কল্পনা করিতে পারি, এবং তাহার প্রসুপ্ত বিবেক জাগ্রত হইলে লুণ্ঠন অপেক্ষা স্বত্বের মর্য্যাদারক্ষাই শ্রেষ্ঠতর মনে করিবে এরূপ অনুমান করিতে পারি। অতএব লুণ্ঠন তাহার বাঞ্ছিত হইলেও বাঞ্ছনীয় নহে, সুতরাং তাহার ইষ্ট বা কল্যাণ নহে, ইহা আমরা অনায়াসে বলিতে পারি।

কল্যাণ কি বস্তু?
কল্যাণ ও বাসনা।

অভিলষিত বস্তু ও কল্যাণ, এই উভয়ার্থ বহন করিয়া ইষ্ট শব্দ চরিত্রবিজ্ঞানের এক জটিল সমস্যার উপর আলোকসম্পাত করে। সকল দেশেই কঠোর নীতিশাস্ত্র বাসনা ও কল্যাণের মধ্যে, প্রেয় ও শ্রেয়ের মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে। বাসনা নির্ম্মূল না হইলে কল্যাণসাধন অসম্ভব, শ্রেয়োলাভ করিতে হইলে প্রেয়কে বর্জ্জন করিতে হইবে, এবংবিধ ধারণা বহুলপ্রচলিত †। কিন্তু ইষ্টশব্দের অর্থ অনুধাবন করিয়া আমরা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি যে এরূপ ধারণা অতিরঞ্জিত ও

ইষ্টশব্দ-সাহায্যে বাসনা ও কল্যাণের সমন্বয়-সাধন।

* ইহার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'The highest good'। এস্থলে 'good' শব্দ 'bad' এর প্রতিযোগী বিশেষণ পদ নহে, ইহা 'evil' এর প্রতিযোগী বিশেষ্যপদ; এবং ইহার অর্থ হিত, মঙ্গল বা কল্যাণ; যথা, The good of the people। 'নিঃশ্রেয়স' শব্দ প্রাচীন দর্শনে মোক্ষ অর্থে রূঢ়। কিন্তু এখানে যৌগিক অর্থে ব্যবহৃত হইল; অর্থাৎ যাহা হইতে শ্রেয়ঃ বা অধিকতর মঙ্গল আর নাই, তাহাই নিঃশ্রেয়স।

† শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কামনামাত্রকেই শত্রু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা, "জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।" গ্রীক্ দার্শনিক প্ল্যাটোর (Plato) দর্শনে বিবেক (Reason) ও প্রবৃত্তির (Passion) দ্বন্দ্ব সুবিদিত। জার্ম্মেন্ দার্শনিক কান্ট (Kant) কর্ত্তব্য-সম্পাদনে অনুরাগের মিশ্রণ অনুমোদন করেন না।

একদেশদর্শিতাদোষে দুষ্ট। বাসনার বস্তু বিবেকানুমোদিত না হইলে কল্যাণ বা ইষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় না ইহা যেমন সত্য, বাসনাই কল্যাণের মূল উৎস ইহাও তেমনই সত্য।

আমাদের বিবেক বা বিচারবুদ্ধি সকল কামনাকে সমান মূল্যদান করে না। দৈহিক বিলাসবাসনা হইতে জ্ঞানপিপাসাকে আমরা শ্রেয়: মনে করি, যশোলিপ্সার চেয়ে দেশহিতৈষণাকে উচ্চস্থান দেই, অর্থলালসা হইতে বিজ্ঞানানুরাগকে অধিকতর মর্য্যাদাদান করি। বাসনাসমূহের মধ্যে এইরূপ মূল্যের তারতম্য বা উচ্চনীচভেদ সুস্পষ্ট। যখন বিভিন্নমূল্যের দুইটী বাসনার মধ্যে এরূপ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় যে একটী বর্জ্জন না করিয়া অন্যটী গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, তখন উচ্চতর বাসনার বস্তু আমাদের বাঞ্ছনীয় বা ইষ্ট ও হীনতর বাসনার বস্তু অবাঞ্ছনীয় বা অনিষ্ট। সাধারণত: এরূপ দ্বন্দ্বস্থলে আসন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন পরীক্ষার্থীর পক্ষে পাঠাভ্যাস ইষ্ট, সবাকৃচিত্র-দর্শন অনিষ্ট। এইখানে আমরা মনোবিজ্ঞানের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নীতিবিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করি। কোনও বস্তু আমাদের বাঞ্ছিত, ইহা আমাদের মনোরাজ্যের প্রাকৃতিকঘটনা, এবং এই ঘটনা মূল্যনিরপেক্ষ। কিন্তু কোনও বস্তু আমাদের বাঞ্ছনীয়, এই কথা বস্তুটীর মূল্যজ্ঞাপক, ইহা নীতিবিজ্ঞানের ভাষা। যাহা বাঞ্ছা করার যোগ্য বা বাঞ্ছা করা উচিত তাহা বাঞ্ছনীয়। 'উচিত' 'অনুচিত' এগুলি নীতিবিজ্ঞানের কথা।

বাসনাসমূহের মূল্যের তারতম্য।

বাসনা মনোবিজ্ঞানের ও কল্যাণ নীতিবিজ্ঞানের কথা।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানুষ যাহা চায় তাহাই তাহার ইষ্ট বা কল্যাণ। উপরোক্ত আলোচনার ফলে এখন আমরা আমাদের বক্তব্য আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি, মানুষ যাহা চাওয়ার যোগ্য মনে করিয়া চায়, তাহাই তাহার কল্যাণ। যাহা যুগপৎ বাঞ্ছিত ও বাঞ্ছনীয় তাহাই ইষ্ট। অনিষ্ট বাঞ্ছিত হইলেও বাঞ্ছনীয় নহে।

যাহা বাঞ্ছনীয় তাহাই কল্যাণ

কল্যাণ-সম্বন্ধে দুইটী কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত: কল্যাণসমূহের মধ্যে মূল্যের তারতম্য: একটী অপেক্ষা আর একটী শ্রেষ্ঠতর, তৃতীয় একটী তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর, উহাদের মধ্যে এইরূপ পারম্পর্য্য আছে। দ্বিতীয়ত: সেইহেতুই কল্যাণ অকল্যাণ শব্দগুলি সর্ব্বদাই আপেক্ষিক অর্থে প্রযুক্ত হয়। যাহাকে এখন আমরা কল্যাণ বলিতেছি, যখনই উহা মহত্তর কল্যাণলাভের পরিপন্থী হইবে, তখনই উহাকে অকল্যাণ বলিব। ভোজনেচ্ছা স্বভাবদত্ত বাসনা, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য খাদ্যগ্রহণ কল্যাণ। কিন্তু যখন উহা শ্রেষ্ঠতর বাসনা আরোগ্যলাভাকাঙ্ক্ষার অন্তরায় হয়, অর্থাৎ আহারে যখন দেহের স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়, তখন উহা অকল্যাণ। চলচ্চিত্রদর্শনে চিত্তবিনোদন সাধারণত: কল্যাণ, ইহা নি:সংশয়। কিন্তু পরীক্ষার্থীর পক্ষে আসন্ন পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ ত্যাগ করিয়া চিত্রালয়ে গমন অকল্যাণ। আবার এই পাঠাভ্যাস বা বিদ্যার্জ্জন সাধারণত: কল্যাণ হইলেও অবস্থাবিশেষে অর্থাৎ যখন উহা উচ্চতর কল্যাণের অন্তরায় হয় তখন উহা অকল্যাণ। দেশ যখন শত্রুদ্বারা আক্রান্ত, স্বজাতির সেই সঙ্কটমুহূর্ত্তে স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মাহুতির আহ্বান অগ্রাহ্য করিয়া পাঠ্যপুথি আঁকড়াইয়া থাকাই অকল্যাণ।

কল্যাণসমূহের স্তরভেদ ও কল্যাণমাত্রেরই আপেক্ষিকতা

সুতরাং সাধারণত: আমরা যাহাকে কল্যাণ বলি তাহার এই অন্তর্নিহিত আপেক্ষিকতাই এমন একটী নিরপেক্ষ পরমকল্যাণের ইঙ্গিত বহন করে, যাহা সকল অবস্থায় সকল সময়েই কল্যাণ,

এবং যাহাপেক্ষা মহত্তর কল্যাণ আর কিছু নাই। * ইহা নিঃশ্রেয়স, যেহেতু ইহাপেক্ষা শ্রেয়ঃ আর কিছু নাই। এই পরম কল্যাণের স্বরূপ কি? ইহা সুখ, না পূর্ণতা, না মোক্ষ, সেই বিতর্ক আমরা এখানে তুলিব না। পরে যথাস্থানে ইহার বিশদ আলোচনা হইবে। এস্থলে ইহা বলাই যথেষ্ট হইবে যে আমাদের সমগ্রসত্তা ইহাকে চরম লক্ষ্যরূপে বরণ করিয়া লয়, এবং অপর কোনও বস্তু যতক্ষণ এই চরম লক্ষ্যলাভে সহায়ক ততক্ষণই উহা কল্যাণ বলিয়া বিবেচিত হয়, পরন্তু চরম কল্যাণের পরিপন্থী হইলেই উহা অকল্যাণ বা অনিষ্টমধ্যে পরিগণিত হয়।

পরম কল্যাণ কি?

৪। নৈতিক আদর্শানুরাগ †—ইহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত যে মানবচেতনায় তিনটী স্রোত সর্ব্বদা বহিয়া চলিয়াছে: জ্ঞান, বাসনা ও বেদনা। জ্ঞানের লক্ষ্য সত্য, বাসনার লক্ষ্য শিব, এবং বেদনার লক্ষ্য সুন্দর। ত্রিস্রোতাঃ মানবাত্মা নিরন্তর এই আদর্শত্রয়ের পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছে। বস্তুতঃ মানবচেতনাও যেমন এক অবিভাজ্য সত্তা, তাহার আদর্শও তেমনই এক অখণ্ড বস্তু; সত্যং শিবং সুন্দরং (The True, the Good and the Beautiful) তাহার ত্রিবিধরূপমাত্র। কিন্তু আমরা এখানে বাসনার আদর্শ শিব বা পরমকল্যাণের কথাই বিশেষ করিয়া বলিব। ইহাই নৈতিক আদর্শ। এই আদর্শের প্রতি অল্পবিস্তর অনুরাগ মানবাত্মার বৈশিষ্ট্য। কর্ষিতচিত্তে এই অনুরাগ প্রবলভাবে দেখা দেয়। অনুরাগমাত্রই একটা স্থায়ী হৃদয়বেদনা; ইহা কখনও প্রচ্ছন্ন, কখনও প্রকট। নৈতিক আদর্শানুরাগ অর্থাৎ শিবের প্রতি অনুরাগ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত আমাদের চিত্ততলে অবিরত প্রবাহিত থাকিলেও শুধু বিশেষ বিশেষ অবস্থায়ই বিশেষ বিশেষ হৃদয়াবেগের মধ্য দিয়া তাহার স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। এই নীতি অনুরাগ কাহারও মহদাচরণ দেখিলে শ্রদ্ধার আকারে বা প্রশংসারূপে, কাহারও কুকার্য্য দেখিলে ঘৃণা বা নিন্দার আকারে, নিজের অন্যায় দেখিলে অনুতাপরূপে, স্বীয়কর্ত্তব্য-সম্পাদনে আত্মতৃপ্তির আকারে এবং দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার-দর্শনে ক্রোধরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে।

নৈতিক আদর্শানুরাগের বিশ্লেষণ।

এই নীতি অনুরাগ-সম্বন্ধে একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা কখনও কর্ম্মবিমুখ ভাবপ্রবণতা নহে, ইহা সর্ব্বদাই কর্ত্তব্যসম্পাদনে প্রেরণা যোগায়। ইহা সৎকর্ম্মের উৎস। নৈতিক আদর্শানুরাগী ব্যক্তি সর্ব্বদাই আত্ম-কর্ত্তব্যনিষ্ঠ।

ইহা কর্ম্মাভিমুখী।

এই অনুরাগের আর একটী বিশেষত্ব এই যে ইহা একটী সামাজিক গুণ। নীতিনিষ্ঠার প্রকাশ ও প্রয়োগক্ষেত্র মানবসমাজ। অন্য মানুষের প্রতি আচরণেই আমাদের নৈতিক অনুরাগ প্রকাশিত হয়। সৌন্দর্য্যানুরাগের মত ইহা শুধু নিজের উপভোগেই পরিসমাপ্ত হয় না।

ইহা সামাজিক।

কোন ব্যক্তির বা সমাজের জীবনে অগ্রগতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ ও মুখ্য অঙ্গ তাহার নৈতিক আদর্শানুরাগের গভীরতা। কোনও জাতি বা সমাজের কৃষ্টির প্রকৃত মাপকাঠি তাহার গৃহ, আসবাব-

* "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"—গীতা।

† The moral sentiment.

পত্র বা বেশভূষার পারিপাট্য নয়, তাহার বিজ্ঞানের নিত্যনূতন চমকপ্রদ আবিষ্কারের প্রভাবে যানবাহন ও ভোগবিলাসের বিবিধ উপকরণ আহরণের শক্তি নয়, তাহার অভাবনীয় অমোঘ মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের সামর্থ্য নয় এবং তাহার তথাকথিত বিবিধ ঐশ্বর্য্যও নয় ; তাহার নৈতিকাদর্শানুরাগের গাঢ়তাই উহার প্রকৃত মাপকাঠি।

ইহা কৃষ্টির পরিমাপক।

এস্থলে আমরা কৃষ্টির অপর দুইটী অঙ্গ, সত্য ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ, জ্ঞানপিপাসা ও সুন্দরের সাধনা অগ্রাহ্য করিতেছি না। সত্য ও সুন্দর শিবেরই অঙ্গীভূত। পরন্তু শিবের প্রতি অনুরাগবিহীন জ্ঞানানুশীলন ও সৌন্দর্য্যসাধনা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারে না ; বিজ্ঞান লক্ষ্যচ্যুত হইয়া লোভ, মোহ, দুরহঙ্কার প্রভৃতি হীনপ্রবৃত্তির পরিচালনে প্রলয়ঙ্করী বিভীষিকা উৎপাদন করিতে থাকে ; সুন্দরের পূজারী সাহিত্য ও সুকুমারকলা পথভ্রষ্ট হইয়া হীনলালসার ইন্ধন যোগাইয়া সমাজকে কলুষিত করিতে থাকে। সুতরাং নৈতিক আদর্শানুরাগ মানবজীবনে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

ইহা সত্য ও সুন্দরের অনুরাগ হইতেও শ্রেষ্ঠ।

পারমার্থিক সত্তা

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত, এম্. এ., পি-আর-এস্

আমরা যাহা কিছু দেখি শুনি অথবা, এক কথায়, জানি, তাহাদের স্বরূপ কি ? অর্থাৎ তাহাদিগকে আমরা যে ভাবে জানি যথার্থই তাহারা সেরূপ কি না ?—এই মূল প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়াই নানাবিধ দার্শনিক আলোচনার সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রসঙ্গেই চরমতত্ত্ব বা পারমার্থিক সত্তার বিচার আসিয়া পড়ে, এবং সেই চরম সত্তা এক না বহু, চেতন অথবা অচেতন, পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত তাহার বা তাহাদের সম্বন্ধ কি ? এই সকল প্রশ্নও উঠিয়া থাকে।

"যে সকল বস্তু আমাদের জ্ঞানে ভাসমান তাহাদের স্বরূপ কি ?" এই প্রশ্ন তুলিলেই বুঝিতে হইবে যে আমরা ধরিয়া লইতেছি যে আমরা তাহাদের যে রূপ দেখিতেছি বা জানিতেছি তাহা হইতে ভিন্ন তাহাদের অন্য রূপ থাকাও সম্ভব। সত্য ও মিথ্যা অথবা বাস্তবিক ও অলীক এই দুইয়ের মধ্যে যখন প্রভেদ করি তখনই এই সম্ভাবনার কথা আমাদের মনে উপস্থিত থাকে। যখনই আমাদের জ্ঞানে বিরোধ বা অসঙ্গতি দেখিতে পাই তখনই বিশেষ করিয়া এই সম্ভাবনার কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি। একটি যষ্টির অর্দ্ধাংশ তির্য্যক্‌ভাবে জলে মগ্ন থাকিলে যষ্টিটি বক্রাকার ধারণ করে। কিন্তু যষ্টিটিকে নিমজ্জমান অবস্থায় স্পর্শ করিলে উহাকে আর বক্র বলিয়া মনে হয় না অথবা উহাকে জল হইতে তুলিয়া লইলেও উহাকে আর বক্র দেখা যায় না। কিন্তু একই বস্তুতে একই অংশে একই সময়ে দুই বা ততোধিক বিরোধী গুণ থাকিতে পারে না। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হই যে যষ্টিটি একই সময়ে সরল এবং বক্র দুইই হইতে পারে না। অথচ এই দুইটি আকারই যখন আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি—অর্থাৎ দুইটিই যখন কোনও না কোনও ভাবে আছে—তখন একটিকে উহার প্রকৃত বা যথার্থ আকার এবং অপরটিকে উহার অপ্রকৃত বা অযথার্থ আকার অথবা অবভাস বলিয়া মনে করিতে হইবে। অথবা ইহাও হইতে পারে যে এই দুইটির মধ্যে কোনওটিই ইহার প্রকৃত আকার নহে, ইহার প্রকৃত আকার বর্ত্তমানে আমাদের জ্ঞানের অগোচর, অনুসন্ধানসাপেক্ষ। একটি বস্তুর যে কোনও রূপ আমরা কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে জানিতেছি তাহাই যদি উহার প্রকৃত রূপ হইত তাহা হইলে এইভাবের বিরোধ বা অসঙ্গতির সৃষ্টি হইত না। জগতে যে এইরূপ বিরোধ বা অসঙ্গতি বস্তুতঃ থাকিতে পারে না এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়াই আমাদের যাবতীয় চিন্তাধারা ও কার্য্যকলাপ চলিতেছে। এইরূপ বিরোধ বা অসঙ্গতির সুমীমাংসা করিতে না পারিলে আমাদের চিন্তাশক্তি পঙ্গু হইয়া পড়ে এবং এমন কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। এ সকল ক্ষেত্রে আমরা বস্তুর যথার্থ রূপ এবং উহার অযথার্থ বা অসত্যরূপ এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কল্পনা করিয়া অসঙ্গতির মীমাংসা করিয়া থাকি। আমরা মনে করি যে একই বস্তুর বহু অযথার্থ রূপ থাকিতে পারে, এবং তাহাদের মধ্যে অসঙ্গতিও থাকিতে পারে, কিন্তু বস্তুর যাহা যথার্থ রূপ তাহা একই হইবে এবং তাহার মধ্যে কোনরূপ অসঙ্গতি থাকা অসম্ভব। এখন প্রশ্ন এই যে বস্তুর যথার্থরূপ বা স্বরূপ কোন্‌টি তাহা নির্ণয় করা যাইবে কি উপায়ে ? উপরে বর্ণিত যষ্টিটির সরলাকার এবং বক্রাকার উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখিয়া

স্থির করা গেল যে উহারা উভয়েই যষ্টিটির যথার্থ আকার হইতে পারে না, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি যথার্থ আকার তাহাও ত নির্ণীত হইল না। এই সমস্তার সমাধানে বলা যাইতে পারে যে বস্তুর যে আকারটির সহিত আমাদের জ্ঞানগত অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকেই উহার যথার্থ আকার বলিয়া মনে করিতে হইবে। বস্তুর আকার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল বস্তু সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। আমাদের জ্ঞানগত কোনও বস্তুর সহিত অন্য কোনও বস্তুবিশেষের অসঙ্গতি লক্ষিত হইলে তাহাদের মধ্যে যে কোনওটি মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু কোনও সুসমঞ্জস ও সুসংহত বস্তুসমষ্টির সহিত কোনও বস্তুবিশেষের অসঙ্গতি দেখা যাইলে ঐ বস্তুটিকেই মিথ্যা বা অলীক বলিয়া মনে করিতে হইবে। যষ্টিটিকে জলের ভিতরে অথবা বাহিরে স্পর্শ করিলে যদি উহাকে সরল বলিয়া প্রতীতি হয়, জল হইতে তুলিয়া লইলে যদি উহাকে সরল দেখা যায়, এবং যদি এই বিষয়ে এক ব্যক্তির প্রতীতি বহু ব্যক্তির প্রতীতি দ্বারা সমর্থিত হয় তাহা হইলে আমাদের সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে সরল যষ্টিটিই যথার্থ বস্তু এবং বক্র যষ্টিটি অলীক বস্তু অথবা অবভাস। কোন্ বস্তু যথার্থ অথবা বস্তুর কোন্ রূপটি যথার্থ তাহা নির্ণয় করিবার আমাদের ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। ধরা যাউক্ কোনও বস্তুর একটি বিশেষ আকার বা রূপের সহিত আরও কয়েকটি বস্তু এবং তাহাদের আকার বা রূপের সম্বন্ধ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গেল যে তাহারা সকলেই পরস্পরের অনুকূল বা পরিপূরক এবং ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিলাম যে সেই বস্তুর তাহাই যথার্থ আকার বা রূপ। এস্থলে এই আপত্তি উঠিতে পারে যে আমাদের এই জ্ঞান হয়ত সত্যের সন্ধান নাও দিতে পারে। বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া যুক্তি দ্বারা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছিলাম, কিন্তু জ্ঞানমাত্রই যদি ভ্রান্ত বা দোষযুক্ত হয় তাহা হইলে আমরা যে কোনও পদ্ধতিই অবলম্বন করি না কেন বস্তুর স্বরূপ চিরকালই আমাদের অজ্ঞাত থাকিবে। এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে কোনও জ্ঞান ভ্রান্ত অথবা মিথ্যা ইহা প্রমাণ করিতে হইলে অথবা এইরূপ সন্দেহ করিতে হইলেও পদ্ধতিমূলক সুসংবদ্ধ জ্ঞানেরই আশ্রয় লইতে হইবে। জ্ঞান মাত্রই মিথ্যা, ভ্রান্ত অথবা দোষযুক্ত এইরূপ কথা বাস্তবিক অর্থহীন বলিয়াই মনে হয়। কোনও বিশেষ বস্তু বা কোনও বস্তুর বিশেষ রূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ভ্রান্ত, অসম্পূর্ণ অথবা দোষযুক্ত হইতে পারে কিন্তু সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসারে চালিত হইলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যে এই জগতের স্বরূপের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে পারে ইহা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই।

সুতরাং বস্তুর যে রূপ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ জ্ঞানের বিষয়ীভূত তাহাই তাহার প্রকৃত রূপ বা স্বরূপ। আবার 'বস্তুর স্বরূপ কি?' এবং 'সদ্বস্তু কি?' এ দুইটি একই প্রশ্ন। কিন্তু কোনও বস্তু সদ্বস্তু ইহা বলিলে তাহা এক সর্ব্বব্যাপী সুসংহত বিষয় সমষ্টির অন্তর্গত কেবল যে এইমাত্র বুঝি তাহা নয়, ইহার অতিরিক্ত আরও কিছু বুঝিয়া থাকি। এই লক্ষণটি বস্তুর প্রকৃত সত্তার দ্যোতক বা নির্দ্দেশক মাত্র। 'এই বস্তুটি সদ্বস্তু' এবং 'এই বস্তুটি একটি সর্ব্বব্যাপী সুসংহত বিষয়সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত' এই দুইটি বচন সমার্থবোধক নহে। প্রকৃত সত্তার মূলগত অর্থ অন্য-নিরপেক্ষ সত্তা। যে বস্তু অন্য-নিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্র তাহাই প্রকৃত বস্তু অথবা সদ্বস্তু এবং যাহা অন্য-সাপেক্ষ তাহাই অপ্রকৃত বস্তু বা অবভাস। বস্তুর যে রূপ তাহার যথার্থ রূপ বা স্বরূপ তাহার সত্তা সেই বস্তুর মধ্যেই নিহিত এবং তাহার যে রূপ অযথার্থ তাহার সত্তা অপর বস্তুর মধ্যে নিহিত। বস্তুর যে রূপ তাহার অন্তর্নিহিত তাহার সহিত অন্য বস্তুর স্বরূপের যথার্থ বিরোধ হইতে পারে না—এই

বিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়াই আমাদের চিন্তাধারা চলিতেছে। সুতরাং বস্তুর স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে তাহার কোন্ রূপটি আমাদের জ্ঞানের অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুটির সহিত সুসংবদ্ধ। উপরে বর্ণিত যষ্টির সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে উহার বক্রতাভাব জল ও আলোকরশ্মির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, সুতরাং উহা তাহার প্রকৃত আকার নয়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে বক্র যষ্টি যথার্থ বস্তু বা সদ্বস্তু নহে। কিন্তু উহার সরলাকার উহার বাহিরে অবস্থিত ও উহা হইতে ভিন্ন কোনও বস্তু বা ঘটনার উপর নির্ভর করে না, ইহা অন্যসাপেক্ষ নহে, সুতরাং ইহাই যষ্টির প্রকৃত আকার। যষ্টির স্বরূপের সহিত অন্যান্য বস্তুর স্বরূপের যথার্থতঃ কোনও বিরোধ বা অসঙ্গতি নাই, কিন্তু তাহার বিকৃত রূপ বা অযথার্থরূপের সহিত অন্যান্য বস্তুর বিরোধ বা অসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায়।

কোনও বস্তুর স্বরূপ কি? এই প্রশ্ন তুলিলে স্বরূপের এই মূল অর্থটি মনে রাখিতে হইবে। কিন্তু এই মূল অর্থকে ভিত্তি করিয়া সাধারণতঃ আমরা বস্তুর স্বরূপ নির্দ্দেশক আরও কয়েকটি লক্ষণের সাহায্য লইয়া থাকি। যথা, বস্তুর অপ্রকৃত রূপের তুলনায় তাহার স্বরূপ অধিকতর স্থায়ী। যে বস্তু প্রকৃত তাহা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন। তাহা দ্বারা আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। যাহা কোনওরূপ নিয়মের বশীভূত নয়, বা যাহা দ্বারা আমাদের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না তাহা অলীক বা অবাস্তব। আবার বস্তুর যে রূপ বাহির হইতে দেখা যায় তাহা অনেক স্থলেই তাহার অপ্রকৃত রূপ, বস্তুর প্রকৃত রূপ জানিতে হইলে তাহার অন্তরে প্রবেশ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ আন্তর রূপই স্বরূপ, বাহ্যরূপ অধিকাংশ স্থলেই অলীক অথবা বিভ্রান্তির জনক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা চালাইতে হইলে এবং সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তাপদ্ধতি অনুসারে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অপ্রকৃত বস্তু বা বস্তুর অপ্রকৃত রূপ এবং সদ্বস্তু বা বস্তুর স্বরূপ এই দুইয়ের প্রভেদ করা অনিবার্য্য। এই দুইয়ের প্রভেদ বুঝিয়া চলিতে না পারিলে আমাদের পদে পদে প্রবঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সাধারণতঃ এই প্রভেদ নির্ণয় করিবার জন্য আমরা কোনও নির্দ্দিষ্ট মান বা বিধির প্রয়োগ করি না। কোনও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অথবা কোনও বিশেষ প্রয়োজনের অনুরোধে বস্তুর যে রূপকে তাহার স্বরূপ বলিয়া মনে করি অন্য ক্ষেত্রে অন্য প্রয়োজনে বা অন্য প্রসঙ্গে তাহার সেই রূপকেই হয়ত অপ্রকৃত বা অলীক বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হই। বিভিন্ন সময়ে আমরা বিভিন্ন মান বা বিধি অনুযায়ী এই প্রভেদ নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু এইভাবে বস্তুর অপ্রকৃত রূপ এবং স্বরূপের পার্থক্য করিতে করিতে আমাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠে যে জগতে এমন কোনও বস্তু আছে কিনা যাহা একান্ত ভাবেই সত্য বা যথার্থ। সাধারণভাবে আমরা যাহাকে প্রকৃত বস্তু বা স্বয়ংসৎ বস্তু বলিয়া মনে করি বিশেষভাবে আলোচনা করিলে হয়ত দেখা যাইবে যে তাহার সত্তাও সম্পূর্ণভাবে অন্যের উপর নির্ভর করে, সুতরাং তাহাকেও প্রকৃত বস্তু বলিয়া মনে করা যায় না। জলে নিমজ্জমান যষ্টিটির সরলাকারকেই আমরা সাধারণতঃ তাহার যথার্থ আকার বলিয়া মনে করি কিন্তু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে তাহার এই আকারটিও অন্য কয়েকটি বস্তু বা ঘটনা-সংস্থানের উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের চক্ষুর গঠন যদি অন্য প্রকারের হইত তাহা হইলে যষ্টির এই আকার থাকিত না। আবার যষ্টিটি কার্য্যকারণসূত্রে অগণিত বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ। সেই সকল বস্তুর সত্তার উপর ইহার সত্তা নির্ভর

করে। বিজ্ঞান বলিতেছে যে যে বস্তুটি আমাদের সমক্ষে রূপ রস প্রভৃতি নানাবিধ গুণবিশিষ্ট জড়পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে তাহা যথার্থতঃ অগণিত তড়িৎকণার সমষ্টিমাত্র। বস্তুর যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়সংযোগের উপর নির্ভর করে। চৈতন্যবিশিষ্ট জীবদেহের সহিত যে বস্তুর কোনও প্রকার সংস্পর্শ নাই তাহা শ্বেত, পীত, শীতল, উষ্ণ, কর্কশ বা মসৃণ কিছুই নহে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযোগের সাহায্যে আমরা বস্তুর যে রূপ প্রত্যক্ষ করি তাহা পরিবর্তনশীল বাহ্যরূপমাত্র, তাহার স্বরূপ নহে। এবং আমাদের যে সকল কল্পনা ও চিন্তা মুখ্যতঃ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাদের বিষয়গুলিও অপ্রকৃত বা অলীক বস্তু ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

এইভাবে চিন্তা করিলে স্বভাবতঃ আমাদের মনে এই প্রশ্ন উঠে যে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র, অন্য-নিরপেক্ষ এক বা তদধিক স্বয়ংসৎ বস্তু আছে কিনা? এরূপ বস্তু যদি কিছু থাকে তবে তাহাকে পরমার্থসৎবস্তু বলা যায় এবং তাহার সত্তাকে পারমার্থিক সত্তা বলা যায়। জগতের নিত্যপরিবর্তনশীল যে রূপ আমরা দেখিতেছি তাহা সমস্তই আপেক্ষিক, কিন্তু ইহার অন্তরালে হয়ত এমন কোনও বস্তু আছে যাহা একান্তরূপেই অপরিণামী, শাশ্বত, স্বপ্রতিষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রকার বিরোধমুক্ত। সেই বস্তু কি? ইহাই দর্শনের সর্ব্বপ্রধান প্রশ্ন।

এ পর্য্যন্ত পারমার্থিক সত্তা বলিতে কি বুঝি তাহারই কিছু আলোচনা করা হইল। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে জগতে কোনও বস্তুরই পারমার্থিক সত্তা নাই। জগতে যাহা কিছু অস্তিত্ববান্ তাহাদের প্রত্যেকেই পরতন্ত্র ও পরিবর্তনশীল। যদি একান্তভাবে স্বয়ংসৎ বস্তু কিছু থাকে তাহা হয় আমাদের জ্ঞানগোচর হইবে অথবা হইবে না। যদি বলা যায় যে স্বয়ংসৎ বস্তু আছে কিন্তু তাহা আমাদের জ্ঞানগোচর নহে তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে যে উহা যদি কোনও ভাবেই আমাদের জ্ঞানের বিষয় না হয় তাহা হইলে উহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? আর যদি উহা আমাদের জ্ঞানগোচর হয় তাহা হইলে উহা স্বতন্ত্র, স্বপ্রতিষ্ঠ না হইয়া আমাদের জ্ঞানসাপেক্ষ হইবে। কোনও প্রকার জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহিত বস্তুর সংযোগ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বস্তুর যে রূপ আমরা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হইতে পাইয়া থাকি তাহা ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকে, সুতরাং ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ দ্বারা আমরা শাশ্বত স্বয়ংসৎ বস্তুর অস্তিত্ব জানিতে পারি না। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই সকল প্রকার জ্ঞানের মূল। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় হইতে আমরা বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান পাইয়া থাকি এবং সেইগুলিকেই আমরা কল্পনার সাহায্যে আমাদের ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্নভাবে মিশ্রিত, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া নানাবিধ বস্তুর ধারণা করিয়া থাকি। কিন্তু কোনওক্রমেই আমরা ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানকে অতিক্রম করিতে পারি না। সুতরাং এইরূপ জ্ঞানকে আমরা যে ভাবেই ব্যবহার করি না কেন আমরা তাহা দ্বারা স্বয়ংসৎ বস্তুতে পৌঁছাইতে পারি না। আর যদি ইন্দ্রিয়সংযোগ ব্যতীত জ্ঞানলাভের অন্য কোনও উপায় আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও যে সেই উপায়ে লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আমরা স্বয়ংসৎ বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হইতে পারি তাহা মনে হয় না। কারণ বস্তুর সহিত সংস্পর্শ যেভাবেই হউক না কেন—ইন্দ্রিয় সাহায্যেই হউক বা অতীন্দ্রিয় কোনও উপায়েই হউক—আমাদের বুদ্ধি তাহার নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী সেই জ্ঞানকে রূপ দিয়া থাকে। জ্ঞান যে উপায়েই হউক না কেন তাহাতে বুদ্ধির ক্রিয়া কিছু না কিছু থাকিবেই থাকিবে এবং

যে জ্ঞান মানববুদ্ধির প্রকৃতিসাপেক্ষ সে জ্ঞানের সাহায্যে আমরা কখনই স্বয়ংসৎ বস্তুতে পৌঁছাইতে পারি না। এইভাবে বিচার করিলে আমাদের এই-সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, যে সকল বস্তু আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয় বা হইতে পারে তাহাদের সত্তা একই প্রকারের। আবভাসিক সত্তা হইতে বিভিন্ন পারমার্থিক সত্তা বলিয়া কিছু নাই। এই পরিদৃশ্যমান জগতের বাহিরে, পশ্চাতে অথবা অন্তরতম প্রদেশে কোনও স্বয়ংসৎবস্তুর অস্তিত্ব কেবলমাত্র আমাদের কল্পনাপ্রসূত। এইরূপ বস্তু সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বিশ্লেষণ করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে উহা আমাদের আবভাসিক বস্তুসমূহের জ্ঞান হইতেই উদ্ভূত। অর্থাৎ আবভাসিক বস্তুগুলির জ্ঞানকেই পরিবর্দ্ধিত, সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া আমরা এক স্বয়ং সৎবস্তুর কল্পনা করিয়া লইয়াছি, কিন্তু এরূপ বস্তুর অস্তিত্ব প্রকৃত পক্ষে অসম্ভব। যে অর্থে আমরা "পারমার্থিক সত্তা" কথাটি ব্যবহার করিয়াছি সেই অর্থে পারমার্থিক সত্তা কোথাও নাই, উহা আবভাসিক সত্তারই নামান্তরমাত্র।

পারমার্থিক সত্তা যে আবভাসিক সত্তা হইতে বিভিন্ন তাহা আর এক উপায়ে অস্বীকার করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে জগতের যাবতীয় বস্তু একই মূলবস্তু হইতে উদ্ভূত অথবা একই মূলবস্তুর উপর নির্ভরশীল। এই মূলবস্তুর সত্তাই পারমার্থিক সত্তা। ইহাই যথার্থ-ভাবে আছে অথবা ইহাই চরমতত্ত্ব। কিন্তু এই মূলবস্তুর সত্তাই যদি পারমার্থিক সত্তা হয় তাহা হইলে যে সকল বস্তু ইহা হইতে উদ্ভূত বা ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহারাও এই মূলবস্তুর সত্তাই পাইবে, অর্থাৎ তাহারাও একান্তভাবে সৎ হইবে। যে অর্থে এই মূলবস্তুটি আছে বলি ঠিক সেই অর্থেই অন্যান্য বস্তুগুলিও আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সাধারণতঃ আমরা জগতে বিভিন্ন-বস্তুর মধ্যে যে বিরোধ দেখিতে পাই তাহা আমাদের অজ্ঞানপ্রসূত। এই বিরোধ আমাদের জ্ঞানগতমাত্র, বস্তুসমূহের সত্তাগত নহে। আমাদের সম্মুখে অবস্থিত রজ্জু ও তাহাতে প্রতীয়মান সর্প এই দুইয়ের মধ্যে সত্তাগত কোনও বিরোধ নাই। বিশেষ ঘটনাসংস্থানে রজ্জুই যথার্থতঃ সর্পে পরিণত হয়। কিন্তু যখন এই ঘটনাসংস্থানকে উপেক্ষা করিয়া আমরা রজ্জু ও সর্পকে একই বলিয়া মনে করি তখনই আমাদের ভ্রম হয়। রজ্জু ও তাহাতে প্রতীয়মান সর্প উভয়েই একান্তভাবে সত্য। জগতের যাবতীয় বস্তুর সত্তাই একপ্রকারের সত্তা, পারমার্থিক সত্তা ও আবভাসিক সত্তার মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক এই দুইটি মতবাদ আমাদের গ্রহণযোগ্য কি না। প্রথম মতানুসারে জগতের প্রত্যেক বস্তুর সত্তাই আবভাসিক সত্তা, কাহারও পারমার্থিক সত্তা নাই। কারণ জগতের প্রত্যেক বস্তুই পরতন্ত্র বা অন্যসাপেক্ষ, অন্ততঃ আমাদের জ্ঞানসাপেক্ষ। এই যুক্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে প্রত্যেক বস্তুই পরতন্ত্র ইহা পৃথক্ পৃথক্ বস্তু সম্বন্ধে সত্য হইতে পারে কিন্তু যাহা জগতের যাবতীয় বস্তু হইতেই অপৃথক্ বা অভিন্ন সেই বস্তু সম্বন্ধে ইহা সত্য হইতে পারে না। যদি এমন কোনও বস্তু থাকে যাহা সর্ব্বগত ও সর্ব্বানুস্যূত, যাহা হইতে পৃথক্ কিছুই নাই তাহা হইলে তাহা অন্যসাপেক্ষ হইতে পারে না, কারণ তাহা হইতে ভিন্ন কোনও বস্তুই নাই। এইরূপ সর্ব্বগত বস্তু আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াও স্বয়ংসৎ হইতে পারে, কারণ আমাদের জ্ঞান এই স্বয়ংসৎ সর্ব্বব্যাপী বস্তু হইতে পৃথক্ কোনও পদার্থ নহে, ইহা তাহারই অঙ্গীভূত। জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয় পৃথক্ হইয়াও এক। পরিপূর্ণ, সমগ্রব্যাপী জ্ঞানের সমক্ষে ভাসমান এবং সেই জ্ঞানের সহিত একীভূত যে বস্তু তাহাই একান্তরূপে সত্য চরমতত্ত্ব এবং তাহারই সত্তা পারমার্থিক সত্তা।

এই পারমার্থিক সদ্বস্তু জগতের যাবতীয় বস্তুসমূহের সমষ্টিমাত্র নহে। ইহা সমুদয় বস্তু হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন, ইহাকে আশ্রয় করিয়াই সকল বস্তুর সত্তা। যে কোনও সসীম, পরিণামী বস্তুর জ্ঞান হইতে গেলে এইরূপ অসীম, অপরিণামী, সর্ব্বগত, স্বয়ংসৎবস্তুর অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। স্বয়ংসৎবস্তু সসীম বস্তুসমূহের সমষ্টিমাত্রও নহে অথবা কতকগুলি বস্তুর অন্তর্গত বিশেষ কোনও বস্তুও নহে, ইহা মনে না রাখিলে স্বয়ং সৎবস্তুসম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা করা অসম্ভব।

এক্ষণে দ্বিতীয় মতবাদটি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ইহাও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। জগতের কারণীভূত মূলবস্তুর পারমার্থিক সত্তা যদি সমগ্রভাবেই সমস্ত বস্তুর মধ্যে নিহিত থাকিত তাহা হইলে ভ্রম, প্রমাদ, অসম্পূর্ণতা, অসঙ্গতি, বিরোধ এই সকলের অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। যদি বলা যায় যে বাস্তবিক এই সকলের কোনও অস্তিত্ব নাই, কেবলমাত্র আমাদের অজ্ঞানের ফলে এইগুলির প্রতীতি হইয়া থাকে তাহা হইলেও সমস্যার সমাধান হইল না। কারণ, আমাদের জ্ঞানও জগতের অঙ্গীভূত, এবং জগতের প্রত্যেক অংশই যদি সম্পূর্ণভাবে পারমার্থিক সত্তার আশ্রয় হইত তাহা হইলে ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতিও সম্ভব হইত না। সুতরাং আবভাসিক সত্তা ও পারমার্থিক সত্তার প্রভেদ স্বীকার করিতেই হইবে এবং অসম্পূর্ণ, অসঙ্গতি দোষদুষ্ট, পরতন্ত্রবস্তু বর্ত্তমান থাকিলেই একান্তরূপে সত্য, পারমার্থিক সদ্বস্তুর অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে। জগতে যাহা কিছু আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে সে সকলই স্বয়ংসৎবস্তুর সত্তায় সত্তাবান্ কিন্তু তাহারা সকলে সমভাবে সেই স্বয়ং সৎবস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে পারমার্থিক সদ্বস্তু ও আবভাসিক জগতের সত্তা একান্তভাবেই বিভিন্ন—এই দুইয়ের ব্যবধান অতিক্রম করা যায় না। পারমার্থিক সদ্বস্তু একান্তভাবেই স্বতন্ত্র, অন্যনিরপেক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। আবভাসিক জগতের সত্তা সম্পূর্ণভাবেই অলীক। ইহা পারমার্থিক সদ্বস্তু হইতে উদ্ভূত হয় নাই এবং তাহার সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধসূত্রেও আবদ্ধ নহে। আবভাসিক জগতের জ্ঞান হইতে স্বয়ংসৎবস্তুর বা চরমতত্ত্বের কোনও জ্ঞানলাভ হইতে পারে না, আবার স্বয়ংসৎবস্তুর জ্ঞান হইতে আবভাসিক জগতের প্রকৃতি সম্বন্ধেও কোনও জ্ঞান হইতে পারে না।

কিন্তু 'সম্বন্ধ নাই' বলিলেই সম্বন্ধ অস্বীকার করা যায় না। স্বয়ংসৎমূলবস্তু ও আবভাসিক জগতের মধ্যে কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই ইহা জানা গেল কিরূপে? ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে যে এই দুইটিই কোনও না কোনও জ্ঞাতার জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। যদি একই জ্ঞাতা একই সময়ে দুইটি বস্তুকে না জানে তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কোনও সম্বন্ধই যে নাই তাহা জানা যাইবে কিরূপে? সুতরাং স্বয়ংসৎ মূলবস্তু ও আবভাসিক জগৎ এই দুইয়ের মধ্যে অন্ততঃ এই সম্বন্ধ আছে যে তাহারা উভয়েই একই জ্ঞাতার জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। মাত্র তাহাই নহে। দুইটিই যখন জ্ঞানের বিষয় তখন দুইয়ের মধ্যে কোনও না কোনও সাদৃশ্য থাকিবেই থাকিবে, আবার দুইয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও থাকিবে। নতুবা দুইয়ে মিলিয়া একাকার হইয়া যাইত। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে উভয়েই সত্তাবান্, বৈসাদৃশ্য এই যে একের সত্তা অন্যনিরপেক্ষ, অপরের সত্তা পরতন্ত্র। কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অন্যসাপেক্ষ, ইহার নিজের কোন সত্তা নাই ইহা যদি বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে ইহা কাহার আশ্রয়ে আছে? ইহা যাহার আশ্রয়ে আছে তাহাই স্বয়ং সৎবস্তু। অপরপক্ষে ইহাও সত্য যে স্বয়ংসৎবস্তু যদি কিছু থাকে তবে তাহার প্রকাশের ভিতর

দিয়াই তাহাকে জানিতে হইবে। যাহার কোনও প্রকাশ নাই তাহার জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু যেরূপে স্বয়ংসৎবস্তু আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয় তাহা সীমাবদ্ধ ও পরতন্ত্র হইতে বাধ্য। আমরা যাহা কিছু জানি তাহা আমাদের বুদ্ধিসাপেক্ষ অবভাসরূপেই জানি। সুতরাং পারমার্থিক সত্তার প্রকাশ আবভাসিক জগতের মধ্য দিয়াই হইবে। এখানে আপত্তি হইতে পারে যে স্বয়ং-সৎবস্তুর প্রকাশ যদি আবভাসিক জগতের মধ্য দিয়াই হয় তাহা হইলে তাহাকে একান্তভাবে স্বতন্ত্র বা অন্যনিরপেক্ষ বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরেও আমরা বলিব যে আবভাসিক জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া স্বয়ং সৎবস্তুকে জানিতেছি তাহা উহা হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। আবভাসিক জগৎ স্বয়ং সৎ পারমার্থিক বস্তুরই অঙ্গ। উভয়কে স্বীকার করিয়া উভয়কে একত্রে জানিলে তবেই আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে।

অদ্বৈত

অধ্যাপক শ্রীঅনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, তর্কতীর্থ

যদিও আরভ্যমান প্রবন্ধে আমাকে প্রায়শঃই পারিভাষিক শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, তথাপি মাতৃ-ভাষা অবলম্বন করিয়াই ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ সংস্কৃতভাষাময় এই সকল বিষয়ের নিবন্ধে যে সমৃদ্ধি আমরা দেখিতে পাই তাহাতে, সংস্কৃত-ভাষা-নিবদ্ধ অর্ব্বাচীন প্রবন্ধ পুনরুক্তি-দুষ্ট হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস এবং তত্ত্ব-প্রতিপাদক ভাষা হিসাবে আপন সুপ্রতিষ্ঠাতে বাংলা-ভাষার যে স্বাভাবিক দাবী আছে, সেই প্রয়োজনেও আমি ঐ ভাষারই শরণ লইলাম।

কোনও ভাষা উৎকৃষ্ট গীতি, কবিতা বা কথা-প্রবন্ধে সুসমৃদ্ধ হইলেও সেই সেই অংশেই দারিদ্র্যের পরিপীড়ন হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে পারে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহা সূক্ষ্ম আলঙ্কারিক বিচারোপযোগী শব্দ-সম্পদেও সম্পন্ন হয়। সুতরাং সেই ভাষার তত্ত্ব-বিচারোপযোগেও প্রশ্নই উঠে না।

স্বতঃপ্রকাশ চিৎ এবং আনন্দৈকরসস্বরূপ যে শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব, নিত্য, সত্য-বস্তু তাহাই তত্ত্ব এবং ঐ তত্ত্ববস্তুকেই শাস্ত্রকারগণ "অদ্বৈত" বা "অদ্বিতীয়" এই সকল কথার দ্বারা উপলক্ষিত করিয়াছেন।[১] যদিও ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মুনি গ্রহণ, ত্যাগ ও উপেক্ষাতে পরিসমাপ্তি বুঝিয়া এবং গ্রহণ, ত্যাগ বা উপেক্ষাতে প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমিতি এই চতুর্ব্বর্গের অপরিহার্য্যতা জানিয়া ঐ চতুর্ব্বর্গে তত্ত্ব-পরিসমাপ্তির[২] কথা বলিয়াছেন, অপিচ যে কোনও পদার্থের যে অবাধিত ধর্ম্ম তাহাকে বা অবাধিত ধর্ম্মবান্ যে কোনও পদার্থকেই তিনি তত্ত্ব[৩] বলিয়াছেন ইহা সত্য, তথাপি আমরা এই স্থলে আরও গম্ভীর অর্থেই তত্ত্ব কথাটীর ব্যবহার করিয়াছি। কারণ বেদান্তে চরম-তত্ত্বই পরম তাৎপর্য্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

১। নিবৃত্তেঃ সর্ব্বদুঃখানামীশানঃ প্রভুরব্যয়ঃ। অদ্বৈতঃ সর্ব্বভাবানাং দেবস্তুর্য্যো বিভুঃস্মৃতঃ॥

মাণ্ডূক্যকারিকা ১০

২। যস্যেপ্সাজিহাসাপ্রযুক্তস্য প্রবৃত্তিঃ স প্রমাতা। যেনার্থং প্রমিণোতি তৎ প্রমাণম্। যোঽর্থঃ প্রমীয়তে তৎ প্রমেয়ম্। যদর্থবিজ্ঞানং সা প্রমিতিঃ। চতসৃষ্বেবংবিধাসু তত্ত্বং পরিসমাপ্যতে।

ন্যায়ভাষ্য ১ম সূত্র

৩। কিং পুনস্তত্ত্বং? সতশ্চ সদ্ভাবোঽসতশ্চাসদ্ভাবঃ। সৎ সদিতিগৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি। অসচ্চ অসদিতিগৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি।

ন্যায়ভাষ্য ১ম সূত্র

অবাধিত স্বয়ং প্রকাশমানতাই[1] সত্তা এবং ঐ যে প্রকাশানন্দাত্মকসত্তা তাহাই পরম বা চরম তত্ত্ব। এই যে সত্তার ঘটক অবাধিতত্ব ইহা জড়প্রপঞ্চে আদৌ সম্ভব হয় না। কারণ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের ফলে জড় প্রপঞ্চের-বাধার কথাই মুক্তকণ্ঠে শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন।[2] বাচারম্ভন[3] শ্রুতিতে কার্য্যমাত্রেরই মিথ্যাত্ব কীর্ত্তিত হওয়ায় কার্য্যত্বে মিথ্যাত্বের ব্যাপ্তি প্রমাণিত হইতেছে। এই ব্যাপ্যত্বনিবন্ধন আমরা কার্য্যত্বকে হেতু করিয়া জড়প্রপঞ্চে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে মিথ্যাত্বের অনুমান করিতে পারি। মিথ্যাত্ব-রূপধর্ম্মে তত্ত্ব জ্ঞান-নাশ্যত্বের নিয়ম, শুক্তিরজত দৃষ্টান্তে প্রমাণিত থাকায়, এই মিথ্যাত্বহেতুর দ্বারাও আমরা জড়-প্রপঞ্চে তত্ত্ব-জ্ঞান-নাশ্যত্বের অনুমান করিতে পারি। সুতরাং জড়-জগতের সর্ব্বত্র মরণ-শীলতা অর্থাৎ বাধিতত্বই প্রমাণিত আছে; অতএব জড়-বস্তু তত্ত্ব হইতে পারে না।

যাহা অপ্রিয় স্বয়ং শোকদুঃখাত্মক বা শোকদুঃখের কারণ তাহা পরম-তত্ত্ব হইতে পারে না। কারণ ঐ প্রকার বস্তুর সংসর্গে আসিলে লোক[4] মৃত্যুরই সম্মুখীন হয়। প্রেক্ষাবান্ ব্যক্তি মৃত্যু বা মৃত্যুর হেতুকে তত্ত্বহিসাবে গ্রহণ করে না। এমন কি যাহা স্বয়ং সুখ নহে আত্মার প্রয়োজনে সুখ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তাহাও পরমতত্ত্ব হইতে পারে না। আত্মাই একমাত্র[5] প্রিয়বস্তু, জায়া বিত্তাদি অনাত্মবস্তুগুলি কদাচিৎ সুখ-স্বরূপ আত্মার মিথ্যা সম্বন্ধেই প্রিয় বলিয়া মনে হয়। অনাত্ম বস্তুর (জায়া বিত্তাদির) যে আত্মার সহিত কল্পিত আসঙ্গ, তাহা চিরস্থির হইতে পারে না। অনাত্ম বস্তুর মৃত্যু বা বিনাশে উহার আসংগ বিনষ্ট হইবেই। ঐ মৃত্যু বা অপক্ষয় জনিত বিয়োগে লোক আর্ত্তিগ্রস্তই হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্বব্যতিরিক্ত স্বসম্বন্ধী হিসাবে ভ্রম-পরিগৃহীত বস্তুমাত্রই বিয়োগ সম্পাদন করিয়া দুঃখের নিদান হয়। অনাত্মস্থ বা দ্বিতীয়াপেক্ষী হইলেই লোক নানাপ্রকার শোকে দুঃখে বিব্রত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় বস্তুতে আত্ম-ব্যতিরেক থাকার দরুণই উহা প্রথমতঃ অপ্রাপ্তই থাকে। যাহা প্রথমতঃ অপ্রাপ্ত সাপেক্ষত্ব-প্রযুক্ত তাহার প্রাপ্তি ঘটিতেও পারে, নাও বা ঘটিতে পারে। প্রাপ্তি ঘটিলেও বিনাশিত্ব-নিবন্ধন বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং উহা দুঃখেরই নিদান।

এই সকল যুক্তি শ্রুতি স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্যে বুঝা যাইতেছে যে যাহা নিত্য-প্রাপ্ত যাহার সহিত কখনও বিযুক্তি ঘটিবে না তাহাই পরম-সুখ এবং পরম-সুখত্ব-

---

১। "অবাধিতা স্বয়ং প্রকাশমানতৈবাস্য সত্তা"। (ভামতী ২০ পৃঃ নির্ণয়সাগর সং)

২। যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কংজিঘ্রেৎ"......(বৃহ, ২।৪।১৪)

৩। "বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"......(ছা, ৬।১।১)

৪। "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" (বৃহ, ৪।৪।১৯)

৫। "নবা অরে পত্যুঃকামায় পতিঃপ্রিয়োভবত্যাত্মনস্তু কামায়পতিঃপ্রিয়ো ভবতি" (বৃহ, ২।৪।৫)

নিবন্ধন তাহাই চরম ও পরম-তত্ত্ব। জীব-নিবহের পক্ষে নিজ নিজ আত্মাই নিত্য-প্রাপ্ত স্ব স্ব আত্মার সহিতই জীবের বিযুক্তি ঘটিবে না; সুতরাং আত্মাই পরম-সুখ এবং পরম-সুখত্ব-প্রযুক্ত চরম ও পরম-তত্ত্ব। এই আত্মার স্বরূপ ও নিত্যতাদি সম্বন্ধে নানামতবাদ আছে। একে একে তাহাদের প্রত্যেকটীর নিরাস করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে গেলে, তাহা অতি বিস্তৃত হইয়া পড়িবে এবং তাহার অবসরও বর্ত্তমান প্রবন্ধে নাই। সিদ্ধান্তের দুই একটী কথা বলিয়াই আমি আমার প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি। যাহা সর্ব্বতোভাবে ব্যবধান-রহিত সর্ব্বান্তরতম[১] তাহাই আত্মা। পঞ্চকোষ-বিবেক প্রসঙ্গে আত্মার এই সর্ব্বান্তরতমত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতিতে বিস্তৃত বিচার আছে। আমরা অতি সংক্ষেপে ইহা বুঝিতে পারি যে, জড়-বস্তু কখনই সর্ব্বথা অব্যবহিত অথবা সর্ব্বান্তরতম হইতে পারে না; কারণ আপন প্রকাশে জড়-বস্তু স্বব্যতিরিক্ত প্রকাশের অপেক্ষা রাখে। কাজেই প্রকাশের দ্বারা উহা ব্যবধান-প্রাপ্ত। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মুক্তি এই সকল অবস্থাতে অখণ্ড আত্ম-প্রকাশ রহিয়াছে, কোনও অবস্থাতেই উহার অপ্রকাশ নাই। আপত্তি থাকিলেও নৈয়ায়িকগণের এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকাটা তত্ত্বের পরিপোষক হইবে না। ন্যায়মত সম্বন্ধে আমারও কিছুটা ধারণা আছে এবং বিদ্বেষ-বুদ্ধি নাই। নিজকে নৈয়ায়িক ভাবিতে আমি গৌরববোধ করি। যদিও সিদ্ধান্তে অহঙ্কার অর্থাৎ অন্তঃকরণ নিরাবরণ সাক্ষি-চৈতন্যেই অধ্যস্ত এবং উহার প্রকাশে করণ-কৃত বা কালকৃত ব্যবধান নাই ইহা সত্য, তথাপি বস্তু-কৃত ব্যবধান[১] উহাতে আছে। জড়ত্ব-নিবন্ধন উহাতেও আপন অধিষ্ঠান যে সাক্ষী অর্থাৎ অনাবৃত চৈতন্য, তাহার কল্পিত[২]-তাদাত্ম্য বশতঃই প্রকাশিত হয়। যাহা আত্মা তাহা অবশ্যই স্বতঃপ্রকাশ হইবে। প্রকাশাশ্রয়ত্বনিবন্ধন প্রকাশমান হইলে প্রকাশ-ব্যবহিত হওয়ায় অহংকারাদি অন্যান্য পদার্থের মত উহা অনাত্মাই হইয়া যাইবে, এবং প্রকাশাশ্রয়ের প্রকাশক যে চৈতন্য অব্যবধান বশতঃ তাহাই আত্মা হইয়া যাইবে। প্রকাশের স্বব্যতিরিক্ত প্রকাশ-প্রকাশ্যত্ববাদে সর্ব্বান্তর-তম বস্তু অপ্রসিদ্ধই হইয়া পড়ে। ঘটপটাদিরূপ তত্তজ্জড়বস্তু স্ব স্ব ব্যক্তি হইতে অভিন্ন

১। "এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর-আত্মা প্রাণময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াদন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মা-আনন্দময়ঃ"।

তৈত্তিরীয় ব্রহ্মবল্লী।

"এবং তপসা বিশুদ্ধাত্মা প্রাণাদিষু সাকল্যেন ব্রহ্মলক্ষণমপশ্যন শনৈঃশনৈরন্তরমনুপ্রবিশ্য অন্তরতমমানন্দং ব্রহ্মবিজ্ঞাতবান্ তপসৈব সাধনেন ভৃগুঃ"। শাংকরভাষ্য, ভৃগুবল্লী, তৈত্তিরীয়।

১। "ব্যবধীয়ন্ত এবামী বুদ্ধিদেহঘটাদয়ঃ। আত্মত্বাদাত্মনঃ কেন ব্যবধানং মনাগপি॥"

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, অঃ ২, শ্লোক ৯৮।

২। "বুদ্ধিসিদ্ধেরাত্মচৈতন্যাভাসোদয়সাপেক্ষত্বাৎ তদনপেক্ষস্বতঃসিদ্ধাত্মস্বভাবাপেক্ষয়া বুদ্ধের্ব্যবধানম্"।

জ্ঞানোত্তম কৃত চন্দ্রিকা, ৯৬ পৃঃ।

হইলেও নিজ নিজ সম্পর্কে তাহাদের প্রকাশকত্বের প্রশ্নই উঠে না। কাজেই তাহারা নিজেরা নিজের আত্মা নহে। এই কারণেই অলীক না হইলেও প্রত্যেক জড় বস্তুই নিরাত্মক। কোনও প্রাণীরও ঐগুলি আত্মা হইতে পারে না। কারণ প্রাণীর সম্পর্কে ঐ সকল বস্তু দেশ, কাল, করণ ও প্রকাশের দ্বারা ব্যবহিত[১]। কাজেই এক্ষণে ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, স্বতঃপ্রকাশ যে চিৎবস্তু তাহাই আত্মা, আত্মত্বনিবন্ধন তাহাই পরম-সুখ এবং পরমানন্দত্বনিবন্ধন উহাই তত্ত্ববস্তু। এই যে স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপী আত্মা, ইহার বাধা হইতে পারে না। কারণ ঐরূপ বাধ নিঃসাক্ষিক হইয়া পড়ে। সাক্ষি-সম্পর্ক-রহিত বস্তু প্রমাণ-সিদ্ধ হয় না।

এই যে পরমানন্দচৈতন্যৈকরস[২] আত্মতত্ত্ব, ইহা অভিন্ন। কারণ ঘটানুভব, পটানুভব, মঠানুভব এই সকল ব্যবহারের দ্বারাই আত্মরূপ অনুভবের পরস্পর ভেদ প্রমাণিত হইবে; কিন্তু তাহা নিতান্তই অসম্ভব। ঐ সকল ব্যবহার ঘট, পট, মঠাদি বিষয়াংশেই ভেদ প্রমাণিত করে; অনুভব অংশে ভেদ প্রমাণিত করে না, বিভিন্নবিষয়াংশে একই অনুভব অনুগত রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়রূপ উপাধির সম্বন্ধ কল্পনা না করিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহই কেবল অনুভবাংশে ভেদ-ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন নাই।[৩] ঘটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদি ব্যবহারের দ্বারা যেমন উপাধিভূত ঘটাদিরই ভেদ প্রমাণিত হয়, আকাশের ভেদ উহার দ্বারা প্রমাণিত হয় না, তেমনই ঘটানুভব, পটানুভব, মঠানুভব এই সকল ব্যবহারের দ্বারাও বিষয়াংশেই ভেদ প্রমাণিত হয়, অনুভবাংশে উহা প্রমাণিত হয় না। বিভিন্ন দেশ-স্থিত বিভিন্ন উপাধির সহিত সম্বন্ধের কল্পনাবশতঃ আকাশের যেমন সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব সিদ্ধ হয়, তেমনই বিভিন্ন দেশস্থ বিভিন্ন উপাধির সহিত সম্বন্ধের কল্পনাবশতঃ, এই অনুভবরূপী আত্মারও সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রমাণিত হয়।

এই যে আত্মতত্ত্ব ইহা সর্ব্বথা নির্ব্বিশেষ এবং নির্ব্বিকল্প। বহু বহু[৪] শ্রুতির দ্বারা ইহার নির্ব্বিশেষনির্ব্বিকল্পাত্মকত্ব বর্ণিত হইয়াছে। "অদ্বৈত" কথাটী "ন বিদ্যতে দ্বৈতং[৫] যত্র" এই নির্ব্বচন-সামর্থ্যে দ্বৈতপ্রপঞ্চের সামান্যতঃ অত্যন্তাভাবের দ্বারা

১। "দেহস্তু পুনর্বুদ্ধ্যাপেক্ষত্বাদিন্দ্রিয়াপেক্ষত্বাচ্চ ততোঽপি ব্যবধানম্। ঘটাদীনাং পুনর্দেশকালাদিসন্নিধানাপেক্ষত্বাদ্ বুদ্ধ্যাদ্যপেক্ষত্বাচ্চ দেহাদপি ব্যবধানম্" ॥ চন্দ্রিকা, ৯৬ পৃঃ।

২। আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ (তৈত্তি, ৩।৬)। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", (বৃহ, ৩।৯।২৮)।

৩। "প্রত্যর্থস্তুবিভিন্নত্বে বুদ্ধয়ো বিষয়োন্মুখাঃ। ন ভিদাবগতেস্তদ্বৎ সর্ব্বাস্তাশ্চিন্নিভা যতঃ" ॥

নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, অঃ, ২, কাঃ ৮৬।

৪। এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসগন্ধম-চক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগ্‌মনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কঞ্চন"।

গার্গী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ, ৮ম ব্রাঃ ৮ম মন্ত্র।

৫। দ্বাভ্যাং প্রকারাভ্যামিতং জ্ঞাতমিতিদ্বীতম্ তদেব দ্বৈতম্।

উপলক্ষিত করিয়া প্রোক্তআত্ম-তত্ত্বেরই সমুপস্থাপন করিতেছে। কারণ এইরূপ হইলে "নেহনানাস্তিকিঞ্চন" ইত্যাদিশ্রুত্যর্থের সহিত উহার অর্থের অনুগম হয়। শ্রুত্যর্থানুগমের দাবী অনুপেক্ষণীয়।

এই যে "অদ্বৈত" কথাটীর দ্বারা দ্বৈত-প্রপঞ্চের সামান্যতঃ নিষেধের আধার হিসাবে অখণ্ডানন্দৈকরস, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, নিত্যস্বপ্রকাশ, চিন্মাত্রবস্তু উপলক্ষিত হইয়াছে, ইহাতে অবশ্যই প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঐ যে চরম ও পরম তত্ত্ব, তাহা'ত আর স্বয়ং নিষেধাত্মক নহে যে, নিষেধ-মুখেই জানিতে বা বলিতে হইবে! পরন্তু উহা পরম-সৎ বা ভাব-বস্তু। সুতরাং উহাকে প্রপঞ্চ অর্থাৎ দ্বৈতনিষেধের দ্বারা উপলক্ষিত করিয়া ফলতঃ নিষেধ-মুখেই বলা হইল ভাব-মুখে বলা হইল না, ইহার কারণ কি?

ইহার উত্তরে অবশ্যই আমরা বলিতে পারি যে, পূর্ব্বপক্ষী যাহা বলিয়াছেন তাহার সবটাই ভুল নহে, কারণ সামান্যতঃ প্রপঞ্চনিষেধের আশ্রয়ত্বোপলক্ষিত বস্তুটী যে নিষেধাত্মক নহে এবং চিন্মাত্র নিত্য-সদাত্মক ভাব-বস্তু তাহা সিদ্ধান্তেও স্বীকৃতই আছে। এই প্রকার হইলেও নিষেধ-মুখে বলাতে পূর্ব্বপক্ষীর যে আপত্তি দেখা যাইতেছে, তাহা সমীচীন নহে। কারণ যদিও পরমার্থতত্ত্ব-বস্তু স্বয়ংভাবভূত চিন্মাত্র সদাত্মকই, তথাপি উহা লোক-ব্যবহারের বিষয় যে, সবিশেষণ, সবিকল্প ভাব-বস্তু তাহা হইতে সর্ব্বথাই বিলক্ষণ। ভাব-ভূত হইলেও পরমার্থ তত্ত্ব-বস্তু নির্ব্বিকল্প, নির্ব্বিশেষণ[১], অসঙ্গ, চিন্মাত্র, নিত্য-সদাত্মক। সেই প্রকার পদার্থগুলিকেই ভাব-মুখে কথার দ্বারা বলিতে পারা যায়, যাহা নাম, জাতি প্রভৃতি বিকল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট। ব্যবহারে উপযোগ থাকাতে, এই প্রকারের সবিকল্প পদার্থগুলিই ব্যবহারিক জগতের একাধিপতি এবং এইগুলির সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলাফেরা করিতেই চিরাভ্যস্ত ব্যবহারিক দুনিয়ার প্রাণী। অতএব সর্ব্বব্যবহারের অতীত এমন যে সর্ব্বাসঙ্গী, নির্ব্বিকল্প বস্তু তাহাকে ভাব-মুখে বলায় অসুবিধা আছে বলিয়াই, যাঁহারা বলিতে জানেন তাঁহারা উহাকে, নিষেধ-মুখেই প্রায়শঃ বলেন।

এই যে নির্ব্বিকল্প ভাব-বস্তু সম্পর্কে অভাব-মুখে বলার ঔচিত্য প্রদর্শিত হইল ইহাতে এই প্রকার আপত্তিও সঙ্গত হইবে না যে, যাহা নির্ব্বিকল্প বা সর্ব্বাসঙ্গী পদার্থ, তাহাকে অভাব-পুরঃসরই কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? কারণ, ভাব-ভূত কোনও বিশেষণের ন্যায়ই অভাব-ভূত কোনও কিছুর সহিতও তাহার

১। "অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ" (বৃহ০ ৪।৩।১৫)। "অপ্রাণোহ্মনা শুভ্রঃ"। (মুণ্ডক, ২)

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥

(কঠ, ২।১৪)

অসঙ্গিত্বই আছে। কারণ প্রপঞ্চাভাবরূপ যে উপলক্ষণের দ্বারা পরমার্থসৎ চিদানন্দময় বস্তুতে "অদ্বৈত"পদ উপলক্ষিত করিয়াছে ঐ প্রপঞ্চাভাব তদীয়ধর্ম্মী হইতে এমন কোনও পৃথক্ বস্তুই নহে, যাহার উপলক্ষণত্ব প্রযুক্ত পরমার্থ সৎবস্তুর অসংগিত্বের কোনও হানি ঘটিতে পারে।

অভাব-বিশেষণের দ্বারা বস্তু-বিশেষকে উপলক্ষিত করিলে যে, অতিরিক্ত কোনও সঙ্গ তাহাতে সংঘটিত হয় না, একটু অনুসন্ধানের দৃষ্টি দিলেই তাহা বেশ বুঝা যায়। দণ্ডের দ্বারা পুরুষ যখন অপরাপর পুরুষ হইতে ব্যাবৃত্ত হয় তখন, পুরুষ, বাস্তবিক পক্ষেই তাহার স্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ একটী বস্তুর আসঙ্গযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ পুরুষই যখন দণ্ড-পরিহার করিয়া দণ্ডশূন্যত্বের দ্বারা উপলক্ষিত হয়, তখন কি বাস্তবিক পক্ষেই ঐ পুরুষ স্বস্বরূপাতিরিক্ত কোনও কিছুর সহিত আসঙ্গশীল হইয়া থাকে? বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যোগের বিযুক্তি ছাড়া নূতন কোনও যোগ তাহাতে হয় না।

এই বিষয়ে অবশ্যই আমার নৈয়ায়িক বন্ধুগণ আমার সহিত একমত হইবেন না (বিশেষতঃ যাঁহারা নব্যন্যায়ের উপাধিপরীক্ষা অবধি পাঠ্যপুস্তক কয়েকখানার গণ্ডীর বাইরে আদৌ যাতায়াতই করেন না) কারণ তাঁহারা ভাষাপরিচ্ছেদ বা দৈবাৎ মুক্তাবলী পড়ারকালে অভাবেরও ধর্ম্মীতে সংসর্গের কথা শুনিয়াছেন। শোনার সংস্কারটাকে একটু সংযত করে যদি স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টি দেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহারাও ধীরে ধীরে আমার মতেরই অনুসরণ করিবেন। বহু ব্যবহারই কল্পনার সাহায্যে সংঘটিত হয়, ধর্ম্মধর্ম্মিভাবের ব্যবহার হয় বলিয়াই অভাবে, ধর্ম্মাতিরেক প্রমাণিত হয় না। বায়ুতে রূপাভাবের প্রত্যক্ষ সকলেই স্বীকার করিবে ইহা মনে করারও কোন কারণ নাই। অনেক এমন দার্শনিক আছেন, পূর্ব্বেও ছিলেন, যাঁহারা অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষই স্বীকার করেন না। অবশ্যই ইহার দ্বারা একথা আমি বলিতেছি না যে, অভাবের অতিরিক্তপদার্থত্ব পক্ষে বলিবার মত কোনও যুক্তি নাই। প্রস্তুত বিষয়ে এই মাত্রই আমার বক্তব্য যে, অভাবের দ্বারা উপলক্ষিত হইলেও নির্ব্বিকল্পকত্বের হানি হয় না।

নির্ব্বিকল্প বস্তুর নিষেধ-মুখে কথন-বিষয়ে, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে যদি কেহ আপত্তি করেন যে,—যদি নিষেধ-মুখে ভিন্ন ভাব-মুখে নির্ব্বিকল্প বস্তুকে বলার কোনও সুযোগ না থাকে তাহা হইলে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রুতি এবং এই জাতীয় আরও অনেকানেক শ্রুতির দ্বারা, সবিশেষ ব্রহ্ম বস্তুই প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। প্রায়শঃ উপাস্য-ব্রহ্ম, সবিশেষরূপে শ্রুতি-কীর্ত্তিত হইলেও, জ্ঞেয়-ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্পকরূপেই, শ্রুতির সাহায্যে কথিত হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানার্থক "সত্যংজ্ঞানমনন্তং

ব্রহ্ম" এই জাতীয় জ্ঞেয়-তত্ত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিগুলির, সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদকত্ব স্বীকার করিলে, সিদ্ধান্ত বিরোধ হইবে। সুতরাং ভাব-মুখে নির্ব্বিশেষ বস্তুকে বলাতে অসুবিধার কথা বলা সঙ্গত হয় নাই।

ইহার উত্তরে প্রথমতঃ আমরা বলিতে পারি যে, সচ্চিদানন্দময় শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব নির্ব্বিকল্পক বস্তুটী উৎপাদবিনাশশীল অনিত্য বস্তু এই আশঙ্কার নিরাসার্থই, শ্রুতিতে উহাকে "সৎ" বলা হইয়াছে। এই "সৎ" কথাটীর দ্বারা সত্তারূপ যে ধর্ম্ম তদ্বিশিষ্ট হিসাবে বলা হইয়াছে, এইরূপ মনে করিলে তাহা ভুল করা হইবে। কারণ বস্তুভূত সত্তারূপ ধর্ম্মের বাস্তবিক কোনও সম্বন্ধ থাকিলেই, আনন্দচিন্ময় বস্তু সত্তারূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু আনন্দচিন্ময় পদার্থটী সর্ব্বথা সঙ্গ-রহিতই।* শ্রুতিতে তাহাকে সর্ব্বথা অসঙ্গই ফলতঃ বলা হইয়াছে। সুতরাং শ্রৌতসিদ্ধান্তানুসারে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রোক্ত শ্রুতিতে সত্তারূপ[১] ধর্ম্মবিশিষ্ট হিসাবে আনন্দচিন্ময় বস্তুকে বলা হয় নাই। যদিও কল্পিত সত্তারূপধর্ম্মের দ্বারা বিশিষ্ট হিসাবে ব্রহ্মবস্তু ঐ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে—এই প্রকার বলিলে, বিশেষ্য ব্রহ্ম-বস্তুর নির্ব্বিকল্পকত্বে কোনও হানি উপস্থিত হয় না, ইহা সত্য ; কারণ কল্পিত বিশেষণের কল্পিত সম্বন্ধ বিশেষ্যে স্বীকার করিলেও বাস্তবিক অসংগত্বের অপলাপ হয় না। প্রত্যক্ষসিদ্ধ কল্পিতরজতের কল্পিত-সম্বন্ধে ভ্রমাধিষ্ঠানীভূত শুক্তিকার যে কোনও ক্ষতি বা বৃদ্ধি বস্তুতঃ হয় না, ইহা আমরা সকলেই বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত আছি। তথাপি "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতির দ্বারা কল্পিত যে সত্তারূপধর্ম্ম তদ্বিশিষ্ট হিসাবে আনন্দচিন্ময় বস্তু প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ ঐ শ্রুতিতে জ্ঞানেরই উপদেশ করা হইয়াছে। যাহা জ্ঞেয়-বস্তুর তাত্ত্বিক বিশেষণ নহে, তদ্দ্বারা জ্ঞেয়বস্তুর উপদেশ করিলে তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞানের উপদেশ হয় না।

বিশেষতঃ, ব্রহ্মবস্তুর অনিত্যত্ব আশঙ্কার নিরাসার্থতাও ঐ শ্রুতি ব্যাহত হইয়া যায়, যদি কল্পিত সত্তারূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট হিসাবে উহা ব্রহ্মের কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কল্পিত সৎহিসাবে কীর্ত্তিত ব্যবহারিক বস্তুর উৎপাদ বিনাশাদি নানাবিধ বিকার প্রমাণিতই আছে। সুতরাং ইহা কখনও সিদ্ধান্তিত হইতে পারে না যে, সত্তারূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট হিসাবে ঐ শ্রুতির দ্বারা চিদানন্দঘন ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব উৎপাদ-বিনাশ-ধর্ম্মা সবিকার বস্তু হইতে[২] ব্যাবৃত্ত করিয়াই প্রদর্শিত শ্রুতিস্থ

* অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ। (বৃহ

১। "সা চ স্বরূপমেব চিদাত্মনঃ ন তু তদতিরিক্তম্"......(ভামতী ২৫ পৃঃ নি, মা, সং)

২। "অতঃ সত্যং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিকারান্নিবর্ত্তয়তি।" (শাঙ্করভাষ্য তৈঃ ব্রহ্ম ২।১)।

"সৎ" কথাটী নির্ব্বিশেষচিদানন্দাত্মক ব্রহ্ম বস্তুর সমুপস্থাপন করিয়াছে, এই প্রকার সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন। কাজেই উক্ত শ্রুতিস্থ "সৎ" কথাটী ব্যাবৃত্তি-মুখে ব্রহ্মের সমর্পণ করে নাই, ইহা মনে করা প্রমাদেরই ফল।

এই স্থলে ইহাও সতর্কতার সহিত মনে রাখা আবশ্যক যে, "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই সকল শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্বরূপ-লক্ষণগুলি অলক্ষ্য-ব্যাবৃত্তির দ্বারা বস্তু-স্বরূপের সমর্পণ করিয়া থাকে। কাজেই "সৎ" কথাটী যেমন বিকারিত্ব-নিষেধের দ্বারা অলক্ষ্য জড় বস্তু হইতে ব্রহ্মবস্তুকে ব্যাবর্ত্তিত করিয়াছে, তেমন সন্মাত্রাংশে ব্রহ্ম[1]-স্বরূপেরও সমর্পণ করিয়াছে। এই প্রকার হইলেও উহা কিন্তু মুখ্য-বৃত্তি অর্থাৎ অভিধা-বৃত্তির দ্বারা নির্ব্বিশেষ সৎ-স্বরূপের সমুপস্থাপন করে নাই। অভিধা-বৃত্তির কোনও না কোনও ধর্ম্মপুরস্কারে স্বার্থ-প্রতিপাদনে নিয়ম থাকায় উহা নির্ব্বিকল্পক বস্তু-স্বরূপমাত্র সমুপস্থাপনে সর্ব্বথা অসমর্থই। এই কারণেই নানাপ্রসঙ্গে শ্রুতি, স্মৃতিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপকে অশব্দ[2] অবাচ্য বলা হইয়াছে। সুতরাং ঐ সকল শ্রুতি লক্ষণা-বৃত্তির দ্বারাই, নির্ব্বিশেষ সন্মাত্রের সমর্পণ করিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব ভাব-মুখে বা অভাব-মুখে যে ভাবেই ধরি না কেন, উহা যে নির্ব্বিশেষ বস্তু-স্বরূপ-মাত্রেরই সমর্পণ করিয়াছে, তাহা অসন্দিগ্ধ।

এই পর্য্যন্ত বিচারের দ্বারা ইহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, অস্থূলাদি শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত যে অক্ষর অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দ শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্মবস্তু তাহাই দ্বৈতসামান্যনিষেধোপলক্ষিতরূপে "অদ্বৈত" কথাটীর অর্থ হিসাবে কথিত হইয়াছে।

ইহাতে নিম্নোক্ত প্রকার আপত্তি হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক যে, যাহা যে অধিকরণে প্রসক্ত সেই অধিকরণে তাহারই নিষেধ লোকতঃ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, অন্যথা অপ্রসক্তের নিষেধ কথিত হইলে, ঐ প্রকারের কথন, অনাকাঙ্ক্ষিতের অভিধান হওয়ায়, বক্তা অপার্থক নামক নিগ্রহ-স্থানে বিনিগৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মে সর্ব্বথা অপ্রসক্ত যে দ্বৈত-প্রপঞ্চ তাহার সামান্যতঃ নিষেধের দ্বারা উপলক্ষিত-ভাবে নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মের কীর্ত্তন অনাকাঙ্ক্ষিতাভিধানই হইয়া যাইতেছে।

এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলিব যে, বাস্তবিকপক্ষেই যদি জড়প্রপঞ্চের প্রসক্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাত্মাতে না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে যে জগৎপ্রপঞ্চের সামান্যতঃ নিষেধ অস্থূলাদি শ্রুতির দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অপার্থকই

১। "সন্মাত্রত্বঞ্চসত্তাত্বম্।......বিশেষণার্থত্বেঽপি স্বার্থাপরিত্যাগ এব।" (শাং ভাং, তৈ, ২।১)।

২। "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্"। ......(কঠ, ১।৩।১৫)।

হয়। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ব্রহ্মাত্মাতে জড়প্রপঞ্চ অপ্রসক্তই নহে, উক্ত ব্রহ্মে উহা প্রাপ্তই আছে। অতএব অস্থূলাদি শ্রুতি প্রসক্তের প্রতিষেধ করায় উহাতে অপার্থকত্বের কথাই উঠে না।

"ব্রহ্মবিদাপ্নোতিপরম্" এই বাক্যের দ্বারা বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় হিসাবে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্মাত্মার উপক্রম করিয়া, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে জ্ঞাতব্য ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। পশ্চাৎ ঐ উপক্রান্ত এবং লক্ষিত ব্রহ্মের বিশেষ[১] পরিজ্ঞানের অভিপ্রায়ে, "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ।।" এই শ্রুতির দ্বারা প্রক্রান্ত ব্রহ্মাত্মা হইতে আকাশাদির সৃষ্টি অর্থাৎ উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

এই স্থলে ইহাও আমাদের বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক যে. "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতির দ্বারা স্বরূপতঃ লক্ষিত ব্রহ্মের বিস্তরতঃ পরিজ্ঞাপন, "তস্মাদ্বা এতস্মাদত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ"......এই শ্রুতি কেমন করিয়া করিল এবং এই আলোচনার ফলে আমরা আমাদের জ্ঞাতব্য সম্বন্ধে বহু তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে পারিব। কাজেই এই বিচার উপেক্ষণীয় নহে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই স্বরূপ-লক্ষণপর শ্রুতির দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে সৎ, চিৎ এবং অনন্ত বলিয়া বুঝিয়াছি। এই সত্যতা ও অনন্ততা সম্বন্ধেই বিশেষ পরিজ্ঞাপন, "তস্মাদ্বা" ইত্যাদি শ্রুতি করিয়াছেন। কোনও বস্তু তাহা হইলেই অসঙ্কুচিতভাবে অনন্ত হয়. যদি তাহাতে সর্ব্বপ্রকারের অনন্ততা থাকে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের যে অনন্ততা কীর্ত্তিত হইয়াছে, সঙ্কোচের কারণ না থাকায়, তাহা অসঙ্কুচিতই বুঝিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকারের অনন্ততাই ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছে। অন্ততা অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নতা তিন প্রকারে হইয়া থাকে। যথা দৈশিক-পরিচ্ছিন্নতা, কালিক-পরিচ্ছিন্নতা এবং বস্তুকৃত-পরিচ্ছিন্নতা। অতএব অনন্ততাও[২] দৈশিক-পরিচ্ছিন্নতাভাব, কালিক-পরিচ্ছিন্নতা-ভাব এবং বস্তুকৃত-পরিচ্ছিন্নত্বের অভাব এই তিন প্রকার। অসংকোচে এই তিন প্রকারের অপরিচ্ছিন্নত্বরূপ আনন্ত্যই, শ্রুতি "অনন্ত" এই কথার দ্বারা ব্রহ্ম সম্পর্কে কীর্ত্তন করিয়াছেন। কোনও দেশের সহিত যাহার সম্পর্ক আছে এবং অপর কোনও দেশের সহিত যাহার সম্পর্ক নাই, এমন বস্তুগুলিকে বলা হয়

১। "পুনস্তস্যৈব বিস্তরেণার্থনির্ণয়ঃ কর্ত্তব্য ইত্যুত্তরস্তদ্বিবৃতিস্থানীয়ো গ্রন্থ আরভ্যতে তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদি"।
(শাং ভাং তৈঃ ২।১)।

২। "তত্র ত্রিবিধং হ্যানন্ত্যং দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চেতি।" (শাং ভাং তৈঃ ২।১)।

দেশ-পরিচ্ছিন্ন। ঘট, পট প্রভৃতি মূর্ত্তবস্তুর ইহাই স্বভাব যে ঐগুলি যখন কোনও দেশ-বিশেষের সম্বন্ধী হয়, তখনই উহারা অন্যান্য দেশের সহিত সম্পর্করহিত হইয়া থাকে। ঐ সকল বস্তুকে লোক-সমাজ দেশ-পরিচ্ছিন্ন বলিয়া ব্যবহার করে। আকাশ সম্বন্ধে দেশ-পরিচ্ছিন্নত্বের ব্যবহার লোকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ এমন কোনও দেশের কল্পনা আমরা করি না, যে দেশ, অবকাশ-দান-স্বভাব আকাশের সম্বন্ধী হয় না। এই যে লোকতঃ সিদ্ধ দেশ-পরিচ্ছিন্ন ভূতাকাশ, তাহার হিসাবে "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতি ব্রহ্মাত্মার কীর্ত্তন করিয়াছে। কাজেই ঐ শ্রুতি অর্থতঃ ব্রহ্মাত্মার দেশাপরিচ্ছিন্নত্ব প্রতিপাদন করিয়া, উহার অনন্ততা সম্বন্ধে বুদ্ধির পরিপূর্ত্তি-সম্পাদন করিতেছে। যেই ব্রহ্মাত্মার কার্য্য ভূতাকাশই দেশতঃ অপরিচ্ছিন্ন, তিনি স্বয়ং যে দেশ-পরিচ্ছিন্ন হইবেন না, হইতে পারেন না, ইহা অসন্দিগ্ধ। দেশপরিচ্ছিন্ন[১] বস্তু হইতে দেশাপরিচ্ছিন্ন বস্তুর উৎপত্তিতে কোনও দৃষ্টান্ত নাই। ভূতাকাশ দেশাপরিচ্ছিন্ন হইলেও বেদান্ত-সিদ্ধান্তে উহা কিন্তু কালাপরিচ্ছিন্ন নহে। কারণ এই মতে আকাশের উৎপত্তি স্বীকৃত আছে। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" শ্রুতির দ্বারাই আকাশের উৎপত্তি প্রমাণিত আছে। যাহার উৎপত্তি বা বিনাশ আছে তাহা কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্নই হইয়া থাকে। যাহা কাল-বিশেষের সম্বন্ধী হয় না, তাহাকে বলা হয় কালপরিচ্ছিন্ন। উৎপন্ন বস্তুর উৎপত্তি-পূর্ব্বকালের সম্বন্ধী এবং বিনাশী বস্তু বিনাশোত্তরকালের সম্বন্ধী হইতে পারে না, কাজেই ঐ প্রকারের বস্তুগুলি কাল-পরিচ্ছিন্নই হয়।

শ্রুতি ব্রহ্মাত্মা হইতে আকাশাদিরই উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন কিন্তু ব্রহ্মাত্মার অপর কোনও বস্তু হইতে উৎপত্তির কথা কোথাও বলেন নাই; অনুমানাদি অপর কোনও প্রমাণের দ্বারাও উহার উৎপত্তি প্রমাণিত হয় না। কাজেই, অনুৎপন্ন-ভাবত্বনিবন্ধন ব্রহ্মাত্মার নিত্যত্ব[২] প্রমাণিত হয় এবং শ্রুতিও বহুশঃ ব্রহ্মাত্মার অমরত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাহা নিত্য তাহা সনাতন, কাল-বিশেষের অসম্বন্ধিত্বরূপ কালাপরিচ্ছিন্নত্ব তাহাতে থাকিতে পারে না। অতএব নিত্যত্বনিবন্ধন ব্রহ্মাত্মার কালপরিচ্ছিন্নত্ব. ইহাও অর্থতঃ "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মাত্মাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কারণ ঐ শ্রুতি ব্রহ্মাত্মাকেই সমস্ত কার্য্যের মূলকারণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রকার হইলে ব্রহ্মাত্মার

১। "নহ্যসর্ব্বগতাৎ সর্ব্বগতাং সর্ব্বগতমুৎপদ্যমানং লোকে কিঞ্চিদ্ দৃশ্যতে"। (শাং ভাং তৈঃ ২।১)।

২। যদিও অনুৎপন্নত্বে সতি ভাবত্ব অবিদ্যা অন্তর্ভাবে নিত্যত্বের ব্যভিচারী, তথাপি ব্রহ্মাত্মার নিত্যত্ব শ্রুতি-প্রমাণ-সিদ্ধ। এই অভিপ্রায়েই অনুমানের পর শ্রুতির উল্লেখ আছে।

অনাদিত্বও ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত বলিয়া ধরিতে হয় এবং অনাদিভাব পদার্থ বলিয়া ব্রহ্মাত্মার সনাতনত্ব শ্রুত্যভিপ্রেত হইলে ব্রহ্মাত্মার কালাপরিচ্ছিন্নত্বরূপ আনন্ত্যও ঐ শ্রুতি অর্থতঃ প্রতিপাদন করিয়াছে অর্থাৎ তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদি শ্রুত্যর্থের পরিশীলনের দ্বারাই যে ব্রহ্মাত্মার কালাপরিচ্ছিন্নত্বরূপ আনন্ত্য আমরা প্রাপ্ত হই, ইহা অসন্দিগ্ধ।

বস্তু-কৃত-পরিচ্ছিন্নতা বা বস্তু-পরিচ্ছেদ কথার দ্বারা আমরা এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভেদকে বুঝিয়া থাকি। ঘট-পদার্থ বস্তুপরিচ্ছিন্ন কারণ তাহাতে পটের ভেদরূপ বস্তু-পরিচ্ছেদ আছে। এইভাবে জড় বা কার্য্য পদার্থমাত্রই বস্তু-পরিচ্ছিন্ন হইবে। কারণ প্রত্যেক জড় বা কার্য্য পদার্থেই জড়ান্তর বা কার্য্যান্তরের ভেদ আছে। ব্রহ্মাত্মাতে কিন্তু এই বস্তুকৃত পরিচ্ছিন্নতা বা বস্তু-পরিচ্ছেদ নাই। এই যে বস্তু-পরিচ্ছেদ ইহা স্বগত-ভেদ সজাতীয়-ভেদ বা বিজাতীয়-ভেদ[1] এই ত্রিবিধ ভেদাউম্বনে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। নিরবয়বত্ব-নিবন্ধন স্বগত-ভেদ ব্রহ্মাত্মাতে সম্ভব নহে। বৃক্ষাদি সাবয়ব বস্তুতেই তদীয় অবয়ব শাখাদির ভেদরূপ যে স্বগত-ভেদ. তাহা দেখা যায়। দ্বিতীয় কোনও চিদ্বস্তু অদ্যাবধি প্রমাণ-সিদ্ধ না হওয়ায় এবং শ্রুতিবাধিত হওয়ায় ব্রহ্মাত্মাতে সজাতীয়-ভেদ সম্ভব নহে। স্বসমানজাতীয় বস্ত্বন্তরের যে স্ববৃত্তি-ভেদ তাহাকেই লোকে সজাতীয়-ভেদ বলা হয়। একটী মানুষে যে অপর মানুষের ভেদ তাহাই সজাতীয় ভেদ। বিজাতীয় বস্তুগুলির যে পরস্পর ভেদ, তাহাকেই বলা হয় বিজাতীয় ভেদ। যেমন মানুষে পশুর ভেদ বা আকাশাদি জড় বস্তুতে চেতনের ভেদ। বস্তুকৃত-পরিচ্ছিন্নতার মধ্যে কেবল এই বিজাতীয়-ভেদেরই ব্রহ্মাত্মাতে আশংকা হইতে পারে। কারণ, ব্রহ্মাত্মা স্বয়ং চিদাত্মক বস্তু, তাহাতে অচিৎ বা জড় যে আকাশাদি বস্তু, তাহার ভেদ থাকা স্বাভাবিক। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু বিজাতীয় এই আকাশাদির ভেদ, ব্রহ্মাত্মাতে পারমার্থিক নহে। সর্ব্বকারণ ব্রহ্মাত্মাতে সর্ব্বকার্য্যের অনন্যত্বই[2] সিদ্ধান্ত আছে। বিশেষ কথা এই যে, জড়বস্তু যে, আকাশাদি, তাহাদের ভেদ, চেতন ব্রহ্মাত্মাতে স্বীকার করিলেও, উহার দ্বারা ব্রহ্মাত্মাকে বস্তু-পরিচ্ছিন্ন করা যায় না। কারণ কার্য্যমাত্রই সদসদ্বিলক্ষণ মিথ্যাভূত বলিয়া তাহার ভেদও ঐ প্রকার মিথ্যাই হইবে। মিথ্যার সম্পর্কে অধিষ্ঠানের যে কোনও হানি বা বৃদ্ধি হয় না, ইহা শুক্তিরজত স্থলে সিদ্ধই আছে। অতএব বস্তু-কৃতপরিচ্ছিন্নতা, ব্রহ্মাত্মার সম্ভব নহে। এই যে তৃতীয় প্রকারের আনন্ত্য, ইহাও আমরা "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতি হইতেই অর্থতঃ প্রাপ্ত হই। এই শ্রুতি আকাশাদি জড়বস্তুকে ব্রহ্মাত্মার কার্য্যরূপে বর্ণিত করিয়াছে এবং বাচারম্ভণ

১। "এবং সজাতীয়ভেদো বিজাতীয়ভেদঃ স্বগতভেদশ্চেতি ত্রিবিধোভেদো বস্তুপরিচ্ছেদঃ"। (মধু, গী, ২।১৬)।

২। কথং পুনঃ সর্ব্বানন্ত্যত্বং ব্রহ্মণঃ ইত্যুচ্যতে সর্ব্ববস্তুকারণত্বাৎ। (শাং ভাঃ তৈঃ ২।১)।

শ্রুতি কার্য্যমাত্রকে সদসদ্বিলক্ষণ মিথ্যাভূত বলিয়াছে। সুতরাং মিথ্যাভূত আকাশাদি জড়প্রপঞ্চের মিথ্যাভূত ভেদ, চেতন ব্রহ্মাত্মাতে স্বীকার করিলেও, উহার দ্বারা ব্রহ্মাত্মার পারমার্থিক কোনও বস্তু-পরিচ্ছেদ প্রমাণিত হয় না। মিথ্যাভূত হইলেই তাহা বস্তুপরিচ্ছিন্ন হয়, ইহা আমরা ঘট-পটাদি স্থলে দেখিতে পাই। অতএব মিথ্যাত্বের ব্যাপক যে বস্তু-পরিচ্ছিন্নত্ব তাহার অভাবের দ্বারা ব্রহ্মাত্মাতে অমিথ্যাত্ব অর্থাৎ সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে। কাজেই, বুঝা যাইতেছে যে, "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতি, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি প্রতিপাদিত অসংকুচিত আনন্ত্যের সমর্থন করিয়া, ব্রহ্মাত্মার অমিথ্যাত্বও সমর্থন করিতেছে এবং "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতি, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রুতির বিস্তৃত ব্যাখ্যামাত্রই। সৃষ্টি প্রতিপাদনে উহার পরম তাৎপর্য্য নহে, ব্রহ্ম-স্বরূপ সমর্থনেই উহার পরম সার্থকতা।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতির সাহায্যে আমরা যে নির্ব্বিকল্প পরমতত্ত্ব বস্তুকে পাই, কেবল "ব্রহ্ম" পদটীর নৈগমিক নির্ব্বচনের দ্বারাও আমরা অবিকল-ভাবে সেই তত্ত্ব-বস্তুকে পাইয়া থাকি। কোনও পদের প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিভাগ-পূর্ব্বক যে শাব্দিক নিরূপণ করা হয়, অর্থাৎ যাহা যোগ-নিরুক্তি তাহার নাম নৈগমিক-নির্ব্বচন। নিগম বা নিরুক্তশাস্ত্রে উক্ত প্রণালীতে নানাপ্রকার উপাখ্যানের সাহায্যে বৈদিক-শব্দের অর্থ-নিরূপণ করা হইয়াছে। নিগম, নিরুক্ত ও ব্যাকরণ[১] পরস্পর বিলক্ষণ এই তিন প্রকার পন্থা অবলম্বনে, সাধারণতঃ বৈদিক শব্দের অর্থ-নিরূপণ করা হইয়া থাকে। (জাতি প্রভৃতি অর্থের সম্পর্কে এই পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন নাই) প্রকৃতি ও প্রত্যয় এই উভয়ের অর্থের মধ্যে একমাত্রের অর্থে যে প্রকৃতি-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন বিশিষ্ট শব্দের বৃত্তি তাহা নিগম[২]। উভয় অর্থের সম্পর্ক নিয়া বিশিষ্টার্থে পদের যে বৃত্তি তাহা নিরুক্ত[৩]। এই দুই স্থলেই অর্থটী প্রসিদ্ধার্থ হইতে বিলক্ষণ হইবে। প্রকৃত স্থলে আমরা নৈগমিক পন্থায় "ব্রহ্ম" শব্দ হইতে পরমতত্ত্বকে পাইতে পারি।

বৃদ্ধ্যর্থক "বৃহি" ধাতুর উত্তর "মনঙ্" প্রত্যয়ে "ব্রহ্মন্" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে।

১। "তত্র নিগমনিরুক্তব্যাকরণানামেবং রূপপদার্থানুগমহেতুনাং বিদ্যমানত্বাৎ।"
(পঞ্চপাদিকা ৮০৯ পৃঃ কলি সং)

২। "নিগমো নাম প্রসিদ্ধার্থতদবয়বৌপরিত্যক্তশব্দস্য শব্দৈকদেশানুগমেনার্থান্তরে বৃত্তিঃ।"
(পঞ্চপাদিকা ৮০৯ পৃঃ কলি সং)

৩। নিরুক্তং নাম শব্দস্য সর্ব্বাবয়বার্থানুগমেন প্রসিদ্ধার্থাদর্থান্তরে বৃত্তিঃ। (পঞ্চপাদিকা ৮০৯ পৃঃ কলি সং)

প্রথমার এক বচনে উহার 'ব্রহ্ম' এই রূপ হয়। এই স্থলে "মনঙ্" প্রত্যয়ের অর্থ পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধি অর্থাৎ মহত্ত্ব অর্থে প্রকৃতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন "ব্রহ্মন্" এই বিশিষ্ট শব্দটীর নৈগমিক-বৃত্তি বুঝিতে হইবে। অতি বিস্তৃত বলিয়া প্রত্যয়ার্থ পরিত্যাগের হেতু প্রদর্শিত হইল না। এই বৃদ্ধি বা মহত্ত্ব প্রকৃত স্থলে নিরতিশয়ই হইবে। কারণ মহত্ত্বের সঙ্কোচক কোনও কারণ প্রকৃত স্থলে নাই। সঙ্কোচক-হেতু না থাকিলে শব্দের দ্বারা অপরিশেষতঃই অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং নিগম-সাহায্যে "ব্রহ্মন্" পদ হইতে আমরা নিরতিশয় মহৎরূপ একটী (আমাদের নিকট অপ্রসিদ্ধ) অর্থ পাইতেছি। এই নিরতিশয় মহত্ত্ব হইতেই ঐ মহৎ বস্তুটী যে চিৎস্বরূপ, তাহাও আমরা অবধারণ করিতে পারি। কারণ অচিৎ বা জড় হইলেই তাহা পরার্থ হয়। জড়ের নিজ প্রয়োজন অসম্ভব বলিয়াই উহা পরার্থ হইতে বাধ্য। যাহা পরার্থ হয় তাহা কখনও নিরতিশয় মহৎ হইতে পারে না। সুতরাং নিরতিশয় মহত্ত্বের অনুপপত্তির দ্বারাই উহার চিদ্রূপত্ব পাওয়া যাইতেছে। যাহা কাল বা দেশের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন তাহা কখনও নিরতিশয় মহৎ হয় না। সুতরাং নিরতিশয় মহত্ত্বের অনুপপত্তিবশতঃ কালাপরিচ্ছিন্নত্ব ও দেশাপরিচ্ছিন্নত্ব পাওয়া যাইতেছে। বস্তুকৃতাপরিচ্ছিন্নত্বও ঐ মহত্ত্বের অনুপপত্তিবশতঃ আমরা পাইতে পারি। কারণ স্বগত সজাতীয় বা বিজাতীয়ভেদ থাকিলে অর্থাৎ স্বসমানসত্তাবিশিষ্ট ঐ প্রকার ভেদের আশ্রয় হইলে তাহা কখনও নিরতিশয় মহৎ হয় না। উক্ত ব্রহ্মের যে আনন্দরূপতা তাহাও ঐ নির্ব্বচন সামর্থেই পাওয়া যায়। কারণ অনানন্দ হইলেই তাহা স্বয়ং পুরুষার্থ হয় না এবং যাহা স্বতঃ পুরুষার্থ নহে তাহা কখনও নিরতিশয় মহৎ হয় না। এই নির্ব্বচন-সামর্থ্যেই আমরা ব্রহ্মপদার্থের নিত্যশুদ্ধমুক্তভাবতাও প্রাপ্ত হই।

অতএব একণে ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, সেই অদ্বৈত তত্ত্বকে আমরা উপক্রমে বলিয়াছি, নানাশ্রুতির সাহায্যে এমন কি কেবল "ব্রহ্মন্" পদের নির্ব্বচন সামর্থ্যেও আমরা সেই চরম ও পরমতত্ত্বকেই প্রাপ্ত হই।

এ বিষয়ে বহু বহু বক্তব্য থাকিলেও একের পরে অন্য মনের কোনে আঘাত করিলেও কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমাকে অসম্পূর্ণভাবেই উপসংহার করিতে হইবে। সুতরাং দ্বৈতপ্রপঞ্চের নিষেধ সম্বন্ধে যে অপ্রসক্ত-প্রতিষেধত্বের ফক্কিকাটী অবসরক্রমে উঠিয়াছিল, প্রাসংগিক বিচারের বাধায় যাহার পরিষ্কার উত্তর দেওয়া সেই স্থানে সম্ভব হয় নাই; তৎসম্পর্কে সাধারণ কিছু বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

"অস্থূলমনণু" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বস্তুতে যে দ্বৈত-সামান্যের নিষেধ প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ নহে। কারণ,

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যতো জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মে জগদুপাদানত্ব কীর্ত্তিত। উপাদান-কারণে সমাশ্রিত হইয়াই, সকল কার্য্য সমুৎপন্ন হয়। কাজেই আপাততঃ ঐ শ্রুতির দ্বারাই ব্রহ্মে দ্বৈত-প্রপঞ্চের[1] প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ প্রমাণিত আছে, এই প্রকারের ভ্রান্তি লোকের হয়। এই প্রকারে ভ্রম-প্রসঞ্জিত যে দ্বৈত-প্রপঞ্চ, তাহার নিষেধ, "অস্থূলমনণু" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব এই দ্বৈতপ্রপঞ্চের সামান্যতঃ নিষেধকে অপ্রসক্তের প্রতিষেধ মনে করা নিতান্তই ভ্রমসঙ্কুল।

এক্ষণে আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, যাহা নির্ব্বিকল্প শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব সচ্চিদানন্দৈকরস চরম ও পরম-তত্ত্ব যে জ্যোতির আধ্যাসিক সম্পর্কে এই জড়-জগৎ প্রত্যক্ষতঃ প্রকাশিত হইয়াছে, যে অখণ্ড-আনন্দের মিথ্যা ভূততাদাত্ম্যে এই জড়-প্রপঞ্চ হইতেও আনন্দ-লেশ সমনুভূত হয়, যে অখণ্ড সত্তার কল্পিত সংস্পর্শে আসিয়াই, সদসদ্বিলক্ষণ এই জড়-জগৎ আজ পরম সৎ হিসাবে সমাদৃত, সেই পরম-তত্ত্বকেই দ্বৈত-প্রপঞ্চের সামান্যতঃ নিষেধের দ্বারা উপলক্ষিত করিয়া শাস্ত্রে "অদ্বৈত" প্রভৃতি কথায় বলা হইয়াছে ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

[1] "সদেব সোম্যেদমগ্রআসীদিতি পূর্ব্ববাক্যে ইদং শব্দার্থ দ্বৈতসামান্যতাদাত্ম্যস্য লক্ষ্যতে।"

(লঘুচন্দ্রিকা, ৫পৃঃ)

আয়ুর্বেদে তত্ত্বজিজ্ঞাসা

অধ্যাপক শ্রীতারাপদ চৌধুরী, এম.এ., বি.এল., পি-এচ. ডি.

(পূর্বানুবৃত্তি)

চরক

সমগ্র চরকসংহিতাই দার্শনিক তথ্যে পূর্ণ। কোন আয়ুর্বেদীয় বস্তুর যুক্তিদ্বারা প্রতিপাদনের অবসর আসিলেই গ্রন্থকার দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; ফলে ইহা দাঁড়াইয়াছে যে কেবল চিকিৎসাক্রম ও ঔষধপথ্যের স্বরূপ ও গুণাগুণের বর্ণনাই এই প্রসঙ্গ হইতে সাধারণতঃ মুক্ত। অল্পবিস্তর দার্শনিক তথ্যের ইঙ্গিত সমগ্র গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিলেও বিস্তৃত আলোচনা প্রধানতঃ এই সকল অধ্যায়ে বর্ত্তমান:—শ্লোকস্থানে (বা সূত্রস্থানে)—দীর্ঘজীবিতীয় (১।১), ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় (১।৮), তিস্রৈষণীয় (১।১১), যজ্জঃপুরুষীয় (১।২৫), আত্রেয়ভদ্রকাপ্যীয় (১।২৬), এবং অর্থে দশমহামূলীয় (১।৩০); বিমানস্থানে—জনপদধ্বংসনীয় (৩।৩), ত্রিবিধরোগবিশেষবিজ্ঞানীয় (৩।৪), রোগানীক (৩।৬), এবং রোগভিষগ্-জিতীয় (৩।৮); এবং শারীরস্থানে—কতিধাপুরুষীয় (৪।১), অতুল্যগোত্রীয় (৪।২), খুড্ডীকাগর্ভাবক্রান্তি (৪।৩), মহতীগর্ভাবক্রান্তি (৪।৪) এবং পুরুষবিচয় (৪।৫)। আয়ুর্বেদকে 'সর্বপারিষদ' বা 'সর্ববেদপারিষদ' বলা হইয়া থাকে। সেইজন্য আয়ুর্বেদের অবিরুদ্ধ ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত এবং অন্যান্য বহুশাস্ত্রের মতামত আপাততঃ পরস্পরবিরুদ্ধ হইলেও ইহাতে স্থান পাইয়াছে।[1] তন্মধ্যে প্রথমোক্ত চারিটীর অনুগ্রাহকতা সুস্পষ্ট, বিশেষতঃ সাংখ্যযোগের প্রতি পক্ষপাতিতা এত প্রবল যে গ্রন্থকারকে তন্মতাবলম্বী বলিয়াই আপাততঃ মনে হয়,[2] কিন্তু সূক্ষ্মবিচারে প্রতীত হয় যে উক্তরূপ পক্ষপাতিতাসত্ত্বেও গ্রন্থকার যেন ঐ সকল

১। সর্বপারিষদমিদং শাস্ত্রং, তেনায়ুর্বেদাবিরুদ্ধবৈশেষিকসাংখ্যাদিদর্শনভেদেন বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়মানো ন পূর্বাপরবিরোধমাবহতি। চক্র০ ১।৮।৩।

২। দেখুন, ১।১৩।৩, সাংখ্যৈঃ সংখ্যাতসংখ্যেয়ৈঃ সহাসীনং পুনর্বসুম্। জগদ্ধিতার্থং পপ্রচ্ছ বহ্নিবেশঃ স্বসংশয়ম্॥ ১।২৫।১৫, রাশিঃ ষড়্ধাতুকো হ্যেষঃ সাংখ্যৈরাদ্যৈঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ৩।৮।৩৪, যথা আদিত্যঃ প্রকাশকস্তথা সাংখ্যজ্ঞানং প্রকাশকমিতি, ৪।১।১৫১, অয়নং পুনরাখ্যাতমেতদ্ যোগস্য যোগিভিঃ। সংখ্যাতধর্মৈঃ সাংখ্যৈশ্চ মুক্তৈর্মোক্ষস্য লক্ষণম্॥ ৪।৫।১৭, যোগং যয়া সাধয়তে সাংখ্যঃ সংপদ্যতে যথা, ইত্যাদি।

দর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্যই দেখিতে পাইয়াছেন এবং বিরোধকে মৌলিক ভাবেন নাই। চরকের দার্শনিক মতবাদের সংক্ষিপ্তসার মোটামুটি এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে।

[আয়ুঃ ও আয়ুর্বেদ]

হিত, অহিত, সুখ ও দুঃখ এই চতুষ্প্রকার আয়ুঃ, তাহার হিতাহিত ও প্রমাণ এবং স্বরূপ যাহাতে উক্ত হইয়াছে তাহাকে আয়ুর্বেদ বলে।[১] আয়ু বলিতে শরীর, ইন্দ্রিয়সকল, মন ও আত্মার সংযোগ[২] অথবা তজ্জনিত চৈতন্যানুবৃত্তি বুঝায়[৩] এবং ধারী, জীবিত, নিত্যগ ও অনুবন্ধ ইহার পর্য্যায়।[৪] এই আয়ুর্বেদ দ্বারা হেতু, লিঙ্গ ও ঔষধের জ্ঞান হয় এবং ইহা স্বস্থ ও আতুরের পরমমার্গস্বরূপ।[৫] ইহার জ্ঞান সামান্য, বিশেষ, গুণ,

আয়ুর্বেদের লক্ষণ ও বিষয়

১। ১।১।৪১, হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতম্। মানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্বেদঃ স উচ্যতে। এই চতুষ্প্রকার আয়ুর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ১।৩০।২৪ সংখ্যক গ্রন্থাংশে—তত্র শারীরমানসাভ্যাং রোগাভ্যাম্ অনভিদ্রুতস্য বিশেষেণ যৌবনবতঃ সমর্থানুগতবলবীর্যযশঃ-পৌরুষপরাক্রমস্য জ্ঞানবিজ্ঞানেন্দ্রিয়ার্থবলসমুদয়ে বর্ত্তমানস্য পরমর্দ্ধিরুচিরবিবিধোপভোগস্য সমৃদ্ধসর্বারম্ভস্য যথেষ্টবিহারিণঃ সুখমায়ুরুচ্যতে, অসুখমতো বিপর্য্যয়েণ; হিতৈষিণঃ পুনর্ভূতানাং পরস্বাদুপরতস্য সত্যবাদিনঃ শমপরস্য পরীক্ষ্যকারিণোঽপ্রমত্তস্য ত্রিবর্গং পরস্পরেণানুপহতমুপসেবমানস্য পূজার্হসংপূজকস্য জ্ঞানবিজ্ঞানোপশমশীলস্য বৃদ্ধোপসেবিনঃ সুনিয়তরোগরোষের্ষ্যামদমানবেগস্য সততং বিবিধপ্রদানপরস্য তপোজ্ঞানপ্রশমনিত্যস্যাধ্যাত্মবিদস্তৎপরস্য লোকমিমং চামুং চাবেক্ষমাণস্য স্মৃতিমতিমতো হিতমায়ুরুচ্যতে; অহিতমতো বিপর্য্যয়েণ।

২। ১।১।৪২, শরীরেন্দ্রিয়সত্ত্বাত্মসংযোগো ধারি জীবিতম্। নিত্যগশ্চানুবন্ধশ্চ পর্য্যায়ৈরায়ুরুচ্যতে॥ "ধারয়তি শরীরং পূতিতাং গন্তুং ন দদাতীতি ধারি। জীবয়তি প্রাণান্ ধারয়তীতি জীবিতম্। নিত্যং শরীরস্য ক্ষণিকত্বেন গচ্ছতীতি নিত্যগঃ। অনুবধ্নাত্যায়ুরপরাপরশরীরাদিসংযোগরূপতয়েত্যনুবন্ধঃ।"—চক্র০।

৩। ১।৩০।২২, চেতনানুবৃত্তিরিতি চৈতন্যসন্তানঃ, এতচ্চ গর্ভাবধিমরণপর্য্যন্তং বোদ্ধব্যং তদূর্ধ্বং চেতনানন্বুবৃত্তেঃ, সাক্ষাদনুপলব্ধত্বেনৈবানুবৃত্তিরিতি ভাবঃ। ন চ বাচ্যং প্রসুপ্তস্য চৈতন্যবিচ্ছেদো ভবতি, যতস্তত্রাপি 'সুখমহমস্বাপ্সম্' ইত্যুত্তরকালীনপ্রতিসন্ধানদর্শনাৎ সূক্ষ্মজ্ঞানমস্ত্যেব।

৪। ১।১।২৪, হেতুলিঙ্গৌষধজ্ঞানং স্বস্থাতুর-পরায়ণম্।—"হেতুগ্রহণেন সন্নিকৃষ্টবিপ্রকৃষ্টব্যাধিহেতুগ্রহণম্; লিঙ্গগ্রহণেন চ ব্যাধেরারোগ্যস্য চ কৃৎস্নং লিঙ্গমুচ্যতে, তেন ব্যাধ্যারোগ্যে অপি লিঙ্গশব্দবাচ্যো, যতস্তাভ্যামপি হি তল্লিঙ্গং লিঙ্গ্যত এব; ...... ঔষধগ্রহণেন চ সর্বপথ্যাবরোধঃ শরীরং চাত্র হেতৌ লিঙ্গে চান্তর্ভবতি।"—চক্র০।

৫। ১।৩০।২৬, প্রয়োজনং চাস্য স্বস্থস্য স্বাস্থ্যরক্ষণমাতুরস্য বিকারপ্রশমনং চ।

দ্রব্য, কর্ম ও সমবায় এই ষট্‌পদার্থের জ্ঞানের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।[১] আয়ুর্বেদের উপযোগি-ভাবে ইহাদের নির্দেশ ও লক্ষণ দেওয়া যাইতেছে।[২] নিত্যগ ও আবশ্যিক সর্বকালেই সকলভাবের অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্মের বৃদ্ধির কারণ সামান্য এবং হ্রাসের কারণবিশেষ[৩]—উভয়ের প্রবৃত্তি অর্থাৎ শরীরের সহিত অভিসম্বন্ধই কিন্তু সেই কারণ; সামান্য একত্ববুদ্ধির, কিন্তু বিশেষ পৃথক্‌ত্ববুদ্ধির জনক, যেহেতু সদৃশবস্তুতাই সামান্য এবং তাহার বিপর্যয় অর্থাৎ বিসদৃশবস্তুতা বিশেষ।[৪] অর্থসকল,[৫] গুর্বাদিগণ, বুদ্ধি,

আয়ুর্বেদজ্ঞের তাত্ত্বিক-বিশ্লেষণ পদার্থষট্‌ক

১। ১।১।২৭-২৯, ঋষয়শ্চ ভরদ্বাজাজ্জগৃহুস্তং প্রজাহিতম্। দীর্ঘমায়ুশ্চিকীর্ষন্তো বেদং বর্ধনমায়ুষঃ॥ মহর্ষয়স্তে দদৃশুর্যথাবজ্জ্ঞানচক্ষুষা। সামান্যং চ বিশেষং চ গুণান্ দ্রব্যাণি কর্ম চ॥ সমবায়ং চ তজ্জ্ঞাত্বা তন্ত্রোক্তং বিধিমাস্থিতাঃ। লেভিরে পরমং শর্ম জীবিতং চাপ্যনিত্বরম্॥

২। ১।১।৪৪-৪৫, সর্বদা সর্ব-ভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারণম্। হ্রাসহেতুর্বিশেষশ্চ প্রবৃত্তিরুভয়স্য তু॥ সামান্যমেকত্বকরং বিশেষস্তু পৃথক্ত্বকৃৎ। তুল্যার্থতা হি সামান্যং বিশেষস্তু বিপর্যয়ঃ॥ চক্রপাণি ও গঙ্গাধর এই শ্লোকদ্বয়ের অতিবিস্তৃত ও পরস্পর বিসদৃশ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যা হইতে যাহা নিজের মনঃপূত বোধ হইয়াছে তাহাই উপরে দিয়াছি।

৩। "অথ বৈশেষিকোক্তানামন্ত্যবিশেষাণামিহ শাস্ত্রে চিকিৎসায়ামনুপযুক্তত্বাৎ তদ্বিশেষ ধর্মব্যাবর্তকত্বযোগাৎ সামান্যবিশেষানেব হ্রাসকারণত্বেনাহ—হ্রাসহেতুরিত্যাদি। ......বিশেষশ্চেহ বিরুদ্ধবিশেষোঽভিপ্রেতঃ; তেনোত্তরত্র বিরুদ্ধবিশেষমেব হ্রাসহেতুতয়া তত্র তত্র বক্ষ্যতি; যথা—'বৃদ্ধিঃ সমানৈঃ সর্বেষাং বিপরীতৈর্বিপর্যয়ঃ' (অস্য ১।১।১৩) ইতি, তথা, 'বিপরীতগুণৈর্দেশমাত্রা-কালোপপাদিতৈঃ' (১।১।৬২) ইত্যাদি। ...... অবিরুদ্ধবিশেষস্তু যদ্যপি হ্রাসে বৃদ্ধৌ বা ন্যকারণম্, যথা পৃথিব্যামনুষ্ণাশীতস্পর্শঃ বাতস্য শৈত্যং ন বর্ধয়তি নাপি হ্রাসয়তি তথাপ্যগ্নিক্ষীয়মাণানাং ধাতূনাম-সমানত্বেনাজনকত্বাদ্ধ্রাসকারণমেব ভবতি; যতোঽসমানদ্রব্যোপযোগে সতি হ্রাসো বিনশ্বরাণাং ভাবানামপূরকহেত্বভাবাদুপলভ্যত এব; যথা বহতো জলস্য পূর্বদেশসেতুনোত্তরদেশজলস্য হ্রাসঃ। এবংভূতং চাবিরুদ্ধবিশেষোপযোগেঽপি হ্রাসং পশ্যতাচার্যেণ সামান্যেনৈবেহোক্তং—হ্রাসহেতুর্বিশেষ ইতি।"—চক্র০।

৪। "তুল্যার্থতা একসামান্যরূপার্থানুযোগিতা। এতেন যস্মাদ্ ভিন্নাসু ব্যক্তিষু সামান্যমেকরূপ-সম্বন্ধমস্তি, ততস্তদনেকার্থাবলম্বে সত্যপি ব্যক্তিভেদে একবুদ্ধির্যুক্তেতি ভাবঃ।"—চক্র০। "অর্থঃ কারণভূতং কার্যভূতং চ বস্তু তুল্যং যেষাং তে তুল্যার্থাস্তেষাং ভাবস্তুল্য এবার্থঃ।"—গঙ্গাধর।

৫। ১।১।৪৯ "সার্থা গুর্বাদয়ো বুদ্ধি প্রযত্নান্তাঃ পরাদয়ঃ। গুণাঃ প্রোক্তাঃ......॥ ইহা দ্বারা বৈশেষিক, সামান্য ও আত্মগুণ এই ত্রিবিধগুণ উক্ত হইল। তন্মধ্যে অর্থ বলিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এইগুলি বৈশেষিক গুণ, কারণ আকাশের প্রধানতঃ শব্দ, বায়ুরই প্রধানতঃ স্পর্শ; এইরূপ অগ্ন্যাদিরই প্রধানতঃ রূপাদি। গুর্বাদি বলিতে গুরু-লঘু-শীত-উষ্ণ-স্নিগ্ধ-রূক্ষ-মন্দ-তীক্ষ্ণ-স্থির-সর-মৃদু-কঠিন-বিশদ-পিচ্ছিল-শ্লক্ষ্ণ-খর-স্থূল-সূক্ষ্ম-সান্দ্র-দ্রব এই কুড়িটি। এইগুলি সামান্য-গুণ, পৃথিব্যাদিতে সাধারণভাবে বর্তমান বলিয়া। যজ্জঃ পুরুষীয়ে (১।২৫।৩৬) প্রায়ই আয়ুর্বেদে

প্রযত্নান্তগণ এবং পরাদিগণকে[১] গুণ বলে ; যাহা[২] সমবায়ী, নিশ্চেষ্ট অথচ কারণ তাহাই গুণ। আকাশ,[৩] বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, আত্মা, মনঃ, কাল এবং দিক্‌সকল এই কয়টি সংক্ষেপতঃ দ্রব্য ; সেন্দ্রিয় দ্রব্য চেতন এবং নিরিন্দ্রিয় দ্রব্য

উপযুক্ত বলিয়া ইহারা পরাদি হইতে পৃথক্ পঠিত হইয়াছে। বুদ্ধি বলিতে জ্ঞান ; ইহা দ্বারা স্মৃতি, চেতনা, ধৃতি, অহঙ্কার প্রভৃতি বুদ্ধিবিশেষের গ্রহণ হইয়াছে। প্রযত্নান্ত বলিতে নির্দেশকালে প্রযত্ন যাহাদের অন্তে আছে ; ইহা দ্বারা ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ এবং প্রযত্ন গৃহীত হইয়াছে। এ বিষয়ে বচন—'ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং প্রযত্নশ্চেতনা ধৃতিঃ। বুদ্ধিঃ স্মৃতিরহঙ্কারো লিঙ্গানি পরমাত্মনঃ॥' (৪।১।৭২)॥ পরাদি যথা—পরত্ব, অপরত্ব, যুক্তি, সংখ্যা, সংযোগ, বিভাগ, পৃথক্ত্ব, পরিমাণ, সংস্কার, এবং অভ্যাস (১।২৬।২৯-৩০)। এইগুলি সামান্য গুণ হইলেও নাত্যুপযুক্ত বলিয়া এবং বুদ্ধিপ্রধান বলিয়া অন্তে উক্ত হইয়াছে।"—চক্র০।

১। ১।২৬।৩১-৩৫, দেশকালবয়োমানপাকবীর্যরসাদিষু। পরাপরত্বে যুক্তিশ্চ যোজনা যা তু যুজ্যতে॥ সংখ্যা স্যাদ্ গণিতং যোগঃ সহ সংযোগ উচ্যতে। দ্রব্যাণাং দ্বন্দ্বসর্বৈককর্মজোঽনিত্য এব চ॥ বিভাগস্তু বিভক্তিঃ স্যাদ্ বিয়োগো ভাগশো গ্রহঃ। পৃথক্ত্বং স্যাদসংযোগো বৈলক্ষণ্য-মনেকতা॥ পরিমাণং পুনর্মানং সংস্কারঃ করণং মতম্। ভাবাভ্যসনমভ্যাসঃ শীলনং সততক্রিয়া॥ ইতি স্বলক্ষণৈরুক্তা গুণাঃ সর্বে পরাদয়ঃ। চিকিৎসা যৈরবিদিতৈর্ন যথাবৎ প্রবর্ততে॥

২। ১।১।৫১, "সমবায়ী তু নিশ্চেষ্টঃ কারণং গুণঃ॥ কারণপদেন কার্য্যোপস্থিতৌ যস্ত কার্যস্যারম্ভে যো ভাবো নিশ্চেষ্টঃ ক্রিয়াহীন এব সন্নন্তক্রিয়য়া পরিণমন্ কার্য্যত্বমাপদ্যতে স তস্য কার্যস্য গুণো নাম কারণমুচ্যতে ক্রিয়াহীনত্বাৎ কর্তৃত্বাভাবাদ্ অপ্রাধান্যাৎ।"—গঙ্গাধর। "সমবায়ীতি সমবায়াধেয়ঃ"—চক্রপাণি। তাঁহার মতে গুণ সমবায়ী কারণ হইতে পারে না। "সমবায়ি কারণং চ তত্তৎস্বসমবেতং কার্য্যং জনয়তি, গুণকর্মণী তু ন স্বসমবেতং কার্যং জনয়তঃ, অতো ন তে সমবায়ি-কারণে" (১।১।৫২ প্রথমাংশ)। গঙ্গাধর কিন্তু অন্যরূপ বলেন,—"প্রেমাদিনাত্ত বৈশেষিকে কণাদোক্ত-গুণলক্ষণং 'দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষো গুণঃ' ইতি দৃষ্ট্বা গুণকর্মণী অসমবায়ি-কারণে ভবত ইত্যাহুঃ। তেষাময়ং হি প্রমাদঃ। সূত্রকৃৎকণাদেন ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি পূর্বস্মাদনুবর্ত্য সমবায়িকারণপদং দ্রব্যাশ্রয়ীত্যাদি সূত্রং কৃতম্। তেন দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগ-বিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষঃ সমবায়িকারণং গুণ ইতি গুণলক্ষণম্ পর্যবসিতম্। যদি হি গুণো গুণান্তরস্য সমবায়িকারণং ন ভবতি, কথং তর্হি গুণাশ্চ গুণান্তরমারভন্তে ইতি বচনং তত্রৈব কণাদেনোক্তং সঙ্গচ্ছতে?...... প্রকৃতিগুণানাং কার্যগুণেষু সমবায়িত্বমন্তরেণ নিরুপাদানকার্য্যাপত্তিঃ স্যাৎ।"—ইত্যাদি।

৩। ১।১।৪৮, খাদীন্যাত্মা মনঃ কালো দিশশ্চ দ্রব্যসংগ্রহঃ। সেন্দ্রিয়চেতনং দ্রব্যং নিরিন্দ্রিয়ম-চেতনম্॥ চেতনাচেতনের এই লক্ষণের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে চক্রপাণি এক কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা উত্থাপন করিয়াছেন ; "যদ্যপি চাত্মৈব চেতনো ন শরীরং নাপি মনঃ, যদুক্তং—'চেতনাবান্ যতশ্চাত্মা ততঃ কর্তা নিরুচ্যতে' (৪।১।৭৬) ইতি, তথাপি সলিলোষ্ণ্যবৎ সংযুক্তসমবায়েন শরীরাদ্যপি চেতনম্। ইদমেব চাত্মনশ্চেতনত্বং যদিন্দ্রিয়যোগে সতি জ্ঞানশালিত্বং, ন কেবলস্যাত্মনশ্চেতনত্বম্ ; যদুক্তং— 'আত্মাজ্ঞঃ করণৈর্যোগাজ্জ্ঞানং তস্য প্রবর্ততে' (৪।১।৫৫) ইতি। অত্র সেন্দ্রিয়ত্বেন বৃক্ষাদীনামপি

অচেতন, কর্ম[১] ও গুণসকল যাহাতে আশ্রিত, যাহা সমবায়ী কারণ, তাহাই দ্রব্য। প্রযত্নাদি[২] চেষ্টাকে কর্ম বলে; দ্রব্যাশ্রিত,[৩] সংযোগ ও বিভাগ কারণভূত, কর্তব্যের কারণই কর্ম,—কর্ম অন্য কিছুর অপেক্ষা রাখে না।[৪] গুণের সহিত

চেতনত্বং বোদ্ধব্যম্; তথাহি—সূর্যভক্তায়া যথা যথা সূর্যো ভ্রমতি তথা তথা ভ্রমণাদ্ দৃগনুমীয়তে তথা লবলী ভবতি বীজপূরকমপি শৃগালাদিবসাগন্ধেনাতীব ফলবদ্ ভবতি. চূতানাং চ মৎস্যবসাসেকাৎ ফলাঢ্যতয়া রসনমনুমীয়তে, অশোকস্য চ কামিনীপাদতলাহতিসুখিনঃ স্তবকিতস্য স্পর্শনানুমানং; স্মৃতিশ্চানুমানং দ্রঢয়তি ...। তথা তন্ত্রকারশ্চ বানস্পত্যানুকান্ প্রাণিনো বক্ষ্যতি; তেনাগম-সংবলিতয়া যুক্ত্যা চেতনা বৃক্ষাঃ॥"

১। ১।১।৫১, যত্রাশ্রিতাঃ কর্মগুণাঃ কারণং সমবায়ি যৎ তদ্দ্রব্যম্ ॥ "যত্রাশ্রিতা যত্র সমবেতাঃ"—চক্র০। "ইহ কারণমিত্যুক্ত্যা কার্যমিতি চোক্তং ভবতি। কার্যমাণভমানে যত্র কারণে কর্মগুণা আশ্রিতা ভবন্তি, কার্যে জায়মানে জায়মানতৎকর্মগুণাশ্রয়ঃ সন্ যৎ কারণং সমবায়ি তৎ কার্যে সমবায়ি ভবতি, তৎকারণং দ্রব্যমুচ্যতে। সমবৈতুং সজাতীয়বিজাতীয়রূপেণ পরিণমদেকীভবিতুং শীলমস্যেতি সমবায়ি, কার্যরূপেণ পরিণমদেকীভাবি সমবায়ি।"—গঙ্গাধর।

২। ১।১।৪৯, .. প্রযত্নাদি কর্ম চেষ্টিতমুচ্যতে। "প্রযতনং প্রযত্নঃ কর্মৈবাত্মমাত্মনঃ যথা 'তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্' (পা. ১।১।৯) ইত্যত্র ব্যাখ্যাতম্। আদিশব্দঃ ক্রিয়াবাচী। তেন সংস্কার-গুরুত্বাদিজন্যকৃৎস্নক্রিয়াবরোধঃ। যদ্যপি চেষ্টিতং প্রাণিব্যাপার উচ্যতে, তথাপীহ সামান্যেন ক্রিয়া বিবক্ষিতা।..... অন্যে তু প্রযত্নাদি ইতি প্রযত্নকারণমিতি ব্রুবতে, প্রযত্নগ্রহণং চ কারণোপলক্ষণং বদন্তি; তেন গুরুত্বাদিকার্যস্যাপি কর্মণো গ্রহণমিতি।"—চক্র০।

৩। ১।১।৫২, সংযোগে চ বিভাগে চ কারণং দ্রব্যমাশ্রিতম্। কর্তব্যস্য ক্রিয়া কর্ম কর্ম নান্যদপেক্ষতে॥ "কর্ম উৎপন্নং স্বাশ্রয়স্য দ্রব্যস্য পূর্বদেশবিভাগে উত্তরদেশসংযোগে চ কর্তব্যে নান্যৎ কারণং পশ্চাৎকালভাব্যপেক্ষতে; দ্রব্যং তু যদ্যপি সংযোগবিভাগকারণং যুগপদ্ভবতি, তথাপি তদুৎপন্নং সদ্ যদা কর্মযুক্তং ভবতি তদৈব সংযোগবিভাগকারণং স্যাৎ।.. ...অথ কর্মশব্দেন বমনাদীনাং তথাদৃষ্টস্য তথা ক্রিয়ায়াশ্চাভিধীয়মানত্বাৎ কস্য কর্মণ ইদং লক্ষণমিত্যত আহ—কর্তব্যস্য ক্রিয়া কর্ম ইতি। এতেন ক্রিয়ারূপস্য কর্মণ ইদং লক্ষণং নাদৃষ্টাদেরিতি।"—চক্র০।

৪। ১।১।৫০ সমবায়োঽপৃথগ্ভাবো ভূম্যাদীনাং গুণৈর্মতঃ। স নিত্যো যত্র হি দ্রব্যং ন তত্রানিয়তো গুণঃ॥ এখানে চক্রপাণি ভূম্যাদিশব্দের ভূমিপ্রকার অর্থাৎ আধার এবং গুণশব্দের অপ্রধান অর্থাৎ আধেয় এই অর্থ লইয়া বৈশেষিকসম্মত লক্ষণের (অযুতসিদ্ধানামাধার্য্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহেতি প্রত্যয়হেতুঃ) সহিত সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন সেইজন্য পৃথিবীত্ব ও গন্ধবত্ত্ব অপৃথক্‌সিদ্ধ হইলেও তাহাদের মধ্যে আধারাধেয়ভাব না থাকায় সমবায় সম্বন্ধ নহে। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "নিত্য আকাশ ও তাহার পরিমাণ রূপগুণের মধ্যে সমবায়সম্বন্ধ নিত্য, অতএব সমবায় সর্বত্র একরূপ [illegible]লিয়া অন্যত্রও উহা নিত্য।" ব্যাখ্যাকারদের মতভেদেরও উল্লেখ করিয়াছেন; "অন্যৈস্তু নিত্যানিত্যভেদেন দ্বিবিধঃ সমবায়ো ব্যাখ্যাতঃ, অয়ং চ গ্রন্থো ভূম্যাদীনাং গুণৈরেব যঃ সম্বন্ধঃ তস্যৈব যথাশ্রুতস্য প্রতিপাদক ইতি ব্যাখ্যাতম্; তচ্চ ন ব্যাপকং নাপি বৈশেষিকমতানুযায়ীতি নেহ প্রপঞ্চিতম্।"

ভূম্যাদির অপৃথগ্‌ভাবকে সমবায় বলে; উহা নিত্য, কারণ যেখানে দ্রব্য নিত্য, সেখানে গুণ অনিত্য নহে। এই সামান্যাদি ছয়টির নির্দেশ ও লক্ষণ দ্বারা সর্ব কার্যের কারণ উক্ত হইল। এই শাস্ত্রে ধাতুসাম্যকেই কার্য বলা হয়, কারণ ধাতু-সাম্যক্রিয়া এই শাস্ত্রের প্রয়োজন।[১]

সত্ত্ব,[২] আত্মা ও শরীর এই তিনটি তিনটি দণ্ডের মত; ইহাদের সংযোগই লোকের স্থিতির কারণ এবং উহাতেই সমস্ত (অর্থাৎ কর্মফলাদি) প্রতিষ্ঠিত। উহাই পুরুষ, উহা চেতন এবং উহাই এই বেদের অধিকরণরূপে স্মৃত, যেহেতু উহার উপকারের জন্যই এই বেদ প্রকাশিত হইয়াছে।

আয়ুর্বেদের অধিকরণ পুরুষ

শরীর[৩] ও সত্ত্বকে ব্যাধি এবং আরোগ্য উভয়েরই আশ্রয় মানা হয়।[৪] এতদুভয় হইতে শ্রেষ্ঠ (অথবা ভিন্ন) আত্মা কিন্তু নির্বিকার, সত্ত্ব, ভূতসকলের গুণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা চৈতন্যবিষয়ে কারণ এবং নিত্য; কারণ তিনি দ্রষ্টৃরূপে কেবল ক্রিয়াসকল দর্শন করেন।

১। ১।১।৫৩, ইত্যুক্তং কারণং কার্য্যং ধাতুসাম্যমিহোচ্যতে। ধাতুসাম্যক্রিয়া চোক্তা তন্ত্রস্যাস্য প্রয়োজনম্॥ "ইতি সমাপ্তৌ, তেনৈতাবদেব সামান্যাদিষট্‌কং সর্বস্যৈব কার্যজাতস্য কারণং নান্যৎ কারণমস্তি।" – চক্র০।

২। ১।১।৪৬-৪৭, সত্ত্বমাত্মা শরীরঞ্চ এবয়েতৎ ত্রিদণ্ডবৎ। লোকস্তিষ্ঠতি সংযোগাত্তত্র সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥ স পুমাংশ্চেতনং তচ্চ তচ্চাধিকরণং স্মৃতম্। বেদস্যাস্য, তদর্থং হি বেদোঽয়ং সম্প্রকাশিতঃ॥ "সত্ত্বং মনঃ। ...... ত্রিদণ্ডঃ পরস্পরসংযোগবিধৃতঃ কুস্তাদিধারকস্তম্ভবৎ। এতেন যথা ত্রিদণ্ডেঽন্যতমাপায়ে নাবস্থানং, তথা সত্ত্বাদীনামন্যতমাপায়েঽপি ন লোকস্থিতিরিত্যুক্তং ভবতি। লোকত আলোকত ইতি লোকঃ তেনেহ জঙ্গমো ভূতগ্রাম উচ্যতে। ...... অত্র চাত্মগ্রহণেন বুদ্ধ্যহঙ্কারাদীনাং গ্রহণং, শরীরগ্রহণেনেন্দ্রিয়াণামর্থানাং চ শরীরসংবদ্ধানাং গ্রহণং ব্যাখ্যেয়ম্।" চক্র০।

৩। ১।১।৫৫, শরীরং সত্ত্বসংজ্ঞং চ ব্যাধীনামাশ্রয়ো মতঃ। তথা সুখানাং...... ॥

৪। ১।১।৫৬, নির্বিকারঃ পরস্ত্বাত্মা সত্ত্বভূতগুণেন্দ্রিয়ৈঃ। চৈতন্যে কারণং নিত্যো দ্রষ্টা পশ্যতি হি ক্রিয়াঃ॥ "পরঃ ইতি সূক্ষ্মঃ শ্রেষ্ঠো বা, তেন সত্ত্বশরীরাত্মমেলকরূপো য আত্মশব্দেনোচ্যতে তং ব্যাবর্তয়তি, যদুক্তং—'সংযোগপুরুষস্যেষ্টো বিশেষো বেদনাকৃতঃ' (৪।১।৮৫) ইতি। সংযোগেঽপি চাত্মাদীনাং মনস্যেব বেদনা ভবতি, সা তু মনঃসংযুক্ত আত্মন্যপি সংবদ্ধেত্যুচ্যতে। .. ... সত্ত্বং মনঃ, ভূতগুণাঃ শব্দাদয়ঃ, ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি। এতৈঃ করণভূতৈশ্চৈতন্যে কারণং ভবত্যাত্মা, চৈতন্যং চাত্মনি জায়তে ব্যজ্যতে বা। এতএব চ সত্ত্বাদীনাং জ্ঞানকরণানাং সর্বত্রাসম্ভবাৎ সর্বগতেঽপ্যাত্মনি ন সর্বত্র প্রদেশে জ্ঞানং ভবতি। ······ নিত্যস্যাপ্যাত্মনো জ্ঞানমনিত্যং; ন চ ধর্মানিত্যত্বে ধর্মিণোঽপ্যনিত্যত্বং, ন হ্যাকাশগুণশব্দানিত্যত্বেঽপ্যাকাশস্যাপ্যনিত্যত্বমিতি ভাবঃ। নিত্যত্বং চাত্মনঃ পূর্বাপরাবস্থানুভূতার্থপ্রতিসন্ধানাৎ; ন অনিত্যে জ্ঞাতরি পূর্বানুভূতমর্থমুত্তরো জ্ঞাতা প্রতিসন্ধত্তে; ন হি দেবদত্তবুদ্ধমর্থং যজ্ঞদত্তোঽবগতত্বেন প্রতিসন্দধাতি ...... দ্রষ্টা সাক্ষী; তেন যতির্যথা পরমশান্তঃ সাক্ষী সন্ জগতঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ পশ্যন্ন রাগদ্বেষাদিনা যুজ্যতে, তথাত্মাপি সুখদুঃখাদ্যুপলম্ভ-

আয়ুর্বেদ[১] শব্দের নিরুক্তি হইতে জানা যায় 'আয়ুকে জ্ঞাপন করে' বলিয়া আয়ুর্বেদ। কেমন করিয়া জ্ঞাপন করে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, নিজের লক্ষণদ্বারা হিতাহিত আয়ু এবং সুখদুঃখ আয়ুর বিবেচনা দ্বারা এবং আয়ুর প্রমাণাপ্রমাণ নির্ণয় দ্বারা। আয়ুষ্য ও অনায়ুষ্য দ্রব্য-গুণ-কর্ম জ্ঞাপন করে বলিয়াও ইহাকে আয়ুর্বেদ বলে। ইহার মধ্যে আয়ুষ্য ও অনায়ুষ্য দ্রব্যগুণকর্ম সমগ্র তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে আয়ুঃ নিয়তকালপ্রমাণ কি অনিয়তকালপ্রমাণ? কারণ সকল আয়ুই নিয়তকাল-প্রমাণ হইলে দীর্ঘতর জীবনলাভের বাঞ্ছা ও তদানুষঙ্গিক আয়ুষ্য ও অনায়ুষ্য দ্রব্যগুণ-কর্মের বিবেচনা বৃথা দাঁড়ায়। ইহার উত্তর আত্রেয় এইরূপ দিয়াছেন; প্রাণীদিগের আয়ুঃ দৈব ও পুরুষকারের যোগের অপেক্ষা করে এবং তাহাদের বলাবলের উপর উহার বল অর্থাৎ নিয়তত্ব এবং অবল অর্থাৎ অনিয়তত্ব নির্ভর করে। উত্তম, মধ্যম ও হীন এই ত্রিবিধ কর্ম দেখা যায়। দৈব ও পুরুষকার উভয়ই উত্তম হইলে উহাদের যোগ দীর্ঘ ও সুখময় নিয়ত আয়ুর, হীন হইলে তদ্বিপরীতের এবং মধ্যম হইলে মধ্যম আয়ুর কারণ হয়। পরস্পরবিরুদ্ধ হইলে দুর্বল দৈব পুরুষকার কর্তৃক উপহত হয়। বলবান্ দৈবকর্তৃকও পুরুষকার উপহত হয়, যাহা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করে আয়ুর প্রমাণ নিয়ত।[২] বস্তুতঃ কোন কর্ম মহৎ বলিয়া বিপাক বিষয়ে কোন বিশিষ্ট-কালে নিয়ত, কোন কর্ম আবার কালনিয়ত নহে, কিন্তু কারণকর্তৃক উদ্রিক্ত হয়। অতএব দুইরকমই দেখা যায় বলিয়া আয়ুকে কেবল নিয়তকালপ্রমাণ অথবা কেবল অনিয়তকালপ্রমাণ বলা অসাধু।[৩] এ বিষয়ে যুক্তিও দেখা যায়; যদি সকলের আয়ু নিয়তকালপ্রমাণ হইত, তাহা হইলে আয়ুষ্কামীদের মণিমন্ত্রৌষধিধারণ, পূজা, প্রায়শ্চিত্ত, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি নিষ্প্রয়োজন হইত; হিংস্র পশু, দুষ্টবাতাদি, প্রপাত-দুর্গ-জলবেগ-প্রভৃতি, শত্রু, অগ্নি, বিষধর প্রাণী, অবিমৃষ্যকারিতা, অদেশকালচর্যা, রাজকোপ প্রভৃতি পরিহার করিতে হইত না; এবং অকালমরণভয়ের নিবারক-প্রয়োগসকলে অনভ্যস্ত প্রাণিগণের অকালমরণ-ভয়ও উপস্থিত হইত না। আমরা

আয়ুর নিয়তানিয়তত্ব

মানোঽপি ন রাগাদিনা যুজ্যতে; দৃশ্যমানরাগাদিবিকারস্ত মনসি বুদ্ধৌ বা সাংখ্যদর্শনপরিগ্রহাদ্-ভবতীতি ভাবঃ। সাংখ্যমতে মনঃশব্দেন বুদ্ধিরন্তঃকরণং চ গৃহ্যতে।"—চক্র০।

১। ১।৩০।২৩, তদায়ুর্বেদয়তীত্যায়ুর্বেদঃ, কথমিতি চেৎ? উচ্যতে,—স্বলক্ষণতঃ সুখাসুখতঃ হিতাহিততঃ, প্রমাণাপ্রমাণতশ্চ; যতশ্চায়ুষ্যাণ্যনায়ুষ্যাণি চ দ্রব্যগুণকর্মাণি বেদয়ত্যতোঽপ্যায়ুর্বেদঃ। তত্রায়ুষ্যাণ্যনায়ুষ্যাণি চ দ্রব্যগুণকর্মাণি কেবলেনোপদেক্ষ্যন্তে তন্ত্রেণ।

২। ৩।৩।৩৩-৩৯।

৩। ৩।৩।৪০-৪১, কর্ম কিঞ্চিৎ কচিৎ কালে বিপাকে নিয়তং মহৎ। কিঞ্চিত্ত্বকালনিয়তং প্রত্যয়ৈঃ প্রতিবোধ্যতে॥ তস্মাদুভয়দৃষ্টত্বাদেকান্তগ্রহণমসাধু।

প্রত্যক্ষও দেখিতে পাই সহস্র সহস্র পুরুষের মধ্যে যাহারা যুদ্ধ করে এবং যাহারা না করে, তাহাদের আয়ুঃ তুল্য নহে; সেইরূপ যাহারা রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র প্রতীকার করে এবং যাহারা না করে, যাহারা বিষভক্ষণ করিয়াছে এবং যাহারা না করিয়াছে তাহাদের আয়ুও তুল্য নহে। অতএব হিতোপচারই আয়ুর মূল এবং তাহার বিপর্যয়ে মৃত্যু।[১]

এই[২] আয়ুর্বেদকে শাশ্বত বলা হইয়া থাকে, কারণ ইহা অনাদি, ইহার লক্ষণ স্বরূপদ্বারাই সিদ্ধ এবং ভাবসকলের[৩] স্বভাব নিত্য। আয়ুর সন্তান[৪] বা বুদ্ধির সন্তান নাই এমন কখনও ছিল না[৫] আয়ুর জ্ঞাতা শাশ্বত, এবং অপরাপরযোগ বা সন্তানের জন্য দ্রব্য হেতু ও লক্ষণ সহ সুখ দুঃখ (অর্থাৎ আরোগ্য ও ব্যাধি) ও অনাদি।[৭] আর অভিধেয়সমূহের (অর্থাৎ

আয়ুর্বেদের নিত্যতা[৬]

১। ৩।৩।৪১, এই প্রসঙ্গে চক্রপাণি মন্তব্য করিয়াছেন: "অদৃষ্টস্যৈব তু কারণত্বং দৃষ্টকার্যানুপপত্তেঃ কল্পনীয়ং; তেনাদৃষ্টস্য কারণত্বং দৃষ্টকারণমূলমেব; ন চ দৃষ্টকারণোচ্ছেদঃ কল্পয়িতুমপি পার্যতে।"

২। ১।৩০।২৭ সোঽয়মায়ুর্বেদঃ শাশ্বতো নির্দিশ্যতে, অনাদিত্বাৎ, স্বভাবসংসিদ্ধলক্ষণত্বাৎ, ভাবস্বভাবনিত্যত্বাচ্চ। ন হি নাভূৎ কদাচিদায়ুষঃ সন্তানো বুদ্ধিসন্তানো বা, শাশ্বতশ্চায়ুষো বেদিতা, অনাদি চ সুখদুঃখং সদ্রব্যহেতুলক্ষণমপরাপরযোগাৎ। এষ চার্থসংগ্রহো বিভাব্যতে আয়ুর্বেদলক্ষণমিতি। যৎ পুনর্গুরুলঘুশীতোষ্ণস্নিগ্ধরূক্ষাদীনাং দ্রব্যাণাং সামান্যবিশেষাভ্যাং বৃদ্ধিহ্রাসৌ যথোক্তং গুরুভিরভ্যস্যমানৈর্গুরূণামুপচয়ো ভবত্যপচয়ো লঘূনাম্, এবমেবেতরেষামিতি। এষ ভাবস্বভাবো নিত্যঃ স্বলক্ষণং চ দ্রব্যাণাং পৃথিব্যাদীনাং, সন্তি তু দ্রব্যাণি গুণাশ্চ নিত্যানিত্যাঃ। ন হ্যায়ুর্বেদস্যাভূত্বোৎপত্তিরুপলভ্যতেঽন্যত্রাববোধোপদেশাভ্যাম্; এতদ্বৈ দ্বয়মধিকৃত্যোৎপত্তিম্ উপদিশন্ত্যেকে। স্বাভাবিকং চাস্য লক্ষণমকৃত্রিমং, যদুক্তমিহাদ্যেঽধ্যায়ে চ; যথা—অগ্নেরৌষ্ণ্যম্, অপাং দ্রবত্বম্। ভাবস্বভাবনিত্যত্বমপি চাস্য, যথোক্তং গুরুভিরভ্যস্যমানৈর্গুরূণামুপচয়ো ভবত্যপচয়ো লঘূনামিতি।

৩। ভাব বলিতে যাহা আছে অথবা উৎপন্ন হয়; "ভাবা যে ভবন্তি, সন্তি চ"—গঙ্গাধর ১।৩০।২৭(১৩)। চক্রপাণির (১।১।৪৪) প্রসঙ্গাপেক্ষী অর্থসংকোচনও উহারই সমর্থন করে; "ভবন্তি সত্তামনুভবন্তীতি ভাবা দ্রব্যগুণকর্মাণীত্যর্থঃ ন তু ভবন্ত্যুৎপদ্যন্ত ইতি ভাবাঃ; তথা সতি পৃথিব্যাদিপরমাণূনাং নিত্যানাং সামান্যস্য পার্থিবদ্ব্যণুকাদিবৃদ্ধং কার্যমসংগৃহীতং স্যাৎ।"

৪। অপরাপরযোগ দ্বারা অবিচ্ছেদ।

৫। ইহ ব্যবহারনিত্যত্বমায়ুর্বেদে সাধ্যং, তচ্চার্থরূপস্যায়ুর্বেদস্য ন শব্দরূপস্য; কিংবা, ব্যবহারনিত্যায়ুর্বেদার্থাভিধায়কস্যায়ুর্বেদস্য পারম্পর্যযোগান্নিত্যত্বং সাধ্যতে।—চক্র০।

৬। সর্বদৈবায়ুরপরাপরসন্তানন্যায়েন বিদ্যতে, আয়ুর্যুক্তানাং প্রাণিনামনুচ্ছেদাৎ।—চক্র০।

৭। এতেন দুঃখং তাবৎ কদাচিদপ্যজিহাসিতং ন ভবতি, জিহাসিতমনুপায়ং ন ভবতি, উপায়শ্চায়ুর্বেদ এব, স চ সর্বদুঃখপরিহারার্থমুপাদেয়ঃ, তস্মাদ্দুঃখপ্রশমনোপায়োপদেশরূপায়ুর্বেদস্য অনাদিত্বেতি ভাবঃ। এবং সুখস্য নিত্যোপাদেয়স্যানাদিত্বং জ্ঞেয়ম্, তদুপায়স্যায়ুর্বেদস্য চ।—চক্র০।

আয়ুঃ, বুদ্ধি, বেদিতা, সুখ ও দুঃখ) এই সংক্ষেপকেই আয়ুর্বেদের লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়।[১] আবার গুরু-লঘু-শীত-উষ্ণ-স্নিগ্ধ-রূক্ষাদি দ্রব্যের সামান্যবিশেষের দ্বারা যে বৃদ্ধিহ্রাস, যেমন বলা হইয়াছে—'গুরুদ্রব্যসকল অভ্যস্ত হইলে গুরুদিগের উপচয় এবং লঘুদিগের অপচয়', অপরপক্ষেও সেইরূপ ভাবসকলের এই স্বভাব নিত্য; পৃথিব্যাদি দ্রব্যের নিজ লক্ষণও নিত্য; দ্রব্য ও গুণ নিত্য ও অনিত্য আছেই।[২] অববোধ ও উপদেশ ছাড়া আয়ুর্বেদের অন্যপ্রকার অর্থাৎ না থাকিয়া উৎপত্তির সন্ধান পাওয়া যায় না; এই দুইটিকেই অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ আয়ুর্বেদের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া থাকেন। আর ইহার লক্ষণ স্বরূপাশ্রিত ও অকৃতক,[৩] যাহা এই অধ্যায়ে (১৷৩০৷২৩) এবং প্রথম অধ্যায়ে (১৷১৷৪১) উক্ত হইয়াছে; যেমন অগ্নির উষ্ণতা, জলের দ্রবত্ব, এবং এতদুক্ত ভাবসমূহের স্বভাবের নিত্যত্বও অকৃতক; যেমন বলা হইয়াছে—'গুরু অভ্যাস করিলে গুরুর বৃদ্ধি ও লঘুর হ্রাস হয়।'

[ব্যাধি ও প্রতিকার]

ধাতুসকলের[৪] বৈষম্যকে বিকার অর্থাৎ ব্যাধি এবং সাম্যকে প্রকৃতি অর্থাৎ আরোগ্য বলে; লোকে যাহাকে সুখ বলে তাহাই আরোগ্য এবং যাহা

১। এতেন আয়ুরাদেরর্থস্যায়ুর্বেদলক্ষণস্যানাদিতয়া যথোক্তয়া স্বভাবসংসিদ্ধলক্ষণত্বং ব্যাকৃতং ভবতি। স্বভাবসংসিদ্ধমিতি সর্বদা সন্তানন্যায়েন সিদ্ধত্বমভিপ্রেতম্।—চক্র০।

২। ভাবস্বভাবো নিত্য ইতি নৈব সামান্যবিশেষাভ্যাং বৃদ্ধিহ্রাসরূপো ভাবস্বভাবঃ কদাচিদন্যথা ভবতীত্যর্থঃ। ন কেবলময়ং ভাবস্বভাবো নিত্যঃ, কিং তর্হি অন্যোঽপীত্যাহ—স্বলক্ষণং চেত্যাদি। স্বলক্ষণং পৃথিব্যাদীনাং খরদ্রবত্বাদি। কথং পৃথিব্যাদিস্বলক্ষণং নিত্যমিত্যাহ—সন্তি হিত্যাদি।...... তত্রাকাশাদি দ্রব্যং নিত্যং, পৃথিব্যাদিকার্যং চানিত্যম্। এবং গুণা আকাশপরিমাণাদয়ো নিত্যাঃ, অনিত্যাশ্চ কার্যগুণা রসাদয়ঃ, অনিত্যা অপি চ সজাতীয়াপরাপরসন্তানন্যায়েন সর্বদা তিষ্ঠন্তীতি যুক্তমনিত্যানামপি সন্তাননিত্যত্বমিতি। অত্র ভাবস্বভাবনিত্যত্বেন হেতুনা ভাবস্বভাবস্য ব্যাধিজনকস্য তথা ব্যাধিপ্রশমকস্য নিত্যত্বেন তৎপ্রতিপাদকস্যায়ুর্বেদস্যাপি নিত্যত্বমুক্তং ভবতীতি মন্তব্যম্।—চক্র০।

৩। অকৃতকমিতি নাস্মদাদিনা কৃতম্।......এতেন স্বলক্ষণস্যাকৃতকত্বেন ব্যবহারনিত্যত্বাৎ তৎপ্রতিপাদকস্যায়ুর্বেদস্যাপি ব্যবহারনিত্যত্বমিতি ভাবঃ। ন কেবলং স্বাভাবিকলক্ষণমকৃতকম্ কিং তর্হি ভাবস্বভাবনিত্যত্বমপি কেনচিদীশ্বরাদিনা কৃতমিত্যাহ ভাবস্বভাবনিত্যত্বমপি চেতি।—চক্র০।

৪। ১৷৯৷৪ বিকারো ধাতুবৈষম্যং সাম্যং প্রকৃতিরুচ্যতে। সুখসংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো দুঃখমেব চ॥ "ধাতবো বাতাদয়ো রসাদয়শ্চ তথা রজঃপ্রভৃতয়শ্চ, তেষাং বৈষম্যং ব্যবহ্রিয়মাণ-স্বাস্থ্যহেতোঃ স্বমানান্ন্যূনত্বমধিকত্বং বা।......উচ্যতে—গ্রহণাদ্বৈদ্যকসিদ্ধান্তে হীয়ং প্রকৃতিবিকারব্যবস্থা, অন্যদর্শনসিদ্ধান্তপরিগ্রহে তু বিকারঃ ষোড়শকঃ, প্রকৃতির্গুণানাং সাম্যাবস্থা ভবতীতি দর্শয়তীতি।...সুখহেতুঃ সুখম্, এবং দুঃখহেতুর্দুঃখম্।...সংজ্ঞক-গ্রহণাৎ পরমার্থতোঽসুখমপি লোকে সুখমিতি যদ্ ব্যবহ্রিয়তে তদিহ গৃহ্যতে ইতি দর্শয়তি;...তথা সংজ্ঞকগ্রহণেন লৌকিকসুখং ন পরমার্থতঃ সুখমিতি

দুঃখ[১] তাহাই বিকার। ব্যাধিসকল[২] অতিবহু বলিয়া অপরিসংখ্যেয়, কিন্তু দোষসকল অনতিবহু বলিয়া পরিসংখ্যেয়। সেইজন্য উদাহরণার্থ বিকার-সমূহের সম্প্রদায় অনুসারে মাত্র প্রধানপ্রধানের বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইলেও দোষসকলের নিরবশেষে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। রজঃ ও তমঃ মানস দোষ। তাহাদের বিকার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষ্যা, মান, মদ, শোক, চিন্তা, উদ্বেগ, ভয়, হর্ষ প্রভৃতি। বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা[৩] শারীর দোষ এবং তাহাদের বিকার জ্বর অতীসার শোথ শোষ, শ্বাস, মেহ, কুষ্ঠ প্রভৃতি। এইরূপে নিরবশেষ দোষসকল ও বিকারসমূহের একদেশ উক্ত হইল।

ব্যাধি ও আরোগ্য দুঃখ ও সুখ

এই দ্বিবিধ দোষেরই[৪] ত্রিবিধ প্রকোপণ: অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম। প্রকুপিত হইয়া তাহারা প্রকোপণবিশেষ ও দূষ্যবিশেষের জন্য অপরিসংখ্যেয় বিকারবিশেষ উৎপাদন করে। এইসকল বিকার পরস্পরের অনুবর্তন করিয়া কখনও কখনও অনুসংবদ্ধ হয়, কামাদি ও জ্বরাদি উভয়ই। কিন্তু রজঃ ও তমঃর পরস্পর অনুবন্ধ নিয়ত, কারণ তমঃ রজঃ ছাড়া স্ববিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না।

পূর্বোক্ত[৫] শরীর-মানস-ভেদে দ্বিবিধ ব্যাধি পুনরায় আগন্তু-নিজ-ভেদে

দর্শয়তি, যতো বক্ষ্যতি "সর্বং কারণবদ্ দুঃখম্' (৪।১।৫২) ইত্যাদি; 'এব চ' গ্রহণেন দুঃখং পরমার্থতোঽপি দুঃখমেবেতি দর্শয়তি, ন সুখমিব ব্যবহারমাত্রেণ"।

১। তুলনীয়—৩।৬।৩, একত্বং তাবদেকমেব রোগানীকং, দুঃখসামান্যাৎ।

২। ৩।৬।৫ ৯ তত্র ব্যাধয়োঽপরিসংখ্যেয়া ভবন্তীতি বহুত্বাৎ, দোষাস্তু খলু পরিসংখ্যেয়া ভবন্ত্য-নতিবহুত্বাৎ। তস্মাদ্ যথাচিত্রং বিকারানুদাহরণার্থম্ অনবশেষেণ চ দোষান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ। রজস্তমশ্চ মানসৌ দোষৌ তয়োর্বিকারাঃ কামক্রোধলোভমোহের্ষ্যামানমদশোকচিন্তোদ্বেগভয়হর্ষাদয়ঃ। ইতি দোষাঃ কেবলা ব্যাখ্যাতা বিকারৈকৈকদেশশ্চ॥ তত্র খল্বেষাং দ্বয়ানামপি দোষাণাং ত্রিবিধং প্রকোপণম্; তদ্যথা—অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ, প্রজ্ঞাপরাধঃ, পরিণামশ্চেতি। প্রকুপিতাস্তু তে খলু প্রকোপণবিশেষাদ্দূষ্যবিশেষাচ্চ বিকারবিশেষানভিনির্বর্তয়ন্ত্যপরিসংখ্যেয়ান্॥ তে চ বিকারাঃ পরস্পরমনুবর্তমানাঃ কদাচিদনুবধ্নন্তি কামাদয়ো জ্বরাদয়শ্চ॥ নিয়তস্ত্বনুবন্ধো রজস্তমসোঃ পরস্পরং ন হ্যরজস্কং তমঃ প্রবর্ত্ততে॥

৩। গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে ও প্রতিপাদ্যের নাত্যুপযোগী বলিয়া বায়ু-পিত্ত-কফের বিশেষ বিবরণ দিতে পারা গেল না। কৌতূহলীরা চরকের এই কয়টি স্থল দেখিলে উপকৃত হইতে পারেন। ১।১২।১-১৩, ১।১৭।১১২-১১৮, ১।১৮।৪৮-৫৩; ১।১৯।৫-৭।

৪। এই দ্বিবিধ দোষের ও তজ্জনিত দ্বিবিধ ব্যাধির উল্লেখ অন্য বহুস্থলেই পাওয়া যায়, যথা ১।১।৫৭; ১।৭।৫০-৫২; ১।১১।৪৫-৪৬; ১।২০।৩-৭; ২।১।৪ ইত্যাদি।

৫। ১।২০।৩, দ্বিবিধা পুনঃ প্রকৃতিরেষামাগন্তুনিজবিভাগাৎ; দ্বিবিধং চৈষামধিষ্ঠানং মনঃ-শরীরবিশেষাৎ। 'মনঃশরীরবিশেষাদিতি আগন্তোরপি মনঃশরীরং চাধিষ্ঠানম্ এবং নিজস্যাপি;

দ্বিবিধ।[১] আগন্তুর কারণ নখ-দন্ত-পতন-অভিচার-অভিশাপ-অভিষঙ্গ-অভিঘাত-ব্যধ-বন্ধন-বেষ্টন-পীড়ন-রজ্জু-দহন-শস্ত্র-অশনি-ভূতোপসর্গপ্রভৃতি, এবং নিজের কারণ বাতপিত্তশ্লেষ্মার বৈষম্য।[২] আগন্তু ব্যথাপূর্বক উৎপন্ন হইয়া পশ্চাৎ বাতপিত্তশ্লেষ্মার বৈষম্য উৎপাদন করে, কিন্তু নিজে বাতপিত্তশ্লেষ্মা পূর্বে বৈষম্য প্রাপ্ত হয়, পশ্চাৎ ব্যথা উৎপাদন করে। সাংখ্যে পরামৃষ্ট দুঃখত্রয় এই চতুর্বিধ অথবা ত্রিবিধ[৩] ব্যাধির প্রকারান্তরে শ্রেণীবিভাগমাত্র।

ব্যাধিসকলের শ্রেণীবিভাগ ও সাংখ্যের দুঃখত্রয়

সাংখ্যসপ্ততির প্রথম কারিকায় গৌড়পাদভাষ্যে দুঃখত্রয়ের এই ব্যাখ্যা দেখি। "দুঃখত্রয় বলিতে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ—শারীর ও মানস। শারীর বলিতে বাতপিত্তশ্লেষ্মার বিপর্যয়কৃত জ্বরাতীসারাদি এবং মানস বলিতে প্রিয়বিয়োগ, অপ্রিয়সংযোগ প্রভৃতি। আধিভৌতিক চতুর্বিধ ভূতগ্রামনিমিত্তক এবং মনুষ্যপশুমৃগপক্ষিসরীসৃপদংশমশকযূপমৎকুণমৎস্যমকরগ্রাহস্থাবর প্রভৃতি জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ হইতে উৎপন্ন হয়। আধিদৈবিক বলিতে 'দেবদের ইহা' অথবা 'দিব্ বা স্বর্গ হইতে উৎপন্ন' দৈব, তাহাকে বিষয় করিয়া যাহা উৎপন্ন হয়—শীত-উষ্ণ-বাত-বর্ষ-অশনিপাত প্রভৃতি।" পরস্পর তুলনা করিলে আমরা দেখি চরকের শারীর ও মানস নিজ ব্যাধিই সাংখ্যের আধ্যাত্মিক দুঃখ এবং চরকের আগন্তুব্যাধিই সাংখ্যের আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ। বস্তুতঃ সুশ্রুত এই ত্রিবিধ দুঃখকেই ব্যাধি বলিয়া সর্ব—তন্মতে সপ্তবিধব্যাধির অবরোধ উহাদের মধ্যেই দেখিয়াছেন।[৪]

আগন্তুগ্রহণেন চ মানসোঽপি কামাদির্গৃহ্যতে'। চক্র। পুনশ্চ ৩।৬।৩, দ্বে রোগানীকে অধিষ্ঠানভেদেন, মনোঽধিষ্ঠানং শরীরাধিষ্ঠানঞ্চ; দ্বে রোগানীকে নিমিত্তভেদেন স্বধাতুবৈষম্যনিমিত্তমাগন্তুনিমিত্তং চ।

১। ১।২০।৪, মুখানি তু খল্বাগন্তোর্নখদশনপতনাভিচারাভিশাপাভিষঙ্গাভিঘাতব্যধবন্ধনবেষ্টনপীড়নরজ্জুদহনশস্ত্রাশনিভূতোপসর্গাদীনি, নিজস্য তু মুখং বাতপিত্তশ্লেষ্মণাং বৈষম্যম্॥ অন্যত্র (১।১১।৪৫) বলিয়াছেন—ত্রয়ো রোগা ইতি—নিজাগন্তুমানসাঃ; তত্র নিজঃ শারীরদোষসমুত্থঃ, আগন্তুর্ভূতবিষবায়্বগ্নিসম্প্রহারাদিসমুত্থঃ, মানসঃ পুনরিষ্ট[স্য]ালাভাল্লাভাচ্চানিষ্টস্যোপজায়তে।

২। আগন্তুর্হি ব্যথাপূর্বং সমুৎপন্নো জঘন্যং বাতপিত্তশ্লেষ্মণাং বৈষম্যমাপাদয়তি; নিজে তু বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ পূর্বং বৈষম্যমাপদ্যন্তে জঘন্যং ব্যথামভিনির্বর্তয়ন্তি।

৩। মানসব্যাধিকে একরূপ ধরিয়া।

৪। সুসং ১।২৪।৪, প্রাগভিহিতং 'তদ্দুঃখসংযোগা ব্যাধয়ঃ' (১।১।২৩) ইতি তচ্চ দুঃখং ত্রিবিধম্ আধ্যাত্মিকম্ আধিভৌতিকম্ আধিদৈবিকমিতি। তত্ সপ্তবিধে ব্যাধাবুপনিপততীতি। তে পুনঃ সপ্তবিধা ব্যাধয়ঃ, তদ্যথা—আদিবলপ্রবৃত্তাঃ, জন্মবলপ্রবৃত্তাঃ, দোষবলপ্রবৃত্তাঃ, সংঘাতবলপ্রবৃত্তাঃ, কালবলপ্রবৃত্তাঃ, দৈববলপ্রবৃত্তাঃ, স্বভাববলপ্রবৃত্তাঃ ইতি॥

আগন্তু অথবা নিজ,[১] শারীর[২] অথবা মানস, সর্বব্যাধি ব্যাধিরই মূল কারণ ত্রিবিধ,—অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম। এই ত্রিবিধ হেতু শারীর দোষত্রয় বায়ু, পিত্ত ও কফ এবং মানস দোষদ্বয় রজঃ ও তমঃকে প্রকুপিত করিয়া রোগ আনয়ন করে।[৩] দীর্ঘজীবিতীয়াধ্যায়ে (১।১।৫৪) ভগ্যন্তরে উক্ত হইয়াছে;[৪] কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থের মিথ্যাযোগ, অযোগ ও অতিযোগ মনঃশরীরাশ্রয়[৫] ব্যাধিসকলের সংক্ষেপতঃ ত্রিবিধ হেতু।' চক্রপাণি বলেন হেতুত্রয়ের উল্লেখকালে এই ক্রমভেদের দ্বারা গ্রন্থকার দেখাইতে চাহেন যে রোগকর্তৃত্বে প্রত্যেকটি হেতুরই প্রাধান্য, কোন একটির প্রধানতা নিয়ম নাই।[৬] বিবিধাশিতপীতীয়ে (১।২৮।৫-৭) প্রথমে[৭] 'এইরূপে এই শরীর, অশিত-পীত-লীঢ়-খাদিত-প্রভব, এই শরীরে ব্যাধিসকলও অশিত-পীত-লীঢ়-খাদিত-প্রভব; হিতোপযোগ ও অহিতোপযোগের বিশেষই এই ব্যাপারে শুভ ও অশুভের বিশেষ আনয়ন করে' এই বলিয়া অগ্নিবেশের শঙ্কার উত্তরে আত্রেয় পুনরায় বলিতেছেন।[৮] "হে অগ্নিবেশ, যাহারা হিতাহার উপযোগ করিয়া থাকে, তাহাদের

ব্যাধিসকলের মূলকারণ

১। ১।২০।৫, দ্বয়োস্তু খল্বাগন্তুনিজয়োঃ প্রেরণমসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ পরিণামশ্চেতি।

২। ২।১।৩-৭, ইহ খলু হেতুর্নিমিত্তমায়তনং কর্তা কারণং প্রত্যয়ঃ সমুত্থানং নিদানমিত্যর্থান্তরম্ তত্ত্রিবিধম্—'অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ, প্রজ্ঞাপরাধঃ, পরিণামশ্চেতি॥ অতস্ত্রিবিধা ব্যাধয়ঃ প্রাদুর্ভবন্ত্যাগ্নেয়াঃ সৌম্যা বায়ব্যাশ্চ; দ্বিবিধাশ্চাপরে রাজসাস্তামসাশ্চ॥ 'আগ্নেয়াঃ পৈত্তিকাঃ, সৌম্যাঃ কফজাঃ, বায়ব্যাঃ বাতজাঃ।' চক্র০।

৩। ৩।৬।৬, তত্র খল্বেষাং দ্বয়ানামপি দোষাণাং ত্রিবিধং প্রকোপণং; তদ্ যথা—অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ, প্রজ্ঞাপরাধঃ, পরিণামশ্চেতি।

৪। কালবুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থানাং যোগো মিথ্যা ন চাতি চ। দ্বয়াশ্রয়াণাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতুসংগ্রহঃ॥

৫। চক্রপাণি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'এতচ্চ মনঃশরীরাধিষ্ঠানত্ব পৃথঙ্ মিলিতং চ বোদ্ধব্যম্।' ইহার পরবর্তী শ্লোকের টীকাতেও বলিয়াছেন, 'অসমাসেন চ পৃথগপি শরীরমনসোর্ব্যাধ্যাশ্রয়ত্বং দর্শয়তি। যতঃ কুষ্ঠাদয়ঃ শারীরা এব, কামাদয়স্তু মানসা উন্মাদাদয়শ্চ দ্বয়াশ্রয়াঃ।'

৬। ২।১।৩ টীকা, 'কালবুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থানাং যোগো মিথ্যা ন চাতি চ' ইতি পূর্বোক্ত-ক্রমভেদেনেহাসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থস্যাদাবভিধানেন সর্বেষামেবৈষাং রোগকর্তৃত্বে প্রাধান্যম্ মা ভূদেকান্তাভিধানেন প্রধানতানিয়মঃ। যদ্যপি চ মূলভূতত্বেন প্রজ্ঞাপরাধঃ প্রধানং ভবতি, তথাপি প্রত্যাসন্নকারণত্বেনাসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগোঽপি প্রধানম্। যদ্যপি কালো দুষ্পরিহরত্বেন প্রধানং তথাপি সোঽপীন্দ্রিয়ার্থপরাধীনত্বেন প্রধানম্ কালাতিযোগাদয়ো হীন্দ্রিয়ার্থশীতাদ্যতিযোগাদিভ্য এব প্রায়ো ভবন্তি।

৭। ১।২৮।৫ এবমিদং শরীরমশিতপীতলীঢ়-খাদিত-প্রভবম্। অশিতলীঢ়-খাদিত-প্রভবাশ্চাস্মিন্ শরীরে ব্যাধয়ো ভবন্তি। হিতাহিতোপযোগবিশেষাত্ত্বত্র শুভাশুভবিশেষকরা ভবন্তীতি।

৮। ১।২৮।৭ ন হিতাহারোপযোগিনামগ্নিবেশ! তন্নিমিত্তা ব্যাধয়ো জায়ন্তে, ন চ কেবল-

তন্নিমিত্তক ব্যাধি জন্মায় না, আবার কেবল হিতাহার-সেবনের দ্বারাই ব্যাধিভয় অতিক্রান্ত হয় না, কারণ অহিতাহারের উপযোগ ছাড়া ব্যাধির অন্য কারণও আছে ; যথা—কালবিপর্যয়, প্রজ্ঞাপরাধ, অসাত্ম্য[1] শব্দস্পর্শরূপরস ও গন্ধ।"

ত্রিস্রৈষণীয় অধ্যায়েও (১।১১।৩৭-৪৩) বলা হইয়াছে,[2] 'রোগের তিনটি আয়তন, অর্থ, কর্ম ও কালের অভিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ।' সেখানে ইহাদের যে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার নিষ্কর্ষ এই দাঁড়ায়; অত্যুৎকট শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের অতিমাত্র গ্রহণ অতিযোগ, সর্বথা অগ্রহণ অযোগ এবং এতদুভয়বর্জিত যে কোন প্রকার অহিতকর উপযোগ মিথ্যাযোগ।[3] বাক্, মনঃ ও শরীরের প্রবৃত্তিই কর্ম; তাহাদের অতিপ্রবৃত্তি অতিযোগ, সর্বথা অপ্রবৃত্তি অযোগ এবং অতিযোগ ও অযোগ ছাড়া আর যে কোন অহিত বা অনুপদিষ্ট প্রবৃত্তি মিথ্যাযোগ, ত্রিবিধবিকল্প এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তিই প্রজ্ঞাপরাধ।[4] শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণ হেমন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-সংবৎসর, তাহাই কাল: অতিমাত্র স্বলক্ষণ বর্তমান থাকিলে কালাতিযোগ, হীনস্বলক্ষণ বর্তমান থাকিলে কালাযোগ এবং স্বলক্ষণের বিপরীতলক্ষণ বর্তমান থাকিলে কালমিথ্যাযোগ হয়। কালকেই পরিণাম বলে।

কতিধাপুরুষীয়ে (৪।১।৯৮-১৩২) এই হেতুসমূহ কিছু অন্যভাবে দেখান হইয়াছে:[5] ধী, ধৃতি ও স্মৃতির বিভ্রংশ, কাল ও কর্মের সংপ্রাপ্তি এবং অসাত্ম্য

হিতাহারোপযোগাদেব সর্বব্যাধিভয়মতিক্রান্তং ভবতি, সন্তি হ্যৃতেঽপ্যহিতাহারোপযোগাদন্যা রোগপ্রকৃতয়ঃ; তদ্ যথা—কালবিপর্যয়ঃ, প্রজ্ঞাপরাধঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাশ্চাসাত্ম্যা ইতি।

১। ৩।৮।১১৮, সাত্ম্যং নাম তদ্ যৎ সাতত্যেনোপসেব্যমানমুপশেতে। ৩।১।২৩, সাত্ম্যং নাম তৎ যদাত্মন্যুপশেতে; সাত্ম্যার্থো হ্যুপশয়ার্থঃ। 'যাহা সেবিত হইয়া প্রাকৃতরূপের উপঘাতক হয়, তাহাই অসাত্ম্য'—চক্র ৪।১।১২৭, 'অসাত্ম্যমিতি তদ্বিত্তাদ্ যন্ন যাতি সহাত্মতাম্'। এই শ্লোকার্ধের টীকায়।

২। ১।১১।৩৭, ত্রীণ্যায়তনানীতি—অর্থানাং কর্মণঃ কালস্য চাতিযোগাযোগমিথ্যাযোগাঃ। তত্রাতিপ্রভাবতাং দৃশ্যানামতিমাত্রদর্শনমতিযোগঃ, সর্বশোঽদর্শনমযোগঃ, অতিশ্লিষ্টাতিবিপ্রকৃষ্টরৌদ্র-ভৈরবাদ্ভুতদ্বিষ্টবীভৎসনবিকৃতবিত্রাসনাদিরূপদর্শনং মিথ্যাযোগঃ, ...।

৩। ১।১১।৩৯-৪১, কর্ম বাঙ্মনঃশরীরপ্রবৃত্তিঃ। তত্র বাঙ্মনঃশরীরাতিপ্রবৃত্তিরতিযোগঃ সর্বশোঽপ্রবৃত্তিরযোগঃ ...॥ সংগ্রহেণ চাতিযোগাযোগবর্জং কর্ম বাঙ্মনঃশরীরজমহিতমনুপদিষ্টং যত্তৎ মিথ্যাযোগং বিদ্যাৎ॥ ইতি ত্রিবিধবিকল্পম্ ত্রিবিধমেব কর্ম প্রজ্ঞাপরাধ ইতি ব্যবস্যেৎ॥

৪। শীতোষ্ণবর্ষলক্ষণাঃ পুনর্হেমন্তগ্রীষ্মবর্ষাঃ সংবৎসরঃ, স কালঃ, তত্রাতিমাত্র-স্বলক্ষণঃ কালঃ কালাতিযোগঃ, হীনস্বলক্ষণঃ কালাযোগঃ, যথাস্বলক্ষণ-বিপরীতলক্ষণস্তু কালমিথ্যাযোগঃ, কালঃ পুনঃ পরিণাম উচ্যতে॥

৫। ৪।১।৯৮-১০২ ধীধৃতিস্মৃতিবিভ্রংশঃ সংপ্রাপ্তিঃ কালকর্মণাম্। অসাত্ম্যার্থাগমশ্চেতি জ্ঞাতব্যা দুঃখহেতবঃ॥ বিষমাভিনিবেশো যো নিত্যানিত্যে হিতাহিতে। জ্ঞেয়ঃ সঃ বুদ্ধিবিভ্রংশঃ সমবুদ্ধির্হি

ইন্দ্রিয়ার্থের সংযোগ এইগুলিকে দুঃখের হেতু বলিয়া জানিতে হইবে।[১] (১) নিত্য ও অনিত্যে, হিত ও অহিতে যে অনুচিত অভিনিবেশ, তাহাকে বুদ্ধিবিভ্রংশ বলে, কারণ (উচিত) বুদ্ধি যথাযথ দেখিয়া থাকে। বিষয়প্রবণ মনকে ধৃতিভ্রংশের জন্যই অহিত-বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারা যায় না, কারণ নিয়মনই ধৃতির স্বরূপ। রজঃ ও মোহকর্তৃক মন আবৃত হইলে তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে স্মৃতি যে ভ্রষ্ট হয়, তাহাই স্মৃতিভ্রংশ, যেহেতু স্মর্তব্য বস্তু স্মৃতিতে অবস্থান করিয়া থাকে। ধী, ধৃতি ও স্মৃতি হইতে বিচ্যুত ব্যক্তি যে অশুভ কর্ম করে, তাহাকে প্রজ্ঞাপরাধ বলিয়া জানিবে, উহা সর্ব-দোষের প্রকোপণ বুদ্ধি[২] দিয়া অনুচিত জ্ঞান এবং অনুচিত প্রবৃত্তিকে প্রজ্ঞাপরাধ বলিয়া জানিবে কারণ তাহা মনের গোচর।[৩] (২) কাল দ্বিবিধ নিত্যগ ও আবস্থিক; নিত্যগ অহোরাত্রাদিরূপ এবং আবস্থিক রোগিত্ব এবং বাল্যাদি অবস্থা দ্বারা বিশেষিত। এই[৪] দ্বিবিধকালেই দোষবিশেষের এবং বিকারবিশেষের যে প্রাপ্তি তাহাই কাল-সংপ্রাপ্তি। কোন কোন রোগ নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইলেই উপস্থিত হয় যেমন অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চতুর্থক, চতুর্থকবিপর্যয় প্রভৃতি। এই[৫] সকল এবং

পশ্যতি ॥ বিষয়প্রবণঃ সত্ত্বং ধৃতিভ্রংশান্ন শক্যতে। নিয়ন্তুমহিতাদর্থাদ্ধৃতির্হি নিয়মাত্মিকা ॥ তত্ত্বজ্ঞানে স্মৃতির্যস্য রজোমোহাবৃতাত্মনঃ। ভ্রশ্যতে স স্মৃতিভ্রংশঃ স্মর্তব্যং হি স্মৃতৌ স্থিতম্ ॥ ধীধৃতিস্মৃতিবিভ্রষ্টঃ কর্ম যৎ কুরুতেঽশুভম্। প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ সর্বদোষপ্রকোপণম্ ॥

১ ধীধৃতিস্মৃতয়ঃ প্রজ্ঞাভেদাঃ। এতে চ শিষ্যব্যুৎপত্ত্যর্থমন্যথা ব্যুৎপাদ্য ইহোচ্যন্তে ॥ সংপ্রাপ্তিঃ কালকর্মণামিতি কালস্য সংপ্রাপ্তিস্তথা কর্মণঃ সংপ্রাপ্তিঃ। কর্মসংপ্রাপ্তিঃ পচ্যমানকর্মযোগঃ। কালসংপ্রাপ্তিগ্রহণেন চেহ যে কালব্যক্ত্যাস্তে গৃহ্যন্তে, নাবশ্যং কালজন্যাঃ, যতঃ স্বাভাবিকানপি কালজন্যান্ তথা তৃতীয়কাদীনসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থাদিজন্যান্ কালজত্বেনৈবেহাভিধাস্যতি। কর্মজাস্তু প্রজ্ঞাপরাধজন্যা এবেহ কর্মজন্যত্বেন বিশেষেণ শিষ্যব্যুৎপত্ত্যর্থং পৃথগুচ্যন্তে, কালব্যঙ্গ্যত্বেন চ কর্মজা ইহ কালসংপ্রাপ্তিজন্যেষ্ববরোদ্ধব্যাঃ। প্রজ্ঞাপরাধাবরোধশ্চ যথা কর্মজানাং তথা প্রথমাধ্যায়ে এবোক্তম্। কিঞ্চাচার্যেণোন্মাদনিদানে স্বয়মেবোক্তং যৎ প্রজ্ঞাপরাধাৎ সম্ভূতে ব্যাধৌ কর্মজ আত্মনঃ' (২।৭।২৪) ইত্যাদি।......তস্মাদিহ সংপ্রাপ্তিঃ কালকর্মণামিত্যনেন ন কালজন্যা গদা উচ্যন্তে, কিন্তু কালব্যঙ্গ্যাঃ। চক্র০।

২। ৪।১।১০৯ বুদ্ধ্যা বিষমবিজ্ঞানং বিষমং চ প্রবর্তনম্। প্রজ্ঞাপরাধং জানীয়াম্মনসো গোচরং হি তৎ।

৩। ৩।১।৩০ কালো হি নিত্যগশ্চাবস্থিকশ্চ; তত্রাবস্থিকঃ বিকারমপেক্ষতে; নিত্যগস্তু ঋতুসাত্ম্যাপেক্ষঃ। 'নিত্যগ ইত্যহোরাত্রাদিরূপঃ। আবস্থিক ইতি রোগিত্ববাল্যাদ্যবস্থাবিশেষিত ইত্যর্থঃ।' চক্র০।

৪। ৪।১।১১০-১১৩

৫। ৪।১।১১৪-১১৭, এতে চান্যে চ যে কেচিৎ কালজা বিবিধা গদাঃ। অনাগতে চিকিৎস্যাস্তে বলকালৌ বিজানতা ॥ কালস্য পরিণামেন জরামৃত্যুনিমিত্তজাঃ। রোগাঃ স্বাভাবিকা দৃষ্টাঃ

অন্যান্য যে কোন কালজ ব্যাধির চিকিৎসা, বল ও কাল জানিয়া, উপস্থিত হইবার পূর্বেই করিতে হয়। কালের পরিণামবশতঃ জরামৃত্যুনিমিত্তজ স্বাভাবিক রোগসকল দৃষ্ট হয়; স্বভাবের কোন প্রতীকার নাই। যে পৌর্বদেহিক কর্ম দৈবশব্দে নির্দিষ্ট হয় তাহাও কালযুক্ত হইয়া রোগের হেতুরূপে দৃষ্ট হয়। এমন কোন মহৎ কর্ম নাই যাহার ফল ভোগ করিতে হয় না; কর্মজ রোগসকল চিকিৎসাক্রিয়াকে নষ্ট করে, কিন্তু কর্মের ক্ষয় হইলেই শান্ত হয়। (৩) পূর্বে উল্লিখিত তিস্রৈষণীয়াধ্যায়ে অসাত্ম্যেন্দ্রিয়াসংযোগের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এখানেও (৪।১।১১৮-১২৭) তদ্রূপ কতক কতক নূতন উদাহরণ দিয়া এক বিবরণ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।[১] শব্দাদির মিথ্যাযোগ, হীনযোগ[২] ও অতিযোগ হইতে যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে ঐন্দ্রিয়ক ব্যাধি বলা হয়। অশান্ত বেদনা অর্থাৎ দুঃখের এইগুলি কারণ, সুখের হেতু একমাত্র সমযোগ, কিন্তু তাহা সুদুর্লভ।

ব্যাধির মূলকারণ লইয়া যজ্জঃপুরুষীয়ে (১।২৫।১-৩১) এক মনোহর অর্থপূর্ণ আলোচনা উত্থাপিত হইয়াছে। 'পুরুষ যাহা হইতে জাত, রোগসকল তাহা হইতেই জাত কি না?' কাশিপতি রামকের এই প্রশ্নের উত্তরে মৌদগল্য পারীক্ষি বলিলেন, 'পুরুষ[৩] আত্মা হইতে জাত, রোগসকলও আত্মা হইতে জাত; যেহেতু আত্মাই কারণ। সেই কর্ম চয়ন করে ও কর্মসকল ভোগ করে; যেহেতু চেতনাধাতু ছাড়া সুখেদুঃখে প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না।'[৪] শরলোমা বলিলেন, 'না, দুঃখদ্বেষী আত্মা কখনও নিজেই নিজেকে দুঃখপ্রদ ব্যাধিসকলের সহিত যুক্ত করিতে পারে না, কিন্তু

স্বভাবো নিষ্প্রতিক্রিয়ঃ॥ নির্দিষ্টং দৈবশব্দেন কর্ম যৎ পৌর্বদেহিকম্। হেতুস্তদপি কালেন রোগাণামুপলভ্যতে॥ ন হি কর্ম মহৎ কিঞ্চিৎ ফলং যস্য ন ভুজ্যতে। ক্রিয়াঘ্নাঃ কর্মজা রোগাঃ প্রশমং যান্তি তৎক্ষয়াৎ॥

১। ৪।১।১২৮-১২৯, মিথ্যাতিহীনযোগেভ্যো যো ব্যাধিরুপজায়তে। শব্দাদীনাং স বিজ্ঞেয়ো ব্যাধিরিন্দ্রিয়কো বুধৈঃ॥ বেদনানামশান্তানামিত্যেতে হেতবঃ স্মৃতাঃ। সুখহেতুঃ সমস্ত্বেকঃ সমযোগঃ সুদুর্লভঃ॥

২। 'হীনযোগেনেহ অযোগো গ্রাহ্যঃ'—চক্র০।

৩। ১।২৫।৮-৯, আত্মজঃ পুরুষো রোগাশ্চাত্মজাঃ কারণং হি সঃ। স চিনোত্যুপভুঙ্ক্তে চ কর্ম কর্মফলানি চ॥ ন হ্যতে চেতনাধাতোঃ প্রবৃত্তিঃ সুখদুঃখয়োঃ। 'কর্মফলানি শরীরারোগ্যবিকারাদীনি…। কর্মসহায়স্যাত্মনো শরীরবিকারাদিকর্তৃত্বাৎ কারণমিতি ভাবঃ।… সুখদুঃখয়োরিতি সুখদুঃখসাধনয়োঃ নীরুক্‌শরীরবিকারয়োরিত্যর্থঃ।—চক্র০।

৪। শ্লো০ ১০-১১, শরলোমা তু নেত্যাহ নহ্যাত্মাত্মানমাত্মনা। যোজয়েদ্ ব্যাধিভির্দুঃখৈর্দুঃখদ্বেষী কদাচন॥ রজস্তমোভ্যাং তু মনঃ পরীতং সত্ত্বসংজ্ঞকম্। শরীরস্য সমুৎপত্তৌ বিকারাণাং চ কারণম্॥

রজঃ ও তমঃ কর্তৃক ব্যাপ্ত সত্ত্বসংজ্ঞক মন শরীর ও বিকারসমূহের উৎপত্তি-বিষয়ে কারণ।'[১] বার্যোবিদ বলিলেন, না, একা মনই কারণ নহে। শরীর ছাড়া শারীর রোগসকল থাকিতে পারে না, মনও থাকিতে পারে না। প্রাণিসকল রসজ, পৃথগ্বিধ ব্যাধিসকলও রসজ। জলেরই রস আছে, অতএব তাহাই তাহাদের উৎপত্তির কারণ।' হিরণ্যাক্ষ[২] বলিলেন, 'না, আত্মাকে রসজ বলা হয় না, অতীন্দ্রিয় মনকেও রসজ বলা হয় না, এবং শব্দাদিজাত রোগসমূহও আছে। পুরুষ ষড়্ধাতুজ, সেইরূপ ব্যাধিসকলও ষড়্ধাতুজ; যেহেতু প্রাচীন সাংখ্যগণ ইহাকে ষড়্ধাতুজ রাশি বলিয়াছেন।' কৌশিক[৩] বলিলেন, 'তাহা নহে; মাতাপিতা ছাড়া ষড়্ধাতুজ কিরূপে হইতে পারে? পুরুষ পুরুষ হইতে, গো গো হইতে, অশ্ব অশ্ব হইতে উৎপন্ন হয়; মেহ প্রভৃতি রোগও পিত্র্য, তাহারাই এই বিষয়ে কারণ।' ভদ্রকাপ্য[৪] বলিলেন, না, কারণ অন্ধ হইতে অন্ধের উৎপত্তি হয় না। আদিতে মাতাপিতারও উৎপত্তি সম্ভব হয় না। প্রাণীকে কর্মজ ধরা হয়, তাহার রোগসকলও কর্মজ; যেহেতু কর্ম ছাড়া রোগসকলের বা পুরুষের জন্ম হয় না।' ভরদ্বাজ[৫] বলিলেন, 'না, কারণ কর্মের পূর্বে কর্তা আর অকৃত কর্মও দেখা যায় যাহার ফল হইবে পুরুষ। স্বভাবই ব্যাধিসকলের

১। ১২-১৩, বার্যোবিদস্তু নেত্যাহ নহ্যেকং কারণং মনঃ। নর্তে শরীরাচ্ছারীররোগা ন মনসঃ স্থিতিঃ॥ রসজানি তু ভূতানি ব্যাধয়শ্চ পৃথগ্বিধাঃ। আপো হি রসবত্যস্তাঃ স্মৃতা নির্বৃত্তিহেতবঃ॥ 'রজস্তমঃ-পরীতস্য হি মনসো নিত্যং শরীর এব স্থিতিঃ; যত্তু নির্দোষং মনস্তত্তু ন পুরুষস্য নাপি ব্যাধেঃ কারণমিতি ভাবঃ।'—চক্র॰।

২। ১৪-১৫, হিরণ্যাক্ষস্তু নেত্যাহ ন হ্যাত্মা রসজঃ স্মৃতঃ। নাতীন্দ্রিয়ং মনঃ সন্তি রোগাঃ শব্দাদিজাস্তথা॥ ষড়্ধাতুজস্তু পুরুষো রোগাঃ ষড়্ধাতুজাস্তথা। রাশিঃ ষড়্ধাতুজো হ্যেষ সাংখ্যৈরাদ্যৈঃ প্রকীর্তিতঃ॥

৩। ১৬-১৭, তন্নেতি কৌশিকঃ। কস্মান্মাতাপিতৃভ্যাং হি বিনা ষড্ধাতুজো ভবেৎ পুরুষঃ পুরুষাদ্গৌর্গোরশ্বাদশ্বঃ প্রজায়তে। পিত্র্যা মেহাদয়শ্চোক্তা রোগাস্তাবত্র কারণম্॥ 'মাতাপিত্রনপেক্ষিত্বে সর্বপ্রাণিষু ষড্ধাতুসমুদায়স্য বিদ্যমানত্বেন নরগোঽশ্বাদিভেদো ন স্যাদিতি ভাবঃ।...পিতৃতোঽপত্যং গচ্ছন্তীতি পিত্র্যাঃ, আদিশব্দেন কুষ্ঠার্শঃপ্রভৃতয়ো গ্রাহ্যাঃ।'—চক্র॰।

৪। ১৮-১৯, ভদ্রকাপ্যস্তু নেত্যাহ ন হ্যন্ধোঽন্ধাৎ প্রজায়তে। মাতাপিত্রোরপি চ তে প্রাগুৎপত্তির্ন যুজ্যতে॥ কর্মজস্তু মতো জন্তুঃ কর্মজাস্তস্য চাময়াঃ। নহ্যৃতে কর্মণো জন্ম রোগাণাং পুরুষস্য বা॥ 'প্রাগিতি সর্গাদৌ মাতাপিত্রোরুৎপত্তির্ন স্যাৎ; সর্গাদৌ নিঃশরীরিণি আদিভূতয়োর্মাতাপিত্রোরভাবাদুৎপাদো নোপপন্ন ইতি ভাবঃ।'—চক্র॰।

৫। ২০-২১, ভরদ্বাজস্তু নেত্যাহ কর্তা পূর্বং হি কর্মণঃ। দৃষ্টং ন চাকৃতং কর্ম যস্য স্যাৎ পুরুষঃ ফলম্॥ ভাবহেতুঃ স্বভাবস্তু ব্যাধীনাং পুরুষস্য চ। খরদ্রবচলোষ্ণত্বং তেজোন্তানাং যথৈব হি।

এবং পুরুষের উৎপত্তির কারণ, ঠিক যেমন পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নির যথাক্রমে খরতা, দ্রবতা, চলতা ও উষ্ণতা স্বভাবসিদ্ধ।' কাঙ্কায়ন[১] বলিলেন, 'না, স্বভাব হইতেই ভাবসকলের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি হইলে চেষ্টার ফল থাকে না।[২] ব্রহ্মার অপত্য অমিতসঙ্কল্প প্রজাপতিই চেতন ও অচেতন এই সুখদুঃখের স্রষ্টা।' ভিক্ষু আত্রেয় বলিলেন, 'তাহা নহে, প্রজাহিতৈষী প্রজাপতি নিজের অপত্যকে অসাধুর মত সতত দুঃখযুক্ত করিতে পারেন না। পুরুষ কালজ, তাহার রোগসকলও কালজ। সমস্ত জগৎ কালের বশ, কালই সর্ববিষয়ে কারণ।' ঋষিদিগকে[৩] এইরূপ বিবাদ করিতে দেখিয়া পুনর্বসু বলিলেন, 'আপনারা এরূপ বলিবেন না, কারণ পক্ষগ্রহণ করিলে তত্ত্ব দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে। এইরূপ বাদসঙ্ঘট্ট ত্যাগ করিয়া তত্ত্বসম্বন্ধে চিন্তা করুন। যে সকল ভাবের সম্পৎ পুরুষের উৎপত্তির কারণ তাহাদেরই বিপৎ বিবিধ ব্যাধি উৎপাদন করিয়া থাকে।'

কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থের মিথ্যা-যোগ, অযোগ ও অতিযোগ যেমন দুঃখ বা ব্যাধির কারণ তেমনই তাহাদের সম-যোগ সুখ বা আরোগ্যের কারণ[৪]। শুধু তাহাই নহে, সকল ভাবেরই ভাব ও অভাব যোগ, অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ ছাড়া দেখা যায় না; কারণ ভাব ও অভাব উভয়ই নিজ নিজ যোগের অপেক্ষা করে।[৫] সুখের লক্ষণ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীরের তুষ্টি; উহা আয়ুর্বেদশাস্ত্রের কার্য বলিয়া পরিগণিত

আরোগ্যের উপায়। রোগের অনুৎপাদন ও চিকিৎসা

১। ২২-২৫, কাঙ্কায়নস্তু নেত্যাহ ন হ্যারম্ভফলং ভবেৎ। ভবেৎ স্বভাবাদ্ ভাবানামসিদ্ধিঃ সিদ্ধিরেব বা॥ স্রষ্টা ত্বমিতসঙ্কল্পো ব্রহ্মাপত্যং প্রজাপতিঃ। চেতনাচেতনস্যাস্য জগতঃ সুখ-দুঃখয়োঃ॥ তন্নেতি ভিক্ষুরাত্রেয়ো ন হ্যপত্যং প্রজাপতিঃ। প্রজাহিতৈষী সততং দুঃখৈর্যুঞ্জ্যাদ-সাধুবৎ॥ কালজস্ত্বেব পুরুষঃ কালজাস্তস্য চাময়াঃ। জগৎ কালবশং সর্বং কালঃ সর্বত্র কারণম্॥

২। য ইমে লোকশাস্ত্রসিদ্ধা যাগকৃষ্যধ্যয়নাদ্যারম্ভাস্তে নিষ্প্রয়োজনা ভবেয়ুরকারণত্বাদিত্যর্থঃ।— চক্র°।

৩। ২৬-২৯, তথর্ষীণাং বিবদতামুবাচেদং পুনর্বসুঃ। মৈবং বোচত তত্ত্বং হি দুষ্প্রাপং পক্ষ-সংশ্রয়াৎ।...মুক্ত্বৈবং বাদসঙ্ঘট্টমধ্যাত্মমনুচিন্ত্যতাম্।...যেষামেব হি ভাবানাং সংপৎ সংজনয়েন্নরম্। তেষামেব বিপদ্ব্যাধীন্ বিবিধান্ সমুদীরয়েৎ॥

৪। ১।১১।৫৫, যোগস্তু সুখানাং কারণং সমঃ; ১।১১।৪৩ সমযোগযুক্তাস্তু প্রকৃতিহেতবো ভবন্তি।

৫। ১।১১।৪৪, সর্বেষামেব ভাবানাং ভাবাভাবৌ নান্তরেণ যোগাযোগাতিযোগমিথ্যাযোগান্ সমুপলভ্যেতে; যথাস্বযুক্ত্যপেক্ষিণৌ হি ভাবাভাবৌ॥ 'ভাবঃ সম্যগবস্থানং, অভাবোঽসম্যগবস্থানং বিনাশো বা; যোগাৎ সম্যগ্‌যোগাদ্ভাবঃ অযোগাদিভ্যোঽভাবঃ; যথাস্বং যুক্তির্যা যস্য ভাবস্য ভাবস্য বা যুক্তিঃ স্বকারণযুক্তিঃ, তদপেক্ষিণৌ ভবত ইতি সম্বন্ধঃ। যথা বৃক্ষস্য ভাবেঽবস্থানেঽনন্যাদ-

ধাতুসাম্যের ফল।[১] ধাতুসাম্যের লক্ষণ, বিকারের উপশম (বা অভাব) এবং উহার পরীক্ষা পীড়ার উপশম (বা অভাব), স্বর ও বর্ণের যোগ, শরীরের উপচয়, বলবৃদ্ধি, খাদ্য ও পানীয়ে অভিলাষ, আহারকালে রুচি, ভুক্তদ্রব্যের কালে সম্যক্ পরিপাক, যথাকালে নিদ্রালাভ, বৈকারিক স্বপ্নসকলের অদর্শন এবং সুখে জাগরণ, বাত, মূত্র, পুরীষ ও শুক্রের মুক্তি এবং সর্বরূপে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকলের অব্যাপত্তি।[২] ধাতুসাম্য বলিতে সম ধাতুর অনুবৃত্তি এবং বিষম ধাতুর সমীকরণ; উহার লক্ষ্য, অজাত ব্যাধির অনুৎপত্তি ও জাত ব্যাধির নিবৃত্তি।

জাতব্যাধির নিবৃত্তি তাহার সন্নিকৃষ্ট কারণ[৩] শারীর ও মানস দোষসকলের প্রশমন দ্বারা সংসাধিত হয়। তন্মধ্যে শারীর দোষত্রয় দৈবব্যপাশ্রয় ও যুক্তিব্যপাশ্রয় ঔষধের দ্বারা ও মানস দোষদ্বয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য, স্মৃতি ও সমাধি দ্বারা প্রশমিত হয়।[৪] এই কথাই অন্যত্র (১।১১।৫৪) স্পষ্টতর করিয়া বলা হইয়াছে[৫]। 'ঔষধ ত্রিবিধ—দৈব-ব্যপাশ্রয়, যুক্তি-ব্যপাশ্রয় ও সত্ত্বাবজয়। তন্মধ্যে দৈবব্যপাশ্রয় বলিতে মন্ত্র, ওষধি, মণি, মঙ্গল, পূজা, উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, প্রণিপাত, গমন প্রভৃতি; যুক্তিব্যপাশ্রয় বলিতে আহার ও ঔষধ দ্রব্যের মাত্রা-কালাপেক্ষী[৬] যোজনা; এবং সত্ত্বাবজয় বলিতে অহিতবিষয় হইতে মনের নিগ্রহ।' দেশ, মাত্রা ও কাল বিবেচনা করিয়া উপপাদিত বিপরীতগুণ ভেষজসমূহের দ্বারা সাধ্য বলিয়া অভিমত বিকারসকল নিবৃত্ত হয়; কিন্তু অসাধ্য ব্যাধির চিকিৎসা

পানীয়যোগাদির্যুক্তিঃ, অভাবে তু বৃক্ষস্য পানীয়াতপাতিযোগাযোগৌ তথা বজ্রপাতাদির্যুক্তিঃ, তত্তস্তদপেক্ষৌ বৃক্ষস্য ভাবাভাবৌ ভবত ইত্যাদি কল্পনীয়ম্।—চক্র০।

১। ৩।৮।২০, কার্যফলং সুখাবাপ্তিঃ, তস্য লক্ষণং—মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়শরীরতুষ্টিঃ॥

২। ৩।৮।৮৯, কার্যং ধাতুসাম্যং, তস্য লক্ষণং বিকারোপশমঃ। পরীক্ষা তস্য—রুগুপশমনং, স্বরবর্ণযোগঃ, শরীরোপচয়ঃ, বলবৃদ্ধিঃ, অভ্যবহৃতস্য চাহারস্য কালে সম্যগ্জরণং, নিদ্রালাভো যথাকালং বৈকারিকাণাং চ স্বপ্নানামদর্শনং, সুখেন চ প্রতিবোধনং, বাতমূত্রপুরীষরেতসাং মুক্তিঃ, সর্বাকারৈর্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং চাব্যাপত্তিরিতি॥

৩। 'কারণং চ ব্যাধীনাং সন্নিকৃষ্টং বাতাদি, বিপ্রকৃষ্টমর্থানামযোগাদি।'—চক্র০ ২।১।৭ টী০।

৪। ১।১।৫৮, প্রশাম্যত্যৌষধৈঃ পূর্বো দৈবযুক্তিব্যপাশ্রয়ৈঃ। মানসো জ্ঞানবিজ্ঞানধৈর্যস্মৃতিসমাধিভিঃ॥

৫। ১।১১।৫৪, ত্রিবিধম্ ঔষধমিতি দৈবব্যপাশ্রয়ং, যুক্তিব্যপাশ্রয়ং, সত্ত্বাবজয়শ্চ। তত্র দৈবব্যপাশ্রয়ং মন্ত্রৌষধিমণিমঙ্গলবল্যুপহারহোমনিয়মপ্রায়শ্চিত্তোপবাসস্বস্ত্যয়নপ্রণিপাতগমনাদি, যুক্তিব্যপাশ্রয়ং পুনরাহারৌষধদ্রব্যাণাং যোজনা, সত্ত্বাবজয়ঃ পুনরহিতেভ্যোঽর্থেভ্যো মনোনিগ্রহঃ॥ 'গমনং বিদূরদেশাদিগমনম্।'—চক্র০।

৬। ১।২।১৬, মাত্রাকালাশ্রয়া যুক্তিঃ।

উপদিষ্ট হয় না।[১] যাহাতে স্বাস্থ্য অনুবর্তন করে এবং যাহা অজাতবিকারের অনুৎপত্তিকর, তাহার নিত্যপ্রয়োগ করিবে।[২] অনাতুর ব্যক্তি নিজরোগের অনুৎপত্তির জন্য স্বস্থবৃত্ত[৩] পালন করিবে; স্নিগ্ধস্বিন্নশরীর হইয়া হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় সঞ্চিত শ্লেষ্মা, বায়ু ও পিত্ত যথাক্রমে চৈত্র, শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ মাসে বমন, বস্তিকর্ম ও বিরেচন দ্বারা নির্হরণ করিবে এবং তদনন্তর নস্যকর্ম করিবে; অতঃপর উচিতকালে যথাক্রমে ও যথাযোগ্যভাবে সিদ্ধ রসায়ন ও বৃষ্যযোগসকল সেবন করিবে। এইরূপ করিলে ধাতুসকল প্রকৃতিস্থ ও পরিপুষ্ট হয় এবং জরা মন্দতা-প্রাপ্ত হয়।[৪] আগন্তু ও মানস ব্যাধির অনুৎপত্তির এই পন্থা নির্দর্শিত হইয়াছে; প্রজ্ঞাপরাধসমূহের বর্জন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, স্মৃতি, দেশ, কাল ও নিজের সম্বন্ধে সম্যক্‌জ্ঞান এবং সদ্বৃত্তের[৫] অনুপালন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ হিত বলিয়া যাহা জানিবে তাহা পূর্ব হইতেই করিবে।[৬] বিকার এবং প্রকৃতি সংক্ষেপতঃ এই দুই-ই সব; উভয়ই হেতুর বশবর্তী, হেতুর অভাব ঘটিলে কোনটিই অনুবর্তন করে না।[৭]

১। ১।১।৬২-৬৩ বিপরীতগুণৈর্দেশমাত্রা কালোপপাদিতৈঃ। ভেষজৈর্বিনিবর্ত্তন্তে বিকারাঃ সাধ্যসম্মতাঃ॥ সাধনং নত্বসাধ্যানাং ব্যাধীনামুপদিশ্যতে।

২। ১।৫।১৩, তচ্চ নিত্যং প্রযুঞ্জীত স্বাস্থ্যং যেনানুবর্ত্ততে। অজাতানাং বিকারাণামনুৎপত্তিকরং চ যৎ॥ 'তচ্চ স্বাস্থ্যমুভয়থা পরিপাল্যতে বিশুদ্ধাহারাচারাভ্যাং সদাক্ষীয়মাণশরীরপোষণেন, প্রত্যবায়-হেতুপরিহারেণ চ; যথা দীপপরিপালনং স্নেহবর্ত্তিদানাৎ ক্রিয়তে, তথা প্রবলবাতাদিনির্বাপকহেতু-পরিহারেণ চ। প্রত্যবায়হেতুশ্চ দ্বিবিধঃ—বুদ্ধিদোষাদ্ বিষমশরীরচেষ্টাদিবাতাদিকারকঃ তৎপরিহরশ্চ কালবিশেষঃ স্বভাবাদিহ হেমন্তাদিঃ কফচয়াদিকারকঃ।'—চক্র০।

৩। সূত্রস্থান ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে সংক্ষেপতঃ উক্ত।

৪। ১।৭।৪৫-৪৯,…অনাতুরস্তস্মাৎ স্বস্থবৃত্তপরো ভবেৎ॥ মাধবপ্রথমে মাসি নভস্য প্রথমে পুনঃ। সহস্য প্রথমে চৈব হারয়েদ্ দোষসঞ্চয়ম্॥ স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরাণামূর্ধ্বং চাধশ্চ নিত্যশঃ। বস্তিকর্ম ততঃ কুর্য্যান্নস্তকর্ম চ বুদ্ধিমান্॥ যথাক্রমং যথাযোগ্যমত ঊর্ধ্বং প্রয়োজয়েৎ। রসায়নানি সিদ্ধানি বৃষ্যযোগাংশ্চ কালবিৎ॥ রোগাস্তথা ন জায়ন্তে প্রকৃতিস্থেষু ধাতুষু। ধাতবশ্চাভিবর্ধন্তে জরা মান্দ্যমুপৈতি চ॥

৫। ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয় অধ্যায়ে (১।৮।১৮-৩৪) সবিস্তরে উক্ত।

৬। ১।৭।৫৩-৫৪ ত্যাগঃ প্রজ্ঞাপরাধানামিন্দ্রিয়োপশমঃ স্মৃতিঃ। দেশকালাত্মবিজ্ঞানং সদ্বৃত্তস্যানু-বর্ত্তনম্॥ আগন্তূনামনুৎপত্তাবেষ মার্গো নিদর্শিতঃ। প্রাজ্ঞঃ প্রাগেব তৎ কুর্যাদ্ধিতং বিদ্যাদ্যদাত্মনঃ॥ 'আগন্তুমানসপরিহারে হেতুমাহ—ত্যাগ ইত্যাদি।…স্মৃতিঃ পুত্রাদীনাং বিনশ্বরস্বভাবত্বানুস্মরণম্।'—চক্র০।

৭। ২।৮।৪১, বিকারঃ প্রকৃতিশ্চৈব দ্বয়ং সর্বং সমাসতঃ। তদ্ধেতুবশগং হেতোরভাবান্নানুবর্ত্ততে॥ 'বিকারো বৈষম্যম্। প্রকৃতিঃ সাম্যম্। সর্বমিত্যনেন শারীরং তথাধ্যাত্মিকম্ চোপসংগৃহ্নাতি

হেতুবৈষম্যের জন্য দেহধাতুসকল বিষম ও হেতুসাম্যের জন্য সম হয়; তাহাদের উভয়েরই স্বভাবতঃ সদাই বিনাশ ঘটে। ভাবসকলের উৎপত্তির কারণ আছে, বিনাশের কারণ নাই; কেহ কেহ উহাতেও উৎপাদক হেতুর আবৃত্তিকেই হেতু বলিয়া মনে করেন।[১] এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, স্বভাবতই যদি বিনাশ ঘটে, তাহা হইলে চিকিৎসকের কার্য কি রহিল? চিকিৎসক কোন বিষম ধাতুকে সম করিবেন? চিকিৎসা বলিতেই বা কি এবং তাহা কি জন্যই বা প্রযুক্ত হইবে?[২] ইহার উত্তরে পুনর্বসু মহর্ষিগণকর্তৃক দৃষ্ট এই যুক্তি উদাহৃত করিয়াছেন। ভাবসকলের বিনাশের কারণ না থাকার জন্য জানা যায় না, যেমন নিত্যগ কালের অত্যয়কারণ। অস্থির বলিয়া কোন ভাব যেমনভাবে উৎপন্ন হয় তেমনই বিনষ্ট হয়; তাহার বিনাশের কারণ নাই, অন্যথাকরণও সম্ভবপর নহে।[৩] যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা শরীরে ধাতুসকল সম হয়, তাহাই বিকারসমূহের চিকিৎসা ও চিকিৎসকের কর্ম। কিরূপে শরীরে ধাতুসকলের বৈষম্য না ঘটে এবং সমধাতুসকলের অনুবৃত্তি হয় এই উদ্দেশ্যেই ক্রিয়া করা হয়। বিষমহেতুসকলের ত্যাগ এবং সমহেতুসকলের সেবনের জন্য বিষমসকল

হেতুবশমিতি হেত্বধীনোৎপাদম্। এতেন আরোগ্যরূপপ্রকৃতার্থিনা সাম্যহেতুঃ সেবনীয়ঃ, তথা বিকাররূপরোগপরিহারার্থিনা বিকারহেতুর্বর্জনীয়ঃ।'—চক্র০।

১। ১।১৬।২৭-২৮, জায়ন্তে হেতুবৈষম্যাদ্ বিষমা দেহধাতবঃ। হেতুসাম্যাৎ সমাস্তেষাং স্বভাবোপরমঃ সদা॥ প্রবৃত্তিহেতুর্ভাবানাং ন নিরোধেঽস্তি কারণম্। কেচিত্তত্রাপি মন্যন্তে হেতুং হেতোরবর্তনম্॥ 'সম্প্রতি···সর্বভেষজানামেব ক্ষণভঙ্গিভাবে পক্ষেঽপি রোগশমকত্বং প্রতিপাদয়িতুং প্রকরণমারভতে—জায়ন্তে ইতি।···সদেত্যবিলম্বেন তেনোৎপন্নমাত্রা এব বিনশ্যন্তীত্যর্থঃ॥...যস্মাৎ সর্ব এব ভাবাঃ প্রদীপার্চির্বদুৎপত্তৌ কারণাপেক্ষিণঃ, বিনাশে তু দ্বিতীয়ক্ষণাবিদ্যমানত্বলক্ষণে সহজসিদ্ধে ন হেত্বন্তরমপেক্ষন্তে, যতো ন স্বাভাবিকরূপে হেত্বন্তরাপেক্ষা ভবতি, ন হ্যুৎপন্নঃ খড়্গাঃ স্বাভাবিকে লোহময়ত্বে কারণান্তরমপেক্ষতে।'—চক্র০।

২। শ্লো০ ২৯-৩০।

৩। ১।১৭।৩২-৩৩, ন নাশকারণাভাবাদভাবানাং নাশকারণম্। জ্ঞায়তে নিত্যগস্যেব কালস্যাত্যয়কারণম্॥ শীঘ্রগত্বাদ্ যথা ভূতস্তথা ভাবো বিপদ্যতে। নিরোধে কারণং তস্য নাস্তি নৈবান্যথাক্রিয়া॥ 'ভাবানাং নাশকারণং ন জ্ঞায়তে, তৎ কিমভাবাদেব, যথা শশবিষাণম্, উত বা জ্ঞানযোগ্যত্বাৎ পৃথিব্যাং নিখাতমূলকীলকাদিবৎ সদপি ন জ্ঞায়তে, ইত্যাহ—নাশকারণভাবাদিতি।··· যদ্ধি যস্য হেত্বন্তরাপেক্ষং ন তস্য তদবশ্যম্ভাবি, যথা পটস্য রাগঃ; হেত্বন্তরাপেক্ষী চেদ্বিনাশঃ স্যাৎ, নাবশ্যভাবী স্যাৎ, এতদ্বিপর্যয়াচ্চানপেক্ষত্বং বিনাশস্য সিদ্ধম্।···অন্যথাক্রিয়া অন্যথাকারণম্ সংস্কারাধানমিতি যাবৎ; এতেন বিষমে ধাতৌ সাম্যং সংস্কার আধীয়তামিত্যেবংরূপাপি চিকিৎসা নিরস্তা ভবত্যা॥'—চক্র০

অনুবৃত্ত হয় না, এবং ধাতুসকল সম হয়।[১] সমধাতুসকল বৈষম্য বা বিষমধাতুসকল সমতা প্রাপ্ত হয় না; দেহধাতুসকল সর্বদা হেতুসমূহেরই সদৃশ উৎপন্ন হয়।[২]

অজাত[৩] ব্যাধির অনুৎপত্তি এবং জাত ব্যাধির নিবৃত্তির জন্য যে বিধি দেখা গিয়াছে সুখার্থী তাহা পালন করিবে। সকল প্রাণীর সকল প্রবৃত্তিই সুখের জন্য, কিন্তু জ্ঞান ও অজ্ঞানরূপ বিশেষের জন্য যথাক্রমে মার্গ ও অমার্গ প্রবৃত্তি দেখা যায়। পরীক্ষকেরা সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া হিতই চাহিয়া থাকেন, লৌকিকেরা কিন্তু তাহাদের মন রজঃ ও মোহ দ্বারা আবৃত বলিয়া, প্রিয়ই চাহিয়া থাকে।[৪] শাস্ত্রজ্ঞান, বুদ্ধি, স্মৃতি, দক্ষতা, ধৃতি, হিতসেবন, বাগ্‌বিশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়জয় ও ধৈর্য পরীক্ষকদের আশ্রয় করে। মোহ ও রজর আশ্রয়ভূত লৌকিক ব্যক্তিকে কিন্তু এই সকল গুণ আশ্রয় করে না, পরন্তু তন্মূলক শারীর ও মানস বহুরোগ উৎপন্ন হয়।[৫] পরিহার্য

১। ১।১৬।৩৪-৩৬, যাভিঃ ক্রিয়াভির্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ। সা চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম তদ্ভিষজাং স্মৃতম্॥ কথং শরীরে ধাতূনাং বৈষম্যং ন ভবেদিতি। সমানাং চানুবন্ধঃ স্যাদিত্যর্থং ক্রিয়তে ক্রিয়া॥ ত্যাগাদ্বিষমহেতূনাং সমানাং চোপসেবনাৎ। বিষমা নানুবধ্নন্তি জায়ন্তে ধাতবঃ সমাঃ॥ বিষমেষু ধাতুষু যাভিঃ ক্রিয়াভিঃ সমা ধাতবো জন্যন্তে সা চিকিৎসা; এবং মন্যতে—যদ্যপি ধাতুবৈষম্যং ক্ষণিকত্বেন বিনশ্বরং তথাপি বিনশ্যদপি তদ্ধাতুবৈষম্যং স্বকার্যং বিষমমেব ধাতুমারভতে; এবং সোঽপ্যপরং বিষমমিতি ন ধাতুবৈষম্যসন্তাননিবৃত্তির্ধাতুসাম্য জনকহেতুং বিনা; যদা তু ধাতুসাম্যহেতুরুপযুক্তো ভবতি তদা তেন সহিতং বৈষম্যসন্ততিপতিতমপি কারণং সমমেব ধাতুসন্তানমারভতে, যথা মুদ্গরপ্রহারসহিতো ঘটপরমাণুসন্তানো বিসদৃশং কপালসন্তানমারভতে।' চক্র০।

২। ৪।১।৯৩, ন সমা যান্তি বৈষম্যং বিষমা সমতাং ন চ। হেতুভিঃ সদৃশা নিত্যং জায়ন্তে দেহধাতবঃ॥ 'সমাশ্চ বিষমাশ্চ ক্ষণভঙ্গিত্বস্বভাবান্ন বৈষম্যাবস্থাং সাম্যাবস্থাং বা যান্তীত্যর্থঃ। হেতুভিঃ সদৃশাঃ ইতি সমহেতোঃ সমাঃ, তথা বিষমহেতোশ্চ বিষমাঃ।'—চক্র০।

৩। ১।২৮।৩৪-৩৮, অজাতানামনুৎপত্তৌ জাতানাং বিনিবৃত্তয়ে। রোগাণাং যো বিধির্দৃষ্টঃ সুখার্থী তং সমাচরেৎ॥ সুখার্থাঃ সর্বভূতানাং মতাঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ। জ্ঞানাজ্ঞানবিশেষাত্ত মার্গামার্গপ্রবৃত্তয়ঃ॥ হিতমেবানুরুধ্যন্তে প্রপরীক্ষ্য পরীক্ষকাঃ। রজোমোহাবৃতাত্মানঃ প্রিয়মেব তু লৌকিকাঃ॥ শ্রুতং বুদ্ধিঃ স্মৃতির্দাক্ষ্যং ধৃতির্হিতনিষেবণম্। বাগ্বিশুদ্ধিঃ শমো ধৈর্যমাশ্রয়ন্তি পরীক্ষকম্॥ লৌকিকং নাশ্রয়ন্ত্যেতে গুণা মোহরজঃশ্রিতম্। তন্মূলা বহবো যন্তি রোগাঃ শারীরমানসাঃ॥

৪। তুলনীয় কঠোপনিষদ্ ১।২।২, শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সংপরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥

৫। ১।২৮।৪৩-৪৪, পরিহার্যাণ্যপথ্যানি সদা পরিহরন্নরঃ। ভবত্যনৃণতাং প্রাপ্তঃ সাধূনামিহ পণ্ডিতঃ॥ যত্তু রোগসমুত্থানমশক্যমিহ কেনচিৎ। পরিহর্তুং ন তৎ প্রাপ্য শোচিতব্যং মনীষিভিঃ॥ অনৃণতামিব প্রাপ্তোঽনৃণতাং প্রাপ্তঃ, এতেন পরিহার্যপরিহারেণ পুরুষকারেঽনপরাধঃ পুরুষ

অপথ্যসকল সদা পরিহার করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সাধুদিগের নিকট অনৃণতা প্রাপ্ত হয়। আর রোগের উৎপত্তি কেহ পরিহার করিতে পারে না—তাহা উপস্থিত হইলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির শোক করা উচিত নহে।

নৈষ্ঠিকী চিকিৎসা

দুঃখসকলের[১] নৈষ্ঠিক বা আত্যন্তিক চিকিৎসা কিন্তু উপধার বর্জন; যেহেতু উপধা দুঃখ এবং দুঃখাশ্রয় শরীরের প্রদাতা প্রকৃষ্টতম হেতু এবং সর্বোপধার ত্যাগ সর্বদুঃখের অপসারক। যেমন কোষকার নামক কীট নিজের বধপ্রদ অংশুসকল গ্রহণ করে, তেমনই সদা আতুর অজ্ঞ ব্যক্তি বিষয়সকল হইতে তৃষ্ণা[২] গ্রহণ করে। কিন্তু যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অর্থসকলকে অগ্নি-কল্প জানিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হন, আরম্ভ ও সংযোগের অভাবে দুঃখ তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না।

ভবতীতি দর্শয়তি।.. অপক্যং পরিহর্ত্তুমিতি বলবৎকর্মজন্যত্বাদিত্যর্থঃ। ন শোচিতব্যমিতি পুরুষকারস্য দৈবজন্যেঽবশ্যম্ভাবিনি ব্যাধাবকিঞ্চিৎকরত্বাদিত্যর্থঃ।'—চক্র°।

১। ৪।১।৯৪-৯৭,...চিকিৎসা তু নৈষ্ঠিকী যা বিনোপধাম্। উপধা হি পরো হেতুর্দুঃখাদুঃখাশ্রয়প্রদঃ। ত্যাগঃ সর্বোপধানাং চ সর্বদুঃখব্যপোহকঃ॥ কোষকারো যথা হ্যংশূনুপাদত্তে বধপ্রদান্। উপাদত্তে তথার্থেভ্যস্তৃষ্ণামজ্ঞঃ সদাতুরঃ॥ যস্ত্বগ্নিকল্পানর্থান্ জ্ঞোজ্ঞাত্বা তেভ্যো নিবর্ততে। অনারম্ভাদসংযোগাত্তং দুঃখং নোপতিষ্ঠতে॥ 'বিনোপধমিতি তৃষ্ণাং বিনা, তৃষ্ণাশূন্যা প্রবৃত্তির্মোক্ষফলা ভবতীত্যর্থঃ॥...ভোগতৃষ্ণয়া হি প্রবর্ত্তমানো ধর্মাধর্মান্ দুঃখশরীরোৎপাদকানুপাদত্তে, সর্বোপধাত্যাগাত্তু ন রাগদ্বেষাভ্যাং কচিৎ প্রবর্ত্ততে অপ্রবর্ত্তমানশ্চ ন ধর্মাধর্মানুপাদত্তে, এবমনাগতধর্মাধর্মোপরমঃ, উপাত্তধর্মাধর্ময়োস্তু রাগদ্বেষশূন্যস্যোপভোগাদেব ক্ষয়ঃ; তেন সর্বথা কর্মক্ষয়াদ্দুঃখশরীরাভাবঃ ইতি ভাবঃ।...অনারম্ভাদিতি রাগদ্বেষপূর্বকারম্ভবিরহাৎ। অসংযোগাদিতি আরম্ভশূন্যত্বেন ধর্মাধর্মোচ্ছেদকৃতাচ্ছরীরাসংযোগাৎ; শরীরাভাবে চ নিরাশ্রয়মকারণকম্ দুঃখং ন ভবতীতি ভাবঃ।'—চক্র°।

২ তৃষ্ণাকে সুখদুঃখের হেতু ও ফল উভয়ই বলা হইয়াছে, যথা ৪।১।১৩৪, ইচ্ছাদ্বেষাত্মিকা তৃষ্ণা সুখদুঃখাৎ প্রবর্ত্ততে। তৃষ্ণা চ সুখদুঃখানাং কারণং পুনরুচ্যতে॥ 'সুখাদিচ্ছারূপা তৃষ্ণা, দুঃখাচ্চ দ্বেষরূপা তৃষ্ণা প্রবর্ত্ততে। ইয়ং চোৎপন্না তৃষ্ণা ঈপ্সিতেঽর্থে প্রবর্ত্তয়ন্তী দ্বিষ্টে চ নিবর্ত্তয়ন্তী, প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিষয়ম্ভ সুখদুঃখভাবমপেক্ষ্য সুখদুঃখে জনয়তীতি বাক্যার্থঃ।—চক্র°।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস

(ফ্রাঙ্ক্ থিলির গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত)

শ্রীযোগেশ্বর মুখোপাধ্যায়

উপক্রমণিকা

জগৎ-সৃষ্টি-বিষয়ে যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য মনীষিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে-সমস্ত চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারই একটি ধারাবাহিক পরস্পর-সুসম্বদ্ধ বিবরণ দেওয়াই দর্শন-ইতিহাসের লক্ষ্য। অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মানব-মনের বিচারবুদ্ধি-সম্মত চিন্তাগুলি যে ভাবে পরিস্ফুট হইয়া পরিণতিপ্রাপ্ত হইয়াছে দর্শন-ইতিহাসে আমরা তাহারই একটা বিবৃতি পাই ;—এই বিবৃতি কেবল একটা বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সময়ানুক্রমিক বিবৃতি বা ব্যাখ্যা নয়, কিন্তু ঐ সকল মতবাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি, কোন্ সময়েই বা তাহাদের উদ্ভব হয়, এবং কোন্ কোন্ দার্শনিকের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এই সকল বিষয়ও উক্ত বিবৃতির মধ্যে প্রণিধানপূর্ব্বক বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান ও বিচার করিতে হইবে। অতএব দর্শন-ইতিহাস-গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ক যাবতীয় মতবাদের প্রত্যেকটিকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে ; এই এক একটি মতবাদ সমুদয় মতবাদের পূর্ণ অবয়বের এক একটি অঙ্গস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে, এবং উহাকে বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ যুগের মানসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। আমাদের দেখাইতে হইবে মানবের দার্শনিক মনোভাব কি প্রকারে উদ্ভূত হয়, ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা (প্রশ্ন) এবং তাহাদের সমাধান আবার কি ভাবেই বা নূতন প্রশ্নোত্তরের সৃষ্টি করে, এবং গন্তব্য পথের চরম সীমায় পৌঁছিবার জন্য আমরা কতদূরই বা অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছি।

ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের আলোচনা করিবার সময়ে ঐতিহাসিকের কোনরূপ স্বীয় মত প্রকাশ করা উচিত নয়। ভিন্ন ভিন্ন লেখকের মতবাদগুলির কোনরূপ সমালোচনা না করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের মূল আকারে সম্পূর্ণভাবে পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা উচিত। কিন্তু ঐতিহাসিকের পক্ষে একেবারে কোনরূপ ব্যক্তিগত মত প্রকাশ না করিয়া অন্যের মতবাদ আলোচনা করা একরূপ অসম্ভব। কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার নিজ মত তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ পাইবেই ; যেমন, যখন তিনি কোন বিশেষ বিশেষ দার্শনিক মতবাদের উপর ঝোঁক দিয়া কিছু বলিতে চাহিবেন এবং তাঁহার ধারণায় দর্শনের উন্নতিসাধন এবং অবনতিই বা কি প্রকারে হয় এই সকল বিষয়ে যখন তিনি তাঁহার গ্রন্থে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ঐতিহাসিকের পক্ষে এসব বিষয় অপরিহার্য্য। যাহা হউক, দার্শনিককে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজমত ব্যক্ত করিবার অবসর দেওয়া উচিত, এবং যে পর্য্যন্ত না তাঁহার সমস্ত বক্তব্যটি বলা শেষ হয়, সে পর্য্যন্ত কোনরূপ আপত্তিকর প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়, এবং আরও এক কথা, কেবলমাত্র আমাদের বর্ত্তমানযুগের উন্নত দর্শনের মানদণ্ড দিয়া কোন মতবাদের সমালোচনা করা আদৌ উচিত নয়। কেন না, তাহাতে উহার প্রতি অন্যায় করা হইবে ; যেহেতু আধুনিক উন্নত

দার্শনিক মতবাদগুলির সহিত উহার তুলনাই হইতে পারে না। কোন দার্শনিক মতবাদের বিচার করিতে হইলে উহাকে উহার নিজস্ব উদ্দেশ্য ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়াই বিচার করিতে হইবে।

দর্শন-ইতিহাস পাঠের উপকারিতা অতি সহজেই বুঝা যায়। জগৎ-সৃষ্টির মূলীভূত কারণ কি, উহা জানিবার জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই কৌতূহলী এবং উহার প্রশ্নোত্তর পাইবার জন্য মানব-জাতির সভ্যতার নানা স্তরে বহু অনুসন্ধান ও বহু চেষ্টা করা হইয়াছে। অধিকন্তু ইহার দ্বারা আমরা আমাদের ও অপর সময়ের ইতিবৃত্ত জানিতে পারি ; ইহা দ্বারা আমরা বিভিন্ন দেশের অতীত ও বর্ত্তমান সময়ের নৈতিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম্ম্য (ধার্ম্মিক) জীবনের একটা ধারণা অতি সহজেই করিতে পারি ; আবার ইহা দ্বারা আমাদের দার্শনিক চিন্তার একটা সুগম পথও প্রস্তুত হইয়া যায়, কেন না এরূপ পাঠে আমরা সামান্য হইতে অধিকতর জটিল ও সমস্যাপূর্ণ কঠিন চিন্তার বিষয়সমূহ চিন্তা করিতে শিক্ষা করি। ইহা দ্বারা আমরা জাতির পূর্ব্বলব্ধ দার্শনিক জ্ঞানসকল তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতে পারি এবং তদ্দ্বারা আমাদের মনকে বস্তুনিরপেক্ষ বিষয়সমূহ চিন্তা করিতে অভ্যস্ত করিয়া তুলি। এই প্রকার জগৎ-সৃষ্টি-বিষয়ে ও আমাদের জীবন-সম্বন্ধে আমাদের নিজ নিজ মত গঠন করিতে শিক্ষা করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী কোন দার্শনিকের গ্রন্থ আদৌ পাঠ না করিয়া, কেবল আপন চিন্তা-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া, কোন দার্শনিক মতবাদ গঠন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার মতবাদ সভ্যতার আদিম যুগের অপরিপক্ক মতবাদ হইতে বড় বেশী উন্নত হইতে পারে না।

সার্ব্বভৌম ইতিহাসের প্রথানুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ অনুসরণ করিলে দর্শনের ইতিহাসকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা—(১) প্রাচীন যুগের দর্শন, (২) মধ্য যুগের বা খৃষ্টীয় দর্শন, এবং (৩) আধুনিক (বর্ত্তমান) দর্শন।

গ্রীক-দর্শন

প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক দর্শন

(১) প্রাচীন গ্রীসবাসীর দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি ও পরিণতি—

আমরা গ্রন্থের উপক্রমণিকায় উল্লেখ করিয়াছে যে, আমাদের দর্শন-ইতিহাসের গ্রন্থখানি, দর্শনশাস্ত্রের চির প্রথানুযায়ী, তিনটি শ্রেণী-বিভাগে বিভক্ত করা হইবে: (১) প্রাচীন দর্শন, (২) মধ্য যুগের বা খৃষ্টীয় দর্শন, এবং (৩) আধুনিক দর্শন। অতএব আমরা প্রথমেই প্রাচীন গ্রীক জাতির দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, জগতের যাবতীয় দর্শন-শাস্ত্রের মধ্যে কেবল এক গ্রীক জাতিরই দর্শন আমরা প্রথমে পাঠ করিব কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন জাতিদের মধ্যে এক গ্রীক জাতিই দার্শনিক চিন্তার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল; অন্যান্য প্রাচীন জাতির দর্শন-শাস্ত্র পৌরাণিক স্তরের সীমা অতিক্রম করিয়া বড় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রাচীন গ্রীকরা যে কেবল একটি দর্শনের মূল ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন (যাহার উপর পরবর্তী যুগের পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদগুলি গড়িয়া উঠে) তাহা নয়, কিন্তু তাঁহারা প্রায় সমুদয় দার্শনিক প্রশ্নও সূত্রাকারে এবং সুবিন্যস্ত ভাষায় ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং উহাদের প্রায় সকলগুলিরই উত্তর ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, উত্তরের আভাস দিয়াছিলেন। সামান্য পৌরাণিক তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, জটিল সমস্যাপূর্ণ ও ব্যাপক মতবাদগুলি সমাধান করিতে মানব-চিন্তার কিরূপ ক্রমবিকাশ হয়, গ্রীকদের দর্শনে আমরা তাহারই একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাই। তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তা ও সত্যানুরাগ তাঁহাদের দার্শনিকগণকে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করিত। তাঁহাদের উক্ত গুণ দু'টী কেহ কখনও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই, এবং অতি অল্প লোকেই উহাদের সমান হইতে পারিয়াছিল। এই সব কারণে উচ্চতর দার্শনিক চিন্তালাভে যত্নবান্ ছাত্রমাত্রেরই গ্রীক-দর্শন-পাঠ একটা আনন্দদায়ক মহামূল্য মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার স্থান বলিয়া বিবেচনা করা উচিত।

গ্রীক-দর্শনের ইতিহাস

গ্রীক দর্শনের ইতিহাস বলিতে আমরা কি বুঝিব? আমরা বুঝিব সেই সকল মানসিক উন্নতিসাধনের আন্দোলন, যাহার উৎপত্তি ও স্ফুরণ প্রথমে সমগ্র গ্রীক রাজ্যের মধ্যেই হয়। তথাচ, ইহাতে যে আমরা কেবল গ্রীকদেরই মতবাদগুলি অন্তর্ভুক্ত করিব তাহা নয়, কিন্তু গ্রীক-দর্শনের মূল লক্ষণযুক্ত অন্যান্য মতবাদও ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবে,—অর্থাৎ যেগুলি স্পষ্টতঃ গ্রীক-সভ্যতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, সে সকল মতবাদও ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবে—তাহারা যেখানেই কেন (অ্যাথেন্সেই হউক রোমেই হউক, আলেকজান্দ্রায়ই হউক বা এশিয়া-মাইনরেই হউক) শ্রীবৃদ্ধিলাভ করুক না।

আমরা যে জাতির দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিব তাহারা গ্রীসের সেই পার্বত্য উপদ্বীপে বাস

করিত যাহার পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের গুণে, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ জাতির উদ্ভব অতি সহজেই হইত। ঐ প্রদেশের বিভিন্ন বন্দর হইতে গ্রীকবাসীরা ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত এবং জাহাজে করিয়া সমুদ্রের উপর দিয়া নানা দেশে গমনাগমন করিবার বিশেষ সুবিধা পাইত এবং আরও নিজ দেশ ছাড়িয়া গ্রীসের বহির্ভূত নানা দ্বীপে যাইয়া বসবাস স্থাপন করিত। এইরূপ বৃহত্তর স্থলভূমি (mainland) হইতে আরম্ভ করিয়া এশিয়া-মাইনরের নানা উপকূলে, এবং অবশেষে মিসর, সিসিলী, দক্ষিণ ইতালী ও জিব্রল্টার প্রণালী পর্য্যন্ত, মাতৃভূমির সহিত সংযোগ রাখিয়া, এক বিশাল, বিস্তৃত, অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলাকারে গ্রীকদের উপনিবেশগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সংস্থাপিত হয়। ঐ সকল উপনিবেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকদিগের দেশাচার ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠানের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া বিশেষ লাভবান্ হইয়াছিল। এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করার ফলে, তাহাদের অদ্ভুত আর্থিক উন্নতি,—তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি, তাহাদের নূতন নূতন সহরের উদ্ভব, তাহাদের ধনাগম, এবং তাহাদের ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল শ্রমবিভাগ-পদ্ধতি—সমগ্র গ্রীক জগতের সামাজিক, রাজনৈতিক, মানসিক ও ধর্ম্ম জীবনের উপর এক গভীর প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং একটি নূতন ও অধিকতর সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল। এইরূপ জড়-প্রকৃতির ও মানব-প্রকৃতির (physical and human environment) পরিস্থিতির মধ্যে থাকিয়া, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তি অতি সহজেই জাগ্রত হইয়া উঠে। এই অবস্থায় থাকিয়া তাহারা জগতের এবং মনুষ্য-জীবনের একটা উন্নততর দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করে, তাহাদের বিচার-শক্তি ও চিন্তা-শক্তি অতি শীঘ্রই বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তাহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত রকমের ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়, এবং মনুষ্য-জীবনের সকল প্রকার চিন্তার ও কর্ম্মের পথে অগ্রসর হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়। স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন, জ্ঞানপিপাসু, সূক্ষ্মসৌন্দর্য্য-বোধবিশিষ্ট, উদ্যমশীল ও উচ্চাভিলাষী গ্রীকজাতি এই পরিস্থিতির মধ্য হইতে এমন সব উপাদান লাভ করিয়াছিল যদ্দ্বারা তাহারা তাহাদের শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি নানা বিষয়ে প্রয়োগ করিবার সুযোগ, অবসর পায় এবং ইহা দ্বারা তাহারা রাজনীতি-ক্ষেত্রে, ধর্ম্মে, চরিত্রে, সাহিত্যে ও দর্শনে অতি দ্রুত উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হয়।

গ্রীকদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিস্থিতি

নিজ গ্রীসদেশের অন্তর্গত শহর-রাষ্ট্রসমূহের ও উপনিবেশগুলির রাজনীতি-ক্ষেত্রের ভাগ্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়। অভিজাত-সম্প্রদায়ভুক্ত একাধিপতি-দ্বারা শাসিত রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া গণতন্ত্র পর্য্যন্ত আমরা সর্ব্বত্রই ক্রমবিকাশের লক্ষণ দেখিতে পাই। মহাকবি 'হোমার'বর্ণিত গ্রীক সমাজ একটি জাতিগত সমাজ (—বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদ্বারা গঠিত সমাজ) এবং একাধিপতির রাজ্যশাসন ইহার শাসন-প্রণালী ছিল। অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে ধনাগম ও মানসিক বৃত্তিসমূহের উন্নতিসাধন হওয়ায় গ্রীসদেশে ও উপনিবেশগুলির মধ্যে প্রথমে উচ্চবংশীয় লোক-দ্বারা পরিচালিত শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং কালক্রমে, অল্পসংখ্যক লোক দ্বারা শাসিত রাজ্যের উদ্ভব হয়। সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি নাগরিক শ্রেণীর লোকের সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। তাহারা দেশের বিশিষ্ট অধিকারপ্রাপ্ত লোকদিগের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নানা বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক করিতে আরম্ভ করে, এবং এই সকল সাহসী ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির চেষ্টায়, অভিজাত-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের

রাজনীতি

হস্ত হইতে রাজ্যভার কাড়িয়া লওয়া হইলে পর, খৃষ্টপূর্ব্ব ৭ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সমগ্র গ্রীক জগতের মধ্যে যথেচ্ছাচারী রাজার রাজত্ব স্থাপিত হইল। পরিশেষে, জনসাধারণ নিজেরাই দেশের শাসনভার গ্রহণ করিল, এবং ইহার ফলে যথেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র গণতন্ত্রের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল এবং দেশে প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল।

গ্রীকদের মানসিক বৃত্তিসমূহের উন্মেষবশতঃই যে রাজ্যের মধ্যে উল্লিখিত ব্যাপারসকল ঘটিয়াছিল তাহা আমরা মনে করিতে পারি। উক্ত নূতন আন্দোলনটী জ্ঞান ও সুশিক্ষার উভয় লক্ষণ এবং কারণ। উহা বংশপরম্পরাগত সংস্কার-সম্বন্ধে বর্দ্ধনশীল চিন্তা ও সমালোচনা-শক্তির একটি বাহ্য লক্ষণ; প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং তাহাদের সংস্কার করিবার জন্য উহার উদ্ভব হয়।

সাহিত্য

খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে গ্রীক সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই গ্রীকদিগের রাষ্ট্রীয় জীবন যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, ঠিক সেইভাবেই তাহাদের চিন্তাশক্তি ও বিচারশক্তি একটু একটু করিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। হোমারীয় যুগের আমোদ-প্রমোদ ও বস্তুতান্ত্রিকতা এবং বাল্যাবস্থার স্বাভাবিক সরলতার লক্ষণ ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল; কবিরা জগৎকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন—'বিশ্ব-সংসারের সমস্তই উৎকৃষ্ট ও হিতকর' এ বিশ্বাস ক্রমশঃ হারাইতে লাগিলেন এবং অধিকতর বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন ও চিন্তাশীল হইয়া উঠিলেন। ইতিপূর্ব্বেই আমরা 'হোমারে'র কাব্যে মানুষের আচার-ব্যবহার ও নির্বুদ্ধিতা, জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও অনিত্যতা, এবং অবিচারের অত্যাচার-সম্বন্ধে অনেক সাময়িক উপদেশপূর্ণ নৈতিক চিন্তা পাইয়াছি। হিসিওডের গ্রন্থে (কাব্যে) সমালোচনা ও দুঃখবাদের সুর আরও অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।......৭ম শতাব্দীর কাব্যকারগণ কাতর ও ব্যঙ্গস্বরে যথেচ্ছাচারিতার উত্থানের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়াছেন এবং মানুষের দুর্ব্বলতার জন্য অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে তাহাদের ভাগ্য বীরের ন্যায় ধীরভাবে সহ্য করিতে এবং উহার ফলাফল দেবতার চরণে অর্পণ করিতে বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কাব্যে উপদেশ ও দুঃখবাদের ভাব আরও অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়া উঠে; জনসাধারণের রাজনৈতিক ভাগ্যকে আলোচনার বিষয়ীভূত করা হয় এবং দেশের প্রচলিত নূতন ব্যবস্থার প্রতি অতি তীব্রভাবে কটাক্ষপাত করা হয়। এই যুগে উপদেশমূলক গল্প-রচয়িতা ইশপ এবং তথাকথিত নীতিপূর্ণ প্রবাদবাক্য-প্রণেতা Solon প্রভৃতি কবিদের আবির্ভাব হয়। ইহাদের নৈতিক-চিন্তা-সমন্বিত জ্ঞানগর্ভ প্রবচনগুলি নীতিবিষয়ক দর্শন-শাস্ত্রের প্রথম অবস্থা বলা যাইতে পারে। ফলকথা এই যে, যখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জীবনের কার্য্য সমুদয় বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন,—তখন তিনি কেবল শুধু জীবনযাপন না করিয়া, জীবন-সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আর তাঁহার জাতির চিরপ্রথানুযায়ী অভ্যাসগত ধারণা ও আদর্শ-সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত নৈতিক, রাষ্ট্রিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মত ও চিন্তাগুলি পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের নিকট জ্ঞাপন করিতে তৎপর হইলেন। পরিশেষে, এইরূপ অনুসন্ধানের, বিচারের ও অসন্তোষের ভাব হইতে নৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদের আকারে, মানব-চরিত্র-সম্বন্ধীয় দর্শন-পাঠের উদ্ভব হয়।

গ্রীকদের ধর্ম্মও তাহাদের রাজনৈতিক এবং সাহিত্যোন্নতির ধারায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও বিকাশ-

প্রাপ্ত হয়। প্রাচীন কালের প্রকৃতি-পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীক-ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে বহু দেবতার উপাসনায় পর্য্যবসিত হয় এবং ইহা হইতে কবি-কল্পনাপ্রসূত দেবতাদের একটি সমাজ গঠিত হয়, যেখানে তাঁহারা একদল অতীত যুগের প্রতিভাশালী বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বাস করিতেন। এক্ষেত্রেও গ্রীকদিগের চিন্তা-শক্তি ও বিচারশক্তি কার্য্যকরী হইয়াছিল এবং তাহাদের ধর্ম্মকে নীতি ও যুক্তিসম্মত করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। উক্ত দেবতাদের স্বভাব-চরিত্র ও আচরণের বিষয় সতত অনুধ্যান ও চিন্তা করায় এবং নীতিমূলক জ্ঞান পরিমার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হওয়ায় গ্রীকরা ওলিম্পাস্ দেবতার একটি অধিকতর শুদ্ধ ধারণা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা নিজেই সংস্বভাববিশিষ্ট ও ন্যায়নিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন এবং জিয়সকে (Zeusকে) গ্রীকরা স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ে প্রধান দেবতা এবং স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল।

ধর্ম্ম

পক্ষান্তরে, গ্রীকদিগের যে তত্ত্ব-জ্ঞানের বা অধ্যাত্ম-বিদ্যার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার লক্ষণ আমরা তাহাদের ঈশ্বরবাদে—ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উৎপত্তি, এবং তাহাদের জগতের সহিত পারস্পরিক সম্বন্ধ-বিষয়ে মতবাদে দেখিতে পাই। লোকেরা প্রথমে তাহাদের বংশপরম্পরাগত পৌরাণিক-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, এবং কিরূপে এই সকল দেবতার উদ্ভব হয়, এ প্রশ্নটিও তাহাদের মনে জাগরিত হয়। তাহারা পৌরাণিক উপাখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া, জগতের বাহ্য বস্তুসমুদয় অস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। দেবতাদের প্রাচীনতম বংশকুলজির নিদর্শন আমরা হিসিওডের গ্রন্থে দেখিতে পাই। ঐ একই শ্রেণীর সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত সাইরস-নিবাসী ফিরিসাইডিসের দেবকুলজি (৫৪০ খৃঃ পূঃ) এবং ওরিফিয়াসের সৃষ্টি-তত্ত্বের মতবাদগুলি। ওরিফিয়াসের মতবাদগুলি, বোধ হয়, আরও প্রাচীনতর দেবকুলজির উপর প্রতিষ্ঠিত (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর) কিন্তু তাহাদের বর্ত্তমান আকারে ঐ সকল মতবাদ খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর অধিক পূর্ব্বের বলিয়া মনে হয় না। হিসিওডের দেবকুলজি অনুসারে সর্ব্বপ্রথম জগৎ-সৃষ্টির প্রাক্কালীন বিশৃঙ্খল অবয়বশূন্য অবস্থার (Chaos) উদ্ভব হয়, তারপর পৃথিবীর (Gaia), তারপর অনুরাগের, ভালবাসার (Erosএর = Love) বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে (Erebos) অন্ধকার ও (Nux) রাত্রি উৎপন্ন হয়, এবং এই দুইটীর উভয়ের সংযোগে আলোক (Æther) ও (Hemeri) দিবসের সৃষ্টি হয়। পৃথিবী সমুদ্র প্রসব করে (পৃথিবী হইতে সমুদ্র উৎপন্ন হয়) এবং আকাশের সহিত মিলনের ফলে নদীসকল উৎপন্ন হয়। আকাশের বীজ হইতে ভালবাসার (অনুরাগের) উৎপত্তি হয়; অর্থাৎ আকাশ হইতে বারিবর্ষণের ফলে বাহ্য প্রকৃতিতে জীবনীশক্তি অঙ্কুরিত হয়। এখানে বাহ্য বস্তুসমূহের উৎপত্তির স্থল দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক বা তর্ক-শাস্ত্রের নিয়মানুগত ব্যাখ্যা নয়, বরং কবি-কল্পনার লোকপ্রিয় পুরাণ-শাস্ত্রের সাহায্য লইয়াই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কবিরা আপনাদের মধ্যে এইরূপ প্রশ্ন করিতেন: কিরূপে বাহ্যবস্তুসমুদয় ও পারিপার্শ্বিক-ঘটনাসমূহের উদ্ভব হয়, এবং তাঁহাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতানুসারে ঐসকল বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেন,—যথা, উৎপাদন-ক্রিয়ার বা মানব-ইচ্ছার ফলস্বরূপ উহারা উৎপন্ন হয়। আঁধার রাত্রি উভয়ের মিলনে দিবস উৎপন্ন হইয়া থাকে; পৃথিবী আকাশের দ্বারা ফলবতী হইয়া নদীসকল উৎপাদন করে।

দেবকুলজি সংক্রান্ত গ্রন্থসকল দর্শন-শাস্ত্র না হইলেও উহারা দর্শনের প্রথমাবস্থা—পূর্ব্ব আয়োজন। পৌরাণিক ধারণাগুলির মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই দার্শনিক চিন্তার বীজ নিহিত থাকে;

দর্শন

জগতের যাবতীয় বস্তুর মূল কারণ জানিবার জন্য একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা, একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা—যদিও উক্ত আকাঙ্ক্ষাটী আমাদের ইচ্ছাবৃত্তির মধ্যে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত থাকে—উজ্জ্বল কাল্পনিক-বর্ণনায় সহজেই পরিতৃপ্ত হয়। দেবকুলজি ও সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মতবাদগুলি পুরাণ অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। ঐ সকল গ্রন্থে পৌরাণিক তত্ত্বগুলিকে যুক্তিসম্মত করিতে, এবং প্রাকৃতিক রাজ্যের ও মনুষ্য-জীবনের উপর শাসনকর্ত্তা দেবতাদের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিবার বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। তথাপি, উক্ত মতবাদগুলি এখনও, অধিক পরিমাণে, যুক্তিসম্মত বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা কবি-কল্পনাকেই পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে; এবং উহাতে স্বাভাবিক কারণের সাহায্য না লইয়া বরং অতি-প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য চাওয়া হইয়াছে। দর্শন তখনই গড়িয়া উঠে, যখন যুক্তি কল্পনার স্থান অধিকার করে; যখন বুদ্ধিবৃত্তি কল্পনাকে সরাইয়া দেয়, যখন অতিপ্রাকৃতিক বস্তুগুলি ব্যাখ্যার মূল সূত্রস্বরূপ পরিত্যক্ত হয়, এবং অভিজ্ঞতার বিষয়গুলিকে অনুসন্ধানের ও ব্যাখ্যার মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হয়। সাধারণ পুরাণের সাহায্য না লইয়া এবং আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের নিত্য প্রয়োজনের বশবর্ত্তী না হইয়া যাবতীয় বাহ্য বস্তু ও ঘটনাসমূহের মূল কারণ, অন্ধবিশ্বাস নিরপেক্ষভাবে এবং স্বীয় সংস্কারের দ্বারা চালিত না হইয়া, নির্ণয় করাই দর্শনের কার্য্য। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে, কুসংস্কারবর্জ্জিত শিক্ষার যুগে, দর্শন-শাস্ত্র গ্রীসে আবির্ভূত হওয়ায়, আমরা দর্শনকে ঐ যুগের লোকদিগের পূর্ব্ববর্ণিত বিচার ও অনুসন্ধান-শক্তির স্বাভাবিক ফলস্বরূপ বলিয়া গণ্য করিতে পারি এবং ঐ দর্শন-শাস্ত্র গ্রীকদের মানসিক জীবনের সকল প্রকার আকারে ব্যক্ত ও প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)